তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ শনিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴০

জীবন-স্রোত।

জীবন হরিয়া কাল যায় দ্রুতগতি,
স্থির থাকি নাহি সে শকতি।
না জানি যে কোন খানে,
সদা এই স্রোত টানে,
আঁধারে জন্মিয়া বহে যায় স্রোতস্বতী;
আঁধারে লুকায়; কোথা তার পরিণতি?

কাহার আদেশে নদী কোথা জনমিল?
কি উদ্দেশে কোথা সে ছুটিল;
আমাতে উৎপত্তি নয়,
এ আদেশে নাহি বয়,
আমাকে রাখিয়া পাশে, ফেলিয়া চলিল;
সুখ দুঃখ দুই মোর ভাসায়ে লইল।

যাঁহাতে জীবন-স্রোত হয়েছে উৎপত্তি;
তাঁহাতেই হয় যেন স্থিতি।
জন্মে মেঘ সিন্ধু জলে,
পড়িয়া ধরার কোলে,
পুন সেই সিন্ধু-পানে যথা তার গতি;
যাও রে জীবন তথা নিজের বসতি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সমুদ্র মধ্যে একখানি জাহাজ নিমগ্ন হইয়া বহুসংখ্যক নরনারী হত হইয়াছে। কেবল এক ব্যক্তি কোন রূপে এক খণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া অতি কষ্টে সমস্ত রজনী জীবিত থাকিয়া ভাসিতে ভাসিতে প্রভাতকালে আর একখানি জাহাজের নিকটে আসিয়া তাহার কাছি ধরিল। ধরিয়া অতি ক্লেশে উপরে উঠিয়া আসিতেছে; প্রায় উপরে উঠিয়াছে, এমন সময় জাহাজের উপরের দুরাত্মা লোকেরা কৌতুক দেখিবার জন্ত কাছি কাটিয়া দিল, আবার সে অগাধ সিন্ধু জলে পড়িয়া গেল। এ যে প্রকার ব্যবহার; যে ব্যক্তি পাপীকে বলে ওরে পাপি! তুই কেন বৃথা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিস? প্রার্থনা করিয়া কোন ফল নাই। তাহারও ব্যবহার সেইরূপ। যে ব্যক্তি মানবকে ঈশ্বরের করুণাতে অবিশ্বাসী করিয়া গভীর নিরাশকূপে তাহাকে ফেলিয়া দেয়, তাহার ন্যায় শত্রু আর কে আছে? আমাদের দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতি সময়ে সময়ে জীবন সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কেহ নিরাশাজনক কথা না বলিলেও আমাদের মন সময়ে সময়ে আপনা হইতে ঘোর নিরাশার মধ্যে পড়িয়া যায়। সে সময়ে আশা ও বিশ্বাসের কথা শুনিলে প্রাণে কত বল পাওয়া যায়। তখন সেরূপ কথা যে বলে সেই বন্ধু। তাহা না হইয়া যে নিজের দুঃখভারে নিজে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার গলে আবার অবিশ্বাসের পাষাণ বাঁধিয়া যে তাহাকে নিরাশার গভীর জলে নিক্ষেপ করে সে পরম শত্রুর কার্য্য করে। হে! সংসার পথের অবসন্ন পথিক, তুমি আশ্বাসিত হও, প্রভু পরমেশ্বর তোমার নিকটে রহিয়াছেন, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

আর কেনই বা পরিত্যাগ করিবেন? তিনি যে আমাদিগকে এই অধিকার দিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি। ইহাতেই কি প্রমাণ পাওয়া যায় না যে তিনি আমাদিগকে তাঁহার সহবাসের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন? এই জন্তই ত মানবজীবনের মূল্য এত। আমরা তাঁহার সহবাসে থাকিতে পারি, এই অধিকার যদি আজ বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে কি আমাদের জীবন পশুদের জীবন অপেক্ষা অন্ধকারময় হইয়া যায় না? পশুরা বর্ত্তমানের সুখ দুঃখই ভোগ করে; অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হয় না; ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কাতে মলিন হইতে হয় না। মানবের বর্ত্তমানের সুখ কত সময়ে উক্ত উভয় কারণে বিষাক্ত হইয়া যায়। ঈশ্বরকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার যদি আজ বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ সুখের দ্বার বন্ধ হইল; কিন্তু বর্ত্তমান জীবনে দুঃখাগ্নি প্রবিষ্ট হইবার দুই দ্বার উদ্ঘাটিত রহিল। সুতরাং মানব জীবন পশুপক্ষীর জীবন হইতেও হীন হইয়া পড়িল। ঈশ্বর তাঁহার সহবাসের জন্ত আমাদিগকে সৃষ্টি করি-

য়াছেন, এই সত্যটী ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে না পারাতে আমাদের পাপে রুচি হয় এবং আমরা স্বার্থপরতার সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এই জীবনকে আবদ্ধ করিয়া ফেলি। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বীয় সহবাসে রাখিতে চান,যতই এই মহাসত্যটী হৃদয়ে ধারণ করিব ততই বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ মানবে প্রেম, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ, প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ সকল আমাদের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইবে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা জর্জ্জ ফক্‌স্ তাঁহার নিজ জীবনের দৈনিক লিপিতে এক স্থানে বলিয়াছেন যে তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ২০ কি ২১ বৎসর, তখন তাঁহার অন্তরে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত রিপুকুলের সহিত সংগ্রামে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একান্ত অন্তরে ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বার বার প্রলুব্ধ হইয়া প্রার্থনার প্রতিও যেন অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইতে লাগিল। হৃদয় নীরস, শুষ্ক ও বিশ্বাসবিহীন হইয়া পড়িল। এইরূপ সংকটের মধ্যে পড়িয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে নানা শ্রেণীর ধর্ম্ম যাজকের নিকট গতায়াত করিতে লাগিলেন। যেখানে যে ধার্ম্মিক লোকের কথা শ্রবণ করেন,তাঁহারই নিকটে গমন করেন তাঁহারই নিকটে হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আপনার অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি দেখিলেন নিতান্ত সাধু ও ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিরাও ঠিক তাঁহার মর্ম্মস্থানের ব্যাধিকে ধরিতে পারিলেন না। যিনি যাহা উপায় বলিয়া দিলেন তাহার কোনটাই সুসংলগ্ন হইল না। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি যে পাপযন্ত্রণার সময় মানবকে আশ্রয় করেন, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিতে হইবে। এই সত্যটী অনুভব করিয়া তিনি মানবের নিকট গতায়াত পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্জ্জনবাস, আত্মচিন্তা ও অবিশ্রান্ত প্রার্থনাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরের চরণ গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকাতে অবশেষে এমন আশ্চর্য্য আলোক প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে জন্মের মত তাঁহার মন হইতে অবিশ্বাসের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল। সকলের জীবনের পক্ষেই এই সত্য অবলম্বনীয়! মানুষ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর হৃদয়ের প্রকৃত অভাব বিদিত হইতে পারে না। আবার যদিও বিদিত হয়, তাহা ঠিকরূপে পূরণ করিতে পারে না। পরমেশ্বরকে একমাত্র বন্ধু ও পরম গুরু বলিয়া ধরিতে না পারিলে এবং তাঁহার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিতে না পারিলে, অটল বিশ্বাসের ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার আলোকে যে ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য ভূমি।

পশ্চিম দেশীয়া একটী ধর্ম্ম পরায়ণা নারীও আপনার জীবনে এই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম ম্যাডাম গেয়োঁ। ইনিও বহু দিন পাপ প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া মনের যন্ত্রণায় ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইলেন। অনেক ধর্ম্মযাজক ও সাধুজনের নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিলেন। কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন ধার্ম্মিক পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি শান্তির জন্য বাহিরে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি হইতেছে না। যিনি শান্তিদাতা তিনি তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন—তাঁহাকে হৃদয়ে অন্বেষণ কর।" এই উপদেশে ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরের চক্ষু যেন খুলিয়া গেল। তিনি আপনার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন আপন অন্তরে সেই সত্যজ্যোতি দর্শন করিলেন, তখন যেন নূতন রাজ্য খুলিয়া গেল; তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বলিত হইয়া যাইতে লাগিল। এই উন্নত প্রেমের অবস্থায় তিনি যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "হে আমার প্রভু! তুমি আমার হৃদয়েই ছিলে এবং অপেক্ষা করিতেছিলে যে আমি তোমারদিকে ফিরিব ও তোমার প্রকাশ দেখিব। হে অনন্ত প্রেমের আধার! তুমি এত নিকটে ছিলে অথচ আমি তোমাকে অন্বেষণ করিয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতে ছিলাম; এবং তোমার উদ্দেশ পাইতেছিলাম না। আমার সুখের উৎস আমার অন্তরেই রহিয়াছিল, অথচ আমার জীবন ভার স্বরূপ বোধ হইতেছিল। আমি ধনরাশির মধ্যে বসিয়া দারিদ্র্য ভোগ করিতেছিলাম, এবং সুভোজ্য-পূর্ণ পাত্রের নিকটে থাকিয়া ও ক্ষুধায় মরিতেছিলাম। হে প্রাচীন ও নবীন সৌন্দর্য্যের খনি! আমি তোমাকে এত বিলম্বে জানিলাম কেন? হায় হায়! তোমাকে যেখানে পাওয়া যায় না, সেই খানেই তোমাকে খুঁজিলাম। আর যেখানে তুমি ছিলে, সেখানে তোমাকে খুঁজিলাম না।" ঈশ্বরের উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে নিজ জীবনে এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকিবেন।

একজন মহিলা একদিন প্রশ্ন করিতেছেন,—এই যে আপনারা এতগুলি ব্রাহ্ম বিবাহ দিলেন, বিবাহের পর বিবাহিত দম্পতির ধর্ম্মানুরাগ দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এরূপ দেখিতেছেন কি তাঁহাদের যে কিছু ধর্ম্মানুরাগ ছিল তাহাও যেন মন্দীভূত হইল, তাহাই দেখিতেছেন? উত্তর,—দুই চারিটী স্থল ভিন্ন উভয়ের ধর্ম্মানুরাগ যে উদ্দীপ্ত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। প্রশ্ন—ইহার কারণ কি? উত্তর—কারণ এই যে আমরা আমাদের বালিকাদের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিতে পারিতেছি না, সুতরাং তাহারা পরিণয়-পাশে যাঁহাদের সহিত আবদ্ধ হইতেছে, তাঁহাদিগকে উঠিবার পক্ষে সাহায্য না করিয়া স্বার্থপরতার গর্ত্তেই টানিয়া ফেলিতেছে। নারীগণের হৃদয় মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জলিত না হইলে, বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারা ধর্ম্ম ভাবের সহায়তা হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজে এরূপ পুরুষ অনেক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহাদের অন্তরে নিঃস্বার্থতার অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের সেবার জন্য স্বার্থনাশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমরা নারীগণের মধ্যে এখনও সে অগ্নি ভাল করিয়া জ্বালাইতে পারি নাই। নারীগণ ইহার এই এক উত্তর দিতে পারেন, পুরুষের অন্তরে যদি ধর্ম্মাগ্নি

প্রজ্বলিত হয়, তবে তাহাকে পোষণ ও বর্দ্ধিত করিবার উপযোগী উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারেন; তিনি অবাধে আত্মোন্নতি সাধন ও ব্রাহ্ম সমাজের সেবাতে মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন। নারীর সে স্বাধীনতা কই? নারীর অন্তরে যদি কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, স্বাধীনতার অভাবে, কার্য্য করিবার সুবিধার অভাবে তাহা ম্লান হইয়া যায়। এই জন্য নারী চরিত্র গড়িতেছে না। দায়িত্ব জ্ঞান ভিন্ন চরিত্র সবল হয় না; স্বাধীনতা ভিন্ন দায়িত্ব জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে নারীচরিত্র গড়িবার সুবিধা নাই। এই কথার মধ্যে গভীর যুক্তি আছে। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে কারণেই হউক আমরা আজিও নারীগণের মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। ইহা না করিতে পারিলে ব্রাহ্ম বিবাহের দ্বারা ব্রহ্মাগ্নি দেশে ব্যাপ্ত হইবে না।

এক জন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী একদিন কোন ব্রাহ্ম প্রচারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত মহাপুরুষদিগকে কি মনে করেন? ব্রাহ্মপ্রচারক উত্তর করিলেন;—পুরাণে বর্ণিত এই মহাপুরুষগণের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহা অত্যুক্তিদোষমিশ্রিত, ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া কিছুই বলা যায় না। তর্কের অনুরোধে যেন স্বীকার করাই গেল যে, এই নামে কোন কোন মহাত্মা ছিলেন; তাহা হইলেও তাঁহারা মহাপুরুষ মাত্র, ঈশ্বর অধিক নহেন। মহাপুরুষদিগকে যেন ঘটকের ন্যায় বিবেচনা করা যায়। ঘটক কন্যার বাড়ীতে আসিয়া বরের নানা গুণ বর্ণনা করে, তদ্দ্বারা কন্যার অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং পরিণয়ের বাসনা প্রবল হয়; কিন্তু পরিণয় যখন হয় তখন বরের সঙ্গেই হয়, ঘটকের সঙ্গে হয় না। মহাজনগণ প্রেমোদ্রেকের সহায়, কিন্তু যোগ তাঁহাদের সঙ্গে নহে, সেই মহাপুরুষেরই সঙ্গে। এক এক মহাজনের জীবন যেন এক একটি পরিবেশনের পাত্রের ন্যায়, তাহাতে করিয়া পরমেশ্বর জগতে প্রেমান্ন পরিবেশন করিয়াছেন। জগতের দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইতেছে, এক শ্রেণীর লোক সেই প্রেমান্ন সম্ভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে পরিবেষ্টার মুখের দিকে চাহিতেছেন; আর এক শ্রেণীর লোক, পরিবেষ্টার গুণ তত অনুভব না করিয়া পাত্রের গুণই বর্ণনা করিতেছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবর্ত্তীবাদী।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বলতা সম্পাদন।

বৈশাখের প্রথম দিবস দেশের প্রত্যেক বণিক ও ব্যবসায়ীর পক্ষে একটা বিশেষ দিন। সমস্ত চৈত্র মাস পুরাতন বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব স্থির করিতে গিয়াছে, বৈশাখের প্রথম দিন কেহ হয়ত বিষণ্ণ কেহ হয়ত প্রসন্ন। যে ব্যক্তি আপনার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিতেছে—সে এই বৈশাখের প্রথম দিনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছে; কিরূপে ব্যবসায়কে দণ্ডায়মান রাখে, কোথায় নূতন ধন পায়; ভবিষ্যতে কাজের কি প্রণালী অবলম্বন করে; যে যে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহা পরিহার করিবার উপায় কি, ইত্যাদি নানা চিন্তা তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে। ক্ষীণ-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই চিন্তার আন্দোলনে পড়িয়া নিরাশ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাহসী, ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণ অতীতের ভ্রম সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতের পরামর্শ স্থির করিতেছেন।

যাঁহারা আয়-ব্যয়ের গণনাতে আপনাদিগকে লাভবান বলিয়া দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাদের মুখ আজ আনন্দে উৎফুল্ল। তাঁহারা অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হইতেছেন। ভাবী কালে আরও লাভবান হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন। যে সকল প্রণালী অবলম্বন করাতে লাভ হইয়াছে, তাহার আরও উন্নতি করিবার সংকল্প করিতেছেন।

যে সকল বণিক আয় ব্যয়ের গণনা করে না—বর্ষান্তে নিজ ব্যবসায়ের অবস্থা বিচার করিয়া দেখে না, কেবল মাত্র বাহিরের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের সবলতা ত্বরায় দুর্ব্বলতাতে পরিণত হয়। অনেক চিন্তাবিহীন লোকে মনে করে বাণিজ্যের ন্যায় সহজ কাজ আর কিছু নাই। আমার হস্তে অর্থ আছে; আমার নিজের অর্থ পরের নহে; যে যে দ্রব্য লোকে সচরাচর চায় তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজ দোকানে রাখিব, লোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে, আমার প্রাপ্য লাভ আমার থাকিবে। তাঁহারা যদি দেখেন প্রতিদিন ক্রেতা আসিতেছে যাইতেছে, দ্রব্য আনা হইতেছে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, আবার আনিতে হইতেছে, তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বিবেচনা করেন যে গড়ের উপর তাঁহাদের লাভ থাকিয়া যাইতেছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত হিসাব পত্র রাখা তত আবশ্যক বোধ করেন না। হিসাব ত কাহাকেও দিতে হইবে না। এই ভাবিয়া তাঁহারা হিসাব পত্র ভাল করিয়া রাখেন না। কিছুকাল পরে যখন অচল হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল যে মধ্যে মধ্যে দোকান হইতে টাকা লইয়া গৃহের ব্যয় করিয়া করিয়া এত অর্থ লওয়া হইয়াছে যে মূল ধনের অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়া গিয়াছে, বাজারে দেনা দাঁড়াইয়াছে, অনেক বিলাত পাড়িয়া গিয়াছে; এখন আর ব্যবসায় চলিবার উপায় নাই। এই কারণে বাণিজ্য কার্য্যে সুদক্ষ ব্যক্তিগণ প্রতিদিনের আয় ব্যয়ের গণনা পরিষ্কার রাখিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৈনিক হিসাব পরিষ্কার হইয়া না মিটিলে তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না।

অধ্যাত্ম বিষয়েও আমাদের একপ্রকার আলস্য ও ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে; যাহাতে আমাদিগকে অনেক সময় আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখে। ধর্ম্ম জীবনের নির্দ্দিষ্ট সাধনগুলি এক প্রকার চলিতেছে; দৈনিক উপাসনা রীতিমত চলিয়াছে;

সামাজিক উপাসনাতেও যোগ আছে, সমাজের অপরাপর কার্য্যের সঙ্গেও এক প্রকার যোগ রহিয়াছে। বাহিরের কেনা বেচা যেন এক প্রকার চলিয়াছে; কিন্তু গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষতি লাভ গণনার অভ্যাস নাই; আয় ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি নাই। এরূপ অলস ভাবে থাকার ফল এই হয়—কিছু কাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষটী অল্পে অল্পে শুকাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত ধর্ম্মভাব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন; এবং অভ্যাস জালে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে তখন সেই জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হওয়াই দুষ্কর।

একারণে আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই সময়ে সময়ে সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া গভীররূপে আত্মচিন্তা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনাতে আত্ম-সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। এজন্য মধ্যে মধ্যে বিষয় কর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া নির্জ্জন বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই বিশমার্ক, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজমন্ত্রীগণ, রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনবাস করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহারা বহু জনাকীর্ণ নগর সকল পরিত্যাগ করিয়া কোন জনসম্বাধ-রহিত নির্জ্জন গিরিকুঞ্জ, কি গ্রাম মধ্যে গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের আবাসস্থানের বিষয় নিজ পরিবারের লোক ভিন্ন অন্যে জানে না; সেই সময়ে মধ্যে সংবাদপত্র অথবা চিঠিপত্রাদি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে নিষেধ থাকে। তাঁহারা নিরুপদ্রবে শান্তির ক্রোড়ে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে থাকেন। এইরূপ নির্জ্জনবাস দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম, বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত মন স্নিগ্ধ হয়; অবসন্ন দেহ মনের শক্তি সকল পুনর্জ্জীবিত হয়; দ্বিতীয় তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে আপনাদের অবলম্বিত রাজনীতির পূর্ব্বাপর চিন্তা করিবার অবকাশ পান। কোন্ কারণে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যাইতেছে না এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যাইতে পারে, এই সকল চিন্তার দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্য নির্দ্ধারণ করেন। রাজনীতিজ্ঞেরা পর্য্যন্ত যে নির্জ্জনবাস ও আত্ম-চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন—অধ্যাত্ম সাধনার্থীদিগের পক্ষে যে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অনেকের মুখে এই অভিযোগ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে ব্রাহ্ম জীবনে সাধনের গভীরতা এখনও উৎপন্ন হইতেছে না। এই অভিযোগ অমূলক নহে। আমাদের যে ধর্ম্ম-জীবনের গভীরতার অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্জ্জনবাস ও আত্ম-চিন্তার অভ্যাস না থাকাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুভব করা যায়। অনেক ব্রাহ্মের জীবনে এই কথা সত্য যে প্রতিদিন উপাসনাকালে তাঁহারা যে দুই এক দণ্ড নির্জ্জনে বসেন তদ্ভিন্ন আর নির্জ্জনে বসিবার নিয়ম নাই। বিষয় কার্য্যে যাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা প্রতিদিন অধিক সময় নির্জ্জনে যাপন করিতে না পারুন সপ্তাহের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা যদি নির্জ্জনবাস ও আত্ম-চিন্তার নিয়ম করেন তাহাতেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন করিয়া কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া নির্জ্জনবাস ও আত্ম-চিন্তাতে যাপনের নিয়ম করা ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বলতা সম্পাদনের বিশেষ অনুকূল বলিয়া বোধ হয়।

আচার্য্যের উপদেশ।

(গত ১৯এ চৈত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

কিছু দিন হইল কলিকাতার সন্নিকটে কোন উপনগরে একজন দরিদ্র ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি একটি সামান্য স্থানে দুই খানি গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেন। যে কিছু অল্প উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে অতি কষ্টে পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার একটী গুণ এই ছিল যে তিনি নিজে দরিদ্র হইলেও দরিদ্র জনের প্রতি তাঁহার বড় দয়া ছিল। নিজে মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া চিকিৎসা শাস্ত্র কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে দীন দরিদ্রদিগের গৃহে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিতেন। কে জানে হাড়ি, কে জানে চণ্ডাল, কে জানে মুটে মজুর যাহারই ঘরে পীড়া হইত সংবাদ পাইবামাত্র গিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেন। কখন কখনও ভিক্ষা করিয়া তাহাদের পথ্যের বন্দোবস্তও করিতে হইত। অনেক দিন এমন ঘটিত যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উঠিয়া গিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কোন গরিবের ছেলেকে চিকিৎসা করিতে হইত।

একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল যে আমাদের সেই বন্ধুর গুরুতর পীড়া। গিয়া দেখি বাড়ী লোকে লোকারণ্য। কত লোকেই দেখিতে আসিয়াছে, কত লোকেই হায় হায় করিতেছে! দুই দণ্ড বসিয়া আছি, দেখি কেহ দুইটা বেদানা, কেহবা খানিকটা মিছরি, কেহবা অন্য কিছু হস্তে করিয়া আসিতেছে। বসিয়া থাকিতে থাকিতে একজন সুযোগ্য চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে দেখিলাম সেই সামান্য পর্ণকুটীরে থাকিয়াও তাঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটী হইল না; সকলই অতি উত্তমরূপে চলিল। ক্রমে পীড়া যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, তখন একদিন আমরা কয়েক জন বন্ধুতে বলাবলি করিতে লাগিলাম যে এখন একবার একজন বড় ইংরাজ ডাক্তার আনিয়া দেখাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ১৬টাকা ভিজিট কোথা হইতে আইসে? আমরা যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি তখন সেখানে একজন দরিদ্র লোক বসিয়া ছিল। ঐ ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল;—মহাশয়! আমার সন্তানের একবার পীড়া হইলে ইনি রাত্রি দিন আমার কুঁড়েঘরে পড়িয়া থাকিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। সে উপকার আমি জীবনে ভুলিব না; ইনি ত চলিলেন আমি ইঁহার জন্য আর কি করিব? যদি অনুমতি করেন ইংরেজ ডাক্তার আনিবার ভিজিট ১৬টী টাকা আমি দি। আমরা বলিলাম সে কি তুমি নিজে দরিদ্র, তোমার জন্য সে দিন আমরা চাঁদা করিয়া টাকা তুলিলাম, তুমি ইংরেজ ডাক্তারের ভিজিট

দিবে, বল কি? সে বলিল যে ঘটনা ক্রমে আমার হাতে কিছু টাকা আসিয়াছে, সেই টাকা এই মহৎ কার্য্যেই লাগুক। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, দেখিলাম একজন ইংরাজ ডাক্তার ও দুইজন বড় দেশী ডাক্তারে চিকিৎসা চলিল—সেবা শুশ্রূষার কিছুই ত্রুটী হইল না। যার যে কাজে গেলে ভাল হয় সেই সে কাজে যায়—রাত্রি জাগরণের জন্য একজন লোকের প্রয়োজন হইলে দুইজন মজুত, ডাক্তার ডাকিবার জন্য এক জনের প্রয়োজন হইলে দুই জন অগ্রসর। নিঃশব্দে, নির্ব্বিবাদে, সমুদায় ব্যাপার চলিতে লাগিল। অথচ যে ব্যক্তির জন্য এত হইল তিনি নিঃস্ব।

এই ত গেল একজন দরিদ্র ব্রাহ্মের মৃত্যু। এই কলিকাতা সহরে একজন ধনী সন্তানের কিরূপে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করুন। তিনি পৈতৃক জমিদারীর অধিকারী হইয়া পানাসক্ত ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরিবার পরিজন নিজ বাসগ্রামে পড়িয়া রহিল; তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিলাসপরায়ণতা ও ইন্দ্রিয়সেবাতে ডুবিয়া রহিলেন। তাঁহার পরিবারের অপ্রতুল ছিল না। পত্নী, তিন চারিটী কন্যা, তিন চারিটী পুত্র, দাস দাসী লোক জন ধনীর যেমন থাকা আবশ্যক সেইরূপ। কিছু দিন পরে কলিকাতাতে তিনি পীড়িত হইলেন। বাড়ীতে সংবাদ গেল। পীড়া যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন কন্যারা দুই একজন আসিয়া কেহ এক রাত্রি, কেহ এক দিন থাকিয়া গেলেন। বলিলেন—আমাদের ঘর কন্যা আছে, ছেলে পিলে আছে, আমাদের কি থাকিবার যো আছে। পত্নী ত আসিলেনই না। হয়ত বিশ্বাস করিলেন না যে গুরুতর পীড়া হইয়াছে। বাবুটী কয়েকজন ভৃত্যের হাতে পড়িয়া শ্বাসিতে লাগিলেন। ভৃত্যগুলি ভয়ে ভয়ে কাজ করিত সুতরাং প্রভুর যখন আর শাস্তি দিবার অবস্থা রহিল না তখন তাহারাও কর্ত্তব্য সাধনে শিথিল হইয়া পড়িল। জল জল করিয়া দশ দণ্ডে একটু জল পাওয়া যায় না; অনেক গেঙ্গাইয়া গেঙ্গাইয়া তাদের ডাক শুনা যায় না। আবার এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার! সময় বুঝিয়া সেই সময়ে সকল চাকর কাজ ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। এ বেলা এক জনকে আনে ওবেলা সে পালায়। এইরূপে স্ত্রী পুত্র পরিবার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বন্ধু বান্ধবহীন অবস্থায় ধনীর প্রাণ গেল।

এই যে দুইটী মৃত্যু ঘটনার উল্লেখ করা গেল ইহা সত্য। ইহা হইতে আমারা কি উপদেশ পাই? এক জনের বা মানুষ না থাকিয়া ও মানুষ যুটিল কেন? টাকা না থাকিয়া ও টাকার কাজ হইল কেন? আর এক জনের বা সব থাকিয়া ও কিছুতে কাজে কুলায় নাই কেন? ইহা একটা শক্ত প্রশ্ন নহে। সকলেই একটু চিন্তা করিলে ইহার উত্তর দিতে পারেন। সকলেই বুলিবেন প্রথমোক্ত স্থলে প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ের চালক হইয়া কাজ করাইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির স্থলে প্রেমের অভাবই সকল অভাবকে উৎপন্ন করিয়াছিল। ইহা বেশ কথা; মনে রাখিবার মত কথা। প্রেম যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কিছু না থাকিয়াও কোন বিষয়ের অভাব থাকে না—প্রেম যেখানে নাই সেখানে ধন জন থাকিয়াও কাজে কুলায় না।

এখন ব্রাহ্মসমাজের বিষয় সকলে চিন্তা করুন। ইহার কাজ দেখিলে প্রথম ব্যক্তির কথা মনে পড়ে কিংবা দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে পড়ে? এক একটী বিষয় ধরিয়া প্রশ্ন করা যাইতেছে। প্রথম—ব্রাহ্মেরা ধনী নহেন জানি, কিন্তু যে কিছু ধন ব্রাহ্মদিগের আছে, তাহার যত অংশ ব্রাহ্মসমাজের কাজে গেলে ভাল হয়, ও যত অংশ যাওয়া উচিত, তাহা যাইতেছে কি না? প্রত্যেকে আপন আপন বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বিবেককে সাক্ষী করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মদিগের যে পরিমাণে বুদ্ধি বিদ্যা আছে, তাহা সমুচিতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ও ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি করে লাগিতেছে কি না? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে লেখক যতজন আছেন তাঁহাদের কত জনের শক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে ব্যয় হইতেছে?

তৃতীয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য যে যে কার্য্যের আয়োজন করা গিয়াছে, সেই সকল কি জোরের সহিত চলিতেছে অথবা খাটিবার লোকের অভাবে দুর্দ্দশা ও মৃতভাবে চলিতেছে?

যদি ইহা হয় যে ব্রাহ্ম সমাজে ধন রহিয়াছে, অথচ ব্রাহ্ম সমাজের কাজে লাগিতেছে না। বুদ্ধি বিদ্যা রহিয়াছে অথচ তদ্দ্বারা সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাহা হইলে কি এই প্রমাণ হয় না যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের প্রেম নাই! যেখানে প্রেম সেই খানেই শৃঙ্খলা, সেই খানেই উৎসাহের সহিত কার্য্য হয়। আমরা কতবার দেখিয়াছি যে আমাদের কোন সাধারণের অনুরাগভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর গৃহে কোন বিবাহ, কি অপর কোন প্রকার উৎসব উপস্থিত। অনেক লোক খাইবে। গৃহস্বামীর প্রতি প্রেম থাকাতে দেখি দলে দলে লোক পরিবেশনের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, যাহার ভাঁড়ারে বসিলে ভাল হয় সে ভাঁড়ারের দ্বার চাপিয়া বসিয়াছে, যে ক্রয় কার্য্যে পারদর্শী সে বাজারে ছুটিয়াছে, দশ জনে মিলিয়া তাঁহার কাজে সুপ্রতুল করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কাজ এরূপে চলিবে না কেন? সাধুরা বলিয়াছেন নিঃস্বার্থ প্রেম যেখানে বিদ্যমান সেখানে ঈশ্বরের ঐশী শক্তিও বিদ্যমান। ঐশী শক্তির অধীন হইয়া যখন মনুষ্য চলে, তখন ঠিক চলে; তখন যেখানে যাহার বসিলে ভাল হয়, সে সেখানেই বসে; যে কাজে যাহার হাত দিলে ভাল হয়, সে সেই কাজেই হাত দেয়; কোন বিবাদ বিরোধ থাকে না; ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নির্ব্বিশেষে শৃঙ্খলার সহিত কাজগুলি হইয়া যায়। আর যে সমাজের মধ্যে ঐশী শক্তি চালক নহে; কিন্তু মানবের অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষাই পথ-প্রদর্শক, যেখানে সবই বিপরীত। সেখানে লোকে বসিতে গেলে একজন অন্যের ঘাড়ে বসে, এক কাজ লইয়া দুইজনে বিবাদ করে; চটক পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশ পার হইতে যায়; পুঁটীমাছ তিমির বিক্রম প্রকাশ করিতে যায়; ছুতোর রেঁদা ফেলিয়া কামারের হাতুড়ী ধরে; কামার রেঁদা লইয়া টানাটানি করে। ব্রাহ্মেরা বিবেচনা করুন, তাঁহারা

পূর্ব্বোক্ত দুই ছবির কোনটী দেখিতে চান? এদিকে ত ব্রাহ্মদের অহঙ্কারের সীমা পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিবার সময় ত খুব মজবুত। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান কারীদিগকে গালাগালি দিবার সময়ে ত খুব বিক্রম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদেরই প্রেমের অবস্থা যদি এই হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া জগৎকে কাঁপাইলে ফল কি? যে জিনিষকে আমরা ভালবাসি না, তাহাকে ভাল বাসিতে বলিলে লোকে ভাল বাসিবে কেন? এই জন্যই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না। যে বৎসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বৎসরেই মুক্তি ফৌজের জন্ম হইয়াছে। জন্মের সময় ইহাদের ৩০ জন প্রচারক ছিল, এখন তিন সহস্রের অধিক হইয়াছে, আর আমরা কোথায় রহিয়াছি। এইরূপে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে?

যুগ সংগ্রাম।

১২ই মাঘ ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে ব্যক্তির পাপে পতিত হইবার সম্ভাবনা তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করা, যে পাপে পড়িয়াছে তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করা এই উভয় বিধ কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে, স্থূলভাবে তাহার কয়েকটী বর্ণন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সে দেশের প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিরা দেখিয়াছেন যে আমোদের ইচ্ছা মানব মনে অত্যন্ত প্রবল। বিশেষতঃ যাহাদের দিন কঠোর পরিশ্রমে গত হয়, যাহাদের গৃহ অপরিচ্ছন্ন, অল্প পরিসর ও অন্ধকারময়, তাহারা আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন উপায় উপস্থিত হইলে প্রায় সে আকর্ষণ লঙ্ঘন করিতে পারে না। সেখানকার শুঁড়ীর দোকানগুলি অতি উৎকৃষ্টরূপে সুসজ্জিত; গ্যাসের আলোকে আলোকিত, বসিবার অতি উৎকৃষ্ট আসন যুক্ত। এতদ্ভিন্ন সেখানে প্রায় গীত বাদ্য চলিয়া থাকে। এই কারণে অনেক শ্রমজীবী লোক কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় তথায় গিয়া প্রবিষ্ট হয়, এবং সেখানকার আমোদ প্রমোদের লোভে আবদ্ধ হইয়া সুরাজালে জড়িত হইয়া পড়ে। অনেক সদাশয় পুরুষ ও রমণী আমোদপাশ হইতে শ্রমজীবীদিগকে উন্মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা আমোদ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও ধর্ম্মোপদেশ এই উভয়কে একত্র করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এক এক স্থানে এক একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুন্দররূপে সাজাইয়া সেখানে মধ্যে মধ্যে গীত বাদ্য প্রভৃতি দিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন সমাগত শ্রমজীবীদিগকে সুলভ মূল্যে উত্তম আহারের বস্তু দিয়া থাকেন। এই সকল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দরিদ্রগণ দলে দলে আসে; তখন তাঁহারা তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল দরিদ্রের ছেলে মেয়ে রক্ষক ও শাসন বিহীন হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় ও পাপ শিক্ষা করে তাহাদিগকে কুড়াইয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া, শিক্ষা দিয়া বড় করিয়া কাজের লোক করিয়া দিবার জন্য অনেক আশ্রয়-বাটিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ অনেক গরিবের মেয়ে কর্ম্মপ্রার্থিনী হইয়া লণ্ডনে আসে। তদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক যুবতী স্ত্রীলোক পুরাতন কাজ হারাইয়া নূতন কর্ম্মের চেষ্টায় বড় বড় সহরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্ম্ম বিহীন অবস্থাতে দারিদ্র্যের তাড়নাতে তাহাদের অনেকে পাপে পতিত হয় এই কারণে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থে অনেক সভা করা হইয়াছে। ঐ সভার সভ্যগণ এই সকল যুবতী স্ত্রীলোকের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন ও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

যাহাদের পাপে পড়িবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন ব্যগ্রতা, পতিতদিগকে তুলিয়া আনিবার জন্যও তেমনি ব্যগ্রতা। ভদ্র মহিলাদিগের এমন অনেক সভা আছে যাহার সভ্যাগণ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাস্তায় রাস্তায় কুলটাদিগের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান ও তাহাদিগকে বিপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করেন; কোন পতিতা নারী অনুতাপিতা হইলে তাহাকে আশ্রয়-বাটিকাতে আশ্রয় দেওয়া হয়, যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করা হয়, কাহাকেও বা আত্মীয় স্বজনের হস্তে সমর্পণ করা হয়, কাহাকেও বা কর্ম্ম জুটাইয়া দেওয়া হয়; কেহ বা বিবাহিতা হয়। এইরূপে পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতা প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে।

তৎপরে দরিদ্রের সহিত সমবেদনা। এটীও মহাত্মা ঈশার একটী বিশেষ ভাব। তিনি যখন ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন দরিদ্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আরম্ভ করিলেন। তৎপরে কথায় কথায়, যেখানে সেখানে দরিদ্রদিগের হইয়া কথা বলিতেন। দরিদ্রদিগকে পীড়ন করে বলিয়া কর-গ্রাহকগণ তাঁহার নিদারুণ ঘৃণার পাত্র ছিল। তিনি নানা প্রসঙ্গে সর্ব্বদা ধনিদিগকে নিন্দা করিতেন। দরিদ্রের সহিত সমবেদনার ভাব ইংলণ্ডীয় সমাজ মধ্যে দিন দিন ব্যাপ্ত হইতেছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই ভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এখন সর্ব্বত্রই ধনির বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভ্যুত্থান দৃষ্ট হইতেছে। ইংলণ্ড ধনিপ্রধান দেশ, ধনিদের শক্তি সেখানে অত্যন্ত প্রবল, তথাপি সেই ইংলণ্ডেই দরিদ্রদিগের স্বত্ব ও অধিকার স্থাপনের জন্য প্রবল আন্দোলন দৃষ্ট হইতেছে। এখন এই বিষয়েই জনহিতৈষীদিগের প্রধান দৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দরিদ্রদিগের জন্য আমোদশালা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে; দরিদ্রদিগের জন্য সুপরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যকর গৃহ সকল নির্ম্মিত হইতেছে; দরিদ্রদিগের জন্য বড় বড় উদ্যান ও চিত্রশালিকার দ্বার সকল উন্মুক্ত হইতেছে; যে সে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ ও বিচরণ করিতে পারিতেছে। দরিদ্রগণ বড় বড় সহরে যেরূপ দুরবস্থাতে বাস করে তাহাতে অনেকে হয় ত একটী ভাল ফুল দেখিতে পায় না কিম্বা বৎসরের একটী ভাল ফল আস্বাদন করিতে পারে না। এই জন্য মধ্যে মধ্যে দরিদ্রদিগের জন্য পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অনেক সদাশয় ব্যক্তি আপন আপন বাগান হইতে ভাল ভাল

ফুলের চারা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন।

চতুর্থতঃ সদনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি। একজন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে পরোপকারার্থে অভাবপক্ষে দশ কোটী টাকা স্বতঃপ্রদত্ত চাঁদার দ্বারা আদায় ও ব্যয় হয়। লণ্ডনে যত প্রকার পরোপকারার্থ আয়োজন আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত এক একখানি পুস্তক প্রতি বৎসর মুদ্রিত হয়। বিগত বৎসর যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে এক লণ্ডন সহরেই প্রায় ১০৭৮টী জায়গা আছে যেখানে কোন না কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং ঐ সমুদায় কার্য্যের ব্যয় স্বতঃপ্রদত্ত দানের দ্বারাই চলিয়া থাকে।

এই সকল কারণে বোধ হয় যে ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মত সকল যদিও শিথিল ও পরিত্যক্ত হইতেছে, তথাপি ঈশার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা না কমিয়া বরং বাড়িতেছে। তদীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি মানবমনে প্রস্ফুটিত হইতেছে। বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় সমাজের ধর্ম্ম ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে দুইটী ভাব প্রধানরূপে বিকাশ হইতেছে। (১ম) স্বাধীন চিন্তা প্রবৃত্তি (২য়) জগতের দুঃখ ভার হরণের ইচ্ছা। প্রথম প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রাচীন কুসংস্কার সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে; দ্বিতীয় প্রবৃত্তির প্রভাবে জনহিতকর কার্য্য সকল দিন দিন নব নব বেশে প্রকাশ পাইতেছে।

ইংলণ্ডে যেরূপ আমেরিকা দেশে তদপেক্ষা অধিক। সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে। ধর্ম্ম বিষয়ে লোকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছে; এবং তাহার ফল স্বরূপ ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল অতি উদার ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। জগতের দুঃখ হরণের ইচ্ছা ও সেখানে অতিশয় প্রবল। সে জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

অতএব পশ্চিমদেশে ধর্ম্মজীবনের বর্ত্তমান ভাবের দিকে দৃষ্টি করিলে দুইটী ভাব দৃষ্ট হয়। (১ম) স্বাধীন চিন্তা প্রবৃত্তি (২য়) জগতের দুঃখভার হরণের ইচ্ছা। এখন যদি একবার ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে কি দেখা যায়? এখানে যে সংগ্রাম বাধিয়াছে এবং যে সংগ্রাম নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও সর্ব্বত্র আপনার বল প্রকাশ করিতেছে তাহার অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলে কি লক্ষ্য করা যায়? সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা যাউক কিরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে এই সংগ্রাম বাধিয়াছে। যে আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে এই সংগ্রাম বাধিয়াছে তাহার দুইটী শোচনীয় ভাব দৃষ্টি হয়। (১ম) বিবেকের হীনতা, (২য়) জন সমাজের পাপ তাপ ও দুঃখ দুর্গতি নিবারণের প্রবৃত্তির অভাব। গূঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুভব করিতে পারা যাইবে যে এই দুইটী ভাবই আমাদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার দুর্গতির মূল। ধর্ম্ম সংস্কার কি কোন প্রকার সংস্কারের প্রয়াস যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন, যে দেশের লোকের বিবেকের দুর্ব্বলতা বশতই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় না। যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বচন প্রভৃতি দ্বারা লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদূরিত হইতেছে, অথচ লোকভয়ে লোকে নিজের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; তাহাদের অন্তরে এত বল নাই, বিবেকের এত শক্তি নাই যে, সাহসের সহিত সত্যের উপরে ও নিজ কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাপের প্রতি জাগ্রত ঘৃণা নাই, পুণ্যের প্রতি জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা নাই। একদিকে যেমন বিবেক দুর্ব্বল, অপরদিকে সমাজের দুঃখ দুর্গতি নিবারণের প্রবৃত্তি নিতান্ত ক্ষীণ। লোকে নানা প্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক অত্যাচার অহরহ সহ্য করিতেছে, অথচ কেহ উচ্চ বাচ্য করে না। নির্ব্বাক হইয়া নিরীহ স্বভাব মেষদলের ন্যায় সকল সহ্য করিতেছে।

ইহার কারণ কি? এই উভয়বিধ হীনতারই মূলে ঘোর জীবন বিষয়ক নৈরাশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের চেষ্টাতে জীবনের দুঃখ সকল দূর হইবার যে কোন উপায় হইতে পারে—এবিষয়ে সাধারণ প্রজা পুঞ্জের বিশ্বাস নাই। নিরাশা গভীর মর্ম্ম স্থানে বসিয়াছে। এই জীবন বিষয়ক নিরাশার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহার দুইটী প্রবল কারণ দৃষ্ট হয়। প্রথম কর্ম্ম বন্ধনে বিশ্বাস। ভারতবর্ষবাসী হিন্দু মাত্রেই অদৃষ্টবাদী। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মানব পূর্ব্ব জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্তই এ জগতে আছে। যে কর্ম্মশৃঙ্খলে মানব আবদ্ধ হইয়া আছে সে শৃঙ্খলকে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। কষ্ট ভুগিতেই হইবে, শাস্তি পাইতেই হইবে। যে ক্লেশ মানব পাইতেছে তাহা বিধি নির্দিষ্ট, সুতরাং তাহাকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস বৃথা। এই বিশ্বাস মানব মনকে ঘোর নিরাশার মধ্যে নিক্ষেপ করে। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন পলায়নের বহু প্রয়াস পাইয়া,—আপনার পদদ্বয়, পক্ষপুট ও চঞ্চুদ্বয়কে সেই চেষ্টাতে আহত করিয়া অবশেষে যেমন জানিতে পারে যে লৌহ নির্ম্মিত পিঞ্জর হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র—তখন নিরাশার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে, এবং তাহার সেই উল্লম্ফন, ও পক্ষ বা চঞ্চুর আঘাতে নিরস্ত হইয়া যে শান্ত ভাব ধারণ করে, সেইরূপ মানবের মনে এই বিশ্বাস যখন বদ্ধমূল হয় যে সে কর্ম্মজালে আবৃত লৌহের পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াছে। সহস্র চেষ্টাতেও নিষ্কৃতি নাই, তখন তাহার উদ্যম বিলোপ প্রাপ্ত হয় এবং সে সকল প্রকার প্রয়াস পরিত্যাগ করে।

কর্ম্ম বন্ধনে বিশ্বাসের ন্যায় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরাধীনতাতেও মানুষকে নিরাশ করিয়া ফেলে। প্রবল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির নিকটে ব্যক্তিবিশেষের শক্তি অতি সামান্য; অতি অল্প চেষ্টাতেই বিনষ্ট হইতে পারে। এই কারণে যে দেশে প্রবল সামাজিক শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে পিষিয়া ফেলে, সে দেশে মানব মনের স্ফুর্ত্তি থাকে না; এবং মানব চিত্ত ঘোর নিরাশার মধ্যে পতিত হয়। তখন লোকে মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে, এতবড় প্রবল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ফল কি? ইহার সহিত কতক্ষণই বা সংগ্রাম করিব। ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম ভাবও এই নৈরা-

স্ত্রের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন শাস্ত্র কারগণ মানব জীবনকে অতি বিষাদের বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন। মানব জীবনকে তাঁহারা এক ঘোর বিড়ম্বনা বলিয়া গণনা করিতেন এবং এই অসাধারণ রূপ বিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করার নাম মুক্তি বলিয়া উপদেশ দিতেন। মানব জীবনকে এইরূপ দৃষ্টিতে দেখাতেই মানবাত্মার স্বাধীনতা ও জগতের দুঃখ ভার হরণের ইচ্ছা, এই দুইটী ভাব ভারতীয় ধর্ম্ম জীবনে সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। তৎপরিবর্ত্তে শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়ানুষ্ঠান ও সন্ন্যাস এই দুই ফল ফলিয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমন ধর্ম্ম দাঁড়াইবে না যাহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভাব না থাকিবে—(১ম) মানবাত্মার স্বাধীনতা ও (২য়) জগতের দুঃখ ভার হরণের ইচ্ছা। যে ধর্ম্ম এই দুইটী ভাব বক্ষে ধারণ করিবে তাহাই বর্ত্তমান সময়ে দাঁড়াইতে পারিবে। যাহা আবার মানব চিন্তার হাত পা কাটিয়া দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া অন্ধকারে ঘুরিতে চাহিবে অথবা মানুষকে মানুষের দুঃখের প্রতি উদাসীন করিয়া নিজের ভাবের চরিতার্থতার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে চাহিবে তাহা নিকৃষ্ট বোধে সভ্য জগতের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে পশ্চিমদেশীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল এই দুইটী ভাব রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ও এই দুইটী প্রধান ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্মই মানবাত্মাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবে। সাক্ষাৎ ও অব্যবহিত ভাবে ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ করিলে ও তাঁহার পুণ্য জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিলে মানব অন্তরে যে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার আস্বাদন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবকে মুক্ত করিবেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের দুঃখ হরণের ইচ্ছাকেও পোষণ করিতেছেন।

এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ের প্রতি আমাদের এত আশা। বর্ত্তমান সময়ে মানব-হৃদয় অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষার সহিত যাহা চাহিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রবচন-সংগ্রহ।

কোরাণ।

পরমেশ্বর তোমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, এবং কখনও ঘৃণা করিবেন না। এই জীবনের অপেক্ষা নিশ্চয়ই তোমাদের পরকালের অবস্থা অধিকতর মঙ্গলকর হইবে; পরমেশ্বর তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন, যাহা পাইয়া তোমরা সুখী হইবে। তোমরা কি পিতৃমাতৃহীনের মত ছিলে না, এবং সেই অবস্থায় তিনি কি তোমাদের সহায় হন নাই? তোমরা কি কুসংস্কারের রাজ্যে বিচরণ করিতে ছিলে না, এবং তিনি আসিয়া কি তোমাদিগকে সত্যপথে চালিত করেন নাই? তোমরা কি অভাবের মধ্যে ডুবিয়া ছিলে না, এবং তিনি কি তোমাদিগকে অনেক মূল্যবান বস্তু দেন নাই? তবে পিতৃমাতৃহীনদিগকে পীড়ন করিও না ও কাঙ্গালদিগকে তাড়াইয়া দিও না; কিন্তু প্রভুর করুণার কথা ঘোষণা কর।

—:০:—

দায়ুদের সঙ্গীত।

আমি মেষ এবং প্রভু আমার পালক; আমার কোনও অভাব নাই।

তিনি আমাকে উর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্যে শয়ন করাইবেন এবং সুশীতল নির্ঝরিণীর নিকট লইয়া যাইবেন।

তিনি আমার আত্মাকে সজীব করিবেন, এবং তাঁহার নামের মহিমাতে আমাকে পবিত্র পথে লইয়া যাইবেন।

যদিও আমি মৃত্যুর রাজ্যে বিচরণ করি, তথাপি কোনও আশঙ্কা করিব না, কারণ তাঁহার শক্তি আমাকে বিপন্মুক্ত করিবে।

—:০:—

কংফুচ।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?

যিনি কথা কহিবার পূর্ব্বে কার্য্য করেন, এবং পরে স্বকৃত কার্য্য অনুসারে কথা বলেন।

যিনি পৃথিবীর কোনও বস্তুর সপক্ষে বা বিপক্ষে, আপনার মনকে চালিত না করিয়া চিরদিন কেবলমাত্র ন্যায়ের অনুসরণ করেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করেন। কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তি সুখের কথা চিন্তা করে। ন্যায়ের অনুসরণের দিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টি থাকে, কিন্তু কিরূপে অন্যের কৃপা লাভ করিবে নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাহাই মনে করে।

—:০:—

সত্য নিপাত (বৌদ্ধগ্রন্থ)।

বাশল (দাস) কে?

যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, পরনিন্দক, অন্যের সদ্গুণদ্বেষী, ধর্ম্ম অবমাননাকারী, তাহাকেই বাশল বলিয়া জান।

যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও দুর্ব্বল বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণ পোষণ করে না, তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

যে ব্যক্তি কোনও পাপকার্য্য করিয়া মনে করে যে ইহা কেহ না জানুক এবং যে ছদ্মবেশী, তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

যে ব্যক্তি অজ্ঞ হইয়াও আত্মাভিমানের বশীভূত হইয়া আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও অন্যের মহত্বকে খর্ব্ব করিতে চায়, তাহাকে বাশল বলিয়া জান।

অকপট ভাব।

প্রাপ্ত।

সহরের কোন কোন পল্লীর মধ্যদিয়া গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থানে স্থানে পয়ঃপ্রণালী সকল মলিন পূতি-

গন্ধময় জলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে এরূপ অসহনীয় দুর্গন্ধ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে যে সে স্থানের নিকট দিয়া যাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। সেই পূতিগন্ধের কণাসকল সেই পল্লীর বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে এরূপ বিষময় করিয়া তুলে যে তাহা সেবন করিয়া তৎস্থানের অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। আবার সেই জল-নালার উপরিভাগ যদি কোন বস্তু দ্বারা এভাবে আবৃত থাকে যে সেই মলিন জলের উপর কোনও প্রকারে সূর্য্যকিরণ পড়িতে পারে না, তবে সেইজল ক্রমশ অধিকতর দুর্গন্ধপূর্ণ ও বিষাক্ত হইয়া যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে যদি একবার ইহার সংযোগ হয়, তবে তাহার উত্তাপে ইহার পূতি-গন্ধ অল্পে অল্পে বিদূরিত হইয়া যায়। তৎপরে সেই মলিন জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হয়। তখন সেই বাষ্প মেঘের আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃষ্টিধারারূপে পতিত হইয়া ধরাতল শীতল করে। তখন তাহার নব আকার ও নির্ম্মল ভাব দেখিয়া কেহ কল্পনা ও করিতে পারে না যে ইহা এক সময়ে পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে পূতিগন্ধময় আকারে থাকিয়া সকলের পীড়ার কারণ হইয়াছিল। তখন তাহা হইতে জগতের অশেষ কল্যাণ উৎপাদিত হয়। যাহা এক সময় জীবের জীবন নাশের কারণ হইয়াছিল, তাহাই আবার তখন সকলের জীবন ধারণের পক্ষে সহায়তা করে, সকলের পিপাসা নিবারণ করে, সকলের আহারোপযোগী নানা প্রকার শস্য পরিবর্দ্ধিত করে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে সূর্য্যের উত্তাপই এই মলিন জলকে নবজীবন দিয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালী যদ্যপি আপনার বক্ষঃস্থলকে সূর্য্যের দিকে প্রসারিত করিয়া না রাখিত,—যদি ইহার উপরিভাগ এরূপ কোনও আচ্ছাদনে আবৃত থাকিত, যে সূর্য্য কিরণ ইহার উপরে পতিত হইতে না পারে, তবে এই আবর্জ্জনাপূর্ণ জল কখনই এমন নির্ম্মল হইত না। তাহা হইলে ইহা দ্বারা কাহারও উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া জীবন বিনষ্ট হইত।

এই ভাবের সদৃশ ভাব ধর্ম্ম জগতের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে এরূপ কত সাধু মহাত্মার জীবনের কথা পাওয়া যায়, যাঁহাদের জীবন প্রথম অবস্থায় ঠিক দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় ছিল। শত শত পাপ দুর্নীতি, শত মলিনতা অপবিত্রতার ভাব তাঁহাদের জীবনকে পূতিগন্ধময় করিয়াছিল। তাঁহাদের জীবনের সেই কদর্য্য ভাব দেখিয়া কোনও ভাল লোক তাঁহাদের সহবাসে আসিতে চান নাই; অধিকন্তু তাঁহারা যে সকল লোকের দলে মিশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আবর্জ্জনাময় জীবনের দুর্গন্ধে তাহাদের সকলের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পাপ ও দুর্নীতির ভাব তাহাদের জীবনে সংক্রান্ত হইয়া তাহা বিষাক্ত ও কলুষিত করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সকল পাপ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রেমে মত্ত হইয়া তখন তাঁহারাই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহাদের জীবনে এই পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল? বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাদের অকপট সরলভাবই তাঁহাদিগের জীবনকে এরূপ উন্নত করিয়াছে। আপনাদের পাপ দুর্ব্বলতা যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন জানিলেন যে পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন তাঁহাদের উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন সকল অহঙ্কার ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে, সরলান্তঃকরণে সেই কৃপাময়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিজের পাপ সকল ঢাকিয়া সাধুতার ভাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। উপরোক্ত পয়ঃ-প্রণালীর ন্যায় আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া পাপদুর্ব্বলতা, দোষ অপরাধ সকল পরমেশ্বরের সমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছেন। "এই দেখ প্রভো! আমি কি ঘোর অপরাধী, আমি কত দুরাচার পাপাসক্ত! তুমি আমার সকলই জান, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই তোমার কৃপা ব্যতীত আমার উদ্ধারের পথ নাই। আমি এই আমার মলিন প্রাণমন সর্ব্বস্ব তোমারই জন্য রাখিয়া দিলাম। তুমি আসিয়া আমাকে পবিত্র কর ও আমার গতি কর; আমি আর কোথায়ও যাইব না।" এই বলিয়া ভগবানের দ্বারে পড়িয়া পড়িয়া তাঁহারা দিবানিশি কাঁদিয়াছেন। অনাবৃত পয়ঃ-প্রণালীর উপরে যেরূপ সূর্য্যকিরণ নিপতিত হয়, সরল প্রার্থনা ও অকপট অনুতাপে অবশেষে তাঁহাদের জীবনের উপর সেইরূপ ব্রহ্মকৃপা বর্ষিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মকৃপার প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের যত পাপ মলিনতা কোথায় গিয়াছে। তখন তাঁহাদের হৃদয় পূণ্য পবিত্রতার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে; নীচ স্বার্থপরতার ভাব বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইয়া তখন সেই প্রেমময়কে আশ্রয় করিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে; পরমেশ্বরের সহবাসে সেই প্রেম ঘনীভূত হইয়া ক্রমে তাহা বৃষ্টি-ধারার ন্যায় জগতের উপর নিপতিত হইয়াছে। তখন তাঁহাদের পবিত্র জীবন, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম মানবের কত মঙ্গল-সাধন করিয়াছে; যে জীবনের পূতিগন্ধময় ভাব এক সময়ে জগতের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিল, পাপের দুর্গন্ধে মানব সমাজের বায়ুকে বিষাক্ত করিয়াছিল, তাহাই আবার তখন প্রেমের আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কত লোকের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিয়াছে; কত লোকের প্রাণের গভীর পিপাসাকে পরি-তৃপ্ত করিয়াছে এবং মানবাত্মার খাদ্যের উপযোগী কত শস্য উৎপাদনের সহায়তা করিয়াছে! কেবল মাত্র প্রাণের সরলতা ও নির্ভরের ভাব তাঁহাদের জীবনকে এইরূপ নূতন করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা পরমেশ্বরের সমক্ষে আপনাদের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যদি সমস্ত পাপমলিনতা না খুলিয়া ধরিতেন এবং তজ্জন্য গভীর অনুতাপের সহিত যদি তাঁহার কৃপা না ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর উপর যেমন সূর্য্য কিরণ নিপতিত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাদের জীবনের উপরেও ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইত না এবং তাঁহাদের জীবন ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিত না।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের জীবনের সে

প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে না কেন? তাহার উত্তর এই যে আমরা সেইরূপ অকপট ভাবে সেই পরম দেবতাকে আশ্রয় করিতে পারি নাই। যদি প্রাণের গভীর কলঙ্ক রেখা সকল তাঁহার নিকটে খুলিয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে, সরল অন্তরে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে নবজীবন দান করিত, এবং তখন আমাদের জীবনের প্রেম ও পবিত্রতা দ্বারা জগতের উপকার হইত। যদ্যপি আমরা পাপসকলকে অন্তরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে বৃথা ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা ত বিনষ্ট হইবই, অধিকন্তু আমাদের জীবনের পূতিগন্ধময় ভাব দ্বারা সমাজের আধ্যাত্মিক বায়ু দূষিত হইবে। সরল প্রার্থনা ও অকপট অনুতাপই ব্রহ্মকৃপা লাভের একমাত্র উপায়। কৃপাময় করুন আমরা যেন অকপট ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারি।

আশ্বাস বাণী।

ভগবদ্গীতা নবম অধ্যায়।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভ-ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহং ॥ ২৯
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, —হে অর্জ্জুন যখন তুমি কোনও কার্য্য কর, যখন আহার কর, যখন দান ধ্যান কর, যখন তপস্যা কর সমুদায় আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। তোমার আত্মা প্রকৃত বৈরাগ্য ও লাভ করিবে এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সকল প্রাণিতে সমানভাবে আছি কাহারও প্রতি আমার বিরাগ নাই কাহার প্রতি অনুরাগ নাই; যে কেহ আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে আমি সে জনে থাকি, সেজন আমাতে থাকে। সে যদি দুরাচারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হয় এবং অনন্য গতি হইয়া ঐকান্তিক ভাবে আমাকে ভজনা করে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে; সে ত্বরায় ধর্ম্মাত্মা হইয়া অক্ষয় শান্তিলাভ করে।

হে অর্জ্জুন! নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

—:•:—

আইসেয়া (বাইবেল)

ঈশ্বর বলিতেছেন;—তোমাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি; জগতের বড়লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিতেছি যে তুমি আমার ভৃত্য। আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।

তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; ত্রাসযুক্ত হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সবল করিব; নিশ্চয় বলিতেছি আমি তোমাকে আমার পুণ্যভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।

দেখ যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পথে বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে তাহারা বিনষ্ট হইবে।

তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়া ও পাইবে না; সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল, যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায় হইবে,—যাহার মূল্য নাই এমন পদার্থের ন্যায় হইবে।

কারণ, আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব—ভয় করিও না, আমি তোমাকে রাখিব।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

য়ীহুদীদের মধ্যে এই প্রকার একটী আখ্যায়িকা আছে যে এক সময়ে শতবৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ এব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি তিন দিন কিছুই আহার করি নাই, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাকে কিছু খাইতে দেও," এব্রাহিম তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে একপাত্র খাদ্যদ্রব্য স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ খাইতে উদ্যত হইলে, তিনি বলিলেন, "যাঁহার কৃপায় তিন দিবসের পর আহার্য্য বস্তু পাইলে, হে বৃদ্ধ! সেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হও।" বৃদ্ধ উত্তর করিল—"পরমেশ্বর আবার কে? আমি তাহাকে মানি না।" এই কথায় এব্রাহিম কুপিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পর ক্ষণেই পরমেশ্বর এব্রাহিমকে ডাকিয়া বলিলেন—"কেন তুমি গৃহ হইতে অতিথিকে তাড়াইয়া দিলে?" এব্রাহিম বলিলেন—"সে যে প্রভু তোমাতে বিশ্বাস করে না, কেহ তোমায় অবিশ্বাস করিলে আমি যে তাহা সহ্য করিতে পারি না।" ঈশ্বর তখন বলিলেন—"তাহার এই অপরাধ আমি শত বৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছি, আর তুমি একবারও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলে না?" এই আখ্যায়িকার মূলে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর দিবানিশি আমাদের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা চাই, অথচ তাঁহার ন্যায় অপরকে ক্ষমা করিতে জানি না। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার বিষয় অনুধ্যান করিয়া আমরাও যেন সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে পারি।

—•—

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল।

ব্রহ্মকৃপাগুণে গত ১৩ই চৈত্র সোমবার, বরিশালে ব্রাহ্ম বালিকাগণের একটী উৎসব হইয়া গিয়াছে। অনধিক বিংশ বৎসর বয়স্কা ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্ম বালিকারাই উৎসবে নিমন্ত্রিতা হন। প্রায় ২০টী বালিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রাহ্মিকা এবং কোন কোন হিন্দু মহিলারাও এই উৎসবে যোগ দান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৩ই চৈত্র সোমবার;—প্রাতে উপাসনা। কোন বালিকার রচিত নিম্ন লিখিত গানটী গীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল।

"ডেকেছেন প্রিয়তম" সুর।

আজি এ আনন্দ দিনে ডাকিতে আনন্দময়ে,
আসিয়াছি মোরা সবে কত আশা মনে লয়ে।
এস বোন সবে মিলে, ডাকি আজ প্রাণ খুলে,
পাইব তাঁহারে মোরা ডাকিলে ব্যাকুল হয়ে।
এস মন প্রাণ দিয়ে, পূজি সেই প্রেমময়ে,
অসার বাসনা-রাশি দূরেতে ফেলিয়ে।
শুনিয়াছি ভক্তিভরে, ডাকিতে পারিলে তাঁরে,
দেখা দেন নিজ গুণে মলিন হৃদয়ে।
দয়ার-সাগর বিনে, কি কাজ বল জীবনে,
এস তবে ডুবি সেই অমৃত-নিলয়ে।
তিনি সুখ, তিনি শান্তি, তিনিই পরমগতি,
জীবন সফল করি তাঁহারে লভিয়ে।
দূরে যাবে পাপ দুঃখ, পাইব অপার সুখ,
এস তবে ত্বরা করে ডাকি সেই দয়াময়ে।

কুমারী প্রেমদা দাস উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়, পরে সকলে মিলিয়া পরমানন্দে প্রীতি-ভোজন হইল।

মধ্যাহ্নে অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, বধির, স্থবির দিগকে কিঞ্চিৎ দান করিবার কথা ছিল, কিন্তু ২।১টী ব্যতীত উপস্থিত না হওয়াতে অন্যান্য দিনে দান করা হইয়াছে।

বেলা ১ ঘটিকার পরে উপাসনা শ্রীমতী সরলা বিশ্বাস উপাসনা করেন। পরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম বালিকাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে পাঁচটী প্রবন্ধ পাঠ হইল।

বালিকাদিগের অনুরোধে বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও বাবু চণ্ডীচরণ গুহ কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করেন। ৪॥ টার পরে সৎগ্রন্থ পাঠ হয়।

সদালাপ হওয়ার কথাছিল কিন্তু সময়ে কুলাইল না। সন্ধ্যার পর উপাসনা করা হইল, শ্রীযুক্তা সরলাসুন্দরী বিশ্বাস উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে অন্য একটী বালিকার রচিত নিম্নলিখিত গানটী গীত হইল।

"ধন্য ধন্য ধন্য আজি" সুর।

আজি এ উৎসব দিনে এসেছি সকলে।
দয়াময়ী জননী গো লও তব কোলে।
আজি বোন সবে মিলে
ডাকি মা হৃদয় খুলে
প্রসন্ন নয়নে চেয়ে
লহ কোলে তুলে।
অবোধ সন্তান বলে
সব অপরাধ ভুলে
লও গো করুণাময়ী
স্নেহ ময় কোলে।
আমরা দুর্ব্বল অতি
নাহি জানি স্তব স্তুতি
তোমার আশীষ ভিক্ষা
মাগিমা সকলে।
তোমারে সর্ব্বস্ব জেনে
তোমারি করুণা গুণে
(যেন) তোমাতে নির্ভর করি
বিশ্বাসের বলে।
মোহময় সংসারে পড়ে
মাগো তব সঙ্গ ছেড়ে
থাকিনা কখন যেন
তব দয়া ভুলে।
দুর্মতি কলুষ হর
শুভমতি দান কর
রাখ চির দাসী করে
তব পদতলে।
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান
মোরা মলিন সন্তান
বিভূষিত কর মাগো
প্রেম ভক্তি ফুলে।
মা হয়ে মা সঙ্গে রাখ
নিত্য সঙ্গী হয়ে থাক
তোমারে লইয়ে মোরা
গৃহে যাই চলে।

সকলেই ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়া আনন্দমনে পুনঃ প্রীতি ভোজনান্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ব্রহ্মকৃপা কেবল জ্ঞানী বয়স্কদের জন্য নহে। অবোধ বালিকারাও যে সেধনে বঞ্চিত হয় না এই ক্ষুদ্র উৎসবেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজের আপামর সাধারণকে এরূপ সদনুষ্ঠানে নিয়ত উৎসাহিত করেন এই প্রার্থনা।

সংবাদ।

উৎসব ঃ—বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু কেদারনাথ রায় প্রাতঃকালে উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্ম বিষয়ে

আলোচনাদি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্ম সম্মিলন—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শিবপুরস্থ রাজকীয় উদ্যানে ব্রাহ্মগণের এক সম্মিলনী হয়। তথায় হাবড়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকটী সমাজ হইতে অন্যূন ৫০ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সহানুভূতিকারী ব্যক্তি মিলিত হন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতঃকালে উপাসনার কার্য্য করেন। প্রীতিভোজনান্তে, কিরূপে এই সকল বিভিন্ন সমাজের সভ্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সদ্ভাব স্থাপন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। নববিধান সমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলে কার্য্যারম্ভ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বলিয়া প্রস্তাবের উত্থাপন করেন যে মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মগণ একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, যদি তাঁহারা এই তিনটী উপদেশের কথা স্মরণ করেন,—"(১) মূল বিষয়ে একতা, (২) সংশয়জনক বিষয়ে স্বাধীনতা, (৩) সকল বিষয়ে উদারতা।" তৎপরে এইরূপ সম্মিলন দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় সকলে এই মত প্রকাশ করিয়া কার্য্য শেষ করেন।

নূতন ব্রাহ্ম সমাজ—বিলাতের ভয়সী সাহেবের সমাজের সভ্য ব্লেকার নামক এক সাহেব কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার উৎসাহে ও যত্নে গত ১০ই মার্চ্চ রবিবার একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার চক্রবেড়ীয়াস্থ বাড়ীতে ইংরাজীতে উপাসনা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভবিষ্যতে প্রত্যেক রবিবার ঐ সমাজে এইরূপ ইংরাজীতে উপাসনা হইবে।

ব্রাহ্ম-বন্ধু সভা—বিগত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার পর ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন "হিন্দু একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২০এ ফাল্গুন সোমবার দিনাজপুরের বাবু মনমোহন দের এক পুত্র জন্মিয়াছে। তাহার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২৭এ তারিখে বাবু ভুবনমোহন করের বাড়ীতে উপাসনা হয়। বাবু শশীভূষণ ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা শেষে শিশুর মাতা একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নামকরণ—গত ৯ই মার্চ্চ শনিবার বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম সুধাংশুমোহন রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তদুপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার আমাদের বন্ধু বাবু কানাইলাল পাইন মহাশয়ের মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বারানসী ব্রাহ্ম সমাজ—আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধুগণের বিদিত আছে যে কাশীর ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের প্রযত্নে কাশী সমাজের উন্নতি হইয়াছিল। বস্তুতে কি তিনিই তাহার প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। এ দেশ হইতে ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদা গিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য সুখ ভোগ করিতেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য মহেন্দ্রবাবু সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম যে কিছুদিন হইল মহেন্দ্রবাবু বদলী হইয়া সীতাপুরে গিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাশী সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। মহেন্দ্রবাবু স্থানান্তরিত হওয়াতে আমাদের যেমন এক দিকে দুঃখ অপরদিকে এক আনন্দের সংবাদ আছে। তাঁহার বদলী হইবার কথা যখন প্রচার হইল, তখন কাশীর আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখ করিতে লাগিলেন। কাশী মহারাজ, রাজা শিবপ্রসাদ, প্রভৃতি ব্যক্তিরা ও বহুসংখ্যক সওদাগর অপরাপর ভদ্রলোক রেলওয়ে কোম্পানির নিকটে তাঁহাকে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য আবেদন করিলেন। সকলেই এক বাক্যে আমাদের বন্ধুর অমায়িক ব্যবহার সৌজন্য কর্ত্তব্যপ্রিয়তা প্রভৃতির অনেক প্রশংসা করিলেন। এই আবেদনের কোন ফল ফলিয়াছে কি না আমরা জানি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মই কর্ত্তব্য পরায়ণ ও সৌন্দর্য্যশালী হইলে এইরূপে সকল শ্রেণীর প্রেম আকর্ষণ করিতে পারেন। আমরা দেখিতে চাই প্রত্যেক ব্রাহ্ম স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে নিজ চরিত্রের দ্বারা লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের নামকে গৌরবান্বিত করেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

(১৮৮৭ মে হইতে ১৮৮৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

১৮০৯ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিতের জের ৩৪৫৯৩৷৷৪ পাই।

বাবু গৌরলাল রায়, কাকিনীয়া	২৲
„ গগনচন্দ্র ঘোষ ঐ	১৲
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	৮০৲
„ মণিলাল মল্লিক ঐ	২০৲
„ গিরিশচন্দ্র রায় ঐ	৪৲
„ গোপীমোহন ঘোষ, ময়মনসিং	৩০৲
„ দুকড়ি ঘোষ, কলিকাতা	১০৲
„ সদয়চরণ দাস, শীলং	৮৸/৫
„ চণ্ডীচরণ সেন, কৃষ্ণনগর	২৪৲
„ শ্রীনাথ দত্ত, ময়ুরভঞ্জ	২০৲
„ কালীনারায়ণ রায়, চাচল	১০৲
„ জগদীশচন্দ্র বসু, কলিকাতা	২৫৲
„ কে, জি, গুপ্ত ঐ	৩৫০৲
„ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর	১২৫৲
„ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, মেদিনীপুর	২০৲
„ রঘুনাথ দাস,	১০৲
শ্রীযুক্তা ললিতা রায়, কলিকাতা	১৫০৲
একটী দরিদ্র লোক, কোচবিহার	৩৲
	৩৫৪৮৬৷/৭ পাই

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিস
সম্পাদক বিল্ডিং ফণ্ড কমিটী
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ। ২য় সংখ্যা।	১৬ই বৈশাখ রবিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

উক্তি।

কালচক্রে দিন রাত এক দুই করে
ঘুরে গেল; বালকের বালকত্ব গিয়া
মনুষ্যত্ব দেখা দিল; বহু দিন ধরে
যে সব উন্নত আশা যতন করিয়া
রেখেছিনু, পুতি তাহা মানস-কবরে
আবার জীবন তরি যাই ভাসাইয়া
সংসার-সাগরে; কূল মিলিবে কোথায়,
ঘটনার দাস জীব বুঝেছি ধরায়।

প্রত্যুক্তি।

কার বিশ্ব মূঢ় নর? তোমার গৌরব
সাজে কোথা? যারে তুমি এত ভালবাস
সে জীবন তোমার কি? এই শক্তি সব
ভাঙ্গিছে গড়িছে যারা, যাহাদের ত্রাস
তোমার পরাণে পশি করিছে নীরব,
তারা কি তোমার? নর দেখ তুমি ভাস
যে শক্তির পারাবারে, সেই শক্তি কার,
ভাঙ্গিছে চূর্ণিছে দর্প সতত তোমার।

(উদ্ধৃত)

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আরবদেশীয় একটী চলিত কথাতে বলে,—

যে অজ্ঞ অথচ জানে না যে সে অজ্ঞ;
সে আহাম্মক; তাহাকে বর্জ্জন কর।
যে অজ্ঞ অথচ জানে যে সে অজ্ঞ,
সে সরল; তাহাকে শিক্ষা দেও।
যে বিজ্ঞ অথচ জানে না যে সে বিজ্ঞ,
সে নিদ্রিত; তাহাকে জাগ্রত কর।
যে বিজ্ঞ এবং জানে সে বিজ্ঞ,
সেই বুদ্ধিমান; তাহার অনুসরণ কর।

এই উক্তির অনুকরণে আমরা বলি:—

যে স্বার্থে মনোযোগী ও পরার্থে বিরোধী,
সে শঠ; তাহাকে বর্জ্জন কর।
যে স্বার্থে মনোযোগী কিন্তু পরার্থে উদাসীন,
সে স্বার্থপর; তাহাকে ক্ষমা কর।
যে স্বার্থে ও পরার্থে উভয়ের প্রতি উদাসীন,
সে সন্ন্যাসী; তাহাকে উদ্বোধিত কর।
যে স্বার্থে উদাসীন কিন্তু পরার্থে মনোযোগী,
সেই সদাশয়; তাহার অনুসরণ কর।

বিস্তার ও গভীরতা এই দুইটীর মধ্যে কোনটী প্রার্থনীয়? কোন পুষ্করিণীর জলরাশি যদি বহু বিস্তীর্ণ হয় কিন্তু তাহার গভীরতা যদি না থাকে তাহা হইলে এই গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে তাহার জল শুষ্ক হইয়া যায়; উত্তপ্ত জলে মৎস্যসকল প্রাণ ত্যাগ করিতে থাকে; সে জল আর নরনারীর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না; পিপাসাতুর পথিক দূর হইতে আসিয়া আর তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু যে সরোবরের জল গভীর, তাহার উপরিভাগ উত্তপ্ত হইলেও, অভ্যন্তর ভাগ সুশীতল থাকে; মৎস্যসকল তাহাতে ক্রীড়া করিতে পারে, চতুর্দ্দিকের লোকের তৃষ্ণা নিবারণের উপায় থাকে। যাহার বিস্তারের সহিত গভীরতা আছে তাহারত কথাই নাই। ধর্ম্ম সমাজের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার। ধর্ম্মসমাজের বিস্তার যদি অধিক হয় কিন্তু গভীরতা যদি অল্প হয়, তবে সংসারের উত্তাপে সে ধর্ম্ম জীবন রক্ষা পায় না; তাহাতে আধ্যাত্মিক গুণসকল বর্দ্ধিত হইতে পারে না এবং তদ্দ্বারা সংসার পথের তৃষিত পথিকদিগের তৃষ্ণা নিবারণের সাহায্য হয় না। বিস্তার অপেক্ষা গভীরতার দিকে অধিক মনোযোগী হইলে সে জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সদুপায় করা হয়।

সুদৃঢ় মণ্ডলী—কোন উপাসক মণ্ডলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে এক ব্যক্তি অপরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহা কি সুদৃঢ় মণ্ডলী"? অপর ব্যক্তি হাঁ বলিয়া উত্তর করাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহার সভাসংখ্যা কত?" উত্তর হইল "ছিয়াত্তর জন।" তিনি বলিলেন—"ছিয়াত্তর জন মাত্র! তবে কি সকলেই ধনী?" উত্তর হইল—

"না সকল সভ্যই দরিদ্র।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে আপনি কিরূপে ইহাকে সুদৃঢ় মণ্ডলী বলিতেছেন?" উত্তর-কর্ত্তা বলিলেন,—"কারণ, সকলেই ব্যাকুল, উৎসাহী, ধর্ম্মানুরাগী, উপাসনাশীল, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সদ্ভাবাপন্ন, এবং সম্মিলিতভাবে প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য সচেষ্ট ও অগ্রসর। অতএব সভ্য সংখ্যা ৫ বা ৫০০ শত জন হউক, এইরূপ মণ্ডলী নিশ্চয়ই সুদৃঢ়।" আমাদের মণ্ডলীর অবস্থা কিরূপ এই কথা যদি কেহ এখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাহার এই প্রকার উত্তর কি দিতে পারি?

মানব ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস—মহম্মদ সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে একদা তিনি এক বৃক্ষতলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ কোনও প্রয়োজনে কিয়দ্দূরে গমন করিয়াছিল। অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন যে মরুভূমবাসী এক আরব তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিল,—"মহম্মদ, এখন আমার হস্ত হইতে কে তোমাকে রক্ষা করে?" মহম্মদ বিশ্বাসের সহিত বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ঈশ্বর!" এই কথা শেলবৎ সেই অবিশ্বাসীর প্রাণকে বিদ্ধ করিল। যে কখনও পরমেশ্বরকে মানবের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করে নাই, জীবন্ত বিশ্বাসীর মুখে এই কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইল। তাড়িতের মত এই ভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহার শিরাসকলকে শিথিল করিয়া ফেলিল এবং নিঃশব্দে তাহার হস্ত হইতে তরবার স্খলিত হইয়া পড়িল। মহম্মদ তাহা তুলিয়া লইয়া তাহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আমার হস্ত হইতে কে তোমাকে রক্ষা করে?" সে বলিল,—"আর কেহই নাই, আমার জীবন এখন আপনার হাতে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক জনের নির্ভর ঈশ্বরের উপর, অপরের নির্ভর মানুষের উপর।

আমাদের নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি যে আমাদের বিশ্বাসের গতি মানুষের দিকে রহিয়াছে, মানুষের উপর যত পরিমাণে নির্ভর করিতেছি, পরমেশ্বরের উপর তত নির্ভর করিতে পারিতেছি না। সচরাচর দেখিতে পাই যে কাহার সঙ্গে যখন আলাপ হইল, কিছু দিন একত্র মিলিতে মিলিতে অমনি তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়া গেল। দুই চারিটা কার্য্যে তাহার ভাল ব্যবহার দেখিয়া অমনি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলাম। এইরূপ সাংসারিক যে কোন ও কার্য্য বা ব্যাপারের মধ্যে কাহারও বিশ্বস্ত ভাব কিছু দিন দেখিলে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পারি না। আবার যাহার নিকট হইতে একটুও ভাল বাসা পাই, যে কাহাকেও আমাদের কোনও উপকার করিতে দেখি, আমাদের হিত সাধনের জন্য যখনই কাহাকে একটু সচেষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন তাহাকে আমাদের পরম বন্ধু, নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে না করিয়া পারি না। কিন্তু পরমেশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের মনে এই ভাব আছে কি, না? তিনি যে সত্যস্বরূপ সারাৎসার তাহা বুঝিলাম, অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা তিনি যে সমস্ত জগৎ নিয়মিত করিতেছেন,—বিশ্বসংসার পালন করিতেছেন তাহাও জানিলাম, তাঁহার করুণা যে অজস্রধারে আমাদের উপর বর্ষিত হইয়া আমাদের জীবনকে রক্ষা করিতেছে, আমাদের সুখ শান্তি বিধান করিতেছে তাহাও অনুভব করিলাম, কিন্তু আমাদের প্রাণ কই তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিতে পারিল, কই সমস্ত হৃদয়মন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেছি? তাঁহার প্রেমের পরিচয় প্রতি মুহূর্ত্তেই পাইতেছি, জীবনধারণের উপযোগী সকল বস্তু তিনি দিতেছেন, আত্মার কল্যাণের জন্য কত আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু তবুও তাঁহাকে চির হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, অনন্ত মঙ্গলের আলয় বলিয়া তাঁহার উপর চিরদিনের জন্য নির্ভর করিতে পারিলাম না। তাই বলি মানুষের উপর নির্ভরের ভাব আমাদের যত, ঈশ্বরের উপর তত নহে। মানুষের নিকট হইতে একটু সামান্য উপকার পাইয়া আমরা তাহার প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হই, কিন্তু পরমেশ্বরের এত করুণা উপভোগ করিয়াও আমাদের প্রাণ কৃতজ্ঞতাভাবে তাঁহার কাছে অবনত হইতেছে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজে আগাছা।

এক দিন ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে নিম্নলিখিত গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করিল। তাহার ভৃত্যগণ নিদ্রিত হইলে পর কোনও শত্রু আসিয়া গোপনে তাহার মধ্যে আগাছার বীজ নিক্ষেপ করিয়া গেল। যখন শস্যের বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত এবং মুকুলিত হইল, তখন ক্ষেত্রের মধ্যে আগাছা ও উৎপন্ন হইতে দেখা গেল। ভৃত্যগণ আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে কহিল "প্রভু, আপনি কি ভাল বীজ বপন করেন নাই? ক্ষেত্রের মধ্যে আগাছা সকল জন্মিয়াছে কেন?" তিনি উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয় কোনও শত্রু আসিয়া ইহা রোপণ করিয়াছে।" ভৃত্যগণ তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি ইচ্ছা করেন যে আমরা গিয়া সে সকল নষ্ট করিয়া ফেলিব?" তিনি বলিলেন,—"না; কারণ আগাছা উৎপাটন করিতে গিয়া পাছে তাহার সঙ্গে তোমরা শস্য সকলও উপাড়িয়া ফেল। শস্যের পূর্ণবিকাশ পর্য্যন্ত উভয়কে বর্দ্ধিত হইতে দেও। শস্য পরিপক্ক হইলে আমি কর্ত্তনকারীদিগকে বলিয়া দিব যে তাহারা যেন শস্য সংগ্রহ করিয়া আমার শস্যাগারে রাখিয়া দেয়, এবং আগাছা সকল একত্রে বন্ধন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে।"

ঈশা ঈশ্বরের রাজ্যকে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেন।

এই কথাও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনেক লোককে সময়ে সময়ে এই কথা বলিতে শুনা যায় যে ব্রাহ্মসমাজের সকল লোক কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কোনও প্রকার স্বার্থসাধনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং যথাসাধ্য পরমেশ্বরকে ভাল বাসিতে ও তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং এখনও নাই। মানবের চক্ষু তাঁহাদের এই কপটতা দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনেক ক্ষতি হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পথে তাঁহারা প্রবল বাধাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের এই কথার মূলে অনেক পরিমাণে সত্য আছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোক আছেন যাঁহারা মুক্তি লাভের ইচ্ছায় এখানে আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে, আমাদের দেশের পরিত্রাণের জন্য, সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্য তিনি কৃপা করিয়া এই সত্য ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহা একদিন সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইবে, অনেক ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন নাই.; এবং সেই জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহাকে সেরূপ ভাল বাসিতে, তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা বিধানের মধ্যে রহিয়াছেন, অথচ তাহাকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিতে এবং যথাশক্তি ভাল বাসিতে পারেন না, তাঁহাদের দ্বারা তাহার কি কার্য্য হয়? বরং ক্ষতিই হইতেছে। তাঁহারা আবর্জ্জনাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, যাহা প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের দ্বারা অধিকৃত হওয়া উচিত ছিল। পুনশ্চ ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা লক্ষ্য, তাহা সাধন করিবার দিকে পূর্ব্বে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না, এখনও নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরকে ভালবাসা, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করা এবং তাঁহার সত্য নিজ জীবনে পালন করিয়া তাহা অন্যের নিকট প্রচার করা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য তাঁহারা কতটুক চেষ্টা করিতেছেন? কতলোক দেখিতে পাই যাঁহারা উপাসনা মন্দিরে কখনও উপস্থিত হন না; কত লোক দেখা যায় যাঁহারা আপন আপন পরিবারবর্গকে উপাসনাবিহীন করিয়া রাখিয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন; এবং এরূপও কাহাকে কাহাকেও দেখা যায় যাঁহারা নিজে দিনান্তে একবারও ঈশ্বরোপাসনা করেন না। স্বার্থত্যাগ করিবার কথা বলি না, জনহিতকর কার্য্য করিবার কথা বলি না, সত্য প্রচার করিবার কথাও বলি না, —সে সকল অনেক দূরের কথা! কিন্তু দিনান্তে একবার যাঁহারা নিজে পরমেশ্বরের নামগ্রহণ করেন না এবং পরিবারদিগকে তাহা করিবার পক্ষে সহায়তা করেন না, তাহাদের ব্রাহ্ম সমাজে থাকা নাম মাত্র? তাঁহারা কি অন্যের অনিষ্ট করিতেছেন না? ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা সেই পরমপিতাকে ভাল বাসিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহার নাম যাঁহাদের মিষ্ট লাগিল না, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের থাকাতে ফল কি? কারণ এখানে না থাকিলে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না,— হিন্দুসমাজে তাঁহাদের জীবন যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে এবং ইহা ছাড়িলেও থাকিবে। তাঁহারা না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না, বরং লাভ হইবে। কারণ তাঁহারা যে স্বার্থপরতার ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, যত লোক বা পরিবার তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতেছেন, সেই সকল লোক বা পরিবার মধ্যে সেই ভাব অল্লাধিক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের জীবনের দ্বারা কাহারও কোন আধ্যাত্মিক কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদের সংসারাসক্তি, বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচভাব সকল অন্যলোকদিগের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক গতি রোধ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণযোগ্য কিনা এই বিচার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহারা ইহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই সকল লোকের জীবনে ধর্ম্ম-বিগর্হিত ভাব দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিদ্বেষী, তাঁহারাও এই সকল লোকের ব্যক্তিগত জীবনে নানা প্রকার ছিদ্র দেখিতে পাইয়া তাহা সমস্ত ব্রাহ্ম সমাজের উপর আরোপ করিতেছেন এবং জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তীব্র কটুক্তির বাণ বর্ষণ করিতেছেন আবার পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। আধ্যাত্মিক যোগই মিলনের প্রকৃত ভিত্তি। ইহা ব্যতীত আর কিছুতেই মানবের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা ও হৃদয়ের গতিকে একীভূত করিয়া কোনও বিশেষ লক্ষ্যসাধনে সমর্থ করিতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসীগণ যে কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া করিতে অগ্রসর হইলেন, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ চারিদিক বিচার করিয়া তাহাতে স্বার্থের কোনও ব্যতিক্রম হয় দেখিয়া তাহা করিতে বাধা দিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে না। এইরূপে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আগাছা স্বরূপ হইয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিতেছেন। নিজেরা অগ্রসর হইতেছেন না, এবং অন্যের পথ আটকাইয়া বসিয়া আছেন।

এখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে এই সকল লোকের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কি করা কর্ত্তব্য। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল লোকদিগের এইরূপ স্বার্থসাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু পাপী তাপী ও প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্য এবং সমস্ত জগতে সত্য ও পবিত্রতার রাজ্য স্থাপনের জন্য ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেক সরল বিশ্বাসী ও পরিত্রাণলাভার্থী আছেন যাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। হইতে পারে যে তাঁহাদের কাহার কাহার জীবনে এখনও অনেক দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু

ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাদের সরল আকাঙ্ক্ষা ও যথাশক্তি চেষ্টা আছে বলিয়া আশা করা যায় যে একদিন তাঁহাদের সে সকল দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইবে—পরমেশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র নবজীবন দান করিবে। বিধাতা স্বয়ং এই সকল লোকদিগকে হাতে ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন এবং আপনার মঙ্গল ছায়ার মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। আর উপরোক্ত স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ ইহার মধ্যে আগাছার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। অন্যান্য সমাজকে অনুদার ও সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ দেখিয়া তাঁহারা তথায় যে সকল স্বার্থাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মসমাজের উদারতা বুঝিতে পারিয়া সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার আশায় তাহার আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাঁদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি? মহাত্মা ঈশা উপরের গল্পোল্লিখিত ক্ষেত্রস্বামীর মুখ দিয়া এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়াছেন।—"ঐ সকল আগাছা এখন উৎপাটন করিও না; উহা উপাড়িতে গিয়া পাছে উহার সঙ্গে শস্যও নষ্ট কর। এখন উভয়কে বর্দ্ধিত হইতে দেও। শস্য পরিপক্ক হইলে আমি কর্ত্তনকারীদিগকে বলিয়া দিব যে তাহারা যেন শস্য সকল সংগ্রহ করিয়া শস্যাগারে রাখিয়া দেয়, এবং আগাছা সকল একত্রে বন্ধন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে।"

খ্রীষ্টীয়গণ নরকাগ্নিতে বিশ্বাস করেন, অগ্নিতে নিক্ষেপ করার অর্থ তাঁহারা নরকাগ্নি বুঝিয়া থাকেন। নরক নামে যে কোন একটী স্থান আছে, সেথানে প্রদীপ্ত হুতাশন সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস নহে। আমরা অগ্নিতে নিক্ষেপের অর্থ আর এক প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি। কোন একটী সমাজের মধ্যে বিশ্বাসী ও অনুরাগী লোকের সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহা হইলে তাহাদের জীবন ও কার্য্য হইতে এমন এক পবিত্রতার তেজ, এমন এক বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে যাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্বার্থ সাধন-তৎপর ব্যক্তিগণের সকল প্রকার নীচ প্রবৃত্তি দগ্ধ হইয়া যাইবে। হয় তাহাদিগকে হৃদয় মন পরিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে, না হয় সেই অগ্নির উত্তাপে দূরে গিয়া পড়িতে হইবে।

আমরা যদি নিতান্ত সতর্কও হই, যদি অতি কঠোর পরীক্ষার দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করি, তথাপি ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, যে সমাজ মধ্যে দুর্ব্বল বিশ্বাসী, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও স্বার্থপরায়ণ লোক প্রবিষ্ট হইবে না। আর যদিও বা প্রবেশের দ্বারে পরীক্ষার অগ্নি জ্বালিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হই, তথাপি এক সময়কার প্রজ্বলিত অনুরাগ যে কালক্রমে শিথিল হইতে পারে না তাহা কে বলিল? যে ব্যক্তি আজ অনুরাগাগ্নিতে উজ্জ্বল, কল্য তাহার অগ্নি মন্দীভূত হইতে পারে। তখন ত সে সকল লোক সমাজের মধ্যে আগাছার ন্যায় হইয়া থাকিতে পারে। মানবীয় সমাজ গঠন করিতে গেলেই সৎএর সঙ্গে অসৎ মিশিয়া থাকিবে; তাহা বলিয়া কি আমরা সমাজ গঠন পরিত্যাগ করিব? কখনই নহে। আমাদের বোধ হয় সৎ অসৎএর একত্র বাস বিধাতার মঙ্গল বিধির অন্তর্গত। যদি অসৎ নিকটে না থাকে সৎ কাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? সৎএর যে কিছু শক্তি ও মহত্ত্ব আছে তাহা কিরূপে বিকশিত হইবে? অসৎএর সহিত সংগ্রামেই সৎএর শক্তি প্রকাশ। আমরা প্রতিদিন যে সকল পদার্থ আহার করি তন্মধ্যে অসার ভাগ কত থাকে, যাহা আমাদের দেহ হইতে রূপান্তর ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যাহা অসার, যাহার দ্বারা শরীরের কোনও ধাতুর পুষ্টি হইতেছে না, তাহা বিধাতা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রাখিলেন কেন? উত্তর এই, সে সকলের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহের পুষ্টি হয় না বটে কিন্তু তাহাদের দ্বারা পুষ্টিকর পদার্থ সকলের কার্য্য করিবার সাহায্য হয়। সেইরূপ ধর্ম্মভাব বিহীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা সমাজের দেহ পুষ্টি হয় না বটে কিন্তু তাহাদের বিদ্যমানতাতে ধর্ম্মভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সংগ্রাম ও শক্তিকে বিকশিত করে। যদি আমাদের জীবনে প্রলোভন না থাকে, বিঘ্ন না থাকে, সংগ্রাম না থাকে, যদি সকল লোকগুলিই আমরা বিশ্বাসী, প্রেমিক, সদাশয়, সাধু হই তাহা হইলে ধর্ম্ম সংগ্রাম একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং অচিরকালের মধ্যে আমরা অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি।

শস্যের সঙ্গে আগাছা থাকিবেই, তবে দেখিতে হইবে যে শস্য অপেক্ষা আগাছা অধিক না হয় তাহা হইলে আর শস্যের ক্ষেত না থাকিয়া আগাছার ক্ষেত হইয়া যাইবে। দুই দশটী দুর্ব্বল লোক থাকে থাকুক ধর্ম্মাগ্নি যেন সমাজ মধ্যে জাগ্রত থাকে; পবিত্রতার তেজ যেন প্রজ্জ্বলিত থাকে; তাহা হইলে ধর্ম্মজগতের আগাছা গুলিকে হয় সেই তেজ প্রাপ্ত হইতে হইবে না হয় দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

প্রবচন-সংগ্রহ।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
———সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥

ভাগবত।

হে সভ্য, যিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমাকে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে সুখ উপভোগ করেন বিষয়ীদের সে সুখ কোথায়? যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সকল দিকই সুখময়।

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎ সর্ব্বংসুধারসৈঃ।
উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য যথা চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ সুধারসে পরিপূর্ণ হয়। যেমন যে ব্যক্তির চরণ পাদুকাবৃত, তাহার নিকটে সকল ভূমিই চর্ম্মাবৃত বোধ হয়।

তবগুণ কয়া জগৎগুরুা জো পাপ করম ন নাশৈ।
সিংহশরণ কৎ যাইয়ে জো জুম্বক গ্রাসৈ ॥
এক বুদদ্‌কে কারণ চাতৃক্ নিত দুঃখ পাবে।
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে ফুন কাম না আবে ॥
মৈঁ নহি প্রভু হৌ নহি কুচ্ছ অহৈ ন মোরা।
আবসর্ লজ্জা রাখ্‌লে সাধনা উম্ তোরা ॥

—সধন।

যদি পাপ কর্ম্মের নাশই না হয়, তবে হে জগৎগুরো! তোমার মহিমা কি? যদি জম্বুকেই গ্রাস করে, তবে সিংহের শরণ কেন লইবে? এক বিন্দু জলের জন্য চাতক নিরন্তর ক্লেশ পায়; যদি তার প্রাণ বিয়োগ হয়, আর সাগরও মিলে, তথাচ তাহাতে তাহার কোনও কায দেখে না। আমি কিছু নই, আমারও কিছু নাই; হে প্রভু! তুমিই আছ; এ সময়ে লজ্জা হইতে রক্ষা কর, সধন তোমারই।

দুর্জ্জয়ানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যৈর্হি বিশ্বং বশীকৃতম্।
যস্তানি জেতুং শক্নোতি স বিশ্ববিজয়ী মতঃ ॥
জাগ্রদন্তর্বহির্ব্রহ্ম পরমানন্দচিন্ময়ং।
স্বপ্রকাশং ন যোবেত্তি স মূঢ়োঽন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

—সদ্ভাব

'লোকে ইন্দ্রিয়গ্রামকে দুর্জ্জয় বলে, কেন না উহারাই আমাদিগের বিশ্বকে অধীনস্থ করিয়াছে, যিনি তাহাদিগকে জয় করিতে পারেন, তিনিই বিশ্ববিজয়ী। অন্তরে ও বাহিরে জাগ্রত পরমানন্দময় চিন্ময় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে যে দেখিতে পায় না, সেই মূঢ়ই অন্ধ।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক দেবতা বাস করেন—তিনি বিবেক।

কেবলমাত্র আপনার জন্য বাঁচিয়া থাকাতে প্রকৃত জীবন ধারণ হয় না। যখন কোনও সাধুকার্য্য করিবে, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তোমার সেই সৎসাহসের মধ্যে রহিয়াছেন মনে করিয়া আনন্দিত হও। প্রকৃত উচ্চ প্রশস্ত অন্তকরণই মানবের প্রধান অভাবের বস্তু।

—গ্রীককবি মিনাণ্ডার।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে দেবতা স্বরূপ মনে কর।

তোমার কর্ত্তব্য কি? অদ্য তোমার সম্মুখে যে কার্য্য অসম্পাদিত পড়িয়া রহিয়াছে তাহা সুসম্পন্ন করা। পুনশ্চ, সর্ব্বোত্তম শাসন প্রণালী কি? যাহা আমাদিগকে আত্মশাসন শিক্ষা দেয়।

—গেটী।

সত্য যাঁহাদিগকে স্বাধীন করিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ, অপর সকলে দাস মাত্র।

—কাউপার।

না জানিয়া বিশ্বাস করা দুর্ব্বলতা। জানিয়াছি এই জন্য বিশ্বাস হইতেছে,—এইরূপ বিশ্বাসেই শক্তি।

যখন মানবের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে ঐক্য হয়, তখন তাহা দুর্জ্জয় শক্তি ধারণ করে।

আইস আমরা পরমেশ্বরকে প্রকৃতির মধ্যে অন্বেষণ করি, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সত্যরূপে পূজা করি, এবং মানব সমাজের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ভালবাসি ও তাঁহার সেবা করি। ইহাই চিরস্থায়ী ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম।

—ইলিফস্ লেভি

প্রেমিক ব্যক্তি বালকের সহিত বালক হইয়া খেলিতে পারেন, যুবার সহিত যুবা হইয়া উল্লাসে মাতিতে পারেন এবং বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধ হইয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করিতে পারেন। জ্ঞানীর সহবাসে তিনি সুখানুভব করিতে পারেন আবার অজ্ঞানের নিকট ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে জানেন। সকলের হাসিতে তিনি হাসিতে পারেন এবং সকলের ক্রন্দনে তিনি কাঁদিতে ও পারেন। সকল উৎসবে তিনি মিশিতে পারেন, আবার সকল হাহাকারে তিনি সহানুভূতি করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তির সদ্‌গুণ তিনি হৃদয়ের সহিত আদর করেন এবং পাপীর দুর্ব্বলতাকে মার্জ্জনা করিতে জানেন।

—ইলিফস্ লেভি।

সদুক্তি।

আত্মত্যাগ।

চিনি মিষ্ট হইলেও, অন্য দ্রব্যের সংযোগ ভিন্ন, অল্পই আহার করা যায়। লেবু মুখপ্রিয় বটে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে, অনাহার্য্য বলিলেও অসঙ্গত হয় না। লবণের ত কথাই নাই; পৃথকরূপে আহার্য্যই নহে। কিন্তু এই বিপরীত রসযুত দ্রব্যগুলি, জলে অচিহ্ন হইয়া, যে উপাদেয় পানীয় প্রস্তুত করে, তাহার আস্বাদ কত মধুর ও তৃপ্তিকর।

প্রকৃত ধর্ম্মও ঠিক্ এইরূপ। ইহাতে জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি ও হিতানুষ্ঠান প্রভৃতির সমাবেশ, পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এবং আত্মত্যাগই তাহার একমাত্র সাধন। ভগবান করুন! যেন এ আদর্শ সাধন পূর্ব্বক, গভীর জ্ঞানী, অটল বিশ্বাসী, পরম ভক্ত, এবং কঠোর কর্ম্মী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, সেই পবিত্র বারি "একমেবাদ্বিতীয়মে" আত্মত্যাগ পূর্ব্বক ভারতের অগণ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর পিপাসাশান্তির সুমিষ্ট সরবৎ হইতে পারি।

নবজীবন।

বলপূর্ব্বক সতেজ পত্র পল্লবচ্যুত করিতে গিয়া দেখিতে পাই, শাখা ভগ্ন হইলেও, পত্র কত সময়ে তাহাতেই সংলগ্ন থাকিয়া যায়। কিন্তু বসন্ত সমাগমে, বৃক্ষের শিরায় শিরায়, যখন নব রসের সঞ্চার হয়, তখন আপনা হইতেই সেই দুশ্ছেদ্য পত্র ঝরিয়া, সুসৌরভ মুকুল ও নবীন পত্ররাজি তরুর অতুল শোভা বিকাস করে; এবং তখনই, সুকণ্ঠ বিহঙ্গ রবে, বনস্থলী মহোল্লাসে পূর্ণ হয়।

প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, জ্ঞান যতদিন নূতন বলের সঞ্চার না করে, তত দিন নির্জীব বাহ্যানুষ্ঠানে, সুফল লাভ দুষ্কর, ও অনেক স্থলে অবাঞ্ছনীয়। যদি বাস্তবিকই নবজীবনলাভের বাসনা জন্মিয়া থাকে, তবে কৃত্রিম অভিনয় বর্জ্জন পূর্ব্বক, যাহাতে প্রাণের শিরায় নব রসের স্রোত প্রবাহিত হয়, প্রথমে তাহারই আয়োজন কর। দেখিবে, এ পুরাতন ভাবনিচয়, আপনা হইতেই দূর হইবা, পরিমলপূর্ণ প্রীতিকুসুম, ও জীবন্ত অনুষ্ঠান-পত্রে সুশোভিত হইয়া যাইবে। এবং তখনই জীবন-বিহঙ্গের ভক্তিপূর্ণ মধুর সঙ্গীতে, জনসমাজ প্রতিধ্বনিত হইবে। এই জন্যই ঈশা উপদেশ দিয়াছেন—"সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর রাজ্য, ও তাঁহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর।"

সমবেদনা।

বাল্যকালে এক সমবয়স্ক বালকের সহিত চৈতন্য এমন প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, দিবাভাগের অধিকাংশ কালই তাহার গৃহে অতিবাহিত হইত। তাহার সহিত এক পাত্রে আহার, এবং তাহার পিতা মাতাকে, পিতৃমাতৃ সম্বোধন করিতেন। একদা অপরাধ হেতু, মাতা নিজ পুত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন।

বালকের পিতা গৃহে আসিলে, চৈতন্য বলিলেন,—"বাবা, মা আমাকে মারিয়াছেন।" গৃহস্বামী লজ্জিত হইয়া, স্ত্রীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। মাতা, বিস্মিত হইয়া, চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আমি নাকি তোমাকে মারিয়াছি?" চৈতন্য বলিলেন, "হাঁ মা, মারিয়াছ বৈকি! উহাকে মারিলে কি আমার লাগেনা? এই দেখ আমার পিঠে আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে!" এ অনুপম সমবেদনার জীবন্ত দৃষ্টান্তে দম্পতী অবাক!

এ আখ্যায়িকা সত্য হউক আর নাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, আমাদের একের ক্লেশে, যত দিন সমগ্র মণ্ডলীর প্রাণ আকুল হইয়া না উঠে, তত দিন ভ্রাতৃভাবের কথা, সাহিত্যের ভূষণ মাত্র থাকিয়া যাইবে। এ উচ্চ আদর্শের কথা ছাড়িয়া দি। যে সামান্য সদ্ব্যবহার, সংসার মধ্যে দেখিতে পাই, এ পবিত্র ভ্রাতৃমণ্ডলীকে কত সময়ে তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। কত সময়ে প্রচ্ছন্ন এবং গুপ্ত ঘাতকের ন্যায়, পরস্পরকে, কুৎসার তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে, ক্ষত বিক্ষত করিতেছি। মুমূর্ষু অবস্থায়, খ্রীষ্টসম ক্ষমাশীল হইয়া, প্রাণ হন্তার মঙ্গল কামনা দুঃসাধ্য হইলেও, অনুশোচনার অশ্রুবারিতে, নিষ্কণ্ঠ-প্রবাহিত, ভ্রাতৃশোণিত ধৌত করা যে অনায়াসসাধ্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু এটুকুও কি আমরা কত সময় করিয়া থাকি?

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৩১শে চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যাকালে বর্ষশেষ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরদিন ১লা বৈশাখ শনিবার নববর্ষোপলক্ষে উৎসব হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারপর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

আমাদের দেশে এমন ধর্ম্মমত সকল আছে যাহাতে বলে যে ধর্ম্মের সঙ্গে সমাজের কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মসাধন স্বতন্ত্র বস্তু, ধর্ম্মসমাজ না হইলে তাহা চলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয়কে এক করিতে চান। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে রোমান কাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই প্রধান শ্রেণী আছে। কাথলিকেরা ধর্ম্মসমাজের এবং প্রোটেষ্টাণ্টেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানেন। বাইবেল প্রচার না করিয়া পোপের অধীন হইয়া চলাই কাথলিকদের মত এবং কেবলমাত্র বাইবেল দ্বারা জীবনকে নিয়মিত করা প্রোটেষ্টাণ্টদের মত। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বলেন যে আগে যেমন ভাষা ও পরে ব্যাকরণ, সেইরূপ অগ্রে ধর্ম্মজীবন, পরে ধর্ম্মশাস্ত্র। ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মজীবন দ্বারা যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মজীবন হইতে ধর্ম্মসমাজ, এবং তাহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র। অনেক দিন যাহা চলিয়া যায় তাহাই শাস্ত্র হয়। ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে ধর্ম্মসমাজের সম্বন্ধ,—ঠিক আম্রের বীজের সঙ্গে তাহার আঁটির যেমন সম্বন্ধ। আঁটি বীজেরঘর স্বরূপ হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। তবে তাহা হইতে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ মানব ব্যক্তির মধ্যে যে সত্য অবতীর্ণ হয় তাহা রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর সমাজ করেন। ধর্ম্মজীবনের শক্তিই সমাজের শক্তি। ইহা থাকিলে সমাজ আপনি গঠিত হয়, নীতি আপনি রক্ষিত হয়। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা অত্যাচারিত ও দেশতাড়িত হইয়া যথায় গিয়াছেন তথায় সমাজ হইয়াছে। কেন হইল? তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন ছিল, তাই হইয়াছে। ধর্ম্মজীবন থাকিলে সব হয়। পুণ্যে রুচি ও পাপে অরুচি না জন্মিলে যেমন নীতিরক্ষা হয় না, ধর্ম্মজীবন না থাকিলে সেইরূপ সমাজও রক্ষিত হয় না।

এই জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখানে ধর্ম্মজীবন ও সমাজ একত্র সম্বন্ধাবদ্ধ। ঈশ্বর স্বয়ং এই সব গড়িয়াছেন। আর কেহ আমাদিগকে ডাকে নাই। হইতে পারে কেহ কেহ হয়ত স্বার্থের জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু অনেকেই পাপের জন্য অনুতপ্ত ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। সূর্য্য যেমন জড় জগতের জন্য সকলই করিতেছে, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের জন্য সব করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতিতে মানব উজ্জ্বল। কেন তিনি আমাদের জন্য এই সমাজ গঠন করিয়াছেন? আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য ইহার সৃষ্টি। অনেকে কত সময় নিরাশ হন, কিন্তু তাঁহারা মনে করেন না যে এ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহারা মরিয়া যাইবেন। সন্ন্যাসের ধর্ম্ম একা চলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম একা চলে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষভাব, ১ম। ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চে স্থান দেওয়া। অন্য ধর্ম্ম নামমাত্র সর্ব্বোচ্চে স্থান দেন। তাঁহারা

ঈশ্বরের সঙ্গে আর কিছু যোগ করেন; খ্রীষ্টীয়েরা বলেন—ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট। মুসলমানেরা বলেন—ঈশ্বর ও মহম্মদ। তাঁহারা একা ঈশ্বরকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। আমরা আর কাহাকে আশ্রয় করিতে চাই না। ২য়। বিবেক ও সাধু-ভক্তির সমবায়। সচরাচর লোকে এই উভয়কে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করে। যাহারা সাধু মানে তাহারা বিবেককে খর্ব্ব করিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, আবার যাহারা বিবেকের অনুসরণ করে তাহারা কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া জীবনকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। বিধাতাকে ধন্যবাদ! ব্রাহ্মগণ বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন! আমাদের দেশে বিবেকের বড়ই দুর্গতি। বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করা যে দোষ তাহা লোকে বুঝে না। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীগণ যাহা ঠিক তাহা বুঝিতে পারিয়া কি কাযে করিতে পারিতেছেন? কিন্তু ব্রাহ্মগণ সাধু ভক্তিতে অগ্রগণ্য। স্বদেশ ও বিদেশের সাধুদিগকে এত ভক্তি কে করে? ৩য়। জ্ঞান ও বিশ্বাস। লোকের ধারণা যে জ্ঞান থাকিলে বিশ্বাস হয় না এবং বিশ্বাস জন্মিলেই হইল; জ্ঞানের তত আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মসমাজ বলেন—জ্ঞান থাকিলে বিশ্বাস আপনি উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান বাতীত যে বিশ্বাস তাহা অন্ধবিশ্বাস। ৪র্থ। বৈরাগ্য ও নরসেবা। বৈরাগ্যের জন্য মানবসমাজ ছাড়িয়া নির্জ্জনে যাইতে হয় না; কিন্তু অনাসক্ত ভাবে নরসেবা করাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ৫ম। প্রেম ও প্রিয়কার্য্য সাধন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম থাকিলে জগতের হিতকর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; আবার অন্তরে যদি ঈশ্বর-প্রেম না থাকে, তবে কেবলমাত্র প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কোনও ফল নাই। ৬ষ্ঠ। নীতি ও আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র নীতিপালন করিলে জীবন শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহা কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। এজন্য তাহার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা থাকা চাই। আবার নীতিবিহীন যে আধ্যাত্মিক ভাব তাহার কোনও মূল্য নাই।

সংবাদ।

দ্রষ্টব্য;—দ্রষ্টব্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দিগের প্রত্যেকের জন্য যে কার্য্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বাহিরের কোন স্থান হইতে কাহাকেও চাহিতে হইলে, সেই প্রচারককে গোপনে পত্র না লিখিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে লেখাই ভাল; কারণ কোন প্রচারকের স্বীয় বিভাগের বাহিরের কার্য্যের ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তে। প্রচারক মহাশয়গণ স্বতন্ত্র ভাবে গোপনে বন্দোবস্ত করেন ইহা প্রার্থনীয় নহে। অতএব আশা করি মফঃস্বলের বন্ধুগণ এবিষয়টী স্মরণ রাখিবেন।

শ্রাদ্ধ;—বিগত ১৫ই চৈত্র বাবু আনন্দমোহন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে বাবু অম্বিকাচরণ সেন পিতার পারলৌকিক আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব।

আগামী ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩রা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১১শ বার্ষিক জন্মোৎসব হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার; প্রাতে উপাসনা, সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার;—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা, এবং সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন ও পরে উপাসনা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার;—সায়ংকালে সিটিকলেজ গৃহে ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারীগণের এক সম্মিলনী হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৮৯।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু নীলরতন সরকার, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ও বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫ জন কর্ম্মচারী সমেত ১৭ জন সভ্য লইয়া এবৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব বৎসরের সভাই সমুদায় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন। বার্ষিক সভার পর পুরাতন কমিটির ৩টী বিশেষ এবং নূতন কমিটির ৮টী নিয়মিত এবং ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে।

বৎসরের প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঊনষষ্টি মাঘোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। একটী বিশেষ কমিটির হস্তে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হয়। সব কমিটির সহিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একযোগে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উৎসবের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার সেই কমিটির হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহারা উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কোন কোন অনিবার্য্য কারণে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং অনাবশ্যক বোধে এখন আর প্রকাশ করা গেল না।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় এবারও উৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন।

বোম্বাই, লাহোর, গাজিপুর, মজঃফরপুর, বাঁকুড়া, ধুলিয়ান, নলহাটি, বোলপুর, বড়বেলুন, বর্দ্ধমান, হুগলি, উলুবেড়িয়া, বাণীবন, কাঁথি, মেদিনীপুর, দশঘরা, কালনা, আঁচুল, মহিপুর, শ্রীরামপুর, আড়ংঘাটা, জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর, দোগাছিয়া, বাহিরগড়া, চন্দননগর, হড়া, চক্রবেড়ে, শিবপুর, বসিরহাট,

বারাসত, মজিলপুর, কামারপুর, নলধা, বাগআঁচড়া, বাগের-হাট, নড়াল, খালোড়, বনগাঁ, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ, মাণিকদহ, জগন্নাথপুর, কালীকচ্ছ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, পাবনা, খলিলপুর, রাজসাহী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, রংপুর সৈদপুর, দিনাজপুর, ধুবড়ি, নওগাঁ, সমসপুর, বানেশ্বরপুর, গোয়ালপাড়া এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নূতন বর্ষের কার্য্য ভার গ্রহণের সময় উপাসনালয়ে বিশেষ উপসনা হইয়াছিল।

নূতন বর্ষে কি প্রণালীতে কার্য্য চলিবে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য হস্তে লওয়া যাইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কয়েকটী অধিবেশনে তাহারই বিশেষ আলোচনা হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটী সবকমিটী গঠনপূর্ব্বক এ বৎসরের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ কার্য্য সাধক (business) কমিটী পুস্তক প্রচার কমিটি, ব্রহ্ম বিদ্যালয় কমিটি, দাতব্য কমিটি, প্রেস কমিটি, মিসনফণ্ড কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, সামাজিক নিয়ম প্রণয়নকারী কমিটি। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব বৎসরের গঠিত প্রচার কমিটি এবং সামাজিক কমিটিও তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। নূতন গঠিত কমিটি সকল কার্য্য করিবার জন্য বেশী সময় প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া, এখনও অনেক কমিটীর কার্য্য বিশেষ ভাবে আরম্ভ হয় নাই।

গত দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্য ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রচার করিবেন। এ বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকগণের নিজের সুবিধা এবং আবশ্যকানুসারে তাঁহাদিগকে বৎসরের মধ্যে ২ মাস কাল অবকাশ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাপন ইচ্ছানুসারে এই দুই মাস যে কোন স্থানে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। স্থির হইয়াছে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায়; বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস বেহার ও ছোটনাগপুরে; পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসামে; বাবু শশিভূষণ বসু উত্তর বাঙ্গালায়; বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বাগআঁচড়া, যশোহর, খুলনায়; এবং প্রচারকার্য্যে প্রবেশার্থী বাবু কালীপ্রসন্ন বসু অধিকাংশ সময় ঢাকায় থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল—

চট্টগ্রাম মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, শিলং, বরিশাল, ময়মনসিংহ, তিনধারিয়া, কোন্নগর, বরাহনগর, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, শিবপুর, হরিনাভি এবং জলপাইগুড়ি।

প্রচার—নিম্নলিখিতরূপে প্রচারক মহাশয়েরা গত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—বাগআচড়া ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক উৎসবে উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য ও আলোচনাদি করেন এবং নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

১৪ই ডিসেম্বর—শঙ্করপুরের বাবু প্রহ্লাদচন্দ্র মল্লিকের দ্বিতীয় সন্তান অর্থাৎ প্রথম পুত্রের নামকরণ।

২রা জানুয়ারী—শঙ্করপুর নিবাসী পরলোকগত চাঁদ মল্লিক মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

৫ই ঐ —কুলবেড়িয়ার বাবু সীতানাথ মল্লিক মহাশয়ের ৺ মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১০ই জানুয়ারী —বাগুড়ী নিবাসী বাবু অমৃতলাল মল্লিক মহাশয়ের ৺ মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১১ই ঐ —কুলবেড়ীয়ার শ্রীমতী বসন্ত কুমারী মৈত্রেয় মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১২ই ঐ —বাগআঁচড়ার বাবু কুড়ানচন্দ্র মল্লিকের দ্বিতীয়া কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা।

৩রা ফেব্রুয়ারি—বাগুড়ীর পরলোকগত ঋষিবর মল্লিক মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

৫ই ঐ —কুলবেড়ীয়ার বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের পিতামহীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

৯ই ঐ —বাগআঁচড়ার শ্রীমতী ভবসুন্দরী মল্লিকের ৺ পিতা ঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১০ই ঐ —বাগআঁচড়ার মাসিক উৎসব—পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা, মধ্যাহ্নে কুড়ান চন্দ্র মল্লিকের প্রথমা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা, অপরাহ্নে ব্রাহ্মিকা সমাজ, সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা।

১৫ই ঐ —বাগুড়ীর ৺ মতিলাল মল্লিকের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১৬ই ঐ —শঙ্করপুরের বাবু তারণ মল্লিক মহাশয়ের ৺ পিতা ঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

২১এ ঐ —কুলবেড়ীয়ার তিনকড়ি মল্লিকের ৺ পিতা ঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

২৬এ ঐ —বাগআঁচড়ার বাবু রাধানাথ মল্লিক মহাশয়ের ৺ মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

৬ই মার্চ্চ—কুলবেড়ীয়ার বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের ৺ মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

১২ই ঐ —বাগুড়ীর বাবু বিনয়ভূষণ এবং কুলবেড়ীয়ার বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা।

১৭ই ঐ —শঙ্করপুরের বাবু অবিনাশচন্দ্র মল্লিকের ৺ পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

২০এ ঐ —বাগআঁচড়ার বাবু নটবর মল্লিক মহাশয়ের ৺ পিতা ঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

২২এ ঐ —বাগআঁচড়ার বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিকের ৺ মাতা ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

এতদ্ভিন্ন তিনি নিম্নলিখিত রূপে নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন।

বাগআঁচড়া, শঙ্করপুর, কুলবেড়ীয়া ও বাগুড়ীর ব্রাহ্ম সমাজে ও ব্রাহ্মিকা সমাজে নিয়মিত উপাসনা, পুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মালাপ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত কি বুঝাইবার জন্য কিছুদিন হইতে সেই বিষয়ে আলোচনা। বালক বালিকাগণও সেই সকল মত যাহাতে বুঝিতে পারে, সেই নিমিত্ত তাহাদিগকেও ব্রাহ্মিকা সমাজে লইয়া যাওয়া। সমাজের দিন ব্যতীত সপ্তাহে যে অবশিষ্ট দিন থাকে সেই সেই দিন কোন পরিবারে উপাসনা এবং প্রত্যহ রাত্রিতে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের পাঠাভ্যাস

কার্য্যে সহায়তা করা। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রায় সমস্ত দিন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং ব্রাহ্মিকা সমাজগুলিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতসার, ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি পুস্তক যাহাতে পঠিত হয় এবং উপাসনা সাধনে সকলে যাহাতে যত্ন করেন তাহার চেষ্টা। ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরে ধর্ম্ম প্রচারের কোন চেষ্টা এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও বালক বালিকাদিগের মধ্যেই অধিকাংশ সময় কার্য্য করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—২৩এ পৌষ—প্রাতে ও সায়াহ্নে রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৫ই মাঘ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে "প্রকৃত ধর্ম্মজীবন" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৬ই মাঘ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং ধ্যানে চিত্তের স্থিরতা বিষয়ে উপদেশ।

১০ই মাঘ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা ও আত্ম-সমর্পণ বিষয়ে উপদেশ।

১৩ই মাঘ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'ধর্ম্মের সামঞ্জস্য' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

১৪ই মাঘ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা বিষয়ে উপদেশ।

২৩এ মাঘ—ত্রিবেণী গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা।

২৮এ মাঘ—সিরাজগঞ্জ ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন; 'ধর্ম্ম পিপাসা' বিষয়ে উপদেশ।

২৯এ মাঘ—অপরাহ্নে সমাজ প্রাঙ্গনে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

২রা ফাল্গুন—সমাজমন্দিরে উপাসনার সময় কীর্ত্তন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে সমাজ প্রাঙ্গনে, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৩রা ফাল্গুন—'অদ্বৈতবাদ' বিষয়ে আলোচনা। এবং কোন ভদ্র লোকের বাটীতে কীর্ত্তন।

৪ঠা ফাল্গুন—ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা।

৫ই ও ৬ই ফাল্গুন—ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা।

৭ই ফাল্গুন—ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ।

৮ই ও ৯ই ফাল্গুন—সঙ্গীত ও আলোচনা।

১০ই ফাল্গুন—'আত্মার স্বাধীনতা' বিষয়ে আলোচনা।

১২ই ফাল্গুন—সম্পাদকের গৃহ প্রাঙ্গনে শিখ সম্প্রদায় বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

১৯এ ফাল্গুন—বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের উদ্বোধন।

২০এ ফাল্গুন—সম্পাদকের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ।

২১এ ফাল্গুন—প্রাতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও উপদেশ।

৪টা চৈত্র—রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন।

৫ই চৈত্র—উক্ত স্থানে অপরাহ্নে আলোচনা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ।

৬ই চৈত্র—অপরাহ্নে সম্পাদকের গৃহ প্রাঙ্গনে 'ভক্তি' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৭ই চৈত্র—রামপুরহাট গ্রামে কোন ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা।

৮ই চৈত্র—প্রাতে নলহাটিতে কোন ভদ্র লোকের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর নলহাটি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও উপদেশ।

বাবু শশিভূষণ বসু—বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভ হইতে (অর্থাৎ মাঘোৎসবের পূর্ব্ব হইতে) মাঘোৎসব পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে লোকের বাটী বাটী যাইয়া উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি করেন। মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করেন। উৎসবের সময় মন্দিরে একদিন উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করেন ও খিদিরপুরে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

তৎপরে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমনপূর্ব্বক তথাকার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং তত্রত্য সমাজ-গৃহে "বুদ্ধদেবের জীবন হইতে শিক্ষা লাভ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন ও সাধারণ লোকদিগের জন্য দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—মাঘোৎসবের সময়ে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যস্থল হইতে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক উৎসবে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং অন্যান্য উপায়ে উৎসব সম্পন্ন হইবার পক্ষে সহায়তা করেন। তৎপরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ক্ষেত্রে গমন কালে পথে বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক আলোচনা ও উপাসনা করেন। এখন তিনি বেহারে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার তথাকার কার্য্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—মাঘ মাসের প্রথমে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবে বক্তৃতা ও উপাসনা করেন এবং অন্যান্য প্রকারে উৎসবের কার্য্যের সহায়তা করেন। ইঁহার বিশেষ কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বৎসরের প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া মাঘোৎসবের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি মাঘোৎসবে ৪ঠা মাঘ সায়ংকালে, ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে, এবং ১১ই মাঘ দুই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "জীবনের অন্ন" এবং "যুগসংগ্রাম" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। তৎপর কলিকাতা অবস্থিতি কালে এখানকার উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতায় ১০নং ক্যামাক ষ্ট্রীটে একটী উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি নিয়মিত রূপে আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন এই সমাজের কার্য্য ইংরাজিতে সম্পন্ন হইতেছে। তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কোন্নগর ও ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গমন করিয়া বক্তৃতা আলোচনা ও উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন। একদিন খিদিরপুরে যাইয়া

কোন ভদ্রলোকের গৃহে উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন। ইঁহারও বিশেষ কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু—মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় আগমন করেন, এ বৎসর তিনি বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচারার্থ সমস্ত সময় যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসবের পর চট্টগ্রামে গমন করেন। তথায় বক্তৃতা, আলোচনা ও উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন এবং তথাকার কোন বন্ধুর গৃহে একটী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি সম্প্রতি ঢাকার অন্তর্গত তিল্লি শ্রীবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে উপাসনা, আলোচনা কীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিতেছেন তিনি কিছুকাল যখন যেখানে যাইবেন এই ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কেদারনাথ রায়, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু কালীমোহন দাস এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

ব্রাহ্মিকা সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমাজ যাহাতে বাস্তবিক ব্রাহ্মিকাগণের ধর্ম্ম সাধনের সহায় হয় তাঁহারা তাহার উপায় করিবেন। মাঘোৎসবের সময় উদ্যান-সম্মিলনে ব্রাহ্মপরিবার সম্বন্ধে আলোচনা হয়—উৎসবান্তে কয়েক দিন বিশেষ ভাবে পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি এবং যাহাতে পরিবারে পরিবারে নিয়মিত রূপে পারিবারিক উপাসনা হইতে পারে তাহার জন্য আলোচনা হইয়াছে।

উপাসকমণ্ডলী—বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্য মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতিতে আবশ্যকমতে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারকগণ আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। এই তিন মাসের প্রথমভাগে মাঘোৎসবের জন্য উপাসক মণ্ডলীর স্বতন্ত্র নিয়মিত উপাসনা হয় নাই। অন্য সময়ের উপাসনা নিয়মিতরূপে হইয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে বিশেষভাবে উপাসনা হইয়াছে। উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনাদির জন্য সম্মিলিত হইতেছেন।

ছাত্রসমাজ—বর্ত্তমান বর্ষের ছাত্র সমাজের কার্য্য বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয়।

এই সময় মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে।

তারিখ	বক্তা	বিষয়
২রা ফেব্রুয়ারী	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	"প্রারম্ভ সূচক বক্তৃতা।"
৯ই ফেব্রুয়ারী	বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র	"ধর্ম্মের গৌরব"
১৬ই ঐ	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	"ইংরাজী শিক্ষা ও বর্ত্তমান সমাজ সঙ্কট।"
৯ই মার্চ্চ	বাবু বিপিনচন্দ্র পাল	"ভারতবর্ষীয় বৃহৎ সমস্যা কে ইহার মীমাংসা করিবে?"
১৬ই ঐ	বাবু দ্বিজদাস দত্ত	"আমাদের আশা ও ভয়"
২৩এ ঐ	ঐ	"ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের ধর্ম্ম।"

গত ২৩এ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাজের সভ্যদিগের একটী সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে উপাসনা, আলাপ ও জলযোগ হইয়াছিল। ছাত্র সমাজের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ২১৮।

সঙ্গত সভা—গত উৎসবের পরে ২৪ এ মাঘ সঙ্গতের কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই ৩ মাসের মধ্যে কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

৭টী অধিবেশনের, দুইটীতে কয়েকজন যুবকের সন্দেহ ভঞ্জনোপযোগী নানা প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

অপর ২টীতে "ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে নিয়মিত উপাসনা প্রবর্ত্তন" সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা হইয়াছে। কিঞ্চিৎ সুফলও লক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপযোগীতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ ছিল। তাহা এক প্রকার দূর হইয়া, কোন কোন পরিবারে কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

অবশিষ্ট ৩টী অধিবেশনে "অহঙ্কার ধর্ম্ম পথের পরম শত্রু" এবং "জীবনের লক্ষ্য" বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা হইয়াছে।

প্রচার কমিটি—আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের আবেদন এখনও প্রচার কমিটির বিবেচনাধীন আছে। এবৎসর প্রচার কমিটি কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে খিদিরপুরে একদিন সংকীর্ত্তন ও উপদেশ হইয়াছিল। হরিনাভি, শিবপুর কোন্নগর, বরাহনগর এবং কলিকাতার কোন কোন উপাসনা-সমাজের উপাসনায় আচার্য্য প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসের মধ্যে "ব্রহ্ম সঙ্গীত" ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। "সাধু দৃষ্টান্ত" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সমাজের ব্যয়ে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয় প্রণীত "বক্তৃতাস্তবক" এবং "পুষ্পাঞ্জলী" সমাজ হইতে খরিদ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই উচ্চতর শ্রেণী (Senior Class) বন্ধ আছে, জুন মাসের পূর্ব্বে ইহার কার্য্য পুনরারব্ধ হইবে না। মধ্যম শ্রেণী (Junior Class)র কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। নিম্নতর শ্রেণী (Primary Class)র যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী পূর্ব্ব বৎসর নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটী নূতন শ্রেণী গঠিত হইয়াছে; এই শ্রেণীতে সম্প্রতি কতিপয় বয়স্থা মহিলা যোগ দিয়াছেন। সম্প্রতি মধ্যম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ২৬ নিম্নতর শ্রেণীর প্রথম বিভাগে ১৬ এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১০ জন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই সভার একটী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন "হিন্দু একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং সেই বিষয়ে আরও অনেকে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করেন।

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—নীতিবিদ্যালয়ের এ বৎসরের কার্য্য ফাল্গুন মাস হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা চল্লিশের কিছু অধিক। বালক বালিকাদিগকে বয়সানুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রথম শ্রেণীতে ৭ জন বালক আর বালকবালিকা সমেত ২য় শ্রেণীতে ১০ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ১৪ জন। ইহাদের মধ্যে তিন চারিটি হিন্দু বালকও আছে।

এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপন ও তত্ত্বাবধান কার্য্য মহিলাদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। এ বৎসর বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একটী নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে; তাহাতে মহিলাগণের সাহায্যার্থ কয়েক জন পুরুষ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, শিক্ষা কার্য্যেও দুইজন পুরুষ সভ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কমিটির নিয়মানুসারে গত ৮ই চৈত্র বুধবার নীতিবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের আমোদ বিধানার্থ কমিটির জনৈক সভ্যের বাটীতে ছায়াবাজী প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে কলিকাতাস্থ সমুদয় অল্পবয়স্ক ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের নিমন্ত্রণ হয়। প্রায় ৪০টী বালকবালিকা প্রদর্শন স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের অনেকের পিতামাতা এবং অভিভাবকগণ অনুগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত থাকিয়া কমিটীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বালকবালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পুস্তকালয় কমিটী—ইহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির কোন কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

তত্ত্বকৌমুদী এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়াভাবে তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের পূর্ব্ব সম্পাদক বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ই এ বৎসরের জন্য সম্পাদক পদে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন। মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য একটী বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এখনও তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

দাতব্য বিভাগ—এ বৎসরের জন্য বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ সম্পাদক এবং বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও এই কমিটির কার্য্য বিশেষ ভাবে আরব্ধ হয় নাই।

নূতন সমাজ—ঢাকার অন্তর্গত তিল্লি নামক গ্রামে একটী প্রার্থনা সভা এবং শ্রীযুক্ত বেকারসাহেবেরযত্নেকলিকাতায়১০নং ক্যামাক ষ্ট্রীটে একটী উপাসনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে কতিপয় ইংরেজ পুরুষ ও রমণী নিয়মিতরূপে উপাসনার জন্য উপস্থিত হইতেছেন। এই সমাজের উপাসনাদি ইংরেজিতে সম্পন্ন হইতেছে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—বাবু হীরালাল হালদার প্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই তিন মাসে ৭৬২৸৶০র কাজ হইয়াছে। ৭১৬৸৶১৫ আদায় হইয়াছে। ১৫০ টাকা ঋণ শোধ হইয়াছে এবং ১৫০ টাকা হাওলাত শোধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ২২৭০ টাকা পাওয়ানা আছে এবং ২৯০০ টাকা ঋণ আছে।

দান প্রাপ্তি—বাবু উমাপদ রায় তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) ১ম সংস্করণের ৩০০ খণ্ড এবং গ্রন্থস্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের		প্রচার ব্যয়	৫৮১/১০
চাঁদা	২৬১	কর্ম্মচারীর বেতন	১৫৩৷৹
বার্ষিক	১১৫৲	ডাক মাশুল	১২৲১০
মাসিক	৫২৲	কমিশন	৷৹
এককালীন	৪৷৹	মুদ্রাঙ্কণ ইঃ	১০৲
[illegible] উপলক্ষে		প্রচারক গৃহ ইঃ	২৮৯৸৹
প্রাপ্ত	১০৲	পাথেয় ইঃ	৩৪৸/০
		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের	
	২৬১৷৹	স্কুলের বেতন	৭৭৷৹
প্রচার ফণ্ড	৪৪৮৷০	বিবিধ ইঃ	৩৩৸/১৫
বার্ষিক	১৫৩৲		
মাসিক	২৯০৷০		১১৯২৸১৫

* মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রচারকগণের বৃত্তির দরুণ ১১১ এবং কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে ৫০৷৹ দেনা আছে। হাওলাত গচ্ছিত হিসাবেও প্রায় ৭০০৲ সাত শত টাকা দেনা আছে।

এক কালীন	৩৩৲	গচ্ছিত শোধ	
প্রাপ্ত চাউলের মূল্য	২৲	হাওলাত শোধ	৩৬৲
			১২২৯।১৫
	৪৪৮।০	স্থিত	১২৬॥৵৫
প্রচারক গৃহের ভাড়া	৫৫৲	মোট	১৩৫৫৸৶০
পাথের হিঃ	৩৩।৵০		
সিটী কলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দানের জন্য প্রাপ্ত	৭৭॥০		
কর্ম্মচারীর বেতন তত্ত্বকৌমুদী বুক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৪৫৲		
বিবিধ হিঃ	৪৶১০		
	৯২৪৸/১০		
গচ্ছিত হিঃ	২০০৲		
হাওলাত হিঃ	১১৩।/১০		
	১২৩৮৶০		
পূর্ব্বস্থিত	১১৭৸০		
মোট	১৩৫৫৸৶০		

পুস্তক বিক্রয় ফণ্ড।

পুস্তকের বাকী মূল্য আদায়	২৮৸৶১০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	১৪৩।৶৫
নগদ বিক্রয়	৪৯৯॥/৫	কমিশন	৪৶১০
সমাজের ৩৩৮৶১০		পুস্তকের ডাকমাশুল	১০॥৫
অপরের ১৬১/১৫		ডাক মাশুল	৸১৫
	৪৯৯॥/৫	কর্ম্মচারীর বেতন (ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী)	২১৲
কমিশন	৩৫॥৫	মুদ্রাঙ্কণ	২৭৭।০
পুস্তকের ডাক মাশুল	১৸৶১০	পুস্তক খরিদ	২৩৪॥০
সুদ হিঃ	৪১৲	পুস্তক বাঁধাই	৫০৲
	৬৭৭৲১০	কাগজ খরিদ	৯॥০
গচ্ছিত হিঃ	২২॥৶০	বিবিধ হিঃ	৪১৲১০
	৬৯৯॥৶১০		৭৯২।০
পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত	২০৯০॥৫	গচ্ছিত শোধ	২৸৵১০
মোট	২৭৯০৶১৫		৭৯৫৵১০
		স্থিত	১৯৯৫/৫
			২৭৯০৶১৫

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্য প্রাপ্তি	২২৩৵০	ডাক মাশুল	৫৪।৵৫
নগদ বিক্রয়	৪।৶১০	মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	৭৪।০
সুদ হিঃ	৮৫৲	কাগজ খরিদ	৫৬।০
ফেরত জমা (পোষ্ট অফিস হইতে)	১৩।৶০	কমিশন	১।৵০
বিজ্ঞাপন হিঃ	২॥০	কর্ম্মচারীর বেতন (ডিসেম্বর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি)	৩৩৲
	৩২৮৸১৫	বিবিধ হিঃ	১৩।৵১৫
গচ্ছিত হিঃ	১৲		২৩২।৶০
	৩২৯৸১০	স্থিত	১৪৪৮৸৶০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৩৫১৸/১০	মোট	১৬৮১॥৵০
মোট	১৬৮১॥৵০		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য প্রাপ্তি	৩৬৪৲	কাগজ	৬৭॥০
বিজ্ঞাপন হিঃ	৯/১০	ডাকমাশুল	১২০।৵৫
নগদ বিক্রয়	/১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৫৮॥০
		মুদ্রাঙ্কণ	৫০৲
	৩৭৩।৶০	বিবিধ হিঃ	১৪॥৶৫
পূর্ব্ব স্থিত	১৭৩৸৵১৫		৩১১/১০
মোট	৫৪৭।/১৫	হাওলাত শোধ	১৫৲
			৩২৬/১০
		স্থিত	২২১।৫
		মোট	৫৪৭।/১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের প্রায় ২৩০০৲ টাকা দেনা আছে।

মাঘোৎসবের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

মন্দিরে দান সংগ্রহ	৬২৵১৫	মন্দির সাজান, নিশান প্রস্তুত ও চিক খরিদ	২২৸/১০
উদ্যান-সম্মিলনের জন্য দান সংগ্রহ	৯৪৸১০	অভ্যাগতগণেরথাকিবার ঘর ভাড়া ও আহারগৃহ-প্রস্তুত, আহার-ব্যয়, পাথেয়, বিচানা ভাড়া এবং বিবিধ ব্যয়	৩৩১৲
চাঁদা সংগ্রহ	৩৬৩৸/১৫	আলোর ব্যয়	২১॥০
বাঁশ বিক্রয়	।/১০	মুদ্রাঙ্কণ ও ডাক-মাশুল	১৭৸১০
	৫২১৵১০	সংকীর্ত্তনের খুলি ও গ্লাস	১৮৲
		উদ্যান-সম্মিলনের ব্যয়	১০২॥৶১৫
		বালক বালিকাদিগের উৎসবে দেওয়া যায়	৫৶১০
			৫১৯/৫
		স্থিত	২/৫
			৫২১৵১০

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১০ই বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা জৈ্যষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

এবার বুঝেছি ভবে তরেছি তরেছি।

সংসার জলধি জলে ডুবিয়া রয়েছি,
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত অনেক সয়েছি;
অকূলেতে কূল নাই, অতলে তলায়ে যাই,
দাঁড়াইনু ভাবি যেথা, আশ্রয় লয়েছি
স্রোতে পড়ে পুন তাহে বঞ্চিত হয়েছি।

হাবু ডুবু খেয়ে শেষে তোমারে ধরেছি,
তোমারি শকতি সার অসারে করেছি;
ঘুচেছে সকল ত্রাস, প্রাণেতে বেড়েছে আশ,
সংশয় তিমির দূরে হরেছি হরেছি,
এবার বুঝেছি ভবে তরেছি তরেছি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কথোপকথন। প্রথম বন্ধু,—বল দেখি মুসলমান ধর্ম্মের মতের সার কি?

দ্বিতীয় বন্ধু—মুসলমান ধর্ম্মের মতের সার এই:—

১। একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর মানবের উপাস্য।

২। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত বিধান-প্রবর্ত্তক।

৩। মহম্মদের প্রকাশিত বিধান-শাস্ত্র অর্থাৎ কোরাণ অভ্রান্ত।

প্রথম বন্ধু—ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বল কিনা? যদি না বল, কেন বল না?

দ্বিতীয় বন্ধু—দুই কারণে বলি না।

(১ম) ঈশ্বরের মুক্তি-বিধান একজন বিশেষ ব্যক্তিতে আবদ্ধ, ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন সংকীর্ণ ও অনুদার মত পোষণ করেন না।

(২য়) ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

প্রথম বন্ধু—এখন আর কয়েকটী মূল সত্যের প্রতি দৃষ্টি-পাত কর;—

১। একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর মানবের উপাস্য।

২। কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বর-প্রেরিত বিধান-প্রবর্ত্তক।

৩। কেশবচন্দ্র সেনের প্রকাশিত বিধান-শাস্ত্র অর্থাৎ নবসংহিতা প্রভৃতি অভ্রান্ত।

প্রথমোক্ত তিনটী মূল সত্যের সহিত এই তিনটীর তুলনা করিয়া বল এই উভয়ে প্রভেদ কি?

দ্বিতীয় বন্ধু—প্রভেদ এই মাত্র যে মহম্মদের পরিবর্ত্তে কেশবচন্দ্র সেনের নাম দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম বন্ধু—এখন বিবেচনা কর শেষোক্ত মত যদি কাহারও হয় তিনি ব্রাহ্ম কিনা?

দ্বিতীয় বন্ধু—তিনি ঠিক ব্রাহ্ম নহেন; মুসলমানকে যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী বলা যায়, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সেইরূপ কেশব ধর্ম্মাবলম্বী বলা যাইতে পারে।

আমাদের দরবার মতাবলম্বী নববিধানস্থ বন্ধুগণ ইদানীং যে সকল মত প্রচার করিতেছেন—তাহার মধ্যে তিনটী মত দেখিয়া আমাদের প্রাণে প্রবল আশঙ্কা জন্মিতেছে যে নববিধান ত্বরায় পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুদ্র উপধর্ম্মের ন্যায় একটী উপধর্ম্মে পরিণত হইবে।

প্রথম, এই একটী মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় চিরকাল বিধানের মধ্য-বিন্দু রূপে বিদ্যমান থাকিবেন। দ্বিতীয়, একটী মত এই দেখিতেছি, যে বিধান সম্বন্ধে মৃত আচার্য্য যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবিচারিত ভাবে অবশ্য প্রতিপাল্য। তৃতীয়, দলগত বিবেকের নিকট অর্থাৎ দরবারে প্রাপ্ত আদেশের নিকট ব্যক্তিগত বিবেককে নত করিতে হইবে। আমরা বন্ধুগণের মতের সার নির্য্যাস করিয়া যাহা লিখিলাম, এবিষয়ে যদি কাহারও সংশয় উপস্থিত হয়, তাঁহাদের উক্তি হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই মতগুলি নববিধান মণ্ডলীর সকলের গ্রাহ্য কিনা জানি না। কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—এই তিনটী মত যদি প্রবল ও সাধারণ্যে গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহার অপরিহার্য্য ফল দুইটী হইবে। প্রথম, বন্ধুগণ মুখে ঈশা, মূষা, মহম্মদ, চৈতন্য যাহাই বলুন, ফলে তাঁহারা অচিরে কেশবচন্দ্র সেন রূপ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ

হইয়া পড়িবেন। স্মরণ রাখিবেন, মহম্মদ ও ঈশা, মূষা প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে সমাদর করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কালে তাঁহার শিষ্যগণ মহম্মদীয় ভাব রূপ কূপে আবদ্ধ হইয়াছেন। সেই রূপ নববিধানের মৌখিক উদারতার অর্থ এই হইবে—ঈশা, মূষা, মহম্মদের যে টুকু কেশবচন্দ্র সেনরূপ অয়স্কান্ত মণিতে প্রতিফলিত সেই টুকু, তার অধিক নয়। অর্থাৎ কলুর ঘানির বলদ যেমন সমস্ত দিন চলে, পরিশ্রম করে, অথচ পথ অগ্রসর হয় না, সেই এক ঘানি গাছের নিকটেই ঘোরে; সেইরূপ তাঁহারা মুখে যীশুকে ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র বলিবেন, চৈতন্যকে প্রেমাবতার বলিবেন, মূষা মহম্মদকে মহাজন বলিবেন, মুখে গতি থাকিবে কিন্তু ফলে তাঁহারা সকলে কেশবচন্দ্র রূপ বৃক্ষের চারি দিকেই ঘুরিবেন। এই স্থানেই উদারতার অন্তর্ধান।

অপর দুইটী মত প্রবল হইলে মানব বিবেকের মুক্তি-দাতা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের যে গৌরব ছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে। অভ্রান্ত শাস্ত্রের মত যদি প্রবল হয়, এবং দলগত বিবেকের নিকট ব্যক্তিগত বিবেক যদি বলিদান দিতে উপদেশ দেওয়া হয়, ফল এই হইবে, বিবেক নিস্তেজ ও নিদ্রিত হইবে। যে সমাজে বিবেক নিস্তেজ ও নিদ্রিত তাহা পচা পুকুরের ন্যায়, সেখানে দাম ও আবর্জ্জনা ত্বরায় জন্মিবে। আমাদের মত এই যে ব্যক্তিগত বিবেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই। বন্ধুরা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান গৌরব বলিয়া যাহা তাঁহারা এক সময়ে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই লোপ প্রাপ্ত করিতেছেন।

সাধুভক্তি ও বিবেক-পরায়ণতা—এই উভয়ের একটী যখন অপরটীকে বিনাশ করে তখন মানুষের অধোগতি উপস্থিত হয়। সাধুভক্তি যখন এত প্রবল হয় যে বিবেকপরায়ণতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন মানব-মন নানা প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক জড়তার মধ্যে নিপতিত হয়, আবার বিবেক-পরায়ণতা যখন উদ্ধত স্বমতপ্রিয়তার আকার ধারণ করে, এবং সেই ঔদ্ধত্যের প্রভাবে সাধুভক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর সে প্রকৃতিতে ভক্তি জন্মিতে পারে না। যে প্রকৃতিতে অহমিকার উষ্মা অত্যন্ত প্রবল, সেরূপ প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতার উপযোগী নহে। যে প্রকৃতিতে সকল দেশের ও সকল কালের সাধু সাধ্বী নরনারীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ভাব, অথচ নিজের বিবেক অনুসারে চলিবার জন্য আগ্রহ, তাহাতে উভয় একত্র মিলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই ভাব শিক্ষা দিতেছেন।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে;—

সানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।

আপনার হিতাহিত বোধ, সৎশাস্ত্র ও গুরুর অর্থাৎ ভক্তিভাজন ব্যক্তির উপদেশ এই তিনকে মিলিত করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যিনি নিজের আলোকের অনুসরণ করিবেন, তিনি যে অপর দুইটীকে একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন তাহা নহে; কিন্তু নিজের বিবেকের সহিত না মিলিলে, শাস্ত্রাদেশ ও গুরুবাক্য কাহারও পক্ষে গ্রহণীয় নয়।

বাক্য ও কার্য্য। জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ডের কোনও স্থানে এক সময়ে এক মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। তথায় একজন ইংরাজ ইংলণ্ডের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। "আমরা স্বাধীন জাতি; কোনও বিষয়ে কাহারও অধীন নই—এই ভাবে বলিতে বলিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি এখন স্বাধীনতার ভূমির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া নিমেষ মধ্যে গৃহের অপর প্রান্ত হইতে এক চর্ম্মকার গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—"না তাহা নয়, তুমি এখন একজোড়া পাদুকার উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, যাহার মূল্য তুমি আমাকে দেও নাই।"

এই বৃত্তান্ত হইতে জানা গেল যে এই বক্তা সামান্য পাদুকার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়াও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অহঙ্কার করিতেছিল। এইরূপ অনেক সময়ে দেখা যায় যে লোকে কথা কহিবার সময় কত উচ্চ উচ্চ কথাই বলে; কিন্তু কথার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় সেরূপ জীবন নাই। যে কথা কার্য্যে পরিণত না হইল, তাহার আবার মূল্য কি? পুস্তকের মধ্যে কত গভীর উপদেশ আছে, কিন্তু পুস্তক মুক্ত বলিয়া সে উপদেশ পালন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি মুখে বড় কথা বলে অথচ তাহা কার্য্যে পালন করিতে পারে না, সে নিজে মৃত এবং তাহার কথাও মৃত।

উপাসনায় একাগ্রতা—একদা দুইজন ইউরোপীয় যুবক এক পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইজনেরই ইচ্ছা যে সেই স্থানে বাস করিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিবে। এই জন্য পরস্পর অপরিচিত হইলেও স্থির করিল যে একটী ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে উভয়ে বাস করিবে। দিবসের অধিকাংশ সময় গৃহ সজ্জা করিতেই অতিবাহিত হইল। এক যুবকের প্রত্যহ উপাসনা করার অভ্যাস ছিল। সমস্ত দিন বিনা উপাসনায় গত হইল দেখিয়া সন্ধ্যার সময় তাহার প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। কোনও উপায় না দেখিয়া পরিশেষে অপরের নিকট প্রস্তাব করিল,—"অদ্য হইতে যখন আমরা একত্রে বাস করিব স্থির করিয়াছি, আসুন তবে পরমেশ্বরের নাম করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করি।" অপর যুবক কখনই উপাসনা করিত না এবং তাহার ঈশ্বরের প্রতি ও তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। এজন্য সে বলিল,—"ওসব আমি ভাল বাসি না; এ গৃহে ওরূপ কিছুই হইবে না।" এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল এবং অবশেষে গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এক রেখা টানিল এবং বলিল,—এই গৃহের এক অংশ আমার ও অপর অংশ আপনার। আপনি যে অংশ

ইচ্ছা লউন; অপর অংশে বসিয়া আমি উপাসনা করিব; পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাসী যুবক লজ্জিত ও নির্ব্বাক্ হইল তদবধি প্রথম যুবক নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ নিষ্ঠা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখিয়া অপর ব্যক্তির মন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তখন সে আর উপাসনায় যোগ না দিয়া থাকিতে পরিল না।

উপাসনার প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠার ভাব কবে আমাদের জীবনে জন্মিবে? শত সহস্র বাধা সত্ত্বেও কবে আমরা উপাসনাশীলতাকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিব? যদি কোন অসুবিধা বা প্রতিকূল অবস্থা ঘটে, তবে মনে করিব যে অদ্য আহার এবং অন্যান্য শারীরিক আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে ত বিরত হই নাই, তবে প্রভুর নাম না লইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করিলে যেমন শরীর রক্ষা হয় না দেখিতেছি, উপাসনা না করিলে আত্মা ও যে রক্ষা হয় না তাহা কবে আমরা সেই ভাবে বুঝিতে পারিব?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ভক্তের ভার ঈশ্বর বহন করেন। *

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায় ২২ শ্লোক।

অর্থ,—যাহারা অনন্যগতি হইয়া আমাকে চিন্তা করে এবং সেই ভাবে আমার উপাসনা করে, সতত আমার শরণাগত সেই ব্যক্তিদিগের যোগ ক্ষেম আমি বহন করি, অর্থাৎ সকল বিষয় আমি রক্ষা করি ও সকল ভার আমি বহন করি।" বসন্তকালে বৃক্ষগুলির শোভা দেখিয়া অনেকবার এই চিন্তা করিয়াছি যে তরুলতাই কি পরমেশ্বরের এত প্রিয়! তাহাদিগকে সাজাইতে তিনি এত ভাল বাসেন! শীতের প্রারম্ভে বৃক্ষগুলির পাতা ঝরিয়া গিয়া কিরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার দেখাইতেছিল। কোন কোনটীকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে সে গুলি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে পাতা গজাইবে না, আর তাহাতে শ্রী ফিরিয়া আসিবে না, আর তাহাদের শাখাতে পাখী বসিবে না, আর ক্লান্ত পথিকগণ তাহাদের ছায়াকে আশ্রয় করিবে না। কিন্তু কি যে বসন্তের সমীরণ তাহাদের শরীরে লাগিল, কোথা হইতে কোন রস যে তাহাদের মধ্যে আসিল, এমন যে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক পত্রবিহীন বৃক্ষ তাহাতে কোমল কোমল কচি কচি পত্র সকল কোথা হইতে দেখা দিল। সে নব পত্রের কি কোমলতা, কি স্নিগ্ধতা, কি নয়ন মনোহারী সুকোমল হরিদ্বর্ণ। যত দেখি চক্ষু সেই শোভাই দেখিতে চাহে; বিধাতার হস্তাঙ্কিত ছবি, অপরূপ চিত্র, তাহার অনুরূপ কে দেখাইতে পারে? এক দিন ঐ প্রকার একটী বৃক্ষের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া ভাবিতেছি,—ভাল, বিধাতা এই বৃক্ষটী এত যত্নে রক্ষা করিতেছেন, ইহার পুরাতন পত্র ঝরিয়া গিয়াছিল, আবার ইহাকে নূতন পত্রের মুকুট পরাইয়াছেন। আমি কি বৃক্ষেরও অধম, তাঁহার নিকট এই গাছটার যে মূল্য আছে আমার আত্মার কি সে মূল্যও নাই, যে তিনি আমাকে একেবারে শুকাইয়া যাইতে দিবেন। মন কোন প্রকারেই মানিতে চাহিল না যে মানবাত্মার মূল্য তাঁহার নিকট ঐ বৃক্ষের মূল্য অপেক্ষা কম। বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাদের প্রতিও বিধাতার কি কৃপা। তাহাদের পুরাতন পক্ষগুলি ঝরিয়া গেলে, আবার তাহাদিগকে নূতন পক্ষে আবৃত করা হয়। আমি কি একটা পক্ষী অপেক্ষা অধম যে তিনি আমাকে একেবারে বিনষ্ট হইতে দিবেন? আমার পুরাতন জীর্ণতা দূর করিয়া নূতন জীবন দিবার ব্যবস্থা কি তাঁহার জগতে নাই?

এই চিন্তায় গভীররূপে নিবিষ্ট হইয়া অনুভব করা গেল যে তাঁহার বিশ্ব-রাজ্যের নিয়ম এই দেখিতেছি যে তিনি যাহাকে যে কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কার্য্য সে যতদিন করিতেছে ও সেই কার্য্যের জন্য তাহার যতদিন থাকা প্রয়োজন হইতেছে ততদিন তিনি তাহাকে রাখিতেছেন। যখন যাহার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, কিম্বা যাহার দ্বারা আর তাঁহার কার্য্য হইতেছে না, তখন তাহাকে বিনষ্ট হইতে হইতেছে। পশু পক্ষীর সন্তান বাৎসল্য কেমন প্রবল। একবার আমি একটী কাকের বাসায় কাটি দিয়াছিলাম, সেই কোপে সেই শাবকগুলির মাতা প্রায় ১৫ দিন আমার মস্তকে ঠুকরাইয়াছে। শেষে এমন বিপদ হইয়াছিল যে আমি অনাবৃত মস্তকে ঘরের বাহির হইতে পারিতাম না। যে শান্ত প্রকৃতি গাভী অতি নিরীহস্বভাব, তাহার শিশুকে ধরিতে যাও দেখিবে ঘোর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইবে। কিন্তু এই স্নেহের তীব্রতা কতদিন? যতদিন শিশুর রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। তাহার পর সেই মাতাই আর সেই সন্তানের দিকে ফিরিয়া চায় না। এইরূপ যে বস্তুটীর দ্বারা যতদিন তাঁহার কার্য্য হইবে ততদিন তাহাকে তিনি রক্ষা করেন, কার্য্য শেষ হইলে বা কার্য্য না করিলে তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। আমাদিগকে হস্ত দিয়াছেন সংসারের কাজ করিবার জন্য, বস্তু সকলকে গ্রহণ করিবার জন্য। সেই হস্তকে উর্দ্ধ বাহু করিয়া রাখ তাহা শুকাইয়া যাইবে, তাহার শক্তি বিনষ্ট হইবে। তিনি যেন বলেন "আমার কাজ যখন করিল না তখন আমি উহাকে রক্ষা করিব না।"

ইহা হইতে আমরা দুটী উপদেশ লইতে পারি। প্রথম উপদেশ, তাঁহার রাজ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকের স্থান নাই।—শীঘ্রই হউক আর বা বিলম্বেই হউক তাহাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। যে তাঁহার প্রদত্ত শক্তিকে ব্যবহার করিবে না—এক গুণ শক্তিকে দশগুণ করিবার প্রয়াস পাইবে না তাহার শক্তি

* ৯ই বৈশাখ রবিবার সাঃ ব্রাঃ সমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অপহৃত হইবেই হইবে। দ্বিতীয় উপদেশ, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত যে থাকিবে,যাহার দ্বারা ঠিক তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হইবে তাহার রক্ষার ভার তিনি লইবেন। তাহার রক্ষার জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন সকলি যুটিবে। যদি অর্থের প্রয়োজন হয় সে পাইবে, যদি শরীরের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয় তাহার স্বাস্থ্য থাকিবে, যদি লোকের প্রয়োজন হয় তাহার লোক যুটিবে। তাহার কিছুর অপ্রতুল হইবে না, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইতে হইবে ও থাকিতে হইবে। বৃক্ষ যেমন তাঁহারই কার্য্য সাধন করে ও সেই জন্যই জীবন ধারণ করে সেইরূপ হইতে হইবে। বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার অনুগত থাক, বৃক্ষের ন্যায় তোমারও রক্ষার ভার তিনি লইবেন। কেবল আধ্যাত্মিক ভার নহে তোমার দৈহিক ভারও তিনি লইবেন। এই স্থানে আমাদের অনেকের একটু একটু কঠিন ঠেকে। ঈশ্বর যে সাধকের দৈহিক ভার বহন করিবেন ইহা তাঁহারা মানিয়া উঠিতে পারেন না। আমরাইত সকল করি। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, বপন কর্ত্তা বপন করে, কর্ত্তক কর্ত্তন করে, ভারী বহন করে, দোকানী বিক্রয় করে, ভৃত্য আনয়ন করে, পাচক রন্ধন করে, আমরা আহার করি, সবইত আমরা করি, ইহার ভিতরে আবার ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে অন্ন বস্ত্র দিবেন বলা এক প্রকার কুসংস্কার। আমাদের বিশ্বাস যে প্রকার দুর্ব্বল তাহাতে এরূপ চিন্তা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই যখন এই নিয়ম দেখি যে তাঁহার কাজ যে করে তাহার রক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেন, তবে মানবের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তাঁহার কার্য্যকে তিনি রক্ষা করিবেন, সে জন্য যদি আমার থাকার প্রয়োজন হয় আমি নিশ্চিত থাকিব। কেমন করিয়া থাকিব,কি করিয়া সকল অভাব পূর্ণ হইবে, কোন সময়ে কাহার হাত দিয়া অন্ন বস্ত্র আসিবে, তাহার কিছুই জানি না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে তাঁহার কাজের জন্য যদি আমার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন হয় আমি বাঁচিয়া থাকিবই; আমার অন্ন বস্ত্র ভূতে উড়াইয়া আনিবে; কেহ বুঝিতেও পারিবে না কোথা হইতে আসিল। যখন এ দেহ পতন হইবে, যেরূপেই হউক না কেন, তখন বুঝিব এ দাসের কার্য্য সমাধা হইয়াছে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইহা যদি মানিতে না পারা যায় তাহা হইলে বিধাতার বিধাতৃত্বে বিশ্বাসই করা হইল না। বৃথা তাঁহাকে বিধাতা বলা। একটা বৃক্ষের সঙ্গে তাঁহার যতটা সম্বন্ধ, একটা পাখীর সঙ্গে যতটা সম্বন্ধ, আমার সঙ্গে যদি ততটাও না থাকে আর কি বৃথা তাঁহাকে বিধাতা বলি। এই বিশ্বাসের ভূমি একবার অবলম্বন করিতে পারিলে ভবিষ্যতের চিন্তা আর থাকে না। অমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই তখন একজন চতুর লোক আমাকে বলিয়াছিলেন "তোমরা কি করিতেছ একবার চিন্তা কর। যদি ইংরাজ গবর্ণমেন্ট উঠিয়া যায় তাহা হইলে তোমরা যে একটা নূতন সমাজ গড়িতে যাইতেছ তাহার গতি কি হইবে? ইহা একটা নেড়া নেড়ীর দলের মত থাকিবে। ভারতবর্ষে এক হাজার সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমরা এক হাজার এক সম্প্রদায় রাখিয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলিলেন আজ তোমার একা, কালে তোমাদের পুত্র কন্যা হইবে, তাহাদের বিবাহ দিবার কি হইবে, যদি তোমরা মারা যাও, তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে? যদি তোমাদের সন্তানগণ এই ভাবাপন্ন না হয় তাহারা পস্তাইবে, বলিবে আমাদের পিতারা কি দুষ্কর্ম্মই করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আজ দাঁড়াইবার স্থান নাই।" এইরূপ কত তর্ক যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এখনও বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মকে এরূপ অনেক তর্ক শুনিতে হয়। আমরা যখন অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি তখন ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষে ৩০টী ব্রাহ্মসমাজ ছিল কিনা সন্দেহ, যে দুই চারিজন ব্রাহ্ম দেখিতাম তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। লোকে বলিত কি দেখিয়া যাও। ওদের চাল চুলো নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই; দুই চারিটী ক্ষুদ্র প্রাণী উহারা কি সমাজের শক্তির সমীপে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? সাংসারিক বুদ্ধিতে এসব ত পাকা কথা। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় যাহারা পায় নাই, তাহাদের প্রখর বুদ্ধি যে মূর্খতা মাত্র ঈশ্বর বার বার তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। এবারও তাহা করিলেন। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ! আমরা যখন অগ্রসর হইয়াছিলাম তখন স্বপ্নেও জানি নাই যে তোমরা আবার আসিয়া আমাদের চারিদিকে ঘিরিবে, তখন জানিতাম না ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা শত শত হইবে, তখন জানিতাম না এই কলিকাতা নগরে তিনটী প্রকাণ্ড ব্রহ্মোপাসনার স্থান হইবে, তখন জানিতাম না এত গুলি লোক প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। তখন জানিতাম না যে আজ ভারতবর্ষে ২৩০ এর অধিক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবে। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বল দেখি সে অভাব ঈশ্বর আপনা হইতে পূরণ করিয়াছেন কিনা? তবু কেন তাঁহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব না? আমরা ভবিষ্যতের অল্পই দেখিতে পাই সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা করিবার ভার আমদের নহে। আমাদের কেবল ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশের অনুগত হইয়া চলিবার ভার। আমরা অনন্য গতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিব, তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছু জানিব না; সতত তাঁহারই চরণাশ্রিত থাকিব, যতটুকু শক্তি আছে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব; তাহার পর তিনি আছেন। রাখিতে হয় রাখিবেন মারিতে হয় মারিবেন। তাহার আর ভাবিব কি? যে আমাকে ভিন্ন জানে না তাহার সকল ভার আমি বহন করি।" কি আশার কথা! ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এই সত্য প্রাণে অনুভব করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমার ভয় হয় আমরা পৃথিবীর জ্ঞানবৃক্ষের ফল কিছু অধিক খাইতেছি, ক্ষতি লাভ কিছু বেশি গণনা করিতে শিখিতেছি। লোকে ব্রাহ্মদিগকে এই বলিয়া নিন্দা করে যে ইহারা যেন কেমন এক প্রকার সৃষ্টিছাড়া লোক, সকলে যেরূপ ভাবে সেরূপ ভাবে না, ইহাদের সকল কাজে কিছু না কিছু উৎকেন্দ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি অজ্ঞ। এই অজ্ঞ অপবাদ কাহারও কাহারও প্রাণে এত লাগে যে তাঁহারা সাংসারিক ভাবে বিজ্ঞ হইবার জন্য ব্যস্ত। ঐ মরণের পথ। ঐরূপ বিজ্ঞ-

তাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের হস্তে, সত্যের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিলে যেরূপ দাঁড়ায় তাহাই দাঁড়াক। তাহা যদি লোকের রুচির অনুরূপ না হয় তাহারা রুচি বদলাইয়া লউক, আমরা বদলাইব না। এই বড় দুঃখ হইতেছে ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত প্রত্যেক উপাসকের সাক্ষাৎযোগ হইতেছে না। আমরা মুখে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি ভিতরে নিজেদের উপরেই নির্ভর করিতেছি। এই গূঢ় ব্যাধিতে আমাদের আত্মাকে গ্রাস করাতেই আমাদের সকল কার্য্য দুর্ব্বল ভাবে চলিতেছে। ঐশী শক্তি জাগিতেছে না; ব্রাহ্ম-চরিত্রের তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে না; বৈরাগ্য ও আত্মসংযম অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেছে না; পতঙ্গ যেমন অনলে আত্মসমর্পণ করে সেইরূপ নরনারী স্বার্থ নাশের অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিতেছে না; বিশ্বাসের শক্তি সাংসারিকতাকে দমন করিতে পারিতেছে না।

যুগ-ভাব ও যুগ-ধর্ম্ম।

(প্রাপ্ত)

স্থূল দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের আভ্যন্তরিক বিচ্ছেদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে অবনতির কারণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকটে এই ভ্রম তিরোহিত হইয়া বরং ইহাকে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির সহায় বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সমাজের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কি দেখি? এক একটী সত্য আসিয়া দেখা দিতেছে আর এক একটী ঘোর আন্দোলনে সেই সত্যের অকৃত্রিমতা পরীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের হৃদয়সিংহাসনে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা একদিকে অসত্য ও কুসংস্কারের প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের বিরাগ ও অপর দিকে সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্ম সমাজের জীবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছে; আর যাহারা অন্ধ তাহারা বাহিরের বিবাদ কলহ দেখিয়া ইহার দুর্ব্বলতা অনুমান করিতেছে।

ব্রাহ্ম সমাজের গৃহ বিচ্ছেদ দেখিয়া নিরাশার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনই শিক্ষিত নামধারীদের বর্ত্তমান প্রতিকূলতা দেখিয়া ভীত হইবারও কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ত আর নূতন নয়। রামমোহন রায়ের সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির প্রতিকূলতা ও তাহার পরিণাম ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত ও ব্রাহ্ম সাধারণের স্মৃতিতে দৃঢ় মুদ্রিত রহিয়াছে; তখন ত ব্রাহ্ম সমাজ সদ্যজাত শিশু, দুই একটী লোকের প্রেমাবরণে আচ্ছাদিত। আজ ব্রাহ্ম সমাজ নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। শত শত লোকের অকৃত্রিম অনুরাগ ইহার উপর পড়িয়াছে। মানবের ভ্রম যে বস্তুকে একবার আশ্রয় করে, তাহা যদি অবস্তু ও হয়, তবু তাহাকে নির্ম্মূল করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, ব্রাহ্ম সমাজ ত একটী সত্য সুন্দর বস্তু। শৈশবে দুই একটী লোকের প্রেমাবরণে আবৃত করিয়া যে হস্ত ইহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সে হস্ত কি শত শত হৃদয়ের প্রেমবর্ম্মে আচ্ছাদিত রাখিয়াও আজ ইহাকে জীবিত রাখিতে পারিবে না?

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন এ যুগের বিশেষ ভাব (spirit of the age) অস্বাভাবিক বৈষম্যের বিনাশ। ব্রাহ্মধর্ম্মের-বিরোধী উত্থানকারী মহাশয়েরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে তর্ককালে মুখে ইহা স্বীকার না করুন, কিন্তু কংগ্রেশ মণ্ডপে দাঁড়াইয়া শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করিয়া কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাহা না হইলে বৎসর বৎসর কংগ্রেসের সময় সভাস্থল কাঁপাইয়া আকাশের বায়ু আন্দোলিত করিয়া ইংরাজ ও এদেশীয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অস্বাভাবিক বৈষম্যাত্মক নীতির বজ্র নির্ঘোষে প্রতিবাদ করিতেন না ও ত্বরায় এ বৈষম্যাত্মক নীতির সংস্কারের জন্য রিজলিউসন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেন না। সত্য মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণের ন্যায়। যে ব্যক্তি নব সত্যকে আসিতে দিবেনা বলিয়া আপন গৃহে অর্গলবদ্ধ করিয়া থাকে, সত্য তাহার গৃহের ছিদ্র দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হয়। যাহা হউক ইহা সত্য যে লোকে কখনও কাজে কখনও বাক্যে উপরোক্ত বিশেষ ভাবেরই আগমন ঘোষণা করিতেছে, এই যুগভাবের আগমনী গাহিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ এই যুগভাব বক্ষে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই জন্যই ইহা যুগধর্ম্ম। কি রাজ-নীতি কি সমাজ-নীতি কি ধর্ম্ম-নীতি সকল বিভাগেই যুগভাব দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহা ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। ক্ষুদ্র প্রাণীরত কথাই নাই, ইন্দ্রের ঐরাবতের সাধ্য কি ইহার গতিরোধ করে? হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী, আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী, আর্য্য সমাজ, নব হিন্দু সমাজ এই সব বিভিন্ন নামধারী সমাজ যতই কেন ধনকুবেরগণ পরিপোষিত শিক্ষিত জনগণ কুলকুলায়িত হউক না, যুগভাব চক্রে পড়িয়া অদর্শন হইবে। খুঁজিয়া চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না।

এই যুগভাবের চক্রে ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমোন্নতির কথা যখন ভাবি, তখন পাণ্ডবদের সশরীরে স্বর্গারোহণের আখ্যায়িকা মনে পড়ে। সহধর্ম্মিণীসহ পাঁচ ভাই স্বর্গের যাত্রী হইলেন; কিন্তু সশরীর স্বর্গারোহণ এক যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না? একে একে দ্রৌপদী ও চারিজন পথকষ্টে অবসন্ন হইয়া মৃত্যু শয্যাশায়ী হইলেন, তাঁহাদের দেহ পঞ্চ পঞ্চেই পড়িয়া রহিল। একমাত্র ধর্ম্মরাজ সশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই আখ্যায়িকার সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য। ব্রাহ্ম সমাজ অস্বাভাবিক বৈষম্য দূর করিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন বলিয়া যাত্রা করিলেন। কতক দূর আসিয়া আদি সমাজ দণ্ডায়মান হইলেন, আর চলিতে পারিলেন না। কিন্তু যুগভাব ত থাকিবে না; ব্রাহ্ম সমাজও ইহাঁকে ছাড়িয়া মণিহারা ফণী হইয়া থাকিতে চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন। আর কিছু দূর আসিয়া পথে নববিধান সমাজের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, চরণ আর চলিল না, নববিধান বসিয়া পড়িলেন। যুগভাব যুগ-

মাহাত্ম্য স্থাপন করিতে চলিয়াছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই ইহা পশ্চাৎ ফিরিয়াও চাহিল না। আদি সমাজ ইহাকে হারাইয়া বর্তমানের না হইয়া আদির ব্যাপার হইয়া রহিলেন, নব বিধান সমাজ এ ভাব বিহনে নামে নববিধি থাকিয়াও নবযুগের বিধি রহিলেন না। তবে কি ব্রাহ্মসমাজ এ মাণিক হাতে পাইয়াও আমাদোষ হারাইল? না হারায় নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যুগভাব এখনও বিহার করিতেছে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অক্ষয় কবচ হইয়া রহিয়াছে। যতদিন সাধারণ সমাজ ইহাকে আপন অঙ্গের আবরণ করিয়া রাখিবে, ততদিন ইহার মার নাই। দিক পালগণ দলবদ্ধ হইয়া আসিলেও ইহার কিছুই করিতে পারিবেন না। যুগভাব যুগধর্ম্মকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। সমভূমি দিয়া চলিতে চলিতে নদী আসিয়া কোন গণ্ডশৈলে প্রতিহত হইলে ক্রমে জল সঞ্চয় করিয়া যেমন সবেগে সেই গণ্ডশৈল লঙ্ঘিয়া চলিয়া যায়, তেমনি যুগধর্ম্ম ব্রাহ্ম সমাজ যুগভাব প্রভাবে বল সঞ্চয় করিয়া অবাধে শিক্ষিত দলের বর্ত্তমান প্রতিকূলতা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইবে।

আমরা এখানেই থামিব তাহা নয়, আরও অগ্রসর হইয়া দেখিব। এই পুনরুত্থানের দিনে উত্থান-ধ্বজী শিক্ষিত মহাশয়েরা পাশ্চাত্য আচার্য্যের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সকল নাড়িয়া চাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান মত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের সমাজের অতি নগণ্য আচার ব্যবহারের পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক, মিশ্র বৈজ্ঞানিক মিশ্রামিশ্র বৈজ্ঞানিক নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া লইতেছেন। আমরা পাশ্চাত্য আচার্য্যদের কোনও একটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা আমাদের উপনীত সিদ্ধান্তের সত্যতা মাত্র দেখাইতে যাইতেছি। পাশ্চাত্য আচার্য্যেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জীবন সংগ্রামে ক্ষমবানের স্থিতি ও অক্ষমের বিনাশ নিশ্চয়। জীবনসংগ্রামে যাহা জীবনের অভাব দূর করিতে পারিবে না তাহার ক্ষয় ও যাহা পারিবে তাহার স্থিতি নিশ্চয়,—একথা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও সত্য যে এই যুগসংগ্রামে এ যুগের অভাব কি ধর্ম্মনৈতিক, কি সমাজ নৈতিক, কি রাজ নৈতিক সর্ব্বপ্রকারের অস্বাভাবিক বৈষম্য যে সকল সমাজ দূর করিতে পারিবেনা তাহাদের পরাজয় ও যে সমাজ পারিবে তাহার জয় ধ্রুব নিশ্চয়। প্রথমে বলিয়া আসিয়াছি অস্বাভাবিক বৈষম্যের বিনাশ, এই যুগভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অক্ষয় কবচ রূপে গাত্রে ধারণ করিতেছে। যুগভাব প্রভাবে প্রভাবশালী ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর ও মানবের, ইংরেজ ও দেশীয়ের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পুরুষ ও রমণীর অস্বাভাবিক বৈষম্য দূর করিতে যেমন ক্ষমবান্ যেমন উপযোগী অপর কোনও ধর্ম্মসমাজ তেমন ক্ষমবান্ তেমন উপযোগী হওয়া দূরের কথা, আদবেই যুগাভাব মোচন করিতে চাহে না সুতরাং ব্রাহ্মসমাজই যুগাভাবমোচনে এক মাত্র ক্ষমবান্ সমাজ এবং ইহার জয়ও ধ্রুব নিশ্চয়।

আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি ব্রাহ্ম সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জল আলোকমণ্ডিত, দেখিয়া কিরূপে অন্যথা বিশ্বাস করিব, ভগবৎ কৃপায় চক্ষুষ্মান হইয়া কিরূপে অন্ধদের কর্ত্তৃক নীত হইব, তাহাদের ন্যায় ভ্রমাচ্ছন্ন, সন্দিহান ও নিরাশাগ্রস্ত হইব? ভ্রমাচ্ছন্নেরা ভ্রমমুক্ত হউন, সন্দিহান আত্মারা সংশয় পরিত্যাগ করুন, নিরাশাগ্রস্তেরা আশান্বিত হউন। ব্রাহ্ম সমাজের জয় হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। এ যুগে স্বর্গরাজ্য স্থাপনার্থ ব্রাহ্মসমাজ বিধাতা কর্ত্তৃক বৃত। ব্রাহ্মসমাজ যুগবিধি, বিধির বিধি। যদি রাখে বিধি, মারে কে?

সমালোচনা।

(প্রাপ্ত)

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা। শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত।

মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্ম-বিদ্যাকে আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, কিন্তু তিনি আত্মপ্রত্যয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কোন সন্তোষ জনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই; "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" লেখক দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মজগতের মূল সত্য সকল কেবল ব্রহ্মবিদ্যার নহে, বিদ্যা মাত্রেরই অর্থাৎ জ্ঞানের ভিত্তি এবং উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব। লেখকের সঙ্গে আমাদের এবিষয়ে সম্পূর্ণ এক মত। আমাদের মনে হয় যে হিউমের পর আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে এই স্থান ভিন্ন অন্য স্থান গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। সন্দেহ অতি বিষম শত্রু। যেখানে পরিত্রাণ ও পরকালের কথা, সেখানে যদি সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও থাকে, তাহা হইলে বিপদ, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা অথবা ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তি স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়কে সেই স্থানে সন্নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য যেখানে সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। স্ববিরোধীতার অভাবই সেই স্থান।

অধ্যাপক বেনও একথা স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল সত্য অস্বীকার করিলে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইতে হয় এবং জ্ঞানের সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, সেই সকল সত্য-বীজ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা তরুর উৎপত্তি দেখাইয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে সীতানাথ বাবু কেশব বাবু অপেক্ষা উচ্চতর ও নিশ্চয়তর স্থানে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কেশব বাবুর জীবনের পূর্ব্বভাগে তাঁহার যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যে তিনি প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" লেখক দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতিবাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপন করিতে গেলে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট এবং অজ্ঞেয়তাবাদ ও জড়ের অনাদিত্বে উপনীত হইতে হয়। এবিষয়েও আমাদের লেখকের সঙ্গে একমত। আমাদের বিশ্বাস, যে বার্কলির পর প্রকৃতিবাদের উপর জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। হার্বার্ট স্পেন্সারের মত পণ্ডিতও ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। পুস্তকের ৫৮ হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে পাঠকদিগকে আমরা তাহা

বিশেষরূপে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃতিবাদী পদে পদে স্ববিরোধিতা জালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। অনুভবের উৎপত্তির কারণের জন্য প্রকৃতিবাদী একটি জড়বস্তু কল্পনা করেন, অথচ বলেন উহা অজ্ঞেয়। এখন প্রশ্ন এই, যদি উহা অজ্ঞেয় তবে উহাকে অনুভবের কারণ বলিয়া কিরূপে জান? যখন উহাকে জানিতেছ, তখন উহা জ্ঞেয় বস্তু; অথচ প্রকৃতিবাদী উহাকে অজ্ঞেয় বলিয়া প্রচার করেন। হার্বর্ট স্পেন্সার স্বীকার করেন যে এক মহাশক্তি জগতের কারণ রূপে বর্ত্তমান, অথচ বলেন যে উহা অজ্ঞেয়। ইহাতে সহজেই এই প্রশ্ন উঠে, যে যদি সেই কারণ অজ্ঞেয়, তবে তাহাকে কারণরূপে, শক্তিরূপে কিরূপে জানিলে? যখন শক্তি বলিতেছ তখন অন্ততঃ সেই কারণের শক্তিত্ব গুণ জ্ঞাত হইয়াছ। আর একটী কথা, যখন এই অনুভবাদির যথেষ্ট কারণ আত্মা, তখন দ্বিতীয় কারণ কল্পনা করার প্রয়োজনাভাব। বাস্তবিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অজ্ঞেয়তাবাদ অতি অসার বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়ই বিশেষ মূল্যবান। উহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি পুস্তকের আকার বিবেচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দুই অধ্যায়ে লেখক নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন "আমরা দেখাইয়াছি যে ঘটনা-প্রবাহ অনাদি অনন্ত, এবং এই অনাদি অনন্ত ঘটনা-প্রবাহ এক অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হয়। এই অদ্বিতীয় জ্ঞানই তাঁহার সংযোগকারিণী শক্তিতে এই অনাদি অনন্ত ঘটনা-প্রবাহকে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; এবং ঘটনা অস্থায়ী প্রবাহশীল হইলেও সমুদায় ঘটনার জ্ঞান নিত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া নিত্যজ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া স্থায়ীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আরও দেখাইয়াছি যে এই নিত্য জাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আংশিক ভাবে প্রবাহিত হইয়াই আমাদের জীবন সংগঠিত হয়। পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ, জীবনাধার।"

ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যদি কেহ দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা বিশেষরূপে বাধিত হইব। ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ববিদ্যার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা তৃপ্তিকর ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বর কিরূপে এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ আপনার মধ্যে উৎপন্ন করেন, এবং কিরূপেই বা পূর্ণ পরমেশ্বর অপূর্ণরূপে জীবের প্রাণে প্রকাশিত হন, উল্লিখিত ব্যাখ্যা তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা উক্ত ব্যাখ্যা যখন জ্ঞানতত্ত্বের সকল প্রশ্নের শ্রেষ্ঠতর মীমাংসায় আমাদিগকে লইয়া যায়, তখন উহাই অবলম্বন করা যে যুক্তিযুক্ত ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন না।

এখন পাঠক দেখুন, যে এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের সাধনের কত নিকট সম্পর্ক। যে ব্যাখ্যা আমাদিগকে সাধনের নিকটবর্ত্তী করে, যে ব্যাখ্যা ব্রহ্মের স্বরূপ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদিগের প্রাণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করে সেই ব্যাখ্যাই আমাদের যত্ন করিবার বস্তু। আমরা ঈশ্বরকে প্রাণস্বরূপ বলি, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাণস্বরূপ কথার কথা নহে, উহার প্রত্যেক বর্ণ জলন্ত ও জীবন্ত সত্য। আমরা ব্রহ্মের আশ্রিত, আমরা ঘুমাইলে চৈতন্যরূপিণী বিশ্বজননী জাগিয়া থাকিয়া আমাদের চৈতন্য রক্ষা করেন, আমরা তাঁহারই ক্ষুদ্র প্রকাশ, আমরা পিতার পুত্র, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সকল কথা বেশ সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের মতে এই পুস্তকের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সীতানাথ বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী। যত দিন যাইবে, ততই ব্রহ্মবিদ্যার আদর বাড়িবে, এবং ব্রহ্মবিদ্যার আদরের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'রও আদর বৃদ্ধি হইবে। এই পুস্তক প্রত্যেক ব্রাহ্মের হস্তে দেখিলে আমরা সুখী হইব। আশা করি লেখক 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ভবিষ্যতে বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

খাসিয়া পর্ব্বতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

অনেক দিন হইতে এই পাহাড়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম তৃষ্ণা উদ্দীপিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতবাসী পুরুষ ও রমণীগণ দিন দিন শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত হইতেছেন। ইহাদের শিক্ষার জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য খ্রীষ্টিয় পাদ্রীগণ গ্রামে গ্রামে ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া ইহারা ডিম ভাঙ্গিতেছে, বহুকাল ধরিয়া খ্রীষ্টের পূজা করিতেছে তথাপি ইহাদের ধর্ম্মতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আর খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

ইহাদের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতি আছে সত্য। ইহারা ডিম ভাঙ্গিয়া কুক্কুটাদির উদর পরীক্ষা করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করে সত্য। সত্য ইহারা রোগ শোক প্রেরণকারী দুষ্ট অপদেবতাদিগকে শোণিত প্রভৃতি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু খাসিয়াগণ নিরীশ্বর নহে। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আদিম কাল হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে "উব্লেই বা পাও" এক ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল খাসিয়া ঐ সকল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেছেন। এবং প্রবর্ত্তিত ত্রিত্ববাদের সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না তাই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? বলিতেছেন এক ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা আমরা জানি। এমন ধর্ম্ম কি নাই যাহা আমাদিগকে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেই এক প্রভুর পূজা করিতে শিক্ষা দেয়? সেই পবিত্র ধর্ম্ম কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাঁহার অনন্ত শক্তি ইহাদের মনে এই চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, যাঁহার অদৃশ্য হস্ত ইহাদিগকে ভাবি উন্নতির পথে টানিয়া লইল তাঁহার মহিমা গৌরবান্বিত হউক, তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক।

তাঁহার করুণায় আজি তিন বৎসরের অধিক হইল মৌথার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহ ছিল না তাঁহারই করুণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বৎসরেক এই সমাজের কার্য্য অতি উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল অবশেষে নূতন উদ্যম নূতন উৎসাহ চলিয়া গেল। লোকে বলিল আর বুঝি মৌথার ব্রাহ্মসমাজ টেঁকে না। এই রূপে ব্রাহ্মগণ অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধ জীবিতাবস্থায় সেই জীবন্ত জাগ্রত মহান্ প্রভুর কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই রূপ মৃত ভাব আর কত দিন থাকে? মানুষ কি আর চিরকাল মৃত থাকিতে পারে? শুভক্ষণে উৎসব আসিল সকলে প্রাণে প্রাণে মিশিলেন। মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত হইল। সকলেই মনে করিলেন, "তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা সাধিব।" ইতি মধ্যে শেলা, চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সমুদায় খাসিয়া ভাষায় লিপিবদ্ধ করতঃ মুদ্রিত করিয়া এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। বোধ হয় ইহা দ্বারা তাহাদের জানিবার আকাঙ্খা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মগ্রহণোদ্যত খাসিয়াগণ সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতেছেন কোন্ পথে যাই। খাসিয়াধর্ম্মাবলম্বী কি যাহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নহেন তাঁহারা ভাবিতেছেন ইহার কোনটী অবলম্বনীয়। ইহাদের মধ্যে এক চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এমন সুসময়ে কে জড় ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? কোন্ ব্রহ্মোপাসকের মনে আনন্দ ও উৎসাহের উদয় না হয়? তাই ব্রাহ্মবন্ধুগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিলঙস্থ ব্রাহ্ম সাধারণ এবং ব্রাহ্মসমাজের শুভানুধ্যায়ীগণ ও শিলং ব্রাহ্মসমাজ একত্রিত হইয়া মৌথার ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী কার্য্যকারী সভা(Working Committee) গঠন করিলেন। এই সভা মৌথার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ও এই পর্ব্বতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিবেন। কার্য্য সুশৃঙ্খলার জন্য এই সভা পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—

১। পুস্তক প্রকাশ কমিটী (publication Committee) ইহারা খাসিয়া ভাষায় পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিবেন, অন্যের প্রণীত পুস্তকাদি এই কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশের উপযুক্ত কি না বিচার করিবেন। এবং পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ জন্য অর্থ সংগ্রহ কি অন্যান্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন; ইহার সভ্য সংখ্যা ৯ জন। সম্পাদক বাবু তরিণীচরণ নন্দী ও বাবু বজেন্দ্রনাথ সেন।

২। উপাসক মণ্ডলী সভা (Congregation Committee) ইহারা মৌথার ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ উপাসনা হইবে, কে কোন দিবস উপাসনা করিবেন, উপাসক মণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহা ও যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা কি গোলযোগ না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। সভ্য সংখ্যা ৯ জন। সম্পাদক বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী ও বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস।

৩। প্রচার সভা (Preaching and visitation Committee)। ইহারা নিকটস্থ গ্রাম সমূহে এবং বন্ধোপলক্ষে এই পর্ব্বতস্থিত অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে প্রচারার্থ গমন করিবেন অথবা লোক নিযুক্ত করিয়া দিবেন। সভ্য সংখ্যা ৬ জন। সম্পাদক বাবু গিরীশচন্দ্র দাস ও বাবু রাজকুমার নন্দী।

৪। লিপি সভা অর্থাৎ পত্র লেখা সভা (Correspondence Committee) যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহারা চিঠি পত্র লিখিবেন। লোকদিগের ধর্ম্ম মত জিজ্ঞাসা করিবেন। এবং যাবতীয় চিঠি পত্রাদি ইহারা লিখিবেন। সভ্য সংখ্যা ৬ জন। সম্পাদক বাবু যবসলমন (খাসিয়া পত্র লেখক) বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বাঙ্গালা পত্র লেখক) বাবু গিরীশচন্দ্র দাস (ইংরেজী পত্র লেখক)।

৫। রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সভা (Sunday Class Committee)। ইহারা প্রতি রবিবারে মৌথার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সভ্য সংখ্যা ৪ জন। সম্পাদক বাবু শিবনাথ দত্ত ও বাবু মথুরানাথ নন্দী। এই পাঁচটী বিভাগ লইয়া মৌথার ব্রাহ্মসমাজের Working Committee গঠিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও বাবু তারিণীচরণ নন্দী।

শুধু বড় বড় নাম দিয়া সভা গঠন করিলেই তো হয় না, কাজ করা চাই। সেই জন্য Working Committee (কার্য্যকারী সভা) স্থির করিলেন Good Friday উপলক্ষে তিন দিন ছুটী, সেই সময় চেরাপুঞ্জি যাইতে হইবে। শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি ৩৩ মাইল, তিন দিনের মধ্যে এই রাস্তা হাটিয়া যাওয়া আসা এবং সেখানে কাজ করা সহজ কথা নয়। তথাপি ইহারা যাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। খাসিয়া ও বাঙ্গালীতে ২০ জন লোকের যাওয়া স্থির হইল। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৭ই এপ্রেল বুধবার সন্ধ্যার পর মৌথার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। বাবু শিবনাথ দত্ত ইঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বাবু সর্ব্বানন্দ দাস সেই দিন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ইত পূর্ব্বেই কয়েক জন খাসিয়াবন্ধু চেরাপুঞ্জিতে উপাসনাদি করিবার ও এখান হইতে যাঁহারা যাইবেন তাঁহাদের থাকিবার স্থান নির্ণয় করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতিবার শিলং ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সকলে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চেরাপুঞ্জি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার রজনী সমাগত প্রায়। এমন সময় এতগুলা লোক উৎসাহে মাতিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকল বন চারিদিগে সোঁ সোঁ করিতেছে। কোথায়ও বা নির্ঝরিণী ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে কোথায়ও বা জলপ্রপাতসমূহ গভীর গর্জ্জনে শিলা খণ্ডে পতিত হইতেছে। অন্ধকার বই আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। কাকু পক্ষী সুমিষ্ট স্বরে কা—কু, কা—কু বলিয়া গান করিতেছে, আর তাঁহাদের প্রাণে কি এক আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিতেছে, কি এক চিন্তার উৎস প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। তাঁহারা অন্ধকার ভেদ করিয়া এক সরাই গৃহে উপস্থিত হইলেন। আহারাদি করিতে রাত্রি সাড়ে এগারটা হইল।

সম্মুখে আরও অনেক রাস্তা রহিয়াছে, রাত্রিতে না চলিলে আর গন্তব্য স্থানে সময়ে পৌছিতে পারা যাইবে না। এই ক্ষণই চলিতে হইবে। কিন্তু মুটেগণ পুঞ্জিতে (গ্রামে) চলিয়া গিয়াছে; কে ইহাদিগকে খবর দেয়? পুঞ্জি সরাই গৃহ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার উপর পর্ব্বত। ইহার অপর পার্শ্বে এক গহ্বরের নিকট পুঞ্জি। চারিদিক বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, স্তূপাকারে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল পর্ব্বত পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। অপ্রশস্ত রাস্তা একটী গর্ত্তের ধার দিয়া কখন বা উচ্চদিকে কখন বা নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। এক পা সরিলেই আর নিস্তার নাই। দুইজন লোক এক খাসিয়া পথ প্রদর্শক সহ গ্রাম হইতে তাহাদিগকে লইয়া রাত্রি দেড়টার সময় সরাই গৃহে উপস্থিত হইলেন। খাসিয়া রমণী আসিবার সময় তাহার সুসুপ্ত শিশু সন্তানকে এই গভীর রজনীতে ডাকিয়া বলিয়াছিল "সন্তান সন্তান আমি চেরাপুঞ্জি যাইতেছি। তোমার জন্য কি আনিব। তুই আমার ধন, আমার সহস্র, আমার লক্ষ আমার কোটীধন তুই, তোর জন্য কি আনিব।" আহা এইরূপ মাতৃ-স্নেহ দেখিয়া জগজ্জননীর স্নেহ কে ভুলিতে পারে? রাত্রি দুইটা বাজিয়া ২০ মিনিট হইল, সকলেই রওনা হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জিনিষ পত্র বান্ধা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। দুঃখের পর সুখ, রোগের পর আরোগ্য, অন্ধকারের পর জ্যোৎস্না কাহার না ভাল লাগে? শুভ্র চন্দ্রালোক পর্ব্বতের শিখরে শিখরে কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জ্যোৎস্নালোক ভেদ করিয়া তিন বার উচ্চারিত হইল,—ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। সেই গভীর শব্দ তিন বার পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, গহ্বরের কোটরে কোটরে, অরণ্যানীর মধ্যে মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহারা যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। সুস্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। কেহ বা অনিদ্রায় কাতর, কাহারও বা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কাহারও আর পা চলে না। কিন্তু গন্তব্য স্থানে যাইতেই হইবে। ধীরে ধীরে চলিয়া সেই দিন সাড়ে চারিটার সময় তাঁহারা চেরাপুঞ্জিতে পৌছিলেন। রাস্তা হইতে কয়েক জন তাঁহাদিগকে পুঞ্জিতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাবু হীরামণি রায় প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু তাঁহাদের থাকিবার ও উপাসনাদি করিবার জন্য দুই খানা ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিলং হইতেই শেলাস্থ বন্ধুদিগকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা ও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, এক জন বাড়ীতে পীড়িত আত্মীয়কে ফেলিয়া এই ১৪।১৫ মাইল দূরে আসিয়াছিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সকলে উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। বাবু যবসলমন সেই দিন উপাসনার কার্য্য করেন ও তৎপরে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি কি" বিষয়ে এক সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। তৎপরে বাবু গিরীশ চন্দ্র দাস তাঁহাদের আগমনের কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন এবং চেরাপুঞ্জিস্থ বন্ধুগণ যে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। সেই সভার পরদিনের কার্য্য প্রণালী বিজ্ঞাপিত হইলে রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিন প্রভাতে সকলে উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইলে বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু তারিণী চরণ নন্দী উপাসনা করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সমুদায় ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সমাগত বন্ধুদিগের সহিত কিছুকাল ধর্ম্মালাপের পর প্রায় ১১টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর শেলাস্থ বন্ধুগণ পুনরায় বাসায় আগমন করিলে তাঁহাদের সহিত তথায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক আলাপ হয়। ১২টার পর পুনর্ব্বার আলোচনা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পৌত্তলিকতা, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, অবতারবাদ, বিবেক, আত্মা এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ওব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা হয়। সমাগত লোকদিগের মধ্যে চেরাপুঞ্জির ভাবি রাজা ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী কয়েক জন খাসিয়া বন্ধু ছিলেন। চারিটার পর এই সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। রাত্রি ৬টার সময় পুনরায় সকলে সভাগৃহে আগমন করিলেন। সভাগৃহ পুনরায় লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিছু কাল সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের পর রাত্রি ৭॥টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু রাধন সিং উপাসনার কার্য্য করেন; তৎপরে বাবু তারিণীচরণ নন্দী "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা পাঠ করেন এবং বাবু রাধন সিং "আমরা কেন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করি" এই সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

উপাসনান্তে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ চেরাপুঞ্জিস্থ বন্ধুদিগের আগ্রহ ও উৎসাহ এবং তাঁহারা যে শিলঙ্গস্থ বন্ধুদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে বাবু গিরীশ চন্দ্র দাস সভাকে অতি সুখের সহিত জানান যে বাবু কৃষ্ণধন রায়, বাবু জয়কিশোর, বাবু কুসিং ও বাবু জন রবার্ট ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা গেলাপুঞ্জিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবেন, তথায় তাঁহাদের সহিত আরও ১৪ জন লোক যোগ দিবেন। এবং মৌস্মাইস্থিত বাবু সিমিয়ন দুই মাস পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এই দুই মাস কাল তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন। ইঁহাদের সকলেই অনেক দিন হইতে একেশ্বরবাদই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ছিলেন। মৌসমাই স্থিত সিমিয়ন গত দুই মাস যাবৎ নিজ গ্রামে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন। বাবু শিবচরণ রায় উপরোক্ত দুই বন্ধুর বাক্যের সারাংশ খাসিয়া ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

এই রূপে রাত্রি ১১টার পর সভা ভঙ্গ হইল। খাসিয়া বন্ধুদিগের সহিত আলাপ ও আহারাদি করিতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। পর দিন প্রত্যুষে সকলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বৃষ্টিস্থান চেরাপুঞ্জি ছাড়িয়া চলিলেন এবং রাত্রি নয়টার সময় শিলং ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপস্থিত হইলেন তথায় বন্ধুগণ

তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ দিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

এক উদ্দেশ্যে এক কার্য্যের জন্য এত গুলি লোকের মিলন কি আশাপ্রদ নহে? ইঁহাদের এক প্রাণতা কষ্টসহিষ্ণুতা ও উৎসাহ দেখিয়া কি মৃত প্রাণেও আশার সঞ্চার হয় না? ভগবান ইঁহাদের মঙ্গল করুন।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ! এখন আপনাদের সাহায্য ভিন্ন এ কাজ চলিবে কিরূপে? আপাততঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ও ব্রাহ্মধর্ম্মনীতি বিষয়ক তিন খানা পুস্তক খাসিয়া ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। খাসিয়া ভাষায় এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অর্থাভাবে কি এই সকল মুদ্রিত হইবে না? মৌখার ব্রাহ্মসমাজ গৃহ জীর্ণ হইয়াছে। অর্থাভাবে মেরামত না হইলে এই বর্ষাতে হয়ত ইহা ভূমিসাৎ হইবে। এমন সময় কি আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই সকল সৎ কার্য্যে আপনাদের সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে গত ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে আমি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। গত ১লা ও ১৬ই চৈত্রের উক্ত পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন তাহার উত্তর দিয়াছেন। বোধ হয় অল্প দিন মাত্র হইবে, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা হইয়া থাকিবে এবং সেই জন্যই তিনি ব্রাহ্মদিগকে অন্ধ বিশ্বাসী বলাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; কেন না তিনি হয় তো এখনও ব্রাহ্মদিগের ভিতরের সকল সংবাদ জানেন না। আজ ৩২ বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংস্রব রাখিয়া আমি ইহাই জানিয়াছি যে অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বীরা যেরূপ, ব্রাহ্মেরাও সেইরূপ অন্ধ বিশ্বাসী; আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত হইতে হইলে অন্ধবিশ্বাসী হইতেই হইবে। অন্ধ বিশ্বাস হইতে যিনি যত মুক্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর ভক্তি হইতে তিনি তত চ্যুত হইয়াছেন—ইহা কুতর্কের কথা নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব ব্রাহ্মদিগকে অন্ধ বিশ্বাসী বলাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাই, ব্রাহ্মদিগের গৌরবেরও খর্ব্ব হয় নাই। অন্ধ বিশ্বাসী কথাটী কুঞ্জ বাবুর সহ্য হয় নাই, কিন্তু আমার পত্রের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি কেবল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ২।১টী মূল সত্যে আঘাত করিয়াছেন এমন নহে কিন্তু তিনি নিজেই আগাগোড়া অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। সে সকল কথা এখন থাকুক। কুঞ্জ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, "এই সামান্য চিঠিতে উক্ত গুরুতর বিষয় গুলির ব্যাখ্যা বিষদরূপে করা অসম্ভব সুতরাং তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।" কেবল কুঞ্জ বাবুর মুখে নহে, কিন্তু অনেক প্রবন্ধ লেখক ও গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মুখেই একথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করি উক্ত গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে বৃহৎ পত্র, বৃহৎ প্রবন্ধ অথবা বৃহৎ পুস্তক লিখিতে তাঁহাদিগকে মাথার দিব্য দিয়া কে বারণ করিয়াছে? আজ কাল ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকেই সন্দেহ জাল বিস্তারিত হইয়া ধর্ম্ম জগতে মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। তাঁহাদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে বৃহৎ পুস্তকাদি লিখিয়া তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সেই সন্দেহ দূর করিতে অগ্রসর না হন কেন? কাজে কিছুই পারিব না, অথচ নিজের অক্ষমতা স্বীকারও করিব না, মধ্য হইতে ক্ষুদ্র পত্র, ক্ষুদ্র পুস্তকের দোহাই দিয়া সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিব—এ বড় অন্যায় ও অসঙ্গত কথা! সে যাহা হউক, এখন আসল বিষয় সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

(১) মন ও আত্মা। কুঞ্জ বাবু এ উভয়কে এক বলিয়াও আমাদের নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলিকে মন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে আত্মা বলিয়াছেন। আত্মার এরূপ নাম বিভাগে কাহারও তত আপত্তি না থাকিলেও তত্ত্ববোধিনীর প্রস্তাবলেখক যে বলিয়াছেন শরীরের ধ্বংশে মনেরও ধ্বংশ হইয়া থাকে—একথাতে নিশ্চয়ই অনেকের আপত্তি আছে। আমিও এই কথারই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম; কিন্তু কুঞ্জ বাবু এবিষয়ে একেবারে নীরব হইয়াছেন। শরীর ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও ধ্বংশ হয় যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এই সংসারই কুপ্রবৃত্তি সকলের লীলা খেলার ভূমি, শরীরের পরিচালনা দ্বারা আমরা এই সংসারে কুপ্রবৃত্তি সকলের পরিচালনা করিতে সক্ষম হই সুতরাং শরীরের ধ্বংশে কুপ্রবৃত্তির অর্থাৎ তাহাদের আধার মনেরও ধ্বংশ হইয়া থাকে। একথা ঠিক নহে। শরীর ধ্বংশে যদি কুপ্রবৃত্তির ধ্বংশ হয় তবে সুপ্রবৃত্তি সকলেরও ধ্বংশ হয় বলিতে হইবে। আমরা শরীর অবলম্বন করিয়া যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পরিচালনা করি, সেইরূপ সেই শরীর অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল পরিচালন করিতে সক্ষম হই। শরীর শূন্য নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কার্য্য যেরূপ, শরীর শূন্য উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কার্য্যও সেইরূপ, কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই। এসম্বন্ধে যিনি যাহা বলেন তাহা জ্ঞানমূলক নহে সত্যমূলক নহে, তাহা কেবল কবির কল্পনার কথা, অন্ধ বিশ্বাসের কথা। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহা যে কোন এক স্থানে অবস্থিতি করে তাহাতে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারেন না। সুতরাং দুই চারি শত আত্মা—বিশেষতঃ বাঙ্গালী আত্মা সকল একত্রে থাকিবে অথচ কুপ্রবৃত্তির পরিচালনা অর্থাৎ পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ, দ্বেষ হিংসা করিবে না ইহা একেবারেই অসম্ভব কথা! অসত্য কথা!!

(২) পশুদিগের আত্মা আছে কি না? আর মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? কুঞ্জ বাবু পশুদিগের আত্মা আছে স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন যে, তাহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি থাকা না থাকা, তাহাদের উন্নতি আছে কি নাই এবিষয়ের মীমাংসা না হইলেও মনুষ্যের ধর্ম্ম সাধনের কোনও প্রকার ব্যাঘাত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বিষয়ের মীমাংসার উপর মনু-

ষ্যের পুনর্জন্ম হওয়ার মীমাংসা যে অনেক পরিমাণে নির্ভয় করিতেছে, তাহা বোধ হয় কুঞ্জবাবু প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। তিনি যখন পশুদিগের আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার ক্রমশঃ উন্নতি স্বীকার করিয়াছেন, তখন ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে তাহারা যে কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য জন্ম এবং পুনর্ব্বার কর্ম্ম দোষে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমে পশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সৃষ্টির ক্রমশঃ উন্নতি হওয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল্যবান সত্য। মনুষ্য আত্মা অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইবে, আর পশু আত্মা জন্ম ও মৃত্যু হইয়াই একেবারে রসাতলে যাইবে, নিতান্ত অন্ধ না হইলে, নির্ব্বোধ না হইলে কেহ একথা মুখে আনিতে পারেন না। তুমি আমি সকলেই এক সময়ে পশু ছিলাম এবং পশু হইতে ক্রমে মনুষ্য হইয়াছি। গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া, অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে। কুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন আত্মার পুনর্জন্ম হওয়া অসম্ভব কেন না হিন্দু দর্শনকারগণ তাহা স্বীকার করেন না। হিন্দু দর্শনকার স্বীকার করেন না—অতএব প্রমাণ হইল যে মনুষ্যের পুনর্জন্ম নাই !! এই উনবিংশ শতাব্দীতে যিনি একথা বলিতে পারেন, ব্রাহ্মদিগকে অন্ধবিশ্বাসী বলাতে তাঁহার বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। সে যাহা হউক আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুদর্শনকারগণ সত্যসত্যই কি মনুষ্যের পুনর্জন্ম স্বীকার করেন নাই ? সত্যসত্যই কি হিন্দু শাস্ত্রে মনুষ্যের পুনর্জন্মের কোন কথার উল্লেখ নাই ? আমি বলিতেছি হিন্দু দর্শনকারগণ তাহা স্বীকার করিতেন এবং আমার একথা প্রমাণের জন্য আমি হিন্দু শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—যথা, "অনেক জন্মভজনাৎ স্ব বিচারং চিকীর্ষতি। বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং সিধ্যতে স্বয়ম্॥" (পঞ্চদশী) "সাধক অনেক জন্ম পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া আত্মতত্ত্ব বিচারে রত হন। আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা মোহ নষ্ট হইলে দেখ মনুষ্যাদি উপাধি বিনষ্ট হয়। তখন তিনি নিত্য শুদ্ধ রূপে অবস্থিতি করেন।" "সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতি জ্ঞানম্।" (পাতঞ্জলদর্শন) "সংযম দ্বারা যখন চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ভূত হয় তখন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়।" "নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা, সমাধিসগচ্ছতি, শত জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি- জ্ঞান সঙ্কলনী তন্ত্র।" "যিনি নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কালও সমাধিযুক্ত হন তাঁহার শত জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়।" আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমার কথা, হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধির ঝুলি বিশেষ ইহাতে যাঁহা খুঁজিবে তাহাই পাওয়া যাইবে। কুঞ্জ বাবু এক স্থলে বলিয়াছেন যে, হিন্দু ও ব্রাহ্মের ইহা এক মত যে, আত্মা একাধিক বার জন্মগ্রহণ করেনা, তবে হিন্দুরা আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ স্বীকার করেন, ব্রাহ্মেরা তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু হিন্দুরা যে আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ স্বীকার করেন তাহা আমি উপরে প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি, আমার পূর্ব্ব পত্রে কি অর্থে পুনর্জন্ম কথা ব্যবহার করিয়াছি কুঞ্জ বাবু একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি নিজে উহার যে কি অর্থ করেন তাঁহার কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। যাহা পূর্ব্বে কিছু ছিল না, পরে হইল ইহাকেই যদি তিনি জন্ম বলেন, তবে তিনি ইহা জানিবেন যে, কেবল শরীরের নহে, আত্মারও পুনঃ পুনঃ কেন—একবারও জন্ম হয় না। মৃত্যুর পরে শরীরের পরমাণু সকল যেমন পরমাণু পুঞ্জে মিশিয়া যায়, আবার কতক পরমাণু সেই পরমাণু পুঞ্জ হইতে পৃথক হইয়া নূতন শরীর ধারণ করে, সেইরূপ মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মা অর্থাৎ জ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞান ব্রহ্মে মিশিয়া যায় এবং আবার সময় বিশেষে একটু কণামাত্র জ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞান হইতে (কুঞ্জ বাবুর কথানুসারেই বলিতেছি) পৃথক হইয়া আমাদের আত্মা নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। এখানে যেমন শরীরের, সেইরূপ আত্মারও একবারও জন্ম হয় না প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিক কথা, কি হিন্দু, কি মুশলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান সকল দেশে ও সকল কালে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আত্মার এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করাকেই পুনর্জন্ম বলে। ব্রাহ্মেরা এরূপ পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহাদের নিজের কথার কোন প্রমাণও দিতে পারেন না, তাই আমরা আমাদের পূর্ব্ব পত্রে এবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কুঞ্জ বাবু তাঁহার পত্রে "আত্মাই জ্ঞান" "জ্ঞানই আত্মা" এই প্রকারে তিনি অনেকবার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানই আত্মা কি না সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না কিন্তু তিনি দুইখানি পুস্তকের দোহাই দিয়াছেন, তাহাতে এমন বিশেষ কি যে আছে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। "আমি বলিতেছি ইহা বৃক্ষ, অতএব তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ইহা সত্যই বৃক্ষ।" উক্ত পুস্তক দ্বয়ে ইহার অধিক আর কিছু আছে কি ? সে যাহা হউক, জ্ঞানই যদি আত্মা হয়, তবে জ্ঞানের উন্নতি অনুন্নতি, বৃদ্ধি ও লয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও উন্নতি অনুন্নতি, বৃদ্ধি ও লয় হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে কি না ? বড় জ্ঞানীর আত্মা বড়, অল্প জ্ঞানীর আত্মা ছোট বলিয়া জানিতে হইবে কি না ? প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে জ্ঞানের সকল অবস্থা সমান নহে। গর্ভমধ্যে যখন ভ্রূণ শরীর অবস্থিতি করে তখন জ্ঞানের অর্থাৎ আত্মার কোন চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয় না; শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মার চিহ্ন অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও অর্থাৎ আত্মারও বৃদ্ধি হইতে থাকে, আবার মৃত্যুর ২।১ মিনিট পূর্ব্বে আত্মা আছে বা আত্মার লয় পাইয়াছে তাহা প্রায় ঠিক করিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় শরীরের ধ্বংশে বা রূপান্তরে আত্মাও লোপ প্রাপ্ত হইবে কি না ? এ কথার উত্তর আমাকে কে দিবে ? "শরীর পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা বিশুদ্ধ ভ—একজন করিবে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম পথে ক্রমশ অগ্রসর হইবে।" ইজন লোক কথা ইহা কেবল অন্ধ বিশ্বাসেরই কথা ; বিশুদ্ধ। বল দেখি যুক্তির কথা নহে। আমিও এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ২

আমার ইহাও বিশ্বাস, আমার ন্যায় অন্যান্য ব্রাহ্মেরাও এইরূপ অন্ধ বিশ্বাসই করিয়া থাকেন। 'আমাদের পুনর্জ্জন্ম নাই, যদি থাকিত, তবে আমাদের পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যের কথা স্মরণ থাকিত ব্রাহ্মেরা এই যে এক কথা বলেন, কুঞ্জ বাবু একথাকে মূল্যবান মনে করেন না অথচ তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'আমি' এই জ্ঞান ব্যতীত যখন আমার অস্তিত্ব সম্ভবে না, বর্ত্তমান দেহ পাইবার পূর্ব্বে 'আমি ছিলাম' এই জ্ঞানই যখন আমার নাই তখন পূর্ব্বজন্মবাদীদিগের যুক্তি কি করিয়া সারবান বলিতে পারি?" আমি জিজ্ঞাসা করি' শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রে, বা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, বা ভ্রূণ শরীর মধ্যে আত্মা অবস্থিতি করে কি না? যদি করে, তবে তখন আমাদের আত্মজ্ঞান থাকে না, তখন (আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি) মৃত্যুরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তনের অবস্থায় আমরা একেবারে যে পূর্ব্ব জন্মের কথা ভুলিয়া যাইব, আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুঞ্জ বাবু আমার একথায় কোন উত্তর দেন নাই কেন? কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়ে নিজের সুবিধা মত কথাটীর আলোচনা করিব অথচ অন্যান্য গুরুতর বিষয়গুলি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব-- ইহা ঠিক নহে। পূর্ব্বজন্মবাদীদিগের যে সকল যুক্তি আছে আমরা বিশেষ করিয়া এবারেও তাহার উল্লেখ করিলাম না; যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম নাই বলেন আমরা কেবল এবারে তাঁহাদের যুক্তিরই অসারতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলাম। এবিষয়ে যাঁহার যাহা ব্যক্তব্য আছে এই তত্ত্বকৌমুদীতে তাহা প্রকাশ করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

(৩) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাও মনুষ্যের স্বাধীনতার সমন্বয় করিতে গিয়া কুঞ্জ বাবু অনেক কথাই লিখিয়াছেন কিন্তু তাহার একটীও কাজের কথা বলিয়া বোধ হয় না। "এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে না পারিয়া কেহ বা জীব ব্রহ্ম এক ভাবিয়া ঘোর অদ্বৈতবাদী হইয়া পাপ পুণ্য অস্বীকার করিয়াছেন" কুঞ্জ বাবু একথা বলিয়াও, মুখে দ্বৈতবাদী হইয়াও তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেই অসাবধানে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। সে সকল অবান্তর কথার এখানে কোন বিশেষ উল্লেখ করার তত প্রয়োজন দেখিতেছি না। প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে কুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন যে, "জীব তাঁহারই (ঈশ্বরের) কর্ত্তৃত্বে চলিতে চলিতে কেবল এক একবার এদিক ওদিক মুখ ফেরাইতে চেষ্টা করে—ইহাই তাহার স্বাধীনতা। এদিক ওদিক মুখ ফেরাইতে অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে—এক কথায়, পাপ কাজ করিতে জীবের যে চেষ্টা [illegible]াহাই তাহার স্বাধীনতা! ও হরি! এতদিন পরে তবে [illegible]ক ইহাই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পাপ কাজ করিবার [illegible] জন্যই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি? পাপ কার্য্যের [illegible] ইচ্ছা বা চেষ্টাকেই কি আমাদের স্বাধীনতা [illegible] হইবে? আসল কথা এই, কেবল পাপ কার্য্য করি- [illegible] ই যে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহা নহে, [illegible] কেও স্বাধীনতা বলে না—স্বাধীনতা অর্থে স্ব— [illegible]ায়। আমি আমার নিজের অধীন হইলেই 'আমি স্বাধীন'। আমি কে? না, জ্ঞান প্রীতি, ইচ্ছা। কেবল জ্ঞান, বা কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি, বা কেবল ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাকে স্বাধীনতা বলে না, কিন্তু জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা— এই তিনের সহযোগে, এই তিনের মতে যে কার্য্য করা হয় তাহাকেই আমাদের স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে। যেখানে আমার স্বাধীনতা, সেখানে আমার কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু যে কার্য্য আজ আমি করিব, কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর যখন তাহা জানিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং এক রকম যখন তাহা ঠিক করাই রহিয়াছে, তখন আমি স্বাধীনভাবে কার্য্য কি প্রকারে করিতে পারি? আমার নিজের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার অভিমতে আমি কার্য্য করিতে সক্ষম, একথা কি প্রকারে বলিতে পারি? কোন কার্য্য করিবার সময়ে আমরা যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করি না এমন নহে, আমরা তাহা অনুভব করি কিন্তু রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় হয়, তাহা আমাদের ভ্রম, না হয় ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞ নহেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা অল্প বিশ্বাসী, আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা উভয়ই স্বীকার ও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের ন্যায় ব্রাহ্মেরাও অন্ধ বিশ্বাসী এবং তাঁহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত উপদেষ্টা ও উপযুক্ত প্রচারক নাই বলিয়াই ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজের অধগতি হইতেছে। দুঃখের কথা বলিব কি, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়েরা কতকগুলি অন্ধ মত লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন—তাঁহারা যে সকল ধর্ম্মমতকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা তাঁহারা অন্য কাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না, এবং তাঁহাদের সমাজ মধ্যে এমন কোনও গ্রন্থ নাই যাহা পাঠ করিয়া তাঁহদের ধর্ম্মমত সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সকল কারণেই আমরা অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, ব্রাহ্মদিগকে গালি দেওয়া বা অপদস্থ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কানপুর
২৭শে এপ্রেল ১৮৮৯। } শ্রীভগবতীচরণ দে।

সংবাদ।

ফ্রীপাশ প্রদান;—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের ম্যানেজার তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত রেলপথে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিবার জন্য দুইখানি পাস প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠাইলে মফঃস্বলস্থ মেম্বরগণ এক এক খণ্ড পাইতে পারেন।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জীবন ও মরণ।

জোনাকির আলো আকাশের গায়
জ্বলে মিটি মিটি, পুনঃ নিভে যায়;
এই মৃত্যু, এই জীবন-সঞ্চার;
এই ক্ষীণ আলো, অমনি আঁধার।

ঠিক এই মত জীবন আমারি,
অর্দ্ধ আলো তায়, অর্দ্ধ অন্ধকার;
এই জ্বলে উঠি, এই নিভে যাই;
এই ক্ষণে আছি, পর ক্ষণে নাই।

তোমার আলোক যবে প্রাণে ধরি,
তবে বেঁচে থাকি, নতুবা যে মরি;
কতবার মরি তোমারে ছাড়িয়া,
তব স্পর্শে পুনঃ উঠি যে বাঁচিয়া!

না রবে আঁধার, না রবে মরণ,
পাব নিত্যজ্যোতি,—অমর জীবন;
কবে সেই ভাবে জীবন আমার
করিবে হে নাথ! বল অধিকার?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বৃক্ষ-বাটিকা;—একটী বড় উদ্যান করিতে গেলে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা করিতে হয়। এই বৃক্ষ-বাটিকাতে শিশু বৃক্ষদিগকে রাখিয়া প্রতিপালন করা হয়। সেখানে একদিকে যেমন শিশু-বৃক্ষ সকলকে বাহিরের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা হয়, অপর দিকে যে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে ছায়াতে রাখা হয়; যে শীত সহিতে পারে না, তাহাকে উষ্ণ ঘরে রাখা হয়; যাহার মূল সর্ব্বদা সরস রাখা আবশ্যক তাহার মূল সর্ব্বদা সিক্ত রাখা হয়। এইরূপে বৃক্ষগুলি যখন বর্দ্ধিত, সবল ও পরিপক্ক হয়, তখন তাহাদিগকে লইয়া বাহিরের উদ্যানে প্রশস্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি এই ভাবেই সভ্য সমাজের সকল প্রকার সংস্কার চলিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে বাবসায় সম্বন্ধীয় এক চেটিয়া প্রথা যখন তুলিবার প্রয়োজন হইল, সুপ্রসিদ্ধ কবডেন্ ব্রাইট প্রভৃতি দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ একটী ক্ষুদ্র দল বাঁধিলেন, সেই দলটীর মধ্যে নূতন সত্যগুলি বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা নিরন্তর তাহার প্রচারে ব্যস্ত রহিলেন। ক্রমে ঐ সত্যের বল যখন বৃদ্ধি হইল, তখন তাহা প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে রাজবিধিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। এইরূপ ইংলণ্ড হইতে দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল, কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তি প্রথমে মানবের ভ্রাতৃত্ব রূপ মহাসত্য হৃদয়ে ভাল করিয়া ধারণ করিলেন; তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র দলটীর মধ্যে অতি যত্নে নব সত্য গুলিকে পোষণ করিতে লাগিলেন; সত্যের বল বিক্রম যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন তাহা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইল এবং অবশেষে রাজবিধিকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সুরাপান নিবারিণী সভার কার্য্যও এইরূপ। প্রথমে দুই চারিজন লোক দলবদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের উদ্যোগ ও চেষ্টাতে সত্যগুলি দিন দিন উজ্জ্বল ও প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সত্যটী স্মরণ রাখিলে ইহা আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্রাহ্ম সমাজ ভারত ক্ষেত্রে বৃক্ষ-বাটিকার ন্যায়। যে সকল সত্য উত্তর কালে ভারত সমাজকে নবজীবন দিবে ও নবভাবে গঠন করিবে আমরা সেই সকল সত্যকে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে পোষণ করিব, এই মহৎ কার্য্যে বিধাতা ইহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আবার এক একটী ব্রাহ্ম পরিবার এক একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকার ন্যায়; ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যে সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে পরিবার মধ্যে করিতে হইবে। দেখ ব্রাহ্মদিগের পারিবারিক জীবনের উপর কত দূর নির্ভর করে!

যেখানে শক্তি সেই খানেই দায়িত্ব;—একজন লোক নদীর জলে ডুবিয়া মরিতেছে, কূল দিয়া দুইজন লোক যায়, একজন সাঁতার জানে, অপর জন জানে না। বল দেখি

তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা সম্বন্ধে দায়িত্ব কাহার অধিক? যে সন্তরণ জানে তাহার; কারণ তাহার বাঁচাইবার শক্তি আছে। একজন ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন কাজ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হন, তিনি এই বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, আমিত ভাল ভাবেই কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম, লোকে আমার কার্য্যে বাধা দিল, আমি কি করি, আমি ইচ্ছা সত্বেও কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু, পরিবার সম্বন্ধে ত এরূপ কথা বলিবার যো নাই। মানুষ মনে করিলে আপনার পরিবারকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া গড়িতে পারে; আপনার শিশু সন্তানদিগকে যেমন ইচ্ছা শিক্ষা দিতে পারে; সেখানে তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। সেখানে আপনার ইচ্ছামত কাজ করিবার শক্তি আছে এবং বাধা দিবার কেহ নাই সুতরাং সেখানে আমাদের দায়িত্ব অধিক। এই দায়িত্ব জ্ঞান আমাদের অন্তরে এখনও পরিস্ফুট হয় নাই; সেই জন্য আমরা এই গুরুতর কার্য্যের প্রতি উদাসীন রহিয়াছি।

কোপন স্বভাবের ন্যায় পারিবারিক সুখের শত্রু আর নাই;—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজার রাজ্যে বাস ও সসর্প গৃহে বাস—দুই সমান। সসর্প গৃহে বাস করিয়া এক দণ্ডের জন্য মনে শান্তি থাকে না; নিঃশঙ্ক মনে নিদ্রা যাওয়া যায় না, কখন দংশন করে। নিশ্চয় উদ্বেগের মধ্যে বাস করার ন্যায় যন্ত্রণা আর নাই। কখন দংশন করে, কখন দংশন করে, এই ভয়েই অস্থির থাকিতে হয়। প্রজাপীড়ক রাজার রাজ্যেও সেইরূপ। কাহারও শান্তি থাকে না, কখন কাহার প্রতি অত্যাচার হয়, এই উদ্দেশে কাল কাটাইতে হয়। কিন্তু গৃহস্বামী যদি কোপনস্বভাব ও অত্যাচারী হয়, তবে সে গৃহের সমুদয় পরিজনের পক্ষে সে গৃহে বাস, সসর্প গৃহে বাস, বা প্রজাপীড়ক রাজার রাজ্যে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। রাজা প্রজাপীড়ক হইলে চিত্তে সতত একটা উদ্বেগ থাকে বটে, কিন্তু দিনের মধ্যে এমন অনেক সময় পাওয়া যায়, যখন মানুষ নিজ পরিবার পরিজনের, আত্মীয় বন্ধুর সহবাসসুখে তাহা ভুলিয়া থাকে; কিন্তু কোপন স্বভাব ও অত্যাচারী ব্যক্তির অধীনে বাস করিলে দিন রাত্রির মধ্যে শান্তি থাকে না। এরূপ পুরুষের সংসর্গে অনেক রমণীর জীবন বিষময় হইয়া রহিয়াছে। যদি আমরা কোন ব্রাহ্ম পরিবারে এইরূপ অবস্থা দেখি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মনে হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে নাই। ঈশ্বর কৃপায় যাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে কখনই অত্যাচারী হইতে পারে না। পরিবার পরিজন সকলে তাঁহার সুস্নিগ্ধ ছায়াতে বাস করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গার্হস্থ্য জীবনকে পবিত্র চক্ষে দেখেন, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পরিবারে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে না পারেন, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।

ব্রাহ্ম গৃহে নারীর আদর;—মনু বলিয়াছেন:—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অর্থ—নারীগণ যে গৃহে সমাদর পায়, দেবতা সে গৃহের প্রতি প্রসন্ন হন, আর যে গৃহে নারীগণ সমাদৃত হয় না সেখানকার সকল কার্য্য বিফল। ইহার যে কত গভীর অর্থ তাহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। সামাজিক নীতির ভিত্তি পারিবারিক নীতি; পারিবারিক নীতির ভিত্তি নারীর প্রতি সমাদর। "ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, "যে গৃহে নারীর সমাদর ঈশ্বর সে গৃহের প্রতি প্রসন্ন।" ব্রাহ্ম পরিবার সকলকে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রাহ্ম পরিবার সকল এমন হওয়া চাই যে তাহা দেখিয়া দেশের নারীকুলের মনে এই আশা জন্মিবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত ললনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য আসিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তিকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যে, সে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত করে অথচ স্বীয় পরিবারস্থ রমণীদিগের প্রতি অত্যাচার করে, কিম্বা তাঁহাদের সুখ শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখে না, তবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্ম পরিচ্ছদধারী প্রবঞ্চক। সে ধর্ম্মসাধনের জন্য যাহা কিছু করে সকলই বৃথা। ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করেন না।

ধর্ম্ম সমাজ সংগঠন—ইংলণ্ডের মুক্তিফৌজের সেনাপতি জেনেরল বুথ তাঁহার ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার সময় একটী পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মধু-মক্ষিকারা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে তাহাতে দুই শ্রেণীর মক্ষিকা থাকে। কতকগুলি শ্রমিক মক্ষিকা, তাহারা মধু আহরণ করে, চক্র নির্ম্মাণ করে ও নিরন্তর শ্রমে নিযুক্ত থাকে; আর কতকগুলি মক্ষিকা অলস, তাহাদিগকে ইংরাজীতে "ড্রোণ" বলে। ইহারা কিছুই করে না কেবল বসিয়া অপরের সঞ্চিত মধু আহার করে। সেইরূপ সকল ধর্ম্মসমাজে "শ্রমিক" ও "অলস" দুই শ্রেণীর লোকই আছে। যাহারা শ্রমিক, যাহারা মধু সঞ্চয় করিতেছে, তাহাদেরই নেতা হওয়া উচিত কিন্তু তাহারা নেতা না হইয়া নেতৃত্ব ভার অলসদিগের উপরে যখন পড়ে তখন আর কাজ হয় না। দুই জন লোকের মনে একটা নূতন ভাব আসিল, তাঁহারা কার্য্য করিতে উৎসাহী হইলেন, কিন্তু এক কমিটী আছে, তাহাতে ধর্ম্মভাববিহীন লোক অনেক তাঁহারা সে ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না; সেই দুই জনের কার্য্যের সহায় হইলেন না; সাধু-ভাবটা অন্তরে মিলাইয়া গেল। জেনেরল বুথ বলিয়াছেন—"অপর ধর্ম্ম সমাজের সহিত আমাদের মুক্তিফৌজের এই প্রভেদ যে আমাদের দলে অলস মক্ষিকারা নেতা না হইয়া শ্রমিকগণই নেতা হয় ও অলসদিগকে শিক্ষা দিয়া হয় সমুন্নত করা হয় নতুবা তাহাদিগকে চাক হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দেখিলে এ কথার মধ্যে এই টুকু উপদেশ দৃষ্ট হয় যে, যে ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নেতা না হইয়া, ধর্ম্মভাববিহীন ব্যক্তিগণ নেতা হয়, সে সমাজে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে না; তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে চলে না।

নিরাশা।—কয়েক বৎসর গত হইল এক বণিক ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সমস্ত মূলধন হারাইয়া ফেলেন। দুঃখের ভারে অবসন্ন হইয়া একদিন তিনি পরিবারবর্গের সমক্ষে বলিতেছিলেন—"আমি নষ্ট হইয়াছি, আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি।" তাঁহার পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"না সর্ব্বস্ব নহে, এই যে আমি রহিয়াছি।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল—"আমিও যে রহিয়াছি!" অমনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল—"আমিও আছি; কই বাবা আমাকে ত তুমি হারাও নাই!" তখন তাঁহার পত্নী পুনর্ব্বার বলিলেন—"তোমার শরীর সুস্থ আছে, এবং তোমার বাহুতে কার্য্য করিবার উপযুক্ত বলও আছে।" জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল—"এবং আমিও তোমাকে সাহায্য করিতে পারি।" "বাবা, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার জন্য তোমার পদদ্বয় আছে, এবং সকল বস্তু দেখিবার জন্য দুই উজ্জ্বল চক্ষুও রহিয়াছে"—তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা এই কথা বলিয়া উঠিল। তখন তাঁহার মাতা বলিলেন—"মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর যে আশা দিয়াছেন, তাহাও তোমার রহিয়াছে।" তাঁহার পত্নী আবার বলিয়া উঠিলেন—"আবার ভাবিয়া দেখ সেই করুণাময় দেবতাও তোমার অন্তরেই রহিয়াছেন।" এই সকল কথা শুনিয়া সেই বণিকের প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—"পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি সর্ব্বস্ব হারাই নাই; আমার যাহা আছে তাহার তুলনায় আমি যাহা হারাইয়াছি, তাহা অতি সামান্য।" এই বলিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিলেন এবং ঈশ্বরের করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সকল চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। বিশ্বাসও স্বাবলম্বন বলে যে বলী নিরাশা তাহার জন্য নহে

নিশ্চিন্ত ভাব—সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আপন আপন অবস্থার উন্নতির জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিতে চায় না। সঞ্চয়ের দিকে তাহাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই। অজ্ঞ যদি কিছু অর্থ হাতে পাইল, তবে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিরত হইয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তাহাদের চেতনা হইল। তখন আর দিন চলে না দেখিয়া উৎসাহের সহিত আবার অর্থাগমের চেষ্টা করিতে লাগিল। আবার কিছু দিনের চেষ্টার পর যদি কিছু লাভ করিতে পারিল, অমনি সকল উদ্যমে শিথিল হইয়া নিশ্চিন্ত ভাব ধারণ করিল। এইরূপে হাতে কিছু পাইলেই কতবার তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, এবং কতবার নিজের দোষ দেখিয়া ব্যথিত হয়। তাহাদের জীবনে এইরূপ নিশ্চিন্ত ভাব থাকাতে এবং সঞ্চয়ের দিকে তাদৃশ দৃষ্টি না থাকাতে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ অভাবের মধ্যে পড়িতে হয় এবং তাহাদের অবস্থার কখনই উন্নতি হয় না।

আধ্যাত্মিক জীবনেও আমরা অনেক সময় এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখিতে পাই। আজ জীবন বড় শুষ্ক হইয়াছে, হৃদয় শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, দিন যেন আর চলে না। এই সময়ে এই আধ্যাত্মিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাপ মলিনতা পরিহার এবং সাধন ভজনের দ্বারা প্রাণে প্রেম ও পবিত্রতার বল লাভ করিবার জন্য কত যত্ন করিলাম। পরমেশ্বরের করুণায় কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা সফল হইল, প্রাণে একটু সরসতা পাইলাম, প্রেম ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা একটু জাগ্রত হইল, উপাসনা মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল,—আর অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্তির ভাব আসিয়া দেখা দিল, মনে করিলাম অনেক হইয়াছে, আর ভাবনা কি; আর পাপ প্রবৃত্তি নিকটে আসিতে পারিবে না, আর কিছুতেই পবিত্র পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, আর জীবনে শুষ্ক ভাব আসিবে না। এই ভাবের সঙ্গে সাধন ভজনে শিথিলতা জন্মিল, ধর্ম্ম জীবন গঠনের জন্য যত চেষ্টা ও উদ্যম, তাহাতে উদাসীন হইয়া নিশ্চিন্ত ভাব ধারণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে দুই এক দিনের মধ্যে সেই সরস পবিত্র ভাবটুকু কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুষ্ক কঠোর, মলিন অপবিত্র ভাবের মধ্যে জীবন ডুবিয়া গেল,—আবার পূর্ব্বের মত হাহাকার করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমরা অল্পতে পরিতৃপ্ত হইয়া সাধন ভজনে শিথিল হইয়া পড়ি বলিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দীনতা দূরীভূত হইতেছে না, আমরা ধর্ম্ম-রাজ্যের নিরাপদ স্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিতেছি না, ধর্ম্ম-জীবনে এমন বস্তু লাভ করিতে পারিতেছি না, যাহা পাইলে আর হারাইতে হয় না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন ধর্ম্মজীবনে কখনও নিশ্চিন্ত ভাব অবলম্বন না করি, চিরদিন যেন অদম্য উৎসাহের সহিত সাধন ভজনের পথে অগ্রসর হই, কৃপণ যেমন অল্প ধন পাইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রমাগত ধনসঞ্চয়ের চেষ্টা করে, আমরাও সেইরূপ অল্প প্রেম, পবিত্রতা ও সরস ভাব পাইয়া নিশ্চিন্ত না হইয়া ক্রমাগত এই সকল ভাব সঞ্চয়ের জন্য যেন চেষ্টা করিতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা।

রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রষ্টডীড লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মসমাজ গঠন করা তাঁহার লক্ষ্যস্থলে ছিল না। ভাবে বোধ হয় তিনি এই প্রকার মনে করিয়াছিলেন, যে একেশ্বরবাদ যখন সকল ধর্ম্মের সার, উহার পোষক বাক্য যখন হিন্দুর বেদে, খ্রীষ্টীয়ের বাইবেলে ও মুসলমানের কোরাণে পাওয়া যায়, তখন একেশ্বরের উপাসনার্থ যদি একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমভাবে আসিয়া সেখানে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে পারিবেন। ব্রহ্মপূজাকে অবলম্বন করিয়া যে একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হইবে

তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সেই ভাব ও ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এই উভয়ে কত প্রভেদ! এখনও ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের জন্ম উন্মুক্ত আছে, কাহারও সেখানে প্রবেশের নিষেধ নাই; কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ বলিলে আর সেই মন্দিরকে বুঝায় না; তাহার পশ্চাতে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ও দিন দিন হইতেছে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি করিয়াছেন।

আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার, ইহা সার্ব্বভৌমক ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা মুখে যতই কেন উদারতার কথা বলি না, ফলে আমরা একটী সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে এইরূপ ঘটনা হইতেছে। অনেকে এই বলিয়া ব্রাহ্মদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, যে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছেন, তাহারা হিন্দুদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, হিন্দু সমাজের রীতি নীতিকে ঘৃণা করিয়া থাকেন সুতরাং দূরে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিতেছেন ও দূরে দাঁড়াইতেছেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিয়াছেন কিনা জানি না: কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে একথা কখনই সত্য নহে। তাঁহাদের পক্ষে এই কথাই সত্য যে তাঁহারা বিবেকের অনুরোধে স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অমনি তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বিরোধী হইয়া প্রথমে তাঁহাদিগকে শাসন ও পরে বর্জ্জন করিয়াছেন। এই বিরোধের ভাব হইতেই ব্রাহ্মগণ এক ঘনন্নিবিষ্ট দলে আবদ্ধ হইতেছেন। আমরা দেখিতেছি সম্প্রদায় বদ্ধ হওয়া ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থাতে অপরিহার্য্য। ধর্ম্মের অনুগত হইতে হইলে তাঁহাদিগকে বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতেই হইবে; বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে গেলেই দেশের লোকের সহিত বিরোধ উৎপন্ন হইবে; বিরোধ উৎপন্ন হইলে আত্ম-রক্ষার্থ তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ হইতে হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনীয় মনে করি আর না করি ব্রাহ্মসমাজ একটী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইবে। খ্রীষ্টীয় সমাজ, মহম্মদীয় সমাজ প্রভৃতি সমুদায় সমাজই এই প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই কিছু কিছু নূতন কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ প্রাচীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বিরোধে নবভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে একত্র ঘনন্নিবিষ্ট করিয়াছে। এই রূপেই সকলের জন্ম।

সম্প্রদায় বদ্ধ হওয়াতে বিশেষ দুঃখের কারণ কিছু নাই, বরং ইহাতে সত্যের রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়। বীজ যেমন কোষের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং সেই কোষ যেমন তাহাকে রক্ষা করে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ সত্য-বীজকে রক্ষা ও পোষণ করিবার জন্ম জগদীশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে কোষস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে সকল সত্য কালে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহা অগ্রে এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সাধন করিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজের একটী মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সম্প্রদায়বদ্ধ হওয়া দূষণীয় না হইলেও সাম্প্রদায়িকতা যে নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেম যখন অপরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ আকার ধারণ করে তখনই তাহা সাম্প্রদায়িকতা নামে অভিহিত হয়। ব্রাহ্ম মাত্রেই সৎ ও বিশ্বাসের যোগ্য ও অব্রাহ্ম মাত্রেই ঘৃণিত এই ভাব সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুসলমান ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এমন সাম্প্রদায়িকতা-দূষিত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর প্রচার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মহম্মদ যে তাঁহার ধর্ম্মবিরোধীদিগকে হত্যা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা এই ভাবে যে যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, যে বিশ্বাসী দলভুক্ত হইল না, তাহার জীবনের মূল্য নাই, তাহা রাখিলেও যাহা, বিনষ্ট করিলেও তাহা। যাঁহাদের অন্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাঁহাদেরও অল্পাধিক পরিমাণে এই ভাব।

ইতিমধ্যে অনেকে এই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন যে ব্রাহ্মদিগের অন্তরেও এই ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্ম সমাজ ব্যতীত অন্য কোন সমাজের লোককে হৃদয় খুলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মগণ দিন দিন আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন; কাছাকাছি বসিয়া পরস্পরের মুখ পরস্পরে দেখিতেছেন; পরস্পরের গুণাবলী সমালোচনা করিতেছেন; পরস্পরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে আর কাহারও কোন গুণ আছে কিনা সে দিকে দৃষ্টি নাই; অন্যের গুণ গ্রহণের শক্তি নাই। হিন্দু শব্দটা তাঁহাদের নিকট একটা ঘৃণা সূচক শব্দ হইয়া উঠিয়াছে ইত্যাদি। ব্রাহ্মগণ সাধারণ্যে কতদূর এই অভিযোগের পাত্র তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয় যদি এরূপ ভাব কোনও ব্রাহ্মের মনে থাকে তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প হইবে।

যাহা হউক যাঁহারা আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাঁহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিতেছেন। রঙ্গভূমিতে যাহারা অভিনয় করিতেছে তাহারা যেমন বুঝিতে পারে না যে দর্শকগণের চক্ষে তাহাদের কথাবার্ত্তা ও গতিবিধি কিরূপ দেখাইতেছে, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজরূপ রঙ্গভূমিতে নটস্বরূপ হইয়া যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না তাহাদের কাজ কর্ম্ম কিরূপ দেখাইতেছে। সুতরাং অন্য লোকে যদি মধ্যে মধ্যে আমাদের অবস্থা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন, তাহাতে আমাদের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই, এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িকতারূপ যে ব্যাধি তাহা উন্মাদরোগের ন্যায়, যে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয় সে বুঝিতে পারে না যে তাহার বিচার শক্তির ব্যতিক্রম হইয়াছে; সে মনে করে কেন আমিও বেশ সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছি; ঠিক কথাই বলিতেছি, ঠিক ভাবেই কার্য্য করিতেছি, আমার বুদ্ধির ব্যতিক্রম কোন খানে? সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত ব্যক্তিও বিবেচনা করে, আমিও উদার-

ভাবে সকলকে প্রীতি করিতেছি কাহারও প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই; লোকে আমাকে সংকীর্ণ বলে কেন? এই জন্যই এই রোগটী অতি দুশ্চিকিৎস্য।

সাম্প্রদায়িকতা অহঙ্কারের ন্যায় আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় শত্রু। অহঙ্কার যেরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে অন্তরে নিহিত থাকিয়া প্রকৃত ধর্ম্মভাবকে জানিতে দেয় না। সাম্প্রদায়িকতাও সেইরূপ অল্পে অল্পে হৃদয়কে কলুষিত করিয়া মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের শোভা নষ্ট করে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে মফঃস্বলে যে সকল ব্রাহ্ম বাস করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা সহরের ব্রাহ্মদিগের সাম্প্রদায়িকতার ভাব অধিক হয়, কারণ মফঃস্বলে লোকে অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে বাস করে; সুখদুঃখে তাহাদের সহায় হয়; নানা কারণে সকলের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়। সুতরাং অপরের জীবনে যে কিছু সদ্‌গুণ বা মহত্ত্ব আছে, তাহা দেখিতে পায়; মনে সংকীর্ণ ভাব জন্মিতে পারে না। সহরের ভাব অন্য প্রকার, প্রকাণ্ড সহরে প্রতিবেশীদিগের সহিত লোকের আলাপ পরিচয় হয় না। নিজে ইচ্ছুক হইয়া আত্মীয়তা না করিলে কাহারও সহিত আত্মীয়তা জন্মে না। বিশেষ এখানে সকলেই নিরন্তর কার্য্যে ব্যস্ত, লোকের সহিত আত্মীয়তা করিবার অবসর সম্ভব ও নাই। সুতরাং এখানে যদি মানুষের আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা করিবার একটু সময় হয়, তাহা ক্ষমতাবান্ লোকের সঙ্গেই করিয়া থাকে। লোকে বাড়ী হইতে বাহির হইলেই স্বীয় ভাবাপন্ন লোকের বাড়ীতে যায়; মিশিতে হইলে তাহাদের সঙ্গেই মিশে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে লোকের প্রীতি এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অল্পে অল্পে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে মানুষকে গ্রাস করে।

যে কারণেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হউক না, বিশেষ আত্মদৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও প্রার্থনা পরায়ণতা ব্যতীত লোকে এই ব্যাধিকে অতিক্রম করিতে পারে না।

হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবেক।

(প্রাপ্ত)

আমাদের দেশে বিবেকের বড়ই দুর্গতি। যাহা সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহা কার্য্যে পালন না করিলে যে অপরাধ হয় একথা আমাদের দেশের অনেকেই বুঝেন না। পরমেশ্বর মানবকে সত্যাসত্য বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন। এই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া সে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহার অনুসরণ করিবে, এবং যাহা অসত্য বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। এইরূপে কার্য্য করিয়া সে ক্রমশঃ নিজ পাপ ও দুর্ব্বলতা হইতে বিমুক্ত হইবে এবং তাহার জীবন পবিত্র হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আবার ব্যক্তিগত জীবনের এই উন্নতির দ্বারা সমগ্র মানব সমাজ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিয়া ঈশ্বরের সত্যকে জয়যুক্ত করিবে,—ইহাই ত তাঁহার অভিপ্রায়। সত্যেই তিনি, সত্যই তাঁহার স্বরূপ। এজন্য যে সত্য পালন করে, সে তাঁহাকেই আশ্রয় করে; সুতরাং তাহাকে তিনি রক্ষা করেন, সত্যপালনে তাহাকে তিনি সহায়তা করেন। আর জানিয়া শুনিয়া যে তাঁহার সত্যকে পরিত্যাগ করে, সে তাঁহাকেই অবমাননা করে; সুতরাং সেই সত্যের অবমাননাকারী আপনাপনি নষ্ট হয়, তাঁহার সত্য কখনই তাহাকেই বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। কিন্তু অনেকে একথা বুঝিয়াও বুঝেন না; তাই আমাদের নরনারীগণ এত হীন ও নির্বীর্য্য হইয়াছে। কিসে তাহাদিগকে সবল করিবে, আপন আপন পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি দিবে? সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই ত মানবজীবনকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে না। একমাত্র সত্যই মানবাত্মার অন্ন জল। অনাহারে মানুষ কতদিন বাঁচে? তাই আমাদের দেশের নরনারী সকল নিস্তেজ ও দুর্ব্বল।

যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং সত্য ভালরূপে বুঝে না তাহাদিগকে তত দোষ দিই না; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সত্যাসত্য বিচার করিবার শক্তি যাঁহাদের পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহাদের দায়িত্ব কত অধিক! যদি তাঁহাদিগকে সত্যপালনে শিথিল দেখি তবে প্রাণে বড়ই বেদনা পাই। কত কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই পৌত্তলিকতাকে অসার বলিয়া যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রতি যাঁহাদের অন্তরের বিশ্বাস চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে, একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বর যে মানবের উপাস্য তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন কার্য্যে তাহা কি করিতে পারিতেছেন? না, কার্য্যে করা দূরে থাকুক, পরনিন্দা এবং সমাজের ভ্রূকুটীর ভয়ে সে কথা তাঁহারা মুখ ফুটিয়াও কাহার কাছে বলিতে পারিতেছেন না। কেহ বা সমাজের প্রিয় হইবার জন্য আবার পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা বিবেকের দুর্গতি আর কি হইতে পারে? দেশে কত চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা জাতিভেদ প্রথার অপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই যে ভারতের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, ইহাই তাহার দুর্জ্জয় সমবেত শক্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া অবশেষে তাহার চরণে দুশ্ছেদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়াছে তাহা তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন,—তাঁহারা হয়ত অনেক সময় উদারতা দেখাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকদিগের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা গোপনে যে অন্য জাতির সঙ্গে একত্রে আহারাদি করিয়াছেন একথা খুলিয়া বলিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সমাজ তাঁহাদের হস্তপদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। সমাজ তাঁহাদিগকে ফিরাইতেছে ঘুরাইতেছে, উঠাইতেছে বসাইতেছে; তবু তাঁহারা সমাজের চরণে মস্তক অবনত করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া আছেন। ইহা অপেক্ষা বিবে-

কের দুর্গতি আর কি হইতে পারে? পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় রমণীগণ পুরুষের খেলার বস্তু,—বিলাসিতার সামগ্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই; বালবিধবাগণ অবিশ্রান্ত নেত্রাসারে ধরাতল সিক্ত করিবার জন্য, দুর্নীতির ভারে সমাজ কলঙ্কিত করিবার জন্য মানবদেহ ধারণ করে নাই,—একথা এদেশের শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত নির্জ্জনে অশ্রুপাতও করিয়াছেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের কয়জন কার্য্যতঃ ইহার প্রতিবিধানের কোনও চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহাদের যে কিছুই শক্তি নাই। শাস্ত্র এবং সমাজ তাঁহাদিগকে নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা আপনাদের হস্তপদ আপনারা বাঁধিয়া সমাজের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর অপেক্ষা মানব সমাজকে অধিক ভয় করিতেছেন। আপনার আপনার ব্যক্তিত্ব সমাজের নিকট বলিদান দিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বিবেকের দুর্গতি আর অধিক কি হইতে পারে? যে জাতির বিবেকের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, তাহার পুনরুত্থান কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?

কিন্তু জগতের বিধাতা যিনি, তিনি আমাদিগকে ভুলেন নাই। আমরা যদি আপনাদের বিনাশের জন্য আপন হস্তে বিষের পাত্র তুলিয়া মুখে ঢালিতে যাই, সেই করুণাময় পিতা কি তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরা ত মরিতেই চাই, কিন্তু তিনি মরিতে দিবেন না। তাই শুভক্ষণে তাঁহার করুণা ব্রাহ্মসমাজরূপে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইল। পরাধীনা রমণীগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, বিধবাগণের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য, ব্রাহ্মণ পদদলিত,—শাস্ত্রশাসনে নিষ্পেষিত শূদ্রদিগের স্কন্ধ হইতে সমাজশাসনের দুর্ব্বহ ভার নামাইয়া দিবার জন্যও তাহাদের অন্তরে আত্মমর্য্যাদার ভাব জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজের হস্ত প্রসারিত হইল। তাহা দেখিয়া কত নিরাশ নরনারীর প্রাণে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। বিধাতা আপনি আসিয়া মধুর স্বরে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের মধ্যে বলিলেন—"বিবেকের অনুসরণ কর, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহা পালন কর, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" সে বাণী শুনিয়া কত নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত হইল,—স্বার্থসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, জননীর অশ্রুজলের প্রতি উদাসীন হইয়া, আত্মীয়বান্ধবের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং শত সহস্র অভাব ও নির্য্যাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া কত নরনারী আসিয়া তাঁহার অভয় চরণে মস্তক রাখিল। যে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, যে দিন হইতে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ সত্যপালনের জন্য,—বিবেকের অনুসরণ করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র স্বার্থও ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন, সে দিন হইতে আশা হইয়াছে যে ভারতের এ দুর্গতি দূর হইবে, দেশের সর্ব্বত্র এক সত্যস্বরূপের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমস্ত মানবসমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে ইহাই আশা করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পৌত্তলিকতা চিরদিনের মত ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নারীদিগকে উপযুক্ত অধিকার দিবার জন্যও ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যে ভীষণ কুসংস্কার বহুকাল হইতে ভারতের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া আছে, সেই দেশোচ্ছিন্নকারী জাতিভেদ প্রথা অদ্যাপি সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। প্রভাতের আলোকের প্রকাশে রজনীর অন্ধকার যেমন অনাবৃত ও প্রশস্ত স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বন ও সংকীর্ণ পর্ব্বতকন্দর আশ্রয় করে, সেইরূপ দিব্য জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে এই কুসংস্কারের অন্ধকার উদার প্রকৃতি ও সরলবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণের হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া ভীরু ও দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিগণের অন্তরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইঁহারা সকল দিক বিচার করিয়া, চারি ধারের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কি জানি ব্রাহ্মসমাজ যদি স্থায়ী না হয়, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া ভাল, ইহাই ইঁহাদের মনের ভাব। স্বার্থকে ইঁহারা বড়ই ভালবাসেন, তাই অন্ধকারকে পুষিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, পরমেশ্বরকে জীবনের বিধাতা না করিয়া আপনারাই বিধাতা হইতে যাইতেছেন।

একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে এই বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। জাতিভেদ প্রথার তিনটী স্থূল বিভাগ আছে,—প্রথম পদমর্য্যাদাগত জাতিভেদ, দ্বিতীয় আদান প্রদানগত জাতিভেদ এবং তৃতীয় আহারাদি সম্বন্ধে জাতিভেদ। পদমর্য্যাদাগত জাতিভেদ জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহার প্রশ্রয় দেওয়া অতি অন্যায় কার্য্য। পরম প্রভু পরমেশ্বর সকলের পিতা এবং বিধাতা; তিনি নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীদিগকে আপনার স্নেহের ছায়ায় রাখিয়া পরিত্রাণ দিবেন—যে ধর্ম্মমণ্ডলীর লোকে ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জীবনে এরূপ ভাব ও আচরণ অবিশ্বাসেরই পরিচয় দেয়। অনেক স্থানে ধনী, পণ্ডিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির যত আদর দেখা যায়, দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির তাহার একদশমাংশও দেখা যায় না। কত সময় শুনা যায় যে কোনও সম্মিলনের স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কত লোক আক্ষেপ করিতেছেন যে আমরা গরীব ও মূর্খ বলিয়া আমাদের দিকে কেহ চাহিল না, কেহ আমাদের সঙ্গে আলাপাদি করিল না। এরূপ ব্যাপার যদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখা যায় তবে তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ব্রাহ্মগণ মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু ধন ও গৌরবের আধার বলিয়াই সম্ভ্রম করে, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা সাংসারিকতাকে উচ্চতর স্থান দিতে চায়। অবশ্য গুণের অনাদর করিতে বলিতেছি না, কিন্তু সাবধান! সে জন্য ঈশ্বরের দীন সন্তানগণ যেন উপেক্ষিত না হন। আধ্যাত্মিক গুণ ও মহত্ত্বের বিশেষ আদর করিতে হইবে। কিন্তু যদি সাংসারিক মহত্ত্বের আদর ব্রাহ্মসমাজের

মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, তবে জগতের দীনদুঃখী আর কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে? অতএব এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ রূপ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে।

আদান প্রদান গত জাতিভেদ পৃথিবীর অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা যেরূপ ভাবে বর্ত্তমান, অন্য কুত্রাপি প্রায় সেরূপ ভাবে দেখা যায় না। অন্য দেশে ইহা কুলগত, কিন্তু এখানে ইহা কুল ও বর্ণ গত। অন্য দেশে বিভিন্ন কুলস্থ লোকদিগের সঙ্গে আদান প্রদান করিলে, কেবল মাত্র কুলমর্য্যাদার হানি হয়, কিন্তু কাহাকে কখনও সমাজবহিস্কৃত হইতে হয় না। আর এ দেশে কেহ যদি বিভিন্ন বর্ণের লোকের সহিত আদান প্রদান করে তবে তাহাকে চিরদিনের মত আপনার সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই কঠিন পাশ ছিন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু হায়! অনেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই আদান প্রদানগত জাতিভেদ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই জন্যই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা এত অল্প দেখা যাইতেছে। জাতিভেদের বড় বিরোধী যাঁহারা এবং তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য যাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কার্য্যকালে তাঁহারাও পশ্চাৎপদ হইতেছেন, বিবাহের সময় তাঁহার চেষ্টা করিয়া সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ করিতেছেন সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা দ্বারা কোনও ফল উৎপন্ন হইতেছে না। কেবলমাত্র মুখের কথায় কি হয়, যদি সে কথার পশ্চাতে কার্য্য না থাকে? ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া যাঁহারা দাণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মদিগের এই ভাব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন,—"আমরা ত হিন্দুদের চক্ষে নিকৃষ্ট জাতি; ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যখন আদান প্রদান সম্বন্ধে উচ্চ নীচ জাতি গণনা করা হয়, তখন এখানে আমাদের পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ হওয়া ত বড় কঠিন ব্যাপার।" এই ভাবিয়া তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। অনেক সময় সবর্ণ পাত্র বা পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়াতে বড়ই অসুবিধা ঘটিতেছে। পিতামাতার মনে এই ভাব থাকাতে ক্রমশঃ তাহা পুত্র কন্যাগণের মধ্যে ও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে যে যুবক যুবতীগণ ব্রাহ্মসমাজের ভাবী আশাস্থল তাহাদের মধ্যে জাতিভেদের অঙ্কুর থাকিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্ম বিবাহের যে আদর্শ,—অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীগণ পবিত্র প্রেম প্রভাবে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরমেশ্বরের সেবার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, সে আদর্শের পথে দুরতিক্রমনীয় বাধা স্থাপন করা হইয়াছে। পিতামাতাগণ কেবল "সুবর্ণ সবর্ণ" খুঁজিতেছেন, সুতরাং পুত্র কন্যাগণের স্বাধীনতা কোথায়? এই কারণেই দুই এক স্থলে অভিভাবকেরা পাত্র বা পাত্রীকে আপন মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে দেন নাই। তাহার কারণ এরূপ অবসর্ণ বিবাহ দিলে হিন্দুসমাজস্থ আত্মীয়গণের নিকট ঘৃণিত হইবেন। এরূপ চিন্তা করিয়া কার্য্য করা অতি আক্ষেপের কথা। ব্রাহ্মসমাজের লোক এরূপ ভাবে স্বার্থের পূজা করে দেখিলে হৃদয়ে বড় ক্লেশ হয়। যাহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিবার সময় শত সহস্র স্বার্থকে পদদলিত করিয়াছে, আজ তাহারা এত হীনবীর্য্য কেন? এই দেখ আমরা পৌত্তলিকতা মানি না, এই দেখ আমরা জাতিভেদ মানি না, তাই উপবীতত্যাগ করিতেছি,—এই বলিয়া যাহারা একদিন সকলের নিকট আপনাদের বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছে, আজ কেন তাঁহারা,—"এই দেখ আমরা জাতিভেদ মানি না, তাই পুত্র কন্যাদিগের অসবর্ণ বিবাহ দিতেছি," এই বলিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া সদৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে না পারেন? অতএব এ বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ভারতের উন্নতির যে ভবিষ্যৎ আশা তাহা ব্রাহ্মসমাজের উপর স্থাপিত।

আহারাদি সম্বন্ধে জাতিভেদ ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও এরূপ ভাবে বর্ত্তমান নাই। এই ভাবই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও অপ্রেমের ভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রেমের সহিত সকলে একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ একটী বিশেষ শক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে বিকসিত হইতে দিতেছে না। সুতরাং এরূপ ভাব যে ব্রাহ্মদিগের কাহারও মধ্যে দেখিতে পাইব এপ্রকার আশা কেহই কখনও করেন না। কিন্তু অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এরূপ ভাবও দুই চারিজন ব্রাহ্মের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। কি কারণে বলিতে পারি না তাঁহারা হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট বর্ণস্থ ব্রাহ্মের সঙ্গেও বাড়ীতে আহারাদি করিতে প্রস্তুত নহেন। আদান প্রদানগত জাতিভেদ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়; কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধীয় এই জাতিভেদ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখিলে সে আশা করিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাঁহারা এই ভাবের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারা যে কোনও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিতেছেন, তাহা মনে হয় না। হয়ত মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা এরূপ করিতেছেন। কিন্তু এই আচরণের দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা নবাগত ব্রাহ্মদিগের নিকট ব্রাহ্ম জীবনের অতি নিকৃষ্ট আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তৃতীয়তঃ হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে আঘাত দিতেছেন। কোনও সাধারণ নিম্নস্তরের ন্যায় চাপিয়া বসিব। শেষোক্ত ব্রাহ্মগণও তাঁহাদের পরিবারবর্গের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে বুঝি আমাদিগকে নীচজাতি বলিয়া সকলে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন। একবার অন্তরে সন্দেহের উদয় হইলে আর প্রাণে শান্তি থাকে না। আর কত বলিব, প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। এই ভাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য আমাদের শিঘ্র চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

• ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্য করিতেছে। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার সত্যসকল তিনি ভারত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতেছেন। এই কারণে তিনি আমা-

দের সকলকে ডাকিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন বিবেকের অনুগত হইয়া কার্য্য কর। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিবেকের আদেশ মত কার্য্য করি, তবে তিনি আমাদিগের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন, এবং আমরা তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইব। আর আমরা যদি সংকীর্ণ ভাবের মধ্যে আপনাদিগকে ডুবাইয়া রাখিতে চাই কিম্বা স্বার্থ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে যাই, তবে তিনি আমাদের হাতে যে ভার দিয়াছেন তাহা কাড়িয়া লইবেন এবং আমাদের যথেচ্ছাচারের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দিবেন। সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অন্যান্য সমাজ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজও সেইরূপ হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের দ্বারা কিছু না হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য কোনও আধারের ভিতর দিয়া কার্য্য করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিবে। বিবেকের উপর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, বিবেকের আদেশেই ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন বিবেকের আদেশে আমরা এখনও যেন অগ্রসর হইতে পারি। আর কোনও দিকে চাহিব না, স্বার্থ বা মানমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত করিব না; কিন্তু যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁহার সত্য বলিয়া বুঝিব তাহা পালনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিব। তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বল দিবেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

(১৬ই বৈশাখ রবিবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত)

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধ অসাধুঃ সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতং॥"

অর্থ,—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে, দানের দ্বারা কৃপণকে জয় করিবেক এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের বিদ্বেষীর সংখ্যা অনেক। কয়েক বৎসর হইতে এই সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যাঁহারা প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, চিরদিন সেই বিশ্বাসে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ্টা, কারণ তাঁহাদে[illegible] বিষম বেদনা, ও জাতিভেদ বিলুপ্ত হইলে ধর্ম্ম থাকি[illegible] নে উপস্থিত হইলে এ, লোকের ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার অকল্যাণ হইবে। এই যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কি প্রকারে ব্রাহ্মসমাজকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন? তাঁহারা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের মূলে কুঠরাঘাত করিতেছে। যাহাদিগকে তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখাইত স্বাভাবিক। আজ যদি এক দল এরূপ নাস্তিক অভ্যুত্থিত হয়, যাহারা বলে ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, মার কাট, লোটো খাও, যথেচ্ছাচার কর, তবে ব্রাহ্মেরা তাহাদিগকে কি চক্ষে দেখিবেন? অবশ্য প্রীতির চক্ষে নয়। তবে নিষ্ঠাবান হিন্দু যদি সেই প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মকে ঘৃণা করেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

তৎপরে আর একদল লোক ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাঁদের নাম পুনরুত্থানকারী। ইহাঁরা মুখে বলেন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান করা ইহাঁদের অভিপ্রেত কিন্তু ফলে দেখিতে পাই ব্রাহ্মবিদ্বেষই প্রধানরূপে ইহাঁদের চালক। প্রথম দলের নিষ্ঠা ও ভক্তির ভাব ইহাঁদের নাই। নূতন শিক্ষার জল ইহাঁদের পেটে পড়িয়াছে, বিজ্ঞানের ও স্বাধীন চিন্তার ভাব ইহাঁদের মনে অবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু কোন কোন আকস্মিক কারণে (ব্রাহ্মবিদ্বেষ তাহার মধ্যে একটী প্রধান কারণ), ইহাঁরা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের ভার লইয়াছেন। এই এক মহা বিড়ম্বনা; নিষ্ঠাবিহীন লোকের দ্বারা ধর্ম্মের পুনরুত্থান ইতিহাসে আর কখনও শুনা যায় নাই। যাহা হউক এই পুনরুত্থানকারীগণও ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ্টার দলে নাম লিখাইয়াছেন। এই দলের লোকের ব্রাহ্ম বিদ্বেষের কারণ কি, অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি; একটী কারণ এই বোধ হয় ইহাঁরা জ্ঞান দ্বারা যে পথ অবলম্বনীয় বলিয়া অনুভব করেন অথচ সে পথে চলিবার সাহস নাই, সেই পথে ব্রাহ্মেরা অগ্রসর, এজন্য ইহাঁদের বিবেক ইহাঁদিগকে লজ্জা দেয়, সুতরাং ইহাঁরা ব্রাহ্মদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হইয়া কোনরূপে যুক্তিকে নিঙড়াইয়া, বিজ্ঞানকে পিষিয়া, ইতিহাসকে টিপিয়া, আপনাদের অবলম্বিত পথের অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করিতেছেন এবং অপর দিকে স্বতঃ পরতঃ গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ও ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা রটনা করিতেছেন।

তৃতীয় বিদ্বেষী দল—সমাজসংস্কারবিরোধী ব্যক্তিগণ। ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া অসবর্ণ বিবাহ দিতেছেন ও অবরোধ প্রথার কঠোর শাসন হইতে নারীদিগকে উন্মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ইহাতে এক শ্রেণীর লোকের মনে গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, যে এইরূপে কাজ চলিলে ভারত সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। বিশেষ রমণীর স্বাধীনতা। বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও এ সম্বন্ধে প্রবল কুসংস্কার দৃষ্ট হয়। তাঁহাদেরও বিশ্বাস যে নারীর অবরোধ না থাকিলে সমাজ উৎসন্ন যায়। এই বদ্ধমূল সংস্কার থাকাতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি, বিশেষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের প্রতি ইহাঁদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি জন্মিতেছে। ইহাঁরা বলেন আরও ত ব্রাহ্ম আছে, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম, নববিধানের ব্রাহ্ম কেমন ভদ্র লোক, মেয়েগুলোকে শাসন রাখে, আর এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা মেয়েগুলোকে স্বাধীনতা দিয়া দেশ উৎসন্ন দিবার পথ খুলিতেছে। সুতরাং আমাদিগকে তাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। এদলে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ আছেন।

চতুর্থতঃ—আর এক দল বিদ্বেষ্টা আছে, পাপাশক্তি, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা প্রভৃতিতে যাহারা লিপ্ত, তাহারাও ব্রাহ্মসমাজকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে। কেহ একটু সুরাপান

করিল, কেহ একটু রঙ্গভূমিতে গেল, কেহ একটু কুরুচি সম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করিল অমনি তাহাদের কাগজে তাহাদের ভ্রূকুটি দেখা গেল। সুতরাং এই সকল লোক মনে করে, এ বড় জ্বালা, আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ করিব, এই ভিংসুকে ব্রাহ্মগুলো তাহাতে এত গোল করে কেন? এই শ্রেণীর লোকে ব্রাহ্মদিগকে পিউরিটান বা রুচিগ্রস্ত লোক বলিয়া বিদ্রূপ করে। ইহারাও ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।

এইরূপে দেখা যায় এক শিশু ব্রাহ্মসমাজ, তাহার শত শত বিদ্বেষ্টা চারিদিকে উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সৎলোক যাঁহারা, তাঁহারা ভদ্রলোকের ন্যায় তর্কযুদ্ধে প্রতিবাদপরায়ণ হইতেছেন, কিন্তু নিকৃষ্টচেতা ব্যক্তিগণ কল্পিত কুৎসা রটনার ন্যায় নিকৃষ্ট ও সাধুজনবিনিন্দিত উপায় সকল অবলম্বন করিতেছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মেরা এই সকল দলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তাঁহারা কি রাস্তায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেক বিপক্ষের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তরে কালাতিপাত করিবেন, অথবা মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদের ইষ্টদেবতার অর্চ্চনাতে নিবিষ্ট হইবেন? সময়ে সময়ে এই সহরের রাজপথে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, দুইজন লোকে মারামারি করিতেছে, দেখিতে দেখিতে দুই চারিজন করিয়া লোক জমিয়া গেল। কেহ কেহ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতেছে,—বাদী প্রতিবাদীর সহিত বকাবকি করিতেছে, দোষী ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার উপরেই মোকর্দ্দমা চলিতেছে, ইতিমধ্যে একজন লোক দ্রুতবেগে আসিল, সে একবার ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারিল, বিষয়টার ভাব একটু সংগ্রহ করিয়া লইল, আবার দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। যে ব্যক্তি দ্রুতবেগে আসিল ও দ্রুতবেগে গেল এবং যে দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া মধ্যস্থতা করিতেছে, এই দুইজনে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে যে মধ্যস্থতা করিতেছে তাহার করিবার কিছুই নাই, দ্রুতগামী ব্যক্তির করিবার কিছু আছে। যাহার করিবার কিছু নাই সে পথের কলহে কালবিলম্ব করিতে পারে, যাহার করিবার কিছু আছে, তাহার বৃথা কলহে কালবিলম্ব খাটে না। ব্রাহ্মদিগের কি কিছু করিবার নাই যে তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক বিপক্ষের সহিত বৃথা কলহ করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ যতগুলি কাজে হাত দিয়াছেন, সকল গুলিই গুরুতর। দেশমধ্যে সত্যস্বরূপের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা, একটী নব ধর্ম্মসমাজ গঠন করা, নরনারীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করা। ইহার এক একটী কাজ এত গুরুতর যে দেশে যে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা সকলে দিনরাত্রি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও যথেষ্ট হয় না। ইঁহাদের অবসর কই, যে বৃথা কলহে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কালাতিপাত করেন?

দ্বিতীয় একটী কথা এই যে আমরা যে সকল সত্য প্রচার করিতেছি বা যে সকল কাজে হাত দিয়াছি তাহা ত কোন লোকের অনুরাগের লোভে নয়, ঈশ্বরাদেশে; তবে লোকের বিরাগ দেখিয়া ক্ষুব্ধ বা বিদ্বেষপরায়ণ হইব কেন? আমরা প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতেছি, মত্ত কোলাহলের মধ্যে তাঁহারই সেবা করিব। লোকে বিরোধী হইলেও তাঁহার সেবার আনন্দ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারে? বরং লোকের দ্বেষভাব দেখিয়া যদি আমরা বিদ্বেষ পরায়ণ হই তাহা হইলে সেই সেবা হইতে ভ্রষ্ট হইব। ডাক্তারেরা যদি রোগীর কটূক্তির প্রতি কর্ণপাত করে ও তাহার ক্রোধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় তবে তাহার কর্ত্তব্যসাধন করা হয় না, তাহার অস্ত্রচিকিৎসা চলে না। বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা হৃদয়কে চঞ্চল হইতে দিলে কর্ত্তব্যের পথকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। বিদ্বেষের গতি খরগোসের গতির ন্যায়, প্রেমের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায়। অথচ কচ্ছপের নিকটে খরগোসকে অবশেষে পরাজিত হইতে হয়। যাহারা বিদ্বেষ বশতঃ কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কতদিন কোলাহল করিবে? আমরা ঈশ্বরপ্রেমে জাগিয়া রহিলাম, কাজ করিতে থাকিলাম, তাহারা যখন ঘুমাইবে, তখন আমরা তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইব।

যেরূপ মানুষকে হাতেও মারা যায়, আবার ভাতেও মারা যায়, কিন্তু হাতে মারা অপেক্ষা ভাতে মারা শক্ত মারা। সেইরূপ মানুষের কথার জবাব দুই প্রকারে দেওয়া যায়, এক বাক্যে আর কার্য্যে। তন্মধ্যে কার্য্যে যে জবাব দেওয়া যায়, তাহাই শক্ত জবাব। বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকার মধ্যে যখন সংগ্রাম বাধিবার উপক্রম হইল, তখন ইংলণ্ডের লোকেরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ করিলে আমেরিকার চলিবে না। আমেরিকগণ বাক্যব্যয় না করিয়া ইংলণ্ডীয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিয়া দিল এবং নিজেরা বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের যে কোটি কোটি টাকার কাপড় বিক্রয় হইত, তাহার পথ বন্ধ হইল, কেমন জবাব! বৃথা বাক্যব্যয় অপেক্ষা এ উত্তর কি ভাল নয়? ব্রাহ্মদিগকেও সকল বিপক্ষের কটূক্তির উত্তর এই প্রকারে দিতে হইবে। যে সকল কার্য্যে হস্ত দিয়াছি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সে সকল কার্য্য করিয়া যাইব। ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে গাঢ়রূপে নিযুক্ত হইব। এইরূপে সাধন ভজনের গুণে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গুণে আধ্যাত্মিক শক্তি যতই জন্মিবে, ততই ভারত সমাজের বক্ষে বিশ মণ পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসিব। এই ব্রাহ্মসমাজকে তোলে সাধ্য কার।

ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্রোধ, অসাধুতার পরিবর্ত্তে অসাধুতা যদি আমরা দিতে অগ্রসর হই, তাহাতে এই প্রমাণ হইবে যে, আমাদের দৃষ্টি ঈশ্বরের উপরে নয়; আমরা তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে চলিতেছি না। লোকের আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকিতে পারে কিন্তু কাহারও প্রতি আমাদের বিদ্বেষ ভাব থাকিবে না। মহাভারতে এরূপ কথিত আছে যে ব্যাধরূপী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যখন যুদ্ধ হয়, তখন অর্জ্জুন যতই শাণিত অস্ত্র সকল সেই ব্যাধের শরীরে নিক্ষেপ করেন, ততই অস্ত্র সকল সেই পাষাণময় দেহে লাগিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত

হয়, এবং ব্যাধরূপী শিব অট্টহাস্য করিতে থাকেন। অর্জ্জুন ক্রোধে অস্থির, ব্যাধের ক্রোধ নাই। ক্রোধ হইবে কেন? দেহে অস্ত্র বিঁধিলে ত লাগিবে ও ক্রোধের সঞ্চার হইবে, সকল অস্ত্রই বিফল হইতেছে, তখন আর ক্রোধ হইবে কিরূপে? সে ব্যাধ জানিতেন অর্জ্জুন যতই অস্ত্র নিক্ষেপ করুন না কেন অবশেষে তাঁহার নিজেরই জয়, সেই জন্য তিনি অর্জ্জুনের ক্রোধকে হাসিয়া উড়াইতে ছিলেন। ব্রাহ্মগণও সেইরূপ বিপক্ষগণের ক্রোধের মধ্যে অক্রুদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের বাণ সকলকে হাসিয়া উড়াইতেছেন। এখানে নিশ্চিত জানা আছে অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয় হইবে।

আর এক কারণে অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিতে হইবে। আমরা যখন ঈশ্বরের সেবক, তখন আমাদের সাধুতা অপরের সাধুতা নিরপেক্ষ হইবে। অপরে ভদ্র ব্যবহার করিলে তবে আমরা ভদ্র ব্যবহার করিব, নতুবা করিব না, এরূপ নহে। ভদ্র অভদ্র সকলের প্রতি আমাদের আচরণ ভদ্র হইবে, কারণ আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ এই আমরা সর্ব্বদা সাধুতা-তেই প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আমি সোজা পথও চিনি বাঁকা পথও চিনি, এমন কথা ব্রাহ্ম বলিবেন না, তাঁহার একই পথ সে সোজা পথ। যে ব্যক্তি সোজা পথ ভিন্ন জানে না, সোজা পথে ভিন্ন চলে না, সহস্র বাধা পাইলেও, সহস্র প্রলোভন দেখাইলেও যে সোজা পথ হইতে একচুল বাহিরে পা বাড়াইতে পারে না—সেই ব্যক্তিই হৃদয় ঈশ্বরকে দিয়াছে, সেই জীবনই ব্রাহ্মসমাজের বল এইরূপ জীবনের শক্তিই অমর শক্তি। ঈশ্বর করুন এরূপ একান্ত ভাবে যেন আমরা তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ছাত্র-সমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৯এ বৈশাখ বুধবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় উদ্বোধন, আচার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।

২০এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬ টার সময় উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন; মধ্যাহ্নে উপাসনা, আচার্য্য মুন্সী জালালউদ্দীন; অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন ও রাত্রি ৭॥ টার সময় উপাসনা, আচার্য্য প্রচারক শশিভূষণ বসু।

২১এ বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা, আচার্য্য বাবু গৌরলাল রায়; অপরাহ্ণ ৬ টার সময় প্রকাশ্য বক্তৃতা, বিষয় "জীবন কাহাকে বলে"—বক্তা প্রচারক শশি-ভূষণ বসু; রাত্রি ৮ টার সময় কীর্ত্তন।

২২এ বৈশাখ শনিবার প্রাতে ৭ টার সময় উপাসনা, আচার্য্য প্রচারক শশিভূষণ বসু; অপরাহ্ণ ৩ টার সময় আলোচনা।

২৩এ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ টার সময় নিয়মিত উপাসনা, আচার্য্য প্রচারক শশিভূষণ বসু; অপরাহ্ণ ৬ টার সময় প্রকাশ্য বক্তৃতা, বিষয় "ঈশ্বরের মহিমা", বক্তা রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।

ছাত্রসমাজের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব।

১৭ই বৈশাখ সোমবার রাত্রি ৭ টার সময় উদ্বোধন, আচার্য্য বাবু গৌরলাল রায়।

১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু গৌর-লাল রায়; রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা, আচার্য্য রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।

ছাত্রসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা।

২৪এ বৈশাখ সোমবার প্রাতে রাজকুমারের পাঠ গৃহে ছাত্র সমাজের কল্যাণের জন্য শশী বাবু প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন ও রাত্রি ৭॥ টার সময় ছাত্রসমাজ-গৃহপ্রতিষ্ঠা, আচার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।

২৫এ বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু কামিনীকুমার ঘোষ।

২৬এ বৈশাখ বুধবার রাত্রি ৮॥ টার সময় উপাসনা, আচার্য্য প্রচারক শশিভূষণ বসু।

অনুষ্ঠান পত্র।

ওঁ তৎসৎ।

অদ্য ব্রাহ্মাব্দ ৬০, বঙ্গাব্দ ১২৯৬। ২৪এ বৈশাখ, ইংরাজী ৬ই মে ১৮৮৯ সোমবার সায়ংকালে শম্ভু সরোবরের উত্তরস্থ নব-গঠিত গৃহ ছাত্রদিগের উপাসনার জন্য আমি সর্ব্ব সমক্ষে উৎসর্গ করিলাম, এই গৃহ ছাত্রসমাজ নামে অভিহিত হইবে।

এই গৃহে কেবল একমাত্র সত্য স্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানালোচনা হইবে। এখানে কোন রূপ দেবদেবীর উপাসনা হইবে না। সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী লোক আসিয়া এখানে উপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন। কিন্তু নিরা-কার পরব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন কেহ এখানে দেবদেবীর কার্য্য করিতে পারিবেন না।

এই গৃহ কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজের কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকিবে, উক্ত কমিটির অধিকাংশের মত ভিন্ন এখানে কোন কার্য্য হইতে পারিবে না।

আমি কি আমার উত্তরাধিকারী এই গৃহ অন্য কোন কার্য্যের জন্য প্রদান করিতে পারিব না। ইহার সম্পূর্ণ স্বত্ব কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজের থাকিবে।

শ্রীমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী
রাজা কাকিনীয়া।

সাক্ষী
শ্রীমহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী
শ্রীকালীকুমার গুপ্ত
শ্রীগৌরলাল রায়
শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ
লেখক শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার
সম্পাদক শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীতারকনাথ মৈত্রেয়

ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ জন্মোৎসব।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। বাবু সীতানাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পরে "বিশ্বাসী এবং অল্প বিশ্বাসী" এই বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এক বক্তৃতা করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার—এই দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন। প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত এমার্সন প্রণীত গ্রন্থ হইতে এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পরে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে দুইজন যুবকের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে একজন সেদিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অপর যুবক দীক্ষিত হইলেন; তাঁহার নাম নদেরচাঁদ বৈরাগী।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—রাত্রি আট ঘটিকার পর সিটি কলেজ ভবনে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের একটী সম্মিলন সভা হয়। প্রার্থনার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১ম ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

গত ৩০এ চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন,—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (সভাপতি), বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ রায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু সাতকড়ি দেব, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু শশিভূষণ বসু (সহকারী সম্পাদক), বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু শ্রীশচন্দ্র দে, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু মথুরামোহন গাঙ্গোপাধ্যায়, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এবং বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।

গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

স্থিরীকৃত হইল যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক যে কার্য্য বিবরণ মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে, তাহা পঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হউক।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন পোষকতা করিলেন যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হউক।

ময়মনসিংহের বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়, কলিকাতার বাবু শশিভূষণ সেন, লাহোরের শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ এবং কৃষ্ণনগরের বাবু সূর্য্যকুমার দের পত্র সকল পঠিত হইল।

এই সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন পরিত্যাগ করায় বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও বাবু বিপিনচন্দ্র পালের পোষকতায় বাবু মধুসূদন সেন সভাপতি হইলেন।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু হীরালাল হালদার পোষকতা করিলেন যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিনা অভিমতে প্রচারকগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ হইতে পরিত্যক্ত হউক।

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর বাবু হীরালাল হালদার প্রস্তাব করিলেন ও বাবু হরকিশোর বিশ্বাস পোষকতা করিলেন যে সেদিনকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক।

জনৈক সভ্য তখন সভাতে আপনার কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতে ছিলেন, এজন্য সভাপতি বলিলেন যে সভা স্থগিত করিবার প্রস্তাব তখন করা যাইতে পারে না।

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থির করা হইল যে ৭ই বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত এই অধিবেশন স্থগিত থাকুক।

গত ৭ই বৈশাখ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার স্থগিত অধিবেশন হয়।

উপস্থিত;—বাবু গুরুচরণ মহলানবিস (সভাপতি), বাবু হীরালাল হালদার, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মথুরামোহন গাঙ্গোপাধ্যায়, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বাবু বিপিনচন্দ্র পাল যে প্রস্তাব করেন, তাহা অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই বলিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন যে এরূপ সংশোধন তাঁহার মতে নিয়ম বিরুদ্ধ।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিলেন;—বাগআঁচড়ায় বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে যে বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোনও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় কি না, তাহা ইহার সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্বন্ধে আবদ্ধ কি না, তাহা স্থাপন সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কিছু করিতে হইয়াছিল কি না, অঘোর বাবু এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোনও কার্য্য বিবরণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে দিয়াছিলেন কি না এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এরূপ কোনও কার্য্য-বিবরণ তাঁহার নিকট চাহিয়া ছিলেন কি না।

সহকারী সম্পাদক বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাগআঁচড়া বিদ্যালয়ে কোনও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না, অঘোর বাবুর তথাকার প্রচার কার্য্যের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ আছে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অঘোর বাবুর প্রচার কার্য্যের অংশস্বরূপ বাগআঁচড়ায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। গত তিন মাসের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত বিবরণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রাপ্ত হন নাই। এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিবরণও চাহিয়া পাঠান নাই।

বাবু বিপিনচন্দ্র পালের এই সকল প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর কার্য্য বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হইবে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সভার মত গৃহীত হইল, এবং অধিকাংশ ব্যক্তির মত দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে এই সকল প্রশ্ন কার্য্য বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

বাবু মথুরামোহন গাঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করিলেন যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ সংশোধিত হইয়া যেরূপ হইল তাহা গৃহীত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বাবু হীরালাল হালদার প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু মথুরামোহন গাঙ্গোপাধ্যায় সমর্থন করিলেন যে, যে সকল পত্র এই সভায় পঠিত হইল, তাহার বিচার এবং মীমাংসার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভাতে অর্পিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন;—

বাবু কেদারনাথ কুলভীর প্রস্তাবে এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পোষকতায় বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; বাবু চণ্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পালের পোষকতায় বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল; বাবু হরিমোহন ঘোষালের প্রস্তাবে এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়র পোষকতায় বাবু অনঙ্গমোহন ঘোষ।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পোষকতা করিলেন যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু মধুসূদন সেন এবং বাবু মথুরামোহন গাঙ্গোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের হিসাবের পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা অনুমোদিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সংবাদ।

নামকরণ;—গত ১৫ই বৈশাখ শনিবার বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম আশাকুমার রাখা হইয়াছে।

মাসিক উৎসব;—গত ২৬শে চৈত্র রবিবার বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রীতি ভোজনের পর স্থানীয় ব্রাহ্মিকা সমাজের এক অধিবেশন হয়।

শ্রাদ্ধ;—গত ২২এ বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকাল আট ঘটিকার সময় বেথুন স্কুলের শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন দাসের পিতার শ্রাদ্ধ আদ্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ভবানীপুরে বক্তৃতা;—বিগত ২৭এ এপ্রেল শনিবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল গৃহে "ভারতের ভবিষ্যৎ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ভবানীপুরস্থ বন্ধুগণের আয়োজনেই এই বক্তৃতা হয়।

দশঘরায় প্রচার;—গত ১৭ই বৈশাখ সোমবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং কতিপয় বন্ধু তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী দশঘরা গ্রামে বাবু উমাপদ রায়ের বাড়ীতে গমন করেন। পরদিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হয়। সন্ধ্যাকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্য সভায় "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিন সেই স্থানে শাস্ত্র হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হয়। পরে "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" সম্বন্ধে বিচার হয়। উপস্থিত ভট্টাচার্য্যগণ নিরাকার উপাসনাকে প্রকৃত উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিয়াও সাকার উপাসনার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বুঝাইতে চাহেন। কিন্তু তর্ক, যুক্তি এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা নিরুত্তর হন। তথাপি আপনাদিগকে পরাস্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

খাসিয়াদিগের মধ্যে প্রচার,—সিলঙ্গের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ খাসিয়া জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন হইল খাসিয়া ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পত্রিকার আকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল খাসিয়া ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বিতরণ করিতেছেন। তাহা দ্বারা সিলঙ্গ ও চিরাপুঞ্জীর অনেক খাসিয়াগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। চিরাপুঞ্জীর খাসিয়াগণের বিশেষ আহ্বানে সিলঙ্গস্থ বন্ধুগণ গত গুডফ্রাইডের বন্ধ উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহা দ্বারা অনেক খাসিয়া ভদ্রলোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন বসু;—খোলাবাড়িয়া নামক স্থানে কিছু দিন হইল একটী ভ্রাতৃ সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতিদিন নিয়মিতরূপে উপাসনাদি হইয়া থাকে। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু দুই রবিবার তথায় উপাসনা করেন। একদিন "ভারতের ইতিহাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয় কি বুঝিতে পারি" এই সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং অন্য দিন "উচ্চতর জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

সঙ্গত সভা;—কিছুদিন হইল সঙ্গত সভায় "কি কি বিষয় দেখিয়া কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে" এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনেক বাদানুবাদের পর সকলে এই মীমাংসায় উপনীত হন;—প্রথম, যিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে ও জীবনের প্রতিকার্য্যে ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজকে যিনি ঈশ্বরের বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও ভালবাসিতে প্রস্তুত। এরূপ না করিয়াও কেহ ভাল লোক হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্‌ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় শুক্রবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

প্রার্থনা।

এ ভগ্ন হৃদয় ভার—কে ঘুচাবে আর—
তুমি বিনে, দীনবন্ধু এত দয়া কার?
পাপীর দুর্দ্দশা হেরি এসে কৃপাকরে
বসিবেন হৃদি মাঝে দগধ অন্তরে—
ঢালিয়ে শান্তির জল—নিবারি অনল,
তুষিবেন দিয়ে সুধা প্রেম-পরিমল?

দারুণ সংসার ঘরে ফেলে নিরাশায়,
সংশয়-তিমির ঘোর আঁধারে ডুবায়;
সুগভীর অন্ধকার—দিগন্ত প্রসার!
নিরখি কম্পিত প্রাণ—করে হাহাকার!
তখন সে অসহায় অবস্থায় মোরে,
পসারিয়ে প্রেম বাহু—স্নেহময় ক্রোড়ে—
তুলিবেন,—কেবা হেন দয়ার নিদান?
ধন্য দেব দয়া তব মঙ্গল বিধান।

পরম ব্রহ্ম! ধন্য তোমার প্রেম! তোমার প্রেমের তুলনা নাই! কে বলে মানব প্রেম তোমারই প্রেমের প্রতিকৃতি? কে বলে জনক জননীর প্রেম তোমারই প্রেমের ছবি? মানব হৃদয় রূপ ও গুণের পক্ষপাতী, মানব প্রেম ঊর্দ্ধগামী। যে ফুলে মধু নাই মানব হৃদয় সে ফুলে বসে না। যে ফুলে সৌরভ নাই মানব তাহার আদর করিতে পারে না। জনক জননীর অকৃত্রিম প্রেম সকল সন্তানকে সমান ভাবে আলিঙ্গন করে না। কিন্তু তোমার প্রেমের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তোমার প্রেম নিম্নগামী। রূপে গুণে অনুপম হইয়াও তুমি নির্গুণ এবং বিরূপকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াও। যে পাপাচারীর, মানব সমাজে স্থান হয় না, যাহার দুর্গতি দেখিয়া সুজন হৃদয়ও দূরে সরিয়া পড়ে, যাহার শরীরের দুর্গন্ধে প্রেমিক হৃদয়ও দূরে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাপাচারীও তোমার প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হয় না। যে তোমাকে জানে না, যে তোমাকে বুঝিয়াও অস্বীকার করে, যে ইন্দ্রিয় মদে মত্ত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার মঙ্গলময় বিধি উল্লঙ্ঘন করে, প্রেমে বিগলিত হ'য়ে তুমি সর্ব্বদা তাহারই মঙ্গল সাধন করিতেছ। সাধু ও অসাধু, পাপী ও পুণ্যাত্মা, পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র সকলে সমান পরিমাণে তোমার প্রেমামৃত পান করিতেছে। আমরা মানব, পাপের সম্ভাবনা লইয়াই আমাদের জন্ম; তাই পাপীর সংসর্গ আমাদের ভয়াবহ। পাছে পাপের সংক্রমণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিনাশের কারণ হয়, এই ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পাপীর সহবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু তোমার সে ভয় নাই। তোমার প্রকৃতি শুভ্র এবং পবিত্র। অহর্নিশি রুগ্ন ব্যক্তিদের সহবাস করিতেছ, অথচ পাপের সংক্রমণ তোমাকে স্পর্শ করিতেও পারিতেছে না। জল যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে কিন্তু তদ্দ্বারা ভস্মীভূত হয় না। সেইরূপ তোমার শুভ্র কান্তি পাপের সংস্পর্শে কলুষিত হয় না, কিন্তু পাপকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। হে প্রেমময় পবিত্রাত্মা! মুহুর্মুহু তুমি আমাদিগের জীবনে তোমার অতুল প্রেমের ও পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছ। দেখিয়াছি পাপাগ্নিতে ছট ফট করিয়া একবার তোমার পবিত্র নাম স্মরণ করিতেই প্রাণ শীতল হইয়া গিয়াছে। আমাদের মত পাপীষ্ঠ যখন তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইতেছে না; তখন তোমার প্রেম যে নিম্নগামী এই সাক্ষ্য আর বহু দূরে অন্বেষণ করিতে হয় না। প্রভো! ধন্য ধন্য তুমি? কেন আমাদের পাপ রসনা কেবল তোমারই প্রেমের ও পবিত্রতার গান করে না। কেন এ রসনা অকিঞ্চিৎকর বিষয়, ক্ষণস্থায়ী মান, সম্ভ্রম, জগতের মরণশীল ঘটনারাজির মহিমা কীর্ত্তনেই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। কেন কোটিকণ্ঠ একতানে তোমার গুণকীর্ত্তনে জগৎকে জাগ্রত করিতেছে না। হে দুর্ব্বলের সহায়! আমাদের বল দাও! আমাদের বিকৃত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ কর। আমাদের রসনাকে উত্তেজিত কর, প্রাণে উৎসাহ এবং উদ্যম দাও। কেবল তোমারই প্রেমের, কেবল তোমারই পবিত্রতার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার মত হইয়া যাই। আমাদের হৃদয় উদার হউক, আমাদের প্রেম তোমারই মত নিম্নগামী হউক। কেবল ভাই ভগ্নী

বোধে নরনারীর চরণ সেবা করিতে প্রস্তুত হই। গুণের দিকে চাহিব না, রূপের জন্য ব্যাকুল হইব না। কেবল তোমার সন্তান বলিয়া, ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সকলের সেবাতে নিরত থাকিব।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

ঈশ্বর দেশ কালের অতীত—অজ্ঞ প্রতিমা পূজক, স্রষ্টা পুরুষের সম্বন্ধে স্থানাধার কল্পনা করিবেন বিচিত্র নহে। তাঁহাদের বিশ্বাস স্বর্গ ও নরক নামক দুই স্থান আছে। বিধাতা পুরুষ স্বর্গধামে হীরক খচিত মহামূল্য আসনে আসীন থাকিয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রদান করিতেছেন। কখন বা ব্যাকুলিত চিত্ত ভক্তের কাতরোক্তি শ্রবণে অধীর হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং সৌদামিনী বেগে মর্ত্তধামে অবতরণ করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসক মহম্মদের শিষ্যগণও পৌত্তলিক আরবের এই সাকার ভাব অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মহম্মদ স্বয়ং ঈশ্বরের বাসস্থান ভিস্তের (স্বর্গের) মনোরম ছবি উপাসক মণ্ডলীদিগের নিকট ধরিয়াছিলেন। অবতারবাদী খ্রীষ্ট সম্প্রদায় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া গৃহীত হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরকে স্থানাতীত মনে করিতে পারেন না। নিরাকার ব্রহ্মোপাসকদিগের কেহ কেহ বংশ পরম্পরাগত এই পৌত্তলিক ভাব চির নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হন নাই। ঈশ্বর বিষয় কথোপকথন কালে ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্ম প্রশ্ন করিয়া থাকেন, ঈশ্বর এই স্থানে আছেন কিনা? ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন কিনা? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী কিনা? ঈশ্বর কোথায় আছেন? এই প্রশ্ন গুলি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নই "ঈশ্বর স্থানাধিকরণে" বিদ্যমান আছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। যাঁহাদের জীবনের অধিক সময় দেশ-প্রতিষ্ঠিত রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাত্মক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ, তাঁহারা সহজে দেশাতীত সত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্থূল দৃষ্টিতে দেশকেই সকল সত্তার আধার বলিয়া বোধ হয়। এজন্যই হয়ত বেদে ঈশ্বরকে ত্যুঃ শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন। বাস্তবিক অন্তর্দৃষ্টি বিহীন বহির্দৃষ্টি শীল ব্যক্তির নিকট আকাশই সর্ব্বসত্তার নিদান বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেশকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দেশজ্ঞান জীব চৈতন্যেরই অন্তর্ভূত; জীব চৈতন্যকে ছাড়িয়া আকাশের সত্তা নাই। সুতরাং আকাশও জীব চৈতন্যের অপেক্ষা করিতেছে। আকাশ যে চৈতন্যের আশ্রয় করিয়া আছে সে জীব চৈতন্য আকাশের অতীত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং জীব চৈতন্য সম্বন্ধেই উল্লিখিতরূপ প্রশ্ন করা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। শুদ্ধ চৈতন্য সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন ভাষার অপূর্ণতা জন্য ওরূপ প্রশ্ন করা হইয়া থাকে। যে ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কি? বরং এরূপ প্রয়োগে সত্য উপলব্ধির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ভাষা যদি অপূর্ণ হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিয়া সত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করাই জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য। অথবা সম্ভবপর হইলে ভাষার অপূর্ণতা দূর করিয়া লওয়াই উচিত। ব্রহ্মোপাসকগণ এদেশে নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন; সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে সাবধান না হইলে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বতন ভাবগুলি সত্যের পূর্ণতা বিলুপ্ত করিবে। এবং অচিরেই পবিত্র শুদ্ধ সত্য অসত্যের সঙ্গমে মলিন বেশ ধারণ করিবে।

ঈশ্বরই সকল ধনের অধিকারী—অতি পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। একদা মহারাজ চর পাঠাইয়া প্রজাদিগকে স্বপুরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাবৃন্দ দলে দলে রাজ বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইল। মহারাজ সভামণ্ডপে পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে প্রজামণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি তোমাদের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইবে। আমি কাহাকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিব না। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে আমি ইচ্ছামত প্রত্যেক প্রজাকেই অধিকার চ্যুত করিতে পারিব। তোমরা ইহা স্মরণ রাখিয়া স্ব স্ব অধিকারে বাস করিবে।" মহারাজ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। প্রজাগণ মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, এবং স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজদত্ত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল এদিকে প্রজাপুঞ্জের প্রত্যেকেই সুখ প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মোহে অভিভূত হইল। পূর্ব্ব স্মৃতি আস্তে আস্তে বিদায় গ্রহণ করিল এবং প্রত্যেকেই আপনাকে মহারাজ প্রদত্ত ভূসম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী মনে করিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর কালচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, তথাপি রাজ ভৃত্য আসিতেছে না। একদিন রাজচর অকস্মাৎ রাজাদেশ ধারণ করিয়া জনপদে উপস্থিত হইল। বিস্মৃতির বশবর্ত্তী প্রজাপুঞ্জ কারণ অনুমান করিতে অসমর্থ হইয়া, রাজভৃত্যের সমুচিত সম্মান করিল না। প্রত্যুত তাহাকে যথেষ্ট অপমানিত করিতে লাগিল। রাজভৃত্য প্রজাদিগের এইরূপ অভাবনীয় দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্ম ব্যথিত হইয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মহারাজ ও প্রজাদিগের ধৃষ্টতার কথা শ্রবণ করিয়া একদল সৈন্য সহ সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। সমর সজ্জা দেখিয়া অহঙ্কৃত প্রজাবৃন্দের অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা দেখিল। কিন্তু দুর্জ্জয় রাজ শক্তির হস্ত হইতে কোন ক্রমেই মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। তারপর অশ্রু মোচন করিতে করিতে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহাদিগের স্মৃতি জাগ্রত করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার

করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই মোহাচ্ছাদিত প্রজাগণের চৈতন্যোদয় হইল না। ক্ষুব্ধ চিত্তে তাহারা গোপনে মহারাজকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

উল্লিখিত আখ্যায়িকাটী পাঠ করিয়া আত্ম জীবনের দিকে লক্ষ পড়িল। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিপতি আমাদিগের প্রত্যেককে আহ্বান করিয়া বহু সম্পত্তি প্রদান করিতেছেন। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অর্থ মান সম্ভ্রম সকলই তাঁহার প্রদত্ত। প্রদানকালে বলিতেছেন "দেখিও, সাবধান! কখনও সুখে উন্মত্ত হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইও না। যাহা লাভ করিলে তাহা তোমার চিরস্থায়ী সম্পত্তি নহে। যখন ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইবে, তখনই ইহা পুনর্গ্রহণ করিব।" সময় স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমরাও মোহে মুগ্ধ হইলাম। পিতৃদত্ত ধন সম্ভোগে উন্মত্ত হইয়া পিতাকে বিস্মৃত হইলাম। অবশেষে মহারাজ একটী দুইটী করিয়া অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন, তবুও চেতনা হইতেছে না। দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছি। হায় কবে এ ভ্রম দূর হইবে। কবে পুণ্য স্মৃতি অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিবে! কবে অনিত্যে নিত্য ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে! পিতঃ! আশীর্ব্বাদ কর। তোমাকেই সর্ব্বদা প্রভু মনে করিয়া জীবন চালাইতে আরম্ভ করি।

মানব প্রেমেই ঈশ্বর প্রেম;—লোকে উচ্চতম হইতে নিম্নতম রাজ কর্ম্মচারীকে সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ তাহারা ইহাদিগকে সাধারণ লোকের মত জ্ঞান করে না; কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া রাজাকেই দেখে। রাজশক্তি ইহাদের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে, রাজবিধি সকল ইহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং ইহারা রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ। এই জন্যই ইহাদিগকে সম্মান করিলে রাজাকেই সম্মান করা হয় এবং ইহাদিগকে অসম্মান করিলে রাজাকে অসম্মান করা হয়। ইহাদিগকে সাধারণ লোকের মত মনে করিলে কখনই লোকে এরূপ ব্যবহার করিত না। সেইরূপ মানুষ যদি ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র হইত, তাহা হইলে সে অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারিত। যখন দেখি যে মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে, তখন আর তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারি না। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু মহত্ব, তাহা তাঁহারই। মানুষের যে জ্ঞান তাহা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানালোকের ক্ষুদ্র একটী কিরণ, মানুষের যে প্রেম তাহা তাঁহার অনন্ত প্রেমসাগরের ক্ষুদ্র একটী তরঙ্গ, মানুষের যে পবিত্রতা তাহা তাঁহার অসীম পবিত্রতার অতি ক্ষীণ আভাস মাত্র। মানুষ তাঁহার মহৎ ভাব সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার। এজন্য যে মানুষকে ভালবাসে সে তাঁহাকেই ভালবাসে, যে মানুষের সেবা করে, সে তাঁহারই সেবা করে এবং যে মানুষকে ঘৃণা করে সে তাঁহারই অবমাননা করে, যে মানুষকে বেদনা দেয় সে তাঁহাকেই আঘাত করে। মানুষের অন্তরালে তিনি চিরদিন রহিয়াছেন।*

অনন্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি;—বাতির আলোক কখনই পৃথিবীকে দিবসের মত আলোকিত করিতে পারে না। বাতির আলোকের ব্যাপ্তি অল্প, এজন্য তাহা অল্প পরিসর স্থানকেই আলোকিত করিতে পারে। পৃথিবী বহু বিস্তৃত, এজন্য তাহাকে আলোকিত করিতে হইলে সূর্য্যের ন্যায় কোনও বৃহৎ আলোকময় পদার্থ চাই। নতুবা তাহার অন্ধকার ঘুচিবে না। সেইরূপ সংসারের ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া মানবের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সকল প্রাণের ক্ষণিক বাসনাকে তৃপ্ত করিতে পারে, কিয়ৎক্ষণের জন্য সুখ দিতে পারে। মানবহৃদয় কিন্তু অনন্ত বস্তুকে চায়, অনন্তের দিকে তাহার স্বভাবতঃই গতি, অনন্তের জন্য তাহা গঠিত। এজন্য অনন্তকে না পাইলে তাহার এ আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না। অনন্ত আকাঙ্ক্ষা দূর করিবার জন্য অনন্ত বস্তুই আবশ্যক। ক্ষুদ্র শিশু যখন মা মা বলিয়া ক্রন্দন করে, তখন যদি অপর কোনও স্ত্রীলোক মায়ের মত সাজিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যায়, শিশু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা নয় জানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইবে। সেইরূপ অনন্তের জন্য পিপাসিত যে প্রাণ, তাহার সেই পিপাসা দূর করিবার জন্য যদি সাংসারিক কোন সুখের বস্তু তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তবে সে প্রাণ সে দিকে চাহিয়া তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয় জানিয়া তৎক্ষণাৎ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঐশী শক্তি

প্রাচীনকালের ঋষিরা ঈশ্বরের শক্তিকে দগ্ধদারু বিনিঃসৃত অনলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অনল যখন দারু অর্থাৎ কাষ্ঠের সহিত থাকে তখনই তাহার দীপ্তি এবং উত্তাপ প্রকাশ পায়। কাষ্ঠ না থাকিলে অনলও থাকে না, আপনাপনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যখন কোন গ্রামের মধ্যে ঘরে আগুন লাগে, যতক্ষণ নিকটে পুড়িবার উপযুক্ত ঘর থাকে, ততক্ষণ সে আগুনের গতিরোধ করাই কঠিন। বায়ু পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্নি এক চাল হইতে আর এক চালে লাফাইয়া যাইতে থাকে; অবশেষে যখন পুড়িবার মত কিছু না থাকে কোন বাগানের বা বনের পাশে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আপনাপনি নিবিয়া যায়। আগুনকে কাষ্ঠরূপ আহার যোগাইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বকালে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ থাকিতেন তাঁহাদিগকে আহিতাগ্নি কহিত; তাঁহারা শৈশবকালে আগুন জ্বালিতেন, কাষ্ঠ যোগাইয়া তাহাকে নির্ব্বাণ হইতে দিতেন না। এখন পারসীকদিগের মধ্যে অগ্নির পূজা প্রচলিত এবং তাঁহারাও তাঁহাদের উপাসনা মন্দিরস্থ অগ্নিকে নির্ব্বাণ হইতে দেন না।

* সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপাসনা মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অগ্নিকে জীবিত রাখিবার পক্ষে যেমন কাষ্ঠের প্রয়োজন, ঐশী শক্তিকে মানবহৃদয়ে প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য তেমনি কিসের আবশ্যক! আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, ঐশী শক্তি যত হৃদয়কে অধিকার করে, তাহার সকল হৃদয়ে চিরদিন প্রজ্বলিত থাকে না। তাহার উত্তাপ কালে জুড়াইয়া যায় তখন মানুষ বাহিরে বেড়ায়, কাজ করে, ধর্ম্ম সাধন করে কিন্তু ভিতরের উত্তাপ টুকু আর থাকে না। ইহার কারণ কি? ইহা যেন ঠিক প্রণয়ের গতির ন্যায়। অনেক সময়ে যুবক যুবতীদিগকে প্রণয়ে পড়িতে শুনা যায়; প্রেমের আগুণ হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আপাদ মস্তক সেই অগ্নিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সমুদয় চিন্তা, সমুদয় ভাব, সমুদয় কামনা, সেই অগ্নির উত্তাপে স্বতেজ হইয়া উঠিল। তখনকার আগ্রহ, ব্যাকুলতা, নিঃস্বার্থতা দেখে কে? সে সময়কার ভাব দেখিলে বোধ হয় সেই পুরুষ সেই রমণীর জন্য জলে ডুবিতে পারে, আগুণে পুড়িতে পারে; সাঁতার দিয়া সমুদ্র পার হইতে পারে। কিন্তু কোন কারণে সেই প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইল না; গুরুজনের প্রতিবন্ধকতা বা অন্য কোন কারণে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই যুবক ক্ষিপ্ত হয়, কি বিষপান করে, কি দেশান্তরী হয়, তাহার স্থির নাই। কিন্তু অপেক্ষা কর, কালের চক্র প্রণয়ও মানে না, বিচ্ছেদ অথবা বিরহও গণনা করে না। কালচক্রে সময় অতীত হইয়া গেল দুই চারি বৎসর নিঃশব্দে জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল, নবীন প্রণয় পুরাতন হইল। দেখি আর সে যুবা সে রমণীর নাম করে না, আর সে উত্তাপ নাই, আর সে ব্যগ্রতা নাই; আর আত্মসমর্পণ নাই। লোকে বলিল ইহার ভালবাসা জুড়াইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের যে ভালবাসা তাহাও কি এই প্রকার জুড়াইয়া যায়? দেখি অনেক স্থলে বাস্তবিক জুড়াইয়া যায়। ধর্ম্মজীবনের প্রথমে যে ব্যাকুলতা বৈরাগ্য, আত্ম সমর্পণ ছিল, তাহা আর থাকে না।

মানবীয় ভালবাসার স্থলে প্রণয় পরিণয়ে পরিণত না হইলে যেমন ভালবাসার শক্তি হয় না, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হওয়া চাই।

ঐশী শক্তি যখন হৃদয়কে অধিকার করে তখন হৃদয়কে পাপ বর্জ্জন ও সাধুতা অর্জ্জনের দিকে প্রেরণ করিতে থাকে। যেমন প্রেরণা আসে অমনি যদি তদনুসারে চলা যায়, তাহা হইলে সেই প্রেরণা জীবনে আরও প্রবল হইতে থাকে, এবং ঐশী শক্তির প্রভাবও সেই সঙ্গে বাড়িতে থাকে। ক্রমে সমগ্র জীবন ঐশী শক্তির অধীন হইয়া পড়ে এবং সেই শক্তি দগ্ধ দ্রাক্ষ বিনিঃসৃত অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে।

অপরদিকে ঐশীশক্তির প্রেরণা যদি অবহেলা করা যায়; সংসারের ক্ষতি গণনা দ্বারা মহৎভাবকে যদি ম্লান করা যায়; ঈশ্বরের প্রেরণা অপেক্ষা মানবের পরামর্শকে যদি শ্রেষ্ঠ স্থলে দেওয়া যায়; ঈশ্বর অপেক্ষা মানবের উপর যদি অধিক নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে তাহার শাস্তি এই হয় যে, সে প্রেরণা আর থাকে না এবং কাষ্ঠাভাবে অগ্নি যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ঐশী শক্তিও তদ্রূপ জুড়াইয়া যায়।

মানব উপাসনা কালে ও আত্মার উচ্চ অবস্থাতে যে সকল পবিত্র ও মহৎভাব প্রাপ্ত হয় নিজ জীবনকে যদি সেই ভাবের অনুসারে বাঁধিতে চেষ্টা না করে, মুখে যে সত্য প্রচার করে, ও হৃদয়ে যে সত্য অনুভব করে জীবনের কোনও বিভাগকে যদি তাহার বিরোধী থাকিতে দেয় তাহা হইলে, তবায় বিশ্বাসের উত্তাপ চলিয়া যায়; তখন সেই সত্য প্রচার করা তাহার পক্ষে তোতা পাখীর কথা কহার ন্যায় হইয়া পড়ে। এই কারণে দুইটী বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হইতে হইবে। একদিকে যেমন ঐশীশক্তির প্রেরণা লাভ করিবার জন্য উৎসুক থাকিতে হইবে, অপরদিকে কাজে তাহার অনুগত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পরিবারিক জীবনে, কি ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে সর্ব্বত্রই ঐশী শক্তির প্রেরণার অধীন থাকিতে হইবে।

একদা আমি একটী সমাজের উৎসবে গিয়াছিলাম, সেখানে এক জন লোক আমাকে বলিলেন, তিনি ওজন সরকার; তিনি যখন জিনিষ পত্রের ওজন লইতে যান তখন যাহারা ওজন দেয় তাহাদিগের নিকট দস্তুরি লইয়া থাকেন, তাহা উচিত কি না? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দস্তুরির অর্থ এই কিনা যে, তাহারা এই জন্য আপনার সন্তোষ সাধন করে যে আপনি ঠিক নমুনার মত জিনিষ মিলাইয়া লইবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন? তিনি বলিলেন হাঁ তাহা বই কি। তখন আমি বলিলাম তবেত আপনি আপনার প্রভুকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। একার্য্যে আপনার পাপ হইতেছে। তিনি বলিলেন "এখন আমার কর্ত্তব্য কি"? আমি বলিলাম দস্তুরি না লওয়া। তিনি বলিলেন "পরিবার চলিবে কিরূপে"। উত্তর—"তাহা আমি জানি না, অন্য কোন বৈধ উপায় অবলম্বন করুন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি আপনার সমগ্র পরিবার পথে পড়িয়া মরিলেও এরূপে অর্থ উপার্জ্জন আপনার বিধেয় নয়। আমি দেখিলাম তিনি মৌনী ও ম্লান হইয়া গেলেন। ভাবে বোধ হইল এত সাহস তাঁহার হইবে না। উঠিয়া আসিবার সময় বাহিরে আসিয়া সেখানকার ব্রাহ্মদিগকে বলিলাম, অমুক ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে থাকিবেন না। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কারণ বলিলাম না। পরে এক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এখন তিনি বিষয়ীর পক্ষে বেশ আছেন, বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছেন, শরীরটা বেশ আরামে আছে, টাকা কড়ি, ধন দৌলত, বাড়ী ঘর, স্ত্রী পুত্র পরিবার, দাস দাসী, সব রহিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি যাহা এক সময়ে একটু জাগিয়াছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের নামে আর রুচি নাই—ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আর ভাল লাগে না—এখন তিনি নিরুপদ্রবে সংসার রাজ্যে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। একবার একটী যুবক আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিল। ছেলেটা যেন আগুণের খাপ্রা, সকল বিষয়ে উৎসাহ স্বার্থনাশে অগ্রসর, পরিশ্রমে কাতর নয়, উপাসনাতে রুচি, সদনুষ্ঠানে অনুরাগ, সকল লক্ষণই সুন্দর। আমরা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরকৃপায় এই একটা ছেলে আসিয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ

ইহার নিকট হইতে অনেক লাভ করিবে। আমরা সকল বিষয়ে তাহার কাজের সহায়তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! কার মরণ যে কোথায় লুকাইয়া থাকে বলা যায় না। একবার সে বাড়ীতে গেল, শুনিলাম সে তাহার হিন্দু আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৌত্তলিক মতে বিবাহ করিয়াছে। সে যে ঈশ্বরের নাম করিয়াছিল এবং তাঁহার উপাসকদিগের সহিত মিশিয়াছিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে! সেই যে নর্ব্বনেশে বিবাহ হইল, সে যুবকটীকে আমরা জন্মের মত হারাইলাম। ব্রহ্মশক্তি অপমানিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন! আর সে আমাদিগের নিকট মুখ দেখাইল না। এইরূপে এই পঁচিশ বৎসরে কত লোকের ভালবাসা যে জুড়াইয়া গেল এবং কতলোক যে ধর্ম্মরাজ্য পরিত্যাগ করিল তাহা বলা যায় না। ব্রহ্মাগ্নি এমন জিনিষ নয় যে তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন এই কথা সত্য, ধর্ম্মসমাজের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপ সত্য। কোন ধর্ম্মসমাজ যদি মুখে বলেন, আমাদের নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, কিন্তু কার্য্যে দেখা যায় তাঁহাদের নির্ভর মানুষের উপরে রহিয়াছে, তাহা হইলে ত্বরায় তাঁহাদের মধ্য হইতে ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। যে সকল উচ্চ উচ্চ সত্য আমরা প্রচার করিব, যদি নিজেরা সরলান্তঃকরণে তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা না করি তবে সে ধর্ম্মসমাজ দ্বারা আর সবই প্রচার হইবে, কেবল ধর্ম্মজীবন গঠন হইবে না; দেশ মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিবে না।

আমরা যতই ব্রহ্মশক্তির প্রেরণার বশবর্ত্তী হইব ততই আমাদের জীবনে ব্রহ্মশক্তি পরিস্ফুট হইবে। যে আমাদের কার্য্য দেখিবে বা সে বিষয়ে চিন্তা করিবে তাহারও হৃদয় অগ্নিময় হইবে। এই একটী কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমরা মুখে যতই প্রচার করি না কেন, আমাদের কার্য্যের অনুধ্যানে যদি অপরের হৃদয় অগ্নিময় না হয়, যদি ঈশ্বর-বিশ্বাস অন্তরে উদ্দীপ্ত না হয়, যদি পবিত্র আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত না হয়, যদি স্বার্থনাশ প্রবৃত্তি প্রবল না হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের দ্বারা কোন কাজ হইতেছে না। দীপাবলার দিন বালকেরা আগে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তৎপরে সেই প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জ্বালিয়া থাকে; প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারও সেইপ্রকারে হয়। ধর্ম্মের বাহিরের সাধন প্রচার করা ও অবলম্বন করা অতি সহজ ব্যাপার। বিনা ব্যয়ে, বিনা আয়াসে, বিনা হৃদয় পরিবর্ত্তনে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ ধর্ম্মের মত প্রচার ও কঠিন কথা নয়; বুদ্ধিমান আচার্য্য হইলে বিশদরূপে বুঝাইয়া তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, লোকের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপ্ত করা; নিদ্রিত অনুতাপকে জাগ্রত করা; সাধুতার আকাঙ্ক্ষাকে অগ্নিশিখার ন্যায় অভ্যুদিত করা; ঈশ্বর-লালসাকে প্রবল করা। এই জিনিষটী আগে দেও, মত ও অনুষ্ঠান পরে আসিবে। এই জিনিষটী দিতে অসমর্থ হও, এবং মত ও অনুষ্ঠানে মানুষকে পরিপক্ক কর, সে সমাজ আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত ব্যক্তির সমাজ হইবে। তাহা জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধমান এবং শোভাশালী হইবে না, কিন্তু মরুপার্শ্বরোপিত বৃক্ষের ন্যায় জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার।

(উদ্ধৃত)

আমাদের কোন কোন ব্রাহ্ম-ভ্রাতার এইরূপ মত যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া উহা যতদূর প্রচারিত হইয়াছে তাহা বড় আশাপ্রদ নহে। তাঁহাদের সংস্কার যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যতদূর প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই এবং উহা দ্বারা দেশের লোকের কুসংস্কার যতদূর দূরীকৃত হইবার ভরসা ছিল তাহা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহা হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চতা এত অধিক যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনায়াসে ও সহজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। মানব মন যে মত ও বিশ্বাসে চিরাভ্যস্ত, বা বহুকাল হইতে অভ্যস্ত, তাহা উন্নত ও সংস্কৃত করা সময়-সাপেক্ষ, এবং উহা যত অধিক পরিমাণে উন্নত ও সংস্কৃত করিতে যাওয়া যায় তত অধিক সময়ের আবশ্যক হয়, ইহা একটী পরম সত্য। একটী জাতির প্রাণে কোন একটী নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া দেওয়া দু দিনের কার্য্য নহে, তাহা শত শত বৎসরের চেষ্টা-সাধ্য। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, বা রাজনীতি, যে কোন বিষয়েরই হউক একটী নূতন উন্নত মত বা একটী নূতন উচ্চতর আদর্শ একটী জাতির মানসিক প্রকৃতিতে বদ্ধমূল করা যে কালসাপেক্ষ, পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাকারবাদী হিন্দুকে নিরাকারবাদী করা, পৌত্তলিক হিন্দুকে ব্রহ্মোপাসক করা, লৌকিক আচারের ক্রীতদাসবৎ অনুবর্ত্তি জাতিকে বিবেকবাণীর সেবক করা, পঞ্চাশ বা একশত বৎসরের কার্য্য নহে। সহস্র সহস্র বৎসর সাকারোপাসনা করিয়া, পুত্তলিকা পূজা করিয়া, এবং বিবেক বাণীর পরিবর্ত্তে আচার ব্যবহারের সেবা করিয়া, যে জাতির মানসিক প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে, সে জাতি যাহাতে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতে পারে এবং বিবেকবাণীরই সেবা করিতে পারে এমন করিয়া তাহার প্রকৃতি উন্নত ও সংস্কৃত করা কি কখন অল্প সময় ও অল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে? হিন্দু জাতির বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও নৈতিক অবস্থা যাহা, এবং ব্রাহ্মসমাজ উহাকে যে উচ্চ আদর্শানুযায়ী করিতে চাহেন, এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিলে এতদূর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে গত ষাইট বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া আমরা নৈরাশ্যকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না।

ব্রাহ্মের বা ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যের পরিমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা ভ্রমান্ধ। অসাক্ষাৎ ভাবে দেশের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে তাহার প্রতি অন্ধ হওয়া উচিত হয়

না। এই যে আজ কাল বহুদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হরিসভা দেখা যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐগুলির জন্মদাতা। এই সকল সভা সাকারবাদী নহে, পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান ভাব যে একেশ্বরোপাসনা তাহাই এই সভাগুলির প্রাণ। যে সকল লোক ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুসমাজচ্যুত হইবার ভয় করেন, কিন্তু সাকারবাদের ও পুত্তলিক পূজার ভ্রমাত্মকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারাই এই সভার সভ্য হয়েন। ইহাঁদিগের অনেকে কার্য্যে ও মতে সঙ্গতি রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না বটে, তথাপি হরিসভার সভ্যগণ সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় হইতে উন্নত ও ব্রাহ্মসমাজের অধিকতর নিকটবর্ত্তী তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরলোকগত দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজও ব্রাহ্মসমাজের সন্তান। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ অঞ্চলীয় অনেকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন দয়ানন্দ স্বরস্বতী ঐ ধর্ম্মমতের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে হিন্দু সমাজচ্যুত হইতে হয় দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মত যে একেশ্বরোপাসনা তাহাই আর্য্যধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আর্য্যধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কোন কোন মত আছে বটে, কিন্তু উহার ভিত্তিভূমি একেশ্বরবাদ। এই আর্য্যধর্ম্ম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে খুব প্রচলিত হইতেছে। হরিসভার ন্যায় আর্য্য সমাজও ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল। আবার আজকাল মান্দ্রাজ প্রদেশে দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও হিন্দু শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া "সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম" নাম দিয়া যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য আছে এবং তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল। ব্রাহ্মধর্ম্ম মান্দ্রাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবার পরে তথায় "সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের" অভ্যুদয় হইয়াছে। এখানেও সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে শিক্ষিত লোকে ব্রাহ্ম না হইয়া দেওয়ান রঘুনাথ রাওর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদিগের বিশ্বাস যে হরিসভা, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্যসভা ও মান্দ্রাজের সংস্কৃত হিন্দু সভার সভ্যগণ ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই সকল সভাগুলি যেন হিন্দুদিগকে ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যেমন কোন কোন ধর্ম্মের মত এই যে অনাদি পুরুষ পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইতে গেলে কোন মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের সাহায্য আবশ্যক, তেমনি আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে গেলে অনেকের পক্ষে উপরোল্লিখিত সংস্কৃত হিন্দু সমাজের কোনটীর মধ্য দিয়া আসা আবশ্যক। ভরসা হয় ঐগুলি ক্রমে অনেকের পক্ষে এইরূপ মধ্যবর্ত্তী সভার কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দ্রুতবেগে প্রচারিত হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রচলিত ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এত উন্নত ও সংস্কৃত যে মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে উহা অল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ উচ্চ ধর্ম্ম এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা উহা যেরূপ শ্রেষ্ঠ তাহাতে বৎসরে বৎসরে উহা সহস্র সহস্র লোক গ্রহণ করিবে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থায় এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না। খ্রীষ্টীয়ান মিসনরিদিগের ন্যায় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে যাইয়া দুই মাসের মধ্যে এক লক্ষ লোককে আমাদিগের উচ্চ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা আমরা ঘৃণা করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের উন্নতি ধীর অথচ স্থির হইবে ইহাই আমরা ন্যায্যরূপে আশা করিতে পারি।

উপসংহারে বলা নিতান্ত আবশ্যক যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ও সংস্কৃত মত অপেক্ষা ব্রাহ্ম জীবনে প্রদর্শিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অধিকতর সহায়তা করিবে।—তত্ত্ববোধিনী।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর।

(হুগলী)

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এখানকার বাবু রতিকান্ত সিংহ রায় মহাশয় প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। রতি বাবুর পুত্র, এককড়ি বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে, তাঁহাদের বাটীতে ও আত্মীয়দিগের মধ্যে আন্দোলন ও কান্না কাটী পড়িয়া যায়; সকলকে সান্ত্বনা দিবার কারণ নীলমণি বাবুকে উহাঁরা এখানে আহ্বান করেন। তিনি এখানে চারি দিন থাকিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—রাত্রে মাধবপুরে রতি বাবুর বাটীতে অনেক গুলি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীর সহিত উপাসনা ও সংকীর্ত্তন। উপদেশ "সকল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর।"

৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার—প্রাতে স্নানান্তে নির্জ্জন বাগানে উপাসনা। রাত্রে রতি বাবুর বৈঠকখানায় উপাসনা। উপদেশ "সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন।"

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—প্রাতে বাহিরগড়ার বাবুদের পূজার দালানে পারিবারিক উপাসনা। উপদেশ "পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাক, ধর্ম্মজীবন আপনাআপনি গঠিত হইবে।" মধ্যাহ্নে "সত্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র সভ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মজীবন গঠন সম্বন্ধে আলোচনা। রাত্রে সামাজিক উপাসনা, সংকীর্ত্তন; উপদেশ "বিপদ আসিলে মানব জীবনে সদ্গুণ ও ঈশ্বর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।" পরে কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় (যেমন—নিয়মিত দৈনিক উপাসনা করিব ইত্যাদি) সমাজের সভ্যদিগের স্বাক্ষর করা।

৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—প্রাতে পারিবারিক উপাসনা, উপদেশ "বিশ্বাস এবং প্রেম ব্যতীত বাহিরের আড়ম্বর অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই।" রাত্রে, মাধবপুরে রতি বাবুর বাটীতে উপাসনা; উপদেশ "সংসারের সহিত আমাদিগের অল্প দিনের সম্বন্ধ, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত অনন্ত কালের সম্বন্ধ"।

এই কয়েক দিনের প্রতিবারের উপাসনায় স্ত্রীলোকেরা অতি আগ্রহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পুরুষদের অপেক্ষা যেন তাঁহাদের ভগবানের নামে বেশী টান। এই কয় দিনের উপাসনা, সংকীর্ত্তন, উপদেশ প্রভৃতি বড় মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নর, নারী, বৃদ্ধ ও যুবা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কাহারও প্রতিকূল ভাব বড় দেখা গেল না। সকলেরই হৃদয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল ও সকলেই মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এখানে এমন অনুকূল বাতাস বহিয়াছে, কাজ করিতে পারিলে বড় সুফল ফলিবার আশা। দুই একটী পরিবারে দৈনিক নিয়মিত পারিবারিক উপাসনা প্রার্থনাদি হইতেছে। 'মা'র জয় হউক।

বুধবার দিন নীলমণি বাবু "হড়া হিন্দুধর্ম্মপ্রচারিণী সভা"র সম্পাদক বাবু বিপিন বিহারী ঘোষাল (হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি সঙ্কলয়িতা) মহাশয়ের বাটী হইয়া যান। তাঁহার সহিত ৩৪ ঘণ্টাকাল আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানা রূপ আলোচনা হয়। বিপিন বাবু স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহাই ঠিক। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা যে ভাবে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেছেন তাহাতে তেমন ফল হইতেছে না। তবে আর কিছু দিন অপেক্ষা করিবেন। 'সত্যের জয় হউক'।

সৈয়দপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন:—

গত ৩০শে বৈশাখ রবিবার বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও আরও দুইটী ভদ্রলোক প্রচারার্থ মহেশ্বরপাশা গ্রামে আগমন করেন। রবিবারে রাত্রিতে বাবু কৈলাসনাথ মজুমদার মহাশয়ের ভবনে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি" এতৎ সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বাবু অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের দূষনীয়তা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয়। বক্তৃতাতে অনেক গুলি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সোমবার প্রত্যূষে নিম্নলিখিত গীতটী লোকের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া পরে বাবু রামলাল মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়।

গীত:—"ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম,
ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর নাম গান।
চেয়ে দেখ বিশ্বজন ব্রহ্মনাম গাইল,
পশু পক্ষী তরুলতা ব্রহ্মানন্দে মাতিল।
নরনারী সবে তবে কোন প্রাণে ভুলে রবে,
বদন ভরিয়ে বল জয় প্রাণারাম।
(জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম, বল জয় প্রাণারাম,
বল জয় জয় প্রাণারাম)
সারানিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,
যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে,
আগে তারে প্রণমিয়ে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
আনন্দে মাতিয়ে বল জয় প্রণারাম।
(জয় প্রাণারাম, জয় প্রাণারাম, বল জয় প্রাণারাম,
বল জয় জয় প্রাণারাম)

বৈকালে দৌলতপুর ছাত্র সভার সভ্যদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে চরিত্রোন্নতি-বিধায়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। রাত্রিতে পুনরায় বাবু রামলাল মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ প্রদত্ত হয়। কয়েকটী ভদ্রমহিলা উপাসনার সময় উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাবু রামলাল মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়। বৈকালে গ্রামস্থ বালকদিগের অনুরোধে বালিকা-বিদ্যালয় গৃহে অতি সুন্দর উপদেশ পূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে বাবু জয়চরণ পাল মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতার কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জন্য হয় নাই। বুধবারে মনোরঞ্জন বাবু খুলনাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় বিশেষ কার্য্যের জন্য চলিয়া যান। আবার পুনরায় গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। রাত্রিতে বাবু জয়চরণ পাল মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা দেন। ভগবানের কৃপায় উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা ইত্যাদি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে একটা আন্দোলনের স্রোত উঠিয়াছে।

অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় গ্রামের একদল অল্প বয়স্ক বালক, যাহারা দুর্নীতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, মনোরঞ্জন বাবুর উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতার দ্বারা তাহাদিগের সকলেরই মনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ৬টী বালকের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত দুঃখের এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যখন গ্রামের এই সকল বালকেরা দুর্নীতির স্রোতে ভাসিতেছিল, তখন ইহাদিগের অভিভাবকেরা কোন প্রকার শাসন কিম্বা উপদেশ দ্বারা সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু এখন যেমন তাহাদিগের ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে—চরিত্রোন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তেমনি অভিভাবকেরা তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন বালকেরা কুকার্য্যের জন্য একত্র মিলিত, তখন অভিভাবকেরা শাসন করিতেন না, কিন্তু এখন তাহারা ধর্ম্মালোচনার জন্য, চরিত্রোন্নতির জন্য মিশিতে গেলে পিতা মাতা হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! কবে এই সকল লোকের চক্ষু ফুটিবে!

বাবু মেঘনাদ মজুমদার পূর্ব্বে মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিবপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি যে মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতা অনন্ত ঈশ্বরের পূজা নহে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত্তিকার শিবকে বিদায় দিয়া অনন্ত মঙ্গলের প্রস্রবণ যিনি তাঁহার পূজায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। গালাগালি তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের অন্তঃকরণে বলের সঞ্চার করুন, যাহাতে তাঁহার সন্তান সকল প্রকার অপমান যাতনা সহ্য করিয়া তাঁহার নাম মহীয়ান্ করিতে পারেন।

যাঁহারা প্রকাশ্যে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন নানা প্রকার কুৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য হিন্দু সমাজের অগ্রণীগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; এবং তাঁহাদের আত্মীয়দিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া যাহাতে তাঁহাদের

দমন হয়, এরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আগুণ কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে কাহার সাধ্য? পূর্ব্বোল্লিখিত দৌলতপুর ছাত্র সভার দ্বারা বালকদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হইতেছিল কিন্তু এই আন্দোলনের পর হইতে বৃদ্ধেরা সভার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস বালকদিগকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য এই সভা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এই সভাতে কোন প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা হয় না। বিশেষতঃ যে সকল বালকের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই এ সভার সভ্য ছিলেন না। যাহাতে এই সভাতে বালকেরা যাইতে না পারে বিশেষ ভাবে এরূপ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ভগবান আমাদিগকে বল বিধান করুন। তাঁহার সত্য জয়যুক্ত হউক।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দের ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে পুনরায় যে পত্র বাহির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনায় এই চিঠিখানি লিখিত হইল।

(১) মন ও আত্মা—মন ও আত্মা সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। মন ও আত্মা প্রকৃত পক্ষে একই বস্তু, তাহা ভগবতী বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মনের অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধাররূপ আত্মার যে অংশ কল্পনা করা হইয়াছে তাহার ধ্বংস হয় কি না তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে আত্মা যতই জ্ঞানে, প্রেমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে ততই যে তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন।

(২) আমার ১লা চৈত্রের চিঠিতে আমি বলিয়াছিলাম যে "যখন তাহাদের (ইতর প্রাণীদিগের) মধ্যে আত্মার একাংশ অর্থাৎ মন দৃষ্ট হইতেছে তখন অপরাংশ অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অপরিস্ফুটভাবে রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে ও হইবে।" এই কথাতে মানবাত্মার পূর্ব্বজন্মেরও কোন প্রমাণ হয় না অথবা তাহাদের (ইতর প্রাণীদের) উন্নতিও অস্বীকার করা হয় না। মানব আত্মা দেহ ত্যাগের পর যেমন উন্নত হইতে উন্নততর, স্থানে যাইবে, ইতর প্রাণীদিগের আত্মারাও তেমন উন্নত হইতে উন্নততর স্থানে যাইতে পারে। ফলতঃ তাহাদের আত্মা যে মানব আত্মাতে পরিণত হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। দুঃখের বিষয় ভগবতী বাবু এই লইয়া কত কি কল্পনা করিয়াছেন ও যথেষ্ট গালাগালি দিয়াছেন। যাক্, সে সমস্ত কথার কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম "দ্বিতীয়, আত্মা সম্বন্ধে পুনর্জন্ম, ইহা অসম্ভব; কারণ হিন্দু দর্শনকর্ত্তাগণ আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন আত্মার একবার জন্ম হয়, তাহার সুকৃতি দুষ্কৃতি ফল ভোগের জন্য সংসারে পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ করে, সুতরাং জন্ম একবারের বেশী কেহ স্বীকার করেন না।" এ কথা বলিবার কারণ এই যে হিন্দুগণই প্রধানতঃ পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহারা কি অর্থে স্বীকার করেন তাহাই দেখাইবার জন্য ঐরূপ লিখিয়াছিলাম। আত্মা যে একবারের বেশী জন্মায় না ও তাহার সুকৃতি দুষ্কৃতি ফল ভোগের জন্য পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ করে—ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই ভগবতী বাবু দেখিতে পারিবেন। তিনি হিন্দু দার্শনিকগণের "আত্মার পুনঃপুনঃ জন্ম" এই মতের প্রমাণ স্বরূপ যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সকল শ্লোকের অর্থ তিনি বোধ হয় প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। সে সকল শ্লোকের অর্থই এই যে এক আত্মার পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ। তাহা না হইলে পুনর্জন্ম কথাই ব্যবহার হইতে পারে না। পুনর্জন্ম কাহার? আত্মার। সেই আত্মা যদি পৃথক্ পৃথক্ হইল তবে তাহার পুনর্জন্ম কি করিয়া সম্ভবে? পুনর্জন্ম বলিলে এক বস্তুরই বার বার জন্ম বুঝায়। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, আশা করি ভগবতী বাবু এখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মদের পুনর্জন্ম স্বীকার না করার কারণ এই যে পুনর্জন্মের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি কি সূত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিব? পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিলে পূর্ব্বজন্মের সহিত ইহজন্মের অবশ্য এমন একটা যোগ সূত্র থাকা চাই যাহা দ্বারা বলিতে পারিব যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম। বলা বাহুল্য যে ইহার এমন কোনও যোগ সূত্র দেখা যাইতেছে না। যদি পূর্ব্বজন্মের সহিত ইহজন্মের কোন যোগ সূত্র না থাকিল তাহা হইলে পূর্ব্বজন্ম কথা বলা কেবল কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বজন্ম অর্থাৎ একই আত্মার বার বার জন্ম আছে অথচ তাহার একত্বের কোনও প্রমাণ নাই—ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা না কল্পনার কথা, ইহার কোন জ্ঞান গত প্রমাণ না পাওয়াতে যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অন্ধ বিশ্বাসী, না—অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অন্ধ বিশ্বাসী, তাহা ভগবতী বাবু নিজেই বিবেচনা করিবেন। পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্য ইত্যাদি স্মরণ না থাকিতে পারে কিন্তু "আমি ছিলাম" এই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মবোধ (self-consciousness) না থাকিলে "আমার পূর্ব্বজন্ম" একথা বলাই সম্ভবে না। ব্রাহ্মদের সাধারণ যুক্তির সহিত এই যুক্তির যে কত তফাৎ তাহা একটু বিশেষ ভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। ভগবতী বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, বা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, বা ভ্রূণ শরীর মধ্যে আত্মা অবস্থিতি করে কি না?" ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে মাতৃ গর্ভে ভ্রূণ দেহে কোন্ সময় আত্মা ভ্রূণের সহিত মিলিত হয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহাতে আত্মা অঙ্কুরাবস্থায় থাকে, তখন তাহার (আত্মার) বিকাশ না হওয়ায় তৎসাময়িক কোন বিষয় স্মরণ হয় না।

বলা বাহুল্য যে একবার জ্ঞানের বিকাশ হইলে তাহা আর নির্ব্বাণ হয় না, তাহা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকে। ভগবতী বাবু কি লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান থাকে না বলেন তাহা কিছুই লেখেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মা যখন দেহ ত্যাগের জন্য উন্মুখ হয়, তখন দেহেতে জ্ঞানের কার্য্য বরং না হওয়াই সম্ভব। আমরা মৃত্যোন্মুখ, ব্যক্তির দেহ দেখিয়া ভাবি যে তাহার আত্ম জ্ঞান নাই কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ ভাবা আমাদের ভ্রম। কারণ যখন আত্মা দেহ হইতে আপন যোগ ক্রমে ক্রমে শিথিল করিতে থাকে তখন শরীরের নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হয় এবং যতই আত্মার যোগ শিথিল হয় ততই শরীরের অবস্থা খারাপ (যাহাকে আমরা অজ্ঞান বা ভীম-রথী বলি) হয়; পরে সম্পূর্ণরূপে আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে একবারে মৃত্যু হয়। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞান থাকে না তাহা নহে। সাধারণ লোকে দেহ ও আত্মাকে এক বলিয়া ভাবে বলিয়া এইরূপ বোধ হয়। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগের যুক্তি বলবান বলিয়া ভগবতী বাবু লিখিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহাকে এই অনুরোধ করি যে যদি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে তিনি কোন বলবৎ যুক্তি দেখাইয়া তাহা প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে করুন নচেৎ এরূপ কল্পনার কথা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার কোনও প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানগত কোন প্রমাণ না থাকায় আমরা বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম আছে বলেন, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাহার প্রমাণ তাঁহাদেরই করা উচিত

(৩) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতা সমন্বয় করিতে গিয়া আমি মুখে দ্বৈতবাদী হইয়া অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছি বলিয়া যে ভগবতী বাবু লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আমি দ্বৈতবাদও সমর্থন করি নাই আর অদ্বৈতবাদও সমর্থন করি নাই। আমার বিবেচনায় এই দুই বাদের কোন বাদই সত্য নহে। আমি অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত (Unity in duality) অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করি এবং তাহাই বলিয়াছি। আমরা সচরাচর যে অর্থে স্বাধীনতা শব্দ ব্যবহার করি বাস্তবিক আমরা সে অর্থে স্বাধীন নহি। ইহা আমি আমার ১৬ই চৈত্রের চিঠিতে লিখিয়াছি এবং এইরূপ ভ্রমের কারণ কি তাহাও দেখাইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তাহার পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। "জীব তাঁহারই (ঈশ্বরের) কর্ত্তৃত্বে চলিতে চলিতে কেবল এক একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতে চেষ্টা করে ইহাই তাহার স্বাধীনতা।" ইহার অর্থ যে কেবল পাপ কার্য্য করে তাহা নহে, পরন্তু পাপ ও পুণ্য এই উভয় কার্য্য করাই ইহার অর্থ। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার যে সমস্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন করিয়া উন্নতির পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন আমি সেই সমস্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন হইয়াই চলিতেছি,—ইহাই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। আমি সেই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীনে থাকিলেও এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম আছে, যাহা আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিপালন করিতে পারি ও ইচ্ছা করিলে কিছু সময়ের * জন্য ভাঙ্গিতেও পারি;—ইহাই স্বাধীনতা, এবং এই অর্থেই "এদিক ওদিক মুখ ফেরান" বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, সে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম রক্ষা ও ভঙ্গ করার জন্য ফলাফল অর্থাৎ প্রতিপালনরূপ পুণ্যের পুরস্কার ও ভঙ্গরূপ পাপের দণ্ড আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয় ইহাতে জীবের স্বাধীনতা অথবা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার কোন বিরোধ নাই। আমাদিগকে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম রক্ষা ও ভঙ্গের ক্ষমতা দিয়া, তাহা কোথায় রক্ষা ও কোথায় ভঙ্গ হইবে এবং তাহার জন্য আমাদিগকে কি ফলভোগ করিতে হইবে, তাহা তিনি অনাদি কাল হইতেই সমস্ত জানিতেছেন †। এখন হয়ত ভগবতী বাবু বলিতে পারেন যে, তিনি যখন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম গুলি কোথায় ভাঙ্গিব ও কোথায় রক্ষা করিব তাহা জানিয়া শুনিয়া এই ক্ষমতা দিয়াছেন, তখন আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, তিনি যেমন এক দিকে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম রক্ষা ও ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন সেইরূপ অপর দিকে আমাদিগকে সদসদ্ বিবেচনা শক্তিও দিয়াছেন। আমরা সেই বিবেচনা শক্তি দ্বারা নিয়ম গুলি বুঝিয়া তদনুসারে চলিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা রক্ষা ও ইচ্ছা করিলে তাহা কিছু সময়ের জন্য ভঙ্গ করিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, তিনি এই নিয়মেই জীবকে সৃষ্টি করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন।

ভগবতী বাবু তাঁহার চিঠির এক স্থানে বলিয়াছেন "ঈশ্বর পরায়ণ ভক্ত হইতে হইলে অন্ধ বিশ্বাসী হইতেই হইবে।" ইহা নিতান্ত অসার কথা। কারণ ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হইলে ঈশ্বরকে না জানিয়া "ঈশ্বর পরায়ণ" এই কথাই বলা যাইতে পারে না। না জানিয়া বিশ্বাস করাকে অবশ্য অন্ধ বিশ্বাস বলিব, কিন্তু আমি এমন অনেক ভক্ত লোককে জানি যাঁহারা কোন বিষয় না জানিয়া কখনও বিশ্বাস করেন না। তবে ভগবতী বাবু তাঁহাদিগকে ভক্ত না বলিতে পারেন। আমি আমার চিঠিতে এমন কোন বিষয় লিখি নাই যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী এবং এমন কথা বলি নাই যাহা আমি জ্ঞান গত বিশ্বাস না করি। তবে ভগবতী বাবু যে সকল কথা বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিবেন "কাজে কিছুই পারিব না, অথচ নিজের অক্ষমতা স্বীকারও করিব না।" যদি কথা যে ভগবতী বাবু লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। এসম্বন্ধে আমি সম্মান লাভের কোন চেষ্টা করি নাই, কেবল সত্যানুরোধে তাঁহার চিঠির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

* কিছু সময়ের জন্য বলিবার কারণ এই যে আমি একবারে সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না, কিছু সময়ের জন্য ভঙ্গ করিলেও পুনরায় আমাকে অনুতপ্ত হইয়া সেই নিয়মের অধীনে আসিতে হইবে।

† এখানে জানা ও করাকে এক বলিয়া কেহ যেন ভ্রম না করেন। আমার সন্তানের অমুক দোষ আছে তাহা আমি জানি কিন্তু তা বলিয়া তাহা আমি করি না তাহা আমার সন্তান করিতেছে। সুতরাং জানা ও করা এক নহে।

জ্ঞান ও আত্মা একই বস্তু ইহার, পরিষ্কার মীমাংসা দেখিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দর্শন সংহিতা নামক প্রবন্ধ সমূহের ও বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে ভগবতী বাবু লিখিয়াছেন যে, "তিনি দুখানি পুস্তকের দোহাই দিয়াছেন, তাহাতে এমন বিশেষ কি যে আছে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। 'আমি বলিতেছি ইহা বৃক্ষ, অতএব তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ইহা সত্যই বৃক্ষ।' উক্ত পুস্তকদ্বয়ে ইহার অধিক আর কিছু আছে কি?" এ সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা এই যে, ভগবতী বাবু বোধ হয় ঐ দুখানি পুস্তকের অন্ততঃ একখানি পুস্তক (ইহা ভগবতী বাবুর কথানুসারে বলিতেছি) আদৌ পড়েন নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন পুস্তক বিশেষ নহে। বিশেষ উহার দর্শন সংহিতা নামক প্রবন্ধ গুলি কোন একখানিতে আবদ্ধ নহে; ১৮০৮ শকের বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১০ শকের আশ্বিন পর্যান্ত ক্রমান্বয়ে (মাঝে মাঝে কয়েক সংখ্যাতে বাহির হয় নাই) বাহির হইয়াছে। সুতরাং ভগবতী বাবুর লেখানুসারে তিনি ইহা পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, পড়িয়া থাকিলে কখনই "দুইখানি পুস্তক" বলিয়া লিখিতেন না; দ্বিতীয় কথা "জ্ঞানের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন হইয়া যদি কেহ বৃক্ষের স্বরূপ, প্রকার ইত্যাদি লক্ষণসকল, সুযুক্তি দ্বারা বাস্তবিক বৃক্ষ দেখাইয়া বলেন —তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, না,—ইহা বৃক্ষ নহে?" অবশ্য এরূপস্থলে তর্কপ্রিয় লোকেরা এই লইয়া তর্ক করিতে পারেন, কিন্তু সত্যানুসরণকারী ব্যক্তি ইহা বৃক্ষ বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে সত্যানুসন্ধান করাই আমার উদ্দেশ্য, যে আলোচনায় সত্যানুসন্ধানের ভাব নাই তাহা লইয়া বৃথা গণ্ডগোল করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই আলোচনাতে সত্যানুসন্ধানের ভাব নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। অতএব ভবিষ্যতে এই প্রকার আলোচনা হইলে তাহাতে যোগ দিতে বিরত থাকিব।

নিবেদক

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

মহাশয়,

আপনি গত ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন:— "অনেক দিন পূর্ব্বে যে সকল কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজে মধ্যে মধ্যে সেই সব কথা উঠিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। জাতিভেদ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কিনা, সম্প্রতি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে। এবিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, যুক্তি তর্ক করিয়া এটী আবার বুঝাইতে হইবে; ইহা আমাদের ধারণা ছিল না।" তৎপরে আপনি এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন যে, "যিনি ঈশ্বরকে মানিতে প্রস্তুত কিন্তু জাতি নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি কিরূপে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত করিবেন?" আপনি যে ভাবে এই প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, দেশের লোকে যে ভাবে জাতিভেদ স্বীকার করেন, ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি লোক ঠিক সেই ভাবে জাতি ভেদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা "মানবের ভ্রাতৃত্ব" স্বীকার করিতে, "ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি প্রেম" করিতে প্রস্তুত নহেন। আত্মমতের প্রতিপক্ষদিগের মতকে এই ভাবে উপস্থিত করা সঙ্গত কিনা তাহা একবার স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে আপনাকে অনুরোধ করি। ব্রাহ্মসমাজ এই দুর্গতির অবস্থায় আসিয়াছে, আমি তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না; বরং গত কালের তুলনায় বর্ত্তমান সময়কে আমি অনেক পরিমাণে উন্নত বলিয়া মনে করি, ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে বিশেষ আশাপ্রদ। আদি ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইতেই ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু নিজ সংস্কার জাতি ভেদের প্রতিকূল হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মের কার্য্য ও বিশ্বাস একরূপ হয় নাই। কার্য্যে ব্রাহ্মেরা অনেক দিন জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রথমে আহার ব্যবহারে জাতিভেদ পরিত্যাগ করা হয়। ক্রমে ক্রমে আদান প্রদানেও জাতিভেদ পরিত্যাগ করা হইতেছে। ব্রাহ্মেরা এপথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন। সুতরাং এসময়ে আপনার পক্ষে নিরাশার ধ্বনি উত্থিত করা কতদূর সঙ্গত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আপনার কাতর ধ্বনির কারণ সম্ভবতঃ কতক অনুভব করিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত নিয়মাবলীর ৩য় নিয়মে সভ্য হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদয় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।" কেহ কেহ এই কথার পূর্ব্বে "পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ" এই কথাগুলি যোগ করিতে চাহেন। এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আলোচনায় জাতিভেদের পক্ষ কেহ সমর্থন করিতেছে, ইহা মনে করা সুসঙ্গত নহে। ভাবিতে কষ্ট হয় যে, আমরা যে সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রস্তুত হই, তাহার যে ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে তাহা আমরা অনেক সময়ে স্মরণ রাখি না এবং নিজ মতের কোন অংশে প্রতিকূল কথা উপস্থিত হইলেই আমরা উত্তেজিত ও বিরক্ত হইয়া থাকি। আলোচ্য বিষয়ে এই ভাবটী অত্যন্ত প্রবল দেখা গিয়াছে। এক পক্ষ এই বিষয়ে অপরাধী, অপর পক্ষ নহেন, এই কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। উভয় পক্ষেরই এসম্বন্ধে দোষ আছে এবং সে দোষ হইতে আমি নিজকেও মুক্ত মনে করিতেছি না। কিন্তু কথায় যে একদেশদর্শিতা ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়, লেখায় তাহার অল্পতা কতক পরিমাণে ঘটিতে পারে এই মনে করিয়াই আপনাকে এই পত্র খানি লিখিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে এখনও এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা সংস্কারে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী হইলেও পৌত্তলিক ব্যবহার ও জাতি

ভেদের শৃঙ্খল হইতে কার্য্য কালে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এতদিন অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। সংশোধিত নিয়মাবলী গৃহীত হইলে, এই সকল লোক আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা সহযোগী বলিয়া আখ্যাত হইবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন,—আমি আশা করি, কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা হইলেই আমি মনে করিব, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় আমরা এ চেষ্টায় সফলতা লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর না হইয়া কেহ ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না, আমরা যদি আপাততঃ ইহা করিয়া উঠিতে পারি, আমি যথেষ্ট লাভ মনে করিব। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি বন্ধু আছেন, যাঁহারা মনে করেন, ইহাই যথেষ্ট নহে। তাঁহারা "জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ" এই কথা গুলি তৃতীয় নিয়মে সন্নিবিষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু এই কথা গুলি সন্নিবেশ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং যাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। বাকুড়ার শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বাবু কেদারনাথ কুলভি মহাশয় এই প্রস্তাবনার একাংশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বোধ হইতেছে। কুলভি মহাশয় বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম হইলে এবং ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করিলেও কেহ পৌত্তলিকতার সংস্রব রাখিতে পারেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। আমিও তাহা বিশ্বাস করি না। সুতরাং "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ" একথার সংযোজন করা কেবল অনাবশ্যক বোধ করি না; বিশেষ আপত্তিজনক মনে করি; কেননা ইহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মের চরিত্রের উপর অন্যায় কলঙ্ক নিক্ষেপ করা হইবে; ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের অগৌরব করা হইবে। যাঁহারা এই কথা দুইটী সংযোজনার জন্য ব্যগ্র তাঁহাদিগের কেহই আমার মতে কুলভি মহাশয়ের কথার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানই পৌত্তলিকতার বিরোধী সুতরাং ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করিয়া লোকে কি রূপে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা আমার বোধের অগম্য। যাঁহারা পূর্ব্বে এই সংযোজনার সমর্থক ছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। ইহার অনাবশ্যকতা যত সহজে বুঝা যায় আমি স্বীকার করিতেছি যে, "জাতি ভেদ পরিত্যাগ" এই কথা সংযোজনার অনাবশ্যকতা প্রতীতি হওয়া তত সহজ নহে। কিন্তু এই শেষোক্ত কথা সংযোজনার যাঁহারা সপক্ষ, তাঁহারা আত্মমত সমর্থন কালে যে সকল যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোথাও ইহা প্রদর্শন করেন নাই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রকার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করিয়াও জাতিচ্যুত হন নাই ব্রাহ্মসমাজে এমন লোক আছেন। বরং যখন ইহা পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তখন অনুষ্ঠানেই যে জাতি ভেদ পরিত্যাগ করা হইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রস্তাব কর্ত্তাদিগের উদ্দেশ্য ইহা নহে। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা অসন্দিগ্ধরূপে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারা "জাতিভেদ পরিত্যাগের" এই অর্থ করিতে চাহেন যে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের সহিত একত্রে পান ভোজন করিবেন এবং বিবাহাদি সূত্রে সম্মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ প্রার্থনীয় পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ ইহা সম্ভাবিত কার্য্যের সীমার মধ্যে রহিয়াছে কি না, তাহাই চিন্তা করা উচিত। আপনি নিজে লিখিয়াছেন, "জ্ঞান অর্থাদি বিষয়ে ভেদাভেদ থাকিবেই থাকিবে।" আপনার যাহা কিছু আপত্তি তাহা এদেশের "জঘন্য বর্ণ ভেদ" সম্বন্ধে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "থাকিবেই থাকিবে," ইহার অর্থ যদি চিরকাল থাকিবে, এই হয়, তবে আমি বলিব, আপনার এমতের সহিত আমার কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই। আমার ভবিষ্যৎ আশার পথ ইহা অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। আমার ধারণা এই, মনুষ্য সমাজক্রমে উন্নতির পথে যত অগ্রসর হইবে, মানুষে মানুষে এখন যত জ্ঞানের বিভেদ রহিয়াছে, ক্রমে তাহা তত খর্ব্ব হইয়া আসিবে। তখন আর জ্ঞান জনিত আভিজাত্য বিদ্যমান থাকিবে না। এ আশা কল্পনা পথের অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে আপাততঃ থাকিলেও ক্রমেই নিকটতর হইয়া আসিতেছে এবং সেই পথে আমাদিগের মন ও শক্তি পরিচালিত হওয়া উচিত। আপাততঃ এ পার্থক্য দূর হইবে, আমিও তাহা মনে করিনা।

এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আপনার সহিত আপনার প্রতিপক্ষগণের মতের বড় বিভেদ নাই। বরং ভবিষ্যতের আশা সম্বন্ধে তাঁহারা আপনার অপেক্ষা অগ্রসর। আপনি বোধ হয় একথা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, যে কারণেই হউক জাতিগত হীনতা, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অনেক প্রকার হীনতার কারণ হইয়াছে। আপনি এ দেশের যে, জঘন্য বর্ণ ভেদের বিরোধী তাহার প্রথমোৎপত্তি যে জ্ঞানবিভেদ জনিত তাহা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, কালক্রমে উহা পুরুষানুক্রমিক আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এ দোষ যে কেবল এদেশেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও এই পুরুষানুক্রমিকতা বিলক্ষণ বিদ্যমান। তথাকার অভিজাত কুলের সকল কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তিই যে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত তাহা নহে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যেও কুলগরিমা যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহারাও হীনজাত পাত্রে কন্যা দান করিতে কিম্বা হীন কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে অসম্মত। সেখানেও ভদ্র বংশে পুরুষানুক্রমিকতার গৌরব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উচ্চ বংশের লোকে নীচ বংশের সহিত বিবাহ সূত্রে সম্মিলিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি গুণবান্ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিও অনেক সময়ে নীচ জাত বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার মূলে কতক পরিমাণে একটী নিগূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই সামাজিকতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং এক স্তরের প্রকৃতি অন্য স্তরের প্রকৃতি হইতে এমন ভাবে অনেকটা স্বতন্ত্র যে, উর্দ্ধের এক স্তর হইতে যদি নিম্নের তিন

চারি স্তর অতিক্রম করিয়া তৎপরবর্ত্তী স্তরে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে এই উভয় স্তরের লোককে এক সমজাতীয় মনুষ্য বলিয়া অনুভব করা কঠিন হইবে। নীচ সংসর্গে আত্ম সমাজের নীচতা লাভ হইতে পারে, এ আশঙ্কা কেবল এদেশের লোকে করেন না, অন্যান্য দেশেও এ আশঙ্কা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং তদনুসারে তথাকার লোকে নীচ সংসর্গে কেবল আদান প্রদানে নয়, পান ভোজনে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিচার না করিয়া যে, যথেচ্ছ ভাবে সকল জাতির সহিত সম্মিলিত হওয়া উচিত নহে, আপনার কোন কোন কথায়ই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে; কেন না আপনিও সকল প্রকার হীন জাত পাত্রেই কন্যা দান ব্যবস্থা করিতেছেন না, কেবল "গুণবান ধর্ম্মশীল" ব্যক্তিকে কন্যা দান না করায় প্রতিবাদ করিতেছেন, এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, গুণ ও ধর্ম্মের কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। একের নিকট যাহা আকাঙ্ক্ষণীয় গুণ ও ধর্ম্ম হইতে পারে, অন্যের নিকট তাহা সমুচিত বলিয়া গণ্য না হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আত্ম কন্যা দানে কেন অসম্মত হইলেন, ইহা বিচার করার ভার যদি সমাজ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক ফলিবার সম্ভাবনা। ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হইতে পারে। কে কাহাকে বিবাহ করিবেন, না করিবেন, তাহা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষের নিজ নিজ বিচার্য্য বিষয়। সমাজ এ বিষয়ে কেবল মাত্র পরামর্শ দিতে পারেন, কোন রূপ অলঙ্ঘনীয় বিধান প্রচলিত করিতে পারেন না। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হইতেছে যে, "জাতি ভেদ পরিত্যাগ" কথা সংযোজনা এরূপ বিধানের সপক্ষতা করিবার উদ্দেশেই প্রস্তাবিত হইয়াছে।

কাহাকে বিবাহ করিব কেবল সে সম্বন্ধে নহে, আমি কাহার সহিত আহার ব্যবহার করিব তাহা নির্ণয় করাও আমারই নিজের কার্য্য, সমাজ সে সম্বন্ধে আমাকে কোন অংশে সঙ্গত ভাবে বাধ্য করিতে পারিবেন না। ইহার দ্বারা মানবের ভ্রাতৃত্ব বিস্মৃত হওয়া হয় না, আত্ম রক্ষণ করা হয়। যে ব্যক্তি মানুষের জন্মগত সীমাকে অতিক্রম করিতে উন্নত হইতে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে মনুষ্যের শক্তি আবদ্ধ রাখিতে চাহে, সেই ব্যক্তিই মানবের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করে এবং জাতিভেদ পোষণ করে। নতুবা যে ব্যক্তি অপর মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আপনার হস্ত নিজ শক্তির অনুরূপ ভাবে প্রসারণ করিয়া দেন, অথবা তাহার উন্নতির প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না করেন, তিনি যদি এই অপর ব্যক্তির সহিত কোন কারণে আহার ব্যবহার করিতে অসম্মত হন, কিংবা বিবাহাদি ক্রিয়া না করেন তাহা হইলেই তিনি জাতি ভেদ রক্ষা করিলেন, আমি একথা বলিতে সম্মত নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে বাধ্য; কেহ যদি মনে করেন যে আমি অমুক ব্যক্তির সহিত সর্ব্ব প্রকার সামাজিকতা সূত্রে আবদ্ধ হইলে আমার নিজ বংশের ক্ষতি করিব, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেরূপ সম্মিলন দূষনীয় হইবে সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই উন্নত হই, ইহাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। নতুবা সকলে অগ্রসর হইতে না পারিলে, সকলেই এক নিম্নস্তরে যাইয়া সমান ভাবে সম্মিলিত হইব, এরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত নহে; তাহার দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না। মনুষ্য যে অনেক পরিমাণে নিজ পিতৃ মাতৃ কুলের গুণ দোষের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। মানসিক শক্তি সম্বন্ধেও যে ইহা ঘটিয়া থাকে গ্যাল্টন তাঁহার "বংশানুক্রমিক প্রতিভা" নামক গ্রন্থে তাহা পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেনই। আমি অবশ্যই একথা বলিতেছি না যে, মানুষ আপনার জন্মগত অবস্থাকে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে পারে না। শারীরিক ব্যাধি লোকে সমুচিত চেষ্টা করিয়া যেমন অনেক সময়ে অতিক্রম করিতে পারে, মানসিক ব্যাধিও সেইরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান সেই ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিলেও কেহ যদি ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়া তাহাকে আত্ম কন্যা দানে অসম্মত হন, তবে যেমন সেই অসম্মত পিতার প্রতি লোকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে কি তাঁহাকে উক্ত পাত্রে নিজ কন্যা দান করিতে বাধ্য করিতে পারেন না, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান সুস্থ মানস হইলেও কেহ যদি আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে নিজ কন্যা দানে অসম্মত হন, তবে সে সম্বন্ধে কাহারও হস্তক্ষেপণ উচিত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষ বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা আছে। পশ্বাদির বংশ সমুন্নত করিবার জন্য যে সকল সাবধানতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, অসাবধানতা বশতঃ তাহাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, মনুষ্য সমাজের উন্নতি পক্ষেও সেই সকল সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ঘটিতে পারে। আমার পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং অদ্য এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সম্ভব নহে। আমি কেবল এই কথাই বলিতে চাহি যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজ বর্ণ অতিক্রম করিয়া অন্য বর্ণের সহিত বিবাহাদি ক্রিয়া সূত্রে আবদ্ধ হইতে না চাহেন এবং সেরূপ করিবার যদি তাহার উপযুক্ত কারণও বিদ্যমান না থাকে, তাহা যদি কেবল মাত্র দুর্ব্বলতা মূলকই হয়, তথাপি তাঁহাকে এই অপরাধে সমাজ বহির্ভূত করা উচিত নহে; সদ্ভাবের দ্বারা তাঁহার দুর্ব্বলতাকে বিদূরিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। দুর্ব্বলের সাহায্যের জন্য সবলের হস্ত প্রসারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি যখন শত শত বিষয়ে আত্ম দুর্ব্বলতা স্মরণ করি, তখন অন্য দুর্ব্বলের প্রতি—যাঁহাদিগের দুর্ব্বলতা আমার অপেক্ষা অনেকাংশে অল্প তাঁহাদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি না জন্মিয়া পারে না। আমি নিজে দুর্ব্বল হইয়া সবলতার গর্ব্ব কিরূপে করিব, যাঁহারা আমার ন্যায় সন্তরণ করিয়া তীরবর্ত্তী হইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে কিরূপে সাগর গর্ভে ডুবাইয়া দিব। তাঁহারা অন্য লোকের সহিত সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না, বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ভাব প্রদর্শন করিতে অধিকারী? যাঁহারা আপনার মতের অনুকূলে অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের অনেকেই এইভাবে পরিচালিত হইয়াছিলেন। এই অপরাধে যদি তাঁহাদিগকে আপনি "ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত" হইবার পক্ষে অনধিকারী মনে করেন, সে অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। কিন্তু আমার ধারণা এই, এক দিনে কখন কোন দেশ বা সমাজ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার অধিকারী হয় না। কেবল মাত্র নিয়মের দ্বারা কোন দেশে ধর্ম্ম, পবিত্রতা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অগ্রে লোকের অভিমত সংগঠনে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় শনিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

সংশয়-বিকার।

পবিত্রতা সিংহাসনে তুমি প্রতিষ্ঠিত ;
অপবিত্র চিত্ত মোর পাপেতে জড়িত ;
অপবিত্র চক্ষে চাই, তোমা না দেখিতে পাই,
সন্দেহে আকুল মন হয় আন্দোলিত ;
শোন কিনা শোন কথা, হই সংশয়িত।

প্রবৃত্তি-হুতাশে পুড়ে হৃদয় অঙ্গার,
সুনির্ম্মল প্রেম তাহে না হয় সঞ্চার ;
নীরস হৃদয়ে ডাকি, অন্ধপ্রায় পড়ে থাকি,
মোহের আঁধারে চিত্তে সংশয়-বিকার ;
প্রেমসিন্ধু তুমি কিনা ভাবি বার বার।

দেও শক্তি শক্তিশালী প্রবৃত্তি দলনে,
দেও জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় এ অন্ধ নয়নে ;
সংশয় কুয়াসা ঘোর, সে আলোকে যাক্ মোর,
দেখি আমি পুণ্যময়ে হৃদয়-আসনে ;
দেখিয়া কৃতার্থ হই প্রেম আস্বাদনে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

যেখানে প্রেম সেইখানেই গুণ কীর্ত্তন।—সংসারে দেখিতে পাই যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গুণ শত মুখে বলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান, স্নেহময় জনকের গুণ বর্ণনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না ; জননী-অনুরক্তা বালিকা মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই পরম আনন্দ অনুভব করে ; পতিব্রতা রমণী পতির গুণ বর্ণনা করিয়া রসনার সার্থকতা অনুভব করেন ; স্নেহময়ী সহোদরা প্রাণপ্রতিম সহোদরের সৎ কীর্ত্তি প্রচার করিয়া সুখী হইয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রেমিকের চক্ষে প্রেমের বস্তুর দোষ ও গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রেমিক যখন প্রেমের দূরবীক্ষণ যোগে প্রেমের বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, তখন তাহার চরিত্রের অতি নিষ্প্রভ নক্ষত্রটী উজ্জ্বল আলোকে জ্বলিতে থাকে। প্রেমিক দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হন ; এবং প্রেমের দূরবীক্ষণ অপরের চক্ষে সংযোজন করিয়া সেই আনন্দের অধিকারী করিবার জন্য ব্যস্ত হন। পৃথিবীর প্রেমিক গণ নিত সন্তার গুণ গানে যদি এতদূর ব্যস্ত হন তবে আমরা কেন অলস থাকিব। আমরা কি সেই প্রেমময়, সন্তান-বৎসল পরম পিতার পুত্র কন্যা নই। আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছি, কিন্তু এই কি আমাদের প্রেমের পরিচয়! আমাদের পিতা রূপে গুণে অনুপম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রূপবান, গুণবান পবিত্র-চরিত্র সাধু সাধ্বীও তাঁহার সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া যান। সূর্য্যোদয়ে যেমন নক্ষত্ররাজীর ক্ষীণালোক অদৃশ্য হইয়া পড়ে ; সেইরূপ পরম পিতার অনন্ত জ্যোতির আভায় পড়িয়া সকলই নিস্তেজ হইয়া যায়। এরূপ পিতার মহিমা কীর্ত্তন, গুণ প্রচারে যদি আমাদের দুর্বল রসনা নিয়োজিত না হইল, তাহা হইলে কোন্ মুখে পিতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব? প্রচার কার্য্য কেবল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষরূপে মনোনীত কতিপয় ব্যক্তির কার্য্য নহে? পরম ব্রহ্মের প্রত্যেক প্রেমিক পুত্র কন্যা তাঁহার গুণ বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

সহিষ্ণুতা ও সাধন।—একজন পথিক গ্রীষ্মকালে এক মাঠের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন। যতই সূর্য্যের তাপ বাড়িতে লাগিল ততই পথিক শ্রান্ত হইতে লাগিলেন। পরে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন। কোথায় গেলে শান্তি পাইবেন, তাপ দগ্ধ শরীর শীতল করিবেন তাহারই জন্য ব্যস্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও শান্তিস্থল দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে সন্তাপহারিণী আশাকে সহচরী করিয়া সাহসের সহিত পথ চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অদূরে এক বিশাল বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, অমনি আনন্দিত চিত্তে তাহার দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে সেই বটবৃক্ষ তলে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন আরও দুই চার জন পথিক তথায় বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। তাহাদের দৃষ্টান্তে নবাগত পথিকও বৃক্ষতলে ছায়োপরি উপবেশন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। ভ্রমণকালে যে তেজোরাশি তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে অসহ্য যাতনা প্রদান

করিতেছিল। বহুক্ষণ চলিয়া গেল, তাঁহার উত্তপ্ত শরীর শীতল হইতেছে না। তিনি আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। বট বৃক্ষ তলে বসাতে ফল নাই বিবেচনা করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। অন্যান্য পথিকগণ অবাক্ হইয়া পথিকের এইরূপ ব্যবহার অবলোকন করিতে লাগিল। ঠিক্ এই প্রকার সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে আমাদের অনেকেই শ্রান্ত হইয়া শান্তি লাভের আশায় শান্তিময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু শরীরের উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে যে কাল বিলম্বের প্রয়োজন আমাদের অনেকেরই ততক্ষণ ধৈর্য্য থাকে না। পুনর্ব্বার শান্তিময়ের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সংসারকে অন্বেষণ করি। এ আমাদের বিষম ভ্রান্তি। যখন আমরা পরম ব্রহ্মের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিতে যাইয়া দেখি যে মন স্থির হইতেছে না, প্রাণ সেই প্রাণেশ্বরের সংসর্গে অধীর হইয়া পড়িতেছে, তখন ইহাই মনে করা উচিত যে বিষয়ের উত্তাপই আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে। যিনি শান্তিময় তাঁহার সহবাস কখনও অশান্তি আনয়ন করিতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে অবশেষে চিত্ত-চাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া যায়। যাঁহারা উপাসনার উপর দোষারোপ করিয়া পুনর্ব্বার সংসারের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। বিষয়ের ক্রোড়ে ছুটিয়া যান, তাঁহারা উল্লিখিত পথিকের মত।

স্বার্থপর ধর্ম্মসাধন।—অতি প্রাচীনতম কাল হইতে মানুষ আপনার সুখ দুঃখ ইষ্ট দেবতাকে জানাইয়াছে। বেদের মধ্যে এরূপ প্রার্থনা দেখা যায়—"আমাদিগকে গরু দেও দুগ্ধ পান করি"—"ধন দেও সুখে দি," এই সকল প্রার্থনার মধ্যে একদিকে কেমন শিশুর সরলতা নিহিত রহিয়াছে। ভারতীয় আর্য্য সমাজের আদিম অবস্থায়, যখন অনাহার-ক্লেশ ও দারিদ্র্য দুঃখে লোক ম্লান হইয়া থাকিত, তখন এইরূপ সরল প্রার্থনাই স্বাভাবিক ভাবকে ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু এরূপ প্রার্থনার আর একদিক আছে—ইষ্ট দেবতার শরণাগত হই কেন? কারণ তাঁহার দ্বারা কিছু ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে; কারণ তিনি দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন ও সুখ দিতে পারেন। এরূপ ডাকার সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে। সহরে একজন ডাক্তার আছেন। অসৎ লোক বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করে; অসৎ জীবনের জন্য সকলেই তাঁহার নিন্দা করে, কিন্তু তথাপি বাড়ীতে কঠিন রোগ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লোকে ডাকিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে কি করি,—প্রাণের দায়ে ডাকিতে হয়। সে ডাক্তারের সহিত যেমন প্রেমের সম্বন্ধ নাই,—সেইরূপ ভয় বা স্বার্থের প্ররোচনাতে মানুষ যে ইষ্ট দেবতাকে ডাকে তাহার সঙ্গেও প্রেমের সম্বন্ধ না থাকিতে পারে।

উপাসনার পূর্ব্ব এবং পর।—উপাসক উপাসনার পূর্ব্বে কখনও কোন হাল্কা বা অসার বিষয় লইয়া কথোপকথন করিবেন না। যখন উপাসনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, তখন হইতে উপাসনার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা বলিবেন যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরের সহবাসের জন্য লালায়িত হয় এবং উপাসনা শেষেও কখনও তেমন বিষয় লইয়া কথোপকথন করিবেন না, যাহাতে উপাসনার গাম্ভীর্য্য বা যাহা কিছু প্রাণে পাইয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অনেক উপাসক এইরূপে উপাসনার পূর্ব্বে এবং পর সময় ব্যবহার করিতে না জানিয়া সামাজিক উপাসনার কি নির্জ্জন উপাসনার ফল হারাইয়া শুষ্ক হইয়া পড়েন; অবশেষে সাধন বিরোধী হন। উপাসকগণের এবিষয়ে খুব দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

আচার্য্যের উপদেশ।—উপদেশ দিতে হয় দিলাম, বা শুনিতে হয় শুনিলাম, এরূপ ভাবের উপদেশ দেওয়া বা শুনায় কোন ফল নাই। অবশ্য যিনি দেন তিনি প্রাণের ব্যাকুলতায় এবং নিজ কর্ত্তব্য বোধেই দেন, তবে সকল সময় তেমন প্রাণ-স্পর্শী উপদেশ না হইতে পারে। কিন্তু উপাসক বা শ্রোতাগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া না শুনিলে সবই বিফল, তৎপর শুনিলেই হইবে না, যাহাতে জীবনে সেই সব সত্য প্রতিপালিত হয়, যাহাতে সেইসব সাধনে জীবন গঠিত হয়, তাহা করা প্রয়োজন, উপাসকগণের বা শ্রোতাদের এবিষয়ে যেমন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, আচার্য্য বা উপদেষ্টা শুধু উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত হইবেন না, তাঁহারও তৎসাধনে সহায়তা করা আবশ্যক। এবিষয় উভয় পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি না থাকাতেই এমন সব সুন্দর সুন্দর উপদেশ যেন মাঠে মারা যাইতেছে, অনেক বিষয় আলোচনা অপেক্ষা এবিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা ভাল এবং সেই বিষয় জীবনে কতদূর সাধিত হইল, সে বিষয় বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক, যতদিন এইরূপ চেষ্টা না হইবে, ততদিন অনেক ভাল কথা উপদেশের স্থলেই থাকিয়া যাইবে, আচার্য্য ও উপাসক বা শ্রোতাগণের এবিষয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক।

সামাজিক উপাসনার ব্যবস্থা।—যদি নেতার অধীন হওয়া কোন স্থানে আবশ্যক হয়, তাহা সংগীতের স্থলে। তানপুরাটী আগে বাঁধিয়া তবে তাহার সঙ্গে আর সমুদায় যন্ত্রকে বাঁধিতে হয়, তবেই সুস্বর উৎপন্ন হয়। সংগীতের পক্ষেও সেইরূপ; যিনি গান ধরিবেন অপর সকলকে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। নতুবা সুস্বর থাকিবে না। যে গায়ক মণ্ডলীতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই নেতা হইবার জন্য ব্যগ্র, কেহই নেতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, সেখানে গানের অতি দুরবস্থা বটে। আমরা অনেক ব্রাহ্ম সমাজে এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়াছি। ব্রাহ্মমাত্রেই দুইটী কাজ করিতে পারেন;—প্রথম, ব্রাহ্মমাত্রেই বক্তৃতা করিতে পারেন, দ্বিতীয় ব্রাহ্মমাত্রেই গান করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মমাত্রেই স্ব স্ব প্রধান গায়ক হওয়াতে উপাসনা কালে বড় গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা ব্রাহ্মদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি,—তাঁহারা একটা নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিবেন। যে ব্যক্তির গাহিবার শক্তি আছে, এবং লোকে যাঁহার গান শুনিতে ভালবাসে,এরূপ ব্যক্তি গান ধরিলে তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়াইয়া

স্বতন্ত্র ভাবে চলিবার চেষ্টা করিবেন না, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন। যাঁহারা বাদক তাঁহারাও এই কথা মনে রাখিবেন, যে গানের সঙ্গে যাইবার জন্যই বাদ্য—বাদ্য যদি গানকে চাপা দেয়, তবে তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ হয়।

নিত্যসাধন—উপাসনা কাহাকে বলে ব্রাহ্ম মাত্রেই জানেন, পরমেশ্বরেতে প্রীতি সংস্থাপন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন, নিত্য ঈশ্বরের আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ নিত্য জ্ঞান অর্জ্জন এবং পরোপকার সাধন আবশ্যক। প্রীতির অঙ্গ সকলও যেমন পূর্ণভাবে সাধন না করিলে আত্মার বিকাশ হয় না, সেইরূপ প্রিয় কার্য্য সাধন না করিলেও আত্মার পূর্ণ বিকাশ হয় না, যিনি শুধু আরাধনা করেন অপর দুটী করেন না তাঁহার আত্মার বিকাশ হওয়া যেমন অসম্ভব সেইরূপ যিনি দানাদি করেন কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করেন না তাঁহার আত্মারও বিকাশ অসম্ভব। সাধক নিত্য জীবনে এই সব পূর্ণরূপে সাধন করিবেন। পূর্ণাঙ্গ সাধনের অভাবেই এমন সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধক কৃতার্থ হইতে পারিতেছেন না। তাই সাধন প্রণালী সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ভজনালয়—যদিও এমন কুসংস্কার কাহারও নাই যে ভজনালয় ব্যতীত ঈশ্বর আর কোথাও নাই বা আর কোথাও তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না; কিন্তু তবুও এ স্থানের বিশেষ মর্য্যাদা আছে; এস্থানের বিশেষ উপকারিতা আছে। ভজনালয় কখন আমোদ প্রমোদের স্থান করিবেন না; সেখানে সংসারের বাজে কথা, সেখানে বাজে বিষয় আলোচনা বা পাঠ করিবেন না; অনেক লোক ভজনা করিতে যাইয়াও বাজে আলাপ ছাড়িতে পারেন না বা বাজে কথা ভুলিতে পারেন না। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা যে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করেন তাহা নহে অপরেরও অনিষ্ট করেন। এস্থান সেই জন্য যাহাতে প্রাণেশ্বরকে বিশেষরূপে প্রাণে অনুভব করিবেন, এস্থান সেই ভাবই উদ্দীপিত করিবে যাহাতে পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়; বাজে আলাপে বাজে কথায় সে ভাবকে নষ্ট করা উচিত নয়, উপাসকগণের এবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত।

আচার্য্য ও উপাসকগণ—ইঁহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অতি পবিত্র, যদিও গুরু মানি না মধ্যবর্ত্তী মানি না কিন্তু যখন সামাজিক উপাসনায় বসি তখন আচার্য্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন; তাঁহার কথার প্রতি আস্থা এবং সম্মান প্রদর্শন প্রয়োজন; তিনি যে সরল বিশ্বাসে প্রাণের অনুভবের কথা বলিতেছেন ইহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন নতুবা এমন পবিত্র সম্বন্ধও অতি হীন হইয়া যায় এবং সামাজিক উপাসনা বিফল হইয়া যায়, আচার্য্য উপাসকগণের সাহায্য করিবেন এবং উপাসকগণও আচার্য্যকে সহায়তা করিবেন কিন্তু প্রত্যেকেই সেই প্রাণস্বরূপের সঙ্গে প্রাণের সাক্ষাৎ যোগে উপাসনা করিবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার।

এখন আমাদিগকে দুইটী বিষয় ভাবিতে হইতেছে। প্রথম কিরূপে দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়—দ্বিতীয় যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কি উপায় বিধান করা যায়। বিবেচনা করিতে গেলে প্রথম লক্ষটী সুসিদ্ধ হওয়া দ্বিতীয়টীর সুব্যবস্থার উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ যাহাদিগকে ক্রোড়ে পাইয়াছি, যাঁহারা সকল দিক ঘুচাইয়া আমাদের সঙ্গে ভাসিয়াছে, তাহাদের উন্নতির যদি সদুপায় না হয়, তাহারা ও তাহাদের বংশজাত ব্যক্তিগণ কালক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে যদি বিচ্যুত হইতে থাকে, তাহাদের আচরণে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বাহিরের প্রচারও কালে বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি মানুষ আনিবার জন্য একটী দ্বার খুলিয়া রাখি, কিন্তু ঘরের লোককে বাহির করিবার জন্য দশটী দ্বার খুলিয়া রাখি, তাহা হইলে প্রচারের ফল কিরূপ হয় সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

এই কারণে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত নরনারী বালক বালিকার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এই দৃষ্টি রাখিতে হইলে কতপ্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত ও হইতে পারে তাহার সবিস্তর আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সম্প্রতি যে কয়েকটী বিষয়ের সুব্যবস্থার অভাবে ব্রাহ্মগণের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, এবং যে বিষয়ে ত্বরায় কোন না কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম,—মফস্বলে যে সকল ব্রাহ্ম-পরিবার বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ঘরে ছেলে মেয়ে দিন দিন বড় হইতেছে। তাঁহারা যেখানে আছেন সেখানে বালকদিগের পড়িবার মত বিদ্যালয় বরং এক প্রকার পাওয়া যায়, কিন্তু বালিকাদিগের সুশিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় দৃষ্ট হয় না। মফস্বলে যে সকল বালিকা-বিদ্যালয় আছে তাহাদের অবস্থা অতি হীন। ব্রাহ্মেরা কন্যাদিগকে যেরূপ লেখাপড়া শিখাইতে চান, সেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা দিবার উপায় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মেরা কন্যাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখেন। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মফস্বলের বালিকাবিদ্যালয়ে বড় বড় মেয়ে পাঠান যায় না। চারিদিকের কুসংস্কারাপন্ন ও প্রতিকূল ভাবাপন্ন লোকের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্ম গৃহস্থ বড় বড় অবিবাহিত মেয়ে লইয়া বাস করেন; সুতরাং চারিদিকের কুশিক্ষা হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত ও সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এই সকল কারণে সকল ব্রাহ্ম পিতা মাতাই বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাদিগকে কলিকাতাতে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা

করেন। কিন্তু সহরে এরূপ বালক বালিকাদিগের থাকিবার স্থান নাই। এক বেথুন স্কুল, যেখানে গবর্ণমেণ্ট অনেক অনুগ্রহ করিয়া মেয়েদের থাকিবার ব্যয় মাসে ১১ টাকা মাত্র করিয়াছেন। প্রত্যেক মেয়েতে তাঁহাদের যে ব্যয় হয়, ১১ টাকাতে তাহার অতি অল্পই সাহায্য হয়। সেখানে মেয়েদের থাকিবার যেরূপ সুব্যবস্থা ও যাঁহাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার আছে, তাঁহারা যেরূপ সুযোগ্য লোক, তাহাতে এই অল্প ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য যে সকল ব্রাহ্মের অর্থ সঙ্গতি আছে তাঁহাদিগকে এখানে কন্যাদিগকে রাখিতে আমরা অনুরোধ করি। কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মদিগের অর্থ সঙ্গতি অতি অল্প। এক একটী কন্যার প্রতি মাসিক ১১ টাকা ব্যয় করিতে অনেকে অসমর্থ। অথচ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম বালিকার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যভার যাঁহাদের প্রতি অর্পিত আছে তাঁহাদের ইহা একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। কলিকাতাতে যদি কন্যাদিগকে রাখিতে হয় তবে বেথুন স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য; কারণ সেখানে অতি উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতাতে বাঙ্গালির মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্টতর বিদ্যালয় আর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতাতে থাকিয়া ব্রাহ্মদের কন্যাগণ বেথুন স্কুলে পাঠ করিতে পারে অথচ ব্যয় অল্প হয় এরূপ কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব কি না? মনে কর কোন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার তত্ত্বাবধানে যদি এমন একটী বাড়ী রাখা যায় যেখানে ব্রাহ্মদের কন্যাগণ আসিয়া থাকিবে; সেখানে তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা ও উপাসনাদির বন্দোবস্ত থাকিবে; গার্হস্থ্য কার্য্যাদি ও শিল্প প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইবে; তাহারা দিবাভাগে বেথুন স্কুলে গিয়া পড়িয়া আসিবে। লেখা পড়ার জন্য স্কুল—ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভার আমাদের প্রতি। এরূপ একটী বোর্ডিং খুলিলে অনেক বালিকা যোটে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ভাবিবার বিষয় দুইটী আছে—প্রথম, ভার লইবার উপযুক্ত লোক কোথায় পাওয়া যায়; দ্বিতীয় এরূপ একটী বিদ্যালয় রাখিতে যে ব্যয় হইবে তত ব্যয় সকলে দিতে পারিবেন কি না? আমরা বেশ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, স্কুলের বেতন ২্ টাকা বাদ দিয়াও প্রত্যেক মেয়ে পিছু ৮।৯ টাকা পড়ে। সেই ১১ টাকা। খ্রীষ্টীয় সমাজের লোকেরা চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া দরিদ্র খ্রীষ্টানদিগের মেয়েদিগকে পড়াইয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সেরূপ সাহায্য করিবার লোক কই। অথচ এবিষয়ে একটা কিছু করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

কেবল ব্রাহ্মদের কন্যাদের বিষয় ভাবিলেও চলিবে না। ব্রাহ্ম বালকদিগেরও থাকিবার একটা স্থান করা কর্ত্তব্য। কলিকাতাতে অনেক ছাত্রদের বাসা আছে—সেখানে ছাত্রগণ আপনাপনি সকল বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। তাঁহাদের উপরে কেহ থাকে না; সমবয়স্কদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে; শাসন করিবার কেহ থাকে না। এইরূপ অসংযত অবস্থাতে থাকাতে অনেক বালকের চরিত্রে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্ম বালকদিগকে ওরূপ অবস্থাতে না রাখিয়া কোন উপযুক্ত চরিত্রবান ব্রাহ্মের তত্ত্বাবধানে একটী বোর্ডিং হওয়া কর্ত্তব্য। সেখানে ব্রাহ্ম বালকদিগকে রীতিমত ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে ও তাহাদের চরিত্র ও আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। এবারে অনেক গুলি মফস্বলবাসি ব্রাহ্মের পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের থাকিবার স্থান করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। উপযুক্ত স্থানাভাবে রাখিতে পারিতেছেন না। বৎসর বৎসর এই অভাব আরও প্রবল রূপে অনুভূত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার যাঁহাদের প্রতি আছে তাঁহারা যদি ইহার একটা উপায় না করেন, ব্রাহ্ম বালক গুলি কালে তাঁহাদের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে।

এই দুইটী বিষয়ে কোন উপায় করা যায় কি না ত্বরায় চিন্তা করা প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল, যাঁহাদিগকে বিধাতা অর্থসঙ্গতি দিয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। যদি তাঁহারা পরস্পরের ভার বহন না করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইবে।

অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা।

একজন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন, সরলতা ও অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা এই উভয় পক্ষের উপরে ভর করিয়া মানবাত্মা ঈশ্বরের চরণাকাশে উঠিয়া থাকে। অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রেমিক সাধকেরা বলিয়াছেন—সর্ব্ব কার্য্যে নিজের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করার নামই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। সাধক মাত্রেই জানেন, ধর্ম্ম জীবনের সকল প্রকার কঠিন সাধনের মধ্যে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। স্বার্থ-প্রবৃত্তি বা সুখাশা বা যশোলিপ্সা, বা অন্য কোন প্রকার নিকৃষ্ট বাসনা অনেক সময় এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের হৃদয়ে নিহিত হইয়া থাকে, যে আমরা নিতান্ত সতর্ক থাকিয়াও অনেক সময়ে তাহা লক্ষ্য করিতে পারি না। যখন আমরা মনে করিতেছি যে আমরা বিশুদ্ধ সাধু ভাবেই কার্য্য করিতেছি—তখন হয়ত গূঢ়রূপে কোন একটা মলিন ভাব তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আবার অনেক সময় এরূপ হয় যে কার্য্যারম্ভ করিবার সময়, অতি মহৎ ও উদার ভাবেই কার্য্যারম্ভ করা গিয়াছে, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে তন্মধ্যে যশঃস্পৃহা বা সুখাসক্তি কিম্বা অন্য কোন ভাব অলক্ষিত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা বিষয়ে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু একবার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। মহীরাবণ রাম লক্ষণকে চুরি করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছে। শিবির মধ্যে উভয় ভ্রাতা নিদ্রিত; দ্বারে স্বয়ং পবন-নন্দন দ্বার-পাল। বিভীষণ সকল প্রকার রাক্ষসী মায়ার গূঢ় তত্ত্ব জানিতেন। তিনি মহীরাবণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হনুকে সাবধান করিয়া বলিয়া গেলেন,—"কাহাকেও আজ রাত্রে দ্বার ছাড়িবে না, এমন কি স্বয়ং রাণী কৌশল্যা যদি

উপস্থিত হন, তাঁহাকেও দ্বার ছাড়িবে না। বিভীষণ চলিয়া গেলেন কিয়ৎক্ষণ পরেই মহীরাবণ নানারূপ ধরিয়া দ্বারে আসিতে লাগিল। হনূ কিছুতেই দ্বার ছাড়িল না। অবশেষে চতুর রাক্ষস স্বয়ং বিভীষণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। এইবার হনূর বুদ্ধিতে আর কুলাইল না। হনূ দ্বার ছাড়িয়া দিল। মানবের ভাগ্যে ও এইরূপ অবস্থা সময়ে সময়ে ঘটে। যে বিবেকের আদেশ ক্রমে মানব জাগ্রত থাকে এবং সকল প্রকার অসাধু ভাবকে হৃদয়ে প্রবৃষ্ট হইতে দেয় না—কোন কোন সময়ে অসাধুভাব সেই বিবেকের আকার ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং হৃদয়ে অবাধে প্রবিষ্ট হয়। আমরা একটু সতর্কতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য পরিদর্শন করিলেই দেখিতে পাইব যে অনেক সময়ে একটা সামান্য হীনভাব বিবেকের আকার ধারণ করিয়া হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে।

ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অধিক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। দলাদলির বিষয় চিন্তা করিলেই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দলাদলির বশবর্ত্তী হইয়া এক দল অপর দলকে এত নির্য্যাতন করিয়াছে, এত বিদ্বেষ করিয়াছে, যাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অপর মানুষকে এত প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছে, যে কোন দস্যু বা তস্কর বা নর-হত্যাকারী, তত নির্দ্দয়তা স্বপ্নেও দেখে নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায়, ধর্ম্মান্ধতানিবন্ধন এক দল লোক অপর দলকে ধরিয়া তপ্ত তৈলের কটাহে ভাজিয়াছে; গায়ের মাংস সাঁড়াশি দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মারিয়াছে; বোলতা ভীমরুল দ্বারা দংশন করাইয়া মারিয়াছে; দুই দিন তিন দিন ধরিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হত্যা করিয়াছে; তপ্ত অঙ্গারের কটাহ পেটে বসাইয়া দিয়া উদর দগ্ধ করিয়া মারিয়াছে; অসহায়া রমণীদিগকে দুর্বৃত্ত দানব সমান পুরুষদিগের হস্তে দিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করাইয়াছে। এই সকল অত্যাচার যাহারা করিয়াছে তাহারা কি সকলেই অসৎ লোক ছিল? তাহা নহে। তাহাদের অনেকেই ধর্ম্মানুরাগী ও বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই কাজ করিয়াছিলেন; হৃদয়ের অতি দূষিত ভাবকে তাঁহারা বিবেকানুমোদিত মনে করিয়াছিলেন; মানুষের রক্ত পাত করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিলাম বলিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত বিদ্বেষবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশ্রিত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছিল তাহা তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই।

অতএব সংসারে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া কাজ করা বড় কঠিন। অথচ অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ভিন্ন প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম অন্তরে জাগে না; তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সাধনের সুফল ফলে না। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে আমার অভিসন্ধি বিশুদ্ধ কি না কিরূপে বুঝিব? এবিষয়ে একজন সাধু পুরুষ দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

প্রথম, তুমি যদি দেখ তোমা অপেক্ষা অপর কোন ব্যক্তি অগ্রসর হইতেছেন, সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইতেছেন, লোকে তোমা অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা অধিক উপকৃত হইতেছে, ইহা দেখিলে তোমার আনন্দের উদয় না হইয়া যদি ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তাঁহার প্রশংসা যদি তোমার ভাল লাগে না; তাঁহার কোন প্রকার দোষের কথা শুনিলে যদি তোমার আনন্দ হয়; তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিবে তুমি ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে ঈশ্বরের বা ধর্ম্মের গৌরব অন্বেষণ করিতেছ না নিজের গৌরব অন্বেষণ করিতেছ।

দ্বিতীয়, যদি দেখ তোমার মন ধর্ম্মার্থে সকল প্রকার কার্য্য করিতে প্রস্তুত নয়; আপনার পদের মত কার্য্য দেওয়া হইতেছে না বলিয়া বিরক্ত, তাহা হইলে বুঝিবে তুমি বিশুদ্ধ ঐশী শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইতেছ না; তোমার কার্য্যের মধ্যে পার্থিব কলুষিত ভাব আছে।

এই দুইটী সঙ্কেত অতি উৎকৃষ্ট। এই দুইটীর দ্বারা আপনাদিগকে বিচার করিলেই দেখা যায়, যে আমাদের কার্য্যের মধ্যে কত কলুষিত ভাব রহিয়াছে। সেই জন্যই আমাদের কার্য্যে তাদৃশ ফল ফলিতেছে না। আমাদের প্রচারে ও চেষ্টাতে ব্রহ্মাগ্নি ভাল করিয়া জাগিতেছে না। ঈশ্বর করুন আমরা বিশুদ্ধ অন্তরে যেন তাঁহার সেবা করিতে পারি।

বিধান প্রবর্ত্তন ও বিধান সংস্থাপন।

(প্রাপ্ত)

ধর্ম্মবিধান সকলের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিধানের প্রথম অভ্যুদয় বা প্রবর্ত্তনে যে সকল লোক বিধানের নিশান হস্তে করিয়া আসিয়াছেন, আর বিধানের প্রভাবকালে বা সংস্থাপন সময়ে যাঁহারা বিধানের নিশান বহন করিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক এক প্রকারের লোক নহেন। উভয়ের লক্ষণে সমতাও আছে, আবার বৈষম্য ও আছে। বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ ও চৈতন্য, ইহাঁরা সকলেই এক একটী ধর্ম্মবিধানের নিশান হস্তে করিয়া জগতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের একটী বিশেষ লক্ষণ এই, যে ইহাঁরা গভীর বিশ্বাসী। ইহাঁরা যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন, ইহাঁদিগকে সেই সব সত্যে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই। বিশ্বাস আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণদের অগ্নির ন্যায় ইহাঁদের অন্তরে অবিরাম জ্বলিয়াছে।

আর একটী লক্ষণ এই, যে ইহাঁদের বিশ্বাস গভীর তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার ফল নহে, সহজ দৃষ্টির ফল। ইহাঁদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই এমন উজ্জ্বল ছিল যে সেই উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সত্য সহজেই প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধ ও চৈতন্য যদিও পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বিশ্বাস গভীর তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার ফল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞানী গুরুদিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধির কিছুই হইল না দেখিয়া স্বয়ং সাধনে প্রবৃত্ত হন। সকলেই জানেন চৈতন্য যতদিন জ্ঞান পক্ষপাতী ছিলেন, ততদিন তাঁহার ভক্তি লাভ হয় নাই। আর ভক্তিলাভ হইলে চৈতন্য জ্ঞানের বড়ই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁরা সহজ দৃষ্টিতে সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে দেখিয়াছেন ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে সত্য দেখিয়াছেন এই কথার অর্থ

এই নয় যে ইঁহারা চিন্তাশীল ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন না, সত্য তাহাদের নিকট ভাসিয়া আসিয়াছিল; একথার অর্থ এই যে ইঁহারা তত্ত্ববিদ্যা সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যরত্ন উদ্ধার করেন নাই। ইঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম জীবন গঠনে যেমন তত্ত্ববিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রচার বিষয়েও তত্ত্ববিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। যদি বা ইঁহাদের কেহ কখনও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইয়া করিয়াছেন। ইঁহাদের বিশ্বাস লাভের ও বিশ্বাস প্রচারের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইঁহারা সহজ দৃষ্টিতে সত্যলাভ ও সহজ কথায় আখ্যায়িকার সাহায্যে সত্য প্রচারের চেষ্টা পাইয়াছেন। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বর বিধাতা এই সত্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গগণবিহারী বিহঙ্গমদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিয়াছেন,—দেখ ইহারা বপন করে না, কর্ত্তন করে না তবু কেমন সুন্দর পালকে আচ্ছাদিত। তোমরা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, কল্যকার জন্য ভাবিও না, তোমাদের কিছুরই অভাব হইবে না। বুদ্ধের আখ্যায়িকাগুলিও এইরূপ সরল।

ইঁহাদের অপর একটী লক্ষণ এই যে পুণ্যের প্রতি ইঁহাদের যেমন জলন্ত অনুরাগ তেমনি পাপীর প্রতি অগাধ প্রেম। ইঁহারা পাপীকে পাষণ্ডী কপটী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কেহ বা বেত্রাঘাত করিয়াছেন; কিন্তু পাপী যখন আঘাত করিয়াছে, তখন প্রতিঘাত করেন নাই। যে মহম্মদ বিধানাশ্রিতদিগের রক্ষণ ও লোকের বিধান গ্রহণের অন্তরায়দিগের দমনের জন্য আপনাকে ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রণোদিত মনে করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও কেহ কখনও স্বহস্তে অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখে নাই। কথিত আছে একদা কয়েকজন বিধানবৈরী তাঁহাকে একাকী পাইয়া এমন গুরুতর প্রহার করে যে তাহাতে তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট ও এক দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি তিনি তাহাদের গাত্র স্পর্শ করেন নাই। ক্রুশবিদ্ধ ঈশার মৃত্যুকালে আততায়ীদের জন্য প্রার্থনা ও গুরু আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর নিত্যানন্দের মাধাইর নিকট প্রেমভিক্ষা ইঁহাদের অগাধ প্রেমের পরিচায়ক।

বিধানের প্রভাব কালে বা সংস্থাপনে যাঁহারা ইহার পতাকা বহন করিয়াছেন তাঁহারাও ঐকান্তিক পুণ্যানুরাগী অগাধ প্রেমিক ও গভীর বিশ্বাসী। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদের বিশ্বাস লাভের ও প্রচারের প্রণালীর সঙ্গে শেষোক্তদিগের প্রণালীর বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্তেরা তত্ত্ববিদ্যা সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিচার দ্বারা সত্যের অকাট্যতা অনতিক্রমনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; এবং প্রচারকালেও এই পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মারা বলিয়াছেন সত্যে বিশ্বাস কর, শেষোক্ত মহাজনেরা বলিয়াছেন, যদি আমার প্রচারিত সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পার, যদি ইহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়, আমার সঙ্গে অকপট ভাবে পরমার্থতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হও, দিব্যজ্ঞানের উদয় হইবে, বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিবে না। দোয়াতে কলম ডুবাইতে যাইয়া নিজে ডুবিয়া যাইবে, যেমন ভয় কর না, তেমনি মন সন্দেহ-গোষ্পদ জলে ডুবিয়া ঈশ্বরকে হারাইয়া ফেলিবে এভয় রাখিও না। ঈশ্বর প্রাণে রহিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানালোকে সন্দেহ কোয়াসা কাটিয়া গেলেই সহস্র কিরণে প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন।

এখন সহজেই এই প্রশ্ন উঠে বিধানের প্রবর্ত্তনে যে বিধাতা বিধানের সংস্থাপনেও সেই বিধাতা সমানভাবে বর্ত্তমান; একই বিধাতা কেন একই বিধানের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের লোক প্রেরণ করেন—বিভিন্ন সময়ে কেন বিভিন্ন নীতিতে কাজ করেন? ইহা আপাততঃ কিছু রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই নীতি-বৈচিত্র্যে বিধাতার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও অপার প্রেম দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এক একটী বিধান প্রবর্ত্তন এক একটী বহুদিনের স্তূপীকৃত পাপ অপ্রেম ও অসত্যের উপর পুণ্য প্রেম ও সত্যের আক্রমণ। মানুষ যেমন সমরনীতিতে কোন দেশ অধিকার করে, বিধাতা তেমনি প্রবর্ত্তনী নীতিতে বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। এই প্রবর্ত্তনী নীতি দেবসমর নীতি বই আর কিছু নয়। এ সমর নীতি অতি অদ্ভুত। ইহা শত্রুর প্রাণ লইতে না বলিয়া শত্রুর জন্য প্রাণ দিতে বলে এবং প্রাণ দিয়া জয়লাভ করে। বিশ্বাসীর রক্ত পাতের সঙ্গে সঙ্গে রক্তবীজের ন্যায় বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। বিশ্বাসের অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আপনাদের জীবন আহুতি দিয়া বিধানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখেন। বিধানের প্রবর্ত্তন কালে বিধাতা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগের দ্বারা এরূপ আত্ম-বিসর্জ্জনের ব্যাপার প্রদর্শন করেন এই জন্য যে অপ্রেমিক অবিশ্বাসী বিশ্বাস ও প্রেমের মহত্ত্ব দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে। তখন লোক অবিশ্বাস ও পাপে মজিয়া এতদূর পতিত হইয়াছে যে সত্য লাভের রুচি ও সত্যান্বেষণের অবসর তাহাদের নাই। সত্যলাভের রুচি ও সত্যান্বেষণের অবসর থাকিলে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করিয়া সত্যলাভ করিবে। পাপীর এ দুরবস্থার নিকটে বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তি কি হার মানিবে? তাঁহার অপার প্রেম কি পরাজিত হইবে? তাহা ত হইবার নয়। এস্থলে তিনি তাহার [illegible] নে ও অপার প্রেমে এরূপ নীতিতে কাজ করেন [illegible] পী অবিশ্বাসী অরুচি সত্ত্বেও পুণ্য ও বিশ্বাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। পাপী ভ্রমেও সত্য লাভের কথা ভাবে না, কিন্তু বিধাতা সাধুজীবনে সত্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে এমন ভাবে ধারণ করেন যে সত্যের মাহাত্ম্য দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। ইহাই ভগবানের প্রবর্ত্তনী নীতি। ভগবানের এই নীতিতে যুগে যুগে কত হাজার হাজার জগাই মাধাই প্রাণ পাইতেছে।

বিধানের সংস্থাপনকালে বিধাতা যে সাধুজীবনে সত্যের মাহাত্ম্য দেখাইয়া পাপীকে আকর্ষণ করিতে বিরত হন তাহা নয়, তবে এ সময়ে এমন এক শ্রেণীর মহাজনের অভ্যুদয় করেন যাঁহারা আপনাদের জীবনে প্রকাশিত সত্যের মাহাত্ম্যে পাপীকে আকর্ষণ করেন। ইহা ব্যতীত আপনাদের দিব্যজ্ঞান সাহায্যে অবিশ্বাসী ও সন্দেহাত্মাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া

তাহাদের বিপথগামী চিন্তাকে সুপথে আনয়ন করেন ও আপন প্রচারিত সত্যের অখণ্ডনীয়তা প্রমাণ করিয়া তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করেন। ভগবান এই প্রণালীতে কাজ করিতে গিয়া প্রবর্ত্তিত সত্যকে তত্ত্বজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমির উপর সংস্থাপিত করেন বলিয়া ইহা তাঁহার সংস্থাপনী নীতি। সকল বিধানেই এই দুই নীতি অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। উপনিষদের ঋষিরা সরল ভাবে সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বেদান্তের ঋষিরা তাহা সংস্থাপন করিয়াছেন। মহর্ষি ঈশার পাণ্ডিত শিষ্যেরা তাঁহার প্রচারিত সত্যের মধ্যে দার্শনিক গুরু প্লেটোর মতের সন্নিবেশ পূর্ব্বক গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ করিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। রূপসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব জ্ঞানীরা গভীর পাণ্ডিত্য সহকারে চৈতন্যের প্রচারিত সত্য সকল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মানবের ভ্রম প্রবণতা প্রযুক্ত অনেক সময় সত্যের সঙ্গে অসত্য, সুবৃক্ষের সঙ্গে আগাছাও সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সব ভুল ভ্রান্তি ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় সকল বিধানেই এমন এক সময় আসিয়াছে যখন প্রবর্ত্তিত সত্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ যুগের ধর্ম্মবিধান। সময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে ইহারও স্থাপনের সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান বিধান বিরোধীগণ যে দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য সকলকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে, চিন্তার চক্ষে ইহা অর্থ হীন নয়। বিরোধীদের বাগবিতণ্ডার ঝড় কর্ণের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেলে শুনিতে পাওয়া যায় এক গম্ভীরস্বর দূর হইতে বলিতেছে—ব্রাহ্মগণ, তোমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি আপনারা ভাল করিয়া বুঝ ও বুঝাইতে চেষ্টা কর। আবার ব্রাহ্ম সমাজের দিকে কর্ণপাত করিলে শুনিতে পাওয়া যায় সেই কণ্ঠ ধ্বনিই অতি নিকটে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুদিগের প্রবল তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া অতি স্পষ্টভাবে বলিতেছে ব্রাহ্মগণ প্রবর্ত্তিত সত্যের সুদৃঢ় জ্ঞান-গুত ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া লাভ কর। যাঁহারা বিশেষভাবে বিধান প্রচারের ভার লইয়াছেন তাঁহারা কি বিধাতার এ ডাক শুনিতে পাইতেছেন? বিধাতার এ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছেন? প্রভুর কাজ করিতে গিয়া নিজের অভিপ্রায় মত কাজ করিলে প্রভুর কাজ করা হইল না, প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করা চাই। বিধাতার অভিপ্রায়েরই উপর বিধানের প্রভাব নির্ভর করিতেছে। আমাদের মধ্যে প্রবল প্রতিভাশালী লোকের অভাব বলিয়া আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের সময়ই বীর ওয়াসিংটনের ন্যায় বীর মণ্ডলীর প্রয়োজন ছিল, বর্ত্তমানে নয়। লোকের জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা এই যে আমরা তাঁহার নীতি অনুসারে চলিব, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিব; তাঁহারই ডাক শুনিয়া চলিব। যে যায় যাক, যে থাকে থাক, শুনে চলি তাঁহারই ডাক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

বিগত ১০ই আষাঢ় রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

ইংলণ্ড বাসিনী একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ৫০। ৬০ বৎসরের পূর্ব্বকার এদেশে মুদ্রিত খবরের কাগজ সকল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সতীদিগের সহমরণের যে বিবরণ আছে তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি একদিন আমার নিকট একটী বিবরণ পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে সেইটী পড়িবার সময় তাঁহার চক্ষে জল পড়িয়াছিল। সেটী এই; প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমের কানপুরের নিকটে একটী রমণী সহমৃতা হয়। তখন এই নিয়ম হইয়াছিল যে কেহ সহমরণোন্মুখ বিধবাকে চিতার সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না, কিংবা কোন প্রকারে বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। তদনুসারে উক্ত সহমরণ স্থলে গবর্ণমেণ্টের তরফের লোক উপস্থিত ছিল, পাছে কেহ বল প্রয়োগ করে। যুবতীটীর বয়ঃক্রম ২০। ২৫ এর মধ্যে। সংসারের কোন দুঃখ নাই। লোক নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিল। লোকের প্ররোচনা আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন, রাজকর্ম্মচারিদিগের পরামর্শ এই সকলে যুবতীর মন ক্ষণকালের জন্য সংশয়-ভাবাপন্ন হইল; ক্ষণকাল জীবনের মায়া মনকে অধিকার করিল। কিন্তু তৎপর ক্ষণেই যুবতী দুই কর যুড়িয়া বলিতে লাগিল, "হে রাম! হে রাম আমাকে এই সময়ে বল দেও, হে জানকি, হে সাবিত্রি, হে প্রাচীনকালের সতীগণ আমাকে এসময়ে রক্ষা কর।" এই বলিয়া নিমেষের মধ্যে বল লাভ করিয়া সেই যুবতী প্রসন্ন অন্তরে চিতাতে আরোহণ করিল।

এই বিবরণটী পড়িয়া উক্ত ইংরাজ মহিলা আমাকে বলিলেন,—এরূপ আত্ম হত্যা অতি শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দেশের নারীগণ এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও মানসিক বলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সে দেশের বিষয়ে তোমরা নিরাশ হইও না। কিছু পরে তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম, কিন্তু "সে দেশের বিষয় নিরাশ হইও না," এই কথাটী আমার মনে ঘুরিতে লাগিল। তৎপরে অনেকবার এবিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ কি ভারতের ধর্ম্মভাবকে বিনাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন? কখনই না। ভারতের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মভাব যে প্রণালী দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে, সে প্রণালী হইতে সেই স্রোতকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে প্রবাহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা ঠিক যেন কোন নদীর স্রোত ফিরাইবার ন্যায়। এক ধার দিয়া একটা খাল খনন করিয়া আর একটী নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া গেল; অমনি জলরাশি সেই কাটা খাল দিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; জলের টানে দুই পাড় ভাঙ্গিয়া খালের পরিসর দিন দিন বাড়িতে লাগিল; এবং অল্পকালের মধ্যে কাটা খালটী এক প্রকাণ্ড নদী হইয়া পুরাতন নদীটী চড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ যেন সেই প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতে এখনও ধর্ম্মভাব আছে। ধর্ম্মভাবের প্রথম লক্ষণ যে সাধুভক্তি তাহা যথেষ্ট

আছে; বরং তাহা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় থাকাতে লোকের স্বাধীন চিন্তার পথ রোধ হইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষণ বৈরাগ্য তাহাও এখনও বিদ্যমান আছে। তৃতীয় লক্ষণ জীবে দয়া তাহাও এখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমাদের পক্ষে ইহা একটা গুরুতর প্রশ্ন, কিরূপে আমরা এই ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট না করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-সম্মত পথে নিয়োজিত করিব, ব্রাহ্ম সমাজ যদি দেশের লোকের ধর্ম্মভাবকে অধিকার করিতে না পারে তবে সে ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

কিন্তু দেশের ধর্ম্মভাবকে অধিকার করিতে হইলে ব্রাহ্ম সমাজে তিনটী গুণ বিদ্যমান থাকা চাই। প্রথম আধ্যাত্মিকতা বা সাধন-তৎপরতা। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ের ও জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া ইহাদের লক্ষ্য এই ধারণাটী লোকের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হওয়া চাই। এরূপ ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন যাঁহারা অপর সকল সম্প্রদায়ের মতের দোষ কীর্ত্তন করিতে ব্যস্ত; তাঁহাদের ধারণা সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্য তাহা নহে। কোন কোন লোকের সমাজ-সংস্কারে অতিশয় উৎসাহ, তাঁহারা মনে করেন সমাজ-সংস্কার করাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্য; তাহা ও নহে। মানবকে সত্য স্বরূপের চরণেউপনীত করিয়া নব জীবন প্রাপ্ত করা ইহার লক্ষ্য। মতগত বিশুদ্ধতা ও সমাজ-সংস্কার এই উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে। দেশের লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়া দিতে হইবে, যে ব্রাহ্মগণ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ের ও জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন দিবার জন্য ব্যগ্র; সে জন্য তাঁহারা সকল ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-নিষ্ঠার ভাব লোকের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত না হইলে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি লোকের মনকে অধিকার করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় গুণ—নীতিগত পবিত্রতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরক্ত ভাব জন্মিবার যত কেন কারণ থাকুক না, আত্ম-সংযম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বলে ব্রাহ্মগণ যদি বলী হন, তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রভাব আপনাআপনি বিস্তৃত হইবে। তাঁহাদের মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। লোকে বলিবে, লোকগুলো বেয়াড়া বটে, মত শত কেমন বিদকুটে, যার তার খায়, জাত মানে না; কিন্তু লোকগুলো ভাল লোক, অন্যায়ের ছন্দাংশ থাকে না; অসাধুতাকে ঘৃণা ও সাধুতাকে আদর করে।” নীতিগত পবিত্রতা যার আছে, মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধাকে সে আপনার হস্তে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুনীতির খ্যাতি যদি একবার বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিও বিলুপ্ত হইবে।

তৃতীয় সদ্‌গুণ—নর-প্রীতি। লোকে যদি দেখে ব্রাহ্মসমাজ সকল শ্রেণীর লোককে ঘৃণা করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, লোকগুলি আত্ম-তৃপ্ত ও আপনাদিগকেই বড় বলিয়া জানে, চারিদিকে যে এত বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, এত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহার কিছুরই সহিত ব্রাহ্মদের হৃদয়ের যোগ নাই; ইহারা লোকের ইহকালের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল পরকালের চিন্তাতে রত আছে। ইহারা লোকের সুখ দুঃখ হইতে দূরে দাঁড়াইয়াছে, তাহারাও আমাদিগের হইতে দূরে দাঁড়াইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের প্রীতি দৃষ্টি আর থাকিবে না। আমার বোধ হয় ইতিমধ্যেই যেন কতকটা এইরূপ ভাব দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশমধ্যে আপনাআপনি প্রচারিত হইবে।

কংফুচের বচনাবলী।

সাধু।

যিনি পূর্ণ সাধুতা লাভে ইচ্ছুক, তিনি আহার বিষয়ে রসনার তৃপ্তি অন্বেষণ করেন না; গৃহে ভোগ সুখের আয়োজন অন্বেষণ করেন না; যে কোন কার্য্য করেন সমুদয় হৃদয় মনের সহিত করেন; যাহা কিছু বলেন সতর্কতার সহিত বলেন; তিনি নিজের ভ্রম সংশোধন মানসে জ্ঞানী ও নীতিমান লোকদিগেরই সহবাস অন্বেষণ করেন, এইরূপ ব্যক্তিরই বাস্তবিক জ্ঞান স্পৃহা আছে।

ঝি কঙ্ (একজন কংফুচের শিষ্য) জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কি?

গুরু (কংফুচ) উত্তর করিলেন;—তিনি মুখে বলিবার পূর্ব্বে কাজে করেন, এবং কাজে যাহা করেন পরে মুখে তাহা বলেন। ৯

গুরু বলিলেন—প্রকৃত সাধু যিনি তিনি উদার চেতা, তাঁহাতে দলাদলির ভাব নাই; ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দলাদলিতে ব্যস্ত, তাহাতে উদারতা নাই।

প্রকৃত সাধু ব্যক্তি যদি সাধুতার নিয়ম পরিত্যাগ করেন তবে তিনি আর কি প্রকারে সাধু নামের যোগ্য হইবেন?

সাধু ব্যক্তি একবার আহার করিতে যে সময়টুকু লাগে সে সময়টুকুর জন্যও সাধুতার নিয়ম লঙ্ঘন করেন না; নিতান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সে নিয়মকে তিনি রক্ষা করেন; বিপদের মধ্যে তিনি সেই নিয়ম রক্ষা করেন।

গুরু বলিলেন:—প্রকৃত সাধু ব্যক্তি জগতে বাস করেন বটে কিন্তু তিনি কোন বস্তুতে অতিশয় আসক্ত বা অতিশয় বিরক্ত নহেন, যাহা সৎ ও যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহার অনুসরণ করেন।

প্রকৃত সাধু ব্যক্তি চিন্তা করেন কিরূপে সাধুতা রক্ষা হইবে, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি চিন্তা করে কিরূপে সুখ মিলিবে। সাধু ব্যক্তি কাজ করিবার সময় ভাবেন নীতির নিয়ম থাকিল কি না? ক্ষুদ্রচেতা ভাবে ইহাতে লোকানুরাগ পাওয়া যাইবে কি না?

গুরু বলিলেন—প্রকৃত সাধু ব্যক্তির চিত্ত কেবল সাধুতার উপায় চিন্তা করে, ক্ষুদ্র চেতার মন কেবল লাভেরই উপায় চিন্তা করে।

গুরু বলিলেন—প্রকৃত সাধু ব্যক্তি কথাতে মন্দগতি কিন্তু কার্য্যে সতেজ।

গুরু বলিলেন—তাঁহার শিষ্য ঝি চাঙ্গের সাধুর চারি গুণ ছিল:—; (১ম) তাঁহার ব্যবহারে বিনয় ছিল; (২) পরের সহিত আচরণে শ্রদ্ধা ছিল; (৩) প্রজাকুলের ভরণে দয়া ছিল, এবং (৪) শাসন কার্য্যে ন্যায় ছিল।

গুরু বলিলেন—প্রকৃত সাধু ব্যক্তি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করেন শুনিয়াছি, ধনীর ধন বৃদ্ধি করেন শুনি নাই।

গুরু বলিলেন:—যেখানে হৃদয় মনের সারবান গুণ আছে কিন্তু সৌজন্যের শিক্ষা নাই—সেখানে গ্রামীণতা আছে:—যেখানে সৌজন্যের শিক্ষা আছে সারবান গুণ নাই সেখানে বাবুগিরি আছে—যেখানে সারবান গুণ ও আছে সৌজন্যের শিক্ষাও আছে, সেখানেই প্রকৃত সাধুতা আছে।——ক্রমশঃ

সংবাদ।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রচার কার্য্য হইতে কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া আপাততঃ হিমালয় শৃঙ্গে তিনধেরিয়া নামক স্থানে বাস করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাস গ্রাম বাঁশবেড়িয়া সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া এখনও সেখানে আছেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস সম্প্রতি বনগাঁ সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশি ভূষণ বসু উত্তর বঙ্গের সমাজ সকলে কার্য্য করিতেছেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় অদ্যাপি বাগআঁচড়াতে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতাতেই আছেন।

কিছুদিন হইল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিজানের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে ভার দিয়া কয়েকজন সহকারী সঙ্গে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত সবডিভিজানের কুলপী থানার অন্তর্গত ঘাটেশ্বরা গ্রামে গিয়া সেই গ্রামকে মধ্যবিন্দু স্বরূপ করিয়া পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারা ৩১ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পান যে শতকরা প্রায় ৮ কি ১০ জন লোকের এক দিন হইতেছে ত এক দিন হইতেছে না এইরূপ অবস্থা। ইহাদের অধিকাংশই মজুর অল্প সংখ্যক বেওয়া বিধবা, ইত্যাদি। তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যার্থে ধান দিয়া চাউল করান, ও পাট দিয়া দড়ি কাটাইবার পরামর্শ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সুবর্ষা আরম্ভ হওয়াতে চারিদিকে চাষ আরম্ভ হইয়াছে; আমাদের কাজ করিবার লোক আর পাওয়া যায় না; সুতরাং তাঁহারা সেখানে থাকা অনাবশ্যক বোধে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলে এইরূপ অনুমান করেন দুই মাস পরে লোকের আবার কিছু অন্নকষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তীকে খাসি পর্ব্বতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। নীলমনি বাবু শিলং পাহাড়ে পৌঁছিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। শিলংএর সন্নিহিত মৌখার পাহাড়ে খাসিদের জন্য যে সমাজ আছে তাহাতে তিনি ইংরাজীতে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার গমনে খাসিগণ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। দুই জন খাসি যুবক তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতেছেন। নীলমনি বাবু খাসি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আশা করেন শীঘ্রই তাহা অধিগত করিতে পারিবেন। পরমেশ্বর আমাদের ভ্রাতার কার্য্যের সহায় হউন।

উলুবেড়িয়ার ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভার উৎসব বিবরণ আমরা তথাকার কোন বন্ধুর নিকট হইতে এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। "বিগত ১লা জুন হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত উলুবেড়িয়ার মহকুমাস্থিত ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভার সাংবৎসরিক উৎসব বিধাতার কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উলুবেড়িয়াতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তথায় মহাকুমাস্থিত অমরাগড়ি, রসপুর, বানিবন, শ্যামপুর, সমসপুরও বাঁটুলের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সহানুভূতিকারী এবং স্থানীয় মুনসেফ উকিল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ মিলিত হন। নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দুই দিন উপাসনার কার্য্য করেন। ১লা প্রাতে উপাসনা, সন্ধ্যাকালে উৎসবের উদ্বোধন। ২রা প্রাতে উপাসনা তৎপরে ধর্ম্মালোচনা এবং সম্মিলনীর গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠান্তে কিরূপে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কথোপকথন। অপরাহ্নে বক্তৃতা ও নগরকীর্ত্তন, বাজারে, মাঠে, ঘাটে, বক্তৃতা হয়। বক্তা কাঁথি স্কুলের শিক্ষক বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, গ্রামবাসীর ও সম্মিলনীর সম্পাদক বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক এবং অমরাগড়ি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বাবু ফকিরদাস রায়। অদম্য উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। প্রায় ৩০০ শত লোক সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছিল। বক্তাত্রয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।"

গত ... জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাজসাহীর অন্তর্গত নওগাঁ এন্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু হীরালাল রায় মহাশয়ের, প্রথম পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু বনমালী বসু মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। বালকের নাম সত্যানন্দ রায় রাখা হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হীরালাল বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার বাবু হরকুমার রায় চৌধুরির প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম দেবকুমার রাখা হইয়াছে। আমাদের বন্ধু তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

নামকরণ—গত ৭ই জুন শুক্রবার বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিকের প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বালকের নাম ধীরেন্দ্র রাখা হইয়াছে। গোপাল বাবু তদুপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বড়বাজার সুতাপট্টী বারয়ারী ফণ্ড হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দাতব্য বিভাগে এককালীন ৫০৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ জন্য আমরা উদ্যোগীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জলন্ধরের সেসন জজ মহাশয় আমাদের মতাদি আমাদের প্রেরিত পুস্তকাদিতে অবগত হইয়া আমাদের মতের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইনি একজন ইংরেজ।

শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—শ্রীবাড়ীতে "ঈশ্বর পিতা মানুষ ভাই" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া সরল ভাষায় একটী বক্তৃতা হইয়াছে; এতদুপলক্ষে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। শ্রমজীবী লোকও কয়েকটী উপস্থিত ছিল।

দিনাজপুর হইতে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু লিখিয়াছেন—

মহাশয়! শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় বিগত ২৭এ জ্যৈষ্ঠ দিনাজপুরে আসিয়া যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ইতি।

২৭এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার—ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা।

সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা।

৩০এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার—ব্রহ্ম মন্দিরে সন্ধ্যার পরে "সমাজের উন্নতি ও অবনতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২রা আষাঢ় শনিবার—সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্ম মন্দিরে "কোন পথ অবলম্বন করি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩রা আষাঢ় রবিবার—সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং "প্রচার" সম্বন্ধে উপদেশ।

এই স্থানে মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের প্রচারকগণ যেখানে যেখানে যাইবেন, সে থানকার কেহ একজন বিশেষ ভার লইয়া তাঁহার কার্য্যের বিবরণ আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু "অমুক দিন উপাসনা," "অমুক দিন বক্তৃতা" কেবল এইরূপ উল্লেখ মাত্র না করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদির এক একটু ভাব ও লোকে কি ভাবে তাঁহাদের কথা গ্রহণ করিতেছে, তাহার এক একটু বিবরণ দিলে ভাল হয়। নতুবা অমুক দিন উপাসনা, অমুক দিন বক্তৃতা, এইমাত্র জানিলে কাহার ও কোন লাভ নাই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

সম্পাদক মহাশয় গত সংখ্যক তত্ত্ব কৌমুদীতে আমাদের বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় পৌত্তলিকতা এবং জাতি ভেদ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। দ্বারি বাবু জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে দুই এক কথা বলিব।

দ্বারিক বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত নিয়মাবলীর তৃতীয় নিয়মে "জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ" সংযোজনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। প্রস্তাবনাকারীগণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াই উল্লিখিত প্রস্তাবনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বারিক বাবু বলিতেছেন যে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কতিপয় দুর্ব্বল ব্রাহ্ম বন্ধুর প্রতি অন্যায় করা হইবে। তিনি এইরূপ সামাজিক উৎপীড়ন দূষণীয় মনে করেন। কোন ও ব্যক্তিকে অযথা কষ্টে ফেলিয়া অপরাধী হওয়া প্রস্তাবনা কারীদের কাহারও উদ্দেশ্য নহে। তবে কিনা তিনি যে "আত্মরক্ষণ" মৌলিক সত্য অবলম্বনে সমাজের এক স্তরকে অপর স্তর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই প্রস্তাবনাকারীগণ উল্লিখিত প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। দুর্ব্বলকে তুলিয়া লওয়া অভিপ্রেত; কিন্তু যাঁহাদিগকে শৈশবকালীন দুর্ব্বলতার সহিত অবিরত সংগ্রামে করিতে হইতেছে, যাঁহারা অতি কষ্টে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আত্মরক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব অপরের সহায়তা করিবেন। দ্বারিক বাবুও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগকে অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের হইতে স্বতন্ত্রীকরণের সমর্থন করিয়া এইরূপ ব্যবহারের ঔচিত্য স্বীকার করিতেছেন।

দ্বারিক বাবু জাতিভেদ রক্ষণকারী ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে কেবল দুর্ব্বল বলিয়া নিরস্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদের জাতিভেদ রক্ষণের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে উহার পৃষ্ঠ পোষণ করিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "কে কাহাকে বিবাহ করিবেন, না করিবেন তাহা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষের নিজ বিচার্য্য বিষয়, সমাজ এ বিষয়ে কেবল পরামর্শ দিতে পারেন, কোন অলঙ্ঘনীয় বিধান প্রচলিত করিতে পারেন না * * * আমি কাহার সহিত আহার ব্যবহার করিব তাহা নির্ণয় করা ও আমার নিজের কার্য্য। সমাজ সে সম্বন্ধে আমাকে কোন অংশে সঙ্গত ভাবে বাধ্য করিতে পারেন না।" এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া দ্বারিক বাবু "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" ভার্সাস্ সমাজ শাসন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবনা কারীগণ সমাজ শাসন দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে অভিপ্রায় করেন না। কে কাহাকে বিবাহ করিবে, কে কাহার সহিত খাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাঁহারা কোন বিধির প্রস্তাব করিতেছেন না। তবে কিনা অপর সমাজের দূষণীয় ভাব যাহাতে ব্রাহ্ম সমাজকে অপবিত্র না করে, সমাজ তজ্জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে বাধ্য। ব্রাহ্ম সমাজ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল, আজি ও তাহা সাধনের পথে কত অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া, হিন্দু সমাজের অঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত বলিয়া, আজি ও অনেক দূষণীয়

হিন্দুরীতি নীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার ব্রাহ্ম সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি এখন উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত এই সকল দূরে নিক্ষিপ্ত না করেন, তাহা হইলে কালের গতিতে যখন শিথিলতা আগমন করিবে, তখন এই সমস্ত বর্জ্জনীয় আবর্জ্জনা রাশি স্তরাবলীতে পরিণত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দেহ কান্তি কলুষিত করিয়া তুলিবে। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ যে আকারে বর্ত্তমান, ব্রাহ্মসমাজে ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাই থাকিয়া যাইতেছে, ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়? এই মুহূর্ত্তে কি সমবেত চেষ্টা দ্বারা ইহা দূর করা অভিপ্রেত নয়? কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা দূর করা অভিপ্রেত কিন্তু সময় এখনও আসে নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি কোন বুদ্ধিমান লোক রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে? যদি রোগ বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে তাহা হইলে কালবিলম্ব বিধেয় নয়! এই জন্যই বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন। বিধি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য নয়। সমাজের দূষিত নীতি অপসারিত করিবার জন্য? ইহাতে যদি কেহ তাঁহার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল বলিয়া আশঙ্কা করেন; তিনি ভ্রম করিবেন।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা দ্বারিক বাবুর চোখে তত দূষণীয় নয় বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ তিনি লিখিয়াছেন "মনুষ্য যে অনেক পরিমাণে নিজ পিতৃ মাতৃ কুলের গুণ দোষের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ইহা ঘটিয়া থাকে তাহা প্রায় কাহার ও অবিদিত নাই, মানসিক শক্তি সম্বন্ধে ও যে ইহা ঘটিয়া থাকে গ্যাল্টন তাঁহার বংশানুক্রমিক প্রতিভা নামক গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * পশ্বাদির বংশ সমুন্নত করিবার জন্য যে সকল সাবধানতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় অসাবধানতা বশতঃ তাহাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে মনুষ্য সমাজের উন্নতি পক্ষেও সেই সকল সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ঘটিতে পারে" দ্বারিকবাবু উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমালোচনা এই স্থানে সম্ভবপর নহে। যাহা হউক দ্বারিকবাবুই আবার বলিয়াছেন "জন্মগত অবস্থা অতিক্রম সম্ভব" হিন্দু সমাজ এই "জন্মগত হীনতা দূর করিতে সুযোগ প্রদান করুক আর নাই করুক, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যে জাতীয় লোকই হউক না কেন জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে, তিনি সমাজভুক্ত হইতে অধিকারী নহেন। জন্মগত বৈষম্য তিরোহিত করিয়া সাধুতা ও জ্ঞানের ভূষণে নর নারীকে সজ্জিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। বাস্তবিক ব্রাহ্ম সমাজের পবিত্র বায়ু সেবনে অনেক নীচ কুলোদ্ভব বন্ধু জাতীয় নীচতা পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কোন সভ্য কি আর কুল গৌরব করিতে পারেন? যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরশ মণি স্পর্শে কাচও কাঞ্চন হইয়া যাইতেছে। তবে কোন যুক্তিতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ব্রাহ্ম সমাজে পোষিত হইবে? তবে কোন কারণে এক ব্রাহ্ম অপরের সহিত আহার ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইবেন? এবং কোন কারণে অবর্ত্তমানে কেবল মাত্র কুলের দোষ প্রদানে আদান প্রদানে সঙ্কুচিত হইবেন? যাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাকে নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া তুচ্ছ করা উচিত নহে। ব্রহ্মই ব্রাহ্মসমাজের পিতা এবং প্রভু। পিতার এক পরিবারের সভ্য হইয়াও যদি আবার ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয় তাহা হইলে এ পরিবার গঠন করিবার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়াতে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে, হিন্দু সমাজ কলঙ্কের ঝুড়ী মাথায় করিয়া বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি চেতন হইবে না? আবার কি জাতিভেদরূপ বিষাক্ত মৃত্যু-অস্ত্র আহ্বান করিবে? তুমি বলিতেছ আত্ম রক্ষা করিতে তুমি বাধ্য? আমাকে ছাড়িয়া তোমার আত্ম কোথায়? ব্রাহ্ম সমাজ অপর সমাজের মত স্তরাবলীতে বিভক্ত নহে। ব্রাহ্ম সমাজই এক মাত্র স্তর। তবে এই স্তর ভুক্ত লোক কোন স্তরের লোক হইতে আত্ম রক্ষা করিবেন? যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্ম সমাজ স্তরে স্তরে বিভক্ত হইবে সে মুহূর্ত্তেই তাহাকে আর ব্রাহ্ম সমাজ বলিব না। সে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজের দুঃখ রজনীর আবির্ভাব হইবে। দ্বারিক বাবুও ব্রাহ্ম সমাজকে একই স্তরে পরিণত দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদিও ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য তিনি দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

দ্বারিক বাবু লিখিয়াছেন "মানসিক রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান সুস্থ মানস হইলেও কেহ যদি আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে নিজ কন্যা দানে অসম্মত হন" মানসিক রোগ গ্রস্ত শব্দ হয়ত তিনি মূর্খ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। মূর্খ পিতার সন্তান জ্ঞানী হইলে ভবিষ্যতে আবার পিতৃধারা কিরূপে পাইবে তাহা বুঝিলাম না। শরীর সম্বন্ধে আশঙ্কা সম্ভব পর হইলে মন সম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে না। সুস্থ শরীর ভবিষ্যতে রুগ্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি অলস না হইলে সুস্থ মন অসুস্থ হইতে পারে না। ব্রাহ্ম সমাজেও জ্ঞানী গুণী লোকেরও যদি কুল মর্য্যাদা অন্বেষণ করা হয়, তাহা হইলে আর আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। আশা করি দ্বারিক বাবু এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার

(জুন, জুলাই, আগষ্ট ১৮৮৮)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, চক্রবেড়
বাবু দ্বারকনাথ চক্রবর্ত্তী, পার্ব্বতীপুর
„ প্যারীলাল ঘোষ, সদ্য পুষ্করিণী
„ দ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা
„ অক্ষয়কুমার রায় ঐ

„ লালবিহারী পাল, চন্দ্রপুর	১৲
শ্রীমতী রাজবালা রায়, হরিনাভি,	৩৲
বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাকিনিয়া	৩৲
শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ, কলিকাতা	৩৷৹
বাবু মনোমোহন বিশ্বাস ঐ	১৲
„ শরচ্চন্দ্র রায়, সম্পাদক রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ	১৲
„ শশিভূষণ রায়, পিংনা	২৮৵১০
„ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৲
„ কালীশঙ্কর, সুকুল ঐ	১৲
„ রাধাগোবিন্দ প্রামাণিক, রাণাঘাট	৩৲
„ হরিদাস মল্লিক, খাগড়া	৩৲
„ শরচ্চন্দ্র দাস, জালালপুর	৩৲
„ বরদানাথ হালদার, লক্ষ্মীপুর	১৪৲
„ তারিণীচরণ দত্ত, ধুবড়ি	৩৲
„ বিপিনবিহারী রায়, মনিকদহ	৩৲
„ হরনাথ বসু, করটিয়া ব্রাহ্মসমাজ	১॥৹
„ শারদাপ্রসাদ দত্ত, চন্দননগর	২৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, ফরিদপুর	৫৲
বাবু দীনবন্ধু মিত্র, নারায়ণগঞ্জ	৩৲
„ কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	২॥৹
„ বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১৴৹
„ নন্দলাল মিত্র ঐ	১৲
সম্পাদক ভরাকর ব্রাহ্মসমাজ	১॥৹
বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিরাট	৩৲
„ রাধানাথ রায়, শিলিগুড়ি	৩৲
„ ভোলানাথ সরকার, মানভূম	২।৹
„ মোহিনীমোহন রায়, কলিকাতা	॥৹
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক ঐ	১৲
„ রামলাল সাহা, পাবনা	২॥৵৹
„ রামেন্দ্রলাল বাগচি, ভররা	১॥৹
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু, কলিকাতা	॥৹
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১৲
„ উমেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ	২॥৹
„ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত, গয়া	৩৲
„ রাসবিহারী সেন, বরিশাল	১৲
„ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	১॥৹
„ উমেশচন্দ্র মিত্র, তুর্কলিয়া	৫৲
„ আশুতোষ মিত্র, কলিকাতা	২॥৹
„ অতুলচন্দ্র দত্ত ঐ	১৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, শিলং	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা	২৲
„ রজনীকান্ত সরকার, খলিলপুর	৩৲
„ অনাথবন্ধু রায়, কাকিনিয়া	৩৲
„ রাধারমণ সিংহ, কলিকাতা	৬৲১০
„ দ্বারকানাথ ঘোষ, ক্ষেতুপাড়া	৩৸৹
„ অভয়চরণ দাস, মনমুথ	৩৲
„ যুগলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,	৬৲
„ গোলোকচন্দ্র সেন, এলাহাবাদ	১০৲
„ বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আগরতলা	১০৲
„ হরনাথ সাহা, কলিকাতা	৫৲
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ	২॥৹
বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল ঐ	২॥৹
„ রজনীকান্ত নিয়োগী ঐ	১৲
„ রাজকুমার দত্ত, জৈনসার	২৲
„ প্রসন্নকুমার বসু, ভাওয়ালপুর	৩৲
„ জহরিলাল পাইন, কলিকাতা	॥৹
„ উমেশচন্দ্র সুর ঐ	২॥৹
শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস, কলিকাতা	২॥৹
বাবু কেদারনাথ রায় ঐ	১৲
„ ভগবতীচরণ হালদার মল্লিক, পেডাম	৩৲
„ রমানাথ চৌধুরী, গড়বেতা	৩৲
„ সীতানাথ বক্সী ঐ	৩৲
„ চন্দ্রকান্ত দত্ত, মেদিনীপুর	২৲
„ তারকচন্দ্র ঘোষ, ঐ	২৲১০
„ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাগলপুর	২৲
„ কানাইলাল সাহা, তিল্লি	৫৲
„ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৲
„ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, হুগলি	৪৲
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাশীমবাজার	৬৲
বাবু বেণীমাধব পাল, কলিকাতা	২॥৹
„ দ্বারকানাথ শেঠ ঐ	২॥৹
„ হরিহর চক্রবর্ত্তী ঐ	২॥৹
„ শশিভূষণ বিশ্বাস ঐ	২॥৹
„ দ্বারকানাথ সেন, ধুবড়ি	৩৲
ম্যানেজার মজুমদার কোম্পানি	১৲
বাবু মন্মথনাথ দাস, পিরোজপুর	৫৲
„ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, সায়েড়াগ্রাম	৩৲
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	।৹
„ হরিনারায়ণ দাঁ ঐ	১০
„ রামপোল মজুমদার, রণবাগপুর	৬৲
„ আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা	২॥৹
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক ঐ	২॥৹
„ তারাপ্রসন্ন দাস, কান্দ্রা	১৲
„ দ্বারকানাথ গুপ্ত, বরিশাল	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ রামপুরহাট	১৲
বাবু রামচরণ পাল, রাঁচি	৩৲
„ শ্যামাপ্রসন্ন রায়, হাজারিবাগ	৩৵৹
„ ভুবনমোহন ঘোষ, কলিকাতা	৫৲
„ ফেলুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইটোয়া	৫৲
„ গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	১৲
„ হরিচরণ সেন, দ্বারভাঙ্গা	৩৲

ক্রমশঃ

২৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

এ নীরবে তুমি কও কথা।

হৃদয় একাকী মোর, নির্জ্জন আঁধার ঘোর,
সাড়া শব্দ কাহারো না পাই;
কিছু ভাল নাহি লাগে, প্রাণেতে নিরাশা জাগে,
কি যে চাহি কাহারে সুধাই;
জনপূর্ণ এ নগর পরিজন পূর্ণ ঘর
সব শূন্য, পশে না পরাণে;
রহিয়াছে গ্রন্থ রাশি, পড়িতে না ভাল বাসি,
নহে শক্ত সান্ত্বনা বিধানে;
অন্তরে একা বেড়াই, কাহারো না দেখা পাই
সাধু ভক্ত কেহ নাহি তথা;
নির্জ্জনে সজন করি প্রকাশ হও হে হরি
এ নীরবে তুমি কও কথা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—এক স্থানে দুই ভাই বাস করিতেন, তাঁহারা উভয়ে একান্ত মনে লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের পূজাতে প্রীত হইয়া একদিন লক্ষ্মী উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎসগণ তোমাদের নিষ্ঠা দেখিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আর তোমাদিগকে আমার তুষ্টির নিমিত্ত আরাধনা করিতে হইবে না। তোমরা কি ভোগ সুখ প্রার্থনা কর তাহা বল।" উভয় ভ্রাতা বলিলেন—"জননি! বর প্রার্থনা রূপ গুরুতর কার্য্য আমরা সহজে করিতে পারি না। আমাদিগকে দুই দিনের সময় দিন, আমরা ইহার মধ্যে চিন্তা করিয়া আপনাকে বলিব।" দুই দিনের পর উভয় ভ্রাতাতে পরামর্শ করিয়া আসিয়া বলিল—"দেবি আমরা আপনার নিকট ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করি না, এই বর প্রদান করুন যে আমরা উভয় ভ্রাতাতে আজীবন সদ্ভাবের সহিত একত্র বাস করি, কখনও যেন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটনা না হয়।" লক্ষ্মী বলিলেন—"বৎসগণ আর যে বর প্রার্থনা কর দিতে পারি ঐটী হবে না; তোমাদের গৃহ-বিবাদ আমার নির্গমনের পথ, সে পথ আমি বন্ধ করিতে পারি না"। এই গল্প যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই গৃহ বিবাদেই লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়। সকল দেশের সকল জাতির অভিজ্ঞতার ফল এই; মহাভারত ও রামায়ণের মহোপদেশ এই; গৃহবিবাদে রাবণ নষ্ট, কুরু পাণ্ডবের বিবাদে কুরুকুল নষ্ট; গৃহ বিবাদে যদুকুল নষ্ট। য়িহুদী জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে একটী প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে তাহা এই—যে গৃহের ভিতরে বিবাদ তাহা দণ্ডায়মান হইতে পারে না। সম্প্রতি একটী খ্রীষ্টীয় সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন—"শয়তান যখন দেখিল যে যীশু অভ্যুদিত হইয়া তাহার রাজ্য বিনষ্ট করিয়া ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিতেছেন তখন সে কৌশল করিয়া যীশুর শিষ্যদলের মধ্যেই বিবাদ বাঁধাইয়া দিল, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথে মহা বিঘ্ন উপস্থিত করিল। এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য একই। আমাদিগকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে প্রধান বিঘ্ন কি কি। আমরা বলি দুইটী—প্রথম ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রেম ও আত্মীয়তার অভাব—দ্বিতীয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণীস্বরূপ হইয়াছিলেন ও সাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে আপনাদের অবলম্বিত মত ও প্রণালীতে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অসার ভাবিতেছে, ও ব্রাহ্মদিগের উপরে আশা স্থাপন করিতে পারিতেছে না।

মতভেদ ও বিদ্বেষ।—লোকের সচরাচর ধারণা আছে যে লুথার যখন রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করেন, তখন ক্যাথলিকগণ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ঘোরতর রূপে নির্য্যাতন করিয়াছিল; জলন্ত চিতায় শরীর দগ্ধ করিয়াছিল, ও বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছিল। প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণ যাঁহারা মানবের স্বাধীনতার জন্য এত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিবেকের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছিলেন; তাঁহারা ও যে মতভেদের জন্য মানুষকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইহা অনেকে

জানেন না এবং হয়ত সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন না। অথচ এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। লুথারের ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, যে সে সময়ে যে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাশালী নেতা অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে ক্যালভিন একজন। ক্যালভিন যখন জেনিভা নগরে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন সার্ভিটস্ নামক একজন চিন্তাশীল লেখক দেখা দিলেন। তিনিও সংস্কার-পক্ষীয় লোক, তিনিও পোপের দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদ করিলেন; তিনিও রোমান কাথলিক মতের ভ্রম প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিলেন না। কিন্তু অপরাধের মধ্যে তিনি লুথার ও ক্যালভিন অপেক্ষা আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ত্রীশ্বরবাদের দোষ ঘোষণা করিয়া লিখিলেন যে মানবের একমাত্র মুক্তিদাতা আছেন, তিনি পরমেশ্বর; যীশু মানব ও পথ-প্রদর্শক মাত্র। ক্যালভিন সংকীর্ণ অনন্ত নরকের মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহারও তিনি প্রতিবাদ করিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ধৃত করা হইল, এবং ক্যালভিনের আদেশ ক্রমে তাঁহাকে শৃঙ্খল দ্বারা খুঁটিতে বাঁধিয়া কাঁচা কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা ধীরে ধীরে দগ্ধ করা হইল এবং তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার উরুতে বাঁধিয়া দিয়া দগ্ধ করা হইল।

প্রাচীন কালে লোকের এতদূর সংকীর্ণতা ছিল, হৃদয় এত কঠোর ছিল, যে মত ভেদের জন্য মানুষ মানুষকে চোর ডাকাতের সাজা দিত। মহম্মদের কাফের বিনাশও ইহার আর এক প্রমাণ। কিন্তু প্রশ্ন এই আমরা ঐই সংকীর্ণতার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিস্তার পাইয়াছি কি না? ক্যালভিনের ন্যায় জীবন মৃত্যুর উপর ক্ষমতা পাইলে আমরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দিগকে দগ্ধ করিতাম কি না? ততদূর বোধহয় করিতাম না; কিন্তু যাহার মত ভ্রান্ত সে অসৎ ও বিদ্বেষের পাত্র, এ ভাব হইতে আমরা এখনও উদ্ধার লাভ করিতে পারি নাই। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই; আমাদের নববিধানী বন্ধুগণ এই কথা প্রচার করিয়া থাকেন, যে নববিধানের উদারতা সর্ব্বগ্রাসী ইহা উদার প্রেমবাহুতে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকে আলিঙ্গন করিবে। এমন উদার ভাবাপন্ন যাঁহারা, শুনিতে পাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদলের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহাদের মনে অত্যন্ত প্রবল। তাহাদের যে প্রেমবাহু ত্রিসংসার আবেষ্টন করিতে যাইতেছে, তাহা কলিকাতার ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের নিকট আসিয়াই সংকুচিত হইয়া যাইতেছে। এরূপ কেন? নববিধানীর অপরাপর লক্ষণের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষ একটী প্রধান লক্ষণ। যদি শুনি কোন যুবক নববিধানে অনুরক্ত হইতেছে, তখনি জিজ্ঞাসা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষী হইয়াছে কি না? যদি শুনি এখনও হয় নাই, তবে বলি পুরা নববিধানী এখনও হয় নাই। সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন এরূপ বিদ্বেষের ফল চারিদিকের লোকের মনে কি প্রকার হইতেছে।

কিঞ্চিৎ আত্ম-চিন্তা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার উদ্যোগ-কর্ত্তাগণ দুইটী বিষয়ে প্রধান রূপে আশা করিয়াছিলেন; প্রথম নিয়মতন্ত্র প্রণালীর একটা গুণ এই, ইহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন শক্তি সকলকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে; দশখানি হাত একত্র করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে; তদ্দ্বারা বিধাতার শুভ অভিপ্রায় সুসম্পন্ন হয়; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দশখানি হাতকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে নিযুক্ত করিবেন। দ্বিতীয় আশা এই ছিল, যে ব্রাহ্মসমাজ সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন স্থাপন করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ চিন্তা করুন উক্ত উভয় উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে বিধাতা যে কিছু শক্তি দিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতেছে কি না? দশখানি হাত ঠিক একত্র হইতেছে কি না? বাহিরের লোকের ধারণা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দশজনে মিলিয়া কাজ করিবার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এই বিষয়েই আমাদের বিশেষ ক্রটী রহিয়াছে। প্রেম ও আত্মীয়তার অভাবে সভ্যগণ বেশ করিয়া মিলিয়া কাজ করিতে পারিতেছেন না; ব্রাহ্মসমাজের মহা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঈর্ষা, অক্ষমা, ক্ষমতা-প্রিয়তা প্রভৃতি মানবীয় ক্ষুদ্র ভাব সকলকে দমন করিয়া একতাবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। প্রথম লক্ষ্য সিদ্ধি বিষয়ে যেরূপ তাঁহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; দ্বিতীয় লক্ষ্যটী বিষয়েও সেইরূপ অকৃত-কার্য্যতা দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আজিও দেশের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত সমাজ সকলকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে যে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় না। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনের দুইটী মূল উদ্দেশ্য অদ্যাপি সিদ্ধ হয় নাই। সভ্যগণ কেন এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না? কেন পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও আত্মীয়তা স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন না? কেন একতাসূত্রে সকলকে বাঁধিতে পারিতেছেন না? ইহা গভীর আলোচনার বিষয়। আমাদের বিশ্বাস প্রার্থনাকে সহায় করিয়া এই চিন্তায় নিযুক্ত হইলেই তাঁহারা ইহার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

পারিবারিক শিক্ষা—আমরা এক গৃহস্থের কথা জানি তাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। বাড়ীর বালক বালিকাদিগের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। গৃহের মধ্যে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহা দিতে ক্রটী করিতেন না। বাহিরে তাহারা নানা প্রকার সঙ্গে মিশিত, কত অভদ্র ভাষা কর্ণে শুনিত, অপর বালক বালিকাকে হয়ত কত অভদ্র আচরণ করিতে দেখিত, কিন্তু গৃহে শিশুগণ যে শিক্ষা পাইত তাহার এমনি গুণ ছিল, যে তাহাদিগকে একটী দিনের জন্যও একটী অভদ্র শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায়

নাই কিম্বা একটী অভদ্র ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। পাড়ার বালক বালিকাদিগের সঙ্গ একেবারে বারণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার গুণে তাহারা অভদ্র বালক বালিকাদিগকে অসৎ বলিয়া জানিত ও তাহাদের অভদ্র ব্যবহার শিক্ষা করিত না। এই গৃহস্থের গৃহ হইতে একটী শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। আমরা যত কেন সাবধান হই না, সন্তানদিগকে যে একেবারে কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখিতে পারিব এরূপ আশা করা যায় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা সৎ ও অসৎ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। এইরূপ ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তবে গৃহের মধ্যে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদিগকে নীতির নিয়মে এমন সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে জীবন পথে তাহারা সতত সৎকে আলিঙ্গন করিবে ও অসৎকে বর্জ্জন করিবে। শিক্ষার অর্থ এ নয়, যে সন্তানগণ ভাল ভিন্ন মন্দ কখনও জানিবে না, শুনিবে না, বা দেখিবে না। মানব সমাজই ভাল মন্দ মিশ্রিত; মন্দকে অন্বেষণ না করিলে তাহা কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের জীবন পথের মধ্যে পড়িবে। যে ব্যক্তি ভালটী ভিন্ন মন্দটী কখনও দেখে নাই, যে এরূপ ভাবে শিক্ষিত,মন্দের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহার বিপদ, তাহার পরাভূত হইবার অধিক সম্ভাবনা। যে মন্দের সাক্ষাতে ভালকে আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছে, পরীক্ষা দিয়াছে ও উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই নিরাপদ। সেই নিরাপদ অবস্থা প্রাপ্ত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা—ধনী মানী লোকেরাই রাজ দরবারে প্রবেশের অধিকারী। দারিদ্র্য যাহার নিত্য সহচর, অন্নাভাবে যাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ; ছিন্ন মলিন বস্ত্রই যাহার একমাত্র পরিধেয়; সংসারে যাহার আদর নাই, পদমর্য্যাদা নাই, সে ব্যক্তি রাজ দরবারে প্রবেশ করিতে পারে না। এরূপ নিরক্ষর মূর্খ চাষা, পণ্ডিত মণ্ডলীর সংসর্গের অধিকারী নহে। কলঙ্কিত-চরিত্র অসাধু, সাধু সজ্জনদিগের সহবাসে বঞ্চিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল শীর্ণকায় ভীরু কাপুরুষ, দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ বীরপুরুষদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ জন্য ইহার কিছুই প্রয়োজন হয় না। যিনি স্বোপার্জ্জিত গুণে ভূষিত হইয়া স্বর্গরাজ্য প্রবেশার্থী হন, তিনি প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে স্বোপার্জ্জিত ধন সম্পদের গৌরব করিলে চলিবে না। দীন দরিদ্র বেশে দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। ব্রহ্মকৃপার প্রহরী সর্ব্বদাই দ্বারে দণ্ডায়মান ভিখারী মাত্রেরই হস্ত ধারণ করিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে। অহঙ্কারী সাধনাভিমানী সাধুতার বাহ্যিক বেশভূষাধারী প্রবেশার্থীদের কেহই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ক্ষুব্ধচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইতেছে। আমরা বাস্তবিকই ভিখারী ভিখারীর বেশে সেই মহারাজার দ্বারে উপনীত হইব। কৃপা প্রহরী অবশ্যই আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইবে।

...র গৃহই লক্ষ্য—অমাবস্যা রজনী; ঘোর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত। প্রকৃতি গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন সময় একজন পথিক গৃহাভিমুখে পথ চলিতেছে। গৃহই তাহার লক্ষ্য, সুতরাং প্রকৃতির ভয়ঙ্কর দৃশ্যও তাহাকে ভীত করিতে পারিতেছে না। সে নির্ভীক চিত্তে পথ চলিতেছে। দুর্ব্বল চিত্ত পথিকেরা আকাশের সাজ সজ্জা দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। পথ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থদের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিন্তু নিশীথ সময়ে জাগ্রত হইয়া দেখিল যাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই দস্যু। আশ্রিতগণের প্রাণ হরণ জন্য অস্ত্র শস্ত্র শাণিত করিতেছে। তখন আতঙ্কে তাহাদের মন কম্পিত হইল। প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। প্রকৃতির করাল মূর্ত্তি এখন আর তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিল না। দস্যুগণও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কেহ কেহ প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইল; অবশিষ্ট দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িল। যখন অল্প বিশ্বাসী পথিকগণ দস্যুদের হস্তে এরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছিল, তখন বিশ্বাসী পথিক গৃহে আসিয়া পরমানন্দে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছিল। যাহারা সেই অনন্ত ধামের যাত্রী তাহাদেরও এরূপ ঘটিয়া থাকে। কত যাত্রী পথের দুর্গমতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিকটবর্ত্তী বিষয় এবং ভোগ বিলাসের গৃহে আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু নিশীথ রাত্রে জাগ্রত হইয়া দেখে আশ্রয়দাতাগণ দস্যুবেশে তাহাদের প্রাণ হরণে উদ্যত হইয়াছে। দেখিয়া কেহ কেহ প্রাণ পণে দৌড়িতে থাকে। কিন্তু দস্যুদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারে না। আমরা কখনও পথের দুর্গমতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিরস্ত হইব না। গৃহীর গৃহই লক্ষ্য থাকিবে। আত্ম ধামে পঁহুছিতে না পারিলে শান্তি নাই। পথ যত দুর্গমই হউক না কেন, এক মাত্র আশ্রয়স্থান ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া নির্ভীক চিত্তে পথ চলিব। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়াসক্তিকে বলিব তোমরা আমার আশ্রয়স্থান নও। তোমরা দস্যু। তোমরা আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম-কোষ।

বীজ যখন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তাহা অচিরকালের মধ্যে চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে সামগ্রী সকল আহরণ করিয়া আপনাপনি একটী মৃণ্ময় কোষ নির্ম্মাণ করে। উক্ত কোষের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র বীজ বাস করিতে থাকে। কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, কোন প্রকার আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক উৎপাত নিবন্ধন বিনষ্ট হইতে পারে না।

মানব সমাজে যেরূপে মানবের ধর্ম্মভাব রক্ষিত হইয়া থাকে তাহার প্রণালীও যেন কতকটা এই প্রকার। মানবাত্মা

যখন ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ হয়, এবং মুক্তির জন্য পিপাসু হয়, তখন মানব অন্তরে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশের জ্যোতিতে মানব অনেক পরমার্থতত্ত্ব দেখিতে পায়; ও তাহার হৃদয়ের গভীর ও পবিত্র ভাব সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাই মানবাত্মার আধ্যাত্মিক জীবন। এই জীবন যখন মানব প্রাপ্ত হয় তখন যদি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য উপায় অবলম্বন না করে, তাহা হইলে, সংসারের উত্তপ্ত বায়ুতে ও অপরাপর সামাজিক উপদ্রবে সে জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রক্ষার উপায়ের চিন্তা ও মানব মনে উদিত হয়। এই রক্ষা প্রবৃত্তি যেন পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণের ন্যায়, বা মার্জ্জারীর শিশুর জন্য লুক্কায়িত স্থান অন্বেষণের ন্যায় স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।" গুটি পোকা যেরূপ আপনার দেহ হইতে আপনার দেহকোষ নির্ম্মাণ করে, মানবও সেই প্রকার আপনার আত্মা হইতে ধর্ম্ম সমাজ, উপাসনা-মন্দির, অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। উভয়ের মধ্যেই বিধাতার হস্ত আছে!

যে সকল উপায় দ্বারা মানব-সমাজের ধর্ম্ম-ভাব রক্ষিত হইয়াছে, এবং কালের গতিতে বিনষ্ট না হইয়া বংশ পরম্পরা ক্রমে নামিয়া আসিতেছে, সেই সকল উপায়কে আমরা ধর্ম্ম-কোষ নাম দিয়াছি। নিম্নে কতকগুলি ধর্ম্ম-কোষের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা প্রণালী ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রথম ধর্ম্ম-কোষ। এতদ্দ্বারা পরিবার ও জনসমাজ মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবকে রক্ষা করিয়াছে; মানবের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার একটী প্রণালী খুলিয়া রাখিয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্ম-সাধনের নিয়ম যদি শিথিল হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে জন সমাজের ধর্ম্মভাব ত্বরায় ম্লান হইয়া যাইবে। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে যে বার মাসে তের পার্ব্বণ, যাত্রা মহোৎসব প্রভৃতি হয়, তদ্দ্বারা সাধারণ প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ভাবকে পরিপোষণ করে; অলৌকিক বিষয় ব্যাপারের অতিরিক্ত মানবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু যে কিছু আছে, এই ভাবটী জাগ্রত রাখে। এইরূপ প্রতি গৃহস্থের গৃহে যে কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ হয় তদ্দ্বারাও ধর্ম্মভাবকে পোষণ করে, পারমার্থিক বিষয়ের দিকে লোকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট রাখে। আমরা পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস করি না বলিয়া কি সমাজ ও পরিবার মধ্যে ধর্ম্মভাব পোষণ করিবার কোন উপায় রাখিব না? অনেক ব্রাহ্মকে সামাজিক উপাসনা ও পারিবারিক উপাসনার প্রতি উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা একবার চিন্তা করেন না যে তাঁহাদের গৃহে সন্তানগণ যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই কেবল লৌকিক বিষয় ব্যাপারের বাহুল্যই দেখিবে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আর আকৃষ্ট হইবে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র—দ্বিতীয় ধর্ম্ম-কোষ। লোকে মানব প্রণীত গ্রন্থ সকলকে ভ্রম প্রমাদ শূন্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের অগ্রে আপনাদের স্বাধীন চিন্তাকে বলিদান দিয়াছে, ইহা শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গ্রন্থপূজার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে হইবে। কত শত শত গ্রন্থ ত রচিত হইয়াছে, ও কালে বিলুপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম গ্রন্থ গুলিই কেন এত সমাদরের পাত্র হইয়া রহিয়াছে? ইহাতে কি এই প্রকাশ পায় না, যে মানব-মন স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিকতার অনুকূল? অর্থাৎ ধর্ম্মভাব মানব অন্তরের স্বাভাবিক ভাব। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব বিকৃত হইয়াই গ্রন্থ পূজার রীতি উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই গ্রন্থগুলি এক একটী ধর্ম্ম-কোষ স্বরূপ হইয়া ধর্ম্ম-ভাবকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছে। ধর্ম্ম গ্রন্থ সকলকে মানুষ যে এত সমাদর করে তাহা ভগ্ন হইয়া যাউক আমরা কি ইহা প্রার্থনীয় মনে করি? অর্থাৎ বেদ, কোরাণ বা বাইবেল, এবং সার ওয়ালটার স্কটের নভেল, লোকে এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ না করুক, আমরা কি তাহা চাই? কখনই না। ধর্ম্ম গ্রন্থ সকলের প্রতি গভীর সমাদরের ভাব যদি বিলুপ্ত হয়, তাহাতে এই প্রমাণ হইবে, যে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা মানব অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। আমরা অভ্রান্ত গ্রন্থ মানি না বলিয়া কি আমাদের ধর্ম্ম ভাব পোষণের উপযোগী কোন গ্রন্থ থাকিবে না? ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের রীতি কি আমরা তুলিয়া দিব? আমরা রোগে শোকে সান্ত্বনা পাইতে পারি, ভয় বিপদে বল লাভ করিতে পারি, উপাসনা কালে ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপ্ত করিতে পারি, এমন সকল গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের জন্য সংকলিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহাকে ব্রাহ্মেরা ধর্ম্ম জীবনের সহায়রূপে অবলম্বন করিবেন।

তৃতীয় ধর্ম্ম-কোষ সাধুদের স্মৃতি। এই স্মৃতি দুই প্রকারে জাগ্রত রাখা হয়, প্রথম তাঁহাদের জীবন চরিত ও উক্তি সকলের আলোচনা দ্বারা, দ্বিতীয় তাঁহাদের আস্থানাদিতে তীর্থ যাত্রাদির দ্বারা। এক এক জন মহাজন যেখানে জন্মিয়াছিলেন, যেখানে যেখানে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন সে সকল স্থানে তীর্থ যাত্রা করিবার রীতি আছে। কালক্রমে এই তীর্থ-যাত্রা এক প্রকার অন্ধ ক্রিয়াতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সাধুদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রিয়তারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থ পূজার ন্যায় সাধুভক্তিও এদেশে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা কি চাই যে সাধুভক্তি একেবারে বিনষ্ট হউক? অর্থাৎ যীশুও লার্ডবাইরন, এই উভয়ের মধ্যে লোকে প্রভেদ না করুক ইহা কি প্রার্থনীয় মনে করি? কখনই না। বরং যদি সাধুভক্তি বিলুপ্ত হইতেছে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ভাবিব তাহাদের অন্তরের ধর্ম্মভাব ও ম্লান হইতেছে। আমরা সাধু-ভক্তিকে অন্ধ রাখিব না, কিন্তু জ্ঞানালোক উন্নত করিব, রক্ষা করিব। বর্ষে বর্ষে হাজার হাজার লোক পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সেক্ষপীরের গোর দেখিতে যায়, সেওত এক প্রকার তীর্থযাত্রা। এ তীর্থ যাত্রাতে দোষ কি? গুণীর গুণাবলী স্মরণে ত গুণভাগেরই উদয় হইবার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজ কি প্রকারে এ দেশের ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে পোষণ করিবেন; কেবল মাত্র ভঞ্জন ক্রিয়া-দ্বারা নহে। পুরাতন ধর্ম্ম-কোষগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থানে যদি উৎকৃষ্টতর ও বিশুদ্ধতর ধর্ম্ম-কোষ নির্ম্মাণ না করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মভাব কালে শিথিল হইয়া পড়িবে, আধ্যা-

স্মিকতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং পরমার্থ-তত্ত্বের লালসা লোকের অন্তরে থাকিবে না। তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অধিকার করিতে পারিবে না।

ভারত-নারী ও ব্রাহ্মসমাজ।

যীশুর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানেই নারীগণ তাঁহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিতেন; তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন, ও মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন। কতকগুলি স্ত্রীলোককে তিনি রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহার ১২ জন শিষ্যের সঙ্গে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। ঐ রমণীদিগের মধ্যে মেরী নাম্নী এক রমণী ছিল—সে ইতিবৃত্তে মেরী মাগদলিন নামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ রমণী প্রথমে কুলটা ছিল; সহরের সকল লোকে তাহাকে অস্পৃশ্য জানিয়া ঘৃণা করিত। যীশুর প্রতি ঐ রমণীর এত গভীর প্রেম জন্মিয়াছিল যে, সে আপনার পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। সে সভার মধ্যে আসিয়া যীশুর চরণালিঙ্গন করিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিত ও আপনার আলুলায়িত কেশপাশ দ্বারা চরণ মুছাইয়া দিত। তাহাতে শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন কিন্তু যীশু তাহার ব্যাকুলতাতে বাধা দিতে নিষেধ করিতেন। এতদ্ভিন্ন জেরুশালম নগরের সন্নিধানে কোন গ্রামে লাজারস নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাঁহার মেরী ও মার্থা নামে দুই ভগিনী ছিল। ঐ দুই ভগিনীর বিশেষতঃ মেরীর যীশুর প্রতি অতিশয় প্রেম ছিল। যীশু যেরুশালম যাত্রা কালে প্রায় তাহাদের বাটীতে বাস করিতেন। ঐ দুই ভগিনীকে যীশু এত ভাল বাসিতেন যে মেরী ভ্রাতৃশোকে কাঁদিতেছে দেখিয়া যীশু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার কালে যেরূপ, যীশুর মৃত্যু কালেও সেইরূপ নারীগণের প্রেমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মান্ধ য়িহুদীগণ যখন হত্যা করিবার মানসে যীশুকে ধৃত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, তখন যীশুর শিষ্য দলের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। দ্বাদশজন শিষ্য মাত্র শেষ দিনে তাঁহার সঙ্গে রহিল। যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরাও কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে।" যে রাত্রে যীশু ধৃত হইলেন সে রাত্রে সে দ্বাদশজনও তাঁহার সহচর হইতে সাহসী হইল না। পিটার তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি গোপনে সঙ্গে গেলেন বটে কিন্তু প্রাণভয়ে মিথ্যা কথা কহিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব অস্বীকার করিলেন। এইরূপ ঘোরতর সামাজিক নির্য্যাতনের সময়েও যীশুর ক্রুশ কাষ্ঠের নিকট আমরা কয়েকটী নারী মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এবং বাইবেলে এপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে যে যীশু কবর হইতে তৃতীয় দিবসে উঠিয়া প্রথমে মেরীকেই দেখা দিলেন। যীশুর মৃত্যুর পর তাঁহার ১২০জন শিষ্য জেরুশালম নগরের এক দ্বিতল গৃহে পড়িয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যেও অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হইতেই ইহার বীজ সকল নারী হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে জগতে জয় লাভ করিয়াছে, নারী হৃদয়ের প্রেম তাহার একটী প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্ম নারী হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না তাহা জনসমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজকে ভারত নারীর সৌভাগ্য রবি বলিলে হয়। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে যত মহা কল্যাণ সাধন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে ভারতনারীর বন্ধন মুক্তি একটী প্রধান। এই বন্ধন মুক্তি দুই প্রকারে হইবে—প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন; দ্বিতীয়, ইহা তাঁহাদিগকে সামাজিক দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত করিবেন। এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মগণ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী; বাল্য বিবাহের বিরোধী; বালবিধবাদিগের বিবাহের অনুকূল; ও নারীর স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ভারত নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইতেছেন, যাঁহাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিতেছে, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের এই লক্ষ্য অনুভব করিতে পারিতেছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ স্বতঃই আকৃষ্ট হইতেছে। আমরা নারীগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতেছি না; তথাপি নারীগণ দলে দলে আমাদের উপাসনাদিতে আকৃষ্ট হইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে সময়ে সময়ে এত নারীর সমাগম হয় যে মহিলাদিগের আসনে স্থান সমাবেশ হয় না। মাঘোৎসবের সময়ে মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান মহিলাদিগের জন্য ঘিরিয়া দেওয়া হয় তথাপি অনেকে স্থানাভাবে বসিতে পান না, কাহাকে কাহাকেও বা ফিরিয়া যাইতে হয়। এ সকল অতি শুভ চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ যাহাই বলুন ইহার মূল সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর হিন্দুরমণীর ব্রাহ্মসমাজের দিকে বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা হিন্দুবিধবা। বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে বহু সংখ্যক হিন্দুবিধবা ব্রাহ্মসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম আত্মীয়গণ প্রথমে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদিগকে আনিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মবন্ধুগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে তাঁহাদিগকে স্থান দিয়া কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়া তাঁহারা সন্তানগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে সংসার করিতেছেন। এই সংবাদ যতদূর যাইতেছে ততদূর হিন্দুবিধবাদিগের মনে এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে, কিরূপে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিবেন ও ঐ প্রকার জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া সুখে ও স্বাধীনভাবে বাস করিবেন। এরূপ আকাঙ্ক্ষা অতি স্বাভাবিক ও নিন্দনীয় নহে। এই সকল বিধবা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মদিগকে পত্রাদি লিখিতেছেন ও আশ্রয়

ভিক্ষা করিতেছেন। অথচ তাঁহাদিগকে আনিয়া রাখা যায় এরূপ কোন আশ্রয়-বাটিকা (এসাইলম্) নাই; শিক্ষা দেওয়া যায় এরূপ কোন বিদ্যালয় নাই; বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় এরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। একজন বিধবা যখন আসেন, তখন সচরাচর তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মগৃহস্থের গৃহে রাখা হয়। এরূপ গৃহস্থও ব্রাহ্মদের মধ্যে অধিক নাই। তাঁহারা হিন্দুসমাজে থাকিলে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতেন, এখানে আসিয়াও পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষের মধ্যে এই সেখানে যাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতেন, তাঁহারা স্বসম্পর্কীয় লোক ও তাঁহাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ; অর্থাৎ তাঁহারা নিতান্ত বিরক্ত হইলেও ঠেলিতে পারেন না; স্থান দিতেই হয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যাঁহাদের গৃহে থাকেন, তাঁহারা একেবারেই নিঃসম্পর্কীয় লোক, কোন প্রকার দোষ বা ত্রুটি দেখিলে, বা অন্য কোনরূপে পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হইলে আর তাঁহারা শেষে গৃহে স্থান দিতে চান না। যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবাকে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া আশ্রয় স্থানের অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয়। যে বিধবা এক ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহ হইতে তাড়িত হইল, অপরেরা আর তাহার জন্য দ্বার খুলিতে চায় না। সুতরাং মহাসংকট উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থাতে এক একজন বিধবাকে এত যাতনা পাইতে হয় যে তখন জীবন ভার বলিয়া বোধ হয়। এক দিকে ত এই ক্লেশ আবার অপর দিকে আর এক বিপদ। হিন্দু বিধবাগণ হঠাৎ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াই এক সম্পূর্ণ নূতন জগতে পড়িয়া যান। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আসিয়া দেখিতে পান নারীগণ অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। স্বাধীনভাবে চলা ফিরা তাঁহাদের কখনও অভ্যাস নাই। সে অবস্থাতে কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাঁহারা জানেন না; সুতরাং অনেক বিধবা চলিতে না জানাতে লোকের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন এবং কোন কোন স্থানে বিপদে পড়িয়া যান। প্রথমে উদ্যোগী হইয়া যাঁহারা আনেন, শেষে আর তাঁহাদিগের দেখা পাওয়া যায় না, কলঙ্কের ডালি সমগ্র সমাজকেই বহিতে হয়। এই সকল চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই মতে উপনীত হইয়াছেন—"যে যতদিন আশ্রয়াগত বিধবাদিগের শিক্ষা ও উন্নতির কোন সদুপায় না করা যায় যতদিন কোন আশ্রয়-বাটিকা না খোলা যায়, ততদিন আর কোন হিন্দু বিধবাকে আসিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে তাহাদিগকে সুখী না করিয়া অসুখী করা হয়।

দ্বিতীয় কথা, এই বিধবাদিগের বিবাহ ঘটনার জন্য ত ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় নাই। মুক্তি পিপাসু নরনারীকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করিবার জন্যই ইহার জন্ম। অতএব আমরা কাহাকেও গ্রহণ করিবার সময় এই মাত্র দেখিব যে সে মুক্তি-পিপাসু কিনা? বিচারে আমাদের ভ্রম থাকিতে পারে কিন্তু এদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। যদি ব্রাহ্মগণ মুক্তি পিপাসার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বিবহার্থিনী বিধবাদিগকে স্থান দিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মনে এই সংস্কার জন্মিবে যে ধর্ম্ম সাধনের জন্য তাঁহাদের সমাজ নহে।

অতএব একদিকে ভারতীয় নারীগণের যেমন ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকর্ষণ হইতেছে অপরদিকে তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহাদের সম্মুখে প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনকেই ধরিতে হইবে।

হিন্দু বিধবাদিগের আর্ত্তধ্বনির প্রতি ব্রাহ্মগণ কি বধির হইবেন? কখনই না। হিন্দুবিধবাগণ যাহাতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে স্বাধীন বৃত্তি লাভে সমর্থ হন; যাহাতে আপন আপন জীবনকে সুখী করিতে পারেন, সে বিষয়ে ব্রাহ্মগণ স্বতঃ পরতঃ সাহায্য করিবেন। সে সম্বন্ধে নিয়ম এই—"শিক্ষার্থিনী বিধবাদিগকে বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বোর্ডিং স্কুল বা রমাবাইএর শারদাসদনের ন্যায় স্থানে প্রেরণ কর; বিবাহার্থিনী বিধবাদিগকে তদুদ্দেশ্যে স্থাপিত আশ্রয়বাটীকাতে প্রেরণ কর; দীক্ষার্থিনী বিধবাকে ব্রাহ্মসমাজে স্থান দিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার উপায় বিধান কর, শিক্ষার্থিনীদিগকে আশা দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনা অন্যায় কারণ ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের শিক্ষার্থ কোন বিদ্যালয় করেন নাই; বিবাহার্থিনীদিগকে ও আশা দিয়া আনা অন্যায়; কারণ সে আশা কেহই দিতে পারে না। বিশেষ সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ নহে। দীক্ষার্থিনীদিগকেই আমরা আশ্রয় দিতে পারি। আমাদের অনুরোধ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এবিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৬ই আষাঢ় বরিশাল নগরে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়. নিবাস লাখুটিয়া বরিশাল, বয়স ২৮ বৎসর, কন্যার নাম শ্রীমতী ইন্দুনিভা সরকার। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত জন্ সরকারের কন্যা। বয়স ২৫ বৎসর। কন্যা প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কালক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাবু মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বিবাহে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে। আমরা এই নব দম্পতীর কল্যাণ প্রার্থনা করি।

বিগত ২৩এ আষাঢ়, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে আর একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বাবু হরকুমার গুহ, নিবাস বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, ইনি বিপত্নিক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত, মজিলপুর নিবাসী বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা, বয়স প্রায় ২০ বৎসর। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

'বাঘআঁচড়া হইতে বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, যে, গত ১০ই জুন ১৮৮৯, ২৮এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার বাঘআঁচড়ার বাবু রতিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের কন্যা কুমারী নবকুমারীর পরলোক হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতে কিছু

দিন প্রতি সপ্তাহে ২।৩ দিন করিয়া তাঁহার গৃহে উপাসনা করিয়াছেন। শবদাহ করিতে যাইবার সময় পথে ও শ্মশানে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এইরূপ করাতে পরলোক-গতার পিতা মাতার শোকাবেগ অনেক পরিমাণে হ্রাস অথবা ভগবানের নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

কুলবাড়িয়ার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী অন্নদায়িনী মল্লিকের প্রসবার্থ কলিকাতায় যাইবার কালিন পথিমধ্যে যাদবপুর ষ্টেসনে প্রসব কষ্টে মৃত্যু হইয়াছে। শব দাহ উপলক্ষে উপাসনা করেন। গত ৮ই জুলাই তারিখে তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা হইয়াছে।

গত ৩রা জুলাই ১৮৮৯ বাঘআঁচোড়ার বাবু রাধানাথ মল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র পরলোকগমন করিয়াছে। তাহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করিয়াছেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

টাঙ্গাইল।

কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী ও বাবু প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়গণ ও ময়মন সিংহ হইতে বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও গয়া স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ মহাশয় ও তাঁহার তিনটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাবু হরিদাস গুহ, বাবু রজনীকান্ত গুহ ও বাবু রমণীকান্ত গুহ এই উৎসব উপলক্ষে এখানে আগমন করেন ও উৎসবের কয়েক দিন থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্নবড় বাঁশালায়া হইতে বাবু চন্দ্রনাথ বাগচি করটিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাবু হরনাথ ঘোষ ভাতকুড়া হইতে বাবু কেদার নাথ ঘোষ স্কুল ডিঃ ইনস্পেক্টর বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন

নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২০এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে উদ্বোধন—বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে কিছুকাল মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে ৪॥ ঘটিকার সময় অত্রস্থ স্কুল গৃহে যোগতত্ব বিষয়ে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই—প্রাচীন ভারতে নানাপ্রকার যোগ প্রণালী প্রচলিত ছিল, কাল ক্রমে ঐ সব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যোগ মাহাত্ম্য অনেকের নিকটেই অপরিচিত। প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা লোকে যে অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখাইতে পারে তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়া বাহ্যিক শারীরিক ক্রিয়ার ফল মাত্র। ঐ সকল ক্রিয়া যোগ মাহাত্ম্যের প্রকৃত পরিচায়ক নহে। প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগ প্রণালী মন স্থির করার এক প্রকার উপায় মাত্র। কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার গাঢ় যোগই প্রকৃত যোগ, এবং ইহাই মনুষ্য জীবনের উচ্চলক্ষ্য। যে সকল দেশে বা যে সকল স্থানে ভারতবর্ষীয় যোগ প্রণালী প্রচলিত নাই, সে সকল স্থানেও কেহবা বাহিক প্রকৃতিতে, কেহবা অন্তর্জ্জতের বিশেষ বিশেষ ভাব নিচয়ে ঈশ্বরের অমোঘ শক্তি উপলব্ধি করিয়া তদবলম্বনে ধ্যান সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এবং এই ধ্যান যোগে আধ্যাত্মিক রাজ্যে পহুছিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার গভীর যোগ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে কোন উপায় অবলম্বনে হউক পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই প্রকৃত যোগ। মানুষ যখন এই যোগ বলে বলীয়ান্ হয়, তখন তাহার শক্তি মনুষ্য শক্তির সাধারণ সীমা অতিক্রম করিয়া এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে। তখন সে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইলে শত শত লোকের ভ্রূকুটী অগ্রাহ্য করিয়া অমিত তেজে বহুযুগের কুসংস্কারের দুর্গ উল্লঙ্ঘন করতঃ সত্যের জয় পতাকা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়। দেশের উদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সে এক অমানুষিক শক্তি বলে রাশি রাশি লোক আপনার পক্ষে আকর্ষণ করিতে পারে। খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন উল্লেখ করিয়া বক্তা ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং নিরাকার পর ব্রহ্মের ধ্যান যে অতি স্বাভাবিক এবং ইহাই প্রকৃত ধ্যান, সাকার ধ্যান ধ্যানই নহে ইহা বক্তার কথায় বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। সাকার বাদী (যাঁহাদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল) ও নিরাকার বাদী উভয় শ্রেণীর লোকই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতাটী অতি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন এবং আমাদিগের বিশ্বাস উভয় শ্রেণীই বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় মুসলমান জমীদার বাবু মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব প্রদত্ত গৃহাভিমুখে যাত্রা করা হয়। অদ্য এই নব গৃহ প্রবেশের দিন। গৃহের সম্মুখে আসিয়া কিছুকাল প্রমত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইলে ঠিক সন্ধ্যার সময় একটী প্রার্থনা দ্বারা দয়াময় ঈশ্বরের কৃপাকাঙ্ক্ষী হইয়া গৃহে প্রবেশ করা হয়। তৎপর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নবগৃহ প্রতিষ্ঠা সূচক ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। পরে উপাসনা হয়। বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার সময়ে স্থানীয় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপাসনার কার্য্যে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

২১এ জৈষ্ঠ সোমবার—অদ্য ৬॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় উপাসক মণ্ডলী ভুক্ত শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিয়োগী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে "ঈশ্বরকে প্রীতি করা মানুষের স্বাভাবিক ভাব" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় নগর কীর্ত্তনের কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টির গোলযোগে কীর্ত্তন বাহির হইতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে বাইবেল ও

অন্য দুই একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—সারা দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে প্রায় ৭ ঘটিকার সময় ভোর কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। বাবু প্রসন্ন কুমার বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে উপাসক মণ্ডলী মত্ততার সহিত অনেক ক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। তৎপর ভিক্ষুকদিগকে তণ্ডুল বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটীকার সময় উপাসনা গৃহে সকলে একত্রিত হইলে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। স্থানীয় উপাসক মণ্ডলীভুক্ত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ৩ ঘটিকা হইতে প্রায় ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রন্থ পাঠ হয়। গয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ নাথ গুহ মহাশয় শ্লোক সংগ্রহ হইতে কয়েকটী শ্লোক বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। ৪॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তৎপর প্রায় ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় উকীলবাবু কৃপানাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসাবাটীতে নারী জীবন অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটী সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানটী উৎসবের নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান ভুক্ত ছিলনা। স্থানীয় কয়েকটী ভদ্রমহিলার বিশেষ উৎসাহ ও ব্যগ্রতায় বাধ্য হইয়া এই বক্তৃতা করা হয়। তাঁহাদের সে দিনের উৎসাহ ও ব্যগ্রতার কথা মনে হইলে আশা ও আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। রাত্রিতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

এবারকার উৎসব উপলক্ষে দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে বিশেষ কৃপার পরিচয় দিয়াছেন। মন্দিরের জন্য একখানা খড়ের ঘর করিবার আমাদের শক্তি ছিল না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহারই কৃপাগুণে করটীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত হাফেজ মাহম্মদ খাঁ সাহেব আমাদিগকে এক খানা প্রশস্ত টিনের ঘর দান করিয়া হৃদয়ের বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে এই বদান্য মহোদয়কে আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, মে, জুন) কার্য্যবিবরণ

১৮৮৯

বিগত তিনমাসে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১২টী নিয়মিত ও ৫টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে—

৩১এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ—বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব হইয়াছে। ৩১এ চৈত্র সায়ংকালে উপাসনা হয়। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে সংগীত সংকীর্ত্তন হয় এবং সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১লা, ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ উপাসনা ও বক্তৃতাদি হয়। ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বাবু সীতানাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "বিশ্বাসী ও অল্পবিশ্বাসী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ ২ দুই বেলা উপাসনা হয়, দুই বেলাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে বাবু সীতানাথ দত্ত এমার্শন প্রণীত ইংরাজি গ্রন্থ এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে সংগীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। এই দিন দুইজন যুবকের ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু একজন ঘটনাক্রমে সে দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অপর যুবক সায়ং কালীন উপাসনার পর দীক্ষিত হন। তাঁহার নাম নদেরচাঁদ বৈরাগী। বাবু এককড়ি সিংহ রায়ও পরে দীক্ষিত হইয়াছেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি আট ঘটিকার সময় সিটিকলেজ ভবনে সামাজিক সম্মিলন হয়। তথায় প্রার্থনা হয়। তৎপর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৎপর বালক বালিকাদিগকে আমোদ জনক ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া জলযোগের পর সম্মিলন সভার কার্য্য শেষ হয়।

বাগআঁচড়া স্কুল—১৮৮৮ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে বাগআঁচড়ায় প্রচারকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় একটী স্কুল খুলিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি নিজেই উহার সম্পাদকের কার্য্য ও ইংরাজি শিক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করেন। আর দুই জন পণ্ডিত আছেন তাঁহারা বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া থাকেন। স্কুলে এখন ৪০ জন বালক ও ১০ জন বালিকা আছে। তথাকার ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোন ভাল উপায় ছিল না। এই বিদ্যালয় দ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকার হইতেছে। ২ জন পণ্ডিতের মাসিক বেতন ১৫৲ এবং অন্যান্য ব্যয় মাসিক ২৲। মোট ১৭৲ করিয়া ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয় স্কুলের ছাত্রবেতন এবং অন্যান্যের প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা চলিতেছে। আমরা সাহায্য দাতা মহাশয়দিগকে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই স্কুলটী মাইনর ক্লাস স্কুলে পরিণত করিতে পারিলে ব্রাহ্ম বালকদিগের সঙ্গে স্থানীয় অন্যান্য বালকদিগেরও বিশেষ উপকার হয়। বৎসরেক কাল এই স্কুল চালাইতে পারিলে পরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। মাইনর স্কুল সংস্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন আছে।

দুর্ভিক্ষ—ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়কে তথাকার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আবশ্যক রূপ সাহায্য দান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ভারপ্রদান করেন। তিনি বাবু হরিমোহন ঘোষাল, বাবু উপেন্দ্রনাথ সরকার ও বাবু রাম গোপাল মজুমদারমহাশয়দিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় গমন করেন। ৩।৪দিন তথায় থাকিয়া ২২ খানি গ্রাম পরিদর্শন করেন। তৎপরে তিনি এখানে আগমন করিলে তাঁহার সঙ্গীগণ

আরও৯খানা গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁহারা যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তদ্দারা জানা যাইতেছে ৩১ খানা গ্রামের লোকের মধ্যে ২২ খানা গ্রামের লোকেরই অধিক পরিমাণে কষ্ট হইয়াছে। তাহাদের শতকরা ৮ জনের কষ্টই খুব বেশী। এই সকল লোকের মধ্যে ৩৩৮ জনকে চাউল পয়সা এবং কাপড় প্রভৃতি দান করা হইয়াছিল। অনুসন্ধানকারীগণের গমনাগমন ও তথায় অবস্থিতির ব্যয় এবং দানের জন্য ৬১।৶৫ লাগিয়াছে। উক্তস্থান সকলের লোকদিগকে কিছু কিছু কাজ দিয়া সাহায্য করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে হইয়াছিল এবং তদনুরূপ আয়োজন হইতেছিল। এমন সময় উপযুক্ত রূপ বৃষ্টি হওয়ায় কৃষক এবং মজুরদিগের বিশেষ কাজ উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় ডায়মণ্ডহারবারের ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয় ও অন্যক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে কাজ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এখন কেহই তথায় যাইয়া কাজ করিতে সম্মত নয়। এজন্য এখন আর তথায় বিশেষ কিছুই করা হইবে না। আবশ্যক হইলে পরে সাহায্য করা যাইবে। এই দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আমরা ১৯৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছি। বাকী টাকা নলহাটি দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে দেওয়া হইবে। বেহার, উড়িষ্যা, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্য জন্য একটী সম্মিলিত কমিটী হইয়াছে। মধ্যবঙ্গ-সম্মিলনী থিওসফিক্যাল সোসাইটী, সঞ্জীবনী, ভারতসভা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকগণ মিলিয়া এজন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

প্রচার—খাসিয়াদিগের মধ্যে স্থায়ীরূপে একজন প্রচারক রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক দিন হইতে শিলংস্থ বন্ধুগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করিতে ছিলেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভাও তথায় প্রচারক পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তথায় যাইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত এমন লোক না পাওয়ায় এত দিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি চেলাপুঞ্জি হইতে খাসিয়াদিগের কয়েকজন মিলিয়া একখানি পত্র লিখেন এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের পত্র পাইয়া এসম্বন্ধে কিছু করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে বাবু নীলমণিচক্রবর্ত্তী (যিনি ইতিপূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা প্রকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিতেছিলেন) খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে তথায় প্রচারকার্য্যের কিরূপ সুবিধা আছে জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি শিলংএ গমন করিয়াছেন। তথায় যাইয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তিনি খাসিয়াকে প্রচারের বিশেষ কার্য্য ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। শিলংস্থ বন্ধুগণ তাঁহাকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি শিলংয়ে থাকিয়া খাসিয়া ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং জানাইয়াছেন ৩ তিন মাসের মধ্যেই খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দিতে পারিবেন। এখন ইংরেজিতে তথাকার খাসিয়া সমাজে কাজ করিতেছেন। খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ সম্প্রতি একখানি সংগীত পুস্তক ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসার খাসিয়া ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পরলোকগত লালা বজরংবিহারী মহাশয় ২০০৲ শত টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মোজঃফরপুরে প্রচারের প্রধান স্থান করিয়া বেহার প্রদেশ প্রচারের জন্য একজন প্রচারক থাকিলে এই টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অন্য উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কেই তথায় থাকিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক প্রেরণের জন্য অনুরোধ পত্র আসিয়াছিল। কুষ্টিয়া, মুর্সিদাবাদ, বাগেরহাট, কাঁথি, হাজারিবাগ, বনগাঁ, কুমিল্লা, নওগাঁ, (রাজসাহি) পাবনা। শিলচার, পূর্ণিয়া, কাকিনিয়া, নলধা, বাঁশবাড়িয়া, বড়বেলুন টাঙ্গাইল।

নিম্নলিখিত ভাবে আমাদের প্রচারকগণ বিগত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—১লা এপ্রিল হইতে ৭ই পর্য্যন্ত মোজফরপুরে থাকিয়া প্রায় প্রতিদিন তথাকার বন্ধুগণের সহিত উপাসনা করেন এবং তত্রত্য ভদ্র লোকদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। ৭ই এপ্রিল তথায় সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং অপরাহ্নে "বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর সমস্তিপুরে গমন করেন। এখানে ডিষ্ট্রিক্টেট রেলওয়ের অনেক কর্ম্মচারী অবস্থিতি করেন। এখানে আসিয়া ভদ্র লোকদিগের সহিত আলোচনা করেন এবং "সংসারে কি ভাবে থাকিতে হইবে" এবিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং প্রতিদিন ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত উপাসনা করেন। এস্থান হইতে লাহিড়িয়াসরাই নামক স্থানে গমন করেন। এখানে বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে ২৪এ পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। এই সময় মধ্যে যে বাটীতে তিনি ছিলেন প্রতিদিন তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা ও আলোচনা করেন। তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সহিত ২ দিন উপাসনা ও আলোচনা করেন এবং সামাজিক উপাসনা করেন। ২৫এ এপ্রিল দ্বারভাঙ্গায় গমন করেন। তথায় বন্ধুগণের সহিত আলোচনা এবং উপাসনা ভিন্ন আর কোন কাজ করিতে পারেন নাই। ১লা মে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব-নারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থান একার নামক স্থানে গমন করেন। তথায় যাইবার পথে ঝাঞ্চারপুর নামক ষ্টেশনে একটী ভদ্র লোকের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। একার নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক ৯ই মে পর্য্যন্ত তথাকার বন্ধুগণের সহিত প্রতিদিন উপাসনা, আলোচনা করেন এবং সামাজিক উপাসনায় হিন্দিতে উপদেশ দেন। "ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়াতে সামঞ্জস্য আছে কি না"। "জীবহিংসায় পাপ আছে কিনা" "পাপের জন্য একবার অনুতপ্ত হইলে পুনরায় কোন শাস্তি আছে কিনা" এই সকল বিষয়ে আলোচনা

হয়। পরলোকগত লালা বজরং বিহারী মহাশয়ের ট্রষ্টি এব একজিকিউটার—ব্রহ্মদেবনারায়ণ,দেব মহাশয়ের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে আলাপ করেন। এখান হইতে লাহিড়িয়া সরাই ও মোজফরপুর হইয়া কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আগমন করেন। ১২ই হইতে ২৩এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা করেন। টাঙ্গাইল সমাজের উৎসবে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আবশ্যক হওয়ায় মুর্শিদাবাদ সমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি হয় এবং "ঈশ্বর বিশ্বাসই ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

তথা হইতে কলিকাতায় আসিবার পথে নলহাটীতে অবস্থিতি করিয়া সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা ও "আগে মানুষ হও" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বনগাঁ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় উপাসনা ও "ধর্ম্মবলই সমাজ রক্ষার উপায়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আসিবার সময় মঙ্গলগঞ্জে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন। শীঘ্রই বেহার অঞ্চলে গমন করিবেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—বাগআঁচড়া স্কুলের কার্য্যেই অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৫।৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্কুলের বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং স্কুলের আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্কুলের পর রাত্রিতেও ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের পাঠাভ্যাসের সাহায্যার্থ ৩।৪ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়াছেন। বাগআঁচড়ার ভিন্ন ভিন্ন চারিটী পল্লিতে ৪টী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়মিত রূপে উপাসনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক সমাজের মাসিক উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাকার পারিবারিক অনুষ্ঠান সকলে উপাসনা করিয়াছেন এবং আলোচনা করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি—সামাজিক উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত সায়ংকালে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিনে ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত বিশেষ উপাসনা করেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" "প্রকৃত পথ কোথায়?" এই দুই বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন।

সিলিগুড়ি—সমাজ গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন ও ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত বিশেষ উপাসনা করেন।

সৈয়দপুর—ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত বিশেষ উপাসনা করেন।

বদরগঞ্জ—এখানে কোন ব্যক্তির সহিত (তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হেতু) নির্জ্জন প্রার্থনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনাদি করেন। অন্যান্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? তাহা বুঝাইয়া দেন।

কাকিনীয়া—উৎসব উপলক্ষে সমাজে উপাসনাদি করেন, ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন ও রাজকুমারের পাঠ গৃহে এই উপলক্ষে একদিন বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। স্থানীয় হলে "জীবন কাহাকে বলে" এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

দিনাজপুর—সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনাদি সম্পন্ন করেন; স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপাদি করেন, ও সমাজ গৃহে (১) "সমাজের উন্নতি ও অবনতি" (২) "কোন্ পথ অবলম্বন করি।" বিষয়ে ২টী বক্তৃতা করেন

বোয়ালিয়া—সম্প্রতি এখানে অবস্থান করিয়া সায়ংকালে ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত উপাসনাদি করিতেছেন। সম্প্রতি কিছুকাল এস্থানে অবস্থিতি করিবেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩১এ চৈত্র হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় ১০ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া প্রায় প্রতিদিন সমাজ গৃহে ও বন্ধুগণের গৃহে উপাসনা ও আলোচনা ও সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। তথাকার উৎসবে উপাসনাদিতে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বশাখ "ধর্ম্মজীবন" বিষয়ে একটী ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ "জাতীয় আন্দোলন" বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তথা হইতে আগমন পূর্ব্বক ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বংশবাটী ব্রহ্ম মন্দিরে তথাকার সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকদিন উপাসনা করেন এবং উপদেশ। দেন এই উৎসবে "সার ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এবং এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া যুবকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন। এই সময় মধ্যে একখানা ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—কিছু দিন হইল তিনধারিয়ায় অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মসাধন প্রভৃতিতে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তিনি নিয়মানুসারে ২ মাসের জন্য প্রচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া আছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতা অবস্থিতি কালে এখানকার উপাসকমণ্ডলীতে সামাজিক উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মিঃ ব্লেকার সাহেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সমাজে প্রতি রবিবার নিয়মিত রূপে ইংরাজিতে উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবে 'ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ' বিষয়ে এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসবে "বিশ্বাসী ও অল্প বিশ্বাসী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভবানীপুর প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল গৃহে "ভারতের ভবিষ্যত" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন দশঘরা গ্রামে গমন পূর্ব্বক বাবু উমাপদ রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা করেন। তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিষয়ে এবং সাকার নিরাকার উপাসনা বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। একদিন তথাকার পণ্ডিতগণের সহিত সাকার ও নিরাকার

উপাসনা সম্বন্ধে বিচার করেন। বড় বেলুন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক উপাসনা করেন ও নগর সংকীর্ত্তনের সময় পথে স্থানে স্থানে সংক্ষেপে উপদেশ দেন এবং "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক ৩ বেলা উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ডায়মণ্ডহারবারের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তথায় যাইয়া ৩।৪ দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক গ্রামসকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং দানের ব্যবস্থা করেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন বসু—ঢাকার অন্তর্গত তিল্লিনামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া কয়েক রবিবার সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন। একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীবাড়ী নামক গ্রামে গমন পূর্ব্বক "ঈশ্বর পিতা ও মানুষ ভাই" "কিসে প্রায়শ্চিত্ত হয়" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। খোলাবাড়ীয়া নামক স্থানে একটী ভ্রাতৃ সম্মিলনী সভা আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন এবং একদিন "ভারতের ইতিহাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে কি জানিতে পারি" এ বিষয়ে আলোচনা এবং "উচ্চতর ধর্ম্মজীবন" "চিন্তাই প্রেম সাধনের উপায়" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বান খানাপুরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য স্কুলের বালকদিগকে কিছু উপদেশ দেন। এবং তথায় উপাসনা করেন। ফরিদপুরে গমন পূর্ব্বক তথায় পারিবারিক উপাসনা করেন এবং সমাজ গৃহে দুই বেলা উপাসনা করেন। এবং উপদেশ দেন। বাজারে "ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর" বিষয়ে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ রায়, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

উপাসক মণ্ডলী—এই তিন মাস উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত সামাজিক উপাসনা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া আসিয়াছে। এই সময় মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়গণ মন্দিরের উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে যে উৎসব হয়, তাহাতে দুই দিন উপাসনা হয় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসমাজ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপাদি করিয়া মণ্ডলীর আচার্য্য ও উপাসকগণের মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়গণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দিরে রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনা ও মঙ্গলবার সঙ্গতের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে মণ্ডলীর কতিপয় সভ্য মন্দিরে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে যে কথোপকথন ও গ্রন্থপাঠ করিতেন তাহা আপাততঃ স্থগিত আছে।

সঙ্গত সভা—সঙ্গত সভার এপ্রেল মাসে ৫টী, মে মাসে ৩টী, ও জুন মাসে ৪টী অধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্যেক অধিবেশনে ১০।১৫ জন সভ্য নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। এই সকল অধিবেশনে প্রধানতঃ কেবল দুইটী মাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রথমটী "কি কি বিষয় দেখিয়া কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" ২য়টী উপাসনা।

দাতব্য কমিটি—এই সময় মধ্যে চাঁদা ২০্ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে, এক কালীন দান প্রায় ১০০্ টাকা, স্বাক্ষর হইয়াছে, (তন্মধ্যে ৭৬৷৷০ টাকা আদায় হইয়াছে) এবার চাঁদার বহি ২২ খানা প্রস্তুত করাইয়া বন্ধুগণের নিকট দেওয়া হইয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে সাহায্য দান অতি অল্পই করা হইয়াছে। আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা		খরচ	
এক কালীন দান সংগ্রহ	৭৬৷৷০	পুস্তক ফণ্ডের ঋণ শোধ ৫০্ মধ্যে	৪০্
একটী ভদ্র মহিলা কোন অনাথা বালকবালিকাকে দেওয়ার জন্য দান করেন	১০্	এক কালীন দান	১১।০
		মাসিক দান	৪্
		বিবিধ ব্যয়	৫্৫
			৬০।৫
বার্ষিক চাঁদা আদায়	৩্	স্থিত	৭০৶১০
থিওডোর পার্কার ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	১৫।৴০		১৩০৷৶১৫
	১০৪৸৶০		
পূর্ব্বস্থিত	২৫৷৷১৫		
	১৩০৷৶১৫		

ছাত্রসমাজ, রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয় এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য গ্রীষ্মের বন্ধের পর পুনরারব্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই সকল সভার কোন কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মবন্ধু সভার কার্য্য ২৮এ জুন তারিখে আরব্ধ হইয়াছে। তাহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা হয়। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথম বক্তৃতা করেন।

প্রচার ফণ্ড কমিটি, পুস্তক প্রচার কমিটি, প্রচার কমিটি, পুস্তকালয় কমিটী এবং সামাজিক নিয়ম প্রণয়নকারী কমিটীরও কোন কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য যে সবকমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহার অর্থাভাব দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এখনও ইহার অভাব যাইতেছে না। তত্ত্বকৌমুদী ফণ্ড হইতে মেসেঞ্জারের মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩০০ তিন শত টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

দান প্রাপ্তি—ময়মনসিংহের অন্তর্গত করটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ মহাশয় তথাকার ব্রাহ্ম

সমাজের উপাসনার্থ ৫০০ পাঁচ শত টাকা মূল্যের তাঁহার একটী বাড়ী প্রদান করিয়াছেন। এই গৃহের স্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই দান প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উক্ত গৃহ সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গরেলওয়ের ম্যানেজার মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের জন্য সেকেণ্ড ক্লাসের ফ্রি পাস প্রদান করিয়াছেন। এই পাস দ্বারা পূর্ব্ব বাঙ্গালা, উত্তর বাঙ্গালা মধ্য বাঙ্গালা ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে এবং ডায়মণ্ডহারবার লাইনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণ গমনাগমন করিতে পারিবেন। ত্রিহুত মজফরপুর ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজার মহাশয়ও বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে সেকেণ্ড ক্লাসে গমনাগমন করিবার জন্য ১ খানি পাস প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—সমাজ মন্দিরের পশ্চাতস্থ ভূমিতে এই প্রেসের জন্য একখানি টীনের গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। শীঘ্র এই বাটীতে প্রেস উঠিয়া যাইবে। প্রেসের জন্য অনেক ভাড়া লাগিত এবং সকল সময় উপযুক্ত স্থানও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই এই গৃহ প্রস্তুত করা হইতেছে। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাড়ে ছয় শত টাকা ব্যয় পড়িবে। এই তিন মাসে প্রেসের ৬৮৯৲ টাকার কাজ হইয়াছে, ১০৭৪৸৫ আদায় হইয়াছে এবং ৫৮৮৲ খরচ হইয়াছে। এই তিন মাসে ৩০০ টাকা দেনা পরিশোধ হইয়াছে। এখন মোট ২৯৭৭৶১৫ দেনা আছে ইহার মধ্যে ২১৬৫ টাকার সুদ দিতে হয়। ১৭৫৮।৵১০ পাওনা আছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়			ব্যয়	
প্রচার		২৯৪।/১৫	* প্রচার	৬০০।৶০
মাসিক	২০৪।০		* কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৫॥০
বার্ষিক	৫৪॥০		মুদ্রাঙ্কণ	২৪৲
এক কালীন	৩২৸৵১৫		ডাক মাশুল	৯।১০
প্রাপ্ত চাউলের মূল্য	২॥৶০		বিবিধ	২১৲
সাঃ ব্রাঃ সমাজের চাঁদা		১৪১।০	কমিশন	।০
বার্ষিক	১০১৸০		পাথেয়	১২॥৵৫
মাসিক	৩৯॥০		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দান	৫৬৲
শুভ কর্ম্মের দান		২৫৲	প্রচার গৃহ	৪৪২॥৵২॥
পাথেয়		১০৲		
বিবিধ		১॥০		১৩০৫॥৵১৭॥
কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত		৪৫৲	হাওলাত শোধ	৮০॥০
			গচ্ছিত শোধ	৪২৯।০
প্রচারক গৃহের ভাড়া		১৪০৶৫		১৮১৫॥৵১৭॥
ব্রাহ্ম বালকদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত সিটি কলেজ হইতে		৫৬৲	স্থিত	৬১৸৵৭॥
		৭১১।/০		১৮৭৭॥/৫
হাওলাত		৯৩০৲		
প্রচার গৃহের জন্য	৭৯০৲			
সমাজের জন্য	১৪০৲			
গচ্ছিত		১০৯॥৶০		
		১৭৫০৸৶০		
পূর্ব্ব স্থিত		১২৬॥৵৫		
		১৮৭৭॥/৫		

* জুন মাস পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে দেনা আছে ৩৮॥০ এবং প্রচারকদিগের বৃত্তির দরুর দেনা আছে ১৩৭৲ — ১৭৬॥০

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

আয়			ব্যয়	
পুস্তক বিক্রয়ের বাকি মূল্য আদায়		১৪৭।১০	অপরের পুস্তকের মূল্য শোধ	২৮৪৶১৫
নগদ বিক্রয়		২৪৫৵১০	কমিশন	১০৸/১০
সমাজের	১৮০/৫		বিবিধ	৬৸/১৫
অপরের	৬৫/৫		পুস্তকের ডাক মাশুল	১০॥১০
			কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
কমিশন		১১০৸৵০	মুদ্রাঙ্কণ	[illegible]
পুস্তকের ডাক মাশুল		৬।৵১৫	ডাক মাশুল	/১০
সুদ		২৪।০	কাগজ	৩॥৵১৫
গচ্ছিত		২৸০	পুস্তক বাঁধাই	১০৲
			গচ্ছিত শোধ	১৫৸/১৫
		৫৩৬॥৶১৫		
পূর্ব্ব স্থিত		১৯৯৫/৫		৩৭৯৸১০
			স্থিত	২১৫২৲১০
		২৫৩১৸/০		২৫৩১৸/০

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩৭৪॥১৫	ডাক মাশুল	৬২॥/০
নগদ বিক্রয়	১৵০	বিবিধ	২৬।১০
ফেরত জমা	১৩।০	কাগজ	৩৭॥০
		মুদ্রাঙ্কণ	১১৯৸০
	৩৮৮৸৵১৫	কর্ম্মচারীর বেতন (মে পর্য্যন্ত)	৪৯৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৪৪৮৸৶০	দান (মেসেঞ্জারকে)	৩০০৲
		গচ্ছিত শোধ	১৲
	১৮৩৭৸/১৫	কমিশন	১৸/১৫
			৫৯৭৸৶৫
		স্থিত	১২৩৯৸৵১০
			১৮৩৭৸/১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩৯৮৸৵০	ডাক মাশুল	১২৯৵০
বিজ্ঞাপন ইঃ	২৪৸/০	বিবিধ	১৮/৫
নগদ বিক্রয়	৸/১০	কাগজ	৭৬/১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৫৭॥০
	৪২৪॥১০	মুদ্রাঙ্কণ	৩৭৯॥০
দান প্রাপ্তি (তত্ত্বকৌমুদী হইতে)	৩০০৲	কমিশন	১২৸/১৫
			৬৭৩॥৵১০
	৭২৪॥১০	স্থিত	২৭২৵৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	২২১।৫		৯৪৫৸১৫
	৯৪৫৸১৫		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের প্রায় ২১০০ টাকা দেনা আছে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পিচ্ছিল-পথ।

জীবন পিচ্ছিলপথে সদর্পে চলিতে
চরণ স্খলিত হয়ে পড়েছি ধরায়;
প্রবৃত্তি-আঁধার মাঝে আপন বাতিতে
সদর্পে দেখিতে পথ ডুবেছি মায়ায়।

হরিলও এই দর্প, দেও হে বিনয়,
দাঁড়াই তোমার বলে বলবান হ'য়ে;
তব জ্যোতি দেও চক্ষে প্রভু জ্যোতির্ম্ময়,
দুর্ব্বল সবল তব কৃপার আশ্রয়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অভয়-বাণী—ঈশ্বরের উপাসক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকিবেন যে সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় যখন আত্মার মধ্যে এক প্রকার গভীর অশান্তি উপস্থিত হয়; সে সময়ে কিছুই ভাল লাগে না; অন্য সময়ে যে সকল সাধনের উপায় মিষ্ট লাগিয়াছে, এবং যদ্দ্বারা বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাও তখন ভাল লাগে না। সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ-পাঠ, সদালোচনা কিছুতেই মন তৃপ্তি পায় না। প্রাণের মধ্যে এক প্রকার গভীর নির্জ্জনতা অনুভূত হইতে থাকে। যাহারা আত্মার প্রিয় ছিল তখন তাহাদিগকে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র বাহিরে সাধুগণ বাহিরে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু বাহিরে, উপাসনা মন্দির ও উপাসক মণ্ডলী বাহিরে। আত্মার এই ঘোর নির্জ্জনতার মধ্যে পড়িয়া অনেকে এক প্রকার নিরাশার মধ্যে পতিত হন। কিন্তু ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এরূপ অবস্থাতে পতিত করেন। এই অবস্থাতে তিনি বার বার আত্মাকে বলিতে থাকেন—"দেখ তুমি যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছিলে, তাহারা কেহ কোথাও নাই, এখন কেবল তুমি আর আমি। এই নির্জ্জন পথে দেখ আমিই কেবল তোমার সহায় আছি।" নিরাশার হস্তে আপনাকে সমর্পণ না করিয়া সেই সময়ে ঈশ্বরের এই অভয় বাণী শুনিবার জন্য প্রয়াসী হওয়া কর্ত্তব্য।

ভাবুকতা ও বিবেক-পরায়ণতা—ভাবুকতার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। ভাব এক সময়ে উচ্ছ্বসিত হয়, আর এক সময়ে নিস্তেজ ভাব ধরিতে পারে। শরীর মনের বিশেষ অবস্থার উপরে তাহা নির্ভর করে; সুতরাং তাহা এক সময় থাকিতে পারে, আর এক সময়ে না থাকিতেও পারে; সুতরাং যাঁহাদের কার্য্য ও ধর্ম্ম-জীবন প্রধানতঃ ভাবের উপরে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের কার্য্যের ও ধর্ম্মজীবনের স্থিরতা থাকে না। যখন তাঁহাদের অন্তরে ভাব তরঙ্গ প্রবল ভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তখন তাঁহারা তাহার উত্তেজনাতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পে অল্পে অন্তরের ভাব রাশি যেমন নিস্তেজ ভাব ধারণ করিতে থাকে। অমনি তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনও নিস্তেজ ভাব ধারণ করে। এই রূপে সেই সকল জীবনে দুই দিন উৎসাহ, দুই দিন নিরুৎসাহ, দুই দিন আশা, দুই দিন নিরাশা, দুই দিন ঈশ্বর-সেবা, দুই দিন স্বার্থ-সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা ভাবরাশিকে বিবেক-পরায়ণতার অধীন করেন, নিজের ভাবের দ্বারা চালিত না হইয়া ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশের দ্বারা চালিত হন, সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে জীবন বিবেক-পরায়ণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা সমুদ্র পুলিনের বালুকারাশির উপরে নির্ম্মিত গৃহের ন্যায়। আজ আছে কল্য তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে; চিহ্নও থাকিবে না।

উপাসক-পরিবার—এক পরিবারের যতগুলি লোক থাকেন, গৃহের অভিভাবকগণ সেই সমুদয়ের সুখ দুঃখের জন্য আপনাদিগকে দায়ী বলিয়া বিবেচনা করেন; তাঁহাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সমাজের কার্য্যের ভার যাঁহাদের প্রতি তাঁহাদেরও উপরে এই প্রকার দায়িত্ব ভার অর্পিত আছে। সেণ্টপলের জীবনচরিতে দেখা যায়, তাঁহার চেষ্টাতে চারিদিকে

যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের কল্যাণের চিন্তাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত থাকিত। তিনি দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতে কখনই বিরত হইতেন না; সর্ব্বদাই লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইতেন, ও দিতেন; চিঠীপত্র দ্বারা তাহাদের সন্দেহ সকল নিরসন করিতেন; এবং ধর্ম্ম-সাধনে উৎসাহ দান করিতেন। ইহাকেই বলে পারিবারিক সম্বন্ধ। খৃষ্টীয় সমাজের আদিম ইতিবৃত্তে দেখা যায় একবার সেণ্টপিটার একজন যুবা-পুরুষকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাহাকে একজন ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট দিলেন। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মাচার্য্য সে দায়িত্বভার সমুচিত রূপে বহন করিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে হঠাৎ এক দিন পিটার শুনিলেন যে সেই যুবক গিয়া এক ডাকাতের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শুনিবামাত্র পিটারের প্রাণে এরূপ আঘাত লাগিল যে তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল; তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "যদি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিবেন না তবে তাহার ভার লইলেন কেন?" এই বলিয়া পিটার তৎক্ষণাৎ সেই যুবকের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং সেই ডাকাতের দলে গিয়া সেই যুবকের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে না বলিয়া আসিয়াছ কেন? তুমি চলিয়া আসাতে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।" এরূপ কথিত আছে, তাঁহার প্রেম ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই যুবকের কঠিন হৃদয় এমন আর্দ্র হইল; যে সে আবার পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বশবর্ত্তী হইল। এই ভাবের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ভাবের তুলনা করিলে কি প্রভেদ লক্ষিত হয়! যাহারা আমাদের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন। দেশের নানা স্থানে যে সকল ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বাস করিতেছেন তাঁহাদের সুখ দুঃখের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই; যে সকল যুবাপুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে, তাহারা কে কোথায় যাইতেছে, কে কি করিতেছে সে বিষয়ে দেখিবার কেহ নাই। এরূপ অবস্থাতে সমাজের সহিত যোগ দিয়া ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কেহ কোন প্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং লোকের মনে সমাজের সহিত যোগ দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় না। আমাদের এই ঔদাস্য বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতেছে। সুখের বিষয় এদিকে আমাদের দৃষ্টি ক্রমে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এরূপ আশা করা যায় কোন উৎকৃষ্ট তর প্রণালী ত্বরায় উদ্ভাবিত হইবে।

আশ্রয় গৃহ—বিহঙ্গগণ উচ্চ বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করে; মৃগ সকল রবিকর সন্তাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রলোভন ও পাপ হইতে মুক্ত হইবার এবং শান্তি ও বল লাভের জন্য আত্মারও সেইরূপ ঈশ্বর চরণে কুলায় নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঈশ্বর-চরণের তুল্য শীতল ও সন্তাপহারী স্থান আর কোথাও দেখা যায় না। সকল দেশের ও যুগের ভক্ত সজ্জনগণ ঐ চরণেই তাঁহাদের বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রলোভন প্রলুব্ধ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অনুসন্ধানই পাইয়া উঠে না। যখন তাঁহারা জগতের সেবা করিতে করিতে শ্রান্ত হন বা আঘাত পান, ছুটিয়া অনন্ত শান্তিপ্রদ ইষ্টদেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস ডি সেলস নামক একজন সাধু মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, "ধন্য সেই আত্মা যে প্রকৃত রূপে বলিতে পারে, প্রভো তুমি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার অবলম্বন এবং ঝটিকা ও দিবসের আতপে আমার আশ্রয় গৃহ।" সুসময় কুসময় সকলেরই আছে, খুব সাবধানে থাকিলেও মাঝে মাঝে কুসময় আসিয়া পড়ে। সুসময়ে যদি আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ না কর, তবে কুসময়ে কোথায় দাঁড়াইবে। দুর্দ্দিনে যদি বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে সুদিনে কাল বিলম্ব না করিয়া ঈশ্বর-চরণে আপন বিশ্রাম ও আশ্রয় গৃহ রচনা কর।

কালক্ষয়ে বলক্ষয়—*একজন ফরাসি রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন, "অদ্য তাহা কখন করিবে না, যাহা কল্য পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিতে পারিবে।"* লর্ড নেলসন ইহার ঠিক বিপরীত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক কোয়ার্টার পূর্ব্বে কার্য্য করিতে হইবে। এই উভয় নিয়মই কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে অপ্রয়োজ্য। যাঁহাদের হাতে অনেক কাজ তাঁহারা জানেন, ফরাসী রাজনীতিজ্ঞের উপদেশ শুনিয়া চলিলে, বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে কাজ কাল করিব বলিয়া রাখা যায় তাহা কখনই সম্পন্ন হয় না, সে কালও কখনও আসে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কাজ করিলেও অনেক প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সাধুজনেরা তাই সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন, যখনকার যে কাজ তখন ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা করিয়া যাইতে হইবে। যদি দেখি, কোন বিশেষ পাপের জন্য ধর্ম্ম জীবন উন্নত হইতেছে না, তখন ভাল অবস্থা আসিলে সেই পাপের সহিত সংগ্রাম করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। যে মুহূর্ত্তে পাপ বোধ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই পাপের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য প্রাণপণ করিবে। এরূপ না করিলে পতনের দ্বার কখনই রুদ্ধ হইবে না। আবার অন্য দিকে যে সাধনের যে সময়, সেই সময়ে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। এখানে লর্ড নেলসনের উপদেশ গ্রহণে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। আমার চরিত্র এখনও শুদ্ধ হয় নাই, অথচ আমি যদি ভক্তির সাধন গ্রহণ করি, আমার না হইবে ভক্তি, না হইবে চরিত্র শুদ্ধি।

জীবনগত আরাধনা।—অনেকে মনে করেন, যে আরাধনা কেবল উপাসনার সময়েই করিতে হয়। তাঁহারা ভাবেন না যে, যে ভাব সমস্ত দিন প্রাণে সাধন না হইল, আরাধনার সময় সে ভাব আসা সহজ বা স্বাভাবিক নহে। সমস্ত দিন অসত্যের সেবা করিয়া আরাধনার সময় সত্যস্বরূপ বলা ঘোর কপটতা। সমস্ত দিন পর নিন্দা, বকা বকি ও গালাগালি করিয়া উপাসনার সময় প্রেমস্বরূপ বলা মহান্ ঈশ্বরকে পরিহাস করা মাত্র। সমস্ত দিন আত্ম-সংযমের চেষ্টা কিছুই করিলাম না, যখন যাহা ইচ্ছা হইল করিলাম, অথচ আরাধনার সময় পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আরাধনার প্রত্যেক স্বরূপের ভাবে যদি ধর্ম্মজীবন গাঁথিতে পার, তবেই উপাসনা

সার্থক। যদি আরাধনা অন্তরের সহিত ও প্রকৃতভাবে করিতে চাও, তবে সমস্ত দিন আরাধনার ভাব মনে আলোচনা ও সুবিধা ঘটিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাও। আরাধনা ঈশ্বর সমীপে বক্তৃতা ও স্বগত উক্তি নহে, আরাধনা জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। আরাধনার সময়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বিফল, যদি অন্য সময়ে আরাধনার বিরুদ্ধভাব ইচ্ছা করিয়া মনে পোষণ কর। কথিত আছে রাম-ভক্ত হনুমান আপন ত্বক উন্মোচন করিয়া অস্থিতে অস্থিতে রাম নাম লেখা দেখাইয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য যে তাঁহার অধ্যাত্ম-দেহের প্রত্যেক অস্থিতে সত্যং শিব সুন্দরং লেখা থাকে।

মোহ।—মোহ ধর্ম্মজীবনের প্রধান অরি। পাপ-বোধ হওয়া অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থা, কেননা পাপবোধ হইলে অনুতাপের উদ্রেক হয় ও পাপ পরিত্যাগের সংকল্প আসে। মোহ পাপবোধ করিতে দেয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, অথচ জীবন জাগিতেছে না, এরূপ অবস্থা অতি ভয়ানক। বিষয়াসক্তি এমনই কৌশল বিস্তার করে যে সকলেই মনে করেন, মরিতে হইবে না, চিরকাল ধন মান আদি অনিত্য বিষয় সম্ভোগ করিয়া জীবন কাটাইতে পারিব। জীবনের উদ্দেশ্য কি, আত্মা কোন্ রাজ্যের লোক, কোথায় তাহাকে যাইতে হইবে এসকল কিছুই মনে থাকে না। দিন চলিয়া যায়, অথচ কষ্টবোধ হয় না, এবং কষ্টবোধ হয় না বলিয়া অবস্থান্তর লাভের জন্য চেষ্টা হয় না। বেশ খাইতেছি, পরিতেছি, দশজনকে খাওয়াইতেছি, পরাইতেছি মনে চিন্তাই আসে না যে একজনের কাছে জবাবদিহী করিতে হইবে। এই জন্য সাধু সজ্জনেরা বিষের ন্যায় মোহ পরিহার করিতে উপদেশ দেন। জীব চৈতন্যের অভিমান করে, অথচ অধিকাংশ সময় অচেতন ইহা এক অতি আশ্চর্য্য সত্য। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিয়া আত্ম-পরীক্ষা করিবে, তবে আত্মা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বিধি ও প্রেম।

বিধি ও প্রেম দুইই চাই। মানব জাতির যিনি আদর্শ, তাঁহাতে বিধি ও প্রেম দুইই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধির কথা কে না জানে? কি জড়জগতে কি অধ্যাত্ম-জগতে, বিধি-প্রতিষ্ঠিত বিধির কি বিষম অপরি-হার্য্যতা! প্রাণান্তে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। শ্রান্ত পথিকের আর্ত্তনাদে মার্ত্তণ্ড কি পৃথিবী দগ্ধ করিতে ক্ষান্ত হন? না। অনুতপ্ত পাপীর ক্রন্দনে পাপের শাস্তিদাতা অনুতাপের অগ্নির তীব্রতা হ্রাস করিয়াছেন? বিধির বিধি কিন্তু নির্দ্দয় বিধি নহে। সকল নিয়মের মূলে দয়া ও মঙ্গলভাব। রবির উত্তাপ কেন? সন্তাপহারী মেঘোদয়ের জন্য। অনুতাপের দহন কেন? পাপীর উদ্ধারের জন্য। বিধাতার প্রকৃতিতে তাই বিধি ও প্রেমের বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। অনন্ত প্রেম ও অখণ্ড বিধির মিলন অনন্ত দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাতেও সম্ভব নহে। যিনি এই দেবতার অনুকরণ করিতে যান, তাঁহাতে অল্পাধিক পরিমাণে এই সমাবেশ থাকা আবশ্যক। যে চরিত্রে বা যে ধর্ম্ম সমাজে উহা নাই, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রেম বিহীন বিধি পালনের দৃষ্টান্ত য়িহুদী ও বৈদিক সমাজ; বিধি বিহীন প্রেমো-ন্মত্ততার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব সমাজ। মূসায় য়িহুদী জাতির মুক্তি হইল না, তাই ঈশার অভ্যুদয়। শঙ্করে আর্য্যজাতি কেবল শুষ্ক অদ্বৈতভাবে উপনীত হইল, সেই জন্য চৈতন্যের আগমন। বেদ বিধিতে মুক্তি হইল না বলিয়া পুরাণ ও গীতার অভ্যুত্থান। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের লোকেই এই কথা অন্ততঃ মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু কাজে যাহা দেখা যায়, তাহা সন্তোষজনক নহে। মত ও ব্যবহারের মিলন করা ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাই যদি না হইল, তবে আমরা এতদিন কি করিতেছি?

ভাল, মানিলাম যে প্রেমে বিধি ও বিধিতে প্রেম মিলাইতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহাদের কোনটীকে অগ্রে সাধন করিতে হইবে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, বিধি ও প্রেমের স্বরূপ কি, বিধি ও প্রেম বলিলে কি বুঝায়, বুঝিতে হইবে। বিধি কি? সোজা কথায় ইহার উত্তর বিধাতা যা করেন। বিধাতা যা করেন, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে তুমি আমি যাহা করি, তাহা সকল সময়ে বিধি নাও হইতে পারে, কিন্তু বিধাতা যাহা করেন, তাহা বিধি হইবেই হইবে। বিধাতা যাহা করেন, তাহা বিশ্বজনীন ও সকলের অবশ্য প্রতি-পাল্য। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, চাই সে বিধি মানি, চাই না মানি; কিন্তু না মানা বিধি নহে,—অবিধি, পাপ। প্রেম কি? সোজা কথায় প্রেম বলিলে অন্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন বুঝায়। এখন পাঠক আসুন দেখি বিধি ও প্রেমের এই দুই লক্ষণ লইয়া আমরা কোথায় উপস্থিত হই? যখন জীবন বিধির অধীন তখন কি করি? নিজের বিধান ছাড়িয়া দিয়া বিধাতার বিধানের শরণাপন্ন হই। যখন জীবনে ঈশ্বর প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন কি হয়? আত্মবশ মন ঈশ্বরবশ হয়; তখন সকলই ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয় বলিয়া আপনার বলিবার কিছুই থাকে না। বিধি ও প্রেমে সুতরাং মূলে পরিণতির অবস্থায় বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। বিধি আত্মার কার্য্যকরী দিকের, এবং প্রেম আত্মার ভাবের দিকের স্ফুরণ মাত্র। কিন্তু ইহা কেবল সিদ্ধ জীবনের লক্ষণ। সিদ্ধ জীবনে বিধি ও প্রেমের সমাবেশ লোকে চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। তোমার ও আমার অসিদ্ধ জীবনের লক্ষণ অন্য প্রকার। আমাদের বিধি রক্ষা করিতে প্রেম থাকে না, আবার প্রেমের মাত্রা বাড়াইতে গেলে বিধি শিথিল হইয়া পড়ে। এ দুইটী বিষয় একেবারে সাধন করা আমাদের ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠে না। তাই বলিতেছিলাম, আগে কি, আগে প্রেম, না আগে বিধি, আগে উচ্ছ্বাস, না আগে চিত্ত-শুদ্ধি।

আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতাতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি-য়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বিধি আগে, পরে প্রেম। ইহার কারণ দুইটী;—প্রথম, বিধি পালনে বুনিয়াদ তৈয়ার না হইলে, পতনের

সম্ভাবনা অপরিহার্য্য। প্রেম সাধন করিতেছি, মন স্বর্গের সুখে সাঁতার খেলিতেছে, সহসা বিধি পালনে ক্রটী হইলে, অমনই পদস্খলন, আর শত শত যোজন নিম্নে বিষম পতন। সে পতন হইতে শুধরাইতে যে কি কষ্ট হয়, যিনি ভুগিয়াছেন তিনি জানেন বর্ণনা বাহুল্য। দ্বিতীয়, ঈশা বলিয়াছেন, পবিত্রাত্মারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। বিধি পালন না করিলে কিরূপে পবিত্রতা সঞ্চার হইবে? অপবিত্র মলিন চক্ষুতে কি ঈশ্বর দর্শন করা যায়? হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একথার যাথার্থ্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাই পদে পদে সংযমের বিধান করিয়া গিয়াছেন। শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, সংযম কর, ব্রত গ্রহণ বা উদ্‌যাপন করিবে সংযম কর, ইত্যাদি। বৃহদ্ব্রতশীল ব্রহ্মসাধকের পক্ষে এই সংযম যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংযমের পথ কঠোর ও প্রেমের পথ মধুর বলিয়া প্রেমের পথ ধরিবার প্রলোভন সহজেই উপস্থিত হয়; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রে সংযমের পথ প্রাণপণে ধরিয়া থাকেন। বিধির গুরুত্ব, ও জীবনের দায়িত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি সংযম ও বিধি পালনে প্রথমে মনোনিবেশ করিবেন সন্দেহ নাই। যিনি পুণ্যের আবহ তাঁহার নিকটে থাকিব ও তাঁহাকে ভাল বাসিব অথচ চিত্ত অসংযত থাকিবে ইহা ভয়ানক কথা। ব্রাহ্ম সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে "পাপ পুণ্যের অতীত যে স্থান সে স্থানে ভক্তি। ভক্ত কি পাপ করিতে পারে? না। * * * পুণ্য স্থাপন হইলে তবে ভক্তি আরম্ভ হয়। যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হইল। মনুষ্য সচ্চরিত্র না হইলে ভক্তির প্রশ্নই আসিতে পারে না।"

পাঠকবর্গ, যদি সমাজের কল্যাণ চাও ব্যক্তিগত জীবনে বিধি প্রতিষ্ঠিত কর। ইচ্ছা পূর্ব্বক বিধি লঙ্ঘন করি না, সরল প্রাণে একথা কি আমরা সকল সময়ে বলিতে পারি। উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে সময়ে সময়ে প্রাণ বিগলিত হইল, তাহাতে কি? তাহাতে জীবনের সম্বল হয় না, তাহাতে মুক্তির দিকে স্থায়ী ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না। উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে বিগলিত হওয়া চাই না, এমন কথা বলিতেছি না। উহা চাই, খুব চাই, কিন্তু আমাদের সে সময় এখন উপস্থিত হয় নাই। সঙ্গীত ও উপাসনা ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের প্রমত্ততার সহায় হয়। আমরা এখনও ঈশ্বর প্রেমিক হই নাই, আমরা সুতরাং উহা আশা করিতে পারি না। সঙ্গীত, প্রার্থনা আদি সকল অস্ত্রকে এখন এক দিকে নিযুক্ত করা আমাদিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে। সে দিক বিধি পালনের দিক। অন্য লোকের চরিত্র দোষ অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসকের চরিত্র দোষ সহস্র গুণে অমার্জ্জনীয় ও নিন্দার পাত্র। উপাসনা করিব, আর স্বেচ্ছাচার করিব, সঙ্কীর্ত্তন করিব আর যাহা যখন ভাল লাগিবে তখন তাহা করিব। ইহার উপর ভক্তির ভিত্তি নির্ম্মাণ করা, বালুকাস্তূপের উপর গৃহ নির্ম্মাণরূপ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। আসুন সকলে মিলিয়া আমরা বিধাতার বিধির জয় ঘোষণা করি, বড় বড় কথা ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালনে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হই।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, যে আমরা কি এত অপরাধ করিয়া থাকি যে আমাদের উপর এত শাসন হইতেছে। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, যে কেবল বড় বড় অপরাধ বা অপরাধের বাহিরের প্রকাশ হইতে মুক্ত আছি বলিয়া যেন আমরা অহঙ্কৃত না হই। অপরাধের বাহ্যিক প্রকাশ গিয়া থাকে ভালই, কিন্তু বাহিরে নিরপরাধী হইলেই সকল হইল এরূপ মনে করা উচিত নহে? অপরাধের মূল যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ কিরূপে নিরাপদ হইবে? যে পাপ করিয়াছি, তদপেক্ষা যে পাপ করিতে পারি তাহার সংখ্যা অনেক অধিক। পাপের মূল যে দূষিত ইচ্ছা তাহা যতক্ষণ না না যাইতেছে ততক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রমুক্ত। বিধাতার ইচ্ছায় ও আমাদের ইচ্ছায় যতদিন না মিল হয়, ততদিন পতনের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছায় ইচ্ছা যতদিন না মিশে ততদিন সন্তান হওয়া যায় না, বাধ্যতা শিখা যায় না, প্রেম শৈলের পাদদেশেও পৌঁছান যায় না।

যদি ভক্তি চাও, চিত্তকে শুদ্ধ কর, যদি পুত্রত্ব লাভের প্রয়াসী হও, সংযম অভ্যাস কর, বিধাতাকে যদি লাভ করিতে চাও, তবে নিষ্ঠার সহিত বিধি পালন কর।

উপাসনা।

সঙ্গ অনুসারে মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়। সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ হওয়া যায়, অসৎসঙ্গে থাকিলে অসৎ হইতে হয়। সঙ্গগুণে চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ এই যে যেরূপ আচার ব্যবহার বিশিষ্ট সহবাসে অবস্থিতি করা যায় সেইরূপ আচার ব্যবহারে ক্রমে অভ্যস্ত হইতে হয়। অজ্ঞাত সারে সেই সকল ভাব চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া প্রকৃতিকে তদবস্থাপন্ন করিতে থাকে।

সঙ্গলাভ দ্বারা যে কারণে মানব চরিত্রে, পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণে কোন সঙ্গে বাস করিতে করিতে যেমন তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষ ভাবগুলি আসিয়া স্বভাবকে অধিকার করে। সেই কারণে ঈশ্বরোপাসনাদ্বারাও মানব স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পুণ্য, ন্যায় প্রেমের দিকে যাইতে থাকে।

উপাসনা শব্দের একটী অর্থ এই যে নিকটে উপবেশন করা। ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে বসা। ঈশ্বরের নিকটে বসা এই কথার তাৎপর্য্য এই নয় যে তিনি কোন একস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন আমাদিগকে অনেক হাটিয়া হাটিয়া যাইয়া তাঁহার নিকটে বসিতে হইবে। 'তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন 'তাঁহার নিকটে যাইয়া বসা' কথার এক দিক দিয়া দেখিলে কোন অর্থই হয় না। আমরা তাঁহার কাছেই আছি—তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্নতাও কোন ক্রমেই সম্ভবে না। তবে তাঁহার নিকটে উপবেশনের অর্থ এই যে আমাদের আত্মা তাঁহার অভিমুখে না থাকিয়া বিমুখে অবস্থিতি করিয়া থাকে। তিনি পূর্ণ ন্যায় প্রেম, পবিত্রতার আধার আমরা অপ্রেম অন্যায় ও অপবিত্রতার সহিত থাকি অর্থাৎ আমাদের আত্মা ঈশ্বর-বিরোধীভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। এই বিরোধী ভাব ঘুচাইয়া তাঁহার ভাবানুরূপ চরিত্র লইয়া যদি থাকিতে পারি তবেই আমরা তাঁহার সহবাসে থাকি বা তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া থাকি।

এই যে ঈশ্বরবিরোধী ভাবাপন্ন স্বভাব ইহাকে তাঁহার ভাবাপন্ন করাই আমাদের লক্ষ্য এবং কল্যাণের হেতু। এই প্রকৃতিগত সাম্য লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরোপাসনার অর্থাৎ তাঁহার নিকটে বসিবার অভ্যাসে আমাদিগকে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

উপাসনা দ্বারা তাঁহার ভাবাপন্ন হইবার আশা করিবার হেতু এই যে উপাসনায় যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহার প্রত্যেকটীই আমাদের প্রাণকে সেই দিকে লইয়া যায়; তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সাধনের সাহায্য করে।

প্রথমতঃ উপাসনা কালে আমরা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া থাকি, এই কার্য্যটী দ্বারা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিবার জন্য যত্নশীল হইতে হয়। স্বরূপ কি তাহা অনুভব করিতে না পারিলে স্তব করা সম্ভবে না। অনুভবের পরিমাণের যতই তারতম্য থাকুক না কেন সামান্য রূপেও অনুভব করিতে না পারিলে—স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে কখনই আরাধনা সম্ভবে না। এজন্য যতই অনুভবের চেষ্টা হইতে থাকে, যতই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের ব্যাখ্যা হইতে থাকে, ততই আমরা তাঁহার ভাব লাভ করিতে থাকি। তৎপর যখন ধ্যানে মন নিবিষ্ট হয়, তখন যেমন একদিকে অনুভব হইতে থাকে, তেমনই তাহাতে গভীর হইতে গভীরতররূপে মগ্ন হইয়া স্বরূপ চিন্তায় মন ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। মানবের মন যে বিষয়ে অধিক পরিমাণে চিন্তা করে, তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সৎ বিষয়ের চিন্তায় মন সৎ হয়, অসৎ বিষয়ের চিন্তায় মন অসৎ হইতে থাকে। চৈতন্যময়ের চিন্তায় চেতনা লাভ করে, জড় বা মৃত ভাবাপন্ন বিষয়ের অনুধ্যানে জড়ত্ব বা মৃতত্ব লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানুষ যে পরিমাণে ঈশ্বর-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহার প্রকৃতি ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইবে। তিনি পুণ্যময় তাঁহার চিন্তায় মন পুণ্যভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তাঁহার প্রেম, ন্যায় পবিত্রতা প্রভৃতির অনুধ্যানে যত অধিক পরিমাণে নিযুক্ত থাকা যাইবে, তত পরিমাণে প্রেম, ন্যায় এবং পবিত্রতা জীবনে সংক্রামিত হইয়া প্রাণকে তাঁহার নিত্য সহবাসের উপযোগী করিতে থাকিবে।

উপাসনার আর একটী অঙ্গ প্রার্থনা, প্রার্থনা যাঁহার নিকটে করিতে হয় তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া করাই রীতি। অন্ততঃ তিনি কাছে আছেন, আমার কথা শুনিতেছেন, প্রাণে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে শূন্যের নিকট আর কেহ প্রার্থনা করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে নিকটে অনুভব করিতে হয়, তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব যে পরিমাণে অধিক হইবে সেই পরিমাণে নিশ্চয়তা ও আশার সহিত প্রার্থনা উত্থিত হইতে থাকে।

অতএব উপাসনার এই তিনটী কার্য্যই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যায়; তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিতে সক্ষম করে; তাহার সহবাসের জন্য আমাদের আত্মাকে প্রস্তুত করে। ইহা নিশ্চয়ই জানা উচিত যে আমরা তাঁহার নিকটে যদি বসিতে অভ্যস্ত না হই, যদি আমাদের প্রাণ তাঁহার অনুধ্যানকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু বলিয়া অনুভব না করে, আমরা যদি অধিক পরিমাণে সেই প্রসঙ্গে থাকাকে সুখের হেতু বলিয়া অনুভব করিতে না পারি, তাহা হইলে ঈশ্বর লাভ কখনও সম্ভব নয়। ঈশ্বর লাভ কিছু এমন একটা ব্যাপার নয় যে হঠাৎ আমরা একটা পার্থিব বস্তুর ন্যায় কিছু পাইয়া ফেলিব। কিন্তু ঈশ্বর লাভের অর্থ এই যে আমাদের প্রকৃতি তদনুরূপ হইবে; আমাদের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে; সংকল্প তাঁহার ভাবানুরূপ হইবে। প্রাণ তাঁহার ভাবে পূর্ণ হইবে অর্থাৎ প্রেম, পবিত্রতা, ন্যায় প্রভৃতি দ্বারা প্রাণ অধিকৃত হইবে। ঈশ্বর লাভের অর্থ যদি এই হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান ঈশ্বর-বিরোধী ভাবকে জোর করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে। তাঁহার চিন্তা আরাধনা প্রভৃতি দ্বারা প্রাণ যাহাতে তাঁহার নিকটে বসিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যাঁহারা প্রার্থনাকে অলসের প্রলাপোক্তি বা তোষামোদ মনে করেন, তাঁহারা যদি অধিক সময় ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহাতেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। কারণ সেই স্বরূপ চিন্তায় প্রকৃতি তদ্‌ভাবাপন্ন হইবেই হইবে। তাহার চরিত্রে ঐশ্বরিক ভাব সংক্রামিত হইবেই হইবে। সুতরাং উপাসনাকে যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক না কেন আত্মার অতি উপাদেয় পরিপুষ্টির হেতুরূপে—কল্যাণের কারণরূপে প্রতীয়মান হইবে। আমরা ঈশ্বরের শ্রবণ মনন এবং গুণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা যেমন তদ্‌ভাবাপন্ন হইতে পারি, সংসারের কার্য্যাদিতে ও তাহার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি প্রকৃতি প্রেমময় হয়, যদি প্রকৃতি পুণ্য ও ন্যায়ে অধিকৃত হয় তাহা হইলে আমরা সদাসর্ব্বদা সেই সকল মহদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি। লোকের প্রতি বা তাঁহার সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণির প্রতি প্রেম পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি আরও প্রেমিক হইতে পারে। আমরা যদি ন্যায়ানুগত হইয়া কার্য্য করিতে থাকি তাহা দ্বারা সেই ন্যায়বানেরই সহবাসের উপযুক্ততা লাভ করিতে পারিব। একমাত্র শ্রবণ কীর্ত্তন মনন প্রভৃতির নামই যে উপাসনা তাহাও নয়, কিন্তু যে কিছু কার্য্য দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারি, তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ প্রকৃতি পাইতে পারি বা তাঁহার সহবাসে থাকিতে পারি তাহাই উপাসনা।

এই উপাসনা আত্মার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি। আমরা যে পরিমাণে বহির্মুখীন প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া—বাহিরের সঙ্গ ছাড়িয়া অন্তর্মুখ প্রকৃতি লাভ করিব, অন্তরের ভিতরে যাইয়া সুখ ও শান্তি পাইতে পারিব, সেই পরিমাণে ঈশ্বর সহবাসের অধিকারী হইতে পারিব, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি ঈশ্বর লাভের প্রধান অন্তরায়। উপাসনা দ্বারাই এই অন্তরায়ের হাত হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারিব। সুতরাং সেই চেষ্টাই আমাদের প্রাণে প্রবল্ হউক।

আত্ম-বলিদান।

সার্দ্ধশত বৎসর অতীত হইল, পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী কাপ্তান কুক অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যস্থানে প্রশান্ত মহা-

সাগরে একটী দ্বীপ পুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপপুঞ্জ হাউইয়ান নামে প্রসিদ্ধ। হাউইয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সাণ্ডুইচ ও মলকাই অতি বিখ্যাত। প্রথমোক্ত দ্বীপের রাজধানী হনলুলু নগর ও শেষোক্ত দ্বীপে কালাবাও ও কালাপাপা গ্রামে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এই কুষ্ঠাশ্রম খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

কিরূপে এই দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবেশ করিল, তাহার ইতিহাসও অতি অদ্ভুত।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইয়েল কলেজের দ্বারদেশে একটী পাংশু বর্ণ বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। ইহার নাম অবুকিয়া, হাউইয়ান দ্বীপ হইতে আমেরিকায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পিতা মাতা স্বদেশে নিহত হইয়াছে, অবু তাহার দুগ্ধপোষ্য ভ্রাতাকে স্কন্ধে করিয়া পলাইতেছিল, একজন শত্রু আসিয়া বর্শাঘাতে তাহার প্রাণ বধ করিল, অবু বন্দী হইয়া কারাগারে রহিল। ঘটনাচক্রে অবু আমেরিকায় আসিয়া পড়িয়াছে, নিরাশ্রয় অবস্থায় ইয়েল কলেজের দ্বারদেশে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। কলেজে ডোয়াইট নামক একজন উপাধি ধারী ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। হাউইয়ান হইতে টেন্নু ও হপু নামক আরও দুইটী বালক আসিয়াছিল, তাহারাও ডোয়াইটের গৃহে আশ্রয় পাইল। ইহারা ইয়েল কলেজে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হইল—খৃষ্ট ধর্ম্মে ইহাদের অনুরাগ বদ্ধমূল হইল।

এই ঘটনার দশ বৎসর পরে দ্বাদশজন পুরুষ ও রমণী হাউইয়ান দ্বীপে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাত্রা করিলেন। টেন্নু ও হপু তাহাদের পরিচালক হইলেন। হাউইয়ান দ্বীপপুঞ্জে দেবতার নিকট নরবলি দেওয়া হইত; শিশু হত্যা, প্রস্তরাঘাতে ক্ষিপ্ত হত্যা, বৃদ্ধদিগকে জীবন্ত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। দেবতার নিকট যে সমুদয় সুখাদ্য বস্তু নৈবিদ্য দেওয়া হইত, স্ত্রীলোকেরা জীবনে কখনও তাহা আহার করিতে পারিত না। নারিকেল, কলা প্রভৃতি আহার করিলে রমণীদিগের প্রাণদণ্ড হইত। দেব মন্দির নির্ম্মাণ কালে দেবতার প্রীত্যর্থে বহু সংখ্যক নরহত্যা করা হইত। সাধারণ লোকের ছায়া যদি রাজার শরীর স্পর্শ করিত, যদি তাহারা রাজপ্রাসাদে পদনিক্ষেপ করিত তাহা হইলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইত। জাতিভেদের প্রকোপে ও পৌত্তলিকতার দৌরাত্ম্যে হাউইয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ জীবন্মৃত হইয়াছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ তারিখে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ হাউই দ্বীপে পদার্পণ করিলেন। তখন প্রাচীন নরপতি কামেহামেহা পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি জাতিভেদ ধ্বংস করিয়া, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছিল, তাহার পথ প্রতিরোধ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রজাদিগকে পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া যাইতে পারেন নাই। কামেহামেহার পুত্র লেহোলিহো তখন তথাকার রাজা ছিলেন। প্রচারকদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া লিহোলিহো তাঁহার পাঁচ রাণীর সহিত প্রচারকদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাজা ও রাণীগণ তখন স্নান করিতেছিলেন, উলঙ্গ অবস্থাতেই তাঁহাদের নিকট আসিলেন। প্রচারকগণ তাহাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা তারপর পায়ে মোজা ও মাথায় টুপি দিয়া দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু বস্ত্র পরিধান যে করিতে হয় তাহা জানিতেন না।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কাপিওলানি নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত রমণী সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। ইঁহার শরীর চারি হস্ত দীর্ঘ ছিল, ইনি অতি প্রতিভাশালিনী রমণী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইনি বহু লোক সমভিব্যাহারে আগ্নেয় পর্ব্বতে গমন করিলেন, যেথানে ধাতু দ্রবীভূত হইয়া প্রকাণ্ড আগ্নেয় সরোবর হইয়াছে, সেই খানে গমন করিয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে পেলী নামক দেবমূর্ত্তি নিক্ষেপ করিলেন। দর্শকগণ ভয়ে জড়সড় হইল কাপিওলানি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি দেবতার সাধ্য থাকে, তবে আমার অনিষ্ট সাধন করুক। কিন্তু দেবতা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইল না। তখন দর্শকগণ বুঝিল দেবতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য—এই ঘটনার পর তথাকার এক তৃতীয়াংশ লোক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

ইহার পর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য দলে দলে প্রচারকগণ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

বেলজিয়াম হইতেও রোমান কাথলিক প্রচারকগণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৩ রা জানুয়ারী তারিখে বেলজিয়ামের অন্তর্গত লোবাইন নগরের নিকটে যোসেফ ডামিয়েনের জন্ম হয়। ডামিয়েনের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ও মাতা প্রগাঢ় ভক্তিমতী ছিলেন। ডামিয়েনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকের কাজ শিক্ষা করিতেন। যোসেফ ডামিয়েনের বয়স যখন ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তিনি পিতার সহিত ভ্রাতাকে দেখিতে যান। বাল্যকাল হইতেই যোসেফের প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল—তিনি ধর্ম্মযাজকদের জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া জনসেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে ব্যাকুল হইলেন। যোসেফ পিতাকে মনের ভাব খুলিয়া বলিলেন—পিতা পুত্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন না—এক পুত্রকে ধর্ম্মের নামে ইতিপূর্ব্বে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পুত্রকেও ধর্ম্মের নিকট উৎসর্গ করিলেন। এ জগতে এমন পিতা কয়জন আছেন? পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া কয়জনে সুখী হইতে পারেন? যোসেফ অতঃপর একবার মাতার আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য গৃহে গেলেন, পুণ্যবতী মাতা পুত্রকে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া বিদায় দিলেন। রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারক হওয়া যে সে কথা নহে। রোমাণ ক্যাথলিক প্রচারকগণ চিরকৌমার্য্য ব্রত, দারিদ্র্যব্রত ও অধীনতা ব্রত গ্রহণ করেন। ধর্ম্মের নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মহারা হইয়া যান। যোসেফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রা করিবার প্রাক্কালে প্রচণ্ড জ্বর রোগে মৃতপ্রায় হইলেন, চিকিৎসকগণ তাঁহাকে যাইতে বারণ করিলেন। যোসেফ ভ্রাতাকে বলিলেন "আপনার গম্য স্থানে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।

যদি আমি গেলে আপনি সুখী হন, তবে এখনই যাইতে পারি।" ভ্রাতা বলিলেন "প্রশান্ত মহাসাগরের ঈশ্বর বিহীন বর্ব্বর দিগকে ধর্ম্মে আনিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার দ্বারা সে কার্য্য হইলনা, যদি তুমি যাইতে পার, তবে আনন্দের সীমা থাকিবেনা।" যোসেফ যাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন তাঁহাকে না জানাইয়াই ধর্ম্ম সমাজের অধ্যক্ষদের নিকট আপনার অভিলাষ জানাইলেন। অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। একদিন যোসেফ পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার শিক্ষক আসিয়া কহিলেন "অধীর বালক! তুমি এই পত্র লিখিয়াছ, তোমায় এখনই যেতে হবে।" যোসেফ এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দে লম্ফ দিয়া উঠিলেন, অধীর হইয়া বন্ধনমুক্ত অশ্বের ন্যায় বাহিরে গিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। অন্যান্য ছাত্রেরা বলিতে লাগিল "যোসেফ কি পাগল হইয়াছে?"

উনবিংশ বর্ষ বয়স্ক যোসেফ অনতিবিলম্বেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে দ্বাদশ বৎসরকাল প্রচার করিয়া শুনিলেন, মলকাই দ্বীপে কুষ্ঠ রোগীগণ ভীষণ যন্ত্রণা পাইতেছে। তাহারা লোকসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কুকুর বিড়ালের ন্যায় গাছের তলায় ও মাঠে পড়িয়া মরিতেছে। তাহাদের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি জানিতেন কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিলে তাঁহাকেও ঐ রোগাক্রান্ত হইতে হইবে, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হইলেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মলকাই দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জোসেফ ইহাই তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য।"

হাউইয়ান দ্বীপপুঞ্জ যাহাদের কুষ্ঠরোগ হইত, তাহাদিগকে মলকাই দ্বীপে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। মলকাই দ্বীপে কুষ্ঠরোগী ভিন্ন আর কেহই বাস করিত না। হাউইয়ান দ্বীপ সমূহে ৪০ হাজার লোক বাস করে, তন্মধ্যে ২ হাজার লোক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। মলকাই দ্বীপে এই সকল রোগীদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তাহাদের ঘর ছিল না, ঔষধ ছিলনা, পানের জল ছিল না। যুবক যুবতী ঘোর ব্যভিচারে রত থাকিত, এক প্রকার গাছের মূল সিদ্ধ করিয়া মদ প্রস্তুত করিয়া খাইত, আর ৪।৫ বৎসর অশেষ যন্ত্রণা সহিয়া মারা যাইত। ফাদার ডামিয়েন মলকাই দ্বীপে যাইয়া সর্ব্ব প্রথমে তাহাদের জন্য গৃহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। জলাভাবে তাহারা বস্ত্র ধৌত করিতে পারিত না, কুষ্ঠের পুঁজ রক্তে বস্ত্রে মহা দুর্গন্ধ হইয়াছিল। ডামিয়েন সে দুর্গন্ধে তাহাদের নিকট যাইতে পারিতেন না। দূরবর্ত্তী পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থ জলাশয় হইতে নল যোগে জল আনার ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং কুষ্ঠরোগীদের ঘা প্রক্ষালন করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, স্বয়ং তাহাদের গাত্র ধৌত, মৃত্যুকালে সান্ত্বনা দান, মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহ মমতায় সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল। তখন তিনি তাহাদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। পুরুষ ও রমণীদিগের বাসের জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে অসৎ কার্য্য ও অসৎ চিন্তা ও কথা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একে একে বহুলোক মদ্যপান, ব্যভিচার ও কুৎসিৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। দুই একজন করিয়া ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ পাইতে লাগিল। দয়া, দান, সমবেদনা ও ধর্ম্মশিক্ষা কুষ্ঠরোগীদিগকে নব জীবন দান করিল। ক্রমে তথায় ধর্ম্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ফাদার ডামিয়েন বাল্য কালে সূত্রধর ও রাজ মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছিলেন, এখন নিজ হস্তেই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। যেখানে মদ্যপান ও ব্যভিচার ছিল, সেখানে ধর্ম্মের মধুর সঙ্গীত দিবানিশি গীত হইতে লাগিল।

ফাদার ডামিয়েন ৩৬ বর্ষ বয়সের সময় মলকাই দ্বীপে গিয়াছিলেন, ১০ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর এক দিন দেখিলেন তাঁহার শরীরে কুষ্ঠের বিষ প্রবেশ করিয়াছে। তিনি ডাক্তারকে ডাকিয়া তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিতে বলিলেন। ডাক্তার তাঁহার অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। ডাক্তার বলিলেন "আমার মুখ দিয়া কথা সরিতেছে না, যাহা সন্দেহ করিতেছেন, তাহাই হইয়াছে।" ফাদার ডামিয়েন বলিলেন "আমি এ কথা শুনিয়া কিছু মাত্র ভীত হইলাম না, আমি জানিতাম নিশ্চয়ই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইব।" ঈশ্বরের ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া ডামিয়েন আরও উৎসাহের সহিত খাটিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আরোগ্য লাভের জন্য মলকাই পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "আমি কুষ্ঠ রোগীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে চাই না। আমার অনুপস্থিতে শত শত লোক ক্লেশ পাইবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না?" দিন দিন পীড়া কঠিন হইতে লাগিল, তথাপি ডামিয়েনের উৎসাহ উদ্যমের হ্রাস হইল না। তাঁহার মাতা পুত্রের কুষ্ঠরোগের সংবাদে মৃতপ্রায় হইলেন। তিনি আর অধিক কাল জীবিত রহিলেন না।

১৮৮৩ সনে তাঁহার শরীরে কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন প্রকাশ পায় ও ৬ বৎসর কাল কষ্ট পাইয়া বিগত এপ্রিল মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

২৮এ মার্চ্চ ডামিয়েন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিলেন, আর সে শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। ৩০এ তারিখ তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১লা এপ্রিল তিনি সহচরদিগকে বলিতে লাগিলেন "দেখ আমার কুষ্ঠের ঘা শুকাইয়া যাইতেছে, উপরকার চামড়া কাল হইয়াছে, এই সকল কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যুর চিহ্ন। আমি কত কুষ্ঠ রোগীকে মরিতে দেখিয়াছি মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলেরই ঘা শুকাইয়া যায়। আমার মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব নাই। মৃত্যুকালে ইচ্ছা ছিল, একবার ধর্ম্মগুরুকে দেখিয়া যাই কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইল না। এবার বড়দিন স্বর্গীয় পিতার সহিত সম্ভোগ করিব।" ২রা এপ্রিল, তিনি বলিলেন "ঈশ্বর কেমন দয়ালু, আমি একাকী এখানে আসিয়াছিলাম, এখন কুষ্ঠরোগীর সেবার জন্য দুইজন পুরোহিত ও দুইটী ভগিনী এখানে সমাগত হইয়াছেন, ইহাতেই আমার মনে শান্তি পাইয়াছি। আমার আর ইহলোকে থাকার প্রয়োজন নাই, আমি শীঘ্রই ঐ লোকে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলী দ্বারা আকাশ দেখা-

ইতে লাগিলেন। তাঁহার একজন সহচর বলিলেন "আপনার বস্ত্র আমাকে দান করুন, আপনার বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন আপনার মত অন্তঃকরণ লাভ করিতে পারি।" ডামিয়েন বলিলেন "আপনি বস্ত্র লইয়া কি করিবেন, এই বস্ত্র যে কুষ্ঠের পুঁজ রক্তে বিষাক্ত হইয়াছে।" ধীরে ধীরে ডামিয়েনের বল ক্ষয় হইতে লাগিল। তিনি আর সে ভূমি শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বস্তুতঃই ভূমিশয্যা ছিল। অতি গরিব কুষ্ঠির শয্যা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু শয্যা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল না। যিনি কুষ্ঠিদের জন্য কত টাকাই ব্যয় করিয়াছেন, তিনি কিনা এমন গরিব ছিলেন, যে নিজের দুইখানা বস্ত্র ছিল না, পুঁজরক্তে বিবর্ণ শয্যাবস্ত্র বদলাইবার উপায় ছিল না। ১৫ই এপ্রিল তিনি নীরবে এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মৃত্যুর পর দেখা গেল, কুষ্ঠের কোন চিহ্ন নাই। তাঁহাকে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করা হয়। যখন তিনি সর্ব্ব প্রথম মলাকাই দ্বীপে পদার্পণ করেন তখন তাঁহার গৃহ ছিল না, এই বৃক্ষ তলেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র দেহ এই বৃক্ষতলেই চিরকালের জন্য শয়ান রহিল।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বংশবাটী।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে বংশবাটী ব্রাহ্মসমাজের ৭ম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, সন্ধ্যার পর, বংশবাটী ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন উপলক্ষে, বংশবাটী সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং "সংসার অনিত্য, সারাৎসার পরমেশ্বর নিত্য," এই বিষয়ে উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, সন্ধ্যার পর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে, ধর্ম্মালোচনা হয়।

২০এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন্ধ্যার পর, সমাজ মন্দিরে উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই রূপ তিন দিবস, বংশবাটী ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন উপলক্ষে, উপাসনাদি হইয়া ১লা আষাঢ় হইতে উৎসব আরম্ভ হয়।

১ লা আষাঢ়, শুক্রবার, সন্ধ্যার পর, বংশবাটী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা, "বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ধর্ম্মের অভাব" বিষয়ে উপদেশ ও সংগীত হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি।

২ রা আষাঢ়, শনিবার, সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময়, রাজা সুরেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের ভবনে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়—"সার ধর্ম্ম কি?" বক্তৃতা প্রায় ২½ ঘণ্টাকালব্যাপী হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে নবদ্বীপ নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গান করিয়াছিলেন।

৩ রা আষাঢ়, রবিবার প্রাতে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা ও "পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ বিষয়ে উপদেশ হয়। প্রাতঃকালের উপাসনা ও উপদেশে লোকের মন যার পর নাই আকৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত দিবস, সন্ধ্যার পর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে, উপাসনা, "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং" ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বনে বিস্তারিত উপদেশ ও সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪ঠা আষাঢ়, সোমবার প্রাতে, নগর সংকীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন গিয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাদের উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। যদিও তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই, তথাচ তাঁহার আগমনে, তিনি আমাদিগকে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে মাতাইয়া গিয়াছেন, এজন্মে তাহা ভুলিতে পারিব না। তিনি ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া সমস্ত বাঁশবেড়িয়াকে মাতাইয়াছিলেন।

নগর সংকীর্ত্তন ;—এই সংকীর্ত্তনের প্রকৃতি আমরা বর্ণনা করিতে অপারগ। এমন সংকীর্ত্তন বাঁশবেড়িয়ায় কখন হওনা দূরে থাকুক, বিজয় বাবু স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি এমন সংকীর্ত্তন বহুকাল দেখি নাই।" গড় বাটীতে সংকীর্ত্তন যেরূপ মধুর হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অতঃপর সংকীর্ত্তন নগেন্দ্র বাবুর বাটী উপস্থিত হইয়া ভঙ্গ হইল।

বনগ্রাম।

১০ই, ১১ই, ১২ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস মহাশয়ের বনগ্রামস্থ বাগান বাটীতে বনগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। রবিবার প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়। সোমবার শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তথায় গমন করেন। ঐ দিবস তিনি সায়ংকালে এবং তৎপর দিবস প্রাতে উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে প্রসন্নচন্দ্র রোধুরী মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং সায়ংকালে তথাকার ইংরেজী স্কুল গৃহে "ধর্ম্মই সমাজের ভিত্তি" এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাধারণ উপাসনা ও বক্তৃতায় স্থানীয় মুনসেফ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী মহাশয়গণ যোগ দান করিয়াছিলেন; অনেকেই তাহার উপাসনা ও বক্তৃতায় প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বিধানবাদ।

ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইতে বিধানবাদ প্রচারিত হইতেছে। ঈশ্বরকে যাহারা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিধাতৃ শক্তিতে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষে বিধান না মানা কখনও সম্ভব নহে। বিধাতা মানিলেই বিধানও

মানিতেই হইবে। কিন্তু যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাদিতে বিধানবাদ প্রচারিত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কি না এবং সেরূপ বিধান মানিলে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য মতের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কি না সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজ এই পত্রে তাহার কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

আমরা দেখিতেছি বিধানবাদ প্রচারের সহিত "পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান", "বিধান সকল" এবং "বিশেষ বিধান" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হইতেছে এবং প্রায় সকল লেখকের লেখাতেই প্রচারিত হইতেছে যে ঈশ্বর সময়ে সময়ে এক একটী বিধান প্রচার করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিধানের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন প্রবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জগতে প্রেরিত হইয়াছেন ইত্যাদি। প্রথমতঃ "ঈশ্বর সময়ে সময়ে এক একটী বিধান প্রচার করেন" এই প্রকার উক্তিতে কোন দোষ আছে কিনা দেখা যাউক; যাঁহারা বিধানবাদ প্রচার করেন তাঁহারা সকলেই জানেন পরমেশ্বর মঙ্গলময় এবং জগতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যেই বিধান সকল প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বিশেষরূপে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, এবং সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ। সুতরাং ইহাও জানা আবশ্যক যে সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্য প্রণালীর কখনও দুর্ব্বলের কার্য্য প্রণালীর অনুরূপ হইবে না। দুর্ব্বল ও অজ্ঞ যে সে একবার একটী প্রণালী অবলম্বন করে, কিছুকাল পরে যখন দেখা যায় তাহাদ্বারা উপযুক্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে না, তখন আর একটী উপায় অবলম্বন করে, এইরূপে যতবার সে এক একটী উপায় অবলম্বন করিয়া বিফল মনোরথ হয় ততবার আর একটী নূতন উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞ। কোন্ উপায়ে জগতের কল্যাণ হইবে, তাহা তিনি যেমন অবগত আছেন; তেমনই তাহার অনুরূপ কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। সুতরাং জগতের কল্যাণের জন্য তিনি যে বিধান করিবেন, তাহা প্রথমেই এই প্রকৃতির হইবে যে তাহার কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। তাহা এই প্রকারের হইবে, যে তাহাই একমাত্র কার্য্য সাধনক্ষম হইবে। কিন্তু যদি এমন হয় যাহাকে বিধান শব্দে অভিহিত করা গেল। তাহা উপযুক্ত ফলোৎপাদনে অক্ষম, যদি তাহা জগতের মঙ্গল সাধারণের উপযোগী না হইল, তবে জানিতে হইবে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলময় ঈশ্বরের হস্ত হইতে সে বিধান আসে নাই। তিনি যেমন অপরিবর্ত্তনশীল, তাঁহার প্রদত্ত উপায় বা বিধানও তেমনি অপরিবর্ত্তনশীল হইবে। তাঁহাতে যেমন দুর্ব্বলতা নাই, তাঁহার কৃত বিধান বা উপায়ে তেমনই দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে না। তাঁহার বিধান অপরিবর্ত্তনীয় সম্যকরূপে অভাব নিরাকরণে সক্ষম। সুতরাং ঈশ্বরের বিধান সময় সময় যেমন পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি নূতন নূতন বিধান আসিবারও সম্ভাবনা নাই। বিধান সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরেও পরিবর্ত্তনশীলতা আরোপ করিতে হয়। বিধানকে উপযুক্ত ফলোৎপাদনে অক্ষম বলিলে ঈশ্বরের প্রতিও শক্তি হীনতাও অজ্ঞতার আরোপ করিতে হয়।

আবার যাঁহারা বলেন ঈশ্বর এক এক সময়ে এক একটী বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাই বলিতেছেন ঈশ্বর কোন এক সময়ে যে উপায়ে জগতের কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন সময়ে সে উপায় কার্য্যকারী না হওয়ায় অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতার আরোপ করা হইতেছে। দুর্ব্বল মানুষ যেমন সচরাচর নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করে, এই বিধানবাদ প্রচারদ্বারা ঈশ্বরকেও সেইরূপ দুর্ব্বল মানুষের মত করিয়া ফেলা হইতেছে। যদি বলা হয় বিধান সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিরুদ্ধ নয়। এক উপায়ই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিধান বলিয়া উল্লেখের কোন সার্থকতা থাকে না। বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া যে সকল ব্যাপারকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান বলা হয়, তাহার সকলগুলি যে একই উপায় নির্দ্দেশ করে বা একই কথা ব্যক্ত করে তাহাও নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের যে সকল ঘটনাকে বিধান বলিয়া উল্লেখ করা যায়, বৌদ্ধধর্ম্ম বা চৈতন্যের ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে তাহার সমর্থন করে না।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি এক এক জনের কার্য্যকে যে এক একটী বিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, ইহাদের সকল কথায় যে সামাঞ্জস্য বা মিল নাই তাহা সকলেই জানে। সুতরাং একই বিধি সর্ব্ব সময়ে প্রচারিত হইয়াছে তাহা বলিবার উপায় নাই। এক এক জন ধর্ম্মবীরের কার্য্যকে যদি ঈশ্বরের বিধান নামে আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি সর্ব্বশক্তিমানের মত কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি এক জনের দ্বারা যাহা করিয়াছেন অন্যের কার্য্য দ্বারা তাহার অন্যথা করিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞতা ও শক্তির অভাব দুইই তাঁহাতে বর্ত্তমান।

কখন কখন এমনও ব্যাখ্যা শুনা গিয়াছে যে শিশুর পক্ষে তরল বস্তু অর্থাৎ দুগ্ধাদি উপযুক্ত আহার্য্য। কিন্তু ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া কঠিন বস্তু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমনি মানব জাতির শৈশবাবস্থায় যে ধর্ম্মবিধান ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখানেও দেখিতে হইবে যে শৈশবের দুগ্ধাদির পরিবর্ত্তে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহাদের উপাদানগত সামঞ্জস্য সর্ব্বদাই থাকিয়া যায়। বস্তুর মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কখনই ঘটে না। কিন্তু বিধান প্রবর্ত্তক বলিয়া যাঁহারা উক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের কার্য্যকে ঈশ্বরের বিধান নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের কার্য্য এবং প্রচারিত মত কখনই মূলতঃ এক নয়। যজ্ঞে পশু বধ এবং অহিংসা কখনই এক প্রকৃতি বিশিষ্ট নয়। মহম্মদের বিধি, এবং খৃষ্টের বিধির সকল গুলিতেই যে ঐক্য আছে, তাহা নয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির (যাঁহাদের কার্য্য বিধান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে) কার্য্য কখনই এক ভাবাপন্ন নহে।

আবার এমন ব্যাখ্যাও সচরাচর শুনা গিয়া থাকে যে এক এক জন বিধানপ্রবর্ত্তক এক একটী বিশেষ বিশেষ বিষয় প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ বিশ্বাস, এবং কর্ম্ম প্রভৃতির প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সেই সেই

বিষয় গুলির প্রচার এক একটী বিধান। কিন্তু যদি এমন হইত যে জ্ঞান প্রচারক শুধু জ্ঞানের কথাই প্রচার করিয়াছেন, ভক্তি প্রচারক শুধু ভক্তির কথাই প্রচার করিয়াছেন বা বিশ্বাস প্রচারক বিশ্বাসের কথাই প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইলেও কতকটা স্বীকার করা যাইত যে ঈশ্বর সময় সময় এক এক ভাব প্রচার জন্য এক এক জনকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও বলিবার উপায় নাই। এক পথাবলম্বিগণ অন্য পথাবলম্বিগণকে ভ্রান্ত বলিয়া শুধু নিন্দা করিয়াছেন, তাহা নয় তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ পথই নয়, তদ্দ্বারা ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াও সেই সেই পথাবলম্বীদিগকে নিজ পথে আনিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিকাশও বলিবার উপায় নাই। আবার সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্য প্রণালী কখনই এরূপ হইতে পারে না। তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদাই পূর্ণতা ও সর্ব্ব প্রকারের উপাদান সম্পন্ন হইবে। যখন জ্ঞানের বিধানে ভক্তি ছিল না, বা ভক্তির বিধানে জ্ঞান ছিল না, তখন এমন অসম্পূর্ণ কার্য্য কখনই ঈশ্বরের হইতে পারে না।

বিশেষ বিশেষবিধানবাদীগণের আর একটী মত এই যে পৃথিবী যখন পাপ তাপে পরিপূর্ণ হয়,যখন তাহার পরিমাণ অতিশয় বেশী হইয়া পড়ে, তখনই তিনি এক এক বিধান প্রেরণ করেন। অর্থাৎ এক এক জন বিধানপ্রবর্ত্তককে জগতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা এখানে আগমন পূর্ব্বক পাপের উপর পুণ্যের জয় প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গলময় প্রেমময় ও নিত্যক্রিয়াশীল ঈশ্বরের কার্য্যের প্রণালী কখনই এইরূপ নহে।' উদাসীন, বা সকল অবস্থা যাহার জ্ঞানগোচর হয় না, তাঁহার পক্ষে কখন কখন জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথা সাজে। জগৎ পাপে পাপে ছারখার হইতেছে, অথচ পূর্ণ জ্ঞানময় মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন না বা তাঁহার জগতের কল্যাণ সাধনের কোন উপায় করিতেছেন না। বহু বৎসর চলিয়া গেল, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি এদিকে পড়িল জগতের দুঃখে তিনি ব্যথিত হইলেন এবং তখন একটা উপায় করিলেন, এরূপ বলিলে তিনি যে নিত্যক্রিয়াশীল এবং মঙ্গলময় প্রতিনিয়ত জগতের কল্যাণে যে তাহার ব্যস্ততা আছে তাহা স্বীকার করিবার কোনই শার্থকতা দেখা যায় না। উদাসীন ঈশ্বরে যাহারা বিশ্বাস করেন তাহাদের পক্ষে উক্তরূপ কথা বলা সাজে যে দুই শত বা পাঁচ শত বৎসর পরে কোন ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল এবং জগতের রক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহার জ্ঞান জন্মিল, তখন একটা উপায় যা হয় করিলেন। এরূপ কথা নিত্য জ্ঞানময় ক্রিয়াশীল ঈশ্বরে বিশ্বাসী কখনই বলিতে পারেন না। নিত্য চৈতন্যময় বিধাতা যিনি তাঁহার পক্ষে দুই শত পাচ শত বৎসর পরে পরে বিধান প্রেরণ কখনই সম্ভবে না। হয় তিনি নিত্যক্রিয়াশীল, নিত্যবিধাতা না হয়, তিনি একই বিধানের প্রেরয়িতা, একই বিধানের পরিপোষক। থেকে থেকে কিছুকাল পরে পরে এক এক বিধান প্রেরণ কখনই নিত্য চৈতন্যময় নিত্য ক্রিয়াশীল ও মঙ্গলময় ঈশ্বরে সম্ভবে না।

ঈশ্বরের বিধান বিধানবাদীর পক্ষে অবশ্য অবলম্বনীয়। বিধান বলিয়া যাহা উক্ত হইবে, তাহার সম্বন্ধে বিচার করা বা তাহার দোষ গুণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা কখনই বিধানবাদীর পক্ষে শোভা পায় না। তিনি দেখিবেন বিধান কি না। যদি বিধান হয়, তাহা হইলে তদনুসারে চলিতে ইতস্ততঃ করিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে বিধানকে বাস্তবিক রূপে মানা হয় না। ব্রাহ্ম যদি খৃষ্টের কার্য্য বা মহম্মদের কার্য্য, কিম্বা বুদ্ধ প্রভৃতির কার্য্যকে বিধান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়া কখনই সংগত নয়। কিন্তু এক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যেক ধর্ম্মবিধান-প্রবর্ত্তকের মতানুযায়ী হইয়া চলাও সম্ভবপর নয়। সেরূপ ভাবে চলিতে গেলে মানুষের বিবেক বা কর্ত্তব্য জ্ঞানের কোন মূল্যই থাকে না। সে কোন্ দিকে যাইবে তাহাই স্থির করিতে পারে না। অতএব এক জনের পক্ষে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় যাহা বিধান নামে উক্ত হইতেছে তাহাদের অনুগত হইয়া চলা কখনই হইতে পারে না। অথচ যাঁহারা প্রায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কাহারও বিধি মান্য করা আবার কাহারও বিধি অমান্য করিয়া চলা ত সুসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের বিধান যাহাকে বলিব তাহার অনুগত হওয়াই ধর্ম্ম। অন্যথা করাই পাপ। ব্রাহ্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচারিত বিধি সকলের কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া কাটিয়া ছাটিয়া আপন সুবিধামুরূপ একটী পথ প্রস্তুত করিয়া লইবেন অথচ সে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই বিধান বলিবেন ইহা কখনই উপযুক্ত হয় না। সুতরাং ব্রাহ্ম "ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিধান" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রায় সকল ধর্ম্মকেই যে বিধান বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা যুক্তিসংগত নহে। বিধান বলিয়া যাহাকে অভিহিত করা যাইবে,সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার অনুগত হইয়া চলাই কর্ত্তব্য তখন দ্বিধা করিলে বাস্তবিক বিধান মান্য করা হয় না।

ঈশ্বর যে দুর্ব্বলের মত একবার একটী বিধান প্রেরণ করিয়া উপযুক্ত ফল না পাইলে, আবার তাহার সংশোধনার্থ আর একটী বিধান প্রেরণ করেন না অথবা তিনি ২ শত ৫ শত বৎসর পরে পরে এক একটী বিধান প্রেরণ করেন বলিলে তাঁহার নিত্য ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি স্বীকারের কোন তাৎপর্য্য থাকে না; এতক্ষণ তাহাই প্রদর্শিত হইল। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে বিধাতা রূপে বিশ্বাস করি এবং তাঁহার বিধানেও বিশ্বাস করি। বাস্তবিক তাঁহার বিধাতৃত্ব শক্তি অস্বীকৃত হইলে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের অতি অল্পই বাকী থাকে। তবে বিধান বলিলে আমরা কি বুঝিব? এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকেই বা কোন্ অর্থে বিধান নামে অভিহিত করিব, তাহাই এখন বিবেচ্য। বিধান বলিলে আমরা এই বুঝি যে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর মানবাত্মার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কল্যাণ সাধনোপযোগী সমস্ত প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা হৃদয়রূপ শাস্ত্রে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি যাহা লাভ করিতে পারিলে মানবাত্মার প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে এবং যাহা লাভ করিলে সে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারে, ঈশ্বর প্রথম হইতে আত্মায় সে সকল বিধান করিয়া শিক্ষাদাতা ও সাহায্যদাতা রূপে নিত্য সঙ্গী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মানব যদি

আপন হৃদয়স্থিত সেই অমূল্য উপদেশ ও শাস্ত্র পাঠ করিতে যত্ন করে, সে যদি তাহার নিত্য সঙ্গী ও উপদেষ্টার সাহায্য উপযুক্তরূপে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহার কোন অভাবই থাকে না, সময়ে তাহার সকল অভাব ঘুচিয়া প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। মানব নিত্য সহায় ও প্রকৃত উপদেষ্টার কথা না শুনিয়া ও তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়াই অসৎ পথের পথিক হয় এবং প্রবৃত্তির বশে আপন কল্যাণ হইতে দূরে যাইয়া কষ্টভোগ করে, তাহাতেই তাহার পক্ষে দুঃখ ও অভাব সম্ভব হইয়াছে। মানুষ এই স্বাধীনতাও সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতেই লাভ করিয়াছে। তিনি কখন মানবকে বৃক্ষাদির ন্যায় এক ভাবাপন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বাধীন ও বিচারক্ষম করিয়া প্রকৃত কল্যাণ ও অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মানব যে সময় তাঁহার হৃদয়স্থিত এই অমূল্য উপদেশ সকল পাঠ করিয়া তাহাতে জ্ঞানবান হয়, তখনই সে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া মহান্ ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধান প্রত্যক্ষ করিয়া বিমুক্ত হইতে থাকে।

এই যে বিধান ইহা কোন এক সময়ে, কোন এক দেশে বা কোন এক ব্যক্তিতে প্রকাশিত বা আবদ্ধ নয়। ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। কোন এক দেশ বিধাতার কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়; কোন একজনও তাঁহার বিধান বহির্ভূত নয়। কিন্তু ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে যেন বোধ হয়, ঈশ্বর এক এক ব্যক্তির ভিতর দিয়া এক একটী সত্য নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই লোকে নূতন বিধান প্রেরণের কথায় বিশ্বাস করে। বাস্তবিক ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নয়, কিন্তু মানবের পক্ষে নূতন অনুভব। তাহার অন্তরে যাহা নিহিত ছিল, যাহার সন্ধান সে এত দিন পায় নাই, এখন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল। ইহাকে নূতন সৃষ্টি বলা সংগত নয়।

যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে "স্বর্গ" সম্বন্ধে মানব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছে। স্বর্গকে বিভিন্ন প্রকার সুখভোগের স্থান বলিয়া মনে করিয়াছে। লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে স্বর্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছে বলিয়া ঈশ্বরও কি ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নাই তিনি নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং বিধানও তাহার নিত্য নূতন নয়। কিন্তু একইভাবে তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিধান বলিবার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে ঈশ্বর ইহাকে হঠাৎ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান এজন্য যে ইহা তাঁহারই প্রেরিত ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিই এই যে ইহা সর্ব্বপ্রকারে সত্যের অনুসরণ করিবে। সত্যই ইহার প্রাণ। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণ যে পরিমাণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অজ্ঞানতাবশতঃ বা কোন স্বার্থ নিবন্ধন সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য গ্রহণ করিবেন কিম্বা অসত্য বোধে সত্য পরিহার করিবেন; সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত থাকিবেন। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম সুতরাং সকল সত্যের আশ্রয়—পরমেশ্বরই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধাতা এবং প্রেরক ইহা আজ যে হঠাৎ এ প্রদেশে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু পরিচিত অপরিচিত যে কোন সাধু সদাত্মা আপন অন্তরে বিধাতার লিখিত সত্যের যাহা কিছু অনুভব করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন স্থান বা কাল বিশেষের ধর্ম্ম নয়। ইহার প্রচার আজ বা ২।৪ শত বৎসর হইতে হইতেছে না। কিন্তু মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্টি হইতেছে। সকল সাধু সজ্জনগণই সেই এক বিধাতার একই বিধানের কর্ম্মচারী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই বিধান যে এখন পূর্ণ হইয়াছে বা কোন এক সময়ে হইবে তাহা নয়। কিন্তু মানব আত্মা যেমন চির উন্নতিশীল, তাহার কল্যাণকর এই বিধানও তেমনি চির উন্নতিশীল।

কলিকাতা অনুগত

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহাশয়,

অনেকেই অবগত আছেন সময় সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য বিশেষ চেষ্টার সহিত সবর্ণের পাত্র বা পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া বিবাহাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঐ সকল বিবাহ পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বর্জ্জিত হইলেও উহাদের মূলে জাতিভেদ রক্ষিত হয় বলিয়া প্রকৃত পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শানুযায়ী বিবাহ নহে। এইজন্য যে সকল ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বিবাহে যোগদান করা বিধেয় নহে। অবশ্য এই সকল সভ্যের কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করি না। কিন্তু প্রচারক মহাশয়দের একটু সাবধান হইয়া কার্য্য করা উচিত মনে করি এবং বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আচার্য্যের কার্য্যের ভার লওয়া উচিত। কারণ তাঁহাদের উপর সাধারণের দৃষ্টি সর্ব্বদা রহিয়াছে।

শিলং বশংবদ

শ্রীপ্যারীনাথ নন্দী।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৬ই আষাঢ়ের পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার" বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ব্রাহ্মের সন্তান, বিশেষতঃ কুমারীদিগের সুশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বাস্তবিকই আর চলিতেছে না।

বেথুন স্কুলে পড়াশুনা অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে করিয়া নীতি, ধর্ম্ম গৃহকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষার স্বতন্ত্র একটী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে, আমাদের উদ্দেশ্য এক প্রকার সফল হয়।

ব্যয়সাধ্য হইলেও এবার বহনক্ষম ব্রাহ্ম কুমারীগণের জন্য এক আশ্রম হউক। কিন্তু এক একটী কন্যার জন্য মাসে ১০।১৫ টাকা ব্যয় যাঁহাদের অনায়াস সাধ্য নহে,—এবং এই শ্রেণীর লোকই আমরা অনেকে—"বরাহনগর মহিলাশ্রম" তাঁহাদের পক্ষে উপকারী হইতে পারিবে। ইহাতে রীতিমত বাঙ্গালা ও ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদিগকে রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সস্ত্রীক শশিপদ বাবু সমুদয় ভার বহন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ ছাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরোপসনা হয়। এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তথায় গিয়া থাকেন।

বিদ্যা শিক্ষা, আহার, পরিচ্ছদ ও ডাক্তার খরচ—সর্ব্বসমেত মাসে ছাত্রী প্রতি ৮৲ আট টাকা দিতে হয়। সুতরাং অনেকেরই ইহা সাধ্যায়ত্ত।

উক্ত আশ্রমের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রস্তাবের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমার মনে হয় সহজেই উহাকে আমাদের অনুকূল করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক উহার সহিত আমাদের প্রগাঢ় যোগ রহিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সস্ত্রীক উহার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রেণীভুক্ত। ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ও সস্ত্রীক অর্থ সাহায্য দ্বারা উহার সহিত সহানুভূতি কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বামাবোধিনীতে "বরাহনগর মহিলাশ্রম" এর উপকারিতা বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন এবং আমাদের "মেসেঞ্জার" ও আশ্রমের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যক্ষ সভার সভ্য, এবং অন্যান্য মান্য গণ্য ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগ্নীগণ উক্ত আশ্রমের সহিত কার্য্যতঃ সংসৃষ্ট রহিয়াছেন। আমার অনুরোধ, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ শশী বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিদ্যালয়কে স্বল্পায়ে ব্রাহ্ম কুমারীগণের শিক্ষাক্ষেত্র হয় কি না, দেখুন।

কলিকাতা শ্রীকেদারনাথ রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—বিগত ১লা জুন হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত উলুবেড়িয়া মহকুমাস্থিত ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব বিধাতার কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরাগড়ি, রসপুর, বাণিবন, শ্যামপুর ও বাঁটুলের অন্যূন ২০ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মে সহানুভূতিকারী এবং স্থানীয় মুনসেফ্, উকীল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই উৎসবে মিলিত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ২ দিন উপাসনার কার্য্য করেন।

১লা, জুন প্রাতে উপাসনা, সন্ধ্যাকালে উৎসবের উদ্বোধন। ২রা প্রাতে উপাসনা; তৎপরে ধর্ম্মালোচনা এবং সম্মিলনীর গতবৎসরের রিপোর্ট পাঠান্তে কিরূপে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কথোপকথন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। ২রা প্রাতে উপাসনা এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণের অনুরোধে অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন এবং বাজারে,মাঠে ও ঘাটে বক্তৃতা হয়। বক্তা কাঁথি স্কুলের শিক্ষক বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, গ্রামবাসী ও সম্মিলনীর সম্পাদক বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক এবং আমারাগড়ীর বাবু ফকিরদাস রায়। বিশেষ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রায় ৩০০ শত লোক সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং বক্তাত্রয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

দান প্রাপ্তি—বড়বাজার সূতাপটী বারইয়ারি ফণ্ড হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দাতব্য বিভাগে এক কালীন ৫০৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা এই দানের উদ্যোগী মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে ডায়মণ্ড হারবার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ আমরা নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য দাতা মহাশয়দিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	ঐ	১৲
শ্রীমতী অম্বিকাদেব,	কোন্নগর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	ঐ	৫
„ „ রজনীনাথ রায়,	মান্দ্রাজ	২৫৲
একজন বন্ধু কলিকাতা মাং বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ		২৲
বাবু রাজকুমার সেন,	চৌদ্দগ্রাম	২৲
খানখানাপুর ছাত্রসভা		১৸০
ঐ স্কুলের শিক্ষকগণ		১৲
ঐ জমিদারির কাছারি		১৲
বাবু ক্ষেত্রমোহন বেরা,	কাঁথি	১।৴০

প্রচার—বাবু কালীপ্রসন্ন বসু গত ২৭ এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীবাড়ী গ্রামে একটী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় "কিসে প্রায়শ্চিত্ত হয়।" বক্তৃতায় প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছিল: দীনতা অবলম্বন না করিলে উচ্চতর জ্ঞান পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলেই বড় লোক হয় না। আর ঈশ্বরকে উপাস্য জানিয়া উপস্থিত লোকদিগকে খুব সাহস করিতে অনুরোধ করা হয়, যেহেতু মানুষ কেবল শরীর বিনাশ করিতে পারে। কিন্তু আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না।

খোলাবেড়িয়া গ্রামে বাবু চন্দ্রনাথ সাহার বাটীতে ভ্রাতৃ সম্মিলনীতে "চিন্তাই প্রেম সাধনের উপায়" এই বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবু আর একটী বক্তৃতা করেন। এবং ফরিদপুরে ৩০শে জুন তত্রত্য উপাসনালয়ে প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা করেন। প্রাতঃকালের উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই যাঁহারা কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া অনুন্নত অগ্রসর না হইলে ধর্ম্মেতে সুখ নাই, দুঃখকে ভয় করা অনুচিত। যেহেতু দুঃখই ধর্ম্মসাধনের রাজপথ, অন্যপথ নাই। সায়াহ্নে যে উপদেশ হইয়াছিল, তাহাতে ভালবাসা ও চিন্তার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ যাঁহার প্রতি ভালবাসা হয়, মনে স্বতই তাঁহার চিন্তা হয়, আবার যে বস্তুর চিন্তা সতত করা যায়, তাহার সঙ্গে প্রণয় হওয়া স্বাভাবিক। এই নিয়মেই বিষয়ের সহিত সতত আলাপ পরিচয়ে বিষয়ের প্রতি প্রণয় জন্মে। চেষ্টা দ্বারা চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া লইলে ঈশ্বর প্রেম ও লাভ হইবে। চিন্তার অসাধ্য কি? অতএব কি আহার করিবে, পরিধান করিবে তাহার অতিরিক্ত চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করাই উচিত।

ভ্রম-সংশোধন—তত্ত্বকৌমুদীর গত সংখ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে যে "ময়মনসিংহের অন্তর্গত করটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত মহম্মদালি খাঁ মহাশয় তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার্থ ৫০০৲ টাকা মূল্যের তাঁহার একটী বাড়ী প্রদান করিয়াছেন।" ইহাদ্বারা করটিয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্য দান করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত গৃহ টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার্থ দান করিয়াছেন। বাড়ী শব্দ প্রয়োগ করা ও ঠিক হয় নাই কারণ তিনি কেবল অনুমান ৫০০৲ মূল্যের একখানি টিনের গৃহই দান করিয়াছেন। কিন্তু ভূমির স্বত্ব দান করেন নাই।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(সেপ্টেম্বর—১৮৮৮।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বাবু নবকৃষ্ণ ভাদুড়ি,	নোয়াখালি	২৲
„ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী,	কাঁথি	৩৲
„ কালীশঙ্কর সুকুল,	কলিকাতা	১৲
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র,	ঐ	২॥০
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	১৲
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়,	ঐ	২৲
„ হরকান্ত সেন,	বরিশাল	৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,	কলিকাতা	১৲
„ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	ভবানীপুর	২৲
„ রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়,	শিমলা	৩৲
„ কৈলাস চন্দ্র সেন,	কলিকাতা	২৲
„ পরেশনাথ সেন,	ঐ	১৸৵০
„ কেদারনাথ রায়,	ঐ	১৲
„ শরৎকুমার সিংহ,	বর্দ্ধা	৩৲

ক্রমশঃ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র শুক্রবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

এ কে শক্তি?

(১)

"দাঁড়াতে না দেয় কাল ঠেলিয়া লইছে ;
নদীর বালুকা মত, সদা পদতলে
যেন মাটী সরে যায় ; জন্মিছে মরিছে
জীব কত ; দাঁড়াবে যে হাসি কাঁদি ব'লে,
তা হবে না ; কেবা হেথা বসিতে পাইছে ?
ছোট আর হাস কাঁদ ; দেখ ভূমণ্ডলে
কাল চক্রে দিন রাত এক দুই করে
ঘুরে যায়, হাসি কান্না ডোবে পরস্পরে ?

(২)

কার বিশ্ব, মূঢ় নর ! তোমার গৌরব
সাজে কোথা ? যারে তুমি এত ভাল বাস
সে জীবন তোমার কি ? এই শক্তি সব
ভাঙ্গিছে গড়িছে, যারা, যাহাদের ত্রাস
তোমার পরাণে প'শে করিছে নীরব,
তারা কি তোমার ? নর ! দেখ তুমি ভাস
সে শক্তির পারাবারে, সেই শক্তি কার ?
ভাঙ্গিছে চূর্ণিছে দর্প সতত তোমার !

(৩)

যেন কোন চক্রে পড়ি ঘুরি রে সকলে !
যেন সামালিতে নারি ! না নিতে নিশ্বাস
ঘুরায় প্রবল বেগে ; সামালিব বলে
মুক্তি আঁটি গুঁড়া করে ; দেখে লাগে ত্রাস !
আমার ইচ্ছার মত কিছু নাহি চলে।
এ কে শক্তি ? জোরে মোরে করিতেছে দাস !
আশার প্রাসাদ মোর স্রোতে ভাসাইছে ;
পাষাণ শিলার মৃত্যু বাসনা পিষিছে।"

বাদ্র-কুসুম।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ঐশীশক্তির পরিচয়—কোরিন্থ নগরবাসি খৃষ্টানদিগকে মহাত্মা সেণ্টপল যে দুই পত্র লেখেন, তাহার প্রথম পত্রের এক স্থানে আছে ;—"তোমরা এখনও আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন হও নাই। সামান্য সাংসারিক ভাবেই কার্য্য করিতেছ ; কারণ ভাবিয়া দেখ যখন তোমাদের মধ্যে এখনও ঈর্ষ্যা, বিবাদ, ও বিচ্ছেদ রহিয়াছে তখন কি তোমরা সাংসারিক ভাবেই কার্য্য করিতেছ না ?" কোন দলের মধ্যে ঐশী শক্তি কার্য্য করিতেছে কি না যদি জানিতে হয় তবে তাহা পরীক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই। অনুসন্ধান কর তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিবন্ধন কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে কি না ? কারণ এই, যেখানে সকলেই নিজের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরের গৌরবই অন্বেষণ করে, সেখানে ঈর্ষ্যা প্রভৃতি প্রবেশ করিবার পথ পায় না। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতে দেখা যায় যে পুরাতন হিন্দু কলেজ স্থাপনের যখন প্রস্তাব হয়, তখন তিনি ও মহাত্মা ডেবিড হেয়ার এই উভয়ে সে বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। পরে তখনকার সুপ্রিম কোর্টের চিফ জষ্টিশ সার হাইড ইষ্ট সাহেব তাহাতে যোগ দিলেন। সার হাইড ইষ্ট হিন্দু সমাজের অগ্রণী স্বরূপ ব্যক্তিদিগকে নিজ ভবনে ডাকাইয়া তাহাদিগকে এবিষয়ে মনোযোগী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সহরের কতকগুলি বড় লোককে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিবার চেষ্টা করা হইল। তাহার মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম ছিল কারণ তিনি প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু হিন্দু সমাজের দলপতিগণ বলিলেন রামমোহন রায়ের নাম কমিটীতে থাকিলে তাঁহারা সে কমিটিতে থাকিবেন না। রামমোহন রায় এই কথা শুনিয়া সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিয়া কমিটী হইতে আপনার নাম তুলিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন কলেজটী স্থাপিত হওয়াই সকলের প্রার্থনীয় ; তাঁহার সংস্রব থাকাতে যদি কাহারও যোগ দিবার বিঘ্ন হয় তবে তাঁহার দূরে থাকাই ভাল। দেশের কল্যাণকে উচ্চ স্থান ও নিজের গৌরবকে নিম্ন স্থান দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রামমোহন রায় ওপ্রকার করিতে পারিয়াছিলেন। সত্যের গৌরব ও ঈশ্বরের গৌরব যেখানে লক্ষ্য থাকে সেখানে লোকে নিজের স্বার্থ ও গৌরব বিস্মৃত হইয়া যায় ; সুতরাং যদি দেখা যায় যে কোন দলের মধ্যে দশজনে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পরতন্ত্র হইয়া পরস্পরকে বাধা দিতেছে ;—পরস্পরকে সদ্ভাব ও উদারতার সহিত

গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; পরস্পরের গুণভাগ অপেক্ষা, দোষ ভাগেরই প্রতি অধিক দৃষ্টি করিতেছে; তাহাতে ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে যে মহৎ কার্য্যের জন্য তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই; তাঁহারা ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করিতেছে না। আমাদের আশঙ্কা হয় আমরা হয়ত এই প্রকার দশাতে পড়িয়াছি।

বিষ-কুম্ভ—এতদ্দেশীয় প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছে "যে ব্যক্তি সমক্ষে প্রিয়বাদী কিন্তু পরোক্ষে অনিষ্ট চেষ্টা করে, এরূপ বন্ধুকে পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় বর্জ্জন করিবে।"—সম্মুখে কিছু বলে না বরং সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করে; কিন্তু পরোক্ষে কুৎসা করে ও অনিষ্ট করে; এরূপ ব্যবহারের প্রতি যে কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই দারুণ ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা নহে, সর্ব্ব দেশীয় নীতিশাস্ত্রই এশ্রেণীর লোককে অতি ঘৃণিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এইটী আমাদের একটী জাতীয় দুর্ব্বলতা বলিয়া বোধ হয়। এমন কি ব্রাহ্মগণ যাঁহারা উৎকৃষ্টতর নীতির গর্ব্ব করেন, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি উচ্চ উচ্চ কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই চক্ষে পড়িতেছে, যে এক জন লোক আর একজনের কোন কার্য্যের প্রতি অতি অসৎ অভিসন্ধি আরোপ করিয়া লোকের নিকট নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ সে ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ভাবে কিছু বলিতেছেন না। মনে ভয় এই, যে সে বলিলে বিরক্ত হইবে, হয় ত ভাল ভাবে লইবে না; হয় ত হিতে বিপরীত ঘটিবে; বলিতে কিরূপ চক্ষু লজ্জা হয় ইত্যাদি। তাহার সম্বন্ধে একটা কথা শোনা হইয়াছে, যাহার মূল নাই; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই, প্রকৃত কথা জানিতে পারা যাইত, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই; তাহা সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তিই নাই। অথচ যার তার নিকট সেই ব্যক্তির কুৎসা করা হইতেছে। এরূপ ব্যবহার দুই এক ব্যক্তির মধ্যেই যে দেখা যায় এরূপ নহে ভাল ভাল লোককেও এই দোষে দোষী দেখা যাইতেছে। এই সামান্য একটা দুর্ব্বলতা হইতে আমরা যখন উদ্ধার হইতে পারিতেছি না, এবিষয়ে যখন আত্ম-সংযম শিক্ষা করিতে পারিতেছি না, তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সপ্তম স্বর্গের কথা সকল বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

আত্ম-সংযম—একজন লোক নিজ আয় ব্যয়ের সমতা বিধান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার যে আয় তাহাতে তাঁহার ঋণ হইবার কথা নয়। অথচ তাঁহার মনের এতটুকু দৃঢ়তা নাই, যাহাতে আপনাকে ও আপনার পরিবার পরিজনদিগকে একটু টানিয়া চলেন। তিনি ঋণ করিয়া বিলাসের সুখ ভোগ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তি কিরূপে আত্ম-সংযম করিবেন? আয় ব্যয়,—যাহাকে ধরা যায়, নির্দ্দেশ করা যায়, বশে রাখা যায়, তাহাকেই যিনি নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন না, অন্তরের সূক্ষ্ম ও প্রবল রিপু সকলকে তিনি কিরূপে সংযত করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবেন? আত্ম-সংযমের অর্থ আপনাকে নিয়মাধীন করা, কঠোর প্রতিজ্ঞার অধীন করা। এই সংযম জীবনের সকল বিভাগেই অভ্যাস করিতে হইবে। আয় ব্যয়ের সমতা বিধান তাহার একটী। দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্মের এবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা আপনাদের প্রমাণাতিরিক্ত চলিয়া থাকেন, ঋণকে ভয় করেন না; অর্থ সম্বন্ধে নিতান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেন। গূঢ়রূপে বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই বিশৃঙ্খলতা হইতে সকল দিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যে ঋণজীবী ও উচ্ছৃঙ্খল সে সকল কর্ত্তব্য সকল সময়ে করিতে পারে না; লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারে না; সত্য ও প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করিতে পারে না; কার্য্যের ও চিন্তার সময় রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এই এক বিশৃঙ্খলা হইতে সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অতএব ব্রাহ্মেরা যে আপনাদিগকে বিবেক ও কর্ত্তব্যের নিয়মাধীন করিবেন, তাহা এক বিভাগে করিতে গেলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষেত্র—শত সহস্র লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন ও ব্যয় করিতেছে; ইহা শুনিয়া এক জন দরিদ্রের লাভ কি? সে যে দশটী টাকা বেতন পায়, তাহার সুখ, স্বাস্থ্য, আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই সেই সীমার মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। কত রাজ্যের উন্নতি কত রাজ্যের পতন হইতেছে; কত ধনীর ধন নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে; কত ধনীর ধন বর্দ্ধিত হইতেছে, এ সমুদায়কে ভুলিয়া গিয়া তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে আমি কিরূপে আমার দশটী টাকার মধ্যে আমার অত্যাবশ্যক ব্যয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারি; কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি। সেই দশটী টাকা তাহার পক্ষে একটী ক্ষুদ্র ক্ষেত্র। যেখানে বসিয়া তাহাকে আত্ম-রক্ষার উপায় করিতে হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ক্ষুদ্র ক্ষেত্র আছে। সাধুজনের যত উক্তি শুনিয়াছি, মহাজনদিগের জীবনে যে সকল অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, তাহা ক্ষণকালের জন্য মনের এক পার্শ্বে রাখিয়া এই চিন্তা করিতে হইবে যে আমি যে একটী ক্ষুদ্র জীবনক্ষেত্র পাইয়াছি ইহার মধ্যে আমি কি করিতে পারি। সেই ক্ষেত্রটুকুর মধ্যে যে কর্ত্তব্য গুলি আছে তাহা সুচারুরূপে পালন কর। ঈশ্বরের সেবা বা সদনুষ্ঠানের যে সামান্য সুবিধা আছে তাহা বিফলে যাইতে দিও না; সেই ক্ষেত্রের মধ্যে যে আলোকটুকু পাইতেছ, তদনুসারে চলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর; তাহাই তোমার পক্ষে ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। আর সব বাহিরের কথা তোমার পক্ষে এইটুকু সার কথা। তুমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া কি করিবে? ত্রিসংসারের লোকের কার্য্য ও নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া কি করিবে? তোমার ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটুকুর মধ্যে তুমি ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্য হও। একান্তমনে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সত্য ও সাধুতার অনুসরণ কর; তোমার পথ আপনাপনি পরিষ্কার হইবে; ঈশ্বর-প্রীতি স্বতঃই তোমার হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

জীবনে ব্রহ্ম পূজা।

ব্রাহ্মের ব্রহ্মোপাসনা স্তাবকের স্তুতিবাদ নহে। অন্তর দর্শী ঈশ্বর স্বার্থান্বেষীর মুখে তাঁহার গুণ গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হন না। ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসনা কিরূপে করিতে হয়, প্রাচীন ঋষিরা সে সম্বন্ধে অতি উচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশই ব্রহ্মোপাসনার বীজ মন্ত্র। ব্রাহ্মসমাজ অতি শৈশবাবস্থা হইতেই এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রানুরূপ কার্য্য হইতেছে কি না, ব্রাহ্মেরা সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন কি না অর্দ্ধ শতাব্দী পরে একবার সে চিন্তা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। যে মহামন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই ;—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। প্রীতি না থাকিলে প্রেমময়ের উপাসনা হয় না। প্রীতিহীন উপাসনা প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। রঙ্গালয়ের দুরাচার নট ধার্ম্মিকের বেশ পরিগ্রহ করিয়া বাক্যচ্ছলে দর্শকের মন বিমোহিত করিতে পারে বটে ; কিন্তু অন্তর্যামী ব্রহ্ম, কপটীর বাক্যে বিমোহিত হন না। তিনি হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তথায় প্রীতির কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে কি না। যদি হৃদয়ে ভালবাসা নিহিত থাকে, মুখে একটী বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অন্তর্যামী ঈশ্বর তাহার পূজা গ্রহণ করিবেন, সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা তাহার সাধনার সহায় হইবেন। আর হৃদয় প্রীতি শূন্য হইলে কণ্ঠ নির্গত ফাঁকা আওয়াজ আকাশ পাতাল স্পর্শ করিয়া যদি দশদিকে বিস্তৃত হয়, তথাপি মহান ঈশ্বরের আসন এক বিন্দু টলিবে না, সে আরাধনা তাঁহার দ্বারে পঁহুছিবে না। পবিত্র ঈশ্বর কপটতাকে প্রশ্রয় দেন না। তিনি সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম কথা শুনিতে চাহেন। মহাপাপী পাপ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সরল প্রাণে যখন ঈশ্বরকে স্মরণ করে, "হে কৃপাসিন্ধু পরিত্রাণ কর" এই বলিয়া যখন নয়নের এক বিন্দু জল বর্ষণ করে, তখন করুণাময় তাহার প্রতি কৃপাকণা বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। লক্ষ লক্ষ প্রাণী এইরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তবে আমরা পড়িয়া রহিলাম কেন, ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী হইয়া আসিয়াছিলাম, আজও সে ভিখারীর দশা ঘুচিল না। পিতৃ ধনে সন্তানের অধিকার, কিন্তু আমরা আজও পিতৃ কৃপার সম্পূর্ণ অধিকারী হইলাম না। কল্পতরু পিতার অবারিত দ্বার দিয়া যে পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারে না, ভিক্ষুকের বেশে দ্বার দেশে পড়িয়া থাকে, সে সরল বিশ্বাসী সন্তান নহে, সে কপটাচারে পিতার মন ভুলাইয়া পিতৃধনে অধিকারী হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। পিতা কপটীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না। আজও কপটাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারিলাম না বলিয়া আমাদিগের অনেকের এই দুর্দ্দশা। নতুবা ঈশ্বরের সেবক হইয়া কে কবে আমাদিগের মত দ্বার দেশে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা বাক্যের পূজা শিখিয়াছি, কিন্তু জীবনের পূজা শিখি নাই। প্রাণের সহিত কেমন করিয়া পিতাকে ভালবাসিতে হয় তাহা জানি না, আমরা তাঁহাকে স্তোভ বাক্যে ভুলাইয়া তাঁহার ধনে অধিকারী হইতে চাহি ; সর্ব্বজ্ঞ পিতার নিকট প্রবঞ্চনা করিয়া কে জয়ী হইতে পারে ? সেই হেতু আমাদিগের এই দুর্দ্দশা। প্রীতির প্রমাণ বাক্যে নহে, কার্য্যে। আমাদিগের ভালবাসা বাক্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া যদি কার্য্যে প্রদর্শিত হইত, করুণাময়ের পূর্ণ কৃপা আমাদিগের মস্তকে নিশ্চয় বর্ষিত হইত। প্রীতি হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত ভাব, কার্য্যে তাহার বিকাশ। এই হেতু ঋষিরা বলিয়াছেন ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উভয়ের অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনই ঈশ্বরোপাসনার মূলমন্ত্র। ব্রাহ্মসমাজ এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের অনেকের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, আমরা মন্ত্রভ্রষ্ট হইয়াছি। আমরা বাক্য ও কার্য্যের একতা সাধনে যত্নশীল নহি। বাক্যের আড়ম্বরে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে চাহিতেছি, কার্য্য অপেক্ষা বাক্য আমাদিগের ধর্ম্ম নিষ্ঠার পরিচায়ক হইতেছে। ইহা কি শোচনীয় অবস্থা নহে ; ইহাদ্বারা কি কপটাচার প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে না। বিষয় সুখের লালসায় যাহার হৃদয় সর্ব্বদা প্রধাবিত হইতেছে, যিনি ধন মানের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদা যদি এই সঙ্গীত নির্গত হয়, "বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে। তব চরণামৃত, পান পিপাসিত ; নাহি চাহি ধন জন মানে।" যাহার অতি সামান্য প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষমতা নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তা হীন, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে যিনি শরীরের এক বিন্দু রক্ত দান করিতে সমর্থ নহেন, তিনি যদি বলেন,

> "যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে;
> তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক এ জীবনে।
> নিত্য সত্যব্রত করিব পালন,
> মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।"

অথবা

> "জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে,
> মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিতে, সহজে ত্যজিব এই দেহে।"

তাহা হইলে উহার মত কপটাচার কি আছে ? অন্যত্র কপটাচারী হইলে সে পাপের ক্ষমা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের সমীপে যে কপটাচার করিতে সাহস করে তাহার পাপের ক্ষমা আছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মের জীবন যেরূপ বাক্য যেন তাহারই অনুরূপ হয়। আমরা যাহাতে কপটাচারের অপরাধে অপরাধী না হই, সে বিষয়ে আমাদিগের প্রত্যেকের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অকপটাচারী হইলে যদি আমরা অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণ্য হই তাহাও ভাল। তথাপি কৃত্রিম ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়া আমরা যেন জগৎকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী না হই। আমাদিগের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদিগের বাক্য সংযমনের একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। বাক্যে ব্রহ্ম পূজা অনেক করিয়াছি, জীবনে ব্রহ্ম পূজা যাহাতে করিতে পারি, ব্রাহ্মের জীবন যাহাতে অনুগত ব্রহ্মসন্তানের অনুরূপ হয়, একবার তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। নতুবা কেবল মাত্র

বাক্যের পূজা নিষ্ফল হইবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের পূজা করি কি না, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি কি না, তাহার প্রমাণ বাক্যে নহে, তাহার প্রিয়কার্য্য সাধনে। অপরের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আত্মজীবনের প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন দেখিতে পাই যে, ব্রহ্ম পূজার যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ছিলাম, সে মন্ত্র পালন করি নাই; মন্ত্র ভ্রষ্ট হইয়া এত দুর্গতি ভোগ করিতেছি। জীবনে যদি ব্রহ্ম পূজা করিতে পারিতাম, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" একথা যদি দৃঢ় বিশ্বাসীর ন্যায় বলিতে পারিতাম, পরম দেবতার প্রিয়কার্য্য সাধনে "যায় প্রাণ যাবে" একথা যদি অকপট চিত্তে উচ্চারণ করিতে পারিতাম, এত দিনে এদেশে ব্রহ্মের পূজা নিশ্চয়ই প্রচারিত হইত। যত দিন জীবনে ব্রহ্মপূজা করিতে অভ্যাস না করিব তত দিন আত্ম-দুর্গতি দূর হইবে না।

নিস্তরঙ্গ প্রেম।

প্রেমের দুই প্রকার অবস্থা আছে; এক তরঙ্গিত অবস্থা, আর একটী নিস্তরঙ্গ অবস্থা। শিশুর প্রতি জননীর যে স্নেহ তাহা কখনও তরঙ্গিত আকার ধারণ করে, কখনও বা নিস্তরঙ্গ অবস্থাতে থাকিয়া কার্য্য করে। কখনও দেখি জননী শিশুকে সোহাগ করিতেছেন; বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছেন; তাহার মুখে মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন; স্নেহপূর্ব্বক কত মধুর শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন; ইহা প্রেমের তরঙ্গিত অবস্থা, উচ্ছ্বসিত ভাব। কিন্তু এরূপ উচ্ছ্বসিত ভাব সদা সর্ব্বদা থাকে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জননী যখনই এবং যতবার সন্তানকে দেখেন ততবারই যে প্রেমের এরূপ উচ্ছ্বাস হয় তাহা নহে। সমস্তদিন তিনি গৃহ কার্য্যে রত রহিয়াছেন; খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন; গৃহের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন; আপনার মনে রন্ধনশালায় পাক করিতেছেন। শিশু দোলাতে ঘুমাইতেছে। জননী যখন চুম্বন করিতেছেন না, সোহাগ করিতেছেন না; শিশুকে বুকে ধরিতেছেন না, তখন কি বলিতে হইবে তাঁহার প্রেম নাই? উচ্ছ্বসিত ভাব না থাকিলে কি এই বলিয়া দুঃখিত হইবে যে তাঁহার প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছে? কখনই নহে। জননী যে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেও দেখা যায় সেই শিশুর পরিচর্য্যাই তাঁহার ব্যস্ততার একটী প্রধান কারণ। তিনি এই শিশুর জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন; তাঁহার স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য উপায় চিন্তা করিতেছেন। যে প্রেম উচ্ছ্বসিত আকারে এক সময় দেখা দিয়াছে, সেই প্রেমই এখন নিস্তরঙ্গ অবস্থাতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে খাটাইতেছে।

মানবসম্বন্ধীয় প্রেমের যেমন দুই ভাব ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রেমেরও সেই প্রকার দুই ভাব আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তরঙ্গিত প্রেম আছে এবং নিস্তরঙ্গ প্রেম আছে। কখনও কখনও ঈশ্বরের নামে ভক্তের অশ্রু, পুলক, মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে পারে, আবার কখনও বা সেই নিস্তরঙ্গ অবস্থাতে হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে চালাইতে পারে। প্রেমোচ্ছ্বাস যে সকল সময়ে থাকিবে এরূপ আশা করা কর্ত্তব্য নহে এবং সকল সময়ে না থাকিলেই যে ঈশ্বরপ্রীতি বিলুপ্ত হইল বলিয়া দুঃখ করিতে হইবে তাহাও নহে। সর্ব্বদা উচ্ছ্বাস না দেখিলে যে প্রেম অন্তর্হিত হয় তাহা নহে। দেখিতে হইবে সেই প্রেম নিস্তরঙ্গ অবস্থাতে হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে কিনা—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীতি তোমার প্রেরক হইয়া খাটাইতেছে কি না?

আমরা সংসারে দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোকের হৃদয়ের সকল ভাবই সহজে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। একদণ্ডে তাহাদের ভাব উথলিয়া উঠে, সজোরে কণ্ঠালিঙ্গন করে; হৃদয়ে বলপূর্ব্বক ধারণ করে, কত মিষ্ট সম্বোধন করে; একেবারে প্রেম মাখাইয়া দেয়। কিন্তু কার্য্যকালে সেই বন্ধুর প্রতি তত অনুরাগ দেখা যায় না; তাহার জন্য স্বার্থনাশ করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; কার্য্যে তাহার উপকার করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখা যায় না; তাহার একটা অনিষ্ট হইতেছে জানিয়া তাহা নিবারণের জন্য তত ব্যাকুলতা লক্ষিত হয় না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের বাহিরে প্রকাশ অল্প কিন্তু কাজে প্রেমের পরিচয় বেশী। বাহিরে বন্ধুকে হৃদয়ে ধরিয়া "তুমি আমার এমন, তুমি আমার তেমন" এরূপ বলে না বটে, কিন্তু তাহার রোগ শোক বিপদে চক্ষে জলধারা পড়ে; তাহার সহায়তার জন্য কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। সকলেই হয়ত বলিবেন এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীই শ্রেষ্ঠ। যে প্রেম কাজে উতরায় না সে প্রেমের গভীরতা অল্প।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও দুই শ্রেণীর সাধক আছেন। এক শ্রেণীর ভাব বাহিরে অধিক প্রকাশ পায়। তাঁহারা ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনে শ্রবণে অশ্রুপাত করেন, তাঁহার সহবাসে প্রাণের ভাবরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু ঈশ্বরের সেবা ও তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তাঁহারা অমনোযোগী; নীতির প্রভাব শিথিল; চরিত্রের উন্নতিসাধনে উদাসীন। কার্য্যে তাঁহাদের ঈশ্বর প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মার্থে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন; বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে সাহসে কুলায় না। অপর শ্রেণীর সাধকের বাহিরে সেরূপ প্রকাশ নাই। তাঁহারা ভাবকে সম্বরণ করেন, অশ্রু, হর্ষ পুলক প্রভৃতি বিষয় সকল বড় অধিক প্রকাশ পায় না; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বিবেক উজ্জ্বল; ঈশ্বরের আদেশ পালনে মনোযোগী; ও নীতির নিয়ম পালনে সর্ব্বদা সযত্ন। যে প্রেম কেবল তরঙ্গ ও উচ্ছ্বাসেই থাকে; হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনকে চালিত করে না, আমরা সে প্রেমের প্রার্থী নহি। আমরা মাতৃস্নেহের ন্যায় স্থায়ী প্রেমকে প্রার্থনীয় মনে করি। যাহা সময়ক্রমে তরঙ্গিত হইবে। আবার অপর সময়ে নিস্তরঙ্গ অবস্থাতে থাকিয়া আমাদের কার্য্য সকলকে চালাইবে।

যে ধর্ম্মভাব নীতি ও সদনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল ভাব মাত্রের পরিতৃপ্তির মধ্যে বাস করে, তাহার পোষণ করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে। নীতি ও সদনুষ্ঠানে যাহাতে স্বভাবতঃ প্রস্ফুটিত সেইরূপ ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সহিষ্ণু হইয়া সাধন কর।

যে মৃত্তিকা অতি কদর্য্য, যাহাতে জল লাগিলেই কর্দ্দমে পরিণত হয়; পায়ে লাগিলে লোকে যত্নপূর্ব্বক পদ ধৌত করে, যে মৃত্তিকাকে সকলেই অপকৃষ্ট বস্তু বলিয়া জানে, সেই মৃত্তিকা হইতেই সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকে; পঙ্ক হইতেই লাবণ্য-পূর্ণ সুবাসিত পদ্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? কোথায় পঙ্ক আর কোথায় পঙ্কজ! যে ধাতুতে পঙ্ক গঠিত কিরূপে সেই ধাতুর এত সংশোধন হয়, যে তাহা হইতে নিষ্কলঙ্ক পদ্ম ফুলটী ফুটিয়া উঠে। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন,—কদর্য্য মৃত্তিকা হইতে যদি সুন্দর গোলাপ হইতে পারে, তবে অচেতন জড় হইতে সচেতন জীব কেন হইতে পারিবে না?

কিন্তু সুন্দর ফুলটী যে ফুটে তাহা কি এক দিনে ঘটিয়া থাকে? ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া যাহারা প্রদর্শন করে তাহারা দশ মিনিটের মধ্যে আম পুতিয়া, গাছ করিয়া, ফল দেখাইয়া দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এমন ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া ঘটে না। প্রকৃতি চির সহিষ্ণু—যথা সময়ে বীজটী বপন কর; কতদিন পরে সুন্দর ফুলটী ফুটিল। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা!

জড় রাজ্যের সর্ব্বত্র এই নিয়ম। এই ধন ধান্য, পূর্ণা পৃথিবী এক দিনে বিবর্ত্তিত হয় নাই। কোন কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে ঈশ্বর সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা বলে না। বিজ্ঞান বলে আদিতে আকাশ ছিল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি। অগ্নির পর জল, জল হইতে পৃথিবী ক্রমে বহু বহু লক্ষ যুগে এই জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে; বহুকালের পরিশ্রমের পর কদর্য্যতার মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টিকে এমন সুন্দর করিতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে সহিষ্ণুতার সহিত কত যুগ কার্য্য করিতে হইয়াছে!

প্রাণী রাজ্যেও এই নিয়ম। এক দিনে জ্ঞান সম্পন্ন মানব সৃষ্টি রাজ্যে আবির্ভূত হয় নাই। প্রথমে একেন্দ্রিয় জীব, তৎপরে দুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্টজীব, এইরূপে বহু যুগব্যাপী বিবর্ত্তনের পর পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন মানব অভ্যুদিত হইয়াছে। মানবের মহত্ত্ব বহুকাল ব্যাপী সংগ্রাম ও চেষ্টার ফল।

এই সকলের দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে সহিষ্ণুতাই শিক্ষা দিতেছেন। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে এই মহাসত্যটী স্মরণ রাখিলে আমরা অনেক সময়ে নিরাশার হস্ত হইতে বাঁচিতে পারি। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাবে কখন কখনও আপনাকে ধনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে; সেইরূপ এক জন নিকৃষ্ট ব্যক্তিও কখন কখনও চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাতে সপ্তম স্বর্গে উঠিতে পারে; কিন্তু কার্য্যে সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করা, দীর্ঘকাল ও বহু সাধন সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর কোন সুপ্রসিদ্ধ বক্তার ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া একজন বালকের ইচ্ছা হইল যে সেও সেইরূপ শক্তি লাভ করে। এরূপ ইচ্ছা হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, বরং স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই শক্তি লাভ করিতে হইলে, তাহাকে এ, বি, সি, পড়িতে হইবে; শিক্ষকের সাহায্য লইতে হইবে; অনেক তিরস্কার ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; ডিক্‌সনারি দেখিতে হইবে; স্মৃতিকে ক্লেশ দিতে হইবে; বহুবৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে; ইংরাজী সাহিত্য মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে। তবে সেই শক্তি জন্মিবে।

সেইরূপ একব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতে পারে "আমাকে একদিনে কাম ক্রোধের হাত হইতে মুক্ত কর; ঈশার ন্যায় বিশ্বাসী কর; বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞানী কর; চৈতন্যের ন্যায় প্রেমিক কর; ইত্যাদি সে ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেই যে ঈশ্বর তাহা পূর্ণ করিবেন তাহা নয়। তাঁহার রাজ্যের এরূপ নিয়ম নয় যে রাতারাতি কেহ স্বর্গে যাইবে। তিনি আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন যে সহিষ্ণুতা সহকারে কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্যকে বিকাশ করিতে হইবে। যদি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন চাও দীর্ঘকাল তাঁহার অনুগত থাকিয়া সাধন করিতে হইবে।

আমরা অনেকের জীবন দেখিয়াছি যে যখন তাঁহারা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন; যখন তাঁহাদের ইচ্ছা পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথকে আশ্রয় করিয়াছে; যখন তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তখনও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের পুরাতন শত্রুগণ, তাঁহাদের পুরাতন পাপ ও দুর্ব্বলতা সকল সময়ে সময়ে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করে। এরূপ অবস্থা অতিশয় নিরাশা জনক। এরূপ অবস্থাতে পড়িয়া, মানুষ বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে, তবে কি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিলেন না? কই আমি ত রিপুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম না। ঈশ্বরের দ্বারে এত ক্রন্দন করিলাম, পাপের জন্য এত অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম তথাপিও আমার নিষ্কৃতি নাই। তবে কি আমি এই নিদারুণ দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না? তবে কি আমার পক্ষে আর উদ্ধারের আশা নাই। এইরূপ নিরাশা যখন হৃদয়কে আক্রমণ করে, তখন যদি স্মরণ করা যায়, যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এই যে আমরা সংগ্রামের ভিতরে থাকিয়া সাধন করিব। তাহা হইলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে পুরাতন রিপুকুলের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেন তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্তরে অনুভব করি, যে পাপের দাসত্ব এমনি ভয়ানক ব্যাপার যে কিছুদিন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে অভ্যস্ত হইলে সহজে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থাতে যতই পুরাতন পাপকে দেখিয়া আমাদের যাতনা হয়, ততই তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা বর্দ্ধিত হয়। ততই তাহার বীভৎস মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ের বিরক্তি জনক হইতে থাকে। ইহা কি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে? অতএব সে প্রকার অবস্থাতেও আমাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যেরূপ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। অনেকে এই বলিয়া দুঃখ করেন "যে ব্রাহ্মসমাজ আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে না।" কিরূপ মৃত্তিকাতে কিরূপ বীজ পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। আমরা কিরূপ

ধাতুর লোক, বহু শতাব্দীর পরাধীনতা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে আমরা কিরূপ জিনিসে দাঁড়াইয়াছি, তাহা মনে থাকিলে, তাহাদিগকে এত নিরাশ হইতে হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বহুকাল ধরিয়া নানা প্রকার দুর্গতির মধ্যে বাস করিয়া আমরা প্রধানতঃ তিনটী গুণ হারাইয়া ফেলিয়াছি অথবা আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রধান তিনটী দোষ জন্মিয়াছে;—(১ম) সৎসাহসের অভাব—(২য়) কর্ত্তব্য জ্ঞানের শিথিলতা (৩য়) পরার্থপ্রবৃত্তির অভাব। আমাদের এমনি দুরবস্থা হইয়াছে, যে আমরা যাহাকে সৎ বলিয়া অনুভব করি, তাহাকে অবলম্বন করিতে সাহসে কুলায় না। জাতির ভয়ে সকলকেই জড় সড় হইয়া থাকিতে হয়। এদেশে সমাজ-শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা যে কার্য্য অবলম্বন করি তাহাতে দায়িত্বজ্ঞান থাকে না; এই জন্য কোন কার্য্যই আমাদের সমুচিতরূপে চলে না; কর্ত্তব্যপ্রিয়তা আমাদের হৃদয়ে অতি দুর্ব্বল। যে কার্য্যের ভার লইয়াছি তাহা আমাকে সুচারুপে করিতে হইবে এজ্ঞান না থাকাতে মজুরকে কাজে লাগাইয়া পাহারা রাখিতে হয়, রাজমিস্ত্রিকে নিযুক্ত করিয়া তত্ত্বাবধায়ক রাখিতে হয়; গ্রন্থখানি ছাপিতে দিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়; এইরূপে লোকের কর্ত্তব্য জ্ঞানের শিথিলতা নিবন্ধন কত শক্তি, কত অর্থ, কত সময় ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দশা এই প্রকার দাঁড়াইয়াছে। পরার্থ প্রবৃত্তি ও আমাদের অন্তরে অতি ক্ষীণ ভাব ধারণ করিয়াছে, দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি যেমন কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকে, আমরাও সেইরূপ স্বার্থ চিন্তাতে নিমগ্ন রহিয়াছি। এই ভুমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিহিত হইয়াছে। কিরূপে আশা কর যে দুই দিনে আকাঙ্ক্ষার ন্যায় উন্নতি দেখা যাইবে। সহিষ্ণুতার সহিত সাধন কর; ঈশ্বরের অনুগত থাক সুদিন সময়ে আসিবে।

সদুক্তি-সংগ্রহ।

কোরিন্থবাসিদিগের প্রতি পত্রে সেণ্টপল বলিতেছেন—"যদি আমি মানবের বা দেব লোকের ভাষাতে কথা কহি; কিন্তু যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে আমার সে ভাষা অন্তঃসার শূন্য তাম্র পাত্রের শব্দের ন্যায়। যদি আমার প্রচুর বাক্ শক্তি থাকে এবং দৈবজ্ঞের শক্তি আমি পাই, যদি আমি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য সকল অবগত হই এবং সমগ্র জ্ঞানকে অধিকার করি; এবং যদ্দারা পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইতে পারে এমন বিশ্বাসও থাকে; আর হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তাহা হইলে আমি অপদার্থের ন্যায়, আমার কিছুই মূল্য নাই। যদি আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণার্থ অর্পণ করি এবং আমার দেহকে অগ্নিতে ভস্ম হইতে দি। কিন্তু অন্তরে প্রেম না থাকে, তদ্দারা আমার কোন উপকার নাই। প্রেম দীর্ঘকাল সহ্য করে; অথচ সদয় থাকে; প্রেম ঈর্ষ্যা করে না; প্রেম গর্ব্বে স্ফীত হয় না; প্রেম অভদ্র ব্যবহার করে না; প্রেম স্বার্থকে অন্বেষণ করে না; প্রেম সহজে কুপিত হয় না; অপরাধ মনে রাখে না; অধর্ম্মাচরণে আনন্দিত হয় না; কিন্তু সত্যেতেই পরিতৃপ্ত হয়। প্রেম সমুদায় বহন করে; সমুদায় বিশ্বাস করে; সমুদায় আশা করে এবং সমুদায় সহ্য করে।"

কোরিন্থীয় প্রথম পত্র ১৩ পরিচ্ছেদ।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। *

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—ইংরাজীতে বলিতে হইলে Breath of Life বলিতে হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দেশে তিনটী প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা গিয়াছে; সেই তিনটী আন্দোলন হইতে অনেক চিন্তার বিষয় পাওয়া গিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ সমাগত সকলকে বলিতে ইচ্ছা করি। যখন লর্ড রিপন দেশ হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, প্রথম আন্দোলনটী সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। যে দিন তিনি বোম্বাই পরিত্যাগ করেন সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতাতে তাঁহাকে যেরূপ সমারোহের সহিত বিদায় দেওয়া হয়,লোকের মনে যে গভীর উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয় এবং যে উৎসাহ স্রোতে নগর প্লাবিত হইয়া উঠে, তাহা নিজে দেখি নাই, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু বোম্বাই থাকিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে নানা গভীর চিন্তার উদয় হইয়াছিল। এমন কি আমাদের বিদ্বেষী "পাইওনিয়ারে" সম্ভবতঃ কলভিন সাহেব লিখিয়াছিলেন "If it is real what does it mean" অর্থাৎ যদি ইহা সত্য হয় তবে ইহার অর্থ কি? ইহাতে প্রমাণ হয় যে সে সময় গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্তও এই দেশব্যাপী আন্দোলন দৃষ্টে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোম্বাইএ উপস্থিত থাকিয়া যে রূপ অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়াছি, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব। এইরূপ ঘটনা যে তথায় ঘটিতে পারে ছ মাস পূর্ব্বে তাহা কেহ চিন্তাও করিতে পারেন নাই। ইহারই কিছুকাল পূর্ব্বে, তথায় ভারত সভার ন্যায় কোনও সভা স্থাপিত হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে তথাকার কয়েক জন প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করি। তাঁহাদের অনেকেই বলেন, তথায় এত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস, তাহারা পরস্পরের এরূপ ঘোর বিদ্বেষী, যে তাহাদের সকলকে একত্রিত করা দুঃসাধ্য। এক বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রীয় পার্শী, গুজরাটী কেনারী; প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করেন। সেই সকল প্রধান প্রধান লোক (কাশীনাথ ত্রম্বকৃতেলাং মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে মনে হইতেছে) বলেন যে বোম্বাইএ এত বিভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন রুচির লোকের বাস যে সেখানে সকল শ্রেণীর লোক লইয়া একত্রে কাজ করা অসম্ভব। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমরা সে উদ্যোগ পরিত্যাগ করি। কিন্তু সেই বোম্বাইএ লর্ড রিপণকে বিদায় দিবার দিনে দুটী বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম আশ্চর্য্য ঐক্য ভাব। দেখা গেল মহারাষ্ট্রীয়, পারশী, গুজরাটী, মুসলমান প্রভৃতি সকলে পরস্পরের বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া এক হৃদয়ে এক প্রাণে এই অভূত পূর্ব্ব একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। পুরুষ, স্ত্রী, হিন্দু, মুসলমান,

* গত ৬ই এপ্রিল তারিখে ছাত্রসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

গুজরাটী সকলে উৎসাহে মত্তপ্রায়; শত শত ভদ্র মহিলা উৎসাহে মত্তপ্রায়। যে সব বড় বড় রাস্তা দিয়া রিপনের যাইবার কথা ছিল তথায় ভদ্রমহিলাদিগের বসিবার আসন ছিল। কারণ তথায় বাঙ্গালার ন্যায় অবরোধ প্রথা নাই। সেই আসনে শত শত ভদ্র মহিলা বসিয়া আছেন। রিপনের যাইবার সময় উৎসাহ ধ্বনি করিতেছেন। একজন অগ্রসর হইয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। স্ত্রী, পুরুষ সকলে উৎসাহে মত্ত, বিদ্বেষভাব পরিহার করিয়া সকলে মহাকার্য্যে উৎসাহী। সমস্ত দিন নগর ভ্রমণ করিলাম, আর বন্ধুদিগকে বলিতে লাগিলাম বোম্বাইএ এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কখনও দেখিয়াছেন কি না। সকলেই বলিলেন, না।

দ্বিতীয় পরিচয় Power of organisation অর্থাৎ সমবায় শক্তি। সমবেতভাবে কার্য্য করার শক্তি বিষয়ে ভারতবাসী বড় হীন। Power of organisation অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ যোজনা করিয়া, বিভিন্ন শক্তি একত্রিত করিয়া সমাজ গঠন সম্বন্ধে ভারতবাসী নিতান্ত হীন। ইংরাজ বিশেতঃ আমেরিকান্‌রা এ বিষয়ে বড় অগ্রসর। সমাজের বিভিন্ন শক্তিকে একত্র যোজনা করিয়া মহৎ কাজ করাই organisation। যেমন আলপিন্ নির্ম্মাণ—এক জন তার পরিষ্কার করিতেছে, এক জন আলপিন্ গঠন করিতেছে, এক জন তাহা সাজাইতেছে—এইরূপ শ্রম বিভাগ করিয়া সমবেত ভাবে কার্য্য করিয়া অতি সহজে কাজটী নির্ব্বাহ করিতেছে। আবার দেখুন কাপড়ের কল এক স্থানে তুলা প্রস্তুত হইতেছে, এক স্থানে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, এক জনে সূতা প্রস্তুত করিতেছে। এই বিভিন্ন অঙ্গ, বিভিন্ন কার্য্য ও বিভিন্ন লোকের পরিশ্রম একত্রিত করিয়া মহৎ কাজ সম্পন্ন হইতেছে। organisation—ইংরাজগণ এবিষয়ে বড় অগ্রসর। তাহারা যে এদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ও শাসন করিতেছেন তাহা ইহারই বলে। তাঁহাদের এই সমবায় শক্তির প্রমাণ এ দেশেও অনেক পাওয়া যায়। যেমন পোষ্ট অফিস্। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ একত্রে এই বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

বহুদিন হইতে সংস্কার আছে, এবং এই সংস্কারে সত্যও আছে, যে এই দেশের লোক সমবায় শক্তি সম্বন্ধে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যথার্থই জাতিভেদ প্রচলিত থাকাতে সমাজের লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই দেশে অনেক দেব মন্দির আছে, এই দেশের লোকের বিদ্যা ও বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা সমস্তই এক এক ব্যক্তির যত্নের ফল। দশ জনের ক্ষুদ্র শক্তি ও অর্থে সমাজের কোনও মহৎ কাজ এ দেশে হয় নাই। কিন্তু সে দিন বোম্বাইএ দেখিলাম, এই সমবেত শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে কোনও ইংরাজের সাহায্য ছিল না, মিউনিসিপালিটির হাত ছিল না, সকলে একত্রে সভা করিয়া একত্রে পরামর্শ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহাতেই ইংরাজগণ গভীর চিন্তায় পড়িয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এ দেশে কাজের উপাদান রহিয়াছে, ব্যবহার করিলেই হয়। প্রথম রাজনৈতিক ঘটনাটী এই।

দ্বিতীয়টী—যখন বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হন সেই সময়কার। সেই সময়ে আমরা এই নগরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুড়ি হাজার লোকে সভা করিয়াছিলাম। প্রথমে টাউন হলে সভা করিবার কথা হয়, কিন্তু যাহাতে আমাদের সভা না হইতে পারে সেই জন্য মিউনিসিপালিটীর সভাপতি তাহা দিলেন না। যেদিন সভা হইবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রে খবর পাই যে টাউন হলে সভা হইতে পারিবে না। প্রভাতে সকলে কোনও বড়মানুষের বাটীতে সভার স্থান হয় কি না, তাহার চেষ্টায় বাহির হইলেন। ৮৷৯ টা পর্য্যন্ত কোনও স্থান পাওয়া গেল না। ১০৷১১ টার সময় স্থির হইল অনাথ বাবুর বাড়ীর মাঠে সভা হইবে। তার পর পাঁচটার সময় বিশ হাজার লোক লইয়া আমরা সভা করিলাম। তখন অল্প সময়ের মধ্যে এই যে সভা হইল, তাহার মধ্যে এই ভাবটী দেখি। সেই সময় দেখিয়াছি হিন্দু, মুসলমান পরস্পরের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া একত্রে কাজ করিতে পারেন।

তৃতীয় রাজনৈতিক ঘটনা এলাহাবাদে National Congress। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। দূরে থাকিয়া যাহা শুনিয়াছি তাহাতেই একতা ও সমবেত শক্তির প্রকাশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তথায় প্রতিনিধিগণের থাকিবার যে বন্দোবস্ত হয়, যে রূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার প্রশংসা সর্ব্বত্র শুনিতে পাই।

এই তিনটী আন্দোলনে একতা ও সমবেত শক্তির প্রকাশ দেখা গিয়াছে। এই তিনটী ঘটনা হইতে এই একটী আভাস পাই যে যে উপাদানে জাতীয় মহত্ত্ব গঠিত হইতে পারে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, একটী জাতি বড় হইতে পারে, তাহা এই জমিতে, এই ভারতবর্ষের নর নারীর হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। এই উপাদান হইতেই জাতীয় মহত্ত্ব গঠিত হইতে পারে; তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। একতা ও সমবেত শক্তির একটু পরিচয় পাইয়াছি। তবে এখন প্রশ্ন এই যে, সমস্ত উপাদান যদি থাকিয়া থাকে, তবে অন্য সময় তাহার ফল দেখা যায় না কেন? এই একতা ও সমবেত শক্তির কার্য্য অন্য সময় দৃষ্ট হয় না কেন? গূঢ় রূপে কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, মাল মসলা আছে বটে, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, এমন শক্তি নাই। যে তিনটী রাজনৈতিক আন্দোলনের উল্লেখ করিতেছি তাহার মূলে স্বজাতি প্রেম ছিল। ইলবার্ট বিল ও অন্যান্য কারণে স্বজাতি প্রেম অগ্নি শিখার ন্যায় সকলের হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। তাহাই এই শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছিল যদি এই স্বজাতি প্রেম স্থায়ী হইত, উদ্দীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় প্রেম শিখা যদি সকলের হৃদয়ে স্থায়ী হইত, তবে তাহা হইতে আমরা স্থায়ী ফল দেখিতে পাইতাম।

National congress এই স্বজাতি প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছে। এই জন্যই হীন বীর্য্য উৎসাহহীন ঐক্যহীন ভারতবাসীর মধ্যেও এই প্রেম শক্তির আবির্ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতেই দেখিতে পাইতেছি, এই নিদ্রিত জাতীয় শক্তি ও প্রেম শক্তির মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। প্রেম থাকিলে এই উপাদান হইতেই শক্তি বিকাশ পাইতে পারে। বৃক্ষের কথা ভাবিয়া দেখুন। বীজ যখন মাটিতে রোপিত হয়, তখন সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, যদি বৃক্ষদেহ পুষ্টির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্ত

মাটিতে বিদ্যমান থাকে। ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে বৃক্ষের পুষ্টি হয়। বীজে জীবনী শক্তি আছে বলিয়া ইহা উপাদান সংগ্রহ করিয়া অঙ্কুর গঠন করে। জীবন্ত বীজ রোপণ না করিয়া মৃত বীজ রোপণ করিলে, জল, উত্তাপ সমস্ত বিদ্যমান থাকিলেও তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে না। যেমন বীজের জীবন্ত শক্তি সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ গঠন করে, তদ্রূপ এই প্রেম যখন বিদ্যমান থাকে তখন জাতীয় মহত্ত্ব গঠিত হয়। আর যদি প্রেম না থাকে তবে অর্থ ঘুমায়, মানুষ দ্বারা কোনও কাজ হয় না, সময় বৃথা বহিয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত অপেক্ষা প্রেমই প্রধান, ক্ষিত্যপ্তেজ আদি পঞ্চভূত অপেক্ষা বীজের জীবনী শক্তিই প্রধান। জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় সংস্কার বিষয়ে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত উপাদান অপেক্ষা প্রেমই প্রধান। এই প্রেম শক্তিতে আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। আপনারা সকলে ভেল্কিবাজী দেখিয়াছেন; আধ ঘণ্টার মধ্যে ধূলী হইতে আম গাছ হয়। এক মুষ্টি ধূলা ছিল, "লাগ ভেল্কি লাগ" বলিয়া ছাড়িয়া দিল, আর তাহা হইতে সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইল। আমরা দেখিয়াছি পৃথিবীতে সাধুগণ, ধর্ম্ম সংস্কারকগণ এইরূপ ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গুরুগোবিন্দ, মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এই দেশে কিরূপ উপাদান ছিল। তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে দেশ নিমগ্ন, ভক্তি শুষ্ক, নবনারীর হৃদয় শুষ্ক, বাহিরের ক্রিয়া কলাপে মানুষ নিমগ্ন। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে সমস্ত দেশ পরিব্যাপ্ত, এমন সময়ে চৈতন্য উদিত হইলেন, "লাগ ভেল্কি লাগ" বলিতেই শুষ্ক মরুতে প্রেমনদী বহিল, ভক্তির আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। ভেল্কিদ্বারা মাটী হইতে আম উৎপাদন করা আর তান্ত্রিক ভাবপূর্ণ দেশে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত করা একই রূপ। গুরুগোবিন্দ ও নানকের কাজও এই প্রকার। 'আপনারা সকলেই শিখদিগের প্রশংসা শুনিয়াছেন; ইংরেজরাও তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। শিখগণ পূর্ব্বে কোথায় ছিল? পঞ্জাবে এই বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বে ছিল না। যাহা ছিল তাহা হইতেই গুরুগোবিন্দ এই বিক্রমশালী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। মহম্মদ কর্ত্তৃক আরবের পবিবর্ত্তনও এইরূপ অদ্ভুত। মহম্মদের আবির্ভাবের সময়ে আরবের অবস্থা সকলে জানেন। দস্যুতা, রক্তপাত এই সকলে আরবগণ মত্ত ছিল। মায়াবীর ন্যায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিত। জ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না। এই জাতিকে হাতে পাইয়া মহম্মদ একশত বৎসরের মধ্যে তাহাদের চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ভিতরকার সংবাদ এই যে তাঁহারা প্রেমাগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বাহিরের সংস্কার করিতে বলেন নাই, কিন্তু মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রেমের আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। অনেক সমাজ সংস্কারক এই সত্য ভুলিয়া যান। তাঁহারা মনে করেন যেন রতি, মাসা, তোলা হিসাবে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া সমাজ সংস্কার করিবেন। যাঁহারা আজ কাল হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন, তাহাদের মতে এত টুকু জ্ঞান চাই, এত টুকু সত্য চাই, এত টুকু প্রেম চাই। তাঁহাদের সংস্কারের ভাব শুনিলে মনে হয় যেন পাঁচ জনে বিচার করিয়া ঠিক করিবেন কোনটী কতটুকু রাখা প্রয়োজন। এইরূপে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা আর গাছের মূল কাটিয়া শাখায় জল দেওয়া একই কথা। মানবহৃদয়ের প্রেম, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন না করিলে, মানবের হৃদয় বদলাইয়া না দিলে বুদ্ধির চালনিতে চালিয়া, সকলে যোগ সাযোগ করিয়া কখনও সমাজ সংস্কার করা যাইতে পারে না। এই জন্যই তাঁহাদের সংস্কারের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকের প্রস্তাব শুনিলে হাঁসি পায়। তাঁহারা বলিলেন জাতিভেদ মন্দ, কিন্তু একেবারেই সব ভাঙ্গিলে চলিবে না, সুতরাং আপাততঃ রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিবাহ প্রচলিত হইলে ভাল হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া, সকলে মিলিয়া Resolution করিয়া কখনও এ কাজ করা যায় না। বুদ্ধির চালুনিতে কখনও সমাজ সংস্কার হয় নাই। আপনারা অনেকেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার একবার জগৎকে একটী নূতন ধর্ম্ম দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বহু চিন্তার পর কাগজে পরিস্কার করিয়া একটী নূতন ধর্ম্ম লিখিলেন। State deeds এর ন্যায় পরিষ্কার রূপে নানা স্থান হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রণয়ন করিলেন। তাহাতে হিসাব মত সত্য প্রেম সকলই ছিল। সব হইয়াছিল, কিন্তু একজনও সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণও সে ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন না। সকলেই প্রশংসা করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মটী বেশ লেখা হইয়াছে কিন্তু কেহই সে ধর্ম্ম লইতে চাহিলেন না। Franklin বিষয়ী লোক ছিলেন, হৃদয়ে অগ্নি ছিল না, তাই বুদ্ধির চালুনিতে ঘরে বসিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে হইবে কেন প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া মানব হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া না দিলে, আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিয়া মন বদলাইয়া না দিলে, কখনও সংস্কার হইতে পারে না।

এ দেশে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। সকলে মনে করিয়াছিলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ করিতে পারিলে আর কোনও গোল থাকিবে না। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ তুলিয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু কাজের সময় কিছুই হইল না। আমরা বুদ্ধি দিতে পারি, প্রাণ ত আর দিতে পারি না। জ্ঞান দিতে পারি, সাহস ত আর দিতে পারি না। জ্ঞান যেন দিলাম কিন্তু ভিরুকে সাহসী করে কে? সে শক্তি দেয় কে? মনুষ্যত্ব না থাকিলে সব বৃথা। কোথায় আটকাইয়াছে?

আজ স্থির করা গেল, বাল্য বিবাহ মন্দ, কিন্তু সাহস কোথায়? বল কোথায়? যে হাঁটুতে বসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে ধরিয়া তোলে কে? তাহাকে দাঁড়াইবার শক্তি দেয় কে? এই জন্যই সমস্ত সংস্কারের কথা বৃথা হইয়াছে। প্রেম যদি হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া না দেয়, তবে উপাদান ঘরে পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে কোনও কাজ হইবে না। রতি মাসা হিসাবে এত বিনয় চাই, এত সাধুতা চাই—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্—এইরূপে কখনও সাধুজীবন লাভ করা যায় না। যে প্রেমের সহিত সাধুতাকে আলি-

ঙ্গন করে, এ তাহারই কাজ। তাহার কথা সাধু হয়, দৃষ্টি সাধু হয়, ব্যবহার সাধু হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সমস্ত স্বাভাবিক হইয়া যায়। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার করিতে হইলে প্রেম পূর্ণ প্রাণ চাই। ইট আছে, চুণ আছে, কিন্তু জল না থাকিলে কি কখনও ঘর হইতে পারে? ইহাদিগকে বাঁধে কে? সব মিশায় কে?—জল। তেমনি প্রেম, সেই আধ্যাত্মিক শক্তি। ইহা না থাকিলে ধনবল, জনবল সমস্ত সত্তেও কোন কাজ হইবে না। এই জন্য প্রেমই প্রাণ। যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণই দেহ কাজ করে। এই জীবনী শক্তির অভাবে কোনও কাজ হয় না। ব্রাহ্ম সমাজ এই জীবনী শক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কথা বিশেষ রূপে হয় না। বেদী হইতে কখনও বাল্য বিবাহ বিধবা বিবাহ প্রভৃতির সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয় না। অধিকাংশ উপদেশেই বলা হয়; ঈশ্বরকে হৃদয় দেও, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, অনুতাপ কর, জীবন পবিত্র কর। অথচ ফলে কি দেখিতেছি? রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্রাহ্মগণ উৎসাহী, সমাজ সংস্কারে ব্রাহ্মগণ অগ্রসর। আগে প্রাণ দেও, কাজ দেখিতে পাইবে। আগে প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া দেও, সে ভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ইহার প্রমাণ। আমরা যদি এই পথে থাকিতে পারি সব হইবে। ১৮৭২ সনে এক জন ইংরেজ বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হইবে। আমারও বিশ্বাস তাই। যে শক্তি রাজনৈতিক সংস্কারে ব্রাহ্মভাব আনয়ন করিয়াছে, তাহা এই ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি। সমাজ সংস্কার এই শক্তি দ্বারাই হইতেছে—এই শক্তি বিধাতার শক্তি। প্রভু পরমেশ্বর এই শক্তি লাভে আমাদের সহায় হউন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

"তত্ত্বকৌমুদীর" বিগত সংখ্যায় "বিধানবাদ" সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, এই গুরুতর বিষয়টীর প্রকাশ্য আলোচনা অতি আবশ্যক; আদিনাথ বাবুর পত্রে এই আলোচনার অবতারণা হইল। আদিনাথ বাবু যে মতের সমালোচনা করিয়াছেন, আমি, অনেকের মধ্যে, সেই মতাবলম্বী একজন। কিন্তু এই মতাবলম্বী দিগের উপর তিনি যে সমস্ত উক্তি ও সিদ্ধান্ত আরোপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক গুলিই আমি স্বীকার করি না; সুতরাং সেই সকল উক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার বোধ হয় যে আদিনাথ বাবু তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের পুস্তক প্রবন্ধাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাঁহাদের উপর ঐ সকল উক্তিও সিদ্ধান্ত আরোপ করিতেন না। যাহা হউক, আমি যত দূর সংক্ষেপে পারি, আদিনাথ বাবুর কোন কোন কথার উত্তর দিব।

বিধানবাদ সম্বন্ধে আদিনাথ বাবু ও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের পার্থক্যের মূল এক স্থানে; সেই স্থানটী—ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা। আদিনাথ বাবু তাঁহার পত্রের অনেক স্থানে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের মত অসত্য। কিন্তু আমার বোধ যে এই সত্যটী স্বীকার করিয়াও তিনি প্রকারান্তরে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ এই সত্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করাতেই আমাদের মতের সঙ্গে তাঁহার যত বিরোধ। এই সত্যটী যে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই, তাহা তাঁহার কতিপয় উক্তি হইতেই আমি প্রমাণ করিতেছি। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন—"বাস্তবিক ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নাই. তিনি নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং বিধান ও তাঁহার নিত্য নূতন নয়, কিন্তু একই ভাবে তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান।" বাস্তবিক তাহাই কি? প্রকৃত কথা কি এই নয় যে ঈশ্বরের জ্ঞানে সমুদায়ই পুরাতন, সমুদায়ই নিত্য বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য নিত্য নূতন। তিনি আজ যাহা করিতেছেন পূর্ব্বে কোন দিন তাহা করেন নাই; এখন যাহা করিতেছেন, কখনও তাহা করেন নাই। কালের প্রকৃতিই এই যে ইহা নিত্য নূতন, এবং ইহার উপকরণ যে কার্য্য তাহা ও নিত্য নূতন। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, সে সমস্তই তাঁহার জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং তিনি জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও পুণ্যে পরিপূর্ণ অক্ষয় অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও এক অর্থে—নিত্য ক্রিয়শীলতার অর্থে—তাঁহাকে পরিবর্ত্তনশীল বলিলে কোন ক্ষতি হয় না। যিনি কাল-স্রোতের রচয়িতা, সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশকর্ত্তা, তিনি এই অর্থে পরিবর্ত্তনশীল না হইয়া থাকিতে পারেন না। কেহ কেহ হয়তঃ বলিতে পারেন যে তাঁহার কার্য্যই পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহাকে বল কেন? বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাঁহার কার্য্য পরিবর্ত্তনশীল, তিনি নিজেও এক অর্থে পরিবর্ত্তনশীল। ঈশ্বর একটী জীব সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ এমন একটী কার্য্য করিলেন যাহা পূর্ব্বে করেন নাই; ইহাতেই বুঝা গেল যে এই জীব সৃষ্টিরূপ বিশেষ কার্য্যটী সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এখন ক্রিয়াবান হইলেন, অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে ক্রিয়াশীল অবস্থায় (নিজ শক্তিতেই) পরিবর্ত্তিত হইলেন। এইরূপে প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধেই দেখান যায় ঈশ্বর যে কার্য্যটী পূর্ব্বে করেন নাই, এখন করিলেন, এই কথা বলিতে গেলেই তাঁহাকে এক অর্থে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মানিতে হইবে। সৃষ্টি মানিতে গেলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। এই সব দেখিয়াই বৈদান্তিকেরা তাঁহাদের পরব্রহ্মে নিষ্ক্রিয়তা আরোপ করেন, এবং সৃষ্টি ব্যাপারটাকে মিথ্যা মায়াময় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমরা যখন এরূপ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে বিশ্বাস করি না এবং সৃষ্টি ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়া মানি, তখন "অমুক মতে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয়তা

অস্বীকার করা হইতেছে" এই ধূয়া তুলিয়া কোন কথারই মীমাংসা হইতে পারে না। আদিনাথ বাবু যে ঈশ্বরের নিত্য-ক্রিয়াশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না, মানবের উন্নতি বিষয়ে তিনি যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতা অতি অল্পই স্বীকার করেন, তাহার আর একটী স্পষ্টতর প্রমাণ তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—"বিধান বলিলে আমরা এই বুঝি যে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর মানবাত্মার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কল্যাণ সাধনোপযোগী সমস্ত প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা হৃদয়রূপ শাস্ত্রে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি যাহা লাভ করিতে পারিলে মানবাত্মার প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে, এবং যাহা লাভ করিলে সে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারে, ঈশ্বর প্রথম হইতে আত্মায় সে সকল বিধান করিয়া শিক্ষাদাতা ও সাহায্যদাতা রূপে নিত্য সঙ্গী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" এই মতই সমস্ত বিরোধের মূল। জিজ্ঞাসা করি যদি ঈশ্বর আমাদের "সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই" সমস্ত বিধি ব্যবস্থা হৃদয়রূপ শাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন, এবং "প্রথম হইতেই" আত্মাতে উন্নতির উপযোগী সমুদায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তবে আর নিত্যক্রিয়াশীলতার প্রয়োজনই বা কি, অর্থই বা কি? আর প্রথমে এত করিয়া আবার "শিক্ষাদাতা ও সাহায্যদাতা রূপে নিত্যসঙ্গী হইয়া অবস্থিতি" করিবারই প্রয়োজন কি? যুগে যুগে নূতন নূতন বিধি প্রচার করিলে যদি ঈশ্বরের পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপূর্ণতা প্রকাশ পায়, তবে প্রথম হইতে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আত্মাতে লিখিয়া রাখিয়া এবং উন্নতির উপযোগী সমস্ত বিধান করিয়া আবার শিক্ষা ও সাহায্য দিতে আসাতে কি পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপূর্ণতা প্রকাশ পায় না? তিনি কি প্রথম হইতেই এমন বিধান করিতে পারিলেন না,—মানবকে এমন ভাবে গঠন করিতে পারিলেন না—যে তাহার যে কোন শিক্ষা ও সাহায্য আবশ্যক হইবে, তাহা সে নিজ প্রকৃতি হইতেই পাইবে? আদিনাথ বাবু হৃদয়-নিহিত বিধি ব্যবস্থা ও প্রাথমিক বিধান সম্বন্ধে যে ভাবে বলিয়াছেন তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঈশ্বর সৃষ্টি কালেই এরূপ বিধান করিতে পারিতেন, যাহাতে পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকিত না। বাস্তবিক এরূপ মত অনেকে মানিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ এইমত হইতে যুক্তির নিয়মানুসারে এই সিদ্ধান্তও করেন যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই। ফলতঃ আদিনাথ বাবুর প্রকৃত বিশ্বাস যাহাই হউক, তাঁহার উপরোক্ত উক্তি এক দিকে ঈশ্বরের নিত্য-ক্রিয়াশীলতা এবং অপর দিকে প্রার্থনাবাদের প্রবল বিরোধী। সমস্ত বিধি ব্যবস্থা ও উন্নতির বিধান যদি প্রথম হইতেই হইয়া রহিল, তবে পরবর্ত্তী সময়ে ঈশ্বরের সাহায্যেরই বা অর্থ কি, আর তাঁহার নিকট প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি?

যাহা হউক, এখন উক্ত মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ঈশ্বরের নিত্য-ক্রিয়াশীলতা মানিতে গেলে ইহাও মানিতে হইবে যে তিনি নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা। কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা চাই, ইহা আদিনাথ বাবু স্বীকার করিবেন, এবং জগতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন তৃতীয় কর্ত্তা কেহ নাই, বোধ হয় ইহাও স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আমাদের আত্মাতে যে নানা বিধি ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের উদয় হয়, এই সকল কার্য্যের কর্ত্তা কে? আমাদের ইচ্ছাতে যাহা হয় তাহার কর্ত্তা অবশ্য আমরাই। কিন্তু বিধি ব্যবস্থার প্রকাশ, জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শের উদয়, এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে যাহা হয়, তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। যিনি বলেন এই সমস্ত আপনা আপনি হয়, তাঁহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা চলিতে পারে না, কেননা ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূল সূত্র সম্বন্ধেই তাঁহার সহিত বিরোধ। যিনি বলেন, এই সমুদায় প্রথম হইতেই ঈশ্বর আত্মাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কথার উত্তর এই যে, যে বিধি ব্যবস্থা, যে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য আমার জ্ঞানের ভূমিতে উদিত না হইল, যাহা জানিলাম না বা অনুভব করিলাম না, যাহা আমার জীবনকে নিয়মিত করিল না, সে বিধি ব্যবস্থা, সে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কি অর্থে আমার আত্মায় লিখিত বা নিহিত আছে, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না; আর যদি স্বীকারও করা যায় যে কোন না কোন অর্থে এই সমুদায় আমার আত্মাতে নিহিত আছে, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে যখন আমি সজ্ঞানে এই সমুদায় লাভ করি, যখন আমার জ্ঞানগত জীবনে এই সমুদায় প্রকাশিত হইয়া আমার আত্মাকে আকর্ষণ করে, আমার উপর দাবি বসায়, তখন একটী সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা ঘটে। জ্ঞান, প্রেম বা পুণ্যের এই যে আবির্ভাব, ইহা একটা নূতন ঘটনা, একটী নূতন বিধান। আদিনাথ বাবুও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—"বাস্তবিক ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নয়, কিন্তু মানবের পক্ষে নূতন অনুভব। তাহার অন্তরে যাহা নিহিত ছিল, যাহার সন্ধান সে এত দিন পায় নাই, এখন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল। ইহাকে নূতন সৃষ্টি বলা সঙ্গত নয়।" নূতন সৃষ্টি বলুন আর নাই বলুন, নূতন কার্য্য, নূতন বিধান বলিতেই হইবে। যত দিন ইহা আমার সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই, তত দিন ইহা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও আমার পক্ষে হয় নাই, আমার কাজে লাগে নাই; যখন ইহা আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইল, যখন ইহা আমার ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করিতে লাগিল, তখন ইহা যে আমার পক্ষে নূতন বস্তু, নূতন বিধান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এখন, এই যে মানব হৃদয়ে একটী সত্য, এক কণা প্রেম বা একটী পুণ্যাদর্শের প্রকাশ, এই কার্য্যের কারণ কে? কারণ নিশ্চয়ই ঈশ্বর, কেন না এই প্রকাশ সম্পূর্ণরূপেই মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। আর, এই যে প্রকাশ রূপ কার্য্য, তাহা কেবল আপেক্ষিক ভাবে নূতন নহে, নিরপেক্ষ ভাবে নূতন; অর্থাৎ কেবল মানবের পক্ষে নূতন নহে, ঈশ্বরের পক্ষেও নূতন। একে কার্য্য মাত্রই সাধারণ ভাবে নূতন, তাহাতে আবার যখন কোন বিশেষ মানবের হৃদয়ে কোন বিশেষ সত্যের প্রথম প্রকাশ হয়, তখন ইহা বিশেষ রূপে নূতন। এই বিশেষ মানবের হৃদয়ে এই বিশেষ সত্য ঈশ্বর পূর্ব্বে কখনো

প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং কার্য্যটী ঈশ্বরের পক্ষে ও নূতন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল। ইহা মানিতে গেলে ইহাও মানিতে হইবে যে ঈশ্বর মানবাত্মার সহিত নিত্য নূতন লীলা করিতেছেন, তাঁহার প্রজ্ঞার ভিতর দিয়া নূতন নূতন সত্য, বিবেকের ভিতর দিয়া নূতন নূতন আদেশ ও পুণ্যাদর্শ, হৃদয়ের ভিতর দিয়া নূতন ভাব, এবং ইচ্ছার ভিতর দিয়া নিত্য নব বল প্রকাশ করিতেছেন। এই যে ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের বিধান, এই বিধানই সমুদায় জাতিগত বা ঐতিহাসিক বিধানের মূল। এই যে ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত ঈশ্বরের আলোক, এই আলোকই সমুদায় বাহিরের আলোকের পরীক্ষক ও গ্রহীতা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্ম অসত্য; কোন্ ধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান, কোন ধর্ম্ম বিধান নয়; মহাপুরুষদিগের প্রচারিত মত ও অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে কোন্ মত বা অনুষ্ঠান ঈশ্বরাভিপ্রেত, এবং কোন্ মত বা অনুষ্ঠান মানবের কল্পনা বা স্বার্থ প্রসূত, এই সমুদায়ের বিচার কেবল ঈশ্বর-প্রকাশিত আন্তরিক আলোকের দ্বারাই হইতে পারে।

বিধানবাদের—বিশেষ বিধানবাদের—মূল সত্য পাওয়া গেল, এখন ইহার শাখা-সত্য সমূহের আলোচনা আবশ্যক। এই মূলসত্য সম্বন্ধে আদিনাথ বাবুর সহিত আমার অতিশয় অনৈক্য, এবং এই অনৈক্যই অন্য সমুদায় অনৈক্যের মূল; এই জন্যই ইহার ব্যাখ্যায় কিছু অধিক স্থান দিতে হইল।

এখন, দ্বিতীয় কথা এই যে ঈশ্বর স্বয়ং পূর্ণ পুরুষ হইলেও তিনি যে বস্তুর উপর কার্য্য করিতেছেন,—অর্থাৎ মানবাত্মা, সে বস্তুটী ক্রমিক উন্নতিশীল বটে। কিন্তু প্রতিক্ষণেই অপূর্ণ। ঈশ্বর ইহাকে ক্রমশঃ অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; সুতরাং মানবজীবন চিরপরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীল মানবের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধান একবারে অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল, বর্দ্ধনশীল মানবের উন্নতির বিধানও অনেকাংশে পরিবর্ত্তনশীল ও উন্নতিশীল হইবে; তাহার জ্ঞান, শক্তি ও অবস্থার উপযোগী হইবে। নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্য যে কিছু নাই, এই কথা বলা হইতেছে না। ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার স্বরূপের প্রকাশরূপী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য ও তেমনি অপরির্ত্তনীয়। কিন্তু এই সকল অপরিবর্ত্তনীয় সত্যে মানুষ অনেক সোপান, অনেক পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া উপনীত হয়, এবং যে সকল উপায়ে উপনীত হয় সে সকল উপায় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি অনেক স্থলে পরস্পর-বিরোধী। যে অসভ্য মানব পশুর অবস্থা হইতে মানবপদবীতে কেবল মাত্র পদক্ষেপ করিয়াছে, নরহত্যা করিবার প্রলোভন যাহার সম্মুখে চির বর্ত্তমান, তাহার পক্ষে "নরহত্যা করিও না" ইহাই যথেষ্ট আদেশ, এবং এই আদেশ পালন করিতে পারিলেই সে ঈশ্বরের নিকট পুণ্যবান বলিয়া গৃহীত। কিন্তু যে সভ্যতার উন্নততর সোপানে আরোহণ করিয়াছে, নরহত্যার প্রলোভন যাহার সম্মুখে নাই, তাহার পক্ষে নরহত্যা না করা একটা পুণ্য কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে। ভ্রাতার বিরুদ্ধে আন্তরিক রাগ পোষণ করা যাহার পাপ বলিয়া বোধ হয় নাই, কেবল কার্য্যগত বৈরনির্যাতনই পাপ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে রাগ পোষণ করা প্রকৃত-পক্ষে পাপ নহে, অপূর্ণতা মাত্র। কিন্তু যাহার বিবেকের সমক্ষে ইহা পাপরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সে বাস্তবিকই ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট দোষী। 'ঈশ্বরকে প্রীতি দান করা কর্ত্তব্য' ইহা একটী অপরিবর্ত্তনীয় সত্য; কিন্তু ইহা পালন সম্বন্ধে অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধান থাকিতে পারে। আদিম অসভ্যাবস্থায় মানুষ আহারীয় বা অন্য কোন বাহ্যিক ব্যবহারোপযোগী বস্তু উপহার দেওয়া ভিন্ন প্রীতি প্রকাশের অন্য কোন উপায় জানিত না; এমন কি নিরাকারবাদী ইহুদী পর্য্যন্ত এই উপায় অবলম্বন করিতেন। কালে প্রীতি প্রকাশের উৎকৃষ্টতর উপায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই নূতন বিধি প্রচারের পর বাহ্যিক পূজা দেওয়া পাপ, ইহা যেমন সত্য, ইহাও কি তেমনি সত্য নহে যে এই বিধি প্রচারের পূর্ব্বে বাহ্যিক পূজা না দেওয়া পাপ ছিল? ধর্ম্মরাজ্যের শিশুর পক্ষে শুষ্ক উপাসনা করা পাপ নহে; ধর্ম্মরাজ্যের প্রৌঢ়ের পক্ষে তাহা পাপ। ধর্ম্মরাজ্যের শিশুর পক্ষে অন্যের উপকারার্থ আত্ম-ত্যাগ না করা পাপ নহে, নিজেকে বাঁচাইয়া যথাসাধ্য পরোপকার না করাই পাপ; কিন্তু প্রৌঢ়ের পক্ষে আত্ম-ত্যাগ না করাই পাপ। যাঁহারা ফাদার ড্যামিয়েনের জীবন আত্ম-বলিদানে কোন মহত্ব দেখেন না, কেবল পাগলামিই দেখেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ না করাতে পাপ নাই; কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্যের মহত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের উপর এই নূতন বিধানের দাবি বসিয়াছে; অতঃপর, এই উচ্চ আদর্শানুসারেই তাঁহাদের জীবনের বিচার হইবে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে উন্নতির পরিমাণ ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ভেদে বিধানেরও ভিন্নতা হয়, অথচ তাহাতে মৌলিক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে না; সমুদায় বিধানই এক উদার প্রশস্ত বিধানের অন্তর্গত; সমুদায়েরই উদ্দেশ্য মানবকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া—মানবকে ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ যোগে সংযুক্ত করা।

উপরোক্ত কথা গুলি ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত জীবন সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিকাশের ভিন্নতা অনুসারে বিধানের ভিন্নতা হয়। কিন্তু ইহাই ভিন্নতার একমাত্র কারণ নহে। আর একটী কারণ প্রাকৃতিক গঠনের ভিন্নতা। বিধাতা প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায়কে ঠিক একরূপ প্রকৃতি দিয়া গঠন করেন নাই; বাহিরের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাও ঠিক একরূপ করেন নাই। কাজেই ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও সকল ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায় ঠিক একরূপ নহে। কেহ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, কেহ যোগে শ্রেষ্ঠ, কেহ বা প্রেমে শ্রেষ্ঠ, কেহ বা সেবায় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক, জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের অনেক শিক্ষা করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই পার্থক্য ঈশ্বরের অপক্ষপাতিত্বের বিরোধী। সে যাহাই হউক, পার্থক্যটা নিঃসন্দেহ। আমাদের বিবেচনায় এই পার্থক্য না থাকিলে পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্বন্ধের যে মধুরতা তাহা থাকিত না; জগৎ একটা শ্রীবিহীন সমতল ক্ষেত্রের মত হইত। যাহা হউক, উপরোক্ত প্রভেদ বশতঃ যদি মানুষ অহংকারী হয়, এবং কেহ জ্ঞানের প্রশংসা ও ভক্তির নিন্দা করে, কেহ বা

ভক্তির প্রশংসা ও জ্ঞানের নিন্দা করে, তবে এই সকল মানুষেরই দোষ, ঈশ্বরের দোষ নহে, তাঁহার বিধানেরও দোষ নহে। বিশেষ বিশেষ সত্য ভাব বা অনুষ্ঠান প্রচারের ভার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হয়। তাহারা যদি সেই সত্য ভাব বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসত্য এবং পাপও প্রচার করে; তাহাতে ঈশ্বরের বিধানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয় না। তাহাতে কেবল মানবের দুর্ব্বলতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে লিখিতে গিয়াও পত্র বিস্তৃত হইয়া গেল। আদিনাথ বাবুর সকল কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইলাম না; আগামী বারে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অনুগত

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল হইতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন— "বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে বিগত ২০ শে শ্রাবণ রবিবার সায়ংকালীন সামাজিক উপাসনান্তে বরিশাল জেলার অন্তর্গত ঝালকাটি ষ্টেসনের অধীন কাচাবালিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।" মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ধর্ম্মরাজ্যে নবপ্রবিষ্ট বন্ধুর প্রাণে দিন দিন ধর্ম্মপিপাসা প্রবল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

গত ২০এ শ্রাবণ মান্দ্রাজ নগরে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে একটী সামাজিক সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে মান্দ্রাজ দেশীয় ২০ জন ভদ্রমহিলা এবং প্রায় ৩০ জন ভদ্র পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলাপ পরিচয় গান বাজনা এবং জল যোগের পর সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। রজনীনাথ রায় মহাশয় সপরিবারে তথায় গমন করাতে মান্দ্রাজের ব্রাহ্মমহিলাগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কোচবিহার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথাকার ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী পাকা মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। কোচবিহারের মহারাজা এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ২ বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাইবে বলিয়া জানাগিয়াছে। এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ২৭০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। আমরা আশা করি কোচবিহারস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত সত্বর এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

গত ২৬এ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মজুমদার বয়স ২৪ বৎসর। ইনি রংপুরের অন্তর্গত গোপালপুর নামক স্থানে মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারের কার্য্য করেন। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী মুখোপাধ্যায়। ইনি মানিকদহের শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের ৪র্থ কন্যা। বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বামন বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৮ই শ্রাবণ বাগআঁচড়া গ্রামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত প্রচার বিদ্যালয়ের (Mission School) জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৮৮৮)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

নাম	স্থান	টাকা
বাবু মধুসূদন সেন	কলিকাতা	২৲
„ দ্বারকানাথ রায়	লাহোর	২৲
মিসেস রামগোপাল বক্সী	লাহোর	৩৲
বাবু অক্ষয়কুমার রায়	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী স্বর্ণলতা রায়	নওগাঁ	৫৷৹
বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী	সক্কর	১৲
„ শিবচন্দ্র দাস	ভবানীপুর	২৷৹
„ কালীপ্রসন্ন সেন	পোড়াদহ	৮৲
„ শ্রীকৃষ্ণদাস	বোয়ালিয়া	১৫৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ বোয়ালিয়া	ঐ	৬৲
বাবু ভগবতীচরণ দাস	ভবানীপুর	২৷৹
„ মহিমচন্দ্র রায়	নাটোর	৬৲
„ গুরুচরণ মহলানবিশ	কলিকাতা	১।৹
„ মোহিনীমোহন রায়	ঐ	৷৹
„ তারিণীচরণ নন্দী	শিলং	১৲
শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী	ভাগলপুর	৬৲
বাবু রাধানাথ রায়	শিলিগুড়ি	৩৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲
„ শশিভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	৩৷৴
„ গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲
„ শিবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	টিকারি	৩৲
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	রাজারামপুর	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ কেদারনাথ রায়	ঐ	৷৹
শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্ত	জলপাইগুড়ি	৩৲
বাবু নবদ্বীপচন্দ্র সরকার	ঐ	৩৲
„ গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল	নেলফামারি	৬৲
„ বিশ্বেশ্বর সেন	রংপুর	৪৲
„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৪৲
„ অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার	ঐ	৭৲
শ্রীমতী যোগমায়া ঘোষ	ঐ	৬৲
বাবু ভুবনমোহন সেন	করিদপুর	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
„ রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	৷৹
„ ভুবনমোহন ঘোষ	ঐ	৫৲৹
„ কেদারনাথ কুলভি	বাকুড়া	৩৲
„ মহেশচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	১৲
„ দ্বারকানাথ ঘোষ	ঐ	১৲
„ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৮৶

ক্রমশঃ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র শনিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

"কে আছে জগতে ম্লান?"

কে আছে জগতে ম্লান? নবপত্র-বাসে,
তরুটী আবরি দেহ নয়ন হরিছে;
প্রস্ফুটিত ফুল-রাশি তাহে মধু আশে,
গুণ গুণ রব অলি কতই করিছে;
কুঞ্জে কুঞ্জে গায় পাখী, খেলে শাখে শাখে;
মনের আনন্দে পশু প্রান্তরে চরিছে;
জলে খেলে জলজন্তু দেখ লাখে লাখে;
একদণ্ডে লক্ষ কীট জন্মিছে মরিছে,
জনম যৌবন জরা প্রেম পরিণয়,
একদণ্ডে সব সুখ আস্বাদ করিছে;
জলে স্থলে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, এই বিশ্বময়
যে আছে সে সুখে আছে, সুখে বিহরিছে;
নর কি সবার হীন? শুধু বিষময়
তার কি জীবন-পাত্র?—না—না তাহা নয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আত্ম-চিন্তা—ঘরের যে কোনটীতে অধিক দিন দৃষ্টিপাত না করা যায়, যে দিকে সংমার্জনীর কার্য্যটা অনেক দিন না হয়, সে দিকে নির্জ্জনে বসিয়া ঊর্ণনাভি আপনার কার্য্য করিতে থাকে। অচির কালের মধ্যে সেই স্থান ঊর্ণনাভির জালে, ধুলার, ধূমের ও সকল প্রকার আবর্জ্জনার একটী আলয় হইয়া উঠে। মানবের মনকেও এই প্রকার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মনের যে বৃত্তিটীর প্রতি উদাসীন হইয়া থাকা যায়, মনের যে দিকটার চর্চ্চা না থাকে, তাহাতে ঊর্ণনাভির জালও নানা প্রকার আবর্জ্জনা জমিতে থাকে। গৃহস্থের গৃহকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য যেমন সংমার্জ্জনীর ব্যবহার আবশ্যক—মনকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য তেমনি আত্ম-চিন্তা সংমার্জ্জনী মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ কথিত আছে গ্লাডষ্টোন, প্রিন্স বিসমার্ক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রীগণ, মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া নির্জ্জন-বাস করেন। তখন রাজ কার্য্যের কোন সংবাদ তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতে নিষেধ থাকে—এমন কি প্রতিদিনের সংবাদ পত্রও প্রেরিত হয় না। এরূপ নির্জ্জন-বাস তাঁহাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজ কার্য্যের কোলাহলে, গভীর সূক্ষ্ম দর্শনের সময় থাকে না; এক এক দিন এক একটা ভাব ও চিন্তার তরঙ্গ সমাজের উপরে উত্থিত হয়, তাহাতে সকলকে অনেকটা চালিত করে। এইরূপ ব্যস্ততা, উদ্বিগ্নতা, বিবাদ, বিদ্বেষ ও দলাদলির মধ্যে থাকিতে থাকিতে চিত্ত নিতান্ত বহির্মুখীন হইয়া পড়ে; সুতরাং বহির্মুখীন চিত্তকে অন্তর্মুখীন করিবার জন্য সময়ে সময়ে নির্জ্জন বাসের প্রয়োজন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, যে সকল গূঢ় শক্তি সমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহার কার্য্য ও গতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকদিগের মধ্যে মাঝে মাঝে নির্জ্জনবাস ও আত্ম-চিন্তার নিয়ম আছে। সকল শ্রেণীর লোকের এইরূপ সময়ে সময়ে নির্জ্জন-বাস অতিশয় উপকার জনক। যাহারা ধনোপার্জ্জনের আশায় নিরন্তর পরিশ্রম করিতেছে, দিন রাত্রি কেবল সেই চিন্তায় রত রহিয়াছে, সেই চেষ্টায় হাটে বাজারে ফিরিতেছে, বিবাদ বিরোধের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে, তাহাদের যদি নির্জ্জন-বাস ও আত্ম-চিন্তার সময় থাকিত, তাহা হইলে জন সমাজের পাপের ভাগ বোধ হয় অনেক হ্রাস হইত। যে সকল ব্রাহ্মকে বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়—উদরান্নের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়, পরের চাকুরিতে দিন যাপন করিতে হয়, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যে ছুটী পান তাহা নির্জ্জনে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ও স্নিগ্ধতার মধ্যে পাঠ ও আত্ম-চিন্তায় যাপন করা কর্ত্তব্য। সহরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে সহর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির রমণীয়তার মধ্যে কিছু কিছু সময় যাপনের নিয়ম করা ভাল। আত্ম-চিন্তা ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মজীবন ম্লান হইবারই কথা।

বিশ্বাস ও প্রেমেই আত্মরক্ষা—খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের লোকগণ গৌরব করিয়া একটা কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন আমাদের ধর্ম্ম যে ঈশ্বর প্রেরিত তাহার প্রমাণ দেখ,

ইহা প্রথমে অতি অজ্ঞ ও দরিদ্র লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল; ইহার জন্মাবধি ইহার প্রতি লোকে খড়্গহস্ত, রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া ইহাকে নির্যাতন করিয়াছে; রোমীয় সম্রাটগণ ইহার উচ্ছেদের জন্য সমগ্র রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তথাপি দেখ ইহার সম্মুখে রোমের রাজ প্রতাপ, গ্রীসের পাণ্ডিত্য, রোমীয় সভ্যতা সমুদয় মস্তক অবনত করিয়াছে। ঐশী শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে কখনও কি এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে? একথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। ইহার তুল্য ইতিহাসে আশ্চর্য্য ঘটনা আর কিছুই নাই। খৃষ্টধর্ম্মের জয় লাভের অনেক ঐতিহাসিক কারণ ঘটিয়াছিল তাহার আলোচনা এখানে প্রয়োজনীয় নহে। সে সময়কার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে একটা বিষয় দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যখন চারি দিকের লোকে অত্যাচার করিতেছে, পশুযূথের ন্যায় খৃষ্টীয়দিগকে গ্রাম হইতে গ্রামে, নগর হইতে নগরে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে, কাহাকেও বা ইষ্টক প্রস্তর মারিয়া, কাহাকেও বা জীবন্ত পোড়াইয়া, কাহাকেও বা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া, কাহাকেও বা তপ্ত কটাহে ভাজিয়া হত্যা করিতেছে, তখন খৃষ্টীয়গণ সেই সকল অত্যাচার গ্রাহ্য না করিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেছে যে তাহাদের জয়ের দিন ত্বরায় আসিতেছে—প্রভুর পনরাগমন সন্নিকট। এই বিশ্বাসে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রার্থনা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের মণ্ডলীর প্রতি তাহাদের এতই প্রেম ছিল যে যীশুর মৃত্যুর পর কিছু দিন এই নিয়ম ছিল, যে কাহাকেও তাঁহার শিষ্য হইতে হইলে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এক সাধারণ ধনাগারে সেই সমুদয় ধন অর্পণ করিতে হইত, তাহা হইতে মণ্ডলীর সকল লোকের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ইহাতেও খৃষ্টীয় সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। কেহ নিজস্ব কিছু রাখিতে পারিত না। একবার এক ধনী দম্পতি খৃষ্টধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আপনাদের সমুদয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধন ভাণ্ডারে দিলেন, কিন্তু দিবার সময় লোভ বশতঃ কিছু ধন পত্নীর জন্য লুকাইয়া রাখিলেন। পিটার প্রভৃতি প্রেরিতগণ যখন এই প্রতারণার বিষয় জ্ঞাত হইলেন, তখন সেই ধনী ব্যক্তিকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন "কে তোমাকে আমাদের দলে প্রবেশ করিতে বলিয়াছিল? না করিলে তোমাকে কে কি বলিত? কেন তুমি লোভে পড়িয়া পাপাচরণ করিলে?" বাইবেলে লিখিত আছে যে এই তিরস্কারে তৎক্ষণাৎ সেই খানে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইল। একদিকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া লোককে শিষ্য মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইতে হইত, অপর দিকে কেহ কোন অপরাধ করিলে, তাহাকে অতিশয় গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইত। একজন ইতিবৃত্ত লেখক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে খৃষ্টের শিষ্য হওয়াতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ ছিল না; খৃষ্ট বিদ্বেষী হইলে জন সমাজে প্রশংসা পাওয়া যাইত; খৃষ্টীয় দল ত্যাগ করিলে লোকে আদর পূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া লইত; এমন অবস্থাতেও খৃষ্টীয় মণ্ডলীর কাহাকে কোন অপরাধে অতি গুরুতর শাস্তি দিলেও সে অসহ্য ক্লেশ সহিয়া পড়িয়া থাকিত, তথাপি সে মণ্ডলী পরিত্যাগ করিত না। মণ্ডলীর প্রতি এত প্রেম ছিল। উক্ত বিশ্বাসীদলের এমন কি একটা আকর্ষণ ছিল। এই বিশ্বাস ও প্রেমের গুণেই আদিম খৃষ্টীয় সমাজ জয়যুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মগণ এই অবস্থার সহিত আপনাদের অবস্থার তুলনা করুন।

অগ্নি পরীক্ষাতে বিশ্বাসের পরিচয়—অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়;—এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের প্রতি লোকের কত সদ্ভাব ছিল, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মনে মনে তাহাদের অনুরাগী ছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মত ও কার্য্যাদিকে ভাল বলিতেন না, তাহারাও ব্রাহ্মদিগকে আদর করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন ব্রাহ্ম সমাজের বিদ্বেষী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে; এখন ব্রাহ্ম হইলে কেহ আদর না পাইয়া গুরুতর বিদ্বেষের পাত্র হয়; ব্রাহ্ম হওয়াতে এখন কোন লাভ নাই বরং গুরুতর ক্ষতি। এই বলিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা বলি ইহাতে বিশেষ দুঃখিত বা বিষণ্ণ হইবার কিছু নাই। ইহাতে একদিকে দেখিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজেরই কল্যাণ। লোকে যদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারে সর্ব্বদা একটা আগুন জ্বালিয়া রাখে, যে আসিবে তাহাকেই সেই আগুনের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার ভিতর দিয়া যে লোকগুলি আসিবে সে গুলি বিশ্বাসী লোক হইবার অধিক সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম বলিলেই যদি আদর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আদরটুকুর লোভে অনেকে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবে। এই কারণেই দেখা যায় যে সকল লোক এ দেশে একবার ব্রাহ্মসমাজের চৌকাট পার হন নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোন সংস্রব রাখেন না, তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া অনেক সময় ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকেন। কারণ এই সেখানে ব্রাহ্ম বলিলে তবু একটু আদর পাওয়া যায়। আবার তাঁহারাই জাহাজ হইতে নামিবার সময় সে ব্রাহ্মনাম জাহাজে রাখিয়া আসেন, কারণ ব্রাহ্মনামে এখানে আর আদর নাই। ব্রাহ্ম বলিলে লোকে আদর না করিয়া বিদ্বেষ করে ইহা এক প্রকার ভাল। আমাদের বিশ্বাস এই, দুর্ব্বলতা বাহির হইতে আসে না; ভিতর হইতেই বাহিরে যায়। ভিতরের সবলতার দিকে ব্রাহ্মগণ দৃষ্টি রাখুন বাহির আপনি সবল হইবে। তবে লোকের বিদ্বেষে একটা ভয় আছে তাহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। লোকের বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে তাহাদেরও প্রতি আমাদের বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। জগতে প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়দিগের যে সাম্প্রদায়িকতা দৃষ্ট হয় বাহিরের বিদ্বেষ তাহার একটা প্রধান কারণ। মহম্মদ প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদিগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি মক্কা নগরে যত দিন ছিলেন, ততদিন তাহাদের প্রতি সমুচিত ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু শত্রুগণের উপদ্রবে যখন তাঁহার শিষ্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, যখন তাহাদিগকে প্রাণ ভয়ে মিশরদেশে আশ্রয় লইতে হইল, যখন তাঁহাকে নিজে অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া মদিনা নগরে পলায়ন করিতে হইল,

যখন শত্রুগণ সেখানেও তাহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না; তখন তাঁহার বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; তিনি আদেশ করিলেন অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি দেও।" বিদ্বেষে বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল, সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইল। এই সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি এখনও মহম্মদের ধর্ম্মের মধ্যে প্রবল রহিয়াছে। বাহিরের বিদ্বেষে পাছে ব্রাহ্মদিগের মনে সাম্প্রদায়িক ভাব বর্দ্ধিত হয় এই এক আশঙ্কা আছে।

অসত্যে যাহার ভিত্তি সমূলে তাহার বিনাশ—এক ব্যক্তি এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিল, তৎপরে কোন গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। সে দেখিল ব্রাহ্মদিগের বিদ্বেষ্টা দলে মিশিবার সুবিধা আছে, এবং সেখানে আদরও আছে। সে সেই দলে গিয়া নাম লিখাইল এবং জনসমাজে ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। এরূপ মধ্যে মধ্যে ঘটিবে; সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। ইহাতে আমাদের চিত্তকে বিচলিত হইতে দিলে এই প্রকাশ পায় যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অতি ক্ষীণ। ঈশ্বরে যদি আমরা বাস্তবিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই মহাসত্যেও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে তিনি ধর্ম্মরাজ তাঁহার এই জগৎ ধর্ম্ম নিয়মের দ্বারা শাসিত। তাঁহার রাজ্যে অসত্য জয় লাভ করিতে পারে না! "সমূল বা এষ পরিশুষ্যতি যোনৃত মভিবদতি"—যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়।" অসত্য যাহার ভিত্তি বিনাশ তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। মিথ্যার উপরে যে জ্ঞাতসারে আপনার কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে তাহার ন্যায় নাস্তিক আর নাই। সেই মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া সে যত কাজ করে, তাহার নাস্তিকতার গভীরতা তত অধিক প্রকাশিত হয়। সে ব্যক্তি আপনার কাজের দ্বারা বলিতেছে—"ঈশ্বর টীশ্বর কিছুই নয়, জগৎ ধর্ম্ম নিয়মে শাসিত নয়; এখানে মিথ্যা ও জালের উপরে দাঁড়াইয়া একটা কিছু করিয়া তোলা যায়।" এরূপ নাস্তিকের প্রতিপক্ষতা দেখিয়া যে চিন্তিত হয় সেও আংশিকরূপে অবিশ্বাসী কারণ সেও মনে করে এ জগৎ ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত নয়। এখানে মিথ্যার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া তোলা যাইতে পারে। এরূপ ঘটনা যখনি ঘটিবে তখন ব্রাহ্মগণ এই মহাসত্যটী স্মরণ করিবেন, "অসত্য যাহার ভিত্তি সমূলে তাহার বিনাশ" অসত্যকে আশ্রয় করিয়া কোন কাজ দাঁড়াইতে পারে না। যদি দাঁড়ায় তবে ত এ রাজ্য ঈশ্বরের রাজ্য নহে। একবার বিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে আর বিদ্বেষের ভাব জন্মিবে না। হস্তি যেমন মশকের কামড় উপেক্ষা করে সেইরূপ তাঁহারাও এরূপ বিপক্ষদিগের আক্রমণ উপেক্ষা করিতে পারিবেন।

তুলনায় বিচার—১৮২৫ হইতে ১৮৩০ এই সময়টা জগতের ইতিবৃত্তের পক্ষে একটা চিরস্মরণীয় সময়। এই সময়ের মধ্যে জগতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মান্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকাতে মর্ম্মন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়; ইংলণ্ডে রিচুয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্ম হয়; গুজরাটে, সত্যনারায়ণী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়; উত্তরপশ্চিমে ওহাবি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়, বঙ্গদেশে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। অন্য কোন দেশে অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্ম হইয়া থাকিবে আমরা জানি না। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন সকল সম্প্রদায়েরই বিশ্বাসীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মনদিগের বিশ্বাসের শক্তি দেখিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এই সম্প্রদায়ের লোক যত প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছে তাহার বর্ণনা হয় না। আমেরিকার ন্যায় সভ্যতম ও স্বাধীনতম দেশেও ইহারা পশুযুথের ন্যায় এক নগর হইতে আর এক নগরে, সে স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়িত হইয়াছে। অবশেষে ইহারা আমেরিকার এক প্রান্তে গিয়া লবণময় দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেখানেও ইহাদের নিস্তার নাই। সেখানেও ইহাদিগের দূষিত মত ও আচরণ নিবারণের জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটস, গবর্ণমেণ্ট আইনের পর আইন প্রণয়ন করিতেছেন; ইহাদের নেতাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, আচার্য্যদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আইনের দ্বারা মানুষকে যত দূর পীড়ন করা যায় তাহা করিতে বাকি রাখেন নাই। কিন্তু মর্ম্মন দলের কিছুতেই নিপাত হইল না। তাহারা লবণময় দ্বীপকে শ্রমের গুণে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে; সেখানে আপনাদের ইচ্ছানুরূপে শাসন প্রণালী, শিক্ষা প্রণালী, সামাজিক প্রণালী স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের প্রচারকগণ দেশ বিদেশে নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিতেছে; বর্ষে বর্ষে জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ হইতে শত শত মর্ম্মন লবণদ্বীপে গিয়া বাস করিতেছে। কি আশ্চর্য্য জীবনী শক্তি! তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর বিষয় ভাবিলে আবার চমৎকৃত হইতে হয়। মর্ম্মন হইতে গেলেই এক জনকে নিজ আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ স্বীয় ধর্ম্মসমাজের উন্নতির জন্য দান করিতে হয়। প্রত্যেক ভজনালয়ে প্রতি মাসে এই দশ ভাগের এক ভাগ সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রচারকদিগের প্রতি নিয়ম আবার অতি কঠিন। এক ব্যক্তি কাজ কর্ম্ম করিতেছে, হঠাৎ তাহার প্রতি নেতাদিগের আদেশ হইল যে, তাহাকে মর্ম্মন ধর্ম্ম প্রচারার্থ জার্ম্মানি যাইতে হইবে। তাহাকে অমনি সকল কাজ ছাড়িয়া যাত্রা করিতে হইবে। যাত্রার আয়োজন, তাহার পয়সা সংগ্রহ, জার্ম্মানিতে কাজ করিবার অর্থ সংগ্রহ, সকলি তাহার ভার। যেমন করিয়াই হউক তাহাকে যাইতে হইবে। সেইরূপ করিয়াই তাহারা যায়। মর্ম্মনদিগের মত ও আচরণ অতি কুৎসিত, তাহারা নিউ টেষ্টমেণ্ট অপেক্ষা ওল্ড টেষ্টমেণ্টের অধিক পক্ষপাতী। সুতরাং বহুবিবাহ তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। এই জন্যই আমেরিকাবাসিগণ তাহাদের প্রতি জাতক্রোধ। এই জন্যই এত অত্যাচার। কিন্তু কিছুতেই মর্ম্মনদিগকে বিনাশ করা যাইতেছে না। ব্রাহ্মগণ একবার তুলনা দ্বারা বিচার করুন। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বৎসরে যত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলেরই লোক সংখ্যা এত অধিক কেন? ব্রাহ্মসমাজের লোকসংখ্যাই বা এত অল্প কেন?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সৎক্ষেত্র-পতিতা কৃষি।

ধর্ম্ম সাধন অনেক লোকে করে, ধর্ম্ম জীবনের সৌন্দর্য্য সকলের হয় না। এরূপ কেন হয়? বাহিরে দেখিতে লোক্-গুলির মধ্যে কাহারই ধর্ম্মসাধন বিষয়ে মনোযোগের ক্রটী দেখা যায় না। সাধনের যে সমুদায় নিয়ম তাহা সকলেই সমান ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন এবং যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিতেছেন, অথচ ফলে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও কাহারও জীবনের সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইতেছে, কাহারও কাহারও জীবন দেখিয়া অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। এরূপ কেন হইতেছে? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, কেবল মাত্র বাহিরে সাধন করিলে কি হইবে, সরল ভাবে সাধন করা চাই। সাধক দলের মধ্যে কেহ যে অসরল ভাবে সাধন করিতেছেন, এরূপ বোধ হয় না। যে ব্যক্তির জীবন দেখিয়া অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, এবং লোকে বলিতেছে উহার ধর্ম্ম সাধনের মুখে ছাই, সে ব্যক্তি ও যে সাধন বিষয়ে অসরল, সে যে মন প্রাণ দিয়া সাধন করিতেছে না, এরূপ বোধ হয় না। বরং ইতিহাসে দেখা যায়, যে একদিকে যাহাদের জীবনের হীনতা দেখিয়া লোকে অশ্রদ্ধা করিয়াছে, আর এক দিকে তাহার সরলতা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের ও মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল লোকে মানুষকে ধরিয়া জলন্ত চিতায় পোড়াইয়াছে ও শত শত ব্যক্তিকে নিরতিশয় নৃশংসতার সহিত নির্যাতন করিয়াছে, তাহাদের অনেকের হৃদয় ধর্ম্মানুরাগে উদ্দীপ্ত ছিল; তাঁহাদের নৃশংসতা তাঁহাদের সরল-বিশ্বাস প্রসূত। যাহাদের হৃদয়ে একদিকে নরঘাতকের নিষ্ঠুরতা ও পিশাচের শোণিত-প্রিয়তা ছিল, তাহাদেরই অপরদিকে ধর্ম্মসাধনানুরাগ প্রবল ছিল। এরূপ কেন হয়?

অনেকে বিবেচনা করেন কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা উপাসনা ও ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পালন দ্বারা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জীবন সাধিত হইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষাতে জানা গিয়াছে, যে কৃষকের শ্রম সংক্ষেত্রে পতিত না হইলে যেমন উৎকৃষ্ট ফল জন্মে না, বাদ্য যন্ত্রের অবস্থা ভাল না থাকিলে সুবাদকের হস্তেও যেমন শ্রবণ-সুখকর ধ্বনি উত্থিত হয় না, সেইরূপ হৃদয় মনের অবস্থা সাধনোপযোগী না থাকিলে, সাধনের শ্রম ও সফল হয় না। হৃদয় মনের অবস্থা সাধনোপযোগী থাকার অর্থ কি? অর্থাৎ জ্ঞানের বিস্তার, প্রেমের প্রসার ও বিবেকের উজ্জ্বলতা থাকা চাই। মনে কর এক ব্যক্তির জ্ঞান-স্পৃহা আদবে নাই; জগদীশ্বর যে সকল মানসিক শক্তি দিয়াছেন তাহার চালনাতে প্রবৃত্তি নাই; প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, নিত্য নিত্য যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা নাই; চারিদিকে কত বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে, কত নূতন নূতন বিষয়ের চর্চ্চা হইতেছে তাহার কিছুর সহিত যোগ নাই; সে ব্যক্তি মানুষকে ভাল বাসে না; প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন; পরোপকারের জন্য কত আয়োজন হয় তাহার কিছুতে সাহায্য করে না; আপনার কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র গুলি লইয়া বসিয়া থাকে; ঋণ করে তাহা শোধ দিবার জন্য ব্যগ্রতা নাই; তাহার জন্য অপরের অসুবিধা হয় সেদিকে দৃষ্টি নাই; যাহার বেতন ভোগী তাহার কাজ ভাল করিয়া করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই; বিলম্বে কর্ম্ম স্থানে যায়; অসম্পূর্ণ ভাবে কাজ করে; অদ্যকার কাজ কল্যকার জন্য ফেলিয়া রাখে; যে কাজের ভার লয় তাহা করে না। কিন্তু অপর দিকে ধর্ম্মভাব প্রবল, ধর্ম্ম বিজ্ঞানে প্রবীণ, সাধনে অনুরক্ত, যেখানে ধর্ম্মের চর্চ্চা হয়, সেখানে সর্ব্বদা উপস্থিত; ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল পালনে মনোযোগী। এরূপ চরিত্রে ধর্ম্ম সাধনের উৎকৃষ্টতর ফল, আমরা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারি না। অথচ এই প্রকৃতির লোক সকল সম্প্রদায় মধ্যে দৃষ্ট হয়।

এরূপ বিকৃত ফল নিবারণের উপায় কি? কৃষির শ্রম চাই ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনও চাই। এই জন্যই কৃষক যেমন কর্ষণ করে সেইরূপ সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনও করে।— হৃদয়-ক্ষেত্রকে সাধনের অনুকূল করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। (১ম) জ্ঞানের বিস্তার (২য়) প্রেমের প্রসার (৩য়) বিবেকের উজ্জ্বলতা। গভীর ভাবে জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে মন স্বতঃই উচ্চ ধর্ম্মভাব সাধনের অনুকূল হয়। গভীর জ্ঞানালোচনা দ্বারা অনেকগুলি মহোপকার সাধিত হয়। প্রথম তদ্দ্বারা হৃদয়মনকে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকলের উপরে উন্নত করে। জ্ঞানী মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে রক্ষা পান। সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয় সকলে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকাতে, স্থূল ইন্দ্রিয়সুখকর বিষয়ে দৃষ্টি থাকে না। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃই বৈরাগ্য ভাবে পূর্ণ, বাহ্য বিষয়ে তাঁহাদের অনাস্থা। সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের জ্ঞানীদিগের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় মহোপকার এই, জ্ঞানীগণের আত্ম দৃষ্টি অতিশয় উজ্জ্বল হয়; তাঁহারা প্রবৃত্তি দ্বারা নীত না হইয়া স্থির-চিত্তে কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে পারেন। এই চিত্তের স্থিরতা ও আত্মদর্শন সাধনের বিশেষ অনুকূল। তৃতীয়তঃ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি উদার ভাবাপন্ন; তিনি সংকীর্ণ চক্ষে মানবের কার্য্য পরিদর্শন করেন না; তাঁহার দৃষ্টি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপর ন্যস্ত; তিনি সমগ্র ভাবে বিচার করিতে পারেন এই জন্যই তাঁহার বিচারের মধ্যে উদারতা থাকে। এই উদারতা ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। জ্ঞানের ন্যায় প্রেমের ও শক্তি আশ্চর্য্য প্রেম নিস্বার্থতাকে আনয়ন করে। যিনি প্রেমিক তিনি আপনাতে আবদ্ধ নহেন; পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, তাহার হৃদয় সর্ব্বদা কোমল থাকে; অপরের সুখ দুঃখ হৃদয় দ্বারে আসিয়া পাষাণের প্রাচীরে লাগিয়া ফিরিয়া যায় না, কিন্তু সেই হৃদয়ের উপরে সেই সুখ দুঃখের ছাপ মুদ্রিত হয়। এইরূপ হৃদয়েই সাধুগণের জীবনের ছাপ সহজে মুদ্রিত হয়, এবং সদুপদেশ সকল ও সহজে প্রবিষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি ক্ষমাশীল, বিনয়ী, ও পরোপকারী। ইহার অপেক্ষা ধর্ম্ম সাধনের সহায় আর কি আছে?

বিবেকের উজ্জ্বলতা ও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তির

বিবেক উজ্জ্বল তাঁহার হৃদয় ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত। তিনি ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। ভয়, স্বার্থপরতা ও সুখাসক্তি এই তিনকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, মানুষ প্রকৃতরূপে বিবেক পরায়ণ হইতে পারে না। যিনি কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে মানুষের অনুরাগ বিরাগের প্রতি উপেক্ষা করিতে হয়, তৎপরে নিজ স্বার্থ যদি কর্ত্তব্যের বিরোধী হয়, তাহা ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়; তৎপরে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য শ্রম, দুঃখ ও বিপদকেও আলিঙ্গন করিতে হয়। সুতরাং ভয়, স্বার্থ, ও সুখাসক্তির উপরে উঠিতে না পারিলে কেহ প্রকৃতরূপে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না। প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে না রাখিলে কেহ বিবেক পরায়ণ হইতে পারে না। অতএব বিবেক পরায়ণতার ন্যায় ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল আর কিছু নাই। যে ব্যক্তির বিবেক মলিন যে জ্ঞাতসারে অসত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা নিজ চরিত্রের কোন অংশে পাপকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহার সাধনের শ্রম দেখিলে একটী গল্প মনে হয়। একবার কোন স্থানের কতকগুলি লোক বরযাত্র হইয়া গঙ্গার ধারের একটী গ্রামে বিবাহ দিতে গিয়াছিল। রাত্রে ফিরিবার সময় সকলেই সুরাপান করিয়া মত্ত। দাঁড়িমাঝি গুলিও তদ্রূপ। নৌকাতে আসিয়াই তাহারা দাঁড়ে বসিল। কিন্তু নৌকার বন্ধন রজ্জু যে খুলিয়া দিতে হইবে, সে হুঁস কাহারও নাই। অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিতেছে। প্রাতে দেখে নৌকা ঘাটেই বাঁধা রহিয়াছে। আমাদেরও বোধ হয়, জ্ঞান, প্রেম ও বিবেকের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধর্ম্ম সাধনে শ্রম করা, নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড় টানার ন্যায়। শ্রম মাত্র সার তাহাতে ফল হয় না।

বিশেষতঃ ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যক্তির জ্ঞান সঙ্কুচিত, প্রেম সংকীর্ণ, ও বিবেক ম্লান, সে সাধন করিবে কি? ঈশ্বরের মহিমা সে বুঝিবে কিরূপে? জ্ঞান, প্রেম বিবেক এ গুলি আমাদের আত্মার এক একটী চক্ষু। এই সকল চক্ষু দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের মহিমা বুঝিয়া থাকি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের এক কণা ধারণ করিয়াই আমরা জ্ঞানী হই; ক্ষুদ্র হৃদয় পাত্রে তাঁহার বিশ্বব্যাপী উদার প্রেমের এক কণিকা ধারণ করিয়াই আমরা প্রেমিক হই; বিবেকের দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করিয়াই সাধু হই। সুতাং যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও বিবেক দুর্ব্বল থাকে, সেই পরিমাণে তাহাকে বুঝিবার শক্তি হারাই। অতএব সাধনের ফল লাভ করিতে হইলে হৃদয়ক্ষেত্রকে তদুপযোগী করা আবশ্যক।

সমাজ সংস্কার ও জাতীয় ভাব।

বর্ত্তমান মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক সমাজ সংস্কারের বিরোধী নহেন, বরং বলিয়াছেন, "উন্নতি পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে উন্নতি অসম্ভব।" তবে তিনি বিদেশীয় অনুকরণের বিরোধী। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন,—"আমরা সংস্কারের বিরোধী নহি, কিন্তু নির্দ্দোষ জাতীয় ভাব যাহা আমরা রক্ষা করিয়া ভারতীয় সভ্যতা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে পারি, সেগুলিকে পরিত্যাগ করা আমরা স্বদেশবৎসলতার লক্ষণ মনে করি না।" তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লেখকের প্রবন্ধ রচনার কারণ তিনি নিজেই প্রদর্শন করিয়াছেন,—"বিশুদ্ধ জাতীয় ভাবগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কারের স্রোতে ভাসিয়া যায়, এই আমাদের আশঙ্কা।"

বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারকদিগকে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে এইরূপ সতর্ক করেন, তাঁহারা প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করেন। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে। এ সংগ্রামটী আর কিছুই নহে, পুরাতন বোতলে নূতন সুরা প্রবিষ্ট করিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। ভারতীয় প্রাচীন রীতি নীতির মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাব সকল প্রবিষ্ট হইয়া অধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই সংগ্রামের ফল কি হইবে? চলিত কথায় বলে পুরাতন বোতলে নূতন সুরা রাখিলে বোতল ভাঙ্গিয়া যায়। সেইরূপ কি প্রাচীন রীতি নীতি ভগ্ন হইয়া যাইবে? এবং সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতি নীতি সেই স্থান অধিকার করিবে? অথবা এই বিদেশীয় ভাব চিন্তা ভারতীয় রীতি নীতি কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবে, এবং ভারতীয় রীতি নীতি স্বতন্ত্র থাকিবে। ভারতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে তাহাদের ভাব ও চিন্তা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের রীতি নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু রীতি নীতির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান সভ্যতা হিন্দু সমাজের প্রান্ত দেশ মাত্রকে স্পর্শ করিয়াছিল, সমাজদেহে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোক আংশিক ভাবে রাজাদিগের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা হিন্দু রীতি নীতির ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যে কয়েক শত বৎসর মুসলমান রাজত্ব এদেশে ছিল, সে কয় শত বৎসর মুসলমান ভাব হিন্দু রীতি নীতির প্রাচীরের বাহিরেই ছিল। এই জন্যই মুসলমান শক্তিকে বিলুপ্ত করা এত সহজসাধ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরেজী চিন্তা ও ভাব কি সেইরূপ হিন্দু রীতি নীতির প্রাচীরের বাহিরে থাকিবে? অথবা হিন্দু রীতি নীতি পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিবে। সে আকার সম্পূর্ণ ইংরেজীও নয় এবং সম্পূর্ণ ভারতীয়ও নয়। উভয়ের মিশ্রণ সম্ভূত।

যাঁহারা বিলাতি অনুকরণ প্রয়াসী তাঁহারা প্রথমটীর পক্ষ; যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রয়াসী তাঁহারা দ্বিতীয়টীর পক্ষ, আর আমাদের ন্যায় যাঁহারা সংস্কার প্রয়াসী তাঁহারা তৃতীয়টীর পক্ষ। অনুকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যাঁহারা দেশ, কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এবং জাতীয় প্রকৃতি ও প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অবিকল এক দেশের রীতি নীতি আর এক দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাঁহারা

অন্ধের ন্যায় কার্য্য করেন এবং তাহাদের সে প্রয়াস সফল হয় না। কারণ ইংরেজের রীতি নীতি শিখিলে কি হইবে? যে সকল মাল মসল্লা লইয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া চলিতে হইবে, তাহারা ভারতীয় সুতরাং অনুকরণ কোন রূপেই সুচারু হইবার উপায় নাই। অনুকরণের কথা বলিলেই আমাদের একটী গল্প মনে হয়। একবার এক চাষার গ্রামে যাত্রা হইতেছিল। এক জন চাষা গানে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ একটী গরু লইয়া যাত্রা স্থলে উপস্থিত হইল। গরুটী দিতে যায়, এমন সময়ে আর এক চাষা, যে ভদ্র গ্রামের ভদ্রলোকদিগের রীতি নীতি কিছু কিছু দেখিয়াছিল, তাহাকে বলিল "ওরে বাবুরা উমোলে বেধে পেলা দেয়," প্রথম চাষা মহা বিপদে পড়িল রুমাল কোথায় পায়? কাজেই অবশেষে গরুর পেটে গামছা বাঁধিয়া সভার মধ্যে উপস্থিত করিল। বাবুদিগের রুমালে বাঁধিয়া যাত্রার পারিতোষিক দেওয়ার অনুকরণ করিতে গিয়া যেমন গরুর পেটে গামছা বাঁধিতে হইয়াছিল; দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অনুকরণ করিতে গেলেও সেই দশা ঘটে। ইংরেজীতে দুইটী শব্দ আছে, imitation ও assimilation এই দুইটীতে অনেক প্রভেদ। একটী অনুকরণ অপরটী অঙ্গীকরণ। মূল ভাবটী লইয়া নিজের প্রকৃতি, রীতি, নীতি ও ইতিবৃত্ত অনুসারে তাহাকে গ্রহণ করার নাম অঙ্গীকরণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, জার্ম্মণি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি ইউরোপের জাতি সকল ইংলণ্ডের নিকট স্বায়ত্ব শাসন লইয়াছেন। ইহার অর্থ এই নয় যে তাঁহাদের এক একটী পার্লেমেণ্ট আছে, তাহাতে একটী হাউস অব কমন্স আছে, তাহার সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী ঠিক ইংলণ্ডের ন্যায়—কার্য্য প্রণালী ঠিক ইংলণ্ডের ন্যায়। একটী হাউস অব লর্ডস্ আছে, তাহারও ব্যবস্থা ইংরাজী হাউস অব লর্ডের ন্যায় ইত্যাদি। ইংলণ্ডের নিকট সায়ত্ব শাসন প্রণালী লওয়ার অর্থ এই যে তাঁহারা মূল ভাবটী ইংলণ্ডের নিকট পাইয়াছেন, গঠনটী স্বদেশের প্রকৃতি ও চরিত্রের অনুরূপ। মূল ভাবগুলি গ্রহণ কর। প্রকার ও প্রণালী গুলি জাতীয় থাকুক। মনে কর যে ইংরেজেরা পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সকলে একত্র আহার করে, এই রীতিটী এক জনের ভাল লাগিয়াছে। তাহা বলিয়া যে তাঁহাকে টেবলে বসিয়া, কাঁটা চামচ দিয়া আহার করিতে হইবে, অথবা বাঙ্গালির ভোজ্য অন্ন ব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের প্রণালীতে রন্ধন করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি? সপরিবারে আহার এই মূল ভাবটী গ্রহণ কর, দেশীয় রীতির অনুসারে তাহাকে কার্য্যে পরিণত কর; ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। অনুকরণ নয় কিন্তু অঙ্গীকরণ।

তবে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে একটী মূল কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমরা ঘরে দ্বার দিয়া কলমটী হাতে লইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া কতটা রাখিতে হইবে কতটা ভাঙ্গিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যবস্থা করিনা কেন ইহা নিশ্চয় যে সমাজ-সংস্কার সেরূপে সাধিত হইবে না। নির্জ্জনে বসিয়া বুদ্ধির তুলাদণ্ড ধরিয়া কোন বিষয়ে হিন্দুভাব কত তোলা থাকিলে ও পাশ্চাত্য ভাব কত তোলা মিশাইলে ভাল হয় তাহা বলা কঠিন নয়। কিন্তু আসল সংস্কার কার্য্যটা এরূপে চলিবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া নব্য ভারতের মনে যে সকল আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই উদিত হইবে, সেই সকল আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্য যে ভাব যতটুকু থাকিলে ভাল হয় তাহা থাকিয়া যাইবে, তাহার বেশীও থাকিবে না কমও থাকিবে না। যাঁহারা সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধরিতে পারিবেন ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত সংস্কারক।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল হইতে একজন ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন—বরিশাল জেলার অন্তর্গত গুবিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের দীক্ষিত হওয়ার বিজ্ঞাপন গত মাঘোৎসবের সময় প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা এখানকার হিন্দু সমাজের লোকের উদ্যোগে ও উত্তেজনায় একটী মোকদ্দমা করিয়া দীক্ষায় বাধা জন্মাইয়াছিলেন! কিন্তু বিগত ২৩এ বৈশাখ বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে উক্ত অন্নদাচরণ সেন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ৪ঠা ভাদ্র রবিবার বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে করাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাস মহাশয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

গত আষাঢ় মাসে বরিশালের গৈলা নিবাসী শ্রীললিত মোহন দাস সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হইয়াছেন। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার দীক্ষার নোটীশ বাহির হইয়াছিল। পরে তাহার আত্মীয়েরা ফাঁকি দিয়া তাহাকে ১ মাস কয়েদ করিয়া রাখেন। এই কারণেই তিনি বরিশালে দীক্ষিত হইতে না পারিয়া কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে দীক্ষিত হইয়াছেন।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত করটীয়া হইতে একজন লিখিয়াছেন—মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় ঘোর পৌত্তলিকতা পরিপূর্ণ কুসংস্কারাপন্ন করটীয়া নামক এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৮০৯ শকের ১২ই মাঃ বুধবার "করটীয়া ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার অপার কৃপাই ইহার একমাত্র অবলম্বন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা ও সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ইহার লক্ষ্য। প্রতি বুধবার সন্ধ্যারপর বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য ও বাবু ললিতমোহন বসু মহাশয় সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া থাকেন।

সুচারুরূপে সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটী "সংগীত সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যারপর কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু মিলিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

সমাজের কার্য্য নিয়মিত ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য ৮ আট জন সভ্য দ্বারা একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। এই সভার নিয়মানুসারে সমাজের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয় !

গত ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে বিধানবাদ সম্বন্ধে প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের একখানা সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন আমার অনেক উক্তির সহিত তিনি একমত। কিন্তু আমি যে বাস্তবিকরূপে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা স্বীকার করি না আমার পত্র হইতে তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা মানি বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য বড় একটা ব্যস্ত নই। আমার পত্র দ্বারা যেরূপ বুঝিবার সুবিধা হয়, আমি আপাততঃ সেইরূপেই পরিচিত থাকিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা প্রমাণ করিয়া সীতানাথ বাবু ইহাই বলিয়াছেন যে ঈশ্বর "নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা।" সীতানাথ বাবু ঈশ্বরকে "নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলিয়া যাঁহাদিগের মত সমর্থন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকরূপে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিধানবাদী অন্যান্য পত্রিকাদি হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ না করিয়া তত্ত্বকৌমুদী হইতেই কয়েকটী স্থান মাত্র উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি যে আমি যাঁহাদিগের কথার প্রতিবাদ করিয়াছি, সীতানাথ বাবু ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাদের মত বিশেষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। ১১শ ভাগ তত্ত্বকৌমুদীর ১১শ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে "বিধানবাদী সকলবিধানকেই সমচক্ষে দেখেন। প্রত্যেক বিধানই তৎকাল দেশও পাত্রোপযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল বিধানের সমন্বয় ও ইহা শেষ বিধান।"...যিনি শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম বিধানের বিশেষ ভাব সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া উহার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিধানের তুলনা করিয়া তারতম্য নির্দ্দেশ করিবেন।" শেষ বিধান বলাতে অনেকে প্রতিবাদ করাতে সম্পাদক ১৪শ সংখ্যায় তাহার উত্তর প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন যে "আমরা কিন্তু যে ভাবে মুসলমানেরা মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মকে শেষ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মকে শেষ ধর্ম্ম বিধান বলেন সে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে শেষ বিধান বলি নাই। সকল বিধানের শেষে এই বিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে সেই জন্যই উহাকে শেষ বিধান বলিয়াছি; ভবিষ্যতে আর বিধান হইবে না—এরূপ অর্থে উক্ত শব্দ প্রয়োগ করি নাই" ইত্যাদি। বর্ত্তমান বৎসরের ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীর "বিধান প্রবর্ত্তন ও বিধান সংস্থাপন" নামক প্রাপ্তপ্রবন্ধে একস্থানে লিখিত হইয়াছে এক একটী বিধান প্রবর্ত্তন এক একটী বহু দিনের স্তূপীকৃত পাপ, অপ্রেম ও অসত্যের উপর পুণ্য, প্রেম ও সত্যের আক্রমণ।" ১১শ ভাগ তত্ত্বকৌমুদীর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সম্পাদক "আমাদের দায়িত্ব" নামক প্রস্তাবের প্রথমেই লিখিয়াছেন,"যে সময় কোনও দেশে বা সমাজে ঈশ্বরের কৃপা ধর্ম্ম বিধানের আকারে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা ঐ দেশ বা সমাজের পক্ষে সুসময়।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, ধর্ম্ম বিধানের দিন, ঐশী শক্তি কর্ত্তৃক মানবাত্মার প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনের দিন চলিয়া যায় নাই। পরমেশ্বর মনুষ্য সমাজের কার্য্য কলাপ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।" অন্যত্র বলিতেছেন, "বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় জীবন্ত ধর্ম্মবিধানের আশ্রয় লাভ করা একদিকে যেমন সৌভাগ্যের বিষয় ইত্যাদি।" আবার আমাদের দায়িত্ব নামক ২য় প্রস্তাবে ঐ বৎসরের ১১শসংখ্যায় লিখিতেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন জগতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে, তাহাদের সার ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত। ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাহাদের পূর্ণতা। ঐ সমস্ত ধর্ম্মবিধান ঈশ্বরের করুণায় প্রত্যক্ষ প্রকাশ।" সীতানাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে একটী উপদেশে বিধানতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এবং যাহা ১০ম ভাগ তত্ত্বকৌমুদীর ৫ম সংখ্যায় বিধানতত্ত্ব নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির জীবন যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন নহে। কিন্তু একটী বিচিত্র ইতিহাস ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন, "তাহাতেই বলি ইহাঁরা জগতের জন্য আসিয়াছিলেন; ইহাঁদের জীবন সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি ইহাঁদের জীবন মানবের উন্নতির সাহায্যার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।" আবার বলিতেছেন, "যে প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু প্রভৃতি আত্মার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান, সেই প্রমাণ দ্বারাই—সেই প্রমাণে বরং উজ্জ্বলতর প্রয়োগে বুঝিতে পারি, বুদ্ধদেব ঈশা প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন জগতের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ বিধান।" তৎপর ঐ ভাগের ৬ষ্ঠ সংখ্যার উক্ত প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশের প্রথমেই বলিতেছেন, "এখন দেখা যাক, এই সকল মহজ্জীবনরূপ বিধান যে জগতে আসে, তাহা কিরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এই সকল বিধান সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? বিধানের উদ্দেশ্য (১) নূতন সত্যের প্রকাশ, (২) নবজীবন সঞ্চার।" আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে এই সকল প্রস্তাব গুলি ভাল করিয়া পড়িতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে বিধান বলিতে আমি যাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছি তাঁহারা কি বুঝিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। ঈশ্বরকে যাঁহারা নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে উক্তরূপ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব কিনা পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

বিধানবাদীদিগের সকলেই যদি ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা এবং নিত্য নূতন বিধানে বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই; আমি আমার পত্রের

এক স্থানে লিখিয়াছিলাম হয় তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য-বিধাতা না হয় তিনি একই বিধানের প্রেরয়িতা।" কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলেন আমি প্রধানতঃ তাঁহাদের কথারই প্রতিবাদ করিয়াছি। ঈশ্বর যদি নিত্য বিধান প্রেরণ করেন তাহা হইলে "এক একটী বিধান প্রবর্ত্তন এক একটী বহুদিনের স্তূপীকৃত পাপ, অসত্যের উপর পুণ্য, প্রেম ও সত্যের আক্রমণ।" এরূপ উক্তির কি স্বার্থকতা থাকে। ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপ, অসত্য অপ্রেমের উপর আক্রমণ করিতেছেন না বা করিতে পারেন না? যাহা হউক সীতানাথ বাবু যে প্রমাণে ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলিতে চাহেন তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। কারণ তিনি লিখিয়াছেন "কিন্তু বিধি ব্যবস্থার প্রকাশ; জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শের উদয়, এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।" অন্যত্র "এই যে মানব হৃদয়ে একটী সত্য, এক কণা প্রেম বা একটী পুণ্যাদর্শের প্রকাশ, এ কার্য্যের কারণ কে? কারণ নিশ্চয়ই ঈশ্বর, কেননা এই প্রকাশ সম্পূর্ণরূপেই মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।" এখন কথা হইতেছে যে বিধান বুঝিতে যদি মানবের কোনই হাত না থাকে, তাহা যদি সম্পূর্ণ রূপেই মানব-ইচ্ছানিরপেক্ষ হয় তবে অবশ্য প্রত্যেক বিধান প্রতি মনুষ্যের নিকটে একই সময়ে প্রকাশ পাইবে। ঈশ্বরের বিধান তাঁহার কোন সন্তানের জন্য আসিবে আবার কোন সন্তানের জন্য আসিবে না, ইহা হইতে পারে না। কারণ তিনি সকল সন্তানের প্রতিই সমান ভাবে করুণাময় এবং ন্যায়বান। কিন্তু জগতে ইহার সম্পূর্ণ অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। বিধাতার বিধান কেবল সকলে বুঝিতেছে না এমন নয়। কিন্তু বিধান একজনে লাভ করিয়া যদি অন্যকে প্রদান করিতে যায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, তাহা ত গ্রহণ করেই না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে নির্যাতনও করিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন সহস্র সহস্র লোক আছে বর্ত্তমান সময়ে যাহা নির্ব্বিবাদে সত্য সুতরাং ঈশ্বরের বিধান বলিয়া গৃহীত হইতেছে তাহারা তাহার কোন সংবাদও রাখে না। ঈশ্বরের বিধান মানব অন্তরে প্রকাশিত হইতে যদি তাহার ইচ্ছার কিছুই অপেক্ষা করে না, তবে এই সকল লোকের পক্ষে সেই বিধান বুঝিবার পক্ষে কি বাধা আছে। সীতানাথ বাবুর উক্তরূপ উক্তি দ্বারা সকল প্রকার ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা অস্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের চেষ্টার কোনই মূল্য নাই বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে ঈশ্বরের পূর্ণ ন্যায়পরতাও অস্বীকৃত হইতেছে। সীতানাথ বাবু অন্যত্র বলিয়াছেন যে "ব্যক্তিগত, বা সম্প্রদায় গত বিকাশের ভিন্নতা অনুসারে বিধানের ভিন্নতা হয়" এবং আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "যে কিন্তু এই সকল অপরিবর্ত্তনীয় সত্যে মানুষ অনেক সোপান, অনেক পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া উপনীত হয় এবং যে সকল উপায়ে উপনীত হয় সে সকল উপায় অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এমন কি অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধী।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যদি সত্যের বা বিধানের প্রকাশ মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষই হয় তাহা হইলে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা বিধানের ভিন্নতা এবং উপায়গুলি পরস্পর বিরোধী" হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? তাহাহইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে ঈশ্বর কাহারও নিকট সত্য প্রকাশ করেন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। কাহাকে অধিক আদর করেন, কাহাকেও বা কম আদর করেন। সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্বজনে সমান দয়া বা ন্যায়পরতা আর স্বীকৃত হইতেছে না। সীতানাথ বাবু কিন্তু প্রকারান্তরে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "বিধাতা প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায়কে ঠিকএক রূপ প্রকৃতি দিয়া গঠন করেন নাই।... কেহ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, কেহ যোগে শ্রেষ্ঠ, কেহ বা প্রেমে শ্রেষ্ঠ, কেহ বা সেবায় শ্রেষ্ঠ ... কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই পার্থক্য ঈশ্বরের অপক্ষপাতিত্বের বিরোধী। সে যাহা হউক" তবেই দেখা যাইতেছে প্রকৃত বিধানবাদ না মানিলে লোককে নানা দিক্ দিয়া অসুবিধায় পড়িতে হয়। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই আমাদিগের সকল প্রকার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া উচিত। পূর্ণ ন্যায়বান ঈশ্বরেই যদি পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে না হয় ওরূপ বিধানে নাই মানিলাম। জগতে বহু পার্থক্য আছে কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু তাহার কি আর অন্য ব্যাখ্যা হয় না?

সীতানাথ বাবুর আর একটী উক্তির প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন "বিশেষ বিশেষ সত্য ভাব বা অনুষ্ঠান প্রচারের ভার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হয়।" এই প্রকার বিশ্বাস হইতেই জগতে যত বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উক্তির প্রতিকূলে অনেক কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু পত্র বড় হইয়া যায় বলিয়া আমি ব্রাহ্মসাধারণের উপরই এবিষয়ের বিচার ভার অর্পণ করিলাম। সীতানাথ বাবুর যে সকল উক্তিতে আমার বিশেষ ভাবে আপত্তি ছিল এতক্ষণ তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক এখন আমার কথার যে সকল প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার কোন কোনটী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

আমি লিখিয়াছিলাম যে ঈশ্বর মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কল্যাণকর বিধি ব্যবস্থা তাহাতে বিহিত করিয়াছেন এবং তিনি নিজে সাহায্যদাতা ও শিক্ষক রূপে নিত্য সঙ্গী হইয়া আছেন। সীতানাথ বাবু এই কথার সম্বন্ধে আপত্তি পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে যদি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা হৃদয়রূপ শাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন ...... তাহা হইলে শিক্ষাদাতা ও সাহায্যদাতারূপে নিত্য সঙ্গী হইয়া অবস্থিত করিবার প্রয়োজন কি? তিনি কি প্রথম হইতেই এমন বিধান করিতে পারিলেন না...যে তাহার যে কোন শিক্ষা বা সাহায্য আবশ্যক হইবে তাহা সে নিজ প্রকৃতি হইতেই পাইবে। ইত্যাদি।

এই কথার উত্তরে আমি প্রথমতঃ বলিতেছি যে তিনি তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নামক পুস্তকে "ক্রমবিকাশ কেন" "ধীর উন্নতি প্রক্রিয়া কেন" প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলিয়াছেন যে "এই প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই দিতে পারে না।" আমিও তাহাই বলিতেছি ঈশ্বরই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন যে কেন প্রথম হইতে উক্তরূপ করেন নাই। তৎপরে বলিতেছি যে বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানের এই আশ্চর্য্য উন্নতির মধ্যে

জন্মগ্রহণ করিয়া কোন লোক যেমন শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে রাশি রাশি গ্রন্থের লিখিত বিষয় তাহার কোন কাজেই আসে না, তেমনি আত্মায় সমুদয় বিধি ব্যবস্থা লিখিত থাকিলেও তাহাতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সে সকল তাহার কোন কাজেই আসে না।

আমার উক্তরূপ ভাব প্রকাশের অর্থ এই নয় যে মানব আপন হৃদয়স্থিত জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতে এই সকলের মূল নিহিত থাকে। সীতানাথ বাবু যে এই মতে একবারে বিশ্বাস করেন না তাহাও নয়। কারণ তিনি বিধানতত্ত্ব নামক প্রস্তাবের এক স্থানে নূতন সত্যের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন "এবং নূতন সত্য বলিতে সেই সত্য বুঝায়, যে সত্য মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে নিহিত থাকে, লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন্ত বাণী শুনিলেই নিতান্ত আত্মীয় ও নিকটস্থ সুহৃদ বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়—যে সত্য হৃদয় কন্দরে নিদ্রিত থাকে কেবল বিশ্বাসীর ঢক্কা-ধ্বনি তুল্য গম্ভীর স্বর শুনিলেই জাগ্রত হয়।" সুতরাং আমার বিধান সম্বন্ধীয় মত শুধু আমারই মনঃকল্পিত নহে, কারণ সীতা-নাথ বাবুর এই উক্তি তাহার যথেষ্ট পোষকতা করিতেছে।

যাঁহারা জড় ও ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহা-দিগকে বাধ্য হইয়াই মানিতে হয় যে ঈশ্বরই বিকশিত হইয়া জড় জগত রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। কারণ জড় যে ক্রম-বিকশিত একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং যাঁহারা ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ মানিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা যে আত্মার ক্রম বিকাশ মানিতে কেন এত আপত্তি করিতেছেন বুঝিতে পারি না। প্রথম হইতে মূলে যাহার উপাদান না থাকে তাহার বিকাশ সম্ভবে না। আত্মার মূলে যদি প্রথম হইতেই জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি না থাকে তবে তাহারও বিকাশ সম্ভবে না। এই জন্যই বলিয়াছি যে ঈশ্বর আত্মার সমস্ত বিধান করিয়া তাহার সাহায্যদাতা ও শিক্ষাদাতা হইয়া আছেন। ক্ষুদ্র বীজটী হইতে যে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যদি প্রথমেই আলো, উত্তাপ ও রস গ্রহণ করিবার শক্তি নিহিত না থাকিত তবে সে কখনই এরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত না। ঈশ্বরকে এইরূপে বিধাতা মানিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্ব-জ্ঞতা, এবং ন্যায়পরতা প্রভৃতি বজায় থাকে বলিয়াই আমি উক্ত রূপ বিধানে বিশ্বাসী। তাঁহাকে নিত্য নূতন বিধানের বিধাতা মানিয়া যদি তাঁহার ন্যায়পরতা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু সীতানাথ বাবু বা কেহ তাহা পারেন নাই বা সে চেষ্টা করেন নাই।

সীতানাথ বাবু আমার লিখিত বিধানবাদকে প্রার্থনাবাদের প্রবল বিরোধী বলিয়াছেন। আমার উক্তি কেন যে প্রার্থনার বিরোধী তাহা আমি বুঝিতেছি না। সাহায্যদাতাও শিক্ষাদাতা বলিয়া আমার লিখায় যদি প্রকাশ না থাকিত, তাহা হইলে অব-শ্যই একথা খাটিত। কিন্তু মনুষ্য যে সাহায্য করে বা যাহার সাহায্য করিবার শক্তি আছে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকে। সাহায্য প্রাপ্তির আশা এবং সম্ভাবনাই প্রার্থনার মূল। সুতরাং আমার লিখা প্রার্থনাবাদের বিরোধী হইতেছে না। বরং ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরণ কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করি-লেই প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ যিনি নিজেই সকল জানিয়া শুনিয়া আপনা হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিধান করিতেছেন, তাঁহার নিকট আবার চাহিতে যাওয়ায় কোনই হেতু নাই। যিনি চাওয়ার অপেক্ষা করেন না এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার নিকট চাহিতে যাওয়া অস্বাভাবিক ও বৃথা পরিশ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সীতানাথ বাবু মানব অন্তরে বিধান প্রকাশকে যখন তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছানিরপেক্ষ বলিয়াছেন, তখন তিনিই বরং প্রকারান্তরে প্রার্থনার বিরোধীগণের সপক্ষতা করিয়াছেন।

আমার পত্র আর দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা নাই। বিধান বিষয়ক মতে আমরা যাহাতে ঐক্য হইতে পারি, তাহার বিচার জন্যই আমি প্রথম পত্র লিখিয়াছিলাম। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক একটী মীমাংসায় উপস্থিত হন ইহাই প্রার্থনা। কোন পত্রের প্রত্যেক কথা নিয়া সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে যাইয়া সুধু কথার কাটাকাটি করিয়া বিশেষ কোন ফল নাই। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাই বজায় থাকুক, আমার এমনও ইচ্ছা নয়। আমার বিশ্বাস যদি অসঙ্গত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিচার সঙ্গত মত গ্রহণ করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। ব্রাহ্মগণ এই বিষয়ে উদাসীন না হইয়া উপযুক্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করিব।

অনুগত

কলিকাতা আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

"জনৈক ব্রাহ্ম"—এই স্বাক্ষরিত পত্রে একজন পত্র প্রেরক ব্রাহ্ম যুবকদিগের প্রতি বয়স্ক ব্রাহ্মেরা দৃষ্টি রাখিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে। তাঁহার পত্রে নাম না থাকাতে তাহা মুদ্রিত হইতে পারিল না। নাম প্রকাশিত না হউক সম্পাদকের জানা আবশ্যক। নাম না দিয়া কেহ পত্র লিখিবেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল—শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত ও আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের মধ্যে বিধানবাদ সম্বন্ধে যে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঘোষাল মহাশয় এক পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার সমগ্র পত্র মুদ্রিত হইতে পারিল না, নিম্ন লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহার মনোভাব জানিতে পারা যাইবে।

"সাধনের দুইটি দিক আছে, একটী লক্ষ্য এবং আর একটী উপায়। জ্ঞানে প্রেমে উন্নত হইয়া ভগবানকে লাভ করা মান-বের লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে সাধন ভজন, সাধু-সংসর্গ লাভ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ভগবানের মধ্যেও এই লক্ষ্য এবং উপায়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়;—পরমাত্মার লক্ষ্য এই যে স্বীয় সাদৃশ্যে গঠিত জীবাত্মার সহবাসে অনন্ত কাল বাস করা। হংসিনী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষপুটে রাখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে, মহান পরমেশ্বর সেইরূপ

কোটী কোটী সন্তানকে বক্ষে করিয়া অনন্তকাল হইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। সন্তানদিগকে লইয়া ঘর কন্না করাই তাঁহার লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধনের জন্য চন্দ্র সূর্য্য কীরণ মণ্ডিত এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই উপায়।

জ্ঞান, প্রেম, কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা আত্মার বিকাশ হয়। যে সকল নিয়ম দ্বারা উক্ত জ্ঞান, প্রেম ও কার্য্যের উন্নতি হয় তাহাই ভগবানের উপায়। লক্ষ্য এবং উপায়ে এই পার্থক্য যে কোনও স্থলে এবং কোনও ব্যক্তিই ভগবানের লক্ষ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না;—মধুময় সহবাসের জন্য ভগবান জীবাত্মাকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন, এই আকর্ষণ হইতে কেহই দূরে থাকিতে পারে না। আজ হউক, কাল হউক, ইহ লোকে হউক কি পর লোকে হউক সকল মানবই এক দিন না এক দিন তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে বসিয়া বন্ধুত্বের আস্বাদ অনুভব করিবে। তবে এই সম্বন্ধ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি আমাদের সম্মুখে যে নানাবিধ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন আহা সকলের পক্ষে সমভাবে থাটে না।

মহাপুরুষগণ ঈশ্বর প্রেরিত বিধান প্রবর্ত্তক নহেন, তাঁহারা সমাজরূপ বৃক্ষের ফল স্বরূপ। একেশ্বরবাদী এবং বহুল ভাববাদী (প্রফেট) পূর্ণ ইহুদি সমাজ হইতে খৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের অভ্যুদয় সম্ভব; সেইরূপ পবিত্র ধর্ম্মভাব লইয়া কতকগুলি লোক অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্য হইতে বাহির হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সমাজ যত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সে সমাজ হইতেই সেরূপ ধার্ম্মিক লোক উদয় হন। ইহা ভগবানের উপদেশের ফল।

ঈশা, মহম্মদ, বৌদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে সকল ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সত্যাসত্য দুইই আছে। অসত্য আছে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। সত্যে সত্যে বিরোধ হয় না। তন্মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহাও বিধান নহে। ভগবানের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র।

যেমন ঈশ্বর এক ছাড়া দুই নাই, তেমন ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নাই। ব্রহ্মের স্বভাবই পূর্ণ ধর্ম্ম, অপূর্ণ মানব সেই ধর্ম্ম অপূর্ণ ভাবে সাধন করিয়া থাকে। যাহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাই মানবের ধর্ম্ম, পূর্ণাপূর্ণ মাত্র প্রভেদ। ব্রহ্মের ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। ঈশ্বর অপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম দিয়া আপন সাদৃশ্যে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা ঈশ্বরের লক্ষ্য তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম, যাহা মানবের লক্ষ্য তাহাই মানবের ধর্ম্ম। মানবের ধর্ম্ম ঈশ্বরের সহবাসে থাকা, ঈশ্বরের ধর্ম্ম মানবের সহবাসে থাকা। পূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান এবং আশ্রয়দাতা রূপে থাকিয়া অপূর্ণ মানবকে ধর্ম্ম সাধন করাইতেছেন। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সংক্ষেপে এই বলা হইয়াছে;—লক্ষ্য নিত্য স্থায়ী, উপায় পরীবর্ত্তনশীল। যাহা ভগবানের লক্ষ্য তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। মানবেরও যাহা লক্ষ্য তাহা ধর্ম্ম। ভগবান এবং মানবের ধর্ম্ম এক। পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই মাত্র পার্থক্য। যাহা ধর্ম্ম তাহাই বিধান। তিনি যখন একমেবাদ্বিতীয়ং সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মও এক এবং বিধি এক। পরিবর্ত্তনশীল উপায় বিধি নহে।

ব্রাহ্মসমাজ।

ভাদ্রমাসের তত্ত্ববোধিনী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"দাক্ষিণাত্যের কোন সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজা নিঃসন্তান। দত্তকগ্রহণ করা তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু চিরাগত প্রথানুসারে বহু দেবতার পূজা ও হোমাদি করিয়া দত্তকগ্রহণে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে একটী দত্তকগ্রহণের পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপলক্ষে যেরূপ পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া উক্ত রাজাকে প্রেরণ করেন এস্থলে তাহাই মুদ্রিত হইল।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি।

অনুষ্ঠাতা পূর্ব্বদিনে সংযত থাকিয়া পর দিনে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

আচার্য্য প্রতিবচনে কহিবেন।

ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ ভবন্তো ব্রুবন্তু।

আচার্য্য প্রতিবচনে ঋদ্ধ্যতাং বলিয়া পরে কহিবেন "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।"

অনন্তর অনুষ্ঠাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রে এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মের সান্নিধ্য অনুভব করিবেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেরা বিষ্ণুর পরম পদকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

পরে ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া সংকল্প করিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অপ্রজাত্বপ্রযুক্ত পৈতৃকঋণাপাকরণার্থং শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং আত্মবংশ রক্ষার্থং চ পুত্রপ্রতিগ্রহমহং করিষ্যে।

পরে এই সূক্ত পাঠ করিবেন।

যজ্জাগ্রতোদূরমুদেতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেত্যদূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

যেহেতু ব্রহ্ম জাগ্রত লোকের অদূরে আছেন এবং সুষুপ্ত লোকের অদূরে আছেন। তিনি জ্যোতির জ্যোতি এবং একমাত্র অতএব আমার মনের সঙ্কল্প শুভ হউক।

পরে কহিবেন।

সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা আচার্য্যকে বরণ করিবেন।

ওঁ সাধু ভবানাস্তাং।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ সাধ্বহমাসে।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ অর্চ্চয়।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু গ্রহণ পূর্ব্বক কহিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিতপুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি আচার্য্যকর্ম্মকরণায় অমুক গোত্রাং অমুকং ভবন্তমহং বৃণে।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ বৃতোস্মি।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

যথাজ্ঞানং আচার্য্যকর্ম্ম কুরু।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা বা পুত্রগৃহীতা পুত্রদাতার সমক্ষে গিয়া এই বলিয়া পুত্র ভিক্ষা করিবেন।

ওঁ পুত্রং মে দেহি।

আমাকে পুত্র দেও।

পরে পুত্রদাতা ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে প্রমাণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রদানকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু।

প্রতিবচনে আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।

পরে পুত্রদাতা কহিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ ভবন্তো ব্রুবন্তু।

প্রতিবচনে আচার্য্য ঋদ্ধ্যতাং বলিয়া কহিবেন।

স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

অনন্তর পুত্রদাতা সঙ্কল্প করিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবেন।

যৎজাগ্রতোঽদূরমুদেতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেত্যদূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

পরে কহিবেন।

সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অনন্তর, যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া পুত্রদান করিবেক।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ইমং পুত্রঃ তব পৈতৃকঋণাপাকরণার্থং বংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চ পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এই বলিয়া বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিবেন।

মম প্রতিগৃহ্নাতু পুত্রং ভবান।

আপনি আমার পুত্রকে প্রতিগ্রহ করুন। পরে পুত্রদাতা সুবর্ণ লইয়া কহিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীপরমেশ্বর প্রীতিকামনয়া যাচতে পুত্রদান সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এই বলিয়া পুত্রগৃহীতার হস্তে দক্ষিণা দিবেন।

পরে পুত্রগৃহীতা স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন।

অনন্তর দাতা বালককে গৃহীতার হস্তে দিবেন।

গৃহীতা স্বস্তি বলিয়া বালককে গ্রহণ করিবেন।

অনন্তর গৃহীতা বালককে উভয় হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া কহিবেন।

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি জায়সে আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতং।

তুমি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জন্মিতেছ, হৃদয় হইতে জন্মিতেছ, তুমি পুত্র নামক আত্মা, শত বৎসর জীবিত থাক।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিবে।

ত্বয়ি ভূর্লোক মাদধামি। ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি। স্বর্লোকমাদধামি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়িদধামি। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরেতল্লোকত্রয়োপলক্ষিতমেতদাশ্রিতং সর্ব্বং প্রমেয়জাতং ত্বয়ি দধামি। ত্বমনেন ত্রৈলোক্যগতপ্রমেয় জাতাধানকর্ম্মণা মেধাযুক্তো ভব।

তোমাতে ভূর্লোক আধান করিতেছি। তোমাতে ভুবলোক আধান করিতেছি। স্বর্লোক তোমাতে আধান করিতেছি। ভূর্ভুব ও স্বর্লোক তোমাতে আধান করিতেছি। ভূর্ভুব ও স্বর এই ত্রিলোকোপলক্ষিত এতদাশ্রিত সমস্ত প্রমিত বস্তু তোমাতে আধান করিতেছি। তুমি এই ত্রিলোকগত প্রমিত বস্তুর আধান কর্ম্ম দ্বারা মেধাযুক্ত হও।

ওঁ অশ্মাভব পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুতং ভব আত্মা বৈ পুত্র নামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতং।

তুমি প্রস্তরের ন্যায় কঠিনদেহ হও, পরশুর ন্যায় কঠিনদেহ হয় এবং সুবর্ণের ন্যায় অক্ষয় হও। তুমি পুত্র নামক আত্মা। শত বৎসর জীবিত থাক।

এই বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিবে। আশীর্ব্বাদ করিবার পর কহিবে।

ওঁ ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্নামি ওঁ সন্তানায় ত্বা পরিগৃহ্নামি।

আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি। সন্তানের নিমিত্ত তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি।

ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব।

তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে বস্ত্র পরিধান করাইয়া মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া কুঙ্কুমাদি দ্বারা তিলক করিয়া দিবে।

ওঁ হিরণ্যরূপমবসে হৃণুধ্বং।

শোভার নিমিত্ত স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে কুণ্ডল পরাইয়া দিবে। পরে তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া নৃতগীত বাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করিবে। পরে আপনার দক্ষিণ দিয়া, বালককে পত্নীর ক্রোড়ে রাখিয়া স্বয়ং উপবেশন করিবে।

অনন্তর আচার্য্য চন্দন লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।

কশ্যপের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য যৌবন জরা তাহা তোমার হউক।

এই বলিয়া বালকের ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।

দেবতাদিগের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য যৌবন জরা তাহা তোমার হউক।

এই বলিয়া বালকের কণ্ঠে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং।

সেই আয়ু তোমার হউক। এই বলিয়া হৃদয়ে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং।

সেই আয়ু তোমার হউক, এই বলিয়া দুই বাহুতে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিতপুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গআচার্য্যকর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপনার্থং ইমাং সবস্ত্রাং ধেনুং স্থবর্ণং (তন্মূল্যং বা) অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুকায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী পাঠ করিয়া অনেক ব্রাহ্মই বোধ হয় মনে মনে প্রশ্ন করিবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে আবার দত্তক কি? অনেকে হয়ত বলিবেন, জগদীশ্বর যাহাকে ধন সম্পদ দিয়াছেন, কিন্তু সন্তান দেন নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব যদি তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তিনি কেন সেই সব সম্পত্তি ভাল কাজে দিয়া যাউন না। ধন অর্জ্জন করিয়া উড়াইবার জন্য একটী লোক রাখিয়া যাওয়া প্রচীন কালের একটী কুসংস্কার। হিন্দুধর্ম্মে শ্রাদ্ধ করিবার লোক না থাকিলে পিতৃপুরুষের দুর্গতি হয়, ব্রাহ্মেরা ত তাহা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহাদের দত্তক গ্রহণের অভিপ্রায় কি? বিশেষ প্রাচীন কালের লোক বিশ্বাস করিতেন যে পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতার সম্পত্তি; সুতরাং তাহাদিগকে দান করিবার অধিকার পিতা মাতার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেরূপ বিশ্বাস করেন না, সুতরাং এপ্রকার দান ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা সঙ্গত নহে। ইহা একটী আলোচনীয় বিষয় ভবিষ্যতে এসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার অভিপ্রায় রহিল।

প্রচার—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ ১ সপ্তাহ কাল নলহাটীতে অবস্থিতি করিয়া নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন।

৫ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যার পর সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। উপাসনান্তে পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি পুনর্জ্জন্ম মতের বিষম ভুল অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেন। ৬ই শ্রাবণ—রবিবার অপরাহ্নে নলহাটীর নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে মনোরঞ্জন বাবুর চতুর্থ সন্তান (প্রথমা কন্যার) নামকরণ হয়। স্থানীয় ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, বালক বালিকাগণ পাহাড়ে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু উপাসনা করেন—বালিকার নাম "প্রেমলতা" রাখা হইয়াছে। ৭ই শ্রাবণ—সোমবার বৈকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনায় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। ৮ই শ্রাবণ—মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় স্কুল গৃহে "ব্রহ্ম পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। প্রথমে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও উপাসনার আবশ্যকতা এবং পরে নিরাকার ভিন্ন সাকারের ধ্যান ধারণা হইতেই পারে না"—এই বিষয় অতি সরল যুক্তি সমূহ দ্বারা বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতাটী বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৯ই শ্রাবণ বুধবার সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন। ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বৈকালে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনাদি হয়।

এতদ্ভিন্ন একটী ব্রাহ্ম পরিবারে প্রতিদিন প্রাতে পারিবারিক উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করেন।

সংবাদ।

শোক সংবাদ—বেহারস্থ শ্রদ্ধেয়বন্ধু বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ বিশেষ পরীক্ষায় পড়িয়াছেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় দিন দিন অগ্রসর হইয়াছেন। গত ৩২ এ আষাঢ় তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি ২৪ দিনের একটী শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদেব বাবু এই শোকের মধ্যে গৃহে এবং সমাজ কর্ত্তৃক নানারূপ অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন তিনি আপন বিশ্বাসানুসারে পরলোকগতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন তখন শুধু যে গৃহের লোকেই বিরোধী হইয়াছিলেন, এমন নহে প্রতিবাসীগণও খুব প্রতিবন্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এমন কি শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্নের জন্য পুলিষ পর্য্যন্ত আনিতে হইয়াছিল! কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় তিনি বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিশ্বাসের জয়! মানুষ যাহা সত্য বলিয়া বুঝে যদি সে অনুসারে চলিতে না পারে তবে একেবারে অসার ও অপদার্থ হইয়া যায়। ঈশ্বর এ দেশের লোকদিগকে সাহস দিন, যেন তাঁহারা বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হন। দয়াময় আমাদের বন্ধুকে শোকের সময় সান্ত্বনা এবং উজ্জ্বল বিশ্বাস প্রদান করুন এবং ইঁহার পরলোকগতাসহধর্ম্মিণীকে শান্তি দান করুন।

নামকরণ—গত ২রা ভাদ্র শনিবার কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম শ্রীমান্ নিরঞ্জন পাল রাখা হইয়াছে। বিপিন বাবু উপাসনা ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার—হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়মহাশয়ের ১ম পুত্রের নামকরণ কলিকাতা নগরে সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম শ্রীমান অমিয়কুমার রায় রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীশবাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৮ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
১১শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন সোমবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য

সাষ্টাঙ্গে ব্রহ্ম-পূজা।

প্রভু হে! মস্তিষ্কে বস; কল্পনা, কামনা
স্মৃতি চিন্তা আদি বৃত্তি সবে
মিলাইয়া তান লয়ে করুক বন্দনা,
জয় জয় ব্রহ্ম জয় রবে।

নেত্রেতে আসন পাত; তোমারি আলোকে
বিশ্ব-শোভা দেখুক নয়ন;
দেখুক তোমার লীলা, দ্যুলোকে ভূলোকে,
তব গুণ করুক কীর্ত্তন।

শ্রুতি সিংহাসনে বস; অভদ্র শ্রবণে
ঘুচে যাক্ তাহার কামনা;
সাধু সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গে সুধা আস্বাদনে
করুক সে তোমার বন্দনা।

রসনা আসনে বস; অভদ্র বচনে
পা'ক লজ্জা; সতে হোক্ মতি;
বজ্রের নিনাদ পা'ক সত্যের ঘোষণে;
গা'ক জয়, জয় বিশ্ব-পতি।

বাহুযুগে অধিষ্ঠান কর ধর্ম্মরাজ;
পাপ-পঙ্কে নাহি যেন মজে;
তাহার ভূষণ হোক প্রভু তব কাজ,
মাখুক সে তব পদ-রজে।

জঠরে আসন পাত;—চিত্তের বিকার
জন্মে যাহে, ঘুচুক সে রুচি;
ফল শস্যে তব কৃপা করুক প্রচার,
হয়ে থাক অন্তরেতে শুচি।

স্পর্শেন্দ্রিয়ে বস তুমি; পাপ আস্বাদন
ভুলে যাক্ তোমারি কৃপায়;
পাইয়ে পবিত্র প্রেম, অপূর্ব্ব মিলন,
প্রেমদাতা পূজুক তোমায়!

চরণযুগলে বস; পাপ-পথ ভুলে
যাক্ তারা জনম-মতন;
বহুক সান্ত্বনা, সুখ, দীন দুঃখী কুলে;
তব নাম করুক বহন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

দুর্ব্বলতা ভিতর হইতেই আসে—গতবারে আমরা বলিয়াছি দুর্ব্বলতা ভিতর হইতেই আসে। এবারে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। য়িহুদীগণ মহাত্মা ঈশাকে ধৃত করিয়া রোমীয় বিচারপতি পাইলেটের সমীপে যখন উপস্থিত করিল, তখন পাইলেট বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন মৃত্যু দণ্ড করিতে পারা যায় এরূপ কোন অপরাধ তিনি করেন নাই; অথচ য়ীহুদিগণ ক্ষিপ্ত প্রায়, তাহাদের মনোমত কাজ না করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইতে পারে। অবশেষে আর কিছু উপায় না দেখিয়া সমাগত য়ীহুদীদিগকে বলিলেন আজ তোমাদের উৎসবের দিন। আজ একজন কয়েদীকে কারামুক্ত করিবার নিয়ম আছে; তদনুসারে এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাক্না কেন? য়িহুদীগণ একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—না—না—"ঐ ব্যক্তিকে হত্যা কর বরং বারাবাসকে (একজন চোর) আমাদের জন্য ছাড়িয়া দেও!" এমনি ধর্ম্মান্ধতা! তাহারা ঈশার জীবন অপেক্ষা একটা চোরের জীবন মূল্যবান জ্ঞান করিল!!! জগতে এরূপ ব্যাপার বার বার ঘটিয়াছে। সাধুদিগকে অসাধুর শাস্তি পাইয়া নিধন প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে যে বস্তু ছিল, তাহা কেহ কখন গোপন করিতে পারে নাই। চন্দনকে পাষাণ-শিলাতে ঘষিলে যেমন তাহার সৌরভ বাহির হয়, তাঁহাদের জীবনের সৌরভও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই উপদেশ পাই, ভিতরে যদি বস্তু থাকে, লোকের কুসংস্কার, বা বিদ্বেষে তাহাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। আজ না হোক দু দিন পরে তাহার প্রভাব বিস্তার হইবেই হইবে। বিশ্বাস কর, সত্য ও সাধুতার জয়বিধাতা স্বয়ং ঈশ্বর। মানবের প্রতিযোগিতায়

যদি নিরাশ হই, তাহাতে এই প্রমাণ হয় আমরা ঐশী শক্তি অপেক্ষা মানব শক্তিকে বড় মনে করি। ব্রাহ্ম সমাজের কুৎসা যদি কেহ করে ছুটিয়া লাঠি লইয়া রাস্তায় যাইও না; সত্য ও সাধুতাকে আরও দৃঢ় ভাবে আশ্রয় কর, কুৎসাকারীর রসনা কদিন থাকিবে? সত্যের শক্তি অক্ষয়!

ব্রাহ্ম সমিতি—অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিগত অধিবেশন কালে এলাহাবাদ নগরে যে সকল ব্রাহ্ম বন্ধু উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক দিন সকলে একত্র হইয়া এক সভা করেন; তাহাতে এই স্থির হয় যে প্রতি বর্ষে কংগ্রেস সভার অধিবেশন কালে, এইরূপ ব্রাহ্মসমিতিরও অধিবেশন হইবে। তদনুসারে কয়েক ব্যক্তির প্রতি আয়োজন করিবার ভার দেওয়া হয়। কংগ্রেসের সময় নিকট হইয়া আসিতেছে। আর সময় নাই সমুদায় সমাজে এতদর্থ অনুরোধ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর আপনাদের সমাজের এক এক জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার আয়োজন করুন! কংগ্রেস সভা খৃষ্টমাস উৎসবের ছুটীর মধ্যেই বসিয়া থাকে সুতরাং আর কয়েক দিনের ছুটী লইলেই যাঁহারা কোন প্রকার কার্য্যে আবদ্ধ আছেন, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন, আর যাঁহারা কোন প্রকার কার্য্যে আবদ্ধ নহেন তাঁহাদের ত কথাই নাই। বোম্বাই নগরে যাতায়াতের ব্যয়টা কোথা হইতে উঠে? ইহার দুই উপায় আছে; প্রথম, যাহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হইবেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের অনেককে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপেও মনোনীত করান যাইতে পারে। তাহা হইলে তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যয়ের অনেক সাহায্য হইতে পারে। দ্বিতীয়, এতদর্থ স্থানীয় সমাজ চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয় এবিষয়ে একটু ভরাভর করিয়া লাগিলে একটা না একটা উপায় হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মের সংখ্যা ত এক মুষ্টি। এই এক মুষ্টি লোক আবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অতি দুর্ব্বল ভাবাপন্ন রহিয়াছে। একতার দিকে যত গতি হয় ততই প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মগণ হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছেন—এই বিচ্ছিন্ন ভাব দূর না করিলে, এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হওয়া সহজ নহে।

একতাতেই দৃঢ়তা—এই একটা উপদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা পাইয়া আসিতেছি। গ্রাস দেশীয় দাস পণ্ডিত ঈশপের সময় হইতে একটী গল্প চলিয়া আসিতেছে। এক কৃষক মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন তোমরা পাঁচটী কাটি লইয়া এস। কাটি আনা হইলে এক এক জনের হাতে এক একটী দিয়া বলিলেন ভাঙ্গ। এক একজন অক্লেশে এক একটী কাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আবার বলিলেন আর পাঁচটী কাটি আন। আবার আনা হইল, সেবার পাঁচটীকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া প্রত্যেককে ভাঙ্গিতে আদেশ করিলেন কেহই পারিল না। তখন বলিলেন এরূপে পাঁচ ভায়ে এক হৃদয় থাকিলে কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। ইহা অনেক দিন শুনিয়াছি। কেন মনে রাখিতে পারিতেছি না? আমাদিগের মিলিত হইবার পথে কে বাধা দিতেছে? এ বিষয়ে একটা বিষয় চিন্তা করিবার আছে। একজন মানুষের দুদিক দেখা যায়। চাই তার দোষ ভাগের প্রতি দৃষ্টি কর; চাই তার গুণভাগের প্রতি দৃষ্টি কর। তবে এই দুই প্রকার দেখাতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। দোষভাগ যদি কেবল দেখ—দেখিবার তোমার অধিকার আছে—তবে ঘৃণারই উদয় হইবে। অপ্রেম জন্মিবে; বিদ্বেষ বুদ্ধি আসিবে। আবার যদি গুণভাগের প্রতি দৃষ্টি কর কোমল ভাব জন্মিবে; স্নেহ আসিবে; ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িবে; এবং তাহাতে তোমার ও তাহার উভয়ের কল্যাণ হইবে। যেমন মানুষের দোষ গুণ দুই দেখা যাইতে পারে, সেইরূপ অপরের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহারও দুই দিক আছে। প্রথম, বিচ্ছেদের দিক, দ্বিতীয় মিলনের দিক। তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে আর এক জনের সহিত তোমার কোন কোন বিষয়ে গরমিল আছে, তাহাই খুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহারই ধ্যান করিতে পার; আবার ইচ্ছা করিলে গরমিলটা ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া না তুলিয়া মিলটার দিকে দৃষ্টি করিতে পার। এইরূপ দুই প্রকার দেখাতে প্রভেদ আছে। কেবল গরমিল খুঁজিয়া বেড়াও হৃদয় দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিবে, নিকটে দাঁড়াইতে চাহিবে না, গরমিলের বিষয় গুলা বড় গুরুতর বোধ হইবে, বাধা দিতে ও প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্তি বাড়িবে। আবার মিলের যে বিষয় গুলি আছে, সে দিকে অধিক দেখ, মনে কোমল ভাব আসিবে, একত্র বসিতে ইচ্ছা হইবে, এক সঙ্গে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে। আমাদের ভয় হয় ব্রাহ্মদিগের মিল অপেক্ষা গরমিলের দিকে অধিক দৃষ্টিপাত করারূপ রোগে ধরিয়াছে, তাই তাঁহারা ভাল করিয়া মিলিতে পারিতেছেন না।

স্বাধীনতা ও সাধুভক্তি—এই উভয়ে যখন একত্রে বাস করে তখন উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হয়। একজন নিজের মত ও বিশ্বাস অনুসারে চলিতে ও বলিতে সাহসী, অথচ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিকট, তাহার মস্তক বিনয়ে অবনত এ ছবি অতি সুন্দর। সুদন সমরের অধিনায়ক জেনেরল গর্ডনের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার এত সাহস ছিল, যে লোকে যেমন ছড়ি হাতে করিয়া প্রাতঃসঞ্চরণে বাহির হয় সেইরূপ তিনি ছড়ি হাতে করিয়া অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন এবং সমরক্ষেত্রে ব্যস্ততা, রক্তপাত, কামানের গর্জ্জনের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের আদেশ করিতেন। একদিকে যাঁহার এতদূর মানসিক বল, আর একদিকে তাঁহার এতদূর বিনয় ছিল যে, তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও একটী ধর্ম্মের কথা বলিতে পারিতেন না। এমন কি ধর্ম্ম বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সকল বিতরণ করিতে ভাল বাসিতেন, তাহাও কাহারও হাতে দিতে পারিতেন না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় পকেটে

করিয়া কতকগুলি পুস্তিকা লইয়া বাহির হইতেন; পথে যাইতে যাইতে যখন দেখিতেন নিকটে কেহ নাই অমনি এমন স্থানে পুস্তিকা ফেলিয়া যাইতেন, যেখানে ফেলিলে লোকের চক্ষে পড়িতে পারে। ঐ সাহসের পার্শ্বে এই বিনয় কেমন সুন্দর দেখায়। যেখানে স্বাধীনতা-প্রিয়তার সহিত সাধুভক্তি নাই তাহা ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়; আবার যেখানে সাধু ভক্তির সহিত স্বাধীন চিন্তা নাই, তাহা কুসংস্কারে ও ভ্রমান্ধতায় পরিণত হয়। এই উভয়ের সম্মিলন কি প্রকারে হইতে পারে?

উন্নতির মূলমন্ত্র।—আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক এবাহাম লিঙ্কনের জীবনচরিতখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলাম; দিয়া স্থিরচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম লিঙ্কন কৃষকের পর্ণকুটীরে জন্মিয়া আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন—ইহার ভিতরের কথা কি? অবশ্য প্রথম কথা প্রতিভা। কিন্তু অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও গতি হীনভাবে চিরদিন থাকিয়াছেন; লিঙ্কনের কি গুণ ছিল যদ্দ্বারা একগুণ প্রতিভা দশগুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিল? ইহার উত্তর—লিঙ্কনে দুইটী দেখিতে পাই। প্রথম, যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন তাহা সুন্দররূপে করিবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা। লিঙ্কন যে জমি চষিয়াছেন তাহা এমনভাবে চষিয়াছেন যাহা দেখিয়া দশজনে ডাকিয়া খাটাইয়াছে; একটী নৌকা গড়িলেন তাহা এমন উৎকৃষ্ট হইল যে, লোকে দেখিবামাত্র মাল বোঝাই দিল; বেড়ার রেল নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। দোকানদারের ম্যানেজার হইলেন, এমন শ্রম, এমন কর্ত্তব্যপরায়ণতা, এমন নিজকার্য্যে মনোযোগ দেখাইলেন যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। যখন যে কাজে হাত দিব তাহা উৎকৃষ্টরূপে করিব এই যেন আকাঙ্ক্ষা ছিল। দ্বিতীয়—যখন যে অবস্থাতে থাকি, মানসিক উন্নতির সুবিধা বিফলে যাইতে দিব না। প্রথম অবস্থাতে তাঁহার গ্রন্থ ক্রয় করিবার সাধ্য ছিল না পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া গ্রন্থ ধার করিয়া আনিয়া পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিতেন। ঘরে পড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এমন শিখিলেন যে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া উঠিলেন। আইনের প্রশ্ন সমীপে আসিল, এমন একাগ্রতার সহিত আইন পড়িলেন যে একজন বিখ্যাত উকীল হইয়া উঠিলেন। যে কার্য্য হাতে পড়ে তাহা উৎকৃষ্টরূপে করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা ও সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে আত্মোন্নতির স্পৃহা। এই দুইটী তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উন্নতি যাঁহারা চান তাঁহাদের সিঁড়ির এই দুইটী বাঁশ। যে কাজ হাতে পড়িবে তাহা দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। এবং যেখানে থাক না কেন, গ্রন্থপাঠ, আত্মচিন্তাদিদ্বারা মানসিক উন্নতিতে বিমুখ থাকিও না। অনেক ব্রাহ্মের মানসিক উন্নতির স্পৃহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন পাঠ অনেক করিয়াছি আর পাঠ করিব কি? ইহার ফল এই হয় মানসিক শক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের শক্তিরও হ্রাস হয়।

সাম্প্রদায়িকতার জন্ম কোথায় ও তাহার ঔষধ কি?—ব্রাহ্মসমাজের অনেক হিতৈষী বন্ধু আমাদিগকে বলিতেছেন ব্রাহ্মগণ বড় সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িতেছেন। হিন্দু নামকে হিন্দুসমাজকে তাঁহারা ঘৃণা করেন; আপনাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর বাহিরে যে সাধুতা বা মহত্ব আছে তাহা দেখিতে পান না; অপরের গুণের প্রতি তাঁহারা অন্ধ। সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে জন্মে? নানা কারণে দেশীয় সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। সে সকল কারণের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জ্জন ও রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা দানের প্রয়াস তাহার মধ্যে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। এই বিরোধ অনিবার্য্য। কিন্তু ব্রাহ্মেরা চিন্তাবিহীন ও মানসিক উন্নতি বিহীন থাকিলে ইহার একটী অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিবে। বিরোধীগণের আঘাত পাইয়া ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মেরই মধ্যে আবদ্ধ হইবেন এবং ক্রমে বিরোধীদিগকে বিদ্বেষ করিতে শিখিবেন। এক দিকে স্বদলের মধ্যে সর্ব্বদা আবদ্ধ, অপরদিকে বাহিরের লোকের প্রতি বিদ্বেষ, এই দুইটী একত্র মিলিলে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহার নাম সাম্প্রদায়িকতা। ইহার ঔষধ কি? (১ম) অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও কর্ম্মাদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করা (২য়) নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অপর লোকের সহিত সর্ব্বদা মিশিবার চেষ্টা করা (৩য়) গভীর জ্ঞানালোচনাদ্বারা চিত্তকে উদার রাখা।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিকতার নৈতিক ভিত্তি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বিজ্ঞ ইংরাজ এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাতে এক প্রবন্ধ লিখিলেন। ঐ প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যে যে সংবাদ দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; তবে তিনি উপসংহারে যে একটী কথা লিখিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঠিক কথাগুলি মনে নাই, ভাবটা এই। ইহারা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও গভীর ভাব সকল প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাদের উক্তি সকল পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইতে হয় যে যাহারা খৃষ্টধর্ম্মকে আশ্রয় করে নাই, তাহারা এত গভীর তত্ত্ব কিরূপে পাইল। কিন্তু ইহাদের নৈতিক শক্তি আধ্যাত্মিকতার অনুরূপ নহে। ইহাদের জীবনে নৈতিক হীনতা দৃষ্ট হইতেছে। তিনি ইংরেজী (moral inadequacy) শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা বলা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না যে, তিনি ব্রাহ্মদিগকে নানা প্রকার নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার এই কথা বলিবার কারণও তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ইহাদের অগ্রণী ব্যক্তিগণই ইহাদের উচ্চ আদর্শের অনুসারে চলিতে অক্ষম; সুতরাং

ইহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদিগের নিকট যাহা চায়, ইহারা তাহা দিতে প্রস্তুত নহে।

ব্রাহ্মগণ এই কথা গুলির প্রতি প্রনিধান করুন—"ইহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদের নিকট যে জীবন চায়, তাহা দিবার মত নৈতিক শক্তি ইহাদের নাই।" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ভাবে যে উদারতা, যে নিঃস্বার্থতা, যে সাহস, যে সত্যানুরাগ, যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা চায়, তাহা দিবার সাধ্য এখনও ব্রাহ্মদিগের নাই। এ কথা কি মিথ্যা? ইহা কি কুৎসার কথা? আমাদের ত বোধ হয় না। কেন বোধ হয় না তাহার বলিবার পূর্ব্বে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের কথাটী একটু বিশদরূপে প্রকাশকরা আবশ্যক বোধ হইতেছে। মনে কর এক ব্যক্তি বিপত্নীক হইয়াছে, তাহার প্রকাণ্ড সংসার দুই একটী শিশু আছে, দাস দাসী আছে, গরু বাছুর আছে, অতিথি অভ্যাগত আছে। গৃহিণী অভাবে সমুদায় বিশৃঙ্খল। দেশীয়প্রথা অনুসারে সে ব্যক্তি একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষেই তাহাকে ঘর কন্না করিবার জন্য আনিল। বালিকাটি যেই সেই সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছে, অমনি তাহার স্কন্ধে সমুদায় ভার পড়িয়া গেল। এক দিকে পতিসেবা, অন্যদিকে শিশুসেবা, ও গৃহস্থালি, বালিকাটির শরীর ভাঙ্গিয়া গেল; দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার উপরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই কয়েকটী সন্তানের মুখ দর্শন করিতে হইল। বালিকাটী অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ না করিতে করিতে মিলাইয়া গেল। এরূপ ঘটনা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। প্রশ্ন এই বালিকাটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল কেন? উত্তর—তাহার নূতন সংসার তাহার নিকট যাহা চায়, তাহা দিবার শক্তি তাহার ছিল না। সে কি চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিয়াছে? সুগৃহিণী হইবার ইচ্ছা কি তাহার ছিল না? সমুচিতরূপে পতিসেবা ও গৃহস্থালি করিবার বাসনা কি তাহার ছিল না? অবশ্যই ছিল। বরং এতদূর বলা যায়, যে সে বাসনা প্রবল ছিল বলিয়াই তাহার অকাল মৃত্যু ঘটনা হইল। যদি সে অলস বা অকর্ম্মণ্য, বা স্বার্থপর, বা পতির প্রতি উদাসীন, বা গৃহকার্য্যে অমনোযোগী হইত, যদি সে আপনার শরীরটী বাঁচাইয়া, ঘুমাইয়া কাল কাটাইতে পারিত তাহা হইলে সে মরিত না। সংসার যুদ্ধে সে তিল তিল করিয়া মরিল; কর্ত্তব্যের চরণে আপনাকে বলিদান করিল। যাহাই বলি না কেন, ভিতরের সত্যটা এই থাকিয়া গেল—নূতন সংসার তাহার নিকট যাহা চাহিয়াছিল তাহা দিবার শক্তি তাহার ছিল না।

আমাদের বোধ হয় ব্রাহ্মদের এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট যাহা চাহিতেছেন তাহা দিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। অত নৈতিক বল অন্তরে নাই। অর্থাৎ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সুচারুরূপে সাধন ও প্রচার করিতে হইল যে বৈরাগ্য, যে আত্ম-সংযম, যে উদারতা, যে নিঃস্বার্থতা, যে সাধু ভক্তি, যে জনহিতেচ্ছা, যে সাধন-তৎপরতার প্রয়োজন—তাহা আমাদের নাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব কিরূপে, যখন দেখিতেছি আমাদের অগ্রণী ব্যক্তিগণ আমাদের আদর্শকে ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। ভাগ্যে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পরম শ্রদ্ধাভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আজিও বাঁচিয়া আছেন, তবু ইহাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান যাইতে পারিতেছে। ইহাঁদের জীবনের আদর্শের সহিত সকল ব্রাহ্মের আদর্শের মিলন না হউক এ কথাত বলিতে পারা যাইতেছে যে ইহাঁরা যৌবনে যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহার অনুসরণ করিতেছেন। নতুবা লোকে যখন বলে—"তোমাদের উপর নির্ভর করিব কিরূপে? তোমাদের অগ্রণী ব্যক্তিরাই এক সময়ে যাহা গড়িয়াছেন পরে তাহা ভাঙ্গিয়াছেন। তোমাদের কেশবচন্দ্র এক সময়ে যাহা গড়িলেন, নিজেই তাহা ভাঙ্গিলেন; তোমাদের বিজয়কৃষ্ণ যে আদর্শের জন্য এক সময়ে প্রাণপণ করিলেন পরে তাহা ছাড়িলেন; তোমাদের অগ্নিহোত্রী যেই একটু বাড়িলেন অমনি পূর্ব্বকার আদর্শত্যাগ করিয়া গেলেন; আরও অপেক্ষা কর আরও কতজন ছাড়িবে।" লোকে যখন এরূপ কথা বলে, তখন আমাদের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়; এবং আমরা অনুভব করিতে থাকি, যে ইহাই ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ। যাঁহারা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সরল সত্যানুরাগে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধেয়। আমরা ক্ষোভ করিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কর্কশ শব্দ ব্যবহার করিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অনিবার্য্য।

কেবল যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জীবনে আমাদের আদর্শ রক্ষা পাইতেছে না তাহা নহে, ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যেও বিবেকের দুর্ব্বলতা দেখিয়া মনোবেদনা পাইতে হইতেছে। গুরুতর দুর্নীতি না থাকিলেই যে আনন্দ করিতে হইবে, তাহা নহে। ব্রাহ্মেরা গাট কাটে না; মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না; প্রবঞ্চনা করে না; মিথ্যা কথা কহে না; ইহা বলিলে যদি কোন ব্রাহ্ম সন্তুষ্ট হন হউন; আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। আমরা যদি দেখি ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম, অথবা স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী বা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ, তাহা হইলেই মনে হয় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নৈতিক ভিত্তি পাইতেছে না। এক প্রকার আধ্যাত্মিকতা আছে, যাহা নীতি-নিরপেক্ষ হইয়া বাস করে। সে আত্ম-তৃপ্ত আধ্যাত্মিকতা ব্রাহ্মসমাজ সাধন করিবেন বলিয়া সংকল্প করেন না।

আমাদের দেশে এই আত্মতৃপ্ত আধ্যাত্মিকতার দুইটী পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী পথ জ্ঞানের, অপরটী ভাবুকতার আত্ম-তৃপ্ত জ্ঞানের পথে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান-তৃপ্ত হইয়া নির্জ্জনে সেই জ্ঞানের তৃপ্তি সুধা সম্ভোগ করিয়াছেন এবং নীতিকে জগতের অজ্ঞ মানবকুলের শাসনের নিগড় জানিয়া তৎপ্রতি উদাসীন হইয়াছেন। ভাবুকতার পথাবলম্বীরাও আধ্যাত্মিকতার নৈতিক ভিত্তিকে অবহেলা করিয়াছেন। ভাবের সুমধুর সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক আনন্দরসে এতই মগ্ন হইয়াছেন, যে বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অতি অসার ও "মায়িক" কার্য্য বোধে উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রারম্ভ হইতেই এই আত্ম-তৃপ্ত আধ্যাত্মিকতার পথ বর্জ্জন করি-

যাছেন। কিন্তু করিলে কি হয় আত্ম-তৃপ্ত আধ্যাত্মিকতার রক্তে আমাদের আত্মার রক্ত মাংস গঠিত—আমাদের নৈতিক তেজ আসিতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিকট যাহা চাহিতেছেন আমরা তাহা দিতে পারিতেছি না। এই দুর্ব্বলতা ও সংগ্রাম এখনও অনেক কাল চলিবে; যদি আমরা পরিশ্রান্ত বা নিরাশ না হইয়া পড়ি; ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ লক্ষ্য এক দিন সিদ্ধ হইবেই হইবে।

আমরা কি হইব। ১

(প্রাপ্ত)

বিজ্ঞানবিশারদ মহাত্মা সার আইজাক্ নিউটন আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"I am gathering pebbles at the sea shore" জ্ঞানের অনন্ত পারাপারের উপকূলস্থ উপলখণ্ডসকল আহরণ করিতেছেন। জ্ঞানময়স্বরূপ ব্রহ্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে—তাঁহার গভীরতার ভিতরে মগ্ন হইতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার কথার গূঢ় তাৎপর্য্য।

ধর্ম্মগত প্রাণ সক্রেটিস বলিতেন, লোকে যে তাঁহাকে পণ্ডিত বলে সে কথা বাস্তবিকই সত্য, কারণ প্রত্যেকেই মনে করে সে নিজে বেশী বুঝিয়া থাকে, তাহার বুঝিবার এবং বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার শক্তি অন্যের অপেক্ষা অধিক। কেহই নিজকে অপদার্থ মূর্খ বলিয়া মনে করে না, কিন্তু তিনি বুঝিতেন যে তাঁহার সে জ্ঞানাভিমান নাই; অন্যেরাও যে অপদার্থ তিনিও সেই অপদার্থ তবে প্রভেদ এই যে তাহারা তাহা বুঝে না, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার অপদার্থতা বুঝিতে পারাতেই তিনি নিজকে অপরের অপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। ইহাতেই লোকের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা যদি এই আদর্শে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিব? আমরা কি দেখিতে পাইব যে অনন্ত পরব্রহ্মের সংস্পর্শে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ও অপদার্থতা এই রূপে অনুভব করিয়াছি? মানব হইয়া জন্মগ্রহণ করার মূল্য এবং তজ্জনিত যে গৌরবানুভূতি ও অভিমান, তাহা কি ব্রহ্মের সর্ব্বজয়ী শক্তির নিকট পরাভব মানিয়াছে? আপনার ক্ষুদ্রত্ব কি বুঝিয়াছি? তাহা যদি হইত তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনেক পূর্ব্বে ভিন্ন আকার ধারণ করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা আমাদিগকে এদেশের অগ্রণী দল বলিয়া মনে করিতাম। মনে করিতাম ধর্ম্ম বিষয়ে এবং সামাজিক সকল প্রকার হিত সাধনে আমরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, ইহার ফল এই হইয়াছে যে আমরা আর ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরের লোকের প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারি না, ক্রমে এরূপ হইয়াছে যে বন্ধু বান্ধবদের প্রতিবাদও সহ্য হয় না। যাহাদের পরস্পরের লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, এক সূত্রে ভাগ্য বাঁধিয়া আপন আপন কল্যাণ সাধন করিতে এবং সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে যাহারা মিলিত হইয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের আদেশে আপনার জনকে পর করিতে এবং পরকে আপনার করিতে বাধ্য হইয়াছে—ধর্ম্ম তাহাদিগকে যেখানে লইয়া যাইবে তাহারা সেই খানে যাইতে প্রতিশ্রুত, তবে কেন নিজ নিজ দোষ প্রদর্শনে মর্ম্মপীড়া পাইয়া সমালোচকের উপর শত্রু ভাব পোষণ করি, সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে বন্ধুকে শত্রু কেন করি? বিধাতার অভিপ্রায় বুঝা ভার। বোধ হয় আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী দল সকল সৃষ্ট করিয়াছেন। বাল্য বিবাহ দেশের অশেষ অকল্যাণের কারণ ব্রাহ্মেরাই একথা প্রচার করিলেন; তাঁহারা কাজেও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদের বিশেষত্ব চলিয়া যাইতেছে, হিন্দু সমাজে পুত্রকন্যার অভিভাবকগণ বিবাহের গুরুতর দায়িত্ব ক্রমে অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বয়স্কা পাত্রী পাওয়া যায়, কন্যার পিতা মাতা কন্যার বিবাহের সময়ে উপার্জ্জনক্ষম পাত্র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চক্ষের উপর এমন সকল ঘটনা উপস্থিত আছে যাহা উল্লেখ করিলে ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বিধবা বিবাহে ব্রাহ্মগণের উৎসাহ সন্দেহ কোন দিন তাঁহারা ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নহেন। পরিচ্ছদ দিতে তাঁহারা যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা এক্ষণে অনেক হিন্দু পরিবারে প্রচলিত হইতেছে। তৎপরে প্রধান কথা এই যে সাহিত্য বিষয়ে এক দিন ব্রাহ্মগণ অগ্রণী ছিলেন। পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ও তাঁহার উপযুক্ত সন্তানগণ পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং তাঁহার অনুচরগণ কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য সংসারে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখনও যে ব্রাহ্মসমাজত্রয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে অনেক শ্রম করিতেছেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ না করিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজ এ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছেন। প্রশ্ন এই যে, কেন এরূপ হইল? ইহার প্রধান কারণ এই প্রশ্নের প্রারম্ভে দুটি প্রাতঃ স্মরণীয় মহাত্মার উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। "আমরা এত বড় উপযুক্ত লোক যে দেশকে উদ্ধার করিব।" এচিন্তা অলক্ষিত ভাবে আমাদের অন্তরে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া আমরা সেই অপরাধের ফলভোগ করিতেছি। ব্রহ্মের কৃপায় এসমস্ত হইতেছে, তিনিই ইহার পৃষ্ঠপোষক তিনিই কৃপা করিয়া এসকল অপদার্থ লোকদ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইতেছেন, আমরা তাঁহার অনুগত সৈন্যদল—তাঁহারই অঙ্গুলি সঙ্কেত বুঝিয়া বুঝিয়া তাহারই অনুসরণ করিব। তাঁহার সংসারের মঙ্গলের জন্য নিজ ব্যক্তিত্ব বলি দিব ইহাই তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার এই ইচ্ছার অধীন হইয়া তাঁহার সন্তানদের কল্যাণ সাধন করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই কাজ যতটুকু পারি করিব—শেষে বিশ্বাসভরে তাঁহারই ক্রোড়ে শয়ন করিব। ইহাই ব্রাহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—দুঃখের বিষয় আমরা অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যাই। যখন সে কথা স্মরণ হয় তখনই আমাদের দ্বারা একটু কাজ হয়। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মদের মনের পূর্ব্ব ধারণা একটু ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে—বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিতেছি আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার অর্থাৎ "সর্ব্বে সর্ব্বা" ভাবটা একটু কমিতেছে, কমিবার কারণও আছে, চারিদিকের প্রতিকূল ঘটনা সকল আমাদের এই জ্ঞানকে আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে।

এখন বোধ হয় একটু নির্ভরশীল হইবার, একটু বিনয়ী হইবার ইচ্ছা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহারও আবার নূতন প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে। এক প্রকার জাল বিনয় দেখা দিয়াছে—জাল বিনয় অর্থাৎ মনে মনে নিজকে খুব কাজের লোক, খুব উপযুক্ত লোক বলিয়া জানা আছে, অথচ বাহিরে লোকের নিকট, বিনয়ের চরম সীমায় দাঁড়াইয়া বলিতেছি—আজ্ঞে না আমি—আমি অতি অপদার্থ, মূর্খ, কোন গুণ নাই। এই বিনয়ের যে একটা প্রশংসা আছে তাহার প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মনের মহত্ত্ব ও হৃদয়ের উদারতা হরণ করে।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি একবার বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের হাওয়ার ভিতরে আমাদের একটা অপদার্থ লোককে কিছু কাল রাখিয়া দাও, সে একটা নূতন মানুষ হইয়া যাইবে, তাহার প্রভাব সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিবে, কথাটীর মধ্যে ভাবিবার বিষয় আছে, এমন কি শক্তি কি জ্ঞান কি ক্ষমতার প্রভাব এখানে আছে যাহার সংস্পর্শে লোক ফুটিয়া উঠে? সে প্রভাব ব্রহ্ম কৃপা, কিন্তু আবার অপর দিকে যাঁহাকে আমরা যত শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি, তাঁহার নিকটস্থ হইতে ততই বাধা পাইতে হয়, কেহ কেহ এ ভাবের অতীত হইলেও সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একথা বলিলে অন্যায় হয় না যে The more spiritual minded, the more unapproachable, যতই ধর্ম্ম জীবনে—আধ্যাত্মিকতায় অগ্রসর ততই তাঁহার নিকটে যাইতে, আলাপ করিতে, তর্ক করিতে ভয় হয়, প্রতিবাদে ও মত ভেদে ভয়ানক মন মালিন্য সংঘটিত হয়, এমন কি পরস্পরের ধর্ম্মভাব, উপাসনাশীলতা এবং সাধারণ সদ্ভাবের প্রতি পর্য্যন্ত সন্দেহ জন্মিতে থাকে। শিক্ষা ও মতের একতা সত্ত্বেও একজন লোক পাঁচ জনের বিরাগ ভাজন হইলে তাহার বন্ধু হওয়া পর্য্যন্ত সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে, আবার একজন পাঁচ জনের প্রিয় পাত্র, তাহার বিরুদ্ধে কোন সঙ্গত কথা বলাও তত সহজ নহে। এই রূপ ভাব-প্রবল সমাজে বাস করিয়া কখনই উন্নতি করিতে, শান্তি, সুখ, সম্ভোগ করিতে পারে না, এরূপ অবস্থায় সমাজ গড়িয়া উঠা কঠিন হইয়া উঠে। সমাজের শ্রদ্ধেয় অগ্রণীগণের সর্ব্বাগ্রে এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মের ভাব বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজে এক একটী সঙ্কীর্ণতর গণ্ডি প্রস্তুত করি এবং আমার গণ্ডির বাহিরের লোককে সকল বিষয়ে আমাপেক্ষা হীন মনে করি, তবেই ত অজ্ঞাতসারে আমার অধঃপতনের আয়োজন করিলাম। নববিধানী বাহিরের লোকেতে আর উচ্চ ধর্ম্ম দেখিতে পান না। যোগের দলের বাহিরে যে ব্যক্তি আছে সে যোগের দল ভুক্ত অধমতম এক ব্যক্তি অপেক্ষা যে অধম, যোগীর নিকট ইহা আর বিচারসাপেক্ষ নহে—আবার আইডিয়ালিজ্‌মের দলের অধমতম স্থানে অবস্থিত ব্যক্তি, দলের বাহিরের কোন এক ব্যক্তি অপেক্ষা (যাহার সম্বন্ধে হয়ত ভাল মন্দ কিছুই জানা নাই—অথবা যাহা জানি তাহা ভালই জানি,) অধিক পদার্থবান এরূপ সংস্কার কেবল তাঁহাদেরই হইতে পারে, যাঁহাদের মন দিন দিন অনুদার হইয়া পড়িতেছে।

এক জনের মুখ খানি ঠিক আমার মুখের মত নয় বলিয়া যেমন তাহাকে মানুষ মনে না করা বাতুলতা, স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন লোকমণ্ডলীর সকল গুলি লোক এক ছাঁচে গড়া হইবে এ কথা ভাবাও ঠিক সেই রূপ। এক জনের ব্রহ্ম বিজ্ঞান অপরের ব্রহ্ম বিজ্ঞানের সহিত না মিলিলেই তাহাকে "mob" বলিয়া উপেক্ষা ও পরিহাস করিতে দেখিয়া কি মনে করিব? এমন অবস্থায় এক জনের নিজের গণ্ডির বাহিরের লোককে নিজ গণ্ডির অপগণ্ড বালক অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ ভাবিলে কি উদারতা রক্ষা পায়? না নিজের গৌরব বৃদ্ধি হয়? বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্ম-জীবনের আভ্যন্তরিক দুর্দ্দশা না হইলে এরূপ ভাবিতে পারে না। প্রিয় পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া আপনার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ত্রুটি দুর্ব্বলতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে আর এরূপ ভাব মনে উদয় হয় না। অনেকে পরলোকগত আত্মাদের দৌরাত্ম্যে (ভূতের দৌরাত্ম্য) বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভাল তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে পরলোকগত আত্মাদের মধ্যে পুণ্যাত্মারা আত্ম কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্রত থাকেন দৌরাত্ম্য করিতে অবসর পান না, যাহারা সংসারের পাপভারে অবসন্ন তাহারাই আসিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কি আসিবার অবকাশ আছে? যে ব্যক্তি নিজের জ্বালায় অস্থির সে আবার অন্যকে বিরক্ত করিতে আসিবে কি? ব্রাহ্ম ভাই তুমি যদি আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া থাক তবে আর অপরের বিষয়ে হাত দিবার অবকাশ কোথায়? তাই প্রারম্ভে বলিয়াছি মহাত্মা সক্রেটিস ও নিউটনের মত হইতে হইবে তাহা হইলে আমাদের ভিতর যে সকল বিসদৃশ ভাব দেখা যাইতেছে—যে সকল বিষয়ে আমরা হীনবল হইয়া পড়িতেছি, যে সকল বিষয়ে আমরা পশ্চাদপদ হইয়া পড়িতেছি, সে সকল বিষয় আপনাপনি আমাদের আয়ত্বাধীন হইবে। আমরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া অধিকাংশ কাজ করি, কাজে কাজেই আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম সাধন যে বাহাড়ম্বরপূর্ণ তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে আমাদের প্রেম অপ্রেমিক অভাগাজনের উপর ধাবিত হয় না। ধর্ম্মের গাঢ়তা ও মাধুর্য্য দেখিতে হইলে এখন অনেক দিন আমাদিগকে খৃষ্টশিষ্যের দিকে তাকাইতে হইবে। যাহাকে পছন্দ করি না—তাহাকে যখন ভাল বাসিতে আমরা শিখিব তখনই আমাদের ধর্ম্ম জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। অনেক কাজ নিজ শক্তিতে হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ কথাটি আর পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। নিজের কতটুকু শক্তি যে তাহাদ্বারা আবার একটী এত বড় কাজ হইবে? বিধাতার শক্তিই শক্তি, সেই শক্তির অনুগত জনই মহাজন।

সজন উপাসনা ও নির্জ্জন উপাসনা।

(প্রাপ্ত)

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও সজন উপাসনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বুঝেন না। এবং কেহ কেহ বা এতদুভয়েরতুল্য উপকারিতাই অস্বীকার করেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই দুইটাই দুই

আধ্যাত্মিক রোগের দুই প্রকার মহৌষধ এবং একজন ব্রহ্মোপাসক বা ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তির সময়ে এই উভয়েরই তুল্যরূপে আবশ্যক হয়।

প্রথমতঃ দেখা যাউক উপাসনার আবশ্যকতা কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত কোন ব্যক্তিকে যুক্তি দ্বারা উপাসনার আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে না, তিনি উপাসনাকে একটী (necessity) অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি নিজ জীবনে উপাসনার ফল প্রত্যক্ষ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের উপাস্য উপাসক, সেব্য সেবক, পালক প্রজা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করেন, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নানাবিধ কর্ত্তব্য আছে একথা মানেন, এক কথায় যাহারা আমাদের (moral responsibility) নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেন (utilitarian অর্থাৎ হিতবাদী ব্যতীত সকল আস্তিকই এ কথা মানেন) তাহারা ও একটু অনুধাবন করিলে মানুষ মাত্রকেই উপসনাশীল হইতে পরামর্শ দিবেন। আমার যষ্টিটী মাটীতে পড়িয়া গেলে একজন উঠাইয়া দিলে অমনি তাহাকে বলি "Thank you"—"আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি", মনে করি একথা না বলিলে সৌজন্যের ত্রুটি হয়, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তাহাই যদি হইল তবে প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার কৃপা লাভ করিতেছি যাহার কৃপা বর্জ্জিত হইয়া এক তিলও বাঁচিতে পারি না, তাঁহার নিকট বুঝি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই? ঈশ্বর নির্ম্মল, আমরা ঘোর পাপী, ঈশ্বর নিত্য, আমরা ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বর দয়ার সাগর, আমরা নরাধম। সুতরাং তাঁহার কৃপার ভিখারী। এসকল কথা জানিলে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও কি বলিব তাঁহার কাছে আমার যাচ্ঞা করিবার কিছুই নাই, তিনি আমার অভাব জানিতেছেন, তাঁহার কাছে প্রার্থনার আবশ্যক নাই ইত্যাদি, কখনই নহে। বরং একথাই বলিতে হইবে যে সর্ব্ব প্রকার অপূর্ণ মানবকে পূর্ণ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকাই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ জনক ও শ্রেয়ঃ কল্প। যাহারা নিত্য উপাসনাশীল তাহারা উপাসনাকে এই জন্যই আত্মার খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, খাদ্য ব্যতীত যেমন শরীর জীবিত থাকে না, তেমনি উপাসনা ব্যতীত আত্মার সজীবতা থাকে না। বাস্তবিক এই অস্থির নৈরাশ্যময় সংসারে উপাসনাই আত্মাকে স্থির ও আশ্বস্ত রাখে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই হস্তপদ সঞ্চালন করিতে হয়, নতুবা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ এই পাপ প্রলোভনময় বিঘ্নাকীর্ণ সংসারে ও আত্মাকে সর্ব্বদা উপাসনার দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত রাখিতে হয় নতুবা আমার পতন নিশ্চিত।

সকলেই বোধ করি অনুভব করিয়া থাকিবেন যে যখনই আমরা সাংসারিকতার একটু বেশী মজি তখনই আমাদের আত্মা যেন প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়ে, আমাদের বোধ হয় যেন আমরা আর সে রাজ্যের প্রজা নাই এবং সে রাজ্যের তত্ত্ব লইতে অধিকারী নহি। কোন প্রিয় বন্ধুর তত্ত্ব অধিক দিন না লইলে তাহার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই আমরা লজ্জিত হই, তাহার সঙ্গে তেমন মুক্ত ভাবে হৃদয় খুলিয়া আলাপ করিতে সাহসী হই না। বহুদিনের পর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেও আত্মার ঠিক সেইরূপ ভাব হয়, প্রত্যেক সজীব আত্মাই এই কথার সাক্ষ্য দিবে। আত্মার এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাহার বহির্ম্মুখীন গতি ফিরাইবার জন্য এবং তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী নির্জ্জন উপাসনার আবশ্যক। হৃদয়ের শুষ্কতা নির্জ্জন উপাসনা ব্যতীত কিছুতেই দূর হইবার নহে, এইটী নির্জ্জন উপাসনার একটী বিশেষ অবশ্যকতা। সজন উপাসনা সর্ব্বদা সম্ভবে না। অতএব প্রত্যহ নির্জ্জন উপাসনা দ্বারা আত্মার সজীবতা, ধর্ম্মের জন্য একাগ্রতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজগুলি রক্ষা করা কর্ত্তব্য, নির্জ্জন উপাসনা আত্মার ব্যক্তিগত কল্যাণের সম্পূর্ণ উপযোগী, এতদ্ভিন্ন তাহার নানাবিধ উপকারিতা আছে। আমরা তাহার উল্লেখ না করিয়া সজন উপাসনার আবশ্যকতা কি তাহা সংক্ষেপে বলিব।

নদীতে যেমন মধ্যে মধ্যে ভাটা লাগে তেমনি আমাদের আত্মাতে কখন কখন ভাবের অত্যন্ত অভাব হয়, আত্মার ভাব প্রবণতা একেবারে কমিয়া যায়। নাম গানে, উপাসনায়, কীর্ত্তনে কিছুতেই মন তত মাতে না। চোকের সম্মুখে কোন ব্যক্তি কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া, অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রভুর নাম করিলেও প্রাণে তত আবেগ হয় না। আত্মার এই মহাব্যাধির ঔষধ সজন উপাসনা, এই অবস্থায় সজন উপাসনা অতি উপকারী। যেমন একটী স্রোতের বেগ অত্যন্ত মন্দ থাকিলে, আর দশটী স্রোত তাহার সঙ্গে মিশিবামাত্রই বর্দ্ধিত বেগে অভিপ্রেত পথে অবাধে চলিতে থাকে, তেমনি একটী আত্মার ক্ষুদ্র ভাবস্রোত আর একটী আত্মার ভাবযোগে প্রবল না হউক কিন্তু আর দশটী আত্মার ভাবস্রোতের সঙ্গে একীভূত হইলে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়কে প্লাবিত করে, তখন কার সাধ্য বাধা দেয়! তখন আত্মার এই প্রেমোন্মত্ততা এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামক রোগের ন্যায় সঞ্চারিত হয়। উপাসকগণ ভাবে বিভোর হইয়া বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, আত্মারামকে নিজ আত্মাতে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন। হৃদয়ের শুষ্কতা, দীনতা, চিরকালের জন্য পলাইয়া যায়।

অতএব দেখিতে পাই আত্মার অবস্থাভেদে এই দুই প্রকার উপাসনারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপকারিতা আছে। কোনটীর দ্বারা বেশী উপকৃত হই এবং কোনটীর দ্বারা কম উপকৃত হই বলিতে পারি না।

ভ্রমসংশোধন।

শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ছকড়ি ঘোষ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের সংবাদ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয় নাই। বিস্মৃতি ক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পাঠকগণের বিদিতার্থে লিখিতেছি উক্ত বিবাহ গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী জীবনবালা ঘোষ, বিবাহ কালে বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর ছিল ইনি গত বৎসর বেথুন কলেজ হইতে এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পাত্রের নাম শ্রীমান্ জয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল,

বিবাহ কালে বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর ছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে এই বিবাহ উপলক্ষে ছকড়ি বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মবিজ্ঞান।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মবিজ্ঞান (Theology) কি ? এবিষয়ে আমি অনেক সময় চিন্তা করিয়া বড়ই দুঃখিত হই। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যিনি যেরূপ ইচ্ছা ধর্ম্মমত বিশ্বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে চিন্তাশীল ব্রাহ্মদিগের কোন সাধারণ ধর্ম্ম মত নাই; ধর্ম্ম মত এখন ব্যক্তিগত। ধর্ম্মমত ব্যক্তিগত হওয়াতে আমি দুঃখিত নই বরং আনন্দিত এবং ইচ্ছা করি ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাধারণ ধর্ম্ম মত উঠিয়া যাক। কিন্তু ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মবিজ্ঞান(Theology) সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ ইহার সকল দিক দেখিয়া চিন্তা করেন না বলিয়াই আমি দুঃখিত। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মবিজ্ঞান কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সীতানাথ বাবুর "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পুস্তক পড়িয়া মনে হইল যদি ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ চিন্তাশীল লোকের আদর হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে। সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন তাঁহার মতের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ও নববিধান সমাজের গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের ঐক্য আছে (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ১৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। তাহা হইলে সীতানাথ বাবুর অধ্যাত্মবাদ সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্মবিজ্ঞান হইবে এরূপ আশা করা যায়। সীতানাথ বাবুও এরূপ আশা করিয়াছেন। কিন্তু সীতানাথ বাবুর অধ্যাত্মবাদে যে প্রকাণ্ড ভ্রম (তাঁহার নিজের মতে, আমার মতে ভ্রম নহে) রহিয়াছে, সীতানাথ বাবু এত চিন্তাশীল হইয়া কেন যে তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বলিতে পারি না। সীতানাথ বাবুর "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পুস্তকের শেষ অধ্যায় ব্যতীত আর সকল অধ্যায়ই যুক্তিপূর্ণ, যদিও দুই এক স্থলে তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। সীতানাথ বাবু যখন শেষ অধ্যায় লিখিতেছিলেন, তখন কি তাঁহার পূর্ব্বমত একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অনেক তর্ক যুক্তি করিয়া যে মত খাড়া করিলেন, শেষ অধ্যায়ে নিজেই সেই মতের প্রতিবাদ করিলেন। সীতানাথ বাবু প্রকৃতিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া, কিছু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন, ঐ মতের দার্শনিকদিগকে কিছু কটুক্তি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন (৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। আমি সীতানাথ বাবুর শেষ অধ্যায় পড়িয়া ভাবিলাম মানবের দুর্ব্বলতা সর্ব্বত্রই সমান। সীতানাথ বাবু এত চিন্তা ও ধর্ম্মসাধন করিয়াও মনে এপ্রকার অহঙ্কার ও আত্মাভিমান রাখিয়াছেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। নিজের মহাভ্রম না দেখিয়া অপরকে কটুক্তি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাটা বোধ হয় ভাল হয় নাই। আমি সীতানাথ বাবুর এই মহাভ্রম দেখাইতেছি। সীতানাথ বাবুর "জ্ঞান ও কাল" এবিষয়টী যিনি চিন্তার সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রেম ও অপ্রেম, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পাপ ও পুণ্য সকল ঘটনার আশ্রয় ও আধার বলিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু সীতানাথ বাবু ব্রহ্মকে কেবল পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নিজেই নিজের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই যখন অনন্ত কালে অর্থাৎ অনন্ত ঘটনা প্রবাহ রহিয়াছে, অতীত কালে ভাল, মন্দ যত ঘটনা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান কালে মঙ্গল, অমঙ্গল যত ঘটনা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে সাধু অসাধু যত ঘটনা ঘটিবে সকলেই যদি সমান ভাবে তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বর্ত্তমান রহিল, তাহা হইলে কি জগতের পাপ, অসাধু ও অমঙ্গল ঘটনা সকল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে রহিল না ? জীবাত্মার পাপ ও অসাধু চিন্তা কি পরমাত্মা হইতে আসিতেছে না ? জীবাত্মা যে সকল সাধুচিন্তা করিয়া বিস্মৃত হন, সে সকল জীবাত্মার জ্ঞান হইতে যায় বটে, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞানে থাকে। সেইরূপ জীবাত্মা যে সকল অসাধুচিন্তা করিয়া বিস্মৃত হন তাহাও পরমাত্মার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিতি করে। জ্ঞান সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক, যখন ইহা কালে আমাদের মনে আসিতেছে এবং অনন্তকালে যখন অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের পাপ পুণ্য সকল জ্ঞান তাঁহা হইতে আমাদের মনে আসিতেছে এবং আমাদের মন হইতে তাঁহার মনে যাইতেছে। সুষুপ্তির প্রথম ভাগে আমরা সাধু অসাধু সকল চিন্তাই (কারণ উভয় প্রকার চিন্তাই কালে ঘটিতেছে) তাঁহার হস্তে দিয়া নিদ্রা যাই, আর জাগ্রত হইবার সময় তাঁহারই হস্ত হইতে সাধু, অসাধু সকল চিন্তা ফিরিয়া পাই। তিনি সাধু চিন্তাকে যেরূপ আদরের সহিত রক্ষা করেন, অসাধু চিন্তাকেও তেমনি আদরের সহিত রক্ষা করেন। একজন লোক নিদ্রা যাইবার সময় অন্য একজন লোককে হত্যা করিবে এই ভাবিতে ভাবিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। নিদ্রার সময় সে তাহার জ্ঞানকে হারাইয়া ফেলে, কিন্তু ব্রহ্ম যত্ন করিয়া তাহার এই জ্ঞানকে নিজে রক্ষা করেন এবং জাগ্রত হইবামাত্র পুনরায় তাহাকে সেই জ্ঞান প্রদান করেন। সে ব্যক্তি ঐ জ্ঞান পাইয়া যাহাকে বধ করিবে ভাবিতেছিল, তাহাকে বধ করিল। ব্রহ্ম যদি তাহাকে ঐ জ্ঞান ফিরাইয়া না দিতেন তাহা হইলে সে বধ করিত না, সে একেবারে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যাইত। এখন সীতানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি এই হত্যাকাণ্ডের কর্ত্তা কি ব্রহ্ম হইলেন না ? সীতানাথ বাবু এখন দেখুন তাঁহার অধ্যাত্মবাদ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-যোগ স্থাপন করিতে গিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আবার কি করিয়া বলেন যে ব্রহ্ম কেবল পূর্ণ পবিত্রতার আধার তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তাই বলি অধ্যাত্মবাদীই হও আর ঘোর অদ্বৈতবাদীই হও, যদি সত্য জ্ঞানের ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে চাও তাহা হইলে সমস্ত পাপ ও অমঙ্গল ঘটনার কারণ যে ঈশ্বর তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি কল্পনার অন্ধ বিশ্বাসের, ও ভাবুকতার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সুখ লাভ করিতে চাও,

তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা কর কোন আপত্তি নাই। আশাকরি সীতানাথ বাবু ইহার উত্তর এই পত্রে লিখিবেন, যদি না লেখেন তাহা হইলে বুঝিব তাঁহার আর কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর নাই, অর্থাৎ তাঁহার ভ্রম প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীহরকালী সেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী"-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

"তত্ত্বকৌমুদীর" বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধানবাদ সম্বন্ধীয় পত্রকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমি বিধানবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহাতে অপর কয়েক জন বিধানবাদীর মতের পোষকতা হয় না। অপর বিভাগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমার ব্যাখ্যাত বিধানবাদের মূল সূত্র যাহা, অর্থাৎ বিধান-প্রকাশ মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, এই মত সত্য নহে। তৃতীয় বিভাগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যাখ্যাত মতে নহে, কিন্তু আমারই ব্যাখ্যাত বিধানবাদে ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা থাকে না, প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না, ইত্যাদি। এই বিভাগে অনেক গুলি এমন বিষয় আছে, যাহাকে আদিনাথ বাবুর নিজের কথায়ই "কথার কাটাকাটি" বলা যায়। আদিনাথ বাবু আমাদিগকে এই "কথার কাটাকাটি" হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত এই পরামর্শের অনুরূপ নহে। যাহা হউক, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিয়া পরামর্শেরই অনুসরণ করিব। প্রথম বিভাগ সম্বন্ধে ও আমি আপাততঃ কিছু বলিব না। আদিনাথ বাবুর উদ্ধৃত বিধানবাদী উক্তি গুলিতে আমি আমার ব্যাখ্যাত বিধানবাদের বিরোধী কিছু দেখি না; যদি কিছু বিরোধ থাকে, তাহা ভাষার বিরোধ। কিন্তু আমার বিশ্বাসের সহিত মিলুক আর নাই মিলুক, আমি অপর বিধানবাদীদিগের উক্তি সমর্থন বা ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য নহি। বিধান-বিরোধী দিগের মধ্যে যেমন মতের অনৈক্য আছে, বিধানবাদীদিগের মধ্যেও তেমনি অনৈক্য থাকিতে পারে ও আছে। আদিনাথবাবু যাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে নিজ নিজ মতকে সমর্থন করিয়া পত্র লিখিবেন। আমি আমার বক্তব্য প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিভাগে আবদ্ধ রাখিব।

আদিনাথ বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ অনৈক্য এই;—আমি বলি, বিধান-প্রকাশ মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, ইহার কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর; বিধান নিত্য নূতন, সুতরাং ঈশ্বর নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রেরণ করেন; মানবের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং বিধান ও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সমুদায় বিধানের লক্ষ্য এক, ইত্যাদি। আদিনাথ বাবু বলেন, বিধানের বীজ ঈশ্বর প্রথম হইতেই আত্মাতে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ যে বিধান বুঝে না, সে তাহার নিজের দোষে; সে বুঝিতে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন। বিধান প্রকাশ যদি মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইত, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইত, তবে মানবের অবস্থার এত অনৈক্য হইত না। অনৈক্যের কারণ ঈশ্বর নহেন; তিনি অনৈক্যের কারণ হইলে তিনি পক্ষপাতী হইতেন; অনৈক্যের কারণ মানবের ইচ্ছা; মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বর-প্রদত্ত সত্য দর্শন করে না। এখন দেখা যাইতেছে "নিহিত" কথাটা লইয়াই যত অনৈক্য। বিধানের বীজ কি অর্থে আত্মায় নিহিত ছিল? "নিহিত" অবস্থায় মানব তাহা জানিতে পারে কি না? জানা না জানার উপরই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে। যদি বলেন 'জানিতে পারে না,' 'নিহিত থাকার' অর্থ অজ্ঞাত অবস্থায় থাকা, তবে স্বীকার করা হইল যে নিহিত অবস্থায় বিধানের প্রকাশ হয় না। যে অবস্থায় বিধানের প্রকাশ হয় না, সে অবস্থা দার্শনিকের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় তাহার কোন প্রয়োজন নাই; বিধান-প্রকাশের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। আমি পূর্ব্ব পত্রে 'নিহিত থাকা' সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—"যদি স্বীকারও করা যায় যে কোন না কোন অর্থে এই সমুদায় আমার আত্মাতে নিহিত আছে, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে যখন আমি সজ্ঞানে এই সমুদয় লাভ করি, যখন আমার জ্ঞানগত জীবনে এই সমুদায় প্রকাশিত হইয়া আমার আত্মাকে আকর্ষণ করে, আমার উপর দাবি বসায়, তখন একটী নূতন ঘটনা ঘটে"। এখন, যদি বলেন যে 'নিহিত' অবস্থায় বিধান প্রকাশিত থাকে, নিহিত থাকা আর প্রকাশিত হওয়া একই কথা,—আদিনাথ বাবুর মত ইহাই বলিয়া বোধ হয়—তবে চেষ্টা করিয়া জানা, চেষ্টা করিয়া বুঝার কোন অর্থই থাকে না। যাহা প্রকাশিত রহিয়াছে, জানা রহিয়াছে, তাহা আবার জানিব কি? এই মূল বিষয়টীর প্রতি পাঠকের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিধান-প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার ঈশ্বরের হস্তে দিতে আদিনাথ বাবু নিতান্তই নারাজ, কিন্তু আমি দেখিতেছি বাধ্য হইয়াই তাহা ঈশ্বরের হস্তে দিতে হইতেছে। "প্রকাশ" ব্যাপারটাই এমন, "জানা" কার্য্যটাই এমন, যে তাহা কখনো জ্ঞাতার ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইতে পারে না। 'প্রকাশ' ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইলে তাহা আর 'প্রকাশ' থাকে না, ধাঁধা হইয়া দাঁড়ায়; 'জ্ঞান' ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইলে তাহা আর 'জ্ঞান' থাকে না, কল্পনা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা যে দেখি, শুনি, এই সকল আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা জ্ঞানের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, তাহাতে জ্ঞান আনিতে পারে না, বাহিরের আলোক আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে চক্ষুতে না পড়িলে দেখা অসম্ভব; যাহা দেখি তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আমার জ্ঞানের সমক্ষে আসে। কিরূপ বস্তু দেখিব, তাহা আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে; আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইলে আমার ইচ্ছানুরূপ দৃষ্ট বস্তুর পরিবর্ত্তন হইত। আমার কান যে খোলা থাকে, তাহা আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে; শব্দ যে আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহাও আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে; কি শব্দ

শুনিব, তাহাও আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করিবার যে আমাদের একটু শক্তি আছে, তাহাও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মৌলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়-গুলিকে না জানিলে পরিচালিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহ আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আমার জ্ঞানের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, ইহাতে আমার ইচ্ছার হাত কিছুই নাই। বাহ্যে-ন্দ্রিয় সম্বন্ধে যেমন, বাহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন, অন্তরেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তেমনি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধেও তেমনি। মনোবৃত্তি যে আছে, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় যে আছে, এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আসে। তারপর, মনোবৃত্তি যে চালনা করি, ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, এই ক্রিয়া ঘটিলেও জ্ঞান না আসিতে পারে। আমি যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ জ্ঞান আমার বাহিরে; বাহিরের জ্ঞান আমার ভিতরে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপেই আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; সত্যের আধার যিনি, তিনি নিজ ইচ্ছায় সত্য প্রকাশ না করিলে, আমার সহস্র চেষ্টাতেও সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না। এখন, এই সকল সত্যের আলোকে আদিনাথ বাবুর মতের একটু বিশেষ আলোচনা করিব। আদিনাথ বাবু বলেন, ঈশ্বর মানবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম হইতেই আত্মাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা লিখিয়া রাখিয়াছেন, অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা বুঝে না, গ্রহণ করে না, তাহাতেই মানব সমাজে এত আধ্যাত্মিক অনৈক্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বিধি ব্যবস্থা সেখাই রহিল, প্রকাশিতই রহিল, তবে আর মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক বুঝিবে কি? গ্রহণ করিবে কি? আর যদি বলেন লিখিত থাকার অর্থ প্রকাশিত থাকা নহে, জ্ঞাত থাকা নহে, লিখিত থাকিলে ও পরে জানিতে হয়, বুঝিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয়, তবে বলি যাহা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না, যাহা আমার জ্ঞানের বাহিরে ছিল, তাহা আমি কখনো ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, জানিতে পারি না; আমার জ্ঞানের বাহিরে যে বস্তু,তাহার উপর আমার ইচ্ছার,আমার চেষ্টার প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং যে দিকেই যান, স্বীকার করিতে হইতেছে যে মানব অন্তরে যে সত্যের প্রকাশ হয়,তাহা সম্পূর্ণরূপেই মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের কার্য্য। আদিনাথ বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে এমন সহস্র সহস্র লোক আছে, বর্ত্তমান সময়ে যাহা নির্ব্বিবাদে সত্য, সুতরাং ঈশ্বরের বিধান বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তাহারা তাহার কোন সংবাদ ও রাখে না।" জিজ্ঞাসা করি, "সংবাদ রাখে না," অর্থ কি? জানে না? কেন জানে না? ইচ্ছা পূর্ব্বক জানে না? "ইচ্ছা পূর্ব্বক জানে না" কথা সবিরোধী। জ্ঞান ছাড়া ইচ্ছা হইতে পারে না; কোন বস্তুর উপর কার্য্য করিতে হইলে তাহা জানা চাই, কিন্তু বস্তুটা একবার জানিলে তাহার সম্বন্ধে আর যাহাই করি, তাহাকে জ্ঞানের বাহিরে আর নেওয়া যায় না। উপরোক্ত লোকেরা যদি ঈশ্বরের বিধান জানিয়া থাকে, তবে তাহারা কখন ইহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক না জানিতে পারে না, জ্ঞানের বাহিরে রাখিতে পারে না; সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক বিধানের "সংবাদ রাখে না," এই কথা নিতান্তই অসঙ্গত। তবে তাহাদের "সংবাদ না রাখার" কারণ কি? না জানার কারণ কি? মানবের ইচ্ছা যখন কারণ হইল না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন এই অজ্ঞানতার আর কোন কারণ নাই; সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ঈশ্বর তাহাদের সমক্ষে বিধান প্রকাশ করেন নাই, তাহাতেই তাহারা জানিতে পারে নাই। কিন্তু এস্থলে আদিনাথ বাবু বলিবেন এই মতে ঈশ্বরের অপক্ষ-পাতিত্বে আঘাত পড়িতেছে। আমি বলি তাহা নহে; যেমন চারি মাসের শিশুকে চলিবার শক্তি না দেওয়াতে ঈশ্বরের পক্ষ-পাতিত্ব প্রকাশ পায় না, দশ বৎসরের বালককে বিজ্ঞান দর্শনের উচ্চ জ্ঞান না দেওয়াতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না, পঞ্চদশ বৎসরের যুবককে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা না দেও-য়াতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না, তেমনি অসভ্য, অশিক্ষিত, অবিকশিত জাতি বা সম্প্রদায় সমূহের নিকট উচ্চতর বিধান প্রকাশ না করাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাই-তেছে না। যদি আদিনাথ বাবু বলেন যে জাতি বা সম্প্রদায়গত অসভ্যতা, অজ্ঞানতা, অবিকশিত অবস্থার কারণ যখন তিনি, স্বয়ংই, তখন ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, তবে এই কথার উত্তর এই যে, জাতিগত অসভ্য অবিকশিত অজ্ঞান অবস্থা যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক হয়, তবে ব্যক্তিগত শৈশব, বাল্য এবং যৌবন প্রভৃতি অবস্থা ও তাঁহার পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। যদি কেহ বলেন যে এই সকল কথাতে জগতের বৈষম্যের সন্তোষকর ব্যাখ্যা হইতেছে না, তবে আমিও বলি যে, যে মতে এই দাঁড়াই-তেছে যে নিগ্রোজাতি যে অসভ্য, তাহারা যে ইংরেজের মত সুসভ্য নয়, ইহা কেবল তাহাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ; খাসিয়া জাতি যে হিন্দুর উচ্চ অধ্যাত্ম তত্ত্ব জানে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান জানে না, তাহার কারণ কেবল তাহাদের ইচ্ছা, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞান রহিয়াছে,—সেই মত ও মানবের বৈষম্যের সন্তোষকর ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছে না। এই বিষয়ে আদিনাথ বাবু ও আমি উভয়েরই আপাততঃ সমান অবস্থা। কিন্তু জাগতিক বৈষম্যের ব্যাখ্যা করা বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নহে; মূল প্রশ্নের সহিত এই প্রশ্ন জড়ান ঠিক হয় নাই। মূল প্রশ্ন এই, বিধান-প্রকাশ মানবের ইচ্ছা-সাপেক্ষ কি না? আমি সংক্ষেপে যথাসাধ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম, আদিনাথ বাবু আমার উত্তরের প্রত্যুত্তর দিলে পরে অন্য কথা বলিব। সম্প্রতি আর একটীমাত্র কথা বলিয়া পত্র শেষ করিব। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে আমি আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ বলিয়াছি,—"যথা, জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশ।" সমুদায় ঘটনাকে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলি নাই। ঈশ্বর-প্রকাশিত সত্য ও পুণ্যাদর্শের অনুসরণপূর্ব্বক উপাসনা ও পুণ্যকার্য্য করা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ; ঈশ্বর সম্প্রতি যাহা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাও আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ; সুতরাং আমার মতে ধর্ম্মসাধন ও প্রার্থনার প্রশস্ত ভূমি রহিয়াছে।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

তত্ত্বকৌমুদীস্তম্ভে শ্রদ্ধেয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের মধ্যে যে বিচার চলিয়াছে তাহাতে যোগ দিবার আমার ইচ্ছাও ছিল না, আবশ্যকতাও ছিল না। যেহেতু শ্রদ্ধেয় সীতানাথ বাবু বিশেষ দক্ষতার সহিত বিধানবাদ সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু আদিনাথ বাবু তাঁহার গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত পত্রে গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীর প্রাপ্ত স্তম্ভে প্রকাশিত আমার "বিধান প্রবর্ত্তন ও বিধান সংস্থাপন," শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত বিধানবাদ নিত্য নূতন বিধানবাদ হইতে ভিন্ন সুতরাং বিশেষ আপত্তিজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার ব্যাখ্যাত বিধানবাদ নিত্য নূতন বিধানবাদ হইতে ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং বিশেষ আপত্তিজনক হইতে পারে না। ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই পত্রখানা লিখিতেছি।

শ্রদ্ধেয় আদিনাথ বাবু তাঁহার পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, "যাহারা ঈশ্বর কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলেন আমি প্রধানতঃ তাঁহাদের কথারই প্রতিবাদ করিয়াছি। ঈশ্বর যদি নিত্যবিধান করেন তাহা হইলে "এক একটী বিধান প্রবর্ত্তন এক একটী বহুদিনের স্তূপীকৃত পাপ অসত্যের উপর পুণ্য প্রেম ও সত্যের আক্রমণ।" এরূপ উক্তির কি স্বার্থকতা থাকে। ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপ ও অসত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন না বা করিতে পারেন না?

এস্থলে আদিনাথ বাবু তিনটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ১ম ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপ, অসত্য, অপ্রেমের উপর আক্রমণ করিতেছেন না? ২য় ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপ, অসত্য। অপ্রেমের উপর আক্রমণ করিতে পারেন না? ৩য় ঈশ্বর কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলিলে তাহাকে নিত্য-বিধাতা বলা হইল না।

আদিনাথ বাবুর আপত্তিগুলির উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি বিধান বলিতে কি বুঝি বলা আবশ্যক। বিধান শব্দ ব্রাহ্মসমাজে দান বা বিতরণ অর্থে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ব্রাহ্মসমাজে কেহ কখনও অন্য অর্থে বিধান শব্দ ব্যবহার করেন নাই! সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমি বিধান বলিতে ইহাই বুঝি। পিতা মাতা সাধু সংগ্রন্থ ধর্ম্মসমাজ ভগবৎ প্রকাশ সকলই ভগবানের বিধান অর্থাৎ তাঁহার দান; এবং এই অর্থেই বিধান শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

আদিনাথ বাবুর প্রথম আপত্তি ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তে পাপ, অপ্রেম, অসত্যকে আক্রমণ করিতেছেন না? রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যের প্রকাশকে যেমন কবিত্বের ভাষায় অন্ধকারের প্রতি সূর্য্যের আক্রমণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তেমনি পাপী হৃদয়ের কি পতিত সমাজের পাপ মোহান্ধকার ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রকাশকে পাপ, অসত্য, অপ্রেমের প্রতি তাঁহার আক্রমণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে পাপী হৃদয়ের ও পতিত সমাজের পাপ, অসত্য, অপ্রেম আক্রমণ করিতেছেন বলিলে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে পাপী হৃদয়েও পতিত সমাজে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলা হয়। আদিনাথ বাবুর আপত্তি ইহাই বলিতেছে যে তিনি পাপী হৃদয়ে ও পতিত সমাজে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত রহিয়াছেন। বাস্তবিক ঘটনা কি তাই? জগাই মাধাইর নবজীবন লাভের পূর্ব্বেও কি ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের নিকট প্রকাশিত ছিলেন? বৈষ্ণবধর্ম্মের আগমনের পূর্ব্বে তান্ত্রিক কদাচারে পূর্ব্বে অধঃপতিত বঙ্গ সমাজেও কি ঈশ্বর প্রকাশিত ছিলেন? বোধ হয় আদিনাথ বাবু কখনও এরূপ বিশ্বাস করেন না। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক ভগবান ব্যক্তিগত মানবজীবনে কি মানবসমাজে অপ্রকাশিত থাকেন বলিতে তিনি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এরূপ বুঝিতে হইবে না। এরূপ পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই বুঝিতে হইবে যে ইহা তাঁহার প্রকাশের অবস্থা নয় আক্রমণের অবস্থা নয়। আমাদের শরীরে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাপ রহিয়াছে, কিন্তু রোগ অথবা অন্য কোন কারণে এই তাপ বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল না হইলে যেমন আছে বলিয়াই অনুভূত হয় না এবং তাপাক্রান্ত হইয়াছি বলা যাইতে পারে না, তেমনই নির্ব্বাপিত প্রায় সত্য ও পবিত্রতার তেজ যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিগত জীবনে কি কোন সমাজে বর্দ্ধিত হইয়া তীব্রবেগে মোহ পাপ দূরীভূত করিতে আরম্ভ না করে, সেই পর্য্যন্ত ঈশ্বর সেই ব্যক্তিগত জীবনের কি সমাজের পাপ অসত্য অপ্রেম আক্রমণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে না।

আদিনাথ বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি ঈশ্বর কি প্রতি মুহূর্ত্তে অসত্য অপ্রেম ও পাপকে আক্রমণ করিতে পারেন না? অসত্য অপ্রেম ও পাপকে সংক্ষেপে মানবের অপূর্ণতা বলা যাইতে পারে। সূর্য্য যেরূপ পৃথিবী অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণে বৃহৎ হইয়াও পৃথিবীর গোলত্ব হেতু ইহার বিশেষ বিশেষ অংশ বই কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র আলোকিত করিতে পারে না; সেইরূপ পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর আমাদের অপেক্ষা অনন্তগুণে মহান্ হইয়াও আমাদের অনন্ত উন্নতিশীলতা প্রযুক্ত বিশেষ বিশেষ অপূর্ণতা-ব্যতীত কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র অপূর্ণতা দূর করিতে পারেন না। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনের এক দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইতেছে। তাহাতে আবার যে অবস্থায় অন্ধকার প্রায় সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সত্য ও পবিত্রতার আলোক জীবনের এক নিভৃত কোণে নিবু নিবু জ্বলিতে থাকে, সেই অবস্থাকেও ঈশ্বরের প্রকাশের বা আক্রমণের অবস্থা বলা কি কোনরূপে সঙ্গত? আদিনাথ বাবুর তৃতীয় আপত্তি ঈশ্বর কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলিলে তাঁহাকে নিত্য বিধাতা বলা হইল না। এটী সত্য কথা। কিন্তু আমার প্রবন্ধে ঈশ্বর কখন কখন বিধান করেন। কখন কখন বা করেন না কোথাও এরূপ বলা হয় নাই। আদিনাথ বাবু বলিতে পারেন ঈশ্বর কখন কখন পাপ অসত্য আক্রমণ করেন অথবা প্রকাশিত হন বলিলে কি তিনি কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলা হইল না? উত্তরে জিজ্ঞাসা করি শুধু তাঁহার প্রকাশই কি তাঁহার দান, আর কিছু কি তাঁহার দান নহে? তিনি কি সর্ব্ব মঙ্গল বিধাতা নহেন, নিত্য বিধাতা অর্থ কি এই যে তিনি প্রতি

মুহূর্ত্তে একই বস্তু বিধান করিতেছেন? অতি শৈশবে স্তন্য দুগ্ধে জীবিত রাখিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানে অন্নদানে জীবন রক্ষা করিতেছেন। ইহাতে কি তাঁহার নিত্য বিধাতৃত্বের কিছু হানি হইতেছে? কখনই না। ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তেই কোন না কোন বস্তু বিধান করিতেছেন। এই অর্থে তিনি নিত্য বিধাতা স্বীকার করিলে তিনি কখন কখন বিধান প্রেরণ করেন বলা হইল না। তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিধান করেন ইহাই বলা হইল। সুতরাং ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিয়াছেন, বলিলে তাঁহার নিত্য বিধাতৃত্বের বিন্দুমাত্র অস্বীকার করা হইল না এবং তাঁহাকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলা হইল। আদিনাথ বাবু তাঁহার পত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন যদি বিধানবাদীদের সকলে ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা ও নিত্য নূতন বিধানে বিশ্বাস করেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি নাই। আমার ব্যাখ্যাত বিধানবাদ যে নিত্য নূতন বিধানবাদ ইহা প্রদর্শিত হইল। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আদিনাথ বাবুর কোন ক্রমেই বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে না। নিত্যনূতন বিধানবাদ সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র আপত্তি থাকাও উচিত নয় তাহা সীতানাথ বাবু প্রদর্শন করিবেন। আমার পত্র সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই।

এ সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম এবং শেষ পত্র। সময়াভাবে পরে আর কিছু লিখিতে পারিব এরূপ আশা নাই।

কলিকাতা। বিনীত নিবেদক

১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীর প্রাপ্ত প্রবন্ধলেখক।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—বিগত ২০এ ভাদ্র কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়া ছিলেন। বালকের নাম সুকুমার ও বালিকাটীর নাম অমিয়া রাখা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২৪এ ভাদ্র ভাগলপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে নবজাতা কুমারীর মাতামহ শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে এককালীন ২৲ দুই টাকা দান করিয়াছেন।

বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোয়েটা নগরে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। পাত্র শ্রীযুক্ত লেখীরাম নাওদা, বয়স ২৫ বৎসর ও অকৃতদার। পাত্রী—শ্রীমতী শ্যামাদেবী ইনি বিধবা বয়স ১৫ বৎসর। পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ মহাশয় উক্ত বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংসৃষ্ট ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বিগত পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত ছাত্র ও ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নিম্নশ্রেণী।

১। শ্রীমান্ রজনী কান্ত গুহ
২। „ রমণীকান্ত দাস
৩। „ নীলকান্ত মিত্র
৪। „ সতীশচন্দ্র রায়
৫। „ শ্রীরঙ্গ বিহারী
৬। „ বিনোদবিহারী মিত্র

প্রাথমিক শ্রেণী।

১। শ্রীমতী প্রেমকুসুম সেন
২। „ ইন্দুমতী মৈত্র
৩। শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র ঘোষ
৪। শ্রীমতী প্রফুল্লবালা বসু
৫। শ্রীমান্ সুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। শ্রীমতী সুহাসিনী ভট্টাচার্য্য
৭। শ্রীমান্ সাধুচরণ দে

দান প্রাপ্তি—ফরিদপুরের জজ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ১মা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৫৲ টাকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান প্রাপ্ত স্বীকার করিতেছি।

দীক্ষা—বিগত ১০ই ভাদ্র রবিবার বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনান্তে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ওলপুর গ্রাম নিবাসী বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র শ্রীবেণীমাধব দে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ধর্ম্মরাজ্যে নব প্রবিষ্ট যুবকের প্রাণে ধর্ম্মবল প্রদান করুন।

সভা—গত ১১ই ভাদ্র সোমবার অপরাহ্নে সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের একটী Informal সভা হইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্ম সমাজের আবশ্যকীয় কার্য্যসকল সম্পন্ন হইবার সাহায্যার্থ আপন আপন আয়ের কত অংশ দান করিবেন সে বিষয়ের আলোচনা হয়। সভায় বিভিন্নভাবে সভ্যগণ আপনাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিকাংশ বক্তাই এরূপ দানের প্রয়োজনীতা স্বীকার করেন। তবে কি হারে দান করা উচিত এবং সকল প্রকার আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই একই হারে দেওয়া কর্ত্তব্য কি না এ সকল বিষয়ে মতের ভিন্নতা প্রচুর ছিল। অর্থাভাবে ব্রাহ্মসমাজ কেবল যে প্রচার কার্য্যেরই ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না এমন নয়। অনেক হিতকর কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত, নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের জন্য কোন সদুপায়, দরিদ্রগণের সাহায্য, ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচার এবং পত্রিকার উন্নতি প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য আছে যাহা সম্পন্ন না হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং অর্থ সংগ্রহ প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। এসকল প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনার্থ ব্রাহ্মগণ অর্থদানে মুক্তহস্ত না হইলে তাঁহাদের সমাজ দিন দিন হীন হইয়া পড়িবে। আশা করি উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় এখানেই শেষ না হইয়া আরও বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

দুই পৃষ্ঠ।

এক পৃষ্ঠে, আমি হীন, দুর্ব্বল, মলিন,
বায়ুমাত্রে কাঁপি তৃণ সম ;
অশক্ত বহিতে ভার, তনু মন ক্ষীণ ;
বারে বারে হই ভগ্নোদ্যম।

অন্য পৃষ্ঠে, তোমা সনে যেখানে মিলন,
তথা আমি বলেতে দুর্জ্জয় ;
তোমারি বলেতে বলী, তথা প্রলোভন,
কটাক্ষেতে হয় পরাজয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্বাস দুর্গ—পৃথিবীর অনেক ঈশ্বর প্রেমিক সাধু বিশ্বাসকে দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দুর্গে যাহারা বাস করে তাহারা শত্রুকুলের গোলাগুলি বর্ষণে ভয় পায় না ; কারণ তাহারা এমন স্থানে আছে, যেখানে সে গোলাগুলি পৌঁছে না। বিশ্বাসকে দুর্গ বলিবার অভিপ্রায় এই যে প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিও এমন স্থানে বাস করেন যেখানে বিপক্ষগণের গোলাগুলি পৌঁছে না। তিনি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান, যে বিপক্ষগণ যে নিন্দাবাদ করিতেছে, তাহা সমূলক ; তাহাতে বাস্তবিক ঐ সকল দোষ আছে, তাহা হইলে তিনি ধীরচিত্তে বলেন, আমি যখন এই অপরাধে বা এই দুর্ব্বলতাতে লিপ্ত তখন ত আমি নিজেই আপনাকে মারিয়া রাখিয়াছি, অপরে আর কি মারিবে? অন্য লোকে উপলক্ষ মাত্র। এ ব্যক্তির হস্ত হইতে আঘাত না আসুক, অপর কাহারও হস্ত হইতে আসিবে এবং আসা উচিত। এস্থলে নিন্দাকারীর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া নিজের সংশোধনের প্রতি অধিক দৃষ্টি করি। সুতরাং তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধির উদয় হয় না। আবার যদি আপনাকে নিরপরাধী বলিয়া অনুভব করেন, তাহা হইলেও বিদ্বেষ বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ; কারণ সেখানে বিশ্বাস তাঁহাকে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখে। তিনি মনে মনে বলেন এ রাজ্য যদি ঈশ্বরের রাজ্য হয় এবং তাঁহারই ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা শাসিত হয় তবে এখানে অসত্য জয় লাভ করিতে পারে না, আমি কেন ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হইব ? আমি সত্যের সেবক, সত্যেরই অনুসরণ করা আমার কার্য্য, আমি তাহাই করি। মানবের প্রীতি, বা অপ্রীতি, প্রশংসা বা নিন্দা সমুদয়ই ঘটনার অধীন ও অজ্ঞতা-প্রসূত, সুতরাং তদুপরি সুখ দুঃখের ভিত্তি স্থাপন করা যুক্তি যুক্ত নহে। যাহা করিয়াছি তাহা কি সৎ ও ঈশ্বরের অনুমোদিত ? যদি তাহা হয়, আমি তাহাতেই লগ্ন রহিলাম, অনুরাগ বিরাগ, পুরস্কার তিরস্কার, কিছুরই প্রার্থী নহি। যাহা আসে আসুক। এই বিশ্বাসের দুর্গকে যাহারা অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতের শান্তিতে বাস করেন ; সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া বিরোধ উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় না ; সৎকার্য্যে তাঁহারা পরিশ্রান্ত হন না ; সত্যের অনুসরণে ক্লান্ত হন না।

জাতি-পাশ—জাতিভেদ প্রথা এদেশে একটা কঠিন পাশের ন্যায়। এই পাশ সহজে ছেদন করা যায় না। এ দেশে কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইলেন, যাহারা এই পাশকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। কিন্তু এই পাশের যে কি মোহিনী শক্তি আছে, অবশেষে ইহা তাঁহাদিগকে কোন না কোন প্রকারে জড়াইয়া আবদ্ধ করিল। মহাত্মা নানক বিশ্বাস চক্ষে ধর্ম্মের মহৎভাব কিঞ্চিৎ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি এই জাতি-পাশকে ছেদন করিবার প্রয়াস পাইলেন ; যতদিন তাঁহার শক্তি জাগ্রত থাকিল, ততদিন একটু উদারতা থাকিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহারই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইল। চৈতন্যের সম্প্রদায়েরও সেই দশা ঘটিয়াছে। এখনও গৃহত্যাগী বৈরাগীদিগের মধ্যে বোধহয় জাতি বিচার নাই, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে ! এমন কি খৃষ্টধর্ম্মকেও প্রথম প্রথম জাতিগত কুসংস্কারের নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি এমন সকল খৃষ্টিয়ান আছেন, যাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ খৃষ্টান, শূদ্র খৃষ্টান প্রভৃতি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ খৃষ্টান দিগের উপবীত আছে ; এবং তাহারা শূদ্র খৃষ্টানদিগের সহিত

আহারাদি করেন না; কিম্বা পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেছেন না। এরূপ প্রথার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে যে সকল রোমান কাথলিক ধর্ম্মপ্রচারক ঐ সকল দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে জাতিভেদ একটা সামাজিক প্রথা, উহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাল, যদি জাতিভেদ রক্ষা করিতে চায়,—করুক, তাহাতে ক্ষতি কি? এই বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ রাখিয়া খৃষ্টান করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী অনিষ্ট ফল ঘটিয়াছে, প্রথম সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের ভাব মৃত হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খৃষ্টানের মধ্যে সর্ব্বদা জাতিগত প্রাধান্যজনিত বিবাদ বাঁধিয়া তাহাদের একতা ও উন্নতির পথে সমূহ প্রতিবন্ধক উৎপন্ন করিয়াছে। ইহা দেখিয়াই কিছুকাল পূর্ব্বে তদানীন্তন লর্ড বিশপ এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, কেহ জাতিভেদ রক্ষা করিয়া খৃষ্টান হইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হওয়াতে কিছু দিন ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছিল, এক্ষণে জাতি রক্ষা করিয়া খৃষ্টান হইবার প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সম্প্রদায়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজও জাতিপাশ ছেদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের বিশ্বাস ও কার্য্যের এই অঙ্গটুকু ছাড়িয়া দিতে পারিলে আমরা অদ্যই প্রচুর পরিমাণে লোকানুরাগ লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমরা সে লোকানুরাগের প্রার্থী নহি। আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এই পাশকে ছেদন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষ্য। নাগপাশ-বন্ধনের ন্যায় এই বন্ধনের ভিতর হইতে মানুষকে বাহির করিয়া আনিতে না পারিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত সামাজিক আদর্শ কখনই কার্য্যে পরিণত হইবে না। সুতরাং ব্রাহ্মদিগকে দেখিতে হইবে কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহারা এই পাশ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তাহা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রকাণ্ড কুক্ষির মধ্যে একটু সামান্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই বিলীন হইবে।

আদর্শ কৃষকালয়—কিছুকাল হইতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে বিলাতি কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এতদর্থে মান্দ্রাজের সন্নিকটবর্ত্তী সয়দাপেট নামক স্থানে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে কৃষিবিদ্যা বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে এক একটী আদর্শ কৃষকালয় (model farm) খোলা হইয়াছিল। তাহাতে কৃষি কার্য্যের উপযোগী সমুদয় উপকরণ ও আয়োজন রাখিয়া কিরূপে কৃষিকার্য্য করিতে হয় তাহা দেখান হইত। কেবল উপদেশ দিলে চলিবে না, একটু ক্ষুদ্রায়ত ভূমির মধ্যে কার্য্যতঃ করিয়া দেখাও যে তোমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, বাস্তবিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। একবার কার্য্যতঃ দেখিলে লোকের মনে উপদেশের ভাব জন্মের মত নিহিত হইবে। এই প্রকার চিন্তা হইতেই আদর্শ কৃষকালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এথাও প্রতিদিন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ এই কার্য্য করিতেন। মনে কর একজন পণ্ডিত স্থির করিলেন, যে এক নূতন উপায়ে রেলের গাড়ি দ্রুত চালান যাইতে পারে। তিনি প্রথমে তাঁহার মনের ভাব কাগজে নিবদ্ধ করিলেন; কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে মনের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। শেষে সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্রায়তন রেল, ক্ষুদ্রায়তন গাড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়া নিজের বাগানে একদিন নূতন প্রণালীতে চালাইলেন, ও সর্ব্বসাধারণকে দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। যাহারা একবার দেখিল তাহাদের সংশয় জন্মের মত চলিয়া গেল। মান্দ্রাজ কৃষি বিদ্যালয়ের উপদেশ ও আদর্শ কৃষকালয় এই উভয়ে যে প্রভেদ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজে সেই প্রভেদ। বিদ্যালয়ের মধ্যে যে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদত্ত হইত আদর্শ কৃষকালয়ে তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখান হইত। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজরূপ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মধ্যে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপদেশ অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্টতর সহায়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি বলিলেই উহার অন্তর্গত পরিবার সকলের উন্নতি, ইহার অন্তর্গত বালক বালিকাদিগের উন্নতি বুঝায়। সত্য আমরা যতই হৃদয়ে অনুভব করিব, ততই আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িবে।

ঔদাসীন্যের অনিষ্ট ফল—প্রায় দশ বৎসর গত হইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একজন ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম মতে পরিণীতা পত্নীর বিয়োগ হইলে, তিনি ১৮৭২ সালের ৩ আইনের মতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু পত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল, আবার ব্রাহ্মিকা পত্নীর গর্ভেও একটী কন্যা জন্মিল। ইহার অল্প দিন পরেই পতি পরলোকগত হইলেন। কিছুকাল পরে বিধবা ব্রাহ্মিকাপত্নী সন্তানদিগের ও পতির বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিলেন। জজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের বিবাহ যে রেজিষ্টারি হইয়াছিল তাহার সার্টিফিকেট কই? ১৮৭২ সালে ৩ আইনে বিবাহান্তে রেজিষ্টারের যে একখানি সার্টিফিকেট লইয়া রাখিবার নিয়ম আছে উক্ত দম্পতী ঔদাসীন্যবশতঃ তাহা রাখেন নাই। সুতরাং বিধবা উত্তর দিলেন, যে বিবাহের সময় সার্টিফিকেট লওয়া হয় নাই; কিন্তু ডেপুটী কমিশনারের সমীপে বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনিই রেজিষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার আফিসে বিবাহের রেজিষ্টার আছে। দুই মাস ধরিয়া অনুসন্ধান হইতেছে ডেপুটী কমিসনারের সে খাতা পাওয়া যাইতেছে না। জজও বলিয়াছেন বিবাহ যখন রীতিমত আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হইয়াছিল, তখন তিনি সেই পাকা দলিল দেখিতে চান। তাহা থাকিতে অপর প্রমাণ লইবেন না। নতুবা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের উপযুক্ত অনেক প্রমাণ আছে। সেই বিবাহে যে তিনজন সাক্ষী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজন এখনও সেই সহরে আছেন; বিবাহের সে সমাচার ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ান ও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা আছে; তৎপরে সেই সংবাদ

ব্রাহ্মপত্রিকাতে ব্রাহ্ম বিবাহের তালিকা ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাও আছে, কিন্তু জজ বলিতেছেন পাকা দলিল যখন আছে, তাহা থাকিতে এসকল সাক্ষী হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারি না। ডিপুটী কমিসনারের আফিস খুঁজিয়া সেই রেজিষ্টারি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এইরূপে বিধবাটী এখন ঘোর বিপদের মধ্যে পড়িয়া ভাসিতেছেন। যাঁহারা ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি, যদি স্বীয় স্বীয় বিবাহের সার্টিফিকেট রেজিষ্টারের নিকট হইতে না লইয়া থাকেন অবিলম্বে এক এক খানি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া নিবেন। নতুবা যদি তাঁহাদের বিধবা পত্নীদিগকে সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে ৩ আইনের আশ্রয় লওয়াই বৃথা। বিশেষ যাঁহাদের বিধবা ও সন্তানদিগের দায়াধিকার লইয়া বিবাদ করিবার লোক আছে, তাঁহাদের পক্ষে এ কার্য্যটী অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকেই বোধ হয় মনে করেন রেজিষ্টারের খাতাতে এক একটা স্বাক্ষর করিলেই পতি ও পত্নীর দায়িত্ব শেষ হইল; তাহা নহে। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পত্নীর নিকটে বিবাহের এক একখানি সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য করিলে একটী কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন হয়।

ব্রাহ্ম সমিতি—আগামী ন্যাশনাল কংগ্রেশের অধিবেশন কালে বোম্বাই নগরে যে ব্রাহ্ম সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহাতে স্বীয় স্বীয় সমাজের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে একটী অনুরোধ এই আছে, যে তাঁহারা সেই সঙ্গে উক্ত সমিতিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও বলিয়া পাঠাইবেন। বোম্বাই নগরের প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক ইতিমধ্যেই এবিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ আছে—

(১ম) ভারতবর্ষের সমুদায় সমাজের একটী সাধারণ নাম হইতে পারে কি না, অর্থাৎ কেহ প্রার্থনা সমাজ, কেহ ব্রাহ্ম-সমাজ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম না লইয়া সকলের পক্ষে এক সাধারণ নাম লওয়া সম্ভব কি না?

(২য়) ১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধন।

(৩য়) ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর সংগ্রহ ও প্রচার।

(৪র্থ) অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ব্রাহ্মদিগের কি সম্বন্ধ থাকিবে, তৎসম্বন্ধে বিচার।

(৫ম) ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ যেমন এই পাঁচটী বিষয় গুরুতর ও বিশেষ বিচারের উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ চিন্তা করিলে অন্যান্য সমাজও অনেক আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই সমিতিটী যাহাতে সুফলপ্রদ হয়, সে বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্ব মানশুঃ"

উপরে যে সংস্কৃত বাক্যটী দেওয়া হইল তাহার অর্থ এই, পূর্ব্বকালের সাধকগণ "একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন"। কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুখ হইতে উপনিষদের এই প্রাচীন শব্দগুলি নূতন ভাবে বিনির্গত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক ইতি মধ্যে একদিন উক্ত ভক্তিভাজন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন মহর্ষি এক অত্যুচ্চ ও অতি গভীর ভাবের মধ্যে বাস করিতেছেন, এই শব্দগুলি সেই ভাব প্রসূত। তিনি বলিলেন, ত্যাগই ধর্ম্মজীবনের প্রধান সাধন। ত্যাগ শব্দের অনেক অর্থ। ইহার এক অর্থ দান অপর অর্থ বিচ্ছেদ। কিন্তু মহর্ষি মহাশয় যে অর্থে ইহার ব্যবহার করিতেন, তাহা এই, যে কোন বাসনা ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ, অথবা যাহা হৃদয়কে তাঁহা হইতে আকৃষ্ট করিয়া বিষয় মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে, তাহাকে সংযত করাই ত্যাগ। এই যে বাসনার সংযম, ঈশ্বরের অনুরোধে আপনার অভীষ্ট বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ইহার ন্যায় সাধনের অনুকূল আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন ইহাতে হৃদয়কে সবল করে এবং আত্মাকে ঈশ্বর প্রীতিতে উদ্দীপ্ত করে। তৎপরে বলিলেন এই আধ্যাত্মিক সাধন অতি দুষ্কর ও শ্রমসাধ্য ও যাতনা বহুল বলিয়া লোকে সাধনের বাহিক প্রণালীর অবলম্বন করে। কেহ পঞ্চতপা হয়, কেহ শরীর শুষ্ক করে, কেহ কুম্ভক প্রভৃতি করে। সে সকলে কি ফল! পঞ্চতপা হওয়া ত সহজ কথা আত্মতপা হওয়া অতি কঠিন।

আমরা সকলেই জানি এবং সর্ব্বদা বলিয়া থাকি যে ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন প্রণালী আধ্যাত্মিক; তাহা কোন শরীরের বা মনের বিকৃত অবস্থার উপর নির্ভর করে না। জগদীশ্বর শরীরের স্বাস্থ্য লাভের যে সকল উপায় করিয়াছেন, তাহা কেমন স্বাভাবিক ও কেমন সুন্দর। জল, বায়ু, তাপ, ইহারা নিত্য তোমার নিকট উপস্থিত, তোমার অভ্যন্তরের যন্ত্র ও ধাতু সকলে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। তুমি ইহাদের শক্তিকে বাধা দিওনা, শরীরকে রুগ্ন বা ভগ্ন করিওনা, স্বাস্থ্য আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিবে। এই দেহের স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য কোন চিকিৎসককে এরূপ বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি প্রত্যহ আধ ঘণ্টা পদদ্বয় উত্থিত করিয়া হস্তের দ্বারা হাটিবে, কিম্বা নিম্নদ্বার দ্বারা বিরেচন না করিয়া মুখদ্বার দিয়া বমন করিবে। যদ্দ্বারা দেহ পরিপুষ্ট, সবল, ও কার্য্যক্ষম হয়, সেই করুণাময় বিধাতা প্রকৃতির সমুদয় শক্তিকে তাহার উপযোগী ও সহায় করিয়া দিয়াছেন। এই দেহটী তাঁহার কৃপায় কেমন সুন্দর প্রতিপালিত হয়, আত্মাটী কি তাঁহার ক্রোড়ে অবস্থিত নয়? আত্মার স্বাস্থ্য ও বললাভ কি ইহার পক্ষে সহজ ও সুখকর করিয়া দেন নাই? আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে কি তাহার অনুকূল করিয়া দেন নাই? যিনি শীতান্তে আবার বৃক্ষ সকলকে হরিত বর্ণ-মণ্ডিত করেন, যিনি বিহঙ্গমদিগকে নূতন পক্ষ দিয়া আচ্ছাদন করেন, সকলকে

নবজীবন প্রদান করেন, তিনি কি আমাদের আত্মাকে অবসন্ন দীন ও মুহ্যমান হইয়া থাকিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাকে নব স্বাস্থ্যে সুশোভিত করিবার উপায় কি করেন নাই? ইহা স্বীকার করিলে এই বলিতে হয় তাঁহার নিকটে আমার এই বিচিত্রতা সম্পন্ন আত্মা অপেক্ষা একটা তরু বা একটা পক্ষীর মূল্য অধিক। ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদিগকে সুদৃঢ় ভাবে এই সত্যটী ধরিতে হইবে যে তিনি প্রকৃতিকে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধন কখনই ক্লেশজনক বা শরীর মনের বিকারজনক হইবার কথা নহে। তবে যদি তাহা আমাদের পক্ষে ক্লেশজনক হয়, আমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের অল্পতাই তাহার এক মাত্র কারণ। এই যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, ত্যাগ এক জনের নিকট অতি ক্লেশকর, অপরের পক্ষে অতি সুমিষ্ট; যে ব্যক্তির বিশ্বাস ঈশ্বরে সুস্থির হয় নাই, যে এখনো তাঁহাকে সত্যের সত্য বলিয়া ধরিতে পারে নাই, যাহার চিত্ত এখনো বিষয়ের মধ্যে পরম পদার্থ অন্বেষণ করে, ত্যাগ তাহার পক্ষে ঘোর ভারবোঝা স্বরূপ। সেই প্রকার ঈশ্বরে যাহাদের প্রীতি নাই, তাঁহার নামে যাহার আনন্দ নাই, তাঁহার চিন্তাতে যাহার আরাম নাই, তাঁহার ইচ্ছা পালনে যাহার উৎসাহ নাই, ত্যাগ তাহারও পক্ষে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ, ঘোর পরাধীনতা। আত্ম-সংযম যখন প্রেম হইতে উৎপন্ন হয় তখনই সুমিষ্ট, যখন শাসন হইতে উৎপন্ন তখনই তিক্ত। সুতরাং প্রেম যখন সাধনের চালক না হইয়া শাসন যখন চালক হয় তখনই দুঃখ উৎপন্ন করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসী ও যিনি প্রেমিক সমুদায় প্রকৃতি তাঁহার সাধনের অনুকূল, ত্যাগ তাঁহার নিকট সুমিষ্ট বস্তু ও বলপ্রদ। ঈশ্বর করুন এই মহাসত্যটী দৃঢ়রূপে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত থাকুক।

ঐশী শক্তি।

আকাশে বায়ু আছে, কিন্তু সকল সময় তাহার গতি থাকে না। গ্রীষ্মে প্রাণ ছটফট করিতেছে, ঘরের ভিতর থাকা দায়, অথচ বাহিরেও একবিন্দু বাতাস নাই, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। অনেক সময় প্রবল বাত্যা বা বৃষ্টির পূর্ব্বে দেখা যায় আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডল একেবারে নিশ্চল, বৃক্ষপত্র সকল একেবারে নিস্পন্দ, নদীর জল নিস্তরঙ্গ, স্থির। সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সচল, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত বায়ুরাশির চঞ্চলতা ও গতিশীলতার প্রমাণ দেখিতে পাই। বায়ুর এই গতি আছে বলিয়াই ঘোর গ্রীষ্মের সময়েও আমরা মলয়ানিল সেবন করিয়া শরীর শীতল করি, বায়ুর গতি আছে বলিয়াই সাগর পৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাষ্পরাশি আসিয়া পৃথিবীর উত্তাপকে দূরীভূত ও পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে, বায়ুর গতি আছে বলিয়াই জনাকীর্ণ স্থানের দূষিত বাষ্প সমূহ দূরীকৃত ও ঐ সকল স্থান মনুষ্যের বাসের যোগ্য হয়। বায়ুর এই সাধারণ গতি আমরা প্রায় সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এই সাধারণ গতিভিন্ন বায়ুর আর এক প্রকার গতি আছে। পূর্ব্বে বায়ুর যে গতির কথা বলা হইল, তাহা ধীর ভাবে বৃক্ষপত্র সকল সঞ্চালিত অথবা সাগর বক্ষ আন্দোলিত করে। সে গতি দেখিয়া বায়ুর শক্তি বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায় না। কিন্তু আবার এই বায়ু যখন প্রবল বাত্যারূপে প্রবাহিত হইয়া হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহ সকলকে সমূলে উৎপাটিত করিতে থাকে, সাগর বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থাপিত ও বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব পোত সকলকে ক্রীড়নকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মানুষের ক্ষুদ্র শক্তিকে উপহাস করিতে থাকে, তখন আমরা পূর্ব্ববর্ণিত শান্ত বায়ু রাশির পরাক্রম দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হই! বায়ুর এই প্রবল পরাক্রম প্রকাশিত হইলে আমরা তাহাকে পৃথিবীর পক্ষে, বিশেষতঃ যে দেশে উহা সংঘটিত হয় তাহার পক্ষে, একটী বিশেষ ঘটনা বলিয়া থাকি। কেবল তাহা নয়,—বিজ্ঞানাবিদ্‌গন স্থির করিয়াছেন এবং আমরাও অনেক সময় দেখিতে পাই যে এইরূপ প্রবলবাত্যা আপাততঃ অত্যন্ত ভয়ানক হইলেও, ইহা যে দেশে বা স্থানে সংঘটিত হয় তাহার প্রভূত উপকার সাধন করে। এইরূপ বাত্যাদ্বারা বায়ুমণ্ডলের তাপের সামঞ্জস্য সংসাধিত হয় এবং বহুদিনের সঞ্চিত দূষিত বায়ু পরিশোধিত হয়।

যদিও আমরা এইরূপ প্রবল বাত্যাকে বিশেষ ঘটনা বলিয়া থাকি এবং যদিও ইহা দ্বারা বিশেষভাবে জগতের উপকার সাধিত হয়, তথাপি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে ইহা জড়জগতের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ঘটনা নহে। বায়ুর নিশ্চলতা, মন্দগতি ও সংহারিণী মূর্ত্তি সকলই একই সাধারণ নিয়মের অধীন। সে নিয়ম কি অনেকেই জানেন, তথাপি পরে যাহা বলা হইবে তাহা বিশদ করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

সূর্য্যের উত্তাপে ধরাতল উত্তপ্ত হইয়া তৎসংস্পৃষ্ট বায়ু রাশিকে উত্তাপিত করে। উত্তাপের স্বধর্ম্ম দ্রব্যের আয়তন বর্দ্ধিত করা। উত্তাপের এই শক্তি নিবন্ধন উক্ত বায়ু রাশির আয়তন বর্দ্ধিত হওয়াতে চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা উহার ভার কমিয়া যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চতুর্দ্দিকের অপেক্ষাকৃত ভারী বায়ু নিম্নে আসিতে চেষ্টা করে ও পূর্ব্বোক্ত লঘু বায়ুকে উপরের দিকে উঠাইয়া দেয়। অর্থাৎ যে কারণে শুষ্ক কাষ্ঠ বা অন্য লঘু বস্তু জলের উপর ভাসে, সেই কারণে লঘু বায়ু উপরে উঠিয়া যায় ও চারিদিকের ভারী বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। উপরে উঠিতে উঠিতে পূর্ব্বোক্ত উষ্ণ বায়ু ক্রমে শীতল সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন হওয়াতে আবার নীচে আসিয়া যে ভারী বায়ু উহার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে সরিয়া গিয়াছে, তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে প্রায় প্রতিনিয়ত পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু রাশি চক্রাকারে ঘুরিতেছে! যখন বায়ু মণ্ডলের (অন্ততঃ কতকদূর ব্যাপিয়া) উত্তাপের তারতম্য চলিয়া গিয়া সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়, তখনই বায়ু একেবারে শান্ত ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে। পূর্ব্বে বায়ুর যে লঘুত্বের কথা বলা হইল, জলীয় বাষ্পের বর্ত্তমানতা নিবন্ধন ঐ লঘুত্ব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ বায়ু যতই লঘু হউক না, জলীয়

বাষ্প উহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক লঘু। পৃথিবীর উত্তাপও জলীয় বাষ্পের বর্ত্তমানতা নিবন্ধন যখন বায়ুমণ্ডলের কোনও বিস্তৃত অংশের ভার চতুর্দ্দিকের বায়ু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়া বিশেষ অসামঞ্জস্য উপস্থিত করে, তখন উহা দূর করিবার জন্য চতুর্দ্দিকের বায়ু প্রবলবেগে ঐ লঘু বায়ুর স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতেই বিষম বাত্যা উৎপন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠকে আলোড়িত করিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বায়ুর শান্তভাব, মন্দগতি ও প্রবলবাত্যা সকলই এক সাধারণ নিয়মের অধীন। মধুর মলয়ানিলের জন্য এক নিয়ম ও সর্ব্বসংহারক ঘূর্ণিত বায়ুর জন্য আর এক নিয়ম নাই। এতদুভয়ের মৌলিক প্রভেদের মধ্যে কেবল কারণের গুরুত্বের ইতর বিশেষ—কেবল অবস্থাভেদ। অবস্থাভেদে একই প্রকার কারণে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সুমন্দ সমীরণ ও প্রবল ঝটিকা একই কারণ হইতে উৎপন্ন ও একই নিয়মের অধীন হইলেও আমরা প্রথমটীকে সাধারণ ঘটনা ও শেষোক্তটীকে বিশেষ ঘটনা বলিয়া থাকি। বিজ্ঞানের চক্ষে একভাবে উভয়ই সাধারণ ঘটনা; কারণ উহার প্রত্যেকটী এক সাধারণ নিয়মের অধীন। কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষেও আর একভাবে শেষোক্তটী একটী বিশেষ ঘটনা; কারণ উহা বিশেষ অবস্থা হইতে সমুদ্ভূত। বায়ু মণ্ডলের ভারের বিশেষ তারতম্য হইতে উহার উৎপত্তি। আবার বিজ্ঞান ছাড়িয়া আর একভাবে উহা বিশেষ ঘটনা—যে দেশে উহা ঘটিল সে দেশে প্রত্যহ বা সচরাচর উহা ঘটে না; সুতরাং সে দেশের পক্ষে উহাকে সাধারণ ঘটনা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত ঐ ঘটনাদ্বারা সে দেশের বায়ুর অবস্থা (দূষিতভাব ও উত্তাপাদির তারতম্য) বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই দুই ভাব হইতেও উক্ত দেশের পক্ষে ঐ ঝটিকাকে একটী বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবে। অথচ উহা জড়জগতের সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূত। কেবল বিশেষ স্থানে, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ ভাবে উহা সংঘটিত বলিয়া উহাকে বিশেষ ঘটনা বলা যায়। এরূপ স্থলে যদি "বিশেষ" শব্দ প্রয়োগ করা দূষণীয় হয়, তবে ইহা যে আর কোথায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বায়ুর গতি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, ঐশী শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে—ঈশ্বরের বিধান সম্বন্ধে প্রায় বর্ণে বর্ণে উহার অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে বায়ুর সহিত ঐশী শক্তির উপমার সার্থকতা দেখাইতে ও বিশেষ বিধানের প্রকৃত অর্থ আমরা যাহা বুঝি তাহা প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব।

বায়ুর বর্ত্তমানতা ও গতি যেমন দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাপার সেইরূপ ঐশী শক্তির বর্ত্তমানতা ও প্রকাশও দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমরা বায়ুর গতি যখন অনুভব করি না, তখনও যেমন বায়ু আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ যখন আমরা ঐশী শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই না, তখনও উহা আমাদের আত্মার আধারভূত হইয়া অবস্থিতি করে। কেবল তাহাই নহে। বায়ু ভিন্ন যেমন আমাদের ভৌতিক জীবন ধারণ করা অসম্ভব, তেমনি ঐশী শক্তি ভিন্ন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "ঐশী শক্তি" শব্দ ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিতেছি। নতুবা একভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ভৌতিক জীবনও ঐশী শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে,—আমরা কিন্তু সে অর্থে উহা ব্যবহার করিব না। কারণ ব্রাহ্মসমাজে বিধান শব্দ সচরাচর আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং বিধান অর্থে ঐশী শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিশ্চল সচল সকল অবস্থাতেই যেমন বায়ুর কার্য্য চলিতেছে, সেইরূপ প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল অবস্থাতেই ঐশী শক্তির কার্য্য চলিতেছে। বায়ুর গতি যেমন আমরা সকল সময় অনুভব করি না, ঐশী শক্তির প্রকাশও তেমনি আমরা সকল সময় অনুভব করি না। ভৌতিক জগতে বায়ু যেমন আধ্যাত্মিক জগতে ঐশী শক্তিও সেইরূপ। ধরাপৃষ্ঠ যেমন বায়ুর কার্য্যক্ষেত্র, প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মা ও তাহার সমবায় স্বরূপ যে আমাদের সামাজিক জীবন তাহাই ঐশী শক্তির কার্য্যক্ষেত্র। মৃদুমন্দ সমীরণ ও প্রবল বাত্যা যেমন একই সাধারণ নিয়মের অধীন, ঐশী শক্তির সাধারণও বিশেষ প্রকাশও সেইরূপ একই সাধারণ নিয়মের অধীন। মানবাত্মা ও জনসমাজ যখন পাপ, অপ্রেম, সাংসারিকতার উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, মানবের হৃদয়নিহিত দেবভাব সকল যখন সেই উত্তাপে উড়িয়া যাইতে থাকে, তখন আত্মার আধারভূত ঐশী শক্তি প্রকাশিত হইয়া ঐ উত্তাপকে মন্দীভূত করিয়া দেয় এবং দেবভাবের আধিপত্য পুনঃস্থাপন করিয়া প্রবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করে। ঐশী শক্তির এই সাধারণ কার্য্য আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। আমাদের প্রাত্যহিক আধ্যাত্মিক সংগ্রামে, নরনারীর সাধু কার্য্যে, জ্ঞান বিস্তার, ধর্ম্মভাব প্রচার, সমাজ সংস্কার, পরোপকারী প্রভৃতি সামাজিক হিতানুষ্ঠানে ঐশী শক্তির সাধারণ প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার যখন কোনও দেশ বা সমাজ পাপ, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, কপটতা ও কদাচারের উত্তাপে বিশেষভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যখন ধর্ম্মের নামে ভীষণ পাপাচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, যখন সমাজের কোনও এক অংশ প্রবল হইয়া অপর অংশকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করে,—তখন জনসমাজে ঘোর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়া সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলে এবং মানবের প্রকৃতি-নিহিত দেবভাব সকল পাশব শক্তির উপর আধিপত্য সংস্থাপনের জন্য ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করে। তখন ঐশী শক্তি ধর্ম্ম বিধান বা সমাজ বিপ্লবরূপে প্রবল ঝটিকার ন্যায় আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। এই শক্তির সম্মুখে যে কিছু বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয় তাহা দেখিতে দেখিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। বহুকালের সঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি সমূলে উৎপাটিত করিয়া, কুসংস্কারের অন্ধকারময় দুর্গকে ভূমিসাৎ করিয়া, সমাজবক্ষকে ঘোর বিপ্লবে আলোড়িত করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণের সিংহাসন কম্পিত করিয়া ভীম পরাক্রমে এই অলৌকিক শক্তি জনসমাজে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুনীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে। ঐশী শক্তির এই ভীষণ প্রকাশ ও পূর্ব্বোক্ত মৃদুপ্রকাশ এতদুভয়ই কিন্তু এক সাধারণ নিয়মের অধীন। তবে বিশেষত্ব

কোথায়? ইহার বিশেষত্ব—প্রথমতঃ কারণের গুরুত্বে, দ্বিতীয়তঃ দেশ বা সমাজের বিশেষত্বে, তৃতীয়তঃ ইহার ফলের বিশেষত্বে। বিশেষরূপে ঘনীভূত কারণ পরম্পরায় বিশেষ দেশ বা সমাজে ইহার প্রকাশ হয় বলিয়া এবং ইহার প্রভাব ও উপকারিতা বিশেষভাবে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে ঐশী শক্তির বিশেষ প্রকাশ বা বিশেষ বিধান বলি। এরূপ স্থলে "বিশেষ" শব্দ প্রয়োগ করা কেন দূষণীয় হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক কার্য্য প্রণালীর দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা সাধারণ ঘটনা বটে, কিন্তু যে অবস্থায়, যে সমাজে ইহা ঘটে তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ ঘটনা। জনসমাজে নিত্য এরূপ ঘটনা ঘটে না এবং ইহার সংঘটনের জন্য গুরুতর কারণের প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন ইহার প্রভাব ও উপকারিতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনার বীজ মানব প্রকৃতিতেই নিহিত আছে। অথচ বিশেষ কারণ ভিন্ন আমরা ইহার প্রকাশ দেখিতে পাই না। এই জন্য ইহাকে বিশেষ ঘটনা বলি। বৌদ্ধ খৃষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের অভ্যুদয়, লুথারকর্তৃক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসি রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি ব্যাপারকে যদি কেহ জন সমাজের পক্ষে বিশেষ ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হন, তবে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের এসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। আগামীবারে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে কয়েকটী কথা।

(প্রাপ্ত)

ইতিপূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে সিলং হইতে বাবু প্যারীনাথ নন্দী একখানা পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সবর্ণে বিবাহ প্রথার প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণকে সেই সকল বিবাহে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এবিষয়ে ব্রাহ্মগণের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সবর্ণে বিবাহ দিবার প্রবৃত্তি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ক্রমে প্রবল হইতেছে। যে সকল যোগ্যতা বিবাহ-সম্বন্ধের হেতু হওয়া উচিত, তাহার প্রতি দৃষ্টি না থাকিয়া একমাত্র বর্ণ-গত সমতাই যদি বিবাহ-সম্বন্ধের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে যে কোন না কোন আকারে জাতিভেদের প্রশ্রয় দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ অকারণে বর্ণগতসমতার অনুরোধে সমান সমান বর্ণে বিবাহ-বন্ধন হইতে থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। এরূপ একবর্ণে বিবাহ প্রদানের স্বপক্ষে যদিও কোন যুক্তি থাকে, তাহা হইলেও ব্রাহ্মগণ এরূপ বিবাহ প্রথার পক্ষপাতী হইলে অধিকতর সামাজিক অনিষ্ট সাধন করিবেন। প্রথমতঃ বিবাহ সম্বন্ধীয় উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে হীন হইতে হইবে। কারণ বর কন্যার পরস্পর পবিত্র-প্রণয়জাত বিবাহ-বন্ধনের যে রীতি—যে রীতিকে উচ্চতর স্থান প্রদান করা হইয়াছে তাহার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। বিবাহ বিষয়ে বর কন্যার যে স্বাভাবিক স্বাধীনতা থাকা প্রার্থনীয়, যাহার অভাবে সংসার সুখের স্থান না হইয়া অশেষ কষ্টেরই হেতুরূপে পরিণত হয়, এই প্রথা তাহার পোষকতা করে না। প্রণয় কখনও শাসন দ্বারা সংস্থাপিত হয় না। তাহা স্বাধীন বিবেচনা এবং স্বাধীন কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং কোন এক বর্ণের মধ্যে প্রণয় বা সদ্ভাবকে আবদ্ধ করিতে যাওয়ার চেষ্টা কখনই প্রশংসনীয় নয়। বিবাহ-বন্ধন সম্বন্ধে কোন্ রীতি অবলম্বিত হওয়া প্রার্থনীয়, তাহা নিঃসংশয়রূপে নিরুপিত না হইয়া থাকিলেও বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজ বর কন্যার সম্মতি হইতে যে বিবাহ-বন্ধন হয় সেই রীতিকেই শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। অবশ্য পিতা মাতা বা অভিভাবকগণের সম্মতি থাকা বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি যাহারা বিবাহিত হইবে তাহাদের পবিত্র ভালবাসাজনিত সম্মতিরই সম্মান থাকা উচিত। এরূপ প্রথা অবলম্বিত না হইলে সমাজে সুস্থ এবং সুখী পরিবারের সংখ্যা আমরা বেশী দেখিতে পাইব না। যদি বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্যার ইচ্ছাকে অধিক মূল্যবান মনে করা যায় এবং সেই সম্মতি যদি তাহাদের পবিত্র প্রণয়-সম্ভূত হওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বর্ণগত সাম্য যে সকল স্থানে রক্ষিত হইতে পারে আমাদের এমন ভরসা হয় না। বিবাহের এই উচ্চভাব রক্ষা করার পক্ষে বর্ণগত সাম্য রক্ষার প্রয়াস বিশেষ বিঘ্ন আনয়ন করিবে। সুতরাং এই প্রথার বিরুদ্ধে সকলেরই প্রতিবাদ করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন যদি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহার ফল অতি অশুভজনক হইবে। বঙ্গদেশের কুলিন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মেল পটি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বিবাহ দিবার রীতি না থাকায় যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানি। আমরা দেখিতেছি অনেককে বাধ্য হইয়া একমাত্র মেল রক্ষার অনুরোধে অতি অপাত্রে আপন আপন স্নেহের পাত্রীদিগকে অর্পণ করিতে হইতেছে। এরূপ মেল-বন্ধন না থাকিলে সে সকল বালিকাদিগের সেরূপ পাত্রের সহিত বিবাহিত হইয়া আজীবন জীবন্তে মৃতবৎ থাকিতে হইত না। যে সকল হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে তাহা সহিতে হইত না। একমাত্র এই কুপ্রথা হইতে কত কত কুলিন কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় সংসারে পরের গলগ্রহ হইয়া, সংসারের প্রধানতম সুখ যে দাম্পত্য-প্রেম তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। মেলবন্ধনের কঠোরতা না থাকিলে তাহাদের বিবাহের পক্ষে হয়ত আর কোন বাধাই উপস্থিত হইত না। অনেকে মনে করেন বঙ্গদেশের লোককে এই কুপ্রথার "না বাল্য বিবাহরূপ হীনকার্য্যে বাধ্য হইয়া লিপ্ত হইতে হয়। তাহাদের আশঙ্কা এখন যে পাত্রটী পাইয়াছি তাহা যদি হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে পরে আর উপযুক্ত ঘরের পাত্র পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যত সত্বর সম্ভব বিবাহ দিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যান। এই সকল কারণে এক এক জন কুলিনকে বাধ্য হইয়া বহু বিবাহের পাপে পড়িতে হয়। আবার অনেকে বিবাহ করিবার সুবিধা না পাইয়া সংসারে বহুঅকল্যাণকর ঘটনায় আপনাকে লিপ্ত করে। এ সকল দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতেও যদি ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের এই

সামান্য সংখ্যার মধ্যে আবার গণ্ডীর সৃষ্টি করিতে থাকেন, যদি ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে কায়স্থে কায়স্থে বৈদ্যে বৈদ্যে বিবাহ দিবার জন্য প্রয়াসী হন, অতি শীঘ্র তাঁহাদিগকে উক্তরূপ কুফল ভোগ করিতে হইবে। ইহারই মধ্যে একমাত্র বর্ণানুরোধে অনুপযুক্ত পাত্রে সেই সকল কন্যা সমর্পিত হইতেছে, যাহাদিগের সেরূপ পাত্রে সমর্পিত হইবার কোনই উপযুক্ত হেতু ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মগণ যেন এমন অহিতকর প্রথার সমর্থন কখনও না করেন। আমাদের বোধ হয় আমাদের প্রচারকগণের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সর্ব্বোপরি বর্ণগত সমতাই যে বিবাহ-সম্বন্ধের মূল বলিয়া জানা যায় সে বিবাহে কখনও কোন প্রচারকের যাওয়া উচিত নয়। উক্ত প্রথার অনুকূলে অন্য যুক্তি থাকিলেও একমাত্র এই অনিষ্টের জন্যও ব্রাহ্মগণকে বর্ত্তমান সময়ে সতর্ক হইতে হইবে যে এই অল্প সংখ্যার মধ্যে যেন আবার গণ্ডীর সৃষ্টি না হয়। আমরা সম্প্রতি কেবল বর্ণগত গণ্ডী সৃষ্টির বিরুদ্ধেই লিখিলাম। ধন, বিদ্যা বা অবস্থাগত গণ্ডীর যে অপকারিতা কম এমন যেন কেহ মনে না করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে কোন প্রকার সীমাতে আবদ্ধ হওয়াই অকর্ত্তব্য। উদার প্রশস্ত প্রণালীর উপরই বিবাহ-সম্বন্ধ-নির্ণয় রীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বিক্রমপুর (বজ্রযোগিনী)

গত ৩১এ ভাদ্র রবিবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত পূর্ব্বপাড়া উপাসনা সমাজের প্রথম শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হইয়াছিল। রবিবার প্রাতঃকালে প্রভাত কীর্ত্তন হয়। তৎপর স্নানান্তে নয়টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত উপাসনা হইয়াছিল। ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সাধারণ আলোচনা এবং ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বিক্রমপুর প্রচার সভা সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছিল, পুনরায় সন্ধ্যা কালে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বৈকালিক উপাসনা শেষ হইয়াছিল। দয়াময়ের কৃপায় উৎসব বেশ জমাট হইয়াছিল, পল্লীস্থ নরনারীগণ অনেকেই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভার প্রাপ্ত বন্ধুগণ ও যুবকগণ আহারাদির ও গৃহ সজ্জাদির পারিপাট্য অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়া, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষতঃ বিক্রমপুর প্রচার সভার বিষয়ে আলোচনায় উপস্থিত থাকিবার জন্য, ঢাকা মুন্সীগঞ্জ এবং বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মদিগকে সমবেত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকা হইতে কেহই সমাগত হইতে পারেন নাই। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ এবং মুন্সীগঞ্জ বেজগাঁ ও ভরাকর গ্রাম হইতে কোন কোন ব্রাহ্ম সমবেত হইয়াই উৎসব ও আলোচনা করিয়াছিলেন। অধিক ব্রাহ্ম উপস্থিত না থাকিলেও বিক্রমপুর প্রচার সভা সম্বন্ধে অতি সুন্দর আলোচনা হইয়াছিল। নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারণ গুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

১। ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মদিগকে লইয়া বিক্রমপুর প্রচার সভার একটী স্থানীয় বিভাগ গঠিত হওয়া আবশ্যক।

২। বিক্রমপুর নিবাসী ব্রাহ্মদিগের একটি তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

৩। সৎকার্য্য (Good work) দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য একটী Charity fund হওয়া আবশ্যক।

৪। বৎসরে একবার বিক্রমপুরবাসী ব্রাহ্মদিগের বিক্রমপুরের কোন স্থানে (বা ঢাকাতে) মিশিয়া আপনাদিগের মধ্যে একতারক্ষণ ও বাহিরে প্রচার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

৫। উল্লিখিত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য একটী কমিটির উপর ভার দেওয়া উচিত।

এই আলোচনা স্থলে বিক্রমপুর-প্রচার সভার অন্যতর সহকারী সম্পাদক বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র উপস্থিত ছিলেন। নির্দ্ধারণ গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। বিক্রমপুর প্রচার সভার স্থানীয় প্রচারক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করি বিক্রমপুর প্রচার সভা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া সৎপ্রস্তাব গুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয় !

শ্রদ্ধেয় সীতানাথ বাবু আমার পত্রের উত্তরে তত্ত্বকৌমুদীর বিগত সংখ্যায় আর একখানা পত্র লিখিয়াছেন। এবার তিনি প্রধানতঃ বিধান প্রকাশ যে মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সকল প্রকার জ্ঞান লাভই যে মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কথাটী এখনও মীমাংসিত হয় নাই। সীতানাথ বাবু আমাদের দেখা শুনা প্রভৃতি বহিবিষয় হইতে অন্তর্জগতে প্রকাশিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়াও কিন্তু পত্রের শেষভাগে বলিয়াছেন যে "আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে আমি, আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ বলিয়াছি —"যথা জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশ" সমুদয় ঘটনাকে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলি নাই।" সুতরাং দেখা যাইতেছে সীতানাথ বাবু অনেক দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন নিজেই আবার তাহার অন্যথা করিতেছেন। কোন বিষয় জানা সম্বন্ধে মানবের ইচ্ছার সাপেক্ষতাকে তিনি যেরূপ অযৌক্তিক অসম্ভব এবং স্ববিরোধী প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আর পারিতেছেন না। কথাটা তবে নিতান্তই অযৌক্তিক নয়।

তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে যে অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় জানা আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। যদি কতকগুলি বিষয় জানা আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ হয়, তবে অন্যগুলি প্রকাশের পক্ষে আমাদের ইচ্ছার কোন প্রয়োজন থাকার পক্ষেই বা কি বাধা থাকিতে পারে? বাস্তবিক কোন বিষয় জানা কখনও একের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় না। দার্শনিকভাবে তর্ক করিবার শক্তি আমার নাই, কিন্তু আমি সোজা সোজি দেখিতে পাইতেছি, কোথাও একের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না। দর্শন শ্রবণ সম্বন্ধে কি আমার কোন ইচ্ছার আবশ্যক হয় না? আলোক প্রকাশ ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু চক্ষু খোলা বা বন্ধ করা ত আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমি যদি চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া রাখি, দর্শন শ্রবণ কখনই সম্পন্ন হয় না। অনেক সময় দেখা যায় অন্যমনা হইয়া যখন কোন বিষয় চিন্তা করা যায় মন কোন বিষয়ের চিন্তায় যখন গাঢ়রূপে নিবিষ্ট হয়, তখন চক্ষু কর্ণ খোলা থাকিলেও দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এইরূপ প্রত্যেক ঘটনাতেই দেখা যাইবে দুই ইচ্ছার মিলন ভিন্ন কোন কাজই হয় না। ঈশ্বর যে বিধানের কর্ত্তা এ কথা কেহ অস্বীকার করিতেছে না। কিন্তু তাহা গ্রহণ করা বা আত্মাকে সেই বিধান প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থায় আনয়ন করা আমাদের কাজ। মানব ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারে এ কথা আমি কোথাও বলিনাই। কিন্তু ইচ্ছা না করিলেও জানিবার উপায় নাই, ইহাই বলিয়াছি। ঈশ্বর যাহা জানাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা গ্রহণ পক্ষে আমার ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। জ্ঞান প্রকাশে মানবের ইচ্ছার সাপেক্ষতা আছে এ কথার অর্থ ইহা নয় যে ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্নও জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সহায়তা এবং মানবের ইচ্ছা দুইয়ের মিলন ভিন্ন যে জ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। আমি যে এখন নূতন সত্য বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর আমাকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছেন না। তিনি ত সর্ব্বদাই প্রত্যেকের হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহার দান ত সকলের জন্যই আসিতেছে। তবে সকল প্রাণে তাহা প্রকাশ পায় না কেন? তিনি যে প্রত্যেকের হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইয়া শিক্ষাদিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা বোধ হয় সীতানাথ বাবু অস্বীকার করিবেন না। যদি অস্বীকার করেন তাহা হইলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া সীতানাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব পত্রে একরূপ স্বীকার করিয়া ছিলেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া ছিলাম। এবারের পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারাও সে আপত্তির কোন মীমাংসা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন "চারি মাসের শিশুকে চলিবার শক্তি না দেওয়াতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না, দশবৎসরের বালককে বিজ্ঞান দর্শনের উচ্চ জ্ঞান না দেওয়াতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না" ইত্যাদি। এ সকল স্থানে যে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় তাহা কেহ বলিতেছে না। কারণ সকলের পক্ষেই এক নিয়ম। কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে দশটী ৪ মাসের শিশুর মধ্যে একটীকে হঠাৎ চলিতে সমর্থ করিলেন বা ১০০টী দশ বৎসরের বালকের মধ্যে ২।১টীকে হঠাৎ প্রবীণের জ্ঞান দিলেন তাহাতেই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়। এক সময়ে একদেশে একই প্রকার সভ্যতার মধ্যে জন্মিয়া যখন এক ব্যক্তি সমধিক জ্ঞানী হইতেছেন, আর সকলে সে জ্ঞান পাইতেছেন না; তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে হয় ঈশ্বর আর সকলকে উপেক্ষা করিয়া সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানবান করিলেন, না হয় বলিতে হইবে সেই ব্যক্তি আপনার যত্ন ও পরিশ্রমে ঈশ্বর-প্রদত্ত শিক্ষাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল। এই দুইটীর একটীকে স্বীকার করিতেই হইবে। যদি প্রথমটী স্বীকার করা যায় তবে বলিতে হইবে ঈশ্বর পক্ষপাতী। আর দ্বিতীয়টী স্বীকার করিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে, মানবের ইচ্ছা ও চেষ্টার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কোন সত্য লাভই মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ নহে। সীতানাথ বাবু কিন্তু প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ তিনি বলিতেছেন "তেমনি অসভ্য, অশিক্ষিত, অবিকশিত জাতি বা সম্প্রদায় সমূহের নিকট উচ্চতর বিধান প্রকাশ না করাতে ও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।" এই যে অসভ্য, অশিক্ষিত, বা অবিকশিত অবস্থায় মানব রহিয়াছে, ইহা কি তাহাদের যত্ন চেষ্টার অভাবে কিম্বা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। কোন্‌টী সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। পৃথিবীতে প্রথম মানব সৃষ্টির সময় কত জন মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা না জানিতে পারিলেও ইহা নিশ্চয় রূপেই বলা যাইতে পারে যে যত জনই সৃষ্ট হইয়া থাকুক এক অবস্থাতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ সভ্য কেহ অসভ্য হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। যদি সেরূপই হয় তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। আর যদি সভ্য ও শিক্ষিত বা বিকশিত হইবার পক্ষে মানবের যত্ন পরিশ্রম ও ইচ্ছার প্রয়োজন আছে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইল জ্ঞান বা বিধান পাইবার পক্ষে মানবের ইচ্ছা ও যত্নের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরই কোন জাতিকে উন্নত করিয়াছেন বা শিক্ষিত ও বিকশিত করিয়াছেন তাহাতে সে সকল জাতির কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রমের আবশ্যক ছিল না বলিলে সাম্য বাদ লইয়া এত গোলযোগের কোনই কারণ দেখিতে পাই না। জাতিভেদের বিরুদ্ধেই বা কি বলিবার থাকে? ঈশ্বরই যদি সেরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে মানুষ কি এত বড় জ্ঞানী হইল, যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আবার সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য প্রকাশে মানবের কোনই ইচ্ছা নাই বলিলে আপনাপনি সাম্য বৈষম্যের কথা আসিয়া পড়ে। পরস্পর সংস্পৃষ্ট বিষয় বিচার করিতে হইলে সকল গুলির প্রতি দৃষ্টি না করিলে চলিবে কেন?

"বিধানের বীজ কি অর্থে আত্মায় নিহিত ছিল" এই কথাটী নিয়া সীতানাথ বাবু বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নিহিত ছিল একথা আমি যেমন বিশ্বাস করি, সীতানাথ বাবুও সেরূপ বিশ্বাস করেন। আমি আমার পূর্ব্ব পত্রে সীতানাথবাবুর কোন কোন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। আত্মায় সত্য নিহিত থাকার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে বিধানের বীজ নিহিত থাকারও অর্থ আছে স্বীকার করিতে হইবে। সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন বিশ্বাসীর জীবন্ত বাণী শুনিলেই তাহা প্রকাশ পায় আমি বলি-

য়াছি—মানবের যত্ন ও ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা প্রকাশ পায়। প্রভেদ এই। সুতরাং নিহিত থাকা সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই। প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধেই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসীর কথা ত অনেকেই শুনিয়া থাকে কিন্তু কয় জনের প্রাণে তাহা স্থান পায়? সুতরাং এখানেও মানবের যত্ন ও ইচ্ছার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। এখন বিধান প্রকাশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এবারের মত সীতানাথ বাবুর পত্রের উত্তর শেষ করিব। আত্মায় যে সত্যের বীজ নিহিত থাকে একথা সীতানাথ বাবু বিশ্বাস করেন। এখন কথা এই ২ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির আত্মায় যাহা নিহিত ছিল এখন যে আমরা জন্মিতেছি আমাদের আত্মাতেও অবশ্য তাহা নিহিত আছে। সেই সময়ে তাঁহারা যাহা জানিয়াছিলেন এখন যদি আমরা তাহা জানি তাহা অবশ্যই আমার পক্ষে নূতন ব্যাপার। কিন্তু তাহা কি ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য? কখনই নয়। আমার জানা বা অনুভব করাটা কিছু ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য বা নূতন সৃষ্টি নহে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় আমি নূতন জ্ঞান পাইলাম। নূতন বিধান যদি স্বীকার করিতে হয় তবে ইহাই বলিতে হইবে যে ঈশ্বর যাহা পূর্ব্বে করেন নাই অর্থাৎ আত্মায় যাহা নিহিত করেন নাই। তাহা এখন নিহিত করিয়া পরে প্রকা' করিলেন। সীতানাথ বাবু এরূপ নিত্য নূতন বিধানে বিশ্বাস করেন কিনা জানিতে পারিলে ভাল হইত।

আমার পূর্ব্ব পত্রে ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত "বিধান প্রবর্ত্তন ও বিধান সংস্থাপন" নামক প্রাপ্ত প্রবন্ধ হইতে তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে সকলে ঈশ্বরকে নিত্য নূতন বিধানের প্রেরয়িতা বলিয়া স্বীকার করেন না। এবারের তত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখক মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। বিধান বলিতে তিনি যাহাই বুঝুন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহা নিত্যই ঘটিতেছে। যদি পতিত সমাজের পাপ মোহান্ধকার ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রকাশকে পাপ, অসত্য অপ্রেমের প্রতি তাহার আক্রমণ অর্থাৎ বিধান বলা যায়। তাহা হইলেই বলিতে হইবে ঈশ্বর নিয়ত একার্য্য করিতেছেন। অস্বীকার করিলে তাঁহাকে নিত্য বিধাতা বলা হয় না। যদি তিনি জগাই মাধাইর নবজীবন লাভের পূর্ব্বে অপ্রকাশিত ছিলেন, তবে ইহাই স্বীকার করা হইল তিনি সে সময় বিধান করেন নাই। কারণ প্রকাশিত হওয়াই তাঁহার বিধান। অতএব তাঁহাকে নিত্য নূতন বিধাতা বলা হইল না।

আমার দ্বিতীয় কথার উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বড়ই আপত্তি জনক। কারণ, অসত্য অপ্রেম ও পাপকে যদি মানবের অপূর্ণতা বলা হয়, তবে ইহাই বলা হইল যে মানব কখনও পাপ শূন্য হইবে না। কেন না পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া কোন কালেই মানবের ভাগ্যে ঘটিবে না। অনন্ত উন্নতিশীল মানব চিরকাল উন্নতিই পাইবে কখনও পূর্ণ হইবে না। তাহা হইলেই পাপ তাহার কখনও যাইবে না। তাহা হইলে পরিত্রাণ ও মুক্তি প্রভৃতি কথা গুলির কোনই অর্থ থাকে না। পাপ করাই মানবের প্রকৃতি হইয়া পড়ে। মানব অপূর্ণ কিন্তু অপূর্ণতাই কখনও পাপ নয়। অপূর্ণতা হইতে পাপ করে বটে কিন্তু অপূর্ণ হইয়াও পাপ না করিতে পারে। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মানবকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের বিধান প্রেরণের কোন অর্থই থাকে না। কারণ সে কখনই নিষ্পাপ হইবে না। সে চিরকালই পাপে পড়িয়া থাকিবে। তাহাকে পাপ শূন্য করিবার চেষ্টার কোন কোনই অর্থ নাই। যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে অর্থাৎ পৃথিবীর গোলত্বের জন্য সূর্য্য তাহার সকল অংশ কোন কালেই আলোকিত করিতে পারেন না। তাহা মানবাত্মার পক্ষে বোধ হয় খাটে না। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান পাপী যতই কেন পাপ করুক না তাহাকে পুণ্যবান করা সূর্য্যের পৃথিবীর সকল অংশ আলোকিত করার ন্যায় ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়। বাস্তবিক পৃথিবীর সকল অংশ আলোকিত করা সূর্য্যের পক্ষে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অসম্ভব, মানবাত্মাকে পবিত্র করার পক্ষে সেরূপ কোন প্রাকৃতিক বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই সত্য যে পুণ্যই মানবের স্বভাব। পুণ্যেই সে বিচরণ করিবে। পুণ্য তাহার সর্ব্বস্ব হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। পুণ্যে বাস ও পুণ্যবান হওয়া যদি মানবের প্রকৃতিগত অধিকার না হয়, যদি তাহা ঈশ্বরও আমাদিগকে প্রদান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর পুণ্যের জন্য চেষ্টা করা বা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করার কি কোন হেতু থাকে? তাহা কি বৃথা বা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে না? সুতরাং এই উত্তরটী কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না।

তৃতীয় আপত্তির উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে একই বস্তু দান করিতেছেন এমন নয়, কিন্তু তিনি কোন না কোন রূপে দান করিতেছেন। সুতরাং তিনি নিত্য বিধাতা। এভাবে যদি তাঁহাকে কেহ নিত্য বিধাতা বলিয়া মানিয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহেন হউন। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। এই রূপ উক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে দুর্ব্বল মানবের মত করিয়া ফেলা হয়। মানুষ যেমন একদিক দেখিতে অন্য সব ভুলিয়া যায়, একটী বস্তু দান করিবার সময় অন্য কিছু দিতে সমর্থ হয় না, ঈশ্বরও কি সেইরূপ? তিনি কি কিছু দেন আবার কিছু দিতে পারেন না? তিনি একদিকে কোন উন্নত আদর্শ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু অন্যদিকে লোক পাপের অত্যাচারে জালাতন হইতেছে, ঈশ্বর তাহার প্রতিকার করিতেছেন না বা পারিতেছেন না। তাঁহার শক্তি যেমন অসীম বিধানও সেইরূপ সর্ব্ব কল্যাণকর, সর্ব্বক্ষম ও সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক হইবে। এরূপ বলিলে তিনি আর সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর থাকিলেন না। আমরা বিধানবাদ মানিতে যাইয়া যেন ঈশ্বরকে আমাদের মত দুর্ব্বল করিয়া না ফেলি এই বিনীত নিবেদন।

নিবেদক

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী"—সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

"তত্ত্বকৌমুদী"র বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত বাবু হরকালী সেন মহাশয়ের পত্রের উত্তরে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

১। হরকালী বাবু বলিয়াছেন, "সীতানাথ বাবুর 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পুস্তকের শেষ অধ্যায় ব্যতিত আর সকল অধ্যায়ই যুক্তিপূর্ণ"—অর্থাৎ শেষ অধ্যায় যুক্তিপূর্ণ নহে। আমি ত জানি "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় "পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক" নামক শেষ অধ্যায়ও যুক্তিপূর্ণ, যুক্তি না দিতে পারিলে আমি তাহা লিখিতাম না। যুক্তির বিন্যাসও স্পষ্টই রহিয়াছে, যথা (১) বিবেক-বাণী হইতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার মূল যুক্তি, (২) বিরুদ্ধবাদীদিগের অসঙ্গতি-প্রদর্শন, (৩) বিশেষ কৃপার যুক্তি ও ব্যাখ্যা, (৪) জাগতিক আপাত-অমঙ্গল ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার। ইহা সত্ত্বেও যখন হরকালী বাবু বলিতেছেন উক্ত অধ্যায়ে যুক্তি নাই, এমন কি,এরূপ একটু ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে উক্ত অধ্যায় অন্ধ-বিশ্বাস ও ভাবুকতায় পূর্ণ, তখন আমার বাস্তবিকই সন্দেহ হয় হরকালী বাবু উক্ত অধ্যায়টী সমগ্র পড়িয়াছেন কি না,অন্ততঃ মনযোগের সহিত পড়িয়াছেন কি না। যাহা হউক উক্ত অধ্যায়ে যুক্তি নাই এই কথা তিনি এই অর্থে বলিয়া থাকিতে পারেন যে উহাতে তাঁহার মতে সুযুক্তি নাই। এই কথা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে, কিন্তু তাঁহার অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে উক্ত অধ্যায়ের যুক্তির সমালোচনা করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক আমি স্বীকার করি যে পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ের ন্যায় এই অধ্যায়কে তাঁহার সুযুক্তি পূর্ণ মনে না করিবার কিছু কারণ পুস্তকেই আছে, প্রথম তিন অধ্যায়ে প্রদর্শিত যুক্তি সমূহ যে যে মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা পুস্তকেই দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল মূল তত্ত্ব দার্শনিক (metaphysical) মূল সত্য। চতুর্থ অধ্যায়ের যুক্তি প্রণালী এরূপ নহে। এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত মূলযুক্তি যে মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে মূলতত্ত্ব নীতিবিজ্ঞানের (Ethical) মূল সত্য। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"প্রধানতঃ দার্শনিক পুস্তক; নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা পুস্তকের উদ্দেশ্যের মধ্যে নহে, এই জন্য এই মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা না দিয়া ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং এই স্বীকার্য্যের উপর ঈশ্বরের পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতাবিষয়ক যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের প্রথমেই আমি এই সকল কথা স্পষ্টরূপে বলিয়াছি এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। বিবেকবাণীর উপর যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, পাপ পুণ্যের মৌলিক অনতিক্রমণীয় প্রভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট এই অধ্যায়ের যুক্তি সুযুক্তি বলিয়া বোধ না হইলে আমি কিছুই বিস্মিত হইব না।

২। ঈশ্বর মানবের চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, এক দিকে এই সত্য, অপর দিকে ঈশ্বর পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, তিনি মানবের অপ্রেম অপবিত্রতার ভাগী নহেন, এই সত্য,—এই উভয় সত্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা ধর্ম্মবিজ্ঞান মাত্রেরই একটী কঠিন সমস্যা। ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রকৃতিবাদীই হউক, আর অধ্যাত্মবাদীই হউক, আর অপর কোন প্রকারই হউক, এই প্রশ্নের মীমাংসা সকল প্রকার ব্রহ্মবাদের পক্ষেই কঠিন সমস্যা। এই বিষয়ে আমার ব্যাখ্যাত অধ্যাত্মবাদের কোন বিশেষত্ব নাই। অধ্যাত্মবাদ যে এই প্রশ্নটাকে কিছু বিশেষ কঠিন করিয়া তুলে, তাহা নহে। ইহা দেখান যায় যে এই প্রশ্নের মীমাংসা অধ্যাত্মবাদে যতদূর কঠিন, প্রকৃতিবাদেও অন্ততঃ ততদূরই কঠিন; অধ্যাত্মবাদীর মীমাংসা যদি সন্দেহবাদীকে তৃপ্তি দিতে না পারে, প্রকৃতবাদীর মীমাংসাও কিছু তদপেক্ষা অধিক তৃপ্তিকর নহে। যাহা হউক, হরকালী বাবু প্রশ্নটাকে যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মীমাংসা করা কিছুই কঠিন নহে। আমি সাধ্যানুসারে তাহা দেখাইতেছি।

৩। হরকালী বাবু জানা আর করাকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি গোলযোগে পড়িয়াছেন। ঈশ্বর মানব মনের অপবিত্র চিন্তা জানেন, তাতেই যেন তিনি অপবিত্র হইয়া গেলেন। তাহা হইলে জগতে পবিত্র কেহ থাকিত না, আর পবিত্রতার কোন অর্থও থাকিত না। যে পবিত্রতা পাপ জানে না, সে পবিত্রতার কোন মূল্য নাই, এবং প্রকৃত অর্থে তাহা পবিত্রতাও নহে। পাপ পুণ্য উভয় জানিয়া পুণ্য পথ অনুসরণ করাতেই পবিত্রতার মাহাত্ম্য ও বাস্তবিকতা প্রকাশ পায়। ঈশ্বরে আমরা এই পবিত্রতাই আরোপ করি। তিনি মানবের অপ্রেম অপবিত্রতা জানেন। তিনি যেমন প্রেমিক ও পবিত্র জীবনের অবলম্বন, তেমনিই অপ্রেমিক ও অপবিত্র জীবনেরও অবলম্বন; তিনি যেমন পুণ্যবানের প্রাণস্য প্রাণম্, তেমনি পাপীরও প্রাণস্য প্রাণম্। কিন্তু ইহাতেই কিছু তিনি পাপীর পাপে লিপ্ত হইলেন না। তিনি পাপীর প্রাণের প্রাণ, সুতরাং পাপীকে জ্ঞান ও স্মৃতি দিতে তিনি বাধ্য (নিজের বিধিতেই বাধ্য), কিন্তু পাপীর ইচ্ছার সহিত যখন তাঁহার ইচ্ছা এক হইল না, তখন তাহাকে কখনো পাপীর পাপের ভাগী বলা যাইতে পারে না। হরকালী বাবুর দৃষ্টান্তস্থানীয় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তিকে যে ঈশ্বর তাহার নরহত্যার চিন্তা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তাহাতে তিনি সেই ব্যক্তির পাপে লিপ্ত হইলেন না। পাপ-চিন্তা মাত্রই যদি ঈশ্বর ভুলাইয়া দিতেন, তবে পুণ্যের মাহাত্ম্য কিছুই থাকিত না। পাপচিন্তা স্মরণ হওয়া এবং স্মরণ থাকা সত্ত্বেও পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করাতেই আত্মার পুণ্য-কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। পাপ-চিন্তা ভুলাইয়া দেওয়াই যদি ঈশ্বরের কর্ত্তব্য হয়, তবে এমন বস্তু না দেখান, না শুনান, না জানান ও তাহার কর্ত্তব্য, যাহা জানিলে ঘুনাক্ষরে ও পাপ বাসনা উদয়ের সম্ভাবনা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে জগতে এমন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে অসংযত মনে কোন না কোন সময়ে পাপ-বাসনা উদয় না হইতে পারে। সুতরাং হরকালী বাবুর যুক্তির অনুসরণ করিতে গেলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে আমাদিগকে কোন প্রকার জ্ঞান না দিলেই অর্থাৎ আত্মারূপে সৃষ্টি না করিলেই সর্ব্বতোভাবে ভাল হইত, তাহা হইলে আর আমাদিগকে পাপী হইতে হইত না এবং ঈশ্বরকে ও আমাদের পাপের জন্য দায়ী হইতে হইত না।

হরকালী বাবু বোধ হয় এত দূর যাবেন না, কিন্তু তিনি যে যুক্তি দ্বারা আমার অসঙ্গতি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে এই মীমাংসায়ই আসিতে হয়। বাস্তবিক কথা এই, পাপ জানায়, পাপ স্মরণ করায় ও পাপ হয় না এবং পাপ জানান, পাপ স্মরণ করানতেও পাপ হয় না, (বরং অনেক সময় তাহা নিতান্ত আবশ্যক)—পাপ ইচ্ছা করাতেই পাপ হয়, পাপ বাসনা পোষণ করাতেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ঈশ্বর পাপীকে তাহার পাপচিন্তা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টরূপে তাহাকে বলিয়া দিতেছেন যে ইহা পাপ-চিন্তা, ইহা তোমার পরিত্যাগ করা উচিত; সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা যে চির-পবিত্র, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্থানীয় ব্যক্তি তাহার পাপ-চিন্তার স্মৃতি ও ঈশ্বরের পুণ্য-বাণী উভয়ই এক সঙ্গে লাভ করিতেছে; সে এই স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া অনুতপ্ত হইতে পারে, ঈশ্বরের পুণ্যবানীর অনুসরণ করিতে পারে, সুতরাং ঈশ্বর-প্রদত্ত স্মৃতি তাহার মঙ্গলের নিদান হইতে পারে; আবার এই স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সে পাপকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। সে যাহাই করুক, তাহা তাহার নিজের, তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাপ দর্শে না। এস্থলে ঈশ্বরও মানবে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ।

৪। "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার" ১৩৮এর পৃষ্ঠায় আমি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় দ্বয়ের সহিত আমার একটী মতের ঐক্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া হরকালী বাবু কিছু ভুল করিয়াছেন। "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"র পাঠক দেখিবেন আমি কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে মৌলিক একতার কথাই বলিয়াছি, অন্যান্য মত সম্বন্ধে কিছু বলি নাই, এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে অনৈক্য থাকিতে পারে, তাহাও স্পষ্ট বলিয়াছি। উক্ত মহাশয় দ্বয়ের সহিত আমার সমুদায় দার্শনিক মতে ঐক্য আছে, এরূপ কথা আমি বলি নাই, এবং কখনো ভাবিও নাই।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক সংবাদ—আমরা প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঢাকাস্থ বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলাবালা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের জেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র মহালানবিশের পরিণয় সংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। এই অল্পসময় মধ্যেই আমাদিগকে আবার সংবাদ দিতে হইল যে নির্ম্মলাবালা দেবী গত ২৮ এ ভাদ্র ২৪ দিনের একটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকগতা হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি পরিবারদিগকে অতি বিষম শোক ভারেভারাক্রান্ত হইতে হইয়াছে। এরূপ বয়সে সংসারলীলা শেষ হইলে স্বভাবতঃই আত্মীয়গণকে বিশেষ শোক পাইতে হয়, তাহার উপর নির্ম্মলা আপনার সুমিষ্ট প্রকৃতিগুণে কি পিতৃ ভবন কি শ্বশুর ভবন উভয় স্থানেই বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। তাহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এমন মিষ্ট এবং বিনয় পূর্ণ ছিল যে সকলকেই তাহার ব্যবহারে বিশেষ সুখী হইতে হইত। তাঁহার শিক্ষা অধিক না থাকিলেও পবিত্রস্বভাবই তাহার বিশেষ শোভার কারণ ছিল। এরূপ সকলের আদরের পাত্রীকে হারাইয়া তাঁহার আত্মীয়গণ বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী যে বিশেষ শোকাকুলিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার পরিত্যাক্ত আত্মীয়গণের প্রাণে মঙ্গলময় পরমেশ্বর সান্ত্বনা প্রদান করুন। গত ৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার নির্ম্মলাবালার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

আমাদিগকে আরও একটী দারুণ শোক সংবাদ পাঠকগণকে প্রদান করিতে হইল। কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি ধর মহাশয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আগ্রানগরে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেখানে প্রবল কলেরা রোগের আক্রমণে অনেককে ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই পরিবারেও উক্ত দারুণ রোগ প্রবেশ করিয়া নীলমনি বাবুর সহধর্ম্মিনী এবং দুইটী পুত্র সন্তানকে ইহলোক হইতে লইয়া গিয়াছে। এক সময়ে এরূপ গুরুতর শোক সহ্য করা মানুষের পক্ষে অতি কঠিন। বিশেষতঃ নীলমনি বাবু বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিতেছেন। এ অবস্থায় সর্ব্বশোকহরণ, পরমেশ্বর ভিন্ন সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে এমন শক্তি আর কাহারও নাই। আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর এই শোকাকুল পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। এবং এই পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিয়া অনন্ত কুশলে রক্ষা করুন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, নীলমনি বাবু তাহার সহধর্ম্মিনীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নামকরণ—বিগত ২৫এ ভাদ্র সোমবার কাঁথিস্থ বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর তৃতীয়া কন্যার (চতুর্থ সন্তান) নামকরণ ও অন্নাশন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আসিঃ সার্জ্জন বাবু গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কন্যার নাম শ্রীমতী বাসন্তীবালা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী অনেকে উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন।

দীক্ষা।—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ১লা আশ্বিন একটী বিধবা মহিলা বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজে বিধিমত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাঁর নাম সরস্বতী বাই বৎসর ১৭৲বৎসর। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই দীক্ষা উপলক্ষে বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজে আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে এই নবব্রত পালনের উপযোগী করুন।

দান প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ের বারেন্দা নির্ম্মাণ জন্য নিম্নলিখিত টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছি:—

শ্রীযুক্ত ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের ম্যানেজার	৫৲
বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, কলিকাতা	॥০
শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা, পূর্ণিয়া	১০৲
বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৲
দান সংগ্রহ	৫৪৶০
শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্যা, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, হুগলী	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু সম্ভুচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা	১০৲
„ দ্বারকানাথ সিংহ ঐ	১৲
„ কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া	৩৲
„ শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, কাঁথি	১৲
„ শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	২৫৲
শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেব ঐ	৫৲
„ সরলা রায়, কলিকাতা	১০৲
„ প্রসন্নতারা গুপ্ত ঐ	১০৲
বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	॥০
„ দীননাথ দাঁ ঐ	১৲
„ ত্রিপুরাচরণ রায়, রাঁচি	১৲
„ বৈদ্যনাথ ত্রিপাটী, ঐ	১৲
„ দীননাথ দত্ত, ঐ	॥০
„ রামচরণ পাল, ঐ	

„ শ্যামলাল ঘোষ, কলিকাতা	৫৲
ক্ষুদ্র সংগ্রহ	।০
পরলোকগত ডাক্তার ভোলানাথ বসুর পরিবার	১০০৲
বাবু নারায়ণ চন্দ্র দাস	॥০
„ স্ফটীকচন্দ্র দাস	২৲
„ রজনীকান্ত বসু, কলিকাতা	৫৲
শ্রীযুক্তা ললিতা রায়, ঐ	১০৲
শ্রীমতী মৃণালিনীর মাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী, পুনা	৫৲
„ সদয়চরণ দাস, শীলং	॥০
শ্রীযুক্তা রুক্মিণী মহলানবিশ	
জেলেটোলার ব্রাহ্মিকা সমাজ	
বাবু কুঞ্জলাল নাগ, ঢাকা	
„ যদুনাথ রায়, রামপুরহাট	
„ তারকচন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর	
„ মতিলাল হালদার, দারজিলিং	
„ শ্রীদয়াল ঐ	৩৲
„ হেমচন্দ্র চাস, কলিকাতা	২০৲
„ কৈলাসচন্দ্র বাগছী, পাবনা	॥০
„ উমাচরণ দাস, ভবানীপুর	৫০৲
„ চণ্ডীচরণ সেনের পরিবার	১৲
„ গোপালচন্দ্র মল্লিকের পরিবার	
„ আশুতোষ ঘোষ, গড়পার	
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক, কলিকাতা	
„ নন্দলাল সেন, ঐ	৫০৲
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন্নগর	৩৲
„ সাতকড়ি দেব, ঐ	১৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র,	
„ মনোমোহিনী বসু, কলিকাতা	১৫৲
মেদিনীপুর হইতে তারক বাবু আদায় করিয়া পাঠান	৭।০
বাবু বিনোদ বিহারী বসু, কালনা	
„ নন্দকুমার চৌধুরি, কলিকাতা	
„ সত্যরঞ্জন দাস ঐ	
শ্রীমতী শিবমনোমোহিনী সিংহ, মুঙ্গের	
বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, কলিকাতা	
„ মোহিনীমোহন মজুমদার, ঐ	১০
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ঐ	
„ গোবিন্দচন্দ্র গুহ, ঐ	
„ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	॥৵১০
„ দুর্গামোহন দাস, ঐ	১০০৲
পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঐ	২৲
বাবু বঙ্কবিহারী বসু, ঐ	২৲
„ ভুবন মোহন ঘোষ, ঐ	১০৲
„ মধুসূদন সেন, ঐ	৫৲
„ ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাঁথি	৫৲
„ চাঁদমোহন মৈত্র, হিজলাবট	৫৲
„ দ্বারকানাথ সেন, কলিকাতা	৫৲
„ কৈলাসচন্দ্র সেন, ঐ	২৲
শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায়, বরিশাল	৫৲
বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, কুষ্টিয়া	৫৲
„ চন্দ্রকান্ত সেন, গৌহাটী	১০৲
„ গৌরলাল রায়, কাকিনীয়া	৪৲
গগনচন্দ্র ঘোষ, ঐ	১॥০
নীলকমল সিংহ ঐ	১৲
তারক নাথ মৈত্র ঐ	২৲
হরিনাথ ঠাকুর ঐ	
কালীকুমার গুপ্ত ঐ	
„ গোবিন্দপ্রসাদ বকসী কাকিনীয়া	॥০
„ কৈলাসচন্দ্র রায় ঐ	।০
„ বিপিনবিহারী রায়, মাণিকদহ	২৫৲
একটী দরিদ্র, কোচবিহার	১৲
উপাসক মণ্ডলীর তহবিল হইতে মেরামতের ব্যয় দরুণ প্রাপ্ত	২৮৸৵০
	৭৪১।৶১০

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক বিল্ডিংফণ্ড কমিটী,
সাঃ ব্রাহ্ম সমাজ।

সহিত স্বীকার করিতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেঞ্চ পাখা ও হার্ম্মোণীয়মের জন্য নিম্ন লিখিত রূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাবু রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্তা শারদাসুন্দরী চৌধুরাণী, ঐ	১০৲
একপঞ্চাশৎ মাঘোৎসব ও প্রীতিভোজনের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে	১২।৵৫
রায় ধনপৎসিং বাহাদুর, আজিমগঞ্জ	১০৲
„ সেতাবচাঁদ বাহাদুর ঐ	৭৲
বাবু প্রসন্নচাঁদ দুগর ঐ	৭৲
„ আনসিং বয়েদ ঐ	৫৲
„ ধনশুকজি গুরুজি ঐ	৫৲
„ কালীচরণ মেমল ঐ	৪
„ বিনয়চাঁদ কিটো ঐ	
একটী বন্ধু ঐ	
বাবু মেহেরচাঁদ নলককা ঐ	
„ বুদ্ধসিং বিননচাঁদ দুধরিয়া ঐ	
„ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, মুরশিদাবাদ	
„ শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	১০
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র কলিকাতা	
„ সরচ্চন্দ্র রায় ঐ	
একটী ব্রাহ্মিকা হার্ম্মোণীয়মের সমস্ত মূল্য দেন	
বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত আঁকনা	২০৲
„ নবকুমার চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মীপুর	২৲
„ গঙ্গা গোবিন্দ নন্দী কলিকাতা	৫৲
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ঐ	১০৲
„ শশীভূষণ বিশ্বাস ঐ	৫৲
„ রাধামাধব বসু টাকি	১০৲
„ নন্দলাল সেন কলিকাতা	৫৲
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ	১৫৲
দ্বিপঞ্চাশৎমাঘোৎসবের উদ্বর্ত্ত	৪৪॥১০
বাবু কালীকুমার ঘোষ কলিকাতা	১৲
„ হরিচরণ সেন ঐ	২৲
„ পঞ্চানন ঘোষ ঐ	১৲
„ দুর্গামোহন দাস ঐ	১০০৲
„ ভুবন মোহন দাস ঐ	২০৲
„ ফণীন্দ্রমোহন বসু ঐ	১০
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক ঐ	
	৭৭৫৸৵১৫

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিস
সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
বিলডিং ফণ্ড কমিটী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

অগ্নি-দীক্ষা।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।
(মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—গানের সুর)

প্রভু হে আনিলে যে কাজ করিতে
প্রাণ তাতে দিলাম কই ?
আমি ভুলেও নারিনু আপনা ভুলিতে
এ ক্ষোভের কথা কারে কই ?
কোটি নরনারী—ভারত আঁধারে
হারায়ে তোমারে কাঁদে ওই ;
পেয়ে তব জ্যোতি একি হে করিনু
আপনি তাহারে আবরি' রই।
নারিনু ভুলিতে মান অভিমান
আলস্য জড়তা, গেল কই ?
ঘোর স্বেচ্ছাচারে বাড়ানু আমারে,
আমি হে আমারি তোমার নই।
নব অগ্নি-দীক্ষা দেও হে আমারে,
সে আগুনে পুড়ে তোমারি হই ;
জ্বালাই আগুন ভারত-কাননে,
আপনা হারায়ে তোমারে লই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধনা ও অধ্যবসায়—রাতারাতি লেখাপড়া শিখা যায় না, রাতারাতি পরিত্রাণও হয় না। বিশ্বাসের অনেক বল, কিন্তু সাধনার কার্য্য বিশ্বাসে হয় না। বিশ্বাসের সহিত পর্ব্বতে স্থানান্তরিত হইতে বলিলে, সে স্থানান্তরিত হইবে সত্য, কিন্তু সে স্থানে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, অনেক পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক বিলোড়নের প্রয়োজন হয়। সাধকদিগের জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠে দেখা যায়, যে যদিও তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও জীবনের গতি "রাতারাতি" পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই সুদীর্ঘ কাল সাধনার পর সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছাশক্তিকে আমরা হীন স্থান দিতে বলিতেছি না। উহাদিগের বল প্রচুর। এক দিনের প্রতিজ্ঞায় লোককে বিশ বৎসরের কু-অভ্যাস দূর করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা সাধনের অভাব দূর হয় না। উহারা যে সাময়িক বলের উচ্ছ্বাস আনয়ন করে, তাহা রাখিবার জন্য সাধনার নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্ম অতি দুর্লভ বস্তু, সংসারের প্রলোভন অতি ভীষণ, চিত্তের দুর্ব্বলতা শোচনীয়। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও সাধনা ভিন্ন সে প্রলোভন উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করত ব্রহ্মধন লাভ করা যায় না। শত শত কুঅভ্যাস ও শত্রু আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, অবসর পাইবামাত্র আমাদিগকে ধর্ম্মপথচ্যুত করিবে। কঠিন ও দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনা ভিন্ন সে সকল রিপুদিগের মস্তক কিরূপে হেঁট করিয়া রাখিব? আমাদিগের মধ্যে সাধনার বড়ই অভাব। যুগে যুগে ঋষি যোগীরা যেরূপ সাধনা করিয়া ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের কৃত সাধনা সাধনা শব্দেরই বাচ্য হইতে পারে না। সহিষ্ণুতার সহিত পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও উপলব্ধি ভিন্ন সাধনার কোন অবস্থাকেই চিরদিনের জন্য জীবনে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। মানব জীবনের সকল বিভাগেই অধ্যবসায়ের জয়। ফোঁটা ফোঁটা মাত্র জল দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষরিত হইলে প্রস্তর ক্ষয় পায়। ধর্ম্মজীবনেও অধ্যবসায় ও সাধনা ভিন্ন পরিত্রাণের আশা নাই।

প্রকৃত সাধনক্ষেত্র—বাহির হইতে অন্তরে, না অন্তর হইতে বাহিরে? স্থূলদর্শিগণ সকল বিষয়েই বাহির হইতে অন্তরে যাইতে বলেন। ধর্ম্ম রাজ্যেও তাঁহারা বাহির হইতে অন্তরে আসা প্রকৃত পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কেবল অনুষ্ঠানের সংখ্যা গণনা করেন, এবং সৎকর্ম্মের সংখ্যার তারতম্যানুসারে সাধকের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা নির্দ্ধারণ করেন। সূক্ষ্মদর্শিগণের উপদেশ অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন স্বর্গরাজ্য বাহিরে নহে, ভিতরে; ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা আগে ভিতরে, পরে বাহিরে। সেই জন্য ধর্ম্ম জগতে দেখা যায় যে যাহারা অন্তর হইতে বাহিরে আসে না তাহারা ধর্ম্মের অন্তঃপুরের সংবাদ রাখে না। বাহিরে পরিত্রাণের কথা বলিয়া বেড়াই, অথচ ভিতরে পরিত্রাণের মূল মন্ত্র প্রকাশ পায় নাই, বাহিরে

অনুষ্ঠান ও বাক্যের শ্রাদ্ধ করি, অথচ ভিতরে ভিতরে দেখি যে প্রাণ এখনও আস্তিক হয় নাই, ইহা বড় শোচনীয় অবস্থা। এই জন্য অভিজ্ঞ সাধকেরা বলেন যে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইতে হইবে। ভাল, তাহাই যেন মানিয়া লইলাম, কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন উঠে, সম্বন্ধ ঠিক হইল কি না হইল, রাঙ কি সুবর্ণ পাইলাম, কোথায় যাচিয়া লইব? সাধনক্ষেত্রের সেই জন্য আবশ্যকতা হয়। সমাজ দূরে, সকল সময়ে সমাজের সঙ্গে মিশিতে হয় না; হাতের কাছে কিন্তু পরিবার। পরিবারকেই সুতরাং প্রথম প্রথম সাধনক্ষেত্র করা সুবিধা। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর হইয়াছে মনে হইতেছে, প্রাণসম পুত্রের উৎকট পীড়ায় সে নির্ভর থাকে কি না দেখিলে জানিতে পারিবে যে প্রকৃত কি মর্কট নির্ভর লাভ করিয়াছ। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস হইয়াছে মনে হইতেছে, সহস্র বিরক্তির কারণ পরিবারে উপস্থিত হইলেও তোমার মন যদি বিক্ষুব্ধ, প্রেমহীন বা বিরক্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, ঈশ্বরের সহিষ্ণু প্রেমের কণা পাইয়াছ। পরিবারই প্রকৃত ও প্রথম সাধনক্ষেত্র। পরিবারকে এই ভাবে দেখিলে বনগমনের আবশ্যকতা হয় না, সংসারের প্রতি মায়াবাদীর বিদ্বেষ উপস্থিত হয় না। সাধনে লব্ধ ধন কসিয়া লইবার এমন সুন্দর কষ্টি পাথরকে আমরা বিপরীত চক্ষুতে দেখি, ইহাই দুঃখের বিষয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঐশীশক্তি।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বায়ুর গতি যেমন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সমান নহে, ঐশীশক্তির প্রকাশও তদ্রূপ সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সমান নহে। বিচিত্রতাই প্রকৃতির নিয়ম। দুই জন মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতি ঠিক্ একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, একই জাতীয় দুইটী বৃক্ষকে পরস্পরের সহিত তুলনা কর, কত বিভিন্নতা দেখিতে পাইবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা। পৃথিবীর সকল লোকের আকার যদি ঠিক্ একরূপ হইত তাহা হইলে যে কি ভয়ানক সামাজিক ও সাংসারিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, মহাকবি সেক্সপীয়র রচিত "ভ্রান্তিবিলাস" (Comedy of Errors) নামক প্রহসনে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সকল মানুষের প্রকৃতি যদি ঠিক্ একরূপ হইত তাহা হইলে বোধ হয় সেই এক প্রকৃতিক (একঘেয়ে) মনুষ্য মণ্ডলী পরস্পরের সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠিত। যদি একটী সহরের সকল বাড়ী গুলিই সুন্দর অথচ ঠিক্ এক আকারের হয় তবে সে সহরের সৌন্দর্য্য থাকে না। আহারের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল মিষ্টান্ন, বোধ হয় কাহারও ভাল লাগে না। বিচিত্রতাই জগতের নিয়ম, বিচিত্রতাতেই সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতাতেই সুখ, বিচিত্রতাতেই শৃঙ্খলা। যে জীবনে কোনও রূপ দুঃখ নাই, অভাব নাই তাহাতে সুখও নাই। অবিমিশ্র সুখ বাস্তবিক সুখকর কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এই বিচিত্রতার জন্য সৃষ্টি কর্ত্তাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী মনে করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। সকল মানব ঠিক্ সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট অথবা সমান অবস্থায় অবস্থিত নহে, বলিয়া যদি জগদীশ্বরকে পক্ষপাতী বলিতে হয় তবে সকল লোক সমান আকৃতি বিশিষ্ট নহে বলিয়াও ত স্রষ্টাকে পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে?

প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই; একই প্রকারের অবস্থায় একই প্রকারের কারণ পরম্পরার সমবায়ে ফল বা কার্য্য যে একই প্রকারের হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কথা এই যে, দুইটী নির্দ্দিষ্ট স্থলে যে অবস্থা ও কারণ পরম্পরার সমবায় ঠিক্ একরূপই হইবে তাহার স্থিরতা কি? বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণের সহযোগে যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় জন্ম, বিভিন্ন ভাবে লালন পালন ও বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা ও সংসর্গ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন পিতামাতার (ও কাহারও কাহারও মতে তদূর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদিগের) প্রকৃতি অনুসারে মানবপ্রকৃতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ইহা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তৎপক্ষে অনেক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণও আছে। এ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি ঐশীশক্তির প্রকাশের পক্ষে অথবা কোনও বিশেষ দেশ বা সমাজ কোন উচ্চ সত্য বা ভাবের প্রকাশের পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুকূল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবং তাহার জন্য বিধাতাকেই বা পক্ষপাতী বলিব কেন? ইহাতে সাম্যের কোনও ব্যাঘাত হয় না। সাম্যের অর্থ কি? সাম্যের অর্থ ইহা নহে যে সকল মানুষের অবস্থা বা প্রকৃতি ঠিক্ একরূপ হইতে হইবে। সাম্যের অর্থ সাধারণ অধিকারের সাম্য, সাম্যের অর্থ সুযোগ ও দায়িত্বের, অধিকার ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য—অর্থাৎ তোমার পক্ষে জ্ঞান ধর্ম্ম লাভের যে পরিমাণে সুযোগ আছে, অবস্থার অনুকূলতা আছে তোমার দায়িত্বও সেই পরিমাণে গুরুতর, তোমার অধিকার যেরূপ উচ্চ, তুমি জ্ঞান ধর্ম্মে যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছ তোমার হৃদয়ে যেরূপ উচ্চ সত্য ও ভাবের আলোক, যেরূপ উন্নত আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে তোমার কর্ত্তব্যের ভারও সেই রূপ গুরুতর। তোমার শক্তি যতটুকু সেই পরিমাণে কার্য্য করিবার জন্য তুমি দায়ী।

সকলের প্রকৃতিতেই দেবভাব বা ঐশী শক্তির অঙ্কুর আছে ইহা সত্য; কিন্তু সকলের হৃদয়ে তাহা সমান প্রকাশিত হয় না, অথবা সকলের তাহা সমান ভাবে ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই। বীজের মধ্যে ভাবী বৃক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে ইহা সত্য, কিন্তু সেই বৃক্ষ প্রকাশের জন্য অনুকূল অবস্থা চাই—রস চাই, উত্তাপ চাই, আলোক চাই, সেই জাতীয় বৃক্ষের পরিপোষক উপাদান বিশিষ্ট মৃত্তিকা চাই—তবে বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হইবে। শিক্ষক পঞ্চাশ জন ছাত্রকে একটী বিষয় বুঝাইয়া দিলেন, কেহ শুনিল, কেহ শুনিল না। যাহারা শুনিল না তাহাদের কথা

ছাড়িয়া দিন, কিন্তু যাহারা শুনিল তাহারা কি সকলেই সমানভাবে উহা বুঝিল? প্রায়ই সেরূপ দেখা যায় না। কেহ একবার দেখিলেই বুঝে, কেহ চেষ্টা করিয়া বুঝে, আবার কেহ বা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাল বুঝিতে পারে না। ইহার কারণ কি কেবল মনোযোগের অভাব—না বুদ্ধিমত্তা বলিয়া একটা জিনিস আছে? যদি প্রকৃতিগত বৈষম্য না থাকিত তাহা হইলে মনোযোগী ছাত্রমাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শী হইত। এক এক জনের বুদ্ধি এক একদিকে ভাল চলে। দুই ব্যক্তি একই বিষয় আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল তাহার মধ্যে এক জন অল্প পরিশ্রমে ও অল্পদিনে তাহা শিখিয়া ফেলিল, আর একজনের তাহাতে প্রবেশ করিতে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ সময় ও পরিশ্রম লাগিল, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

চেষ্টা করিলে প্রত্যেক লোকে হয়ত কোন না কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই যে কালিদাস বা সেক্সপীয়রের মত কবি, গালিলিও বা নিউটনের মত গণিতবেত্তা, অথবা হিউম বা কাণ্টের মত দার্শনিক হইতে পারে একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি তাহা পারিত তাহা হইলে এরূপ লোকের সংখ্যা জগতে এত বিরল হইত না। যে যে শক্তির বিশেষ বিকাশে দুই এক জন লোক কোনও বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ প্রাধান্য লাভ করে, তাহার বীজ সকলের প্রকৃতিতে আছে ইহা স্বীকার করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে সকলের প্রকৃতি, মানসিক ও বাহ্যিক অবস্থা, শিক্ষা, সংসর্গ ইত্যাদি ঐ সমুদায় শক্তির বিকাশের পক্ষে সমান অনুকূল নহে। চেষ্টা করিলে অনেকে কালিদাসের কাব্য, নিউটনের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা কাণ্টের চিন্তাপ্রসূত দার্শনিক মত সকলের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সকলেই যে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের ন্যায় মৌলিক (original) ভাবের অবতারণা বা সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন একথা বলিলে প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা ও নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক কথা বলা হয়। কারণ, যাঁহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন যে সকলের মানসিক শক্তি সমান ও সমভাবে বিকসিত নহে। এক একজনের বুদ্ধি এক এক বিষয়ের বিশেষ উপযোগী; আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের বুদ্ধি একাধিক বিষয়েও সহজে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে; অপরদিকে এমন লোকও আছে যাহাদের বুদ্ধি কোনও বিষয়েই ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। ইংরাজিতে যাহাদিগকে idiot (জড়বুদ্ধি) বলে তাহারা ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। কোনও মতবিশেষ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ধীরভাবে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে মানসিক শক্তি সম্বন্ধে সকল লোক সমান নহে। অথচ একথা বলিলেই যে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হইল তাহার কোনও অর্থ নাই। নানা কারণ পরম্পরার সমবায়ে ও অবস্থাভেদে একই অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন লোকের মানসিক শক্তির বিকাশের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের পক্ষে পরিবর্ত্তনশীল হওয়া যদি তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়, জগতের অখণ্ডনীয় নিয়মের পরিবর্ত্তন করা যদি তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়, তবে এই বৈষম্য দূর করাও তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম; ইহাতে পক্ষপাত নাই, অসাম্য নাই। কারণ, যাহার যতটুকু শক্তি সে তাহারই জন্য দায়ী; সে তাহারই সদ্ব্যবহার করিবে, তাহারই উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে, তাহারই সাহায্যে জগতের জন্য যে কিছু কার্য্য করিতে পারে তাহা করিবে। মানব মণ্ডলীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও যেমন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সাধারণ সৌসাদৃশ্য আছে, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্য সত্ত্বেও সকলের সাধারণ অধিকারের সাম্য আছে। নতুবা বিশেষ শক্তি, অবস্থা, সম্বন্ধ প্রভৃতি কারণে বিশেষ অধিকারের বৈষম্য ত থাকিবেই। যে সাম্যবাদ বলে তুমি, আমি, খৃষ্ট, চৈতন্য, কালিদাস, নিউটন, কাণ্ট, নেপোলিয়ন সকলেই সমান—তোমার আমার সহিত ইহাদের কোনও ইতর বিশেষ নাই—ইহাদের মধ্যে যে শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তোমার আমার মধ্যেও সেই শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহাদের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের সমান অধিকার—সে সাম্যবাদের মধ্যে কতদূর সত্য আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বিভিন্ন লোকের মধ্যে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির ভিন্নতা আছে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিরও ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও আধ্যাত্মিকতা জ্ঞানপ্রধান, কাহারও বা ভাবপ্রধান, কাহারও বা কার্য্যপ্রধান, আবার কাহারও কাহারও জীবনে এই তিনের সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বা বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মনিষ্ঠ, অল্পবয়সেই তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অনেকে তাহা পারে না। জন্মগত কারণেই হউক, বা বাল্যকালীন অবস্থা, শিক্ষা ও সংসর্গের জন্যই হউক, অথবা তৎসাময়িক সাধারণ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবেই হউক তাঁহাদের প্রাণে ধর্ম্মের উচ্চ ভাব ও সত্য সকল বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এরূপ প্রকৃতি যে ঐশী শক্তির প্রকাশের পক্ষে—উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল তাহা কখনই অস্বীকার করা যায় না। যখন বিশেষ অবস্থার প্রভাবে কোনও সমাজে ঐশী শক্তির বিশেষ প্রকাশ হয় সেই শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র কোথায়? ঐ সমাজস্থিত নরনারীর আত্মাই তাহার ক্ষেত্র। নতুবা শূন্যে কিছু আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইবে না। আর যদি সমাজস্থ মানবাত্মাই সেই ক্ষেত্র হয়, তবে যে সকল আত্মা বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন তাহাতেই সর্ব্বাগ্রে ও বিশেষ প্রবলভাবে উহার প্রকাশ দেখা যাইবে না ত কোথায় দেখা যাইবে? ইহার মধ্যে ত অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব কিছু দেখি না। যদি শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা স্বাভাবিক হয় ও তাহাতে পক্ষপাতিত্ব না থাকে তবে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিভিন্নতাই বা অস্বাভাবিক ও পক্ষপাতদোষযুক্ত কেন হইবে? আর তাহা যদি না হয় তবে অনুকূল আধ্যাত্মিকঅবস্থাসম্পন্ন আত্মায় ঐশীশক্তির প্রকাশই বা অস্বাভাবিক ও পক্ষপাতদোষবিশিষ্ট হইবে কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনোরাজ্যে যেমন কেহ কেহ

স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে, সাধারণ লোক অপেক্ষা সহজে দুরূহ সত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন, নূতন নূতন ও সুন্দর সুন্দর ভাবের অবতারণা করিতে পারেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তেমনি কেহ কেহ স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে অপরের অপেক্ষা সহজে উচ্চ ভাব ও সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, উন্নত আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। জগতের ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ কথা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা হয়।

ইহার বিরুদ্ধে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা চেষ্টা করি না বলিয়া সেরূপ উন্নত হইতে পারিতেছি না। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে শক্তির তারতম্য অনুসারে চেষ্টার ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। শক্তি না থাকিলে কেবল চেষ্টায় কিছু হয় না। যাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল, পাঁচমিনিট স্থির হইয়া কোন বিষয় ধরিতে পারে না, তাহাকে তিন ঘণ্টা বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলে সে পারিবে কেন? তোমার আধমণ ভার তুলিবার শক্তি নাই, তুমি এক মণ বহিবে কিরূপে? যে জ্যামিতির একটা সামান্য সত্য বুঝিতে পারে না সে গ্রহগণের কক্ষাদির প্রকৃতি বুঝিবে কেমন করিয়া? আমরা আগামীবারে এই বিষয় আরও বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

আত্মসমর্পণ।

ঈশ্বর মহান্, মানব সন্তান ক্ষুদ্র, ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান্, মানব দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়; ঈশ্বর অসংখ্য বিভূতিবিশিষ্ট, মানব সন্তান দরিদ্র ও নিঃসম্বল। এরূপ বিসদৃশভাবাপন্ন দুই আত্মায় যোগ কিরূপে সম্ভব, সাধনার্থীর মনে সহজেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে।

এই প্রশ্নের মীমাংসা দুই প্রকারে হইতে পারে। এক প্রকার তত্ত্ববিদ্যার দিক্ হইতে, আর এক প্রকার ভক্তির দিক্ হইতে। তত্ত্ব-বিদ্যা বলেন যে (১) জীব ও পরমাত্মায় পদার্থগত প্রভেদ নাই, পরিমাণগত অনন্ত প্রভেদ আছে এবং (২) ঈশ্বর জীবের প্রাণ ও জীব সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মের মুখাপেক্ষী। একথা যদি সত্য হয়, যে ব্রহ্ম প্রতিমুহূর্ত্তে জীবের জীবন রচনা করেন এবং জীবের জীবন অসীম ব্রহ্মের সসীম ক্রম বিকাশমাত্র, তাহা হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ ধারণা করা সহজ হইয়া পড়ে।

ভক্তিশাস্ত্র বলেন, জীব ও ব্রহ্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও প্রেমে উভয়ে সাযুজ্য লাভ করে। জীব উত্থান করে, ব্রহ্ম অবতরণ করেন, উভয়ে মিলন হয়! বর্দ্ধমান অনুরাগ জীবাত্মায় ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ তৃষ্ণা উৎপাদন করে। জীব আত্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া উপরের লৌহ সরাইয়া দিলে নিম্ন হইতে অরুণোজ্জল ব্রহ্মরূপ সুবর্ণকণা বাহির হয়; তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন হয়। প্রেমরাজ্যে বয়স, গুণ, ধন, বিদ্যা ও অন্যবিধ অসমাবেশ নিবন্ধন যে মিলনের ক্রটী হয় না ইহা কে না জানে?

বহির্জগতে দেখিতে পাই, ভানুকরোত্তপ্ত বারি রাশি ধূমাকারে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হইলে, আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষিত হয়, এবং সেই বারিধারায় ধরার উর্ব্বরতা সাধন করে। অন্তর্জগতেও ইহার সদৃশ ঘটনা ঘটে। ব্রহ্মরবি নিঃসৃত পবিত্রতার রশ্মি জীব-হৃদয়ে পড়িয়া অনুতাপ ও প্রার্থনা উত্থিত হইলে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয় এবং সেই কৃপাধারা হৃদয় ক্ষেত্রকে প্রেম ও পুণ্যফল প্রসবে সমর্থ করিয়া তুলে।

মিলনে উভয়পক্ষকে যে উভয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, এই সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যই ব্রহ্মকৃপা ও জীব চেষ্টার সামঞ্জস্য ভূমি। জীব চেষ্টার মূলে যে ব্রহ্মশক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জীবাত্মার যখন স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তখন জীবকৃত চেষ্টায় জীব কর্ত্তৃত্ব আরোপ অপরিহার্য্য। ব্রহ্মশক্তি সাধু অসাধু উভয়ের নিকটেই আসে; সাধু সে শক্তি স্বাভাবিক পথে পরিচালন করিয়া স্বর্গে যান, অসাধু সে শক্তির অপব্যবহার করিয়া অধঃপাতে যায়। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" নিম্নশ্রেণীর সাধকের মুখে শোভা পায় না। যে সাধক আপনার ও ব্রহ্মের মধ্যে ইচ্ছাগত পার্থক্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন, তিনিই উক্ত মহাবাক্যের মহত্তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তিনিই বুঝেন, যে একদিন যাহাকে নিজশক্তি বলিয়া জানিতেন, তাহা তাঁহার নহে, ব্রহ্মের কৃপা-সম্ভূত।

জীবচেষ্টা সুতরাং দুই প্রকার; এক প্রকার অহঙ্কারমিশ্র ও আর এক প্রকার অহঙ্কার শূন্য। অহঙ্কারমিশ্র চেষ্টায় মিলন হয় না, অহঙ্কারশূন্য চেষ্টা আত্মসমর্পণে পরিণত হয়।

ঈশ্বর চরণে আপনাকে সমর্পণ করাই আত্মসমর্পণ; স্বতন্ত্রতা নাশ উহার লক্ষণ। এ স্বতন্ত্রতা বস্তুগত নহে ইচ্ছাগত। "যাও তোমার যাহা কিছু আছে বিক্রয় করিয়া বিতরণ করত আমার অনুবর্ত্তী হও" এই মহাবাক্যে মহর্ষি ঈশা একটী সুমহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন। সে সত্য এই, যে বিশ্বপতি নিরন্তর আমাদিগের নিকট আত্মসমর্পণের দাবী করিতেছেন। আত্মবুদ্ধি বা অহঙ্কার জীবের বন্ধন কেন না উহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবাত্মা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও গৌরব আপনাতে আরোপ করে। এই আত্মবুদ্ধির প্ররোচনাতেই জীবাত্মা স্বভাবলব্ধ দিব্যদৃষ্টি হারাইয়া ঘোরতর মোহের অন্ধকারে আবৃত ও অসত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই অন্ধকার নিরসন ও এই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য আত্মবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। অহঙ্কারী লোক আপাততঃ দেখিতে নৈতিক জীবন লাভ করিতে পারে, কিন্তু যতদিন না অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, ততদিন কেহই উচ্চ ধর্ম্মজীবনের অধিকারী হয় না। যেমন দিবসের আলোক নির্ব্বাণ না হইলে নৈশগগন শোভী তারাদলের স্নিগ্ধ ও বিমল আলোক প্রকাশিত হয় না, তেমনই আপনার অহঙ্কারের আলোক নির্ব্বাণ না হইলে পরমাত্মার সুস্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতি হৃদয়ে বিকশিত হয় না। সংসার আমার, সমাজ আমার, আমি কেবল আপন চেষ্টায় উন্নত হই, এ সকল কথা অহংবুদ্ধির প্রকাশ। যতদিন এ সকল কথা থাকে, ততদিন জীবাত্মা আপনার প্রকৃত নিরাশ্রয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং করিতে পারে না বলিয়াই আত্মবিসর্জ্জনে ব্যাকুলতা জন্মে না।

অহং বুদ্ধি বিনাশ পূর্ব্বক দীনহীন ভাবে ঈশ্বরপদে আত্ম-সমর্পণ করা অতীব কঠিন। অভ্যাস ও সঙ্গদোষ বশতঃই উক্ত অবস্থা লাভ করা দুরূহ হয়। অসিদ্ধলোকদিগের মধ্যে অহং ভাবের প্রবল রাজত্ব। দ্বিবিধ অন্ধতা উহাদিগকে সত্য হইতে দূরে রাখে। বাহ্য জগতে তাহারা কেবল প্রকৃতির শক্তির ক্রীড়া দেখে, ঈশ্বরের লীলা দেখিতে পায় না; অন্তর্জগতে তাহারা ঐশী শক্তির বিকাশ না দেখিয়া আপনার শক্তির প্রকাশই দেখে। এই অন্ধতা বশতঃ তাহারা উৎকৃষ্টতম সদনুষ্ঠানেও আপনার গৌরব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করে এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। এরূপ লোকদিগের মধ্যে বাস করিয়া উহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ভিন্ন আত্মা আর কি শিখিতে পারে?

অভিমানী আত্মার অহংভাব দূরীকরণের উপায় বৈরাগ্য সাধন। বৈরাগ্য দুই প্রকার, মর্কট ও প্রকৃত। মর্কট বৈরাগ্যে অভিমান বৃদ্ধি বই হ্রাস পায় না। সুতরাং মর্কট বৈরাগ্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। সাধকদিগের এবিষয়ে কঠিন শাসন। বাহিরের বিলাসে ভিতরের বৈরাগ্য গোপন করিবার বিধিও কেহ কেহ দিয়া থাকেন। বৈরাগ্য অতি কোমল বস্তু; বিশেষ যত্ন করিয়া রক্ষা না করিলে থাকে না। সকল ধর্ম্মভাব ও সাধনের প্রকৃতি কর্পূরের ন্যায়; চাপা দিয়া না রাখিলে উড়িয়া যায়। প্রকৃত বৈরাগ্য আবার দুই প্রকার; এক প্রকার বস্তুগত ও আর এক প্রকার আত্মগত। সকল বস্তুই অসার, ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তুর বস্তুত্বই নিষ্পন্ন হয় না, ঈশ্বরের শক্তিই বস্তুর আকার ধরিয়া আমাদের অন্তরে বস্তুজ্ঞান উৎপাদন করে। কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে যে বাহিরের সম্বন্ধ সংস্থাপিত তাহা অনিত্য; কেহ ও কিছুই সঙ্গে যাবে না, জীবনে মরণে এক ঈশ্বরই সহায়, সম্বল ও আশ্রয় ইত্যাকার সাধন ধারণা বস্তুগত বা প্রচলিত বৈরাগ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বৈরাগ্য সাধন না করিলে আত্ম-বিসর্জ্জনে স্পৃহা পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। সে উচ্চতর বৈরাগ্য আত্মগত অর্থাৎ আপনাকে অসার অকর্ম্মণ্য ও দীন হীন বলিয়া ধারণা। যতদিন পর্য্যন্ত মনে থাকে যে আমি একটা শক্তিমান্ ব্যক্তি এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি ততদিন বিনয়ের সঞ্চার ও আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের উপযোগী হয় না। নিজের অসারত্ব যত বুঝিব ঈশ্বরের সারবত্তা ততই আমাদের প্রাণে প্রতিভাত হইবে।

উক্ত দ্বিবিধ বৈরাগ্য আত্মসমর্পণ রূপ চিত্রের ভূমি। উহাতে আত্মবিসর্জন চিত্রের ভূমি প্রস্তুত করিয়া ইচ্ছাযোগে রঙ ফলাইতে হয়। ইচ্ছাযোগও দুই প্রকার; এক প্রকার কর্ম্ম ফল ত্যাগ, আর এক প্রকার ঈশ্বর প্রীত্যর্থে ধর্ম্মানুষ্ঠান। কর্ম্ম অপরিহার্য্য সুতরাং কর্ম্মের সহিত ইষ্ট দেবতার যোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। এই যোগের প্রথম সোপান কর্ম্মফল ত্যাগ; নিঃস্বার্থ কর্ম্ম ভিন্ন কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; আর নিশ্চিন্ত ভাব ভিন্ন শান্ত ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান অসম্ভব। কেবল কর্ম্মফল ত্যাগ কিন্তু যথেষ্ট নহে। কর্ম্মফল ত্যাগ শুষ্ক ও নীরস হইতে পারে। শুষ্ক বা জ্ঞানমূলক কর্ম্ম ফল ত্যাগে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। সরস বা অনুরাগ মূলক কর্ম্মত্যাগই স্থায়ী ও মধুর। বৈষ্ণব ভক্তি শাস্ত্রে যে মধুর দাস্য ভাবের কথা শুনা যায় প্রেম মূলক কর্ম্মত্যাগের পর সে ভাবের উদয় হয়। আমি দাস, আমার নিজের ইচ্ছা নাই, প্রভুর যাহা ইচ্ছা আমার তাহাই ইচ্ছা, প্রভুর ইচ্ছা পালন অতীব ক্লেশপ্রদ হইলেও আমার সর্ব্বতোভাবে করণীয় যাহার মনের ভাব সে, ব্যক্তি ভাগ্যবান্। সেই যথার্থ আত্ম সমর্পণের মর্ম্ম বুঝিয়াছে।

ক্ষণিক আত্ম-সমর্পণ অল্পাধিক পরিমাণে সকল বিশ্বাসী সাধকের জীবনে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা সাধন জনিত নহে বলিয়া স্থায়ী হয় না। সাধ্য অবস্থা যত দিন না সহজ ও স্বাভাবিক হয় তত দিন তাহা আয়ত্ত হয় না। আত্ম-সমর্পণ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ও প্রযত্নানুষ্ঠিত বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ এবং প্রেম মিশ্র কর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক হইলে আত্মা যে এক অপূর্ব্ব ভাব লাভ করে তাহা প্রেমদাস অতি সুন্দর ভাবে নিম্ন লিখিত সংগীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রাণ যোগে যোগী হয়ে, থাকিব সদা নির্ভয়ে,
সুখে করিব পালন, অনন্ত জীবন ব্রত;
সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে
ফিরে ফিরে বারম্বার, নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমারে পাবে,
সশরীরে স্বর্গে যাবে হইয়ে জীবন্মুক্ত;
আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী
দেবলোকে সেই ধ্বনি হইবে প্রতিধ্বনিত।"

* ঈশাদি মহাজনগণ এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইষ্টদেবতার সহিত ইচ্ছাযোগে সাযুজ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে কয়েকটী কথা।

(২)

(প্রাপ্ত)

গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে কয়েকটী কথা" নামক প্রস্তাবে সবর্ণে বিবাহ দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সংক্ষেপে তাহার কোন কোন্‌টীর উল্লেখ করা গিয়াছে। ব্রাহ্ম বিবাহের পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত মনে করিয়া সে সম্বন্ধে এবার কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। আশা করি ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা তিন প্রকার প্রণালীতে বিবাহপদ্ধতি স্থিরীকৃত হইতে দেখিতেছি। (১ম) অনেকস্থলে পাত্র পাত্রী উভয়ে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। (২য়) কোন কোন স্থলে কন্যার পিতা বা অভিভাবক পাত্রীর ভার পাত্রের প্রতি অর্পণ করেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। তৎপর বর কন্যা উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাঁহারা উদ্বাহ-ব্রতে ব্রতী হন। ৩য় পিতা প্রথমতঃ কন্যা সম্প্রদান করেন। বর এই দান গ্রহণ পূর্ব্বক পরে উভয়ে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বর্ত্তমান সময়ে এই তিন প্রণালীতেই ব্রাহ্ম সমাজে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এখন বিবেচ্য এই একই কার্য্যের পক্ষে এইরূপ তিনটী প্রণালী অবলম্বন সঙ্গত হইতে পারে কি না। উক্ত প্রণালী তিনটীই যে এক ভাবাপন্ন নয় বরং অনেক পরিমাণে পরস্পর বিরোধী তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে এই তিনটী প্রণালীতেই অবাধে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। বিবাহের প্রণালী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকা প্রার্থনীয় হইলেও বিশৃঙ্খলতা কখনই প্রার্থনীয় নহে। অন্তত: গুরুতর বিষয় গুলিতে ঐক্য থাকা উচিত। এজন্য কোন্ প্রণালী অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয় তাহার মীমাংসার পক্ষে উদাসীন হওয়া কখনই উচিত নহে।

ব্রাহ্ম সমাজ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয়ে বর কন্যার সম্মতির শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। পরস্পরের অসম্মতিতে কোন বিবাহ হওয়া ব্রাহ্মগণ কখনই উচিত মনে করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিবাহ বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য যে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন সে বিষয়ে বর কন্যাকে তুল্য অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রাহ্ম সমাজ সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ এবং দম্পতির কল্যাণ-সাধন সম্বন্ধে উভয়েরই সাহায্য বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। একজন অন্ধের ন্যায় অন্যের অনুসরণ করিবে বা একজন অন্যের ভার বহন করিবে তাহা নয়; কিন্তু উভয়ে উভয়ের জীবনপথের সহায় হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সম্মিলিত ভাবে সংসারে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ব্রাহ্ম সমাজ এই নীতির পক্ষপাতী। সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে উভয়ের সহায়তাই প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সংসারে নর নারী স্বভাবদত্ত অধিকার সম্বন্ধে কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নয়।

সুতরাং একজন ভার গ্রহণ করিবে আর অন্য জন গৃহীত হইবে, এরূপ প্রথা সমর্থিত হইলে উভয়ের সমান অধিকার, বা উভয়েই বিশেষ রূপে উভয়ের সাহায্য দাতা, উভয়ের কল্যাণ সাধনে উভয়েই উপযুক্ত; এ সকল কথা আর স্বীকৃত হইতেছে না। একজন যদি ভার গ্রহণ করে, আর অন্যজন যদি গৃহীত হয়, তবে উভয়ের ভার উভয়ে বহন করিবে, কিম্বা উভয়ে সমভাবে সহায়তা করিবে, এই কথার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। অতএব একজনে ভার গ্রহণ করিবে অন্যজন গৃহীত হইবে এই প্রথা কখনই বিচার-সংগত হইতেছে না। এজন্য ভার অর্পণ করিতে হইলে উভয়ের ভার উভয়কে দিতে হইবে এবং উভয়েই তাহা গ্রহণ করিবে ইহাই যুক্তিযুক্ত। তৎপর বিবেচনা করিতে হইবে যে এই ভারার্পণ ক্রিয়া কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া প্রার্থনীয়। এক হইতে পারে যে বর কন্যা নিজেরাই আপন আপন ভার উভয়ের প্রতি অর্পণ করিতে পারে, আর না হয় উভয়ের পিতা মাতা বা অভিভাবক উভয়ের ভার উভয়কে অর্পণ করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের উপর শৈশব জীবনের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের ভার স্বভাবতঃ অর্পিত থাকে। সেই ভার আপন স্কন্ধ হইতে তাহাদের (বর কন্যার) উভয়ের মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্পণ করিবার অধিকার অবশ্যই তাঁহাদের থাকা উচিত। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ সময়ে এইরূপে ভারার্পণ করিতে পারেন। এই ভারার্পণ যদি পাত্র পাত্রীর পিতা মাতা কিম্বা অভিভাবক সমভাবে সম্পন্ন করেন অর্থাৎ যদি পাত্রীর ভার পাত্রের উপর এবং পাত্রের ভার পাত্রীর উপর উভয় পক্ষ হইতে সমর্পিত হয়, তাহা হইলেই উভয়ের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয় এবং উভয়ের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে যে বিবাহেই ভারার্পণের প্রথা অবলম্বিত হইতেছে, সেই বিবাহেই দেখা যাইতেছে যে পাত্রীর ভারই অর্পিত হইতেছে, কিন্তু পাত্রের ভার কোথাও অর্পিত হইতেছে না। এইরূপ এক জনের ভার অর্পণ করায় উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইতেছে না। শুধু তাহা নয়, প্রকারান্তরে নারী জাতিকে হীন করা হইতেছে। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে—আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে চরিত্র-রক্ষণ বিষয়ে সাহায্য করিতে নারী জাতির ক্ষমতা যে কোন অংশে কম তাহা বলিবার উপায় নাই। এদেশে অর্থ উপার্জ্জন পুরুষের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকিলেও এই প্রথাই যে চিরদিন চলিতে থাকিবে বা থাকা উচিত তাহা নয়। একজন প্রতিনিয়ত অন্যের উপর নির্ভর করিতে থাকিলে তাহার আত্মসম্মানবোধ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়। স্বাধীন বিবেচনাশক্তি ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনেও শক্তি থাকিতেও ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতে হয়। এরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই চিরকাল এদেশে নারীগণ অতি হীনভাবে অন্যের অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতা বর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আর সেরূপ প্রথা প্রবল থাকিতেছে না। ইহারই মধ্যে নারীগণ সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত অর্থ সম্বন্ধেও সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছেন। যেখানে সেরূপ সম্ভাবনা নাই সেখানেও নারী যে সংসারের প্রয়োজন সাধনে অল্প সাহায্য করেন তাহা নয়। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে নারীর সহায়তা ভিন্ন পুরুষ কোন্ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। নারী তেমনি গৃহ-কার্য্যের সাহায্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত থাকেন। সুতরাং এরূপ বলিবার উপায় নাই যে সংসারে নারীর শক্তির প্রয়োজন কিছু কম। বাহিরের ব্যাপারে নারীর শক্তি যেমন কম নয়, তেমনি অন্তরের উন্নতিসাধনে, চরিত্রের উন্নতিসাধনে এবং ধর্ম্মসাধনে নারী যে পুরুষের বিশেষ সহায় তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

বিবাহকালে পাত্রীর ভার পাত্রের উপর সমর্পণ দ্বারা নারীজাতিকে নিচু করা হয়। তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া হয় তুমি অন্যকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, তোমার ভার অন্যে বহন করিবে, তুমি তাহার অনুসরণ করিবে মাত্র। এইরূপে আত্মমর্য্যাদাহীন এবং শক্তি থাকিতেও অশক্তের ন্যায় ব্যবহার করাতে নারীর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে চিরকাল এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে যে নারীর পৃথক্ কোন ধর্ম্মসাধন নাই। স্বামীর ধর্ম্মেই নারীর ধর্ম্ম। তিনি কেবল স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা করিবেন। স্বীয় বিবেক বা কর্ত্তব্য বুদ্ধি

অনুসারে চলিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজও প্রকারান্তরে সেই প্রথারই সমর্থন করিতেছেন। অন্ততঃ এই ব্যবহার দ্বারা নারীগণকে তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। এই প্রথা দ্বারা বিশেষভাবে নারীজাতির উন্নতির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং নারীজাতিকে হীনভাবে দেখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং ব্রাহ্মগণের বিবেচনা করা উচিত যে এরূপভাবে বিবাহ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত কি না। যে বিবাহে পাত্র পাত্রী উভয়ের দ্বারাই প্রতিজ্ঞা করান হয় যে—"সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গল সাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্ন করিব, সেই বিবাহে পাত্রীর ভার পাত্রের উপর সমর্পন করার রীতি কখনও শোভা পায় না। চিরাগত সংস্কারের অধীন না হইয়া যাহাতে বাস্তবিক উভয়ের অর্থাৎ পাত্র পাত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা পায় সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল কথা আলোচনা করিবার সুবিধা এবারেও হইল না, আগামীতে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাকরিবার ইচ্ছারহিল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়-
সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদ আদিনাথ বাবু ও আমার মধ্যে বিধানবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আর অধিক দূর চলিতে পারে না, এবং চলিবার প্রয়োজনও নাই। এই সম্বন্ধে এই পত্রই আমার শেষ পত্র। আদিনাথ বাবু ইচ্ছা হইলে আর এক পত্র লিখিতে পারেন; শেষ কথা বলার অধিকার তাঁহারই।

আমার আর অধিক লিখিতে অনিচ্ছা হইবার প্রথম কারণ এই,—আমি দেখিতেছি আমার অতি সহজ কথা ও আদিনাথ বাবু ভুল বুঝিতেছেন। আমি আমার প্রথম পত্রে বিধান-প্রকাশকে অর্থাৎ মানব অন্তরে জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশকে মানবের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ও ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ বলিয়াছিলাম। মানবের ইচ্ছা-সাপেক্ষ ঘটনা ও যে কতকগুলি আছে, এবং সে গুলি কি, তাহা স্পষ্টরূপে বলা আবশ্যক বোধ করি নাই, কেননা এই সামান্য বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই। কিন্তু আদিনাথ বাবু তাহার দ্বিতীয় পত্রে এই বিষয়ে কিছু ভুল বুঝিতেছেন দেখিয়া আমি আমায় দ্বিতীয় পত্রে প্রথমোক্ত সত্যের ব্যাখার পর পত্রের শেষ ভাগে বলিয়াছিলাম—"আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে আমি আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়াছি, যথা—'জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশ'। সমুদায় ঘটনাকে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলি নাই। ঈশ্বর-প্রকাশিত সত্য ও পুণ্যাদর্শের অনুসরণ পূর্ব্বক উপাসনা ও পুণ্যকার্য্য করা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ" ইত্যাদি। এই কথাতেই আদিনাথ বাবুর স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে "সীতানাথ বাবু অনেক দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন নিজেই তাহার অন্যথা করিতেছেন। কোন বিষয় জানা সম্বন্ধে মানবের ইচ্ছার সাপেক্ষতাকে তিনি যেরূপ অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আর পারিতেছেন না। কথাটা তবে নিতান্তই অযৌক্তিক নয়। তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে যে অন্ততঃ কতক গুলি বিষয় জানা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ। যদি কতক গুলি বিষয় জানা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ হয়, তবে অন্যগুলি প্রকাশের পক্ষে আমাদের ইচ্ছার কোন প্রয়োজন থাকার পক্ষেই বা কি বাধা থাকিতে পারে?" আমি এই কথা গুলি পড়িয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। আমি কোথায় বলিলাম, কবে বলিলাম যে "কতক গুলি বিষয় জানা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ?" আমি ত জ্ঞান মাত্রকেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়াছি। অপর দিকে আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে আমি "কতকগুলি ঘটনা" মাত্র উল্লেখ করিয়াছি; সেই "ঘটনা" গুলি কোন্ শ্রেণীর ঘটনা, সেগুলি যে জ্ঞান-শ্রেণীর ঘটনা নহে, তাহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। "কতকগুলি ঘটনা" বলিলেই কি "কতক গুলি বিষয় জানা" বুঝায়? ঘটনা মাত্রই কি জ্ঞান-শ্রেণীর ঘটনা? ঘটনা মাত্রই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে বটে, কিন্তু ঘটনা মাত্রই জ্ঞান নহে। আদিনাথ বাবু কি জানেন না যে আমাদের জীবনের ঘটনা সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—জ্ঞান, ভাব ও কার্য্য (বা ইচ্ছা—volition)। আমার মতে কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর ঘটনাই আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ। আদিনাথ বাবুর আর একটী আশ্চর্য্য ভুলের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে বলিয়াছিলেন, শেষপত্রেও বলিয়াছেন যে আমি ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া একরূপ স্বীকার করিয়াছি। শেষপত্রে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া সীতানাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্বপত্রে একরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম। এবারের পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারাও সে আপত্তির কোন মীমাংসা হয় নাই।" আমি আমার প্রথম পত্র পড়িয়া দেখিলাম আমি একস্থানে মানবের বৈচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম—"কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই পার্থক্য ঈশ্বরের অপক্ষপাতিত্বের বিরোধী। যাহা হউক, পার্থক্যটা নিঃসন্দেহ। আমাদের বিবেচনায় পার্থক্য না থাকিলে পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্বন্ধের যে মধুরতা তাহা থাকিত না, জগৎ একটা শ্রীবিহীন সমতল ক্ষেত্রের মত হইত।" জিজ্ঞাসা করি ইহাতে কি "ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া একরূপ স্বীকার করা" হইল? আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা ঈশ্বরকৃত জগতের বৈচিত্র, পার্থক্য। একজনের কৃত পার্থক্যের কারণ তাহার পক্ষপাতিত্বও হইতে পারে, তাহার অন্য ভাব বা অভিপ্রায়ও হইতে পারে। পার্থক্য একটী বাহিরের ব্যাপার, পক্ষপাতিত্ব ভিতরের ভাব। বাহিরের ব্যাপার দেখিয়া ভিতরের কারণ সকল স্থলে নিশ্চয়রূপে জানা যায় না, অন্ততঃ ঈশ্বরের ভাব নিশ্চিতরূপে জানিবার প্রণালী সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমার মতে জগতের পার্থক্য যে ঈশ্বরের

পক্ষপাত-জনিত নহে, অন্যভাব ও অতিপ্রায়-জনিত, তাহা আমার উপরোক্ত কথায়ই প্রকাশ পাইতেছে; অথচ আদিনাথ বাবু দুই বার বলিলেন যে আমি ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব একরূপ স্বীকার করিয়াছি। যেখানে এরূপ সহজ কথায় ভুল হয়, সেখানে আলোচনা অবাধে চলিতে পারে না। আদিনাথ বাবু বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বর সময়ে সময়ে আমাদিগকে দুঃখ দেন। ইহা হইতে যদি কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে আদিনাথ বাবু ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা একরূপ স্বীকার করেন, তবে তিনি কি মনে করিবেন?

আলোচনা না চলিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে আমি দেখিতেছি দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের কতকগুলি মূল বিষয়েই আদিনাথ বাবুর সহিত আমার অনৈক্য রহিয়াছে। আলোচনার আরম্ভে এত দূর ভাবি নাই। মনোবৃত্তির তিন বিভাগ, জ্ঞান ও ভাবের উপর ইচ্ছার নির্ভর, প্রকৃতি ও মানব জীবনে ঐশী শক্তির নিত্য ক্রিয়াশীলতা,—ভাবিয়াছিলাম এই সকল মৌলিক বিষয়ে তাঁহার ও আমার মধ্যে বিশেষ অনৈক্য হইবে না, যাহা কিছু অনৈক্য থাকে তাহাও অতি সহজেই দূর হইবে। ভাবিয়াছিলাম, বিগত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রয়াসে যে শক্তিতত্ত্ব ও ধর্ম্মের অন্যান্য দার্শনিক-তত্ত্ব প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ে অনেকটা ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে,—অন্ততঃ আদিনাথ বাবুর সহিত আমার ও আমার সম-বিশ্বাসীগণের সেরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেখিতেছি তাঁহার সহিত আলোচনা চালাইতে গেলে আমাকে এখন আমার অতি মৌলিক বিশ্বাস সমূহেরও ব্যাখ্যা দিতে হইবে, তাহা না হইলে আলোচনা সন্তোষকর হয় না। এরূপ প্রণালী যে সাময়িক পত্রিকার প্রেরিত স্তম্ভের পক্ষে উপযোগী নহে, ইহা বলা বাহুল্য।

আলোচনা থামিবার তৃতীয় কারণ এই যে আদিনাথ বাবু আমার অতি দরকারি কথারও উত্তর দিতে আদতে প্রয়াসই পান না; এরূপ স্থলে আলোচনা কিরূপে চলিতে পারে? আলোচনা চালাইতে গেলে আমাকে বারবার পূর্ব্ব-কথিত কথার পুনরুক্তি করিতে হয়। পাঠক আমার দ্বিতীয় পত্র (১লা আশ্বিনের) আর আদিনাথ বাবুর শেষ পত্র খানা (১৬ই আশ্বিনের) একত্রে পড়িবেন, পড়িয়া দেখিবেন আদিনাথ বাবু আমার যুক্তির উত্তর দিয়াছেন কি না—উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রয়াসও পাইয়াছেন কি না। তাঁহার শেষ চিঠির অনেক কথার উত্তর যে আমার দ্বিতীয় পত্রেই আছে, তাহা আমি এই দুই চিঠি হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি কথা দ্বারা দেখাইতেছি।

আদিনাথ বাবু—"দর্শন শ্রবণ সম্বন্ধে কি আমার কোন ইচ্ছার আবশ্যক হয় না? আলোক প্রকাশ ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু চক্ষু খোলা বা বন্ধ করাত আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমি যদি চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া রাখি, দর্শন শ্রবণ কখনই সম্পন্ন হয় না।"

আমার উত্তর—"ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা জ্ঞানের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, তাহাতে জ্ঞান আনিতে পারে না, বাহিরের আলোক আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে চক্ষুতে না পড়িলে দেখা অসম্ভব; যাহা দেখি তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আমার জ্ঞানের সমক্ষে আসে।...আমার কাণ যে খোলা থাকে, তাহা আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে; শব্দ যে আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহাও আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে।...ইন্দ্রিয় গুলিকে পরিচালিত করিবার যে আমাদের একটু শক্তি আছে, তাহাও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মৌলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয় গুলিকে না জানিলে পরিচালিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহ আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আমার জ্ঞানের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, ইহাতে আমার ইচ্ছার হাত কিছুই নাই।"

আদিনাথ বাবু—"২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির আত্মায় যাহা নিহিত ছিল, এখন যে আমরা জন্মিতেছি আমাদের আত্মাতেও অবশ্য তাহা নিহিত আছে। সেই সময়ে তাঁহারা যাহা জানিয়াছিলেন এখন যদি আমরা তাঁহা জানি তাহা অবশ্যই আমাদের পক্ষে নূতন ব্যাপার। কিন্তু তাহা কি ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য? কখনই নয়। আমার জানা বা অনুভব করাটা কিছু ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য বা নূতন সৃষ্টি নহে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় আমি নূতন জ্ঞান পাইলাম।"

আমার উত্তর—"এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বিধি ব্যবস্থা লেখাই রহিল, প্রকাশিতই রহিল, তবে আর মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক বুঝিবে কি? গ্রহণ করিবে কি? আর যদি বলেন লিখিত থাকার [আদিনাথ বাবু 'নিহিত' ও 'লিখিত' এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন] অর্থ প্রকাশিত থাকা নহে, জ্ঞাত থাকা নহে, লিখিত থাকিলেও পরে জানিতে হয়, বুঝিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয়, তবে বলি যাহা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না, যাহা আমার জ্ঞানের বাহিরে ছিল, তাহা আমি কখনো ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, জানিতে পারি না; আমার জ্ঞানের বাহিরে যে বস্তু, তাহার উপর আমার ইচ্ছার, আমার চেষ্টার প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং যে দিকেই যান, স্বীকার করিতে হইতেছে যে মানব অন্তরে যে সত্যের প্রকাশ হয়, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের কার্য্য।"

জ্ঞানোদয় সম্বন্ধে মানবের ইচ্ছা-সাপেক্ষতাতে আদিনাথ বাবুর এরূপ অটল বিশ্বাস যে তিনি এই সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য অত্যুক্তি দোষে দোষী হইয়াছেন। এই উক্তিগুলি যে অত্যুক্তি তাহা বোধ হয় তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন। অথবা তাহাই বা কি করিয়া বলিব? কথাগুলি এক আধবার নয়, অনেকবার বলিয়াছেন। কথাগুলি এই;—"বাস্তবিক কোন বিষয় জানা কখনও একের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় না।...কোথাও একের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না।...প্রত্যেক ঘটনাতেই দেখা যাইবে দুই ইচ্ছার মিলন ভিন্ন কোন কাজই হয় না।...মানব ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারে একথা আমি কোথাও বলি নাই। কিন্তু ইচ্ছা না করিলেও জানিবার উপায় নাই ইহাই বলিয়াছি।...তাঁহার

(ঈশ্বরের) সহায়তা ও মানবের ইচ্ছা দুইয়ের মিলন ভিন্ন যে জ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই।" কথাগুলি পড়িয়া অবাক্ হইলাম। জিজ্ঞাসা করি যখন প্রথমে মানবের আত্মজ্ঞান জন্মিল, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কার ইচ্ছা ছিল? যখন প্রথমে চক্ষু ফুটিল, তখন কার ইচ্ছায় ফুটিল, মানবের ইচ্ছা তখন কোথায়? যখন প্রথমে শব্দ শুনিলাম, তখন কার ইচ্ছায় শুনিলাম, তখন আমার কান খুলিবার, কান বন্ধ করিবার ইচ্ছা কোথায় ছিল? স্বপ্নশূন্য গভীর সুষুপ্তি—যাহাতে সমুদায় ব্যক্তিগত জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার বিরাম হয়,—এই সুষুপ্তি হইতে যে জাগ্রত হই—এই জাগরণ কার্য্যে আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষকতা কোথায় থাকে? অথবা এই সকল বিশেষ দৃষ্টান্তেরই বা প্রয়োজন কি? প্রতিনিয়তই ত আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অনাশঙ্কিত ভাবে নূতন নূতন বিষয়, নূতন নূতন সত্য আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। এই সহজ সত্যটী ও কি আবার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক যে ইচ্ছা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ইচ্ছা জ্ঞান-সাপেক্ষ একটা বিষয়? প্রথমে না জানিলে তাহার সম্বন্ধে ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নহে; অগ্রে জ্ঞান, পরে ইচ্ছা। তাহাই যদি হইল, তবে আর জ্ঞান ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইবে কিরূপে? জ্ঞান যখন ইচ্ছার অগ্রবর্ত্তী, তখন ইহা নিশ্চয়ই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। যাহা একবার দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহা পুনরায় দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিতে পারি, অনিচ্ছাও করিতে পারি। যাহা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তাহা স্পষ্ট বা সম্পূর্ণরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি, অনিচ্ছাও করিতে পারি এবং এরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে উপলক্ষ করিয়া (উপলক্ষ মাত্র) ঈশ্বর আমাদের নিকট কথিত বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন, অপ্রকাশিতও রাখিতে পারেন। এরূপ স্থলেও সকল সময় ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, জানি নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ইচ্ছা করা একবারেই অসম্ভব। এরূপ বিষয়ের প্রকাশ, এরূপ সত্যের জ্ঞান, সম্পূর্ণরূপেই মানবের ইচ্ছা নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ। ইহাতে মানবেচ্ছা উপলক্ষরূপেও বর্ত্তমান থাকে না।

আদিনাথ বাবু তাঁহার প্রথম পত্রে তাঁহার মতের একদিকেই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিধান যে প্রথম হইতেই মানবের আত্মা-নিহিত, মানব যে নিজের চেষ্টায় তাহা বুঝে, বিধান-প্রকাশ যে ঈশ্বরের নিত্য নূতন কার্য্য নয়, এই বিষয়ই বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে শিক্ষাদাতা ও সাহায্য দাতারূপে মানবের চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন, এই কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন; ঈশ্বর কিরূপ সাহায্য করেন, শিক্ষা দেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। পরবর্ত্তী আলোচনাতে তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে প্রত্যেক সত্য প্রকাশেই ঈশ্বর মানবের সহায়তা করেন। এই কথাটী প্রথমেই পরিষ্কাররূপে স্বীকার করিলে অনেক তর্ক বিতর্ক বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি এখনো এরূপ কথা বলিতে ছাড়িতেছেন না, যাহাতে বিধান প্রকাশ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়তা বুঝায়। উপরে আদিনাথ বাবুর শেষ পত্র হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয় স্থানটী দেখুন। তিনি বলিতেছেন "সেই সময়ে তাঁহারা যাহা জানিয়াছিলেন এখন যদি আমরা তাহা জানি তাহা অবশ্য আমার পক্ষে নূতন ব্যাপার। কিন্তু তাহা কি ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য? কখনই নয়। আমার জানা বা অনুভব করাটা কিছু ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কার্য্য বা নূতন সৃষ্টি নহে। কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় আমি নূতন জ্ঞান পাইলাম।" প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ায় ঈশ্বরের সহায়তা অর্থাৎ ঈশ্বরের কার্য্য স্বীকার করিয়াও আদিনাথ বাবু আবার এ কি কথা বলিতেছেন? যখন "কোন বিষয় জানা কখনো একের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় না," যখন "দুই ইচ্ছার মিলন ভিন্ন কোন কাজই হয় না," আবার যখন "তাঁহার শিক্ষায় আমি নূতন জ্ঞান পাইলাম," তখন আদিনাথ বাবুর নিজের মতেই "আমার জানা বা অনুভব করাটা" কেবল আমার কাজ নয়, ইহা ঈশ্বরেরও কাজ,—তিনি জানাইলেন, আমি জানিলাম, তিনি অনুভব করাইলেন, আমি অনুভব করিলাম। আমার জানা বা অনুভব করাটা যতদূর নূতন, তাঁহার জানান বা অনুভব করানটাও ততদূর নূতন। আদিনাথ বাবু প্রথম পত্রেও বলিয়াছিলেন, "বাস্তবিক ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নয়, কিন্তু মানবের পক্ষে নূতন অনুভব।...ঈশ্বরের পক্ষে নূতন কিছুই নাই, তিনি নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার বিধানও নিত্য নূতন নয়।" এখন যখন স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে মানবের প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বর মানবকে নিত্য নূতন জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, নিত্য নূতন বিধান প্রেরণ করিতেছেন, তখন, জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়তা-ব্যঞ্জক উপরোক্ত কথাগুলি আর ব্যবহার করেন কেন?

মূল সূত্র ধরিয়া যুক্তিপথ অনুসরণ পূর্ব্বক আমি যথা সাধ্য বিধান-তত্ত্বের মূল কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আদিনাথ বাবুর কর্ত্তব্য আমার প্রদর্শিত মূল-সূত্রে বা যুক্তিতে ভ্রম দেখান। ইহাই সত্য নির্ণয়ের প্রকৃত পথ। আমি এই সোজা পথ ছাড়িয়া আদিনাথ বাবুর অভিপ্রেত বক্র পথ কখনো অবলম্বন করিব না। আদিনাথ বাবুর মতে "জগতে বৈষম্য কেন?" এই প্রশ্নের বিচার না হইলে বিধানবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমি যতদূর জানি বিচারের প্রণালী এরূপ নয়। আমি বলি, আমার প্রদর্শিত যুক্তিতে ভ্রম প্রদর্শন করুন্। যদি ইহাতে ভ্রম না থাকে, তবে আমার ব্যাখ্যাত বিধানবাদ সত্য, বিধান-প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা-সাপেক্ষ, এখন জগতের বৈষম্যের কারণ আমি বুঝাইতে পারি আর নাই পারি। স্থান থাকিলে আমি বৈষম্য সম্বন্ধে অনেক বলিতাম, কিন্তু স্থান নাই। আদিনাথ বাবু বৈষম্যের একমাত্র কারণ বুঝিয়াছেন—মনুষ্যের স্বাধীনতা। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাতে জ্ঞান লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে, মানুষ ইচ্ছা করে না তাই জ্ঞান পায় না, যাহারা ইচ্ছা করে তারা পায়, তাই জ্ঞান সম্বন্ধে এত বৈষম্য। মৌলিক সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ যে সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এবং মৌলিক সাক্ষাৎ জ্ঞানই যে মানবের সমুদায় ইচ্ছা ও চেষ্টার মূল, তাহা আমি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানের বৈষম্য

সম্বন্ধে আমার আর কিছু না বলিলেও চলে। জ্ঞানের বৈষম্যের প্রধান ও মূল কারণ আর যাহা হউক, তাহা মানুষের স্বাধীনতা নহে, ইহা ঠিক। অন্য বৈষম্যের বিষয় আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। মানুষের স্বাধীনতা যে অনেক বৈষম্যের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা অসীম নহে; তাহার স্বাধীনতা চারিদিকেই সীমাবদ্ধ। মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন অনেকাংশে তাহার শারীরিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার অধীন। এই সকল শারীরিক ও প্রাকৃতিক বৈষম্যের কারণ কি? স্বাধীনতা কদাচ ইহাদের কারণ নহে। কেন্দ্র সন্নিহিত স্থান এমন ভয়ানক শীতল কেন? বিষুব রেখা-সন্নিহিত স্থান এমন ভয়ানক উষ্ণ কেন? একদেশ সজল ফলশালী, আর একদেশ শুষ্ক অনুর্ব্বরা কেন? এক দেশের জলবায়ু সুমিষ্ট বলকারক, অপর দেশের জলবায়ু ক্লেশকর ও দুর্ব্বলকারী কেন? একদেশ শান্তিপূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন, আর এক দেশ ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে উৎপীড়িত কেন? এই সমুদায় প্রাকৃতিক বৈষম্যে মানব চরিত্র সহস্র সহস্র প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মানবের স্বাধীনতা সহস্র সহস্র প্রকারে সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঈশ্বরকে আধ্যাত্মিক বৈষম্যের কর্ত্তা বলিলে যদি তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা হয়, তবে তাঁহাকে এই সকল প্রাকৃতিক বৈষম্যের কর্ত্তা বলিলেও কি পক্ষপাতী বলা হয় না? অথচ তিনি যে এই সমুদায়ের কর্ত্তা তাহা আদিনাথ বাবু অস্বীকার করিবেন না। আদিনাথ বাবুর মতে ঈশ্বর প্রথমে সকল মানুষকে সমান করিয়া সৃষ্টি করেন; মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় অসমান হইয়াছে। আদিনাথ বাবু কি কখনো জন্মগত বৈষম্য দেখেন নাই। শিশুদের জীবনেত প্রতিনিয়তই তাহা দেখা যায়। যদি বলেন সে বৈষম্য পিতা মাতার বৈষম্য-জনিত, তবে জিজ্ঞাসা করি এই নিয়মই বা কেন? পিতা মাতার বৈষম্য সন্তানে আরোপ করিয়া ঈশ্বর কেন প্রথম হইতেই সন্তানের স্বাধীন চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করেন? বৈষম্য সর্ব্বত্র, কিন্তু মানবের বৈষম্যের মধ্যে ও গভীর সাম্য আছে। বিশেষত্বের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী সাধারণত্ব আছে, এই সাধারণত্বই সমুদায় অধিকারবাদ ও সাম্যবাদের ভিত্তি। যাহা হউক বৈষম্যের একমাত্র ব্যাখ্যা মানবের স্বাধীনতা বা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব নহে। প্রকৃত ও সন্তোষকর ব্যাখ্যা কি তাহার আলোচনা স্বতন্ত্র চলিতে পারে। এসম্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার স্থান নাই।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মসমূহ নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।*

উদ্দেশ্য।

১। এক মাত্র সত্য স্বরূপ নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধনদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, ব্রাহ্মমণ্ডলীর ও জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও অপরাপর উন্নতি ও হিতসাধনে সহায়তা করা এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য সকল সম্পাদন করা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

২। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে, এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সভ্য হইবার যোগ্যতা।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের উল্লিখিত মূল সত্যে বিশ্বাস এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি থাকা উচিত এবং অষ্টাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক হওয়া আবশ্যক।

(খ) চরিত্রের উন্নতি সাধনে ও নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে যত্নশাল হওয়া আবশ্যক।

(গ) পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে গার্হস্থ্য ও অন্যান্য সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) অর্থদান ও অন্যান্য উপায় দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

(ঙ) তিন বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত ⅔ সভ্য অনুমোদন করিলে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী।

৪। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কোন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধানান্তর তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (form) স্বাক্ষর করিবেন এবং সুবিধা হইলে তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে বা অন্য কোন স্থানীয় উপাসনালয়ে নিয়মিত বা বিশেষ উপাসনার দিনে সর্ব্ব সমক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

সহযোগী (Associate)।

৫। যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস আছে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে এবং

* এই সংশোধিত নিয়মাবলী অধ্যক্ষ সভার ১৮৮৯ সালের ২য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে শীঘ্রই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিচারের জন্য উপস্থিত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অবগতিরজন্য প্রস্তাবিত নিয়ম সমূহ প্রকাশিত হইল।

যাঁহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থ দান এবং অন্য প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, যাঁহাদের বয়স অন্যূন অষ্টাদশ বৎসর, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মনে করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা অধ্যক্ষ সভা সহযোগী (associate) রূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য।

৬। ৪র্থ নিয়ম অনুসরণ না করিয়াও জ্ঞান ধর্ম্ম ও চরিত্র বিষয়ে উন্নত ও খ্যাতাপন্ন ব্রাহ্মকে সম্মানিত , সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে। সম্মানিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

দাতব্য দেয় হইবার সময়।

৭। সভ্যদিগের মাসিক দান মাসের প্রথমে এবং বার্ষিক দান বর্ষের প্রথমে দেয় হইবে। মাঘ মাসে বর্ষারম্ভ গণনা করা হইবে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৮। যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মোক্ত কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণ বশতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিম্বা তাঁহার ক্রটি প্রমাণিত হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতিশ্রুত দাতব্যের যদি কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দুই বৎসরের অধিক কাল অনাদায় থাকে, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ⅔ অংশের মতানুসারে যেরূপ উচিত বিবেচিত হইবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন (অর্থাৎ এরূপ স্থলে অবস্থা বিশেষে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে, বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিধান করিতে পারিবেন) অথবা একেবারে সভ্য পদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচার মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তিনি সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাহার অভিপ্রায় জানাইবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের ⅔ অংশ মত দ্বারা উপযুক্ত কারণে কোন সহযোগীকে সাময়িক রূপে কিম্বা একেবারে উক্তপদ হইতে চ্যুত করিতে পারিবেন। কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনও রূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

এই নিয়মোক্ত কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কি অধ্যক্ষ সভা স্বয়ং কিম্বা কোন কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

সভ্য শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশের নিয়ম।

৯। যাঁহার নাম কোন কারণবশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলেও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে তিনি পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে সভ্য পদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

সভ্যদের অধিকার।

১০। সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণকে মনোনীত, কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কোন বিষয় অধ্যক্ষ-সভার কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় আলোচ্য বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন।

সহযোগীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন বিষয় অধ্যক্ষ সভা বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

১১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হইবে এবং আবশ্যকানুরূপ পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে। কর্ম্মচারিগণ এবং ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষ সভার ৫০ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদী অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় বিচারার্থ উত্থাপিত হইতে পারিবে।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন।

১২। কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

এতদ্ভিন্ন অন্যূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহাহইলে প্রার্থনাকারিগণ কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন ⅔ সভ্য সভাপতিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি এরূপ স্থলে নিজ নামে সভা আহ্বান করিবেন। যদি সভাপতিও অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৩০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু সম্পাদক বা সভাপতি যে কারণে সভা আহ্বানে বিরত হইবেন, তদ্বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আহ্বান কারীদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং সেই মন্তব্য অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিচারাধীন হইয়া তৎসম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল মত প্রকাশ হইতে পারিবে।

অধিবেশনের বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

১৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১২ ধারার নিয়মানুসারে সভাপতি কি সভ্যগণ প্রকাশ্যপত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না।

অনুপস্থিত সভ্যগণের অধিকার।

১৪। কোন সভ্য পীড়া কিম্বা মফঃস্বলে অবস্থিতির জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে, সম্পাদকের নিকট পত্রদ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণকালে এই সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।

কর্ম্মচারী।

১৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারীগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর, ন্যূনকল্পে ৫ বৎসরকাল তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মোল্লিখিত সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না। তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ৩/৪ দ্বারা অনুমোদিত হইলে সহকারী সম্পাদক সম্বন্ধে উপরোক্ত ৫ বৎসরের নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ম্মচারিদিগের অর্থানুকুল্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

নামকরণ—জগন্নাথপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সরকারের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ গত ১৯এ আশ্বিন মানিকদহ গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম শ্রীমান্ অরবিন্দ সরকার রাখা হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে এই শুভ কার্য্য উপলক্ষে রজনী বাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ৩৲ তিন টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই আশ্বিন রবিবার শিলংস্থ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সেনের দ্বিতীয় পুত্র ও দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম সরোজকুমার এবং বালিকার নাম ইন্দুনিভা রাখা হইয়াছে।

বিবাহ—বিগত ২৩এ আশ্বিন মঙ্গলবার কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী সেনের সহিত ঢাকাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন রায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ২৩ ও পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর। ঢাকাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং বাবু সীতানাথ দত্ত ও বাবু দুর্গানাথ রায় পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে এই বিবাহ উপলক্ষে মধুসূদন বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ১০ দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই আশ্বিন সোমবার কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত খুলনাবাসী শ্রীমান্ রমানাথ রাহার শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে অভয় বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ৫৲ টাকা এবং দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

এই দুইটী বিবাহই ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—বিগত ২১এ আশ্বিন রবিবার লক্ষ্ণৌস্থ শ্রীযুক্ত লছমন্ প্রসাদের পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

পত্র প্রেরকগণের প্রতি

শ্রীঈশানচন্দ্র দেব—মুগুরি—পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ অথচ তাঁহার সকল কথা এই পত্রে শেষ হয় নাই। এজন্য পত্র প্রকাশিত হইল না। সংক্ষেপে সমস্ত কথা লিখিত হইলে ছাপান যাইতে পারে।

শ্রীহরকালী সেন—বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় হরকালী বাবুর পত্রের উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, এপত্র সেই বিষয়েই লিখিত হইয়াছে। এবার স্থানাভাবে পত্র প্রকাশিত হইল না। ভবিষ্যতে ছাপা হইবে কিনা আমরা তাহাও নিশ্চয় রূপে জানাইতে পারিলাম না।

জনৈক ব্রাহ্ম—বোলপুর শান্তিনিকেতন। পত্রের লিখিত বিষয় প্রকাশ যোগ্য হইলেও লেখকের নাম না থাকায় পত্র প্রকাশিত হইল না।

১৬ই আষাঢ়ের প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখক—গত সংখ্যায় বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন। এপত্র সে বিষয়েই লিখিত হইয়াছে। এবার স্থানাভাবে পত্র প্রকাশিত হইল না। আগামীতে তাঁহার পত্রের কোন কোন অংশ প্রকাশিত হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভা গঠন সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মাবলীর ২য় নিয়মানুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২১এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে তাঁহাদের নাম, ধাম, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৮ই অক্টোবর ১৮৮৯

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফস্বলে ৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

পরজ সংযুক্ত। যৎ।

প্রভু তব চরণে,
এই প্রার্থনা জানাই।
সাগরে নদীর মত,
আমি যেন মিশে যাই।
হয়ে যেন মাখামাখি
চরণে মিশায়ে থাকি
সংসার তন্ময় দেখি
দেখে এ দুঃখ ঘুচাই।
প্রেমসিন্ধু টেনে নাও
তোমার তরঙ্গে মিশায়ে দাও
আমার আমিত্ব ঘুচাও
তোমার হয়ে প্রাণ জুড়াই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শাস্ত্রচর্চ্চা।—শাস্ত্র, গুরু, তীর্থ, মন্দির ও সত্য সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করি না। সত্য আমাদের শাস্ত্র, ঈশ্বর আমাদের গুরু, সুনির্ম্মল চিত্ত আমাদের তীর্থ ও বিশাল বিশ্ব আমাদের মন্দির। সত্য আহরণ সম্বন্ধে সুতরাং আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা আমাদের অনেক অধিক। কেন না তাহাদের মতে শাস্ত্র ও সত্য তাহাদের সম্প্রদায়-নিবদ্ধ। এত গুরু দায়িত্ব সত্তে সত্য আহরণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ দোষের কথা। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের প্রচুর আলোচনা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সত্য সকল আমরা কিরূপে শিক্ষা করিব, আর তাহা শিক্ষা না করিলে বিবেকের নিকট কি বলিয়া জবাব দিব। খৃষ্টধর্ম্ম যাজকেরা এ বিষয়ে আমাদিগের এক প্রকার দৃষ্টান্ত স্থল। কত ভাষাই তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন। মেসেঞ্জার বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে পৃথিবীনিবাসীগণের পঞ্চমাংশের একাংশ লোক মাত্র বাইবেল পড়িতে পারিত। এখন দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের ভাষায় উক্ত পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জর্ম্মণি ও ফ্রান্সে এখন প্রচুর পরিমাণে প্রাচ্য শাস্ত্র চর্চ্চা হইতেছে। আর আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্র অনুশীলন করা দূরে থাকুক আমাদের আপনাদের দেশের শাস্ত্রও অনুশীলন করিতেছি না। হিন্দু সমাজে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক পরিমাণে শাস্ত্র চর্চ্চা হইতেছে, কিন্তু সে চর্চ্চায় অনেকস্থলে শাস্ত্র সকলের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করিয়া সম্প্রদায়ের অনুরোধে গৌণার্থ প্রতিপাদন করা হইতেছে। যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার হয়, প্রচারকগণের সে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে অধিকার না থাকিলে বিশেষ ফল লাভ হইতে দেখা যায় না। একথা আমাদের স্মরণ থাকা উচিত। যাহার যতটুকু সাধ্য তিনি ততটুকু পরিমাণে এবিষয়ে যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সকলের চেষ্টা একত্রিত করিয়া অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করা যাইতে পারে।

অধ্যাত্মরাজ্যে আলোক-বিজ্ঞান।—স্থান পরিচ্ছিন্ন বাহ্য জগত ও কাল পরিচ্ছিন্ন অন্তর্জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জড় জগতে আমরা তিন প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই; এক প্রকার বস্তুর মধ্য দিয়া আদবেই আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। আর এক প্রকার বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারে না; তৃতীয় প্রকার বস্তু এরূপ পরিষ্কার যে তাহার মধ্য দিয়া আলোক রেখা অব্যাহত ভাবে গমন করিতে পারে। অস্বচ্ছ, ঈষৎস্বচ্ছ ও স্বচ্ছ এই তিন প্রকার বস্তুর অনুরূপ তিন শ্রেণীর আত্মা অধ্যাত্মরাজ্যে দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক এরূপ অস্বচ্ছ যে সাধ্য কি স্বর্গের বা ঈশ্বরের বা সাধু জনের আলোক তাহাদের ভিতর দিয়া যায়, তাহারা মনে করে তাহাদের আপনার আলোকই যথেষ্ট। যেখানে এরূপ ধারণা সেখানে কোমল ঐশ আলোক কিরূপে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্যে অহংভাব এমন উজ্জ্বল যে তাহারা স্বর্গীয় আলোক লইতে মস্তক হেট করিতে সম্মত হয় না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা একেবারে অস্বচ্ছ নহে অথচ স্বচ্ছও নহে। ঈশ্বরের আলোক তাহাদের ভিতর দিয়া কতক পরিমাণে যায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যায় না। তাহা-

দের চিত্ত হইতে একেবারে অহঙ্কার যায় নাই। তবে অহঙ্কার দূর করিবার চেষ্টা তাহারা মাঝে মাঝে করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহারা তাই ব্রহ্মের শক্তিকে, মহিমান্বিত করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক একবারে অহমিকা শূন্য। সকল বিষয়েই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও আপনাদের দাসত্ব অনুভব করে; স্বর্গের আলোক যখন আসে তখন তাহা মাথায় করিয়া লয়। তাঁহাদের আত্মা স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল দর্পণ তুল্য। ঈশ্বরের পুণ্য-জ্যোতি তাঁহাদের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। এই সকল সদাত্মারূপ পবিত্র অধ্যাত্ম-দর্পণে যখন আমরা আপনাদিগের মুখ দেখি তখন অবাক হই। সাধুদিগের ভক্তি ব্যাকুলতা বিনয় ও বৈরাগ্যের সহিত যখন আপনাদের জীবন তুলনা করি, তখন লজ্জায় অধোবদন হই।

সাধন-আসন—এদেশে ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষে শব-সাধনার রীতি প্রচলিত আছে। সেই সম্প্রদায়ের সাধকগণ মৃত শরীরের উপর বসিয়া আপন আপন ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। মৃত শরীরকে সাধনার আসন করিলে সিদ্ধি বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ হয় কি না আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু শব-সাধনার ভাব হইতে সাধকগণ বিশেষ শিক্ষা করিতে পারেন। সাধকের সাধনপথের প্রধান অন্তরায় বহির্বিষয়ের আকর্ষণ। মনের প্রতি বাহ্যিক আসক্তি যে পরিমাণে বলবান হয় সেই পরিমাণে সাধকের সাধনার বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সাধককে সফলমনোরথ হইতে হইলে, তাহার পক্ষে সকল প্রকার আকর্ষণ ও আসক্তির উপর জয় লাভ করা আবশ্যক। মনশ্চাঞ্চল্যই সাধকের ব্রহ্মযোগের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। এ জন্য সাধক সর্ব্বদাই এমন স্থল সাধনের জন্য নির্ণয় করেন যেখানে মনের বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। সাধক যদি তাহা করিতে পারেন তাহা হইলে মন স্থিরের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। শব লোকের মনকে আকর্ষণ না করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়। যাহা থাকিলে লোকের মন আকৃষ্ট হইতে পারে শবে তাহার কিছুই নাই। তাহার যে শোভায় এক সময় অন্যে আকৃষ্ট হইত এবং নিকটে যাইয়া কত আদর করিত? এখন তাহার কিছুই নাই। সুতরাং তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেই যেন লোকে বাঁচিয়া যায়। তেমনি যদি পৃথিবী মানবের পক্ষে শবস্থানীয় হয় অর্থাৎ ইহার যত কিছু আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা যদি সাধককে আকৃষ্ট করিতে অসমর্থ হয়—পৃথিবীর ধন, মান, সম্পদ এ সকল যদি চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ না হয়—পৃথিবীর কোলাহল, যশস্পৃহা এবং শত প্রকার আমোদজনক ক্রিয়া যদি তাহাকে নিকটে না আনিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই অর্থাৎ পৃথিবীকে শবে পরিণত করিতে পারিলেই মানব আপন মনোরথ সিদ্ধ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারে।

আমরা যে ব্রহ্মযোগ অনুভব করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের মন সর্ব্বদাই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। একটু কাজের ঝঞ্চাট নিবৃত্ত করিয়া উপাসনার জন্য বসিলাম, অমনি জনকোলাহল আসিয়া মনকে সেইদিকে টানিয়া লইল। একটু স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে পৃথিবীর নানা সুখস্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ সুখ-আশা আসিয়া প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মোহিনী শক্তির অভাব নাই। যিনি এ সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্ম-যোগেযোগী হওয়ার পক্ষে আর কোন বাধাই থাকে না। কারণ ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতা আছে তাহা নয়। আমরা সর্ব্বদা তাঁহারই আশ্রিত এবং তাঁহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগে নিবদ্ধ রহিয়াছি। তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। স্থানের ব্যবধান ত তাঁহার সহিত ঘটেই না। কিন্তু আমাদের প্রাণ তাঁহার প্রতি অনুরাগী না হইয়া নানাবিধ বিষয়ে আসক্ত হয়—নানা স্থানে প্রাণ বাঁধা থাকে বলিয়াই তাঁহার সহিত আমাদের এই যে নিত্য যোগ তাহাও অনুভব করিতে পারি না। পরমাত্মীয়রূপে যিনি আমাদের নিত্য আশ্রয় দাতা, তাঁহাকেও দূরে মনে হয় এবং তাঁহাকে দূরে ভাবিয়াই আমাদের যত বিপদ উপস্থিত হয়। বহির্বিষয়ে আসক্তিরূপ অন্তরায় অন্তর্হিত হইলেই আমরা তাঁহাকে প্রাণে অনুভব করিতে পারি। সুতরাং আমাদের সাধনস্থল পৃথিবী যদি আমাদের নিকট শবে পরিণত হয় অর্থাৎ যেরূপ হইলে মন আর ইহাতে আকৃষ্ট হইবে না, তাহা হইলেই সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে আর কোন বিঘ্ন থাকে না। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হইবে? পৃথিবীর যে শোভা দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়; ইহার যে আকর্ষণীতে জগৎ মন্ত্র মুগ্ধ সর্পের ন্যায় পশ্চাৎ অনুসরণ করে, তাহা কি থাকিবে না? এখানকার যশস্পৃহা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি অনুরাগ অন্যপ্রকার শত আকর্ষণ কি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে? ইহা ত যাইবার নয়। এই সকল শোভা সম্পদ সবই থাকিবে, অথচ এ সকলে প্রাণকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। কেমন করিয়া তাহা হইবে? কিন্তু আমরা দেখিয়াছি প্রেমিক যিনি তাঁহার ব্যবহারে দেখিয়াছি এ সকলই সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তির আশা একদিকে পড়িয়া থাকে, আর প্রেমিক অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রেমাস্পদের নিকট বসিয়া দিন যাপন করেন। তাঁহার প্রতি প্রকৃতির শাসনও যেন পরাস্ত হইয়া যায়। প্রেমিক ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া পৃথিবীর আর সকল প্রয়োজন বর্ত্তমান সত্ত্বেও প্রেমাস্পদের নিকটেই বসিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। সুতরাং প্রেমই মানবকে পৃথিবীর সকল আকর্ষণের হাত অতিক্রম করিতে সমর্থ করে। প্রেমের শক্তির নিকট আর কোন শক্তিই কার্য্যকর নহে। এখন আমরা কি প্রেমহীন আছি? না। আমাদের প্রেম প্রচুর পরিমাণেই আছে। কিন্তু তাহা উপযুক্ত পাত্রে নাই। আমরা অপাত্রে প্রেম দান করি অথবা যেখানে যে পরিমাণ প্রেম প্রদান করা প্রয়োজন সেখানে সে পরিমাণে প্রেম প্রদান না করিয়া তাহার অন্যথাচরণ করি। প্রকৃত প্রেমাস্পদ, পরম সুন্দর—নিত্যসহায় এবং নিত্যসহচর যিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া আমরা দুই দিনের যাহা—যাহা আমাদিগকে অটল আশ্রয়হইতে বিচ্যুত করিয়া অস্থায়ী বিষয়ের প্রতি নির্ভর করিতে প্রবৃত্তি দেয় সেই সকল বিষয়ের প্রতিই অনুরাগী হই। তাহার পশ্চাতেই ধাবিত হই। তাই আমরা ব্রহ্ম সহবাসে বাস করিয়াও—তাঁহার অব্যবহিত আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহাকে দূরে ভাবিতেছি।

কোথায় ব্রহ্ম কোথায় ব্রহ্ম বলিয়া হাহাকার করিতেছি। সুতরাং আমাদিগকে অনুরাগী হইতে হইবে। ব্রহ্মে অনুরাগ প্রবল করিতে হইবে এবং বহির্বিষয়ের প্রতি এখন যে ষোল আনা আসক্তি রহিয়াছে তাহা হ্রাস করিতে হইবে। লোকে যেরূপ সংসর্গে অধিক সময় যাপন করে তাহাতেই অধিকতররূপে অনুরাগী হয়। সুতরাং ব্রহ্ম সংসর্গ যাহাতে দিনের মধ্যে অধিক সময় হয়, যাহাতে সেই প্রসঙ্গ অধিক পরিমাণে হয় তাহাই করিতে হইবে। তাঁহার পরিচয় পাইলে এ সকল বন্ধন আর বেশী সময় থাকিতে পারে না। তবে সে পরিচয় লাভের জন্য আমরা ব্যস্ত হই। আমরা যদি একবার ব্রহ্মযোগে যোগী হইতে পারি তাহা হইলে পৃথিবীর শোভা এখন যে ভাবে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া আছে তাহা আর থাকিবে না। এই শোভা সম্পদ তাঁহার প্রদত্ত সামগ্রীরূপে তাঁহার দিকে যাইবার সাহায্য করিবে। আমাদের চক্ষু পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহার মধ্যে তাঁহারই সৌন্দর্য্যের আভা দেখিতে পাইবে। অতএব কিছুকালের জন্য ইহার বাহ্যিক বিকৃত শোভা অন্তর্হিত হউক। প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আধারের সহিত যোগসাধন পক্ষে এখন যেভাবে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া আছে তাহা বিলুপ্ত হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঐশী শক্তি।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

কে না স্বীকার করিবে যে সকলের শারীরিক শক্তি সমান নহে? অথচ এরূপ কেহ মনে করেন না যে চেষ্টা করিলে সকলেই সমান বলবান্ হইতে পারে। কাহারও কাহারও শরীর স্বভাবতঃই এরূপ বলিষ্ঠ যে অপরে সহস্র ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়াও সেরূপ বলিষ্ঠ হইতে পারে না। এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক। কারণ, বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন কারণের বর্ত্তমানতা প্রযুক্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিভিন্নতা হইয়াছে। একজন হয় ত অনায়াসে দুই মণ ভার তুলিতে পারে, আর এক জনের এক মণ ভার তুলিতে কষ্ট বোধ হয়—এস্থলে কেবল চেষ্টার তারতম্য বলিব কিরূপে? শক্তির তারতম্যও স্বীকার করিতে হইবে। মানসিক শক্তি সম্বন্ধেও যে এইরূপ বিভিন্নতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ পনর ষোল বৎসর বয়সে সহজে এমন অনেক বিষয় বুঝিতে পারে, যাহা তাহাদের অপেক্ষা অধিকবয়স্ক লোকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ভালরূপে বুঝিতে পারে না। যাহার স্বাভাবিক শক্তি আছে সে বাল্যকালেই এমন ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে পারে যে অনেক বর্ষীয়ান্ পণ্ডিতের লেখনী হইতেও সেরূপ কবিতা বাহির হওয়া দুর্ঘট। জলপূর্ণ পাত্রে উত্তাপ দিলে তাহার জল কি ভাবে বাষ্প হইয়া বহির্গত হয়, তাহা ত সকলেই দেখিয়াছেন; কিন্তু জেম্‌স্ ওয়াটের পূর্ব্বে কয় জন লোক তাহা দেখিয়া জলীয় বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তির মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়া ছিলেন? এই জেম্‌স্ ওয়াট সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইনি ছয়বৎসর বয়সে একটী জ্যামিতির সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে স্বাভাবিক শক্তি বা প্রতিভা। কেহ চেষ্টা করিয়া ইহা লাভ করিতে পারে না। জন্মগত, অবস্থাগত ও শিক্ষাগত নানা কারণে বিভিন্ন বিষয়িণী প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে প্রতিভা আছে সে যেরূপ অল্প সময়ে ও অল্প চেষ্টায় তদ্বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ক তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে, অপরে অনেক দিন ধরিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও সেরূপ পারে না। ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেই ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয় না। তাহার কারণ কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে যেমন কেহ কেহ বিশেষ বলবত্তার পরিচয় দেন, মানসিক শক্তি সম্বন্ধে যেমন কাহারও কাহারও বিশেষ প্রতিভা দৃষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কাহাকেও কাহাকেও বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐশ্বরিক ভাব সকলের বীজ প্রত্যেকের হৃদয়েই নিহিত আছে ইহা সত্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনে ঐ সকল বীজকে যত সহজে ও শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, অপরের জীবনে সেরূপ দেখা যায় না। ইহার কারণ কেবল চেষ্টার তারতম্য নহে; এস্থলে শক্তির তারতম্যও স্বীকার করিতে হইবে। সকল প্রকার সত্য, ভাব ও আদর্শ সকলে সমানভাবে ও সমান চেষ্টায় বুঝিতে ও ধরিতে পারে না। জন্ম, অবস্থা ও শিক্ষাগত নানাপ্রকার প্রভেদনিবন্ধন লোকের আধ্যাত্মিক ধারণাশক্তির প্রভেদ হইয়া থাকে। একটী সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক;—ব্রাহ্মমাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন ও ইহার সত্য সকলের বীজ সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ভারতের নানাস্থানে এবং ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশেও প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে কথা এই যে সকল নর নারী ঐ সকল সত্যের বিষয় শ্রবণ করিয়াও উহা গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই কি ইহা বলা যায় যে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া উহা গ্রহণ করিতেছেন না? উক্ত নর নারীগণের সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে যে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সত্যের প্রতি অনুরাগ নাই? ইহা বলিলে আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অন্যায় কথা বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভক্তিমান, বিশ্বাসী, সরল ও সাধুপ্রকৃতির লোক আছেন। তাঁহারা সকলেই ইচ্ছা করিয়া অসত্যের অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা যিনি বলিতে চান বলুন, আমরা কিন্তু এরূপ কথা বলা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে ঐ উক্তি সত্য হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসকল প্রকৃতভাবে বুঝিতে ও ধরিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের হৃদয় মন আজিও তাহার জন্য ঠিক্ প্রস্তুত হয় নাই। কোনও বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ না করা এবং বুদ্ধির দোষে বা অন্য কোন কারণে তাহা বুঝিতে না পারা এ দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাপার। প্রথমটী কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, দ্বিতীয়টীর সঙ্গে সরল-

তার কোনও বিরোধ নাই। সুতরাং হয় বলিতে হইবে যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়াও তাহা গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহারা সকলেই কপট, নতুবা বলিতে হইবে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহার সত্য সকল প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না। ইহার মধ্যে কোন্ মীমাংসা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

আসল কথা এই যে, উপযুক্ত শক্তি না থাকিলে, হৃদয় উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরিষ্কৃত না হইলে আধ্যাত্মিক সত্য সকল ভালরূপে ধরা যায় না। যাহার দৃষ্টি-শক্তি অবিকৃত আছে সে চক্ষু খুলিলেই সূর্য্যালোক দেখিতে পায় বটে, কিন্তু যাহার চক্ষু হীনজ্যোতি ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সে ইচ্ছা করিলেও ভাল দেখিতে পায় না। সেইরূপ যাহার আধ্যাত্মিক চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই, অথবা কোনও কারণে যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে সে চেষ্টা করিয়া আধ্যাত্মিক সত্য দেখিবে কিরূপে? এরূপ অবস্থায় যদি কেহ উচ্চ সত্য, ভাব বা আদর্শ ধরিতে না পারে তবে সে ইচ্ছা করিয়া তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইতেছে না এরূপ কথা বলা যায় না। তাহাকে সহজ সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতে হইবে। সে ইচ্ছা করিলেও উচ্চ সত্য দেখিতে পাইবে না। এস্থলে বয়স বা সভ্যতা প্রভৃতি ধরিয়া হিসাব করিলে চলিবে না। বয়সের হিসাবে শারীরিক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধেই যখন ঠিক্ সমতা দেখা যায় না, তখন মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ত দূরের কথা। দশটী ৪, মাসের শিশুর মধ্যে একটীকে হাঁটিতে দেখিলে যিনি ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিতে পারেন, তিনি দশটী শিশুর মধ্যে কাহাকেও দশ বা এগার মাসে, কাহাকেও পনর মাসে, কাহাকেও দুই বৎসরে এবং কাহাকেও বা আড়াই বৎসরে হাঁটিতে দেখিয়াও কি ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিতে পারেন? অথচ শিশুদিগের হাঁটিবার বয়স সম্বন্ধে এইরূপ ইতর বিশেষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে কি কেহ বলিতে চাহেন যে ইচ্ছা বা চেষ্টার তারতম্য নিবন্ধন এই বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে? ইহা বলিলে নিতান্ত অনভিজ্ঞের মত কথা বলা হয়। সেইরূপ মানসিক শক্তি সম্বন্ধে দেখা যায় যে দশ বৎসর বয়সে কেহ প্রবীণের ন্যায় জ্ঞানবান্ না হইলেও, বার কি চৌদ্দ বৎসরের অন্য বালক অপেক্ষা জ্ঞানবান্ হইতে পারে। কেহ বা তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কেহ বা ষোল সতর বা তদধিক বয়সেও তাহা পারিতেছে না। যাহারা পারিতেছে না, তাহারা সকলেই যে চেষ্টার অভাবে পারিতেছে না তাহা নহে, অনেকে বুদ্ধির প্রখরতার অভাবেও পারিতেছে না। যাঁহারা শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা স্বচক্ষে প্রতিদিন ইহার প্রমাণ দেখিতে পান। এরূপ স্থলে ঈশ্বরকে ত পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে? আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধেও সেইরূপ বয়সের কোনও সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ধ্রুব বা প্রহ্লাদের মত লোক বর্ষীয়ান্দের মধ্যে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? যদি বলেন, ধ্রুব প্রহ্লাদ কবিকল্পনাপ্রসূত, তবে আমরা বলিব খৃষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনে বাল্যকাল হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ স্ফুরণ হইয়াছিল, সাধারণতঃ কয়জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনে তাহা দেখা যায়? আর এই বিভিন্নতা কি কেবল চেষ্টা বা ইচ্ছার তারতম্য হইতেই উৎপন্ন? "এক সময়ে এক দেশে একই প্রকার সভ্যতার মধ্যে জন্মিয়া" কেহ কেহ "সমধিক জ্ঞানী" হইতেছেন এবং অপর অনেকে ঠিক্ সেইরূপ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের সমান জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে না, ইহা ত প্রত্যক্ষ ঘটনা। পাছে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ পড়ে এই ভয়ে কি একথা অস্বীকার করিতে হইবে? আর তাহাই বা পড়িবে কেন? এইরূপ শক্তির বিভিন্নতা ত স্বাভাবিক। বিধাতার এক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেই বিভিন্ন অবস্থা ও কারণ পরম্পরার সমবায়ে এই বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। এই বিভিন্নতা, এই বিচিত্রতাই জগতের নিয়ম। চেষ্টা ভিন্ন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না ইহা যেমন সত্য, আবার শক্তি ভিন্ন চেষ্টা চলিতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। চেষ্টা ব্যতীত শক্তির স্ফুরণ হয় না, আবার শক্তি ব্যতীত চেষ্টারও স্ফুরণ হয় না। যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে তাহার জন্য সাধ (desire) হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা (will) হইতে পারে না। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। শক্তি থাকিলে ত তাহার স্ফুরণের জন্য চেষ্টা হইবে? অল্পশক্তি থাকিলে অল্প চেষ্টা হইবে, অধিক শক্তি থাকিলে অধিক চেষ্টা হইবে। যেস্থলে শক্তির বিভিন্নতা আছে সেস্থলে সমান চেষ্টায় কখনই সমান ফল উৎপাদিত হইবে না।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। যে সকল জাতি আজিও অসভ্যাবস্থায় আছে, তাহারা যে কেবল আপনাদের দোষে, ইচ্ছার অভাবে, চেষ্টার অভাবে সুসভ্য জাতিদিগের ন্যায় উন্নত হয় নাই তাহা নহে। জাতীয় প্রকৃতি ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্য, প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, শারীরিক সামর্থ্য বা দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কত কারণে যে জাতিগত উন্নতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে তাহা কে বলিতে পারে? এবং এই বিভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে বলিলেই যে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হইল তাহারই বা অর্থ কি? এরূপ করিয়া বিচার করিতে হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রাকৃতিক বিভিন্নতা বিধাতার পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। তিনি কেন পৃথিবীর সকল স্থানের জলবায়ু ও শীতোষ্ণতা সমান করেন নাই? তিনি কেন কোনও দেশকে সমতল কোনও দেশকে পর্ব্বতময় করিয়াছেন? তিনি কেন কোনও দেশকে সমুদ্রের নিকটে ও কোনও স্থানকে সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত করিয়াছেন? তিনি কেন কোনও স্থানকে উর্ব্বর কোনও স্থানকে মরুময় করিয়াছেন? তিনি কোনও স্থান দিয়া নদী প্রবাহিত করিয়াছেন কোনও স্থান দিয়া তাহা করেন নাই কেন? ইত্যাকার কারণের জন্যও ত বিধাতাকে পক্ষপাতী বলা যায়? কেন না, এই সকল কারণে যে জাতিগত অবস্থা ও প্রকৃতির প্রভূত পরিমাণে বিভিন্নতা হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন নির্ব্বোধ কে আছে, যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানের (physical features) বিভিন্নতার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে পক্ষপাতী

বলিতে প্রস্তুত? আসল কথা এই, পূর্ব্বোক্ত মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিভিন্নতা সকল সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে বলিলেই যে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হইল, তাহার কোনও অর্থ নাই। আর ঈশ্বরের অনন্তভাব ও আমাদের লক্ষ্যের অনন্তত্বের তুলনায় আমরা এই পৃথিবীতে যে কিছু আধ্যাত্মিক বিভিন্নতা দেখিতে পাই তাহা এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা উচিত নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমরা চেষ্টার আবশ্যকতা একেবারেই স্বীকার করি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে চেষ্টা ভিন্ন শক্তির স্ফুরণ হয় না। সমান শক্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি একজন চেষ্টা করে ও আর একজন নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল চেষ্টার তারতম্যই যে সকল প্রকার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিভিন্নতার মূল তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যেমন চেষ্টা ব্যতীত শক্তি নিষ্ফল হয়, সেইরূপ শক্তি ব্যতীত চেষ্টাও নিষ্ফল হয়। শক্তির মৌলিক (original) বিভিন্নতা স্বাভাবিক কারণ সমুদ্ভূত; কিন্তু শক্তির উপার্জ্জিত (acquired) বিভিন্নতা চেষ্টা সাপেক্ষ। এই মৌলিক বিভিন্নতা স্বীকার করিলেই যে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হইল এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। এই মৌলিক বিভিন্নতার বর্ত্তমানতা মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং আমরা নিত্য ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি। পাছে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয় এই ভয়ে যে প্রত্যক্ষ ঘটনা অস্বীকার করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। এই বিভিন্নতাকে যিনি ঈশ্বরের অপক্ষপাতিত্বের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ। দৃষ্টি প্রসারিত করুন, জগতের বিস্তীর্ণ কার্য্যকারণ পরম্পরার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ঈশ্বরের অনন্তভাব ও জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করুন— কোথায় বিভিন্নতা, কোথায় অসাম্য, কোথায় ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব—সকলই অন্তর্হিত হইয়া, আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে চারিদিক্ আলোকিত হইবে!

বিশেষ বিধান সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল আপত্তি আছে আমরা ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। স্থানাভাবে এবার এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মসমূহ নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কর্ম্মচারিদিগের কর্ত্তব্য।

সভাপতি।

১৬। সভাপতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, অধ্যক্ষ সভার এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সকল অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা সভাপতির বিরুদ্ধে কোন বিষয় আলোচনা করা সভার উদ্দেশ্য হইলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সভাপতি সাধারণভাবে অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

সম্পাদক।

১৭। সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ পত্র ও পুস্তকাদি, সভ্যগণের তালিকা ও দাতব্য ইত্যাদির বিবরণ রক্ষা করিবেন; সমাজের প্রাপ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন;

সমাজের নিয়মিত নির্দ্ধারিত ব্যয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আদেশানুযায়ী অপর ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং সমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সংসাধন পক্ষে সবিশেষ যত্নবান থাকিবেন। এবং আয় ব্যয়ের রীতিমত হিসাব রাখিবেন। সম্পাদক আবশ্যক স্থলে পত্রাদি লিখিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষসভা বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় সমুদয় দায়িত্ব তাঁহার উপরে থাকিবে।

সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন!

সহকারী সম্পাদক।

১৮। সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের অভিপ্রায় মতে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১৯। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভা ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভারও সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ধনাধ্যক্ষ।

২০। সমাজের সংগৃহীত অর্থ ধনাধ্যক্ষের হস্তে থাকিবে তিনি সম্পাদকের, কি সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া টাকা দিবেন।

ধনাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট গচ্ছিত অর্থের রীতিমত হিসাব রাখিবেন।

কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়োগ।

২১। কোন কারণ বশতঃ বৎসরের মধ্যে কোন কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়োগ করা আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশনে তদ্বিষয় স্থির করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভা।

২২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে নিয়োজিত অনধিক ৫০ জন সভ্য, এবং ২৩ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে। উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে এবং উপস্থিত সভ্যগণের ⅔ অনুমোদন করিলে অনধিক পাঁচ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর এবং তিন বৎসরকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা এবং ৩য় নিয়মানুসারে সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত ⅔ অংশ সভ্য

অনুমোদন করিলে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

প্রতিনিধিগণের নিয়োগকারীসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় সমাজের অন্যূন তিন বৎসর কাল সভ্য থাকা আবশ্যক এবং তৃতীয় নিয়মানুযায়ী সভ্যের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্যের ভার অধ্যক্ষসভার উপর অর্পিত থাকিবে এবং তজ্জন্য উক্ত সভা দায়ী।

অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগ।

২৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষ সভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগকারী সমাজ সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের কার্য্য বিবরণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইতে পারিবে।

কোন এক ব্যক্তি এক অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

উপাসনা প্রণালী, আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে প্রতিনিধি-নিয়োগকারী সমাজ সকলের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে।

প্রতিনিধির নাম প্রেরণ।

২৪। প্রতিনিধি নিয়োগকারী সমাজ সকল যাঁহাদিগকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের নাম বার্ষিক অধিবেশনের পনর দিবস পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উক্ত সমাজ সকলের নিকট আগামী বর্ষের প্রতিনিধির নাম বার্ষিক অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে চাহিয়া পাঠাইবেন।

যদি তাঁহারা প্রতিনিধির নাম না পাঠান, তবে সেই সমাজের প্রতিনিধির পদ শূন্য থাকিবে। বৎসরের মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগ বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে সেই নিয়োগ বা পরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইতে হইবে।

প্রতিনিধিবর্জ্জন ও শূন্যপদপূরণ।

২৫। নিয়োজক সমাজ প্রয়োজনানুসারে স্বীয় প্রতিনিধি বর্জ্জন বা শূন্যপদ পূরণ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন কোন প্রতিনিধি কোন কারণে পদস্থ থাকিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে, অধ্যক্ষসভা তাঁহাকে আপাততঃ তৎপদ হইতে স্থগিত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়োগকারী সমাজকে অনুরোধ করিবেন। নিয়োজক সমাজ উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন ব্যতীত তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইলে উক্ত সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং অধ্যক্ষ সভা তাঁহাদের নিয়োজিত প্রতিনিধিকে অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পরিবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগের যোগ্যতা।

২৬। যে সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, সেই সমাজের প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার থাকিবে।

২৫ শ নিয়মে প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার হইতে বর্জ্জিত কোন সমাজ পুনরায় প্রতিনিধি নিয়োগের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে এবং অধ্যক্ষ সভার মতে উপযুক্ত বোধ হইলে তাঁহারা সেই অধিকার পুনঃ প্রদান করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার সাধারণ অধিবেশন।

২৭। অধ্যক্ষ সভার সাধারণ অধিবেশন বর্ষে চারিবার অর্থাৎ চৈত্র, আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ মাসে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন।

২৮। কার্য্যনির্ব্বাহকসভাদ্বারা আদিষ্ট কিম্বা অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ১০ জন সভ্যদ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে সম্পাদককে অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। সম্পাদক পত্রদ্বারা অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে কিম্বা অনুরোধ পত্র পাইবার পর দুই সপ্তাহ মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার না করিলে তিনি প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন ইহা স্থিরীকৃত হইবে এবং অধ্যক্ষ সভার অন্যূন ১৫ জন সভ্য নিজ নামে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন।

২৯। অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবসে হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহা অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে।

অধ্যক্ষসভার সভ্যবর্জ্জন ও শূন্যপদপূরণ।

৩০। প্রতিনিধি ব্যতীত অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্য কোন কারণে পদস্থ থাকিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে উক্ত সভা তাঁহার আত্মসমর্থন পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমতি অপেক্ষায় তাহাকে আপাততঃ স্থগিত রাখিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে অধ্যক্ষ সভার অনুরোধ রক্ষা করিয়া উক্ত সভ্যকে সাময়িক ভাবে স্থগিত অথবা ইচ্ছা করিলে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত কারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্যকে স্থগিত বা পদচ্যুত করা আবশ্যক বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন। এইরূপে অথবা মৃত্যু কিম্বা পদত্যাগ নিবন্ধন অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্যের পদশূন্য হইলে ঐ শূন্যপদ পূরণ করিতে পারিবেন।

অবান্তর নিয়ম (bye-laws) করিবার ক্ষমতা।

৩১। সমাজের কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অধ্যক্ষ সভা অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে

পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সমুদায় নিয়ম পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা।

৩২। অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও আপনাদিগের মধ্য হইতে আর ১২ জনকে লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন এবং কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন সভ্য পরিবর্ত্তন ও শূন্যপদে নূতন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে কেহ বিশেষ কারণ প্রদর্শন ব্যতীত ক্রমান্বয়ে ১২টী অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যে কোন কারণে একাদিক্রমে ২৪টী অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে সভ্যপদচ্যুত হইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ আপনাদিগের অথবা অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর এক ব্যক্তিকে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহকসভা-সংগঠন।

৩৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর দুই সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ একটি বিশেষ অধিবেশনে আপনাদিগের মধ্য হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশজন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। উক্ত বার্ষিক অধিবেশনেই এই সভা সংগঠনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

এই নিয়োগের তিন দিবসের মধ্যে প্রচারকগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত অপর একজন সভ্য নিযুক্ত হইবেন।

পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকসভাসংগঠন না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তব্য।

৩৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক নৈতিক ও বৈষয়িক সকল প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ও তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবান থাকিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। প্রচার কার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় উপাসনা, আচার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভায় অর্পণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে।

অঙ্গীভূত সমাজ।

৩৫। ব্রাহ্মমণ্ডলীর সামাজিক উপাসনার উন্নতি ও একতা সংস্থাপনার্থ উপাসনা গৃহ স্থাপন, উপাসকমণ্ডলী সংগঠন, আচার্য্য নিয়োগ, এবং উপাসনা প্রভৃতির নিয়মাদি কার্য্যনির্ব্বাহকসভা আবশ্যকমতে প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত করিবেন। অধ্যক্ষ সভার সংশোধনান্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই সকল বিষয় স্থির করিবেন।

যে যে সমাজ এই সকল নিয়মাধীন হইবেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন।

৩৬। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তিকে প্রচারক পদে বা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ মনোনীত বা তৎপদ হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক মতে অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কোন প্রচারক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রচারকপদ হইতে স্থগিত বা অপসৃত হইলে তাঁহার অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচার মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হইবার এক মাসের মধ্যে প্রচারক মহাশয় সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইবেন।

প্রচারকগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যতদূর সম্ভব প্রচারকগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।

৩৭। "কর্ম্মচারীগণ, অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ২০ জন সভ্য সচরাচর কলিকাতা তৎসন্নিহিত স্থানবাসী হওয়া চাই।

অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন।

৩৮। যদি কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্বোল্লিখিত কোন সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিজ্ঞাপিত অধিবেশনের দিবস পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কোন দিবসে উক্ত অধিবেশন হওয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইতে হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী স্থিরীকৃত দিবস কোন ক্রমে এক সপ্তাহের অধিক কাল বিলম্বে হইতে পারিবে না।

স্থগিত (Adjourned) অধিবেশন।

৩৯। কোন সভার কোন অধিবেশনে সমুদায় কার্য্য শেষ না হইলে অবশিষ্ট কার্য্য যে দিবস সম্পন্ন হইবে, তাহা সেই স্থলেই স্থিরীকৃত ও বিজ্ঞাপিত হইবে; এই বিষয়ে তিন সপ্তাহের বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যকতা হইবে না। "উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের (Quorum) অনুপস্থিতিতে যদি কোন সভার অধিবেশন না হয় তাহা হইলে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারা এই সভার অধিবেশনের জন্য তৎপরবর্ত্তী যে কোন সময় নির্দ্ধারণ করিবেন। উক্ত সময় প্রকাশ্য পত্রে বা অন্য উপায়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

উপরোক্ত উভয়স্থলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ২০ জন, অধ্যক্ষ সভায় অন্যূন ৭ জন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় অন্যূন ৩ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে।

নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি করিবার রীতি।

৪০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার যে কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যও এরূপ প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা করিলে অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট বিজ্ঞাপন দিবেন। সম্পাদক উক্ত অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

যদি কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত সভ্যদিগের অন্যূন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ কারী উপস্থিত অনুপস্থিত উভয়বিধ সভ্যদিগেরও অন্যূন ⅔ সভ্য দ্বারা গৃহীত হয় এবং যদি তাহা পুনরায় অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্তরূপে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে যদি উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে অন্যূন ⅔ সভ্যের দ্বারা অপরিবর্ত্তিতরূপে অনুমোদিত হয়, তবে তাহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইবে।

কিন্তু যদি অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ৫ জন সভ্য ও তদ্ব্যতিরিক্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ ২৫ জন সভ্য অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কোন প্রস্তাবের পুনর্ব্বিচার আবশ্যক মনে করিয়া কার্ত্তিক মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট বিজ্ঞাপন দেন তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইবে এবং সেখানে উপস্থিত সভ্যের ⅔ অংশ দ্বারা অনুমোদিত হইলে গৃহীত হইবে।

যদি এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব ২য় নিয়মে উল্লিখিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্য সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব অপরিবর্ত্তিতরূপে ⅔ সভ্যের দ্বারা গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাব স্থিরীকরণার্থ মত গ্রহণ।

কোনরূপ বিশেষ বিধি না থাকিলে সকল প্রকার সভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাবাদি ধার্য্য হইবে। কোন প্রস্তাবের সপক্ষে এবং বিপক্ষে মত সংখ্যা সমান হইলে সভাপতি যে পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষের মতই ধার্য্য হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) কার্য্যবিবরণ।

১৮৮৯

বিগত তিনমাসে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১৩টী নিয়মিত ও ১টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে—

বাগআঁচড়া স্কুল—এই স্কুলের কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে দুই জন পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ভাল কাজ না হওয়ায় এবং ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, দুই জন পণ্ডিতকেই কার্য্য হইতে অবসৃত করা হইয়াছে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ই এখন স্কুলের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। স্থানীয় লোকের প্রতিবন্ধকতায় ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণই প্রধানতঃ শিক্ষা করিয়া থাকে। বাহিরের বালক অতি অল্প সংখ্যক উপস্থিত হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ—বেহার, উড়িষ্যা, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ-কষ্ট নিবারণার্থ মধ্যবঙ্গসম্মিলনী, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, সঞ্জীবনী, ভারতসভা, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকগণ সম্মিলিত হইয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, সেই কমিটির সহিত মিলিত হইয়াই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাবে আর কিছু করা হয় নাই।

প্রচারক ভবন—প্রচারকগণের বাসের জন্য প্রচারক ভবন নামে পূর্ব্বে দুইটী একতালা গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিছুদিন হইল উক্ত গৃহ দুইটীই দোতালা করা হইয়াছে। এই দুইটী বাটী প্রস্তুতের ব্যয় স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের টাকা সম্প্রতি হাওলাত স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক দেওয়া হইতেছে। এই দুইটী বাটীই এখন অন্য লোককে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ভাড়া হইতে টেক্স এবং অন্যান্য ব্যয় বাদে ন্যূনাধিক ৪০৲ টাকা মাসিক আয় হইবার সম্ভাবনা। ভাড়ার টাকা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ ব্যয় হইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অর্থাভাবে প্রচার কার্য্য এবং ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত, নিরাশ্রয়া বিধবাগণের জন্য সদুপায়—ভাল ভাল গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিছেন না। এজন্য ব্রাহ্মগণ আপন আপন আয়ের কত অংশ ব্যয় করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য কলিকাতাস্থ সভ্যগণের একটী সভাও হইয়াছিল। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ হইয়া থাকিলেও আয়ের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে দান করিবার পক্ষে অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবিষয়ের মীমাংসার জন্য ভবিষ্যতে আরও চেষ্টা করিবেন।

প্রচার—এই তিন মাসের প্রচার কার্য্য বিশেষ সন্তোষকর নহে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় বিদায় লইয়া আছেন। যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদেরও সকলে যে আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষরূপে কার্য্য করিয়াছেন এমন মনে হয় না। কার্য্য বিবরণ দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কিরূপ সুবিধা আছে তাহা জানিবার জন্য বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পাঠান হইয়াছিল। তিনি শিলংএ থাকিয়া যাহা জানিয়াছেন এবং খাসিয়া ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৌথার ব্রাহ্মসমাজে যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে কিছুকাল তথায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। খাসিয়াদিগের মধ্যে কার্য্যের সুবিধার জন্য কয়েক খানা পুস্তক একটী হোমিওপ্যাথি ঔষধের বকস এবং সমাজের পত্রিকা সকল পাঠান হইয়াছে।

বর্ম্মা হইতে বাবু বঙ্কবিহারী দাস কার্য্য নির্ব্বাহক সভায়

একখানি পত্র লিখিয়া তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচারক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারের বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ ইচ্ছাবান হইয়াও উপযুক্ত লোকাভাবে কার্য্যতঃ কিছুই করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অন্য ছয় দিন পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৫ পাচ ঘটিকা পর্য্যন্ত বাগআঁচড়া স্কুলের বালক বালিকাদিগকে পড়াইয়াছেন। রাত্রির উপাসনার পর ছাত্রদিগের পাঠ শিক্ষার সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সমাজে উপাসনা করিয়াছেন। বাগআঁচড়ার ভিন্ন ভিন্ন ৪টী পল্লিতে যে ৪টী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজ আছে তাহাতে প্রায় নিয়মিতরূপে উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; কয়েক রবিবার অপরাহ্নে মন্দির হইতে বাজার পর্য্যন্ত যাইয়া নগর সংকীর্ত্তন এবং প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তথাকার ৬টী পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ১০ই আগষ্ট রবিবার কুলবেড়িয়া সমাজের মাসিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং ২১এ আগষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ৪টী পল্লির ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মিলিত উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বেহারে গমন কালে প্রয়োজন বশতঃ উত্তর বাঙ্গালা হইয়া গমন করেন। পথিমধ্যে ফুলবাড়ী নামক স্থানে একদিন অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও আলোচনা করেন। এখান হইতে রংপুর সমাজের সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন এবং তথাকার মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন উপলক্ষে উপাসনা করেন। তথা হইতে দিনাজপুরে যাইয়া ২।৩ দিন তথায় অবস্থিতি করেন। সমাজে এবং ব্রাহ্মগণের গৃহে সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা ও আলোচনা করেন। তথা হইতে রায়গঞ্জ নামক স্থানে এক দিন থাকিয়া উপাসনা ও আলোচনা করেন। তথা হইতে কাটিয়ার নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক ২।৩ দিন থাকিয়া পারিবারিক উপাসনা এবং নানাবিষয়ে আলোচনা করেন। এখান হইতে পুর্ণিয়া গমন করেন। তথায় ২।৩ দিন কিছু কিছু কাজ করিবার পরেই তাঁহার জ্বর হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়া ৯ই আগষ্ট পুর্ণিয়া হইতে পুনরায় কাটিয়ারে গমন করেন। শরীর দুর্ব্বল বলিয়া তথায় ৪।৫ দিন অবস্থিতি করেন। এখানে আলোচনাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন নাই। তথা হইতে বারসর নামক স্থানে গমন করেন সেখানেও সৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন আর কিছু কাজ হয় নাই। এখান হইতে মুঙ্গেরে গমন করেন। তথায় বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণের পীড়া নিবন্ধন তাঁহার সঙ্গে প্রায় এক মাস অবস্থিতি করেন। এই সময় মধ্যে মুঙ্গের সমাজে নিয়মিতরূপে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনা এবং পরিবারে ও ব্রাহ্মবন্ধুগণের বাসায় উপাসনা করিয়াছেন। মুঙ্গের হইতে একবার জামালপুর ব্রাহ্মসমাজে গমন পূর্ব্বক তথাকার সমাজে উপাসনা করেন এবং ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এখানে বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। মুঙ্গের হইতে ভাগলপুরে গমন করেন তথাকার ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা করেন, উপদেশ দেন, এবং আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কয়েক দিন বাঁশবেড়িয়ায় অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য যুবক বৃন্দের সহিত মিলিয়া ধর্ম্মালোচনাদি করেন এবং তথাকার সমাজের সভ্যগণের সহিত কথোপকথন, ও সৎপ্রসঙ্গ করেন। ১৯এ শ্রাবণ শিবপুরে গমন করেন। উক্ত দিবস শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রগণের যে প্রার্থনা সমাজ আছে, তাহার একটি বিশেষ উৎসব হয়। কোম্পানির বাগানে উপাসনা উপদেশ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে কালেজের নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ২১এ শ্রাবণ বর্দ্ধমানে গমন করেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া একটি ছাত্র নিবাসে দুই দিন সভা আহ্বান করিয়া আলোচনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। ২৭এ শ্রাবণ রবিবার প্রাতে সমাজগৃহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রার্থনা বিষয়ে উপদেশ এবং সঙ্গীত ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। এক খানি ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক (ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশের জন্য কার্য্য করিয়াছেন। ৩০এ ভাদ্র তিনি আর একবার বাঁশবেড়ীয়ায় গমন করেন। তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য (উপাসনাদি) করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া এখানকার উপাসকমণ্ডলীর সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মিঃ ব্লেকার সাহেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সমাজে প্রতিরবিবার নিয়মিত রূপে ইংরাজিতে উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। ঢাকায় গমন পূর্ব্বক তথাকার ছাত্র সমাজের উৎসবে উপাসনা করিয়াছেন এবং বক্তৃতা করিয়াছেন। বরাহনগরে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। এখানকার ছাত্রসমাজে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিবেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—নিজের সাধন ভজনের জন্য তিনি পৌষ মাস পর্য্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে প্রথমতঃ নিয়মানুসারে দুই মাসের জন্য অবকাশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি পৌস মাস পর্য্যন্ত বিদায় পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিদায় না পাইলে কোন কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া জ্ঞাপন করায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে উক্ত সময় পর্য্যন্ত বিদায় প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে তিনি সুবিধা পাইলে অবশ্যই যেন উক্ত সময়ের পুর্ব্বে তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীযুক্তবাবু শশীভূষণ বসু—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবৎসর প্রচারকগণকে তাঁহাদের সুবিধানুসারে ২ মাসের অবকাশ প্রদান করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তদনুসারে শশীবাবু আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই দুই মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জুলাই মাসে নিম্নলিখিতরূপ কাজ করিয়াছিলেন। রাজসাহী ব্রাহ্ম সমাজে এবং লোকের বাটীতে ২ সায়ংকালে উপাসনা করেন। দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করেন এবং তথায় একটি নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের সাহায্য করেন। বদরগঞ্জে—উপাসনাদি করেন এবং ধর্ম্মবন্ধু—পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন।

কোন কোন প্রচারক কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে না জানাইয়া আপন আপন কার্য্য ক্ষেত্রের বাহিরে গমন পূর্ব্বক কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে যে গুলি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুমোদন করেন না তাহা এই কার্য্য বিবরণে প্রদত্ত হইল না।

এতদ্ভিন্ন বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিলংএ থাকিয়া তথাকার সমাজে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়াছেন। তথায় একদিন "সজীব ও নির্জীব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তথাকার কোন কোন ভদ্র লোকের বাটীতে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন। মৌথারে খাসিয়াদিগের জন্য যে সমাজ আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে ইংরাজিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মৌথারে একটী রবিবাসরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে মধ্যে মধ্যে তিনি পড়াইয়া থাকেন। অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। তিনি খাসিয়া ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং এক খানা উপাসনা প্রণালী ঐ ভাষায় লিখিতেছেন। একজন খাসিয়াবন্ধুদ্বারা তাহার সংশোধন করিয়া লইতেছেন।—

বাবু চণ্ডীকিশোর কুসারি, লছমন প্রসাদ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাবু কেদার নাথ রায়, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের কার্য্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সঙ্গত সভা—জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে সঙ্গত সভার ১৩ টী অধিবেশন হইয়াছিল। ১০।১২ জন সভ্য নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া প্রতি মঙ্গলবার সায়ংকালে উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। নিম্ন লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। ঈশ্বরোপাসনা ও স্মরণ, সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, আত্মচিন্তা, ঈশ্বর চিন্তা, দীনতা, এবং মিসন ফণ্ড।

উপাসক মণ্ডলী—এই তিন মাস কাল উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত সামাজিক উপাসনা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া আসিয়াছে। এই সময় মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মন্দিরের উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। মন্দিরে রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনা ও মঙ্গলবার সঙ্গতের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদিত হইতেছে।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের এই ৩ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ নিম্নেলিখিত হইল। একটী পিতৃহীন বালককে মাসিক ৪৲ টাকা, একটী বিধবাকে মাসিক ১৲, একটী কলেজের ছাত্রকে মাসিক ২৲ টাকা, আর দুইটী ছাত্রকে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হইতেছে। আর ২টী বিধবাকে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন সময় সময় এককালীনও কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়া থাকে।

আয়		ব্যয়	
বার্ষিক চাঁদা আদায়	১৫৲	ঋণ শোধ	১০৲
এক কালীন চাঁদা আদায়	৩৮৵০	মাসিক দান	২২৲
		এককালীন দান	৩৲
	৫৩৵০	বিবিধ ব্যয়	১৷৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৭০৶১০		
			৩৬৷৶৫
	১২৩৷১০	স্থিত	৮৬৷৵৫
			১২৩৷১০

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—এই তিন মাসে নীতি বিদ্যালয়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইয়াছে। মধ্যে যেমন সকলের উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছিল এখন সেরূপ নাই। ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সম্প্রতি দূর হইতে ও কোন কোন পিতা মাতা আপনাপন সন্তানদিগকে প্রতিবার নিয়ম পূর্ব্বক পাঠাইয়া থাকেন। এক্ষণে ন্যূনাধিক ৩৫ জন বালক বালিকা প্রতি রবিবার সমাজ গৃহে একত্রিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, কুমারী হেমপ্রভা বসু ও কুমারী যামিনী সেন, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালক বালিকাদিগকে গত কয়েক মাসে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন, পূর্ব্বে চারিটী শ্রেণীতে এই বিদ্যালয় বিভক্ত ছিল, এক্ষণে তিনটী শ্রেণী হইয়াছে। কারণ প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র নির্দ্ধারিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করাতে এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছে। এই দুই মাসে কয়েকটী নূতন সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বালক বালিকারা অতি শীঘ্র এই গান গুলি অভ্যাস করিয়াছে, ইহা বড় সন্তোষের বিষয়। এই বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য ২০০ শত টাকা সভার হস্তে আছে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় তাঁহার পরলোকগত কন্যা ৺ সরলাবালা মহলানবিশের স্মরণার্থ ১০০৲ টাকা, এবং মাননীয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্ত অবশিষ্ট ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই এই বিদ্যালয়ের ধন্যবাদের পাত্র। এই বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যগণের উদ্যোগে ছাত্র ও ছাত্রীগণকে একদিন কোম্পানির বাগানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—গ্রীষ্মাবকাশের পর বিগত জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারব্ধ হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

মহাশয়ের শিক্ষাধীনে যে উচ্চতর শ্রেণী (Senior Class) ছিল, তাহা তাঁহার অনিচ্ছা বশতঃ আর খোলা হয় নাই। জুলাইর শেষভাগে মধ্যম শ্রেণী (Junior Class)এর পরীক্ষা গৃহীত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ৮ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর কতিপয় ছাত্র এবং কতিপর নূতন ছাত্র লইয়া একটী নূতন উচ্চতর শ্রেণী গঠিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে। অধ্যাপনার ভার বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের হস্তে আছে। প্রাথমিক শ্রেণী (Primary Clss) র পরীক্ষা ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছিল। পাঁচ জন ছাত্রী ও চারি জন ছাত্র পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে চারি জন ছাত্রী ও তিন জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণী এখন মধ্য শ্রেণীতে (Juniro Class) এ পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু পূর্ব্বতন মধ্যম শ্রেণীতে যে সকল ইংরেজি বই পড়ান হইত, তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে বাঙ্গালা বই দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর নিম্নে পূর্ব্ববৎ একটী প্রাথমিক শ্রেণী আছে। মধ্যম ও প্রাথমিক শ্রেণীস্থ ছাত্রীদিগের ধর্ম্ম সাধনের সাহায্যার্থ যে একটী সঙ্গত আছে, তাহার কার্য্যও নিয়মিত রূপে চলিতেছে। এই সঙ্গতের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার বাবু মোহিনীমোহন রায় মহাশয়ের হস্তে আছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ;—উচ্চতর শ্রেণীর—১১ ; মধ্য শ্রেণীর—১৩ ; প্রাথমিক শ্রেণীর—৪।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদী—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাহারা সম্প্রতি আপনাদের কার্য্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সব কমিটির চেষ্টায় অনেক অনাদায়ী টাকা আদায়ের কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা মেসেঞ্জারের নিয়মিত ব্যয় হ্রাস এবং মুদ্রণ ব্যয় কম করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন আছে। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের ঋণ শোধের, জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। তত্ত্বকৌমুদীর অবস্থা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়। উভয় কাগজই নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রচার কমিটি—বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর প্রচার কমিটি তাঁহাকে পরীক্ষাধীন না করিয়া একবারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশার্থী প্রচারক পদে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রচার সভার অনুরোধ এখনও বিবেচনাধীন আছে। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি মহাশয়ও প্রচারক পদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহার সম্বন্ধে কোনও নির্দ্ধারণ করিতে আরও কিছুকাল গত হইবে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই সময় মধ্যে ব্রাহ্মবন্ধু সভায় আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা, বালক বালিকাদিগের শিক্ষা এবং জাতিভেদ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। প্রথম বিষয়ে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ২য়টীতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৩য়টীতে বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র বিষয়ের অবতারণা করেন। তৎপরে অন্যান্য সভ্যগণ আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েক জনের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মবন্ধুসভার উদ্যোগে একটী সায়ং সমিতি হইয়াছিল।

প্রচারফণ্ড কমিটি—এই কমিটির কার্য্য এখন স্বতন্ত্র ভাবে না হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যোগেই চলিয়াছে। এই কমিটির চেষ্টায় মাসিক প্রায় ১৫ পনর টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

পুস্তকালয় কমিটি—পুস্তকালয়ের বন্দোবস্তের ভার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। পুস্তকালয়ের সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ পুস্তক লইয়া গিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠ করিবার দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। রবিবার মধ্যে মধ্যে এখানে বসিয়া পড়িবার জন্য অল্প সংখ্যক লোক উপস্থিত হন।

ছাত্রসমাজ—গত তিন মাসে ছাত্র সমাজে সর্ব্বশুদ্ধ ১০টী বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু দ্বিজদাস দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত ও বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই তিন মাসে দুইটী সামাজিক সম্মিলন হইয়াছিল। ছাত্র সমাজের সভ্যদিগের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য সভ্যদিগকে লইয়া একটী সঙ্গত সভা সংগঠিত হইয়াছে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় ইহার সভাপতি।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—গত বৎসরের সহিত তুলনায় এ বৎসর ব্রাহ্মমিসন প্রেসের আয় কিছু কম হইতেছে। প্রেসের নূতন গৃহ প্রস্তুতের জন্য ৬৩৯৵৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এই তিন মাসে ৮৮১ টাকার কাজ হইয়াছে। ৭২০।৵০ আদায় হইয়াছে। ৬৭০৸৵১৫ খরচ হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার কমিটি, সামাজিক নিয়মপ্রণয়ণকারী কমিটির কোন কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
প্রচার	৩০৭।/০	* প্রচার ব্যয়	৫৩৪॥/১০
বার্ষিক চাঁদা ৫৬৲		* কর্ম্মচারীর বেতন	১১৪॥০
মাসিক চাঁদা ২৩১৲		ডাক মাশুল	৪৵৫
এককালীন ১৭॥৵		প্রচারক গৃহ হিঃ	৪১০।৵৫
প্রাপ্ত চাউলের মূল্য ২॥৵		পাথেয় হিঃ	৫৲
		মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	১২৲
	৩০৭।/০		

* সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের দরুণ ১২৮৸০ এবং কর্ম্মচারীদিগের বেতনের দরুণ ৬৪॥০ দেনা আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড	১৭৯॥০
বার্ষিক চাঁদা	১১১।০
মাসিক চাঁদা	৪৪৲
শুভ কর্ম্মোপলক্ষে প্রাপ্ত	২৪৲
জন্মের রেজিষ্ট্রেশন ফিঃ	।০
	১৭৯॥০
দরিদ্র ব্রাহ্ম বালকদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য সিটী কলেজ হইতে প্রাপ্ত	১৩৪৲
প্রচারক গৃহের ভাড়া	৯০৲
কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৩০৲
বিবিধ হিঃ	৵০
	৭৪০৸৶০
হাওলাত গ্রহণ	৫০৩৲
দঃ প্রচারক গৃহ ৪২৪৲	
দঃ জেনেরেল ফণ্ড ৭৯৲	
	৫০৩৲
	১২৪৩৸৶০
পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত	৬১৸৵৭
মোট	১৩০৫৸৵৭॥

দরিদ্রব্রাহ্ম বালকদিগের স্কুলের বেতন দান	১৩৪৲
বিবিধ হিঃ	৮।৶৫
	১২২৩/৫
হাওলাত শোধ	২৪৲
	১২৪৭/৫
স্থিত	৫৮৸২॥
মোট	১৩০৫৸৵৭॥

(ক্রমশঃ)

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কাঁথি হইতে বাবু ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—গত ১৪ই আশ্বিন (29th Sep.) রবিবার কাঁথি নিবাসী বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বেরা মহাশয়ের মৃত শ্বশুরের আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর এই প্রথম অনুষ্ঠান। বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইন্দ্রনারায়ণ বাবু স্থানীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে, ব্রাহ্মসমাজে, বালিকা বিদ্যালয়ে এবং গরিবদিগকে অর্থ ও চাউলাদি বিতরণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিতরূপে তিন দিন কাঁথিতে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল।

১৭ই আশ্বিন বুধবার সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন প্রার্থনা ও আলোচনাদি। ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭টার সময় রীতিমত সামাজিক উপাসনা। সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা। রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উপদেশ ও কথোপকথন।

১৯এ আশ্বিন শুক্রবার। সকালে সামাজিক উপাসনা। অনেকগুলি বন্ধু এবং দুই একটী নূতন লোকও উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

রাত্রে মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় সঙ্গীতাদি ও উপাসনা।—

সংবাদ।

বিবাহ—গত ২৯এ আশ্বিন সোমবার ময়মনসিংহে ১৮৭২ সনের তিন আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত গোলোক চন্দ্র দাস বয়স ২৮॥ বৎসর। ইনি ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসনের একজন শিক্ষক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সুশীলা কুমারী মজুমদার। বয়স ১৫ বৎসর। ইনি টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর নব দম্পতিকে কুশলে রাখুন।

নামকরণ—গত ৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বাগছি মহাশয়ের কনিষ্ট পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র বাগছি রাখা হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে কৈলাস বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—বিগত ৭ই। ৮ই কার্ত্তিক বনগাঁ মহকুমার কোর্ট সবইন্স্পেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগতা কন্যা মনোরমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা এবং কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। মনোরমার বয়স সবে ১২ বৎসর হইয়াছিল। সে তাহার সৎস্বভাবের জন্য পিতা মাতার বিশেষ আদরের পাত্রী ছিল। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বনগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিয়া কুশলে রক্ষা করুন এবং শোকসন্তপ্ত পিতামাতার প্রাণে শান্তি প্রদান করুন এই প্রার্থনা।

উদ্যানসম্মিলন—গত ৭ই কার্ত্তিক বুধবার শিবপুর বোটানিক্যালগার্ডনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের একটী উদ্যানসম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমতঃ উপাসনা হয়। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপন আপন আয়ের কত অংশ প্রদান করিবেন সে বিষয়ে আলোচনা হয়। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হয় যে যাঁহাদের মাসিক আয় ২৫৲ টাকা তাঁহারা টাকা প্রতি ৫ এক পয়সা এবং তাহার অধিক আয়বান সভ্যগণ টাকা প্রতি ৭॥ দেড় পয়সা হিসাবে দান করিবেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে তথায় উপস্থিত সকলেই এই হারে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। আশা করি অন্যান্য সভ্যগণও এইরূপে সমাজের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

স্থানাভাবে এবার কোন পত্রই প্রকাশিত হইল না। পত্রপ্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভা গঠন সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মাবলীর ২য় নিয়মানুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২১এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে তাঁহাদের নাম, ধাম, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৮ই অক্টোবর ১৮৮৯

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

বিশ্বরাজ!
কি জানি তোমার বিভো! অনন্ত স্বরূপে
কি যে আছে, কি বা বুঝি! যত দূর যাই
তত ডুবি; আরো ডুবি; শেষে ক্ষুদ্র প্রাণ
রুদ্ধশ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠে বলে হে অগাধ!
আমি ক্ষুদ্র, বিশ্বপতি! আমার কামনা,
আমার কল্পনা, চিন্তা, ক্ষুদ্র যে সকলি!
কি জানাব? ওহে দেব! এই মাত্র জানি
ভগ্নপ্রাণে বাস তব! তাই ভগ্ন হৃদে
সংসার দুর্দ্দিন-মাঝে, যন্ত্রণা সাগরে
তাই হে হৃদয় বন্ধু! ডাকি বারে বারে।
কোটী বিশ্ব ভিক্ষা করে যে কটাক্ষ-তলে
সে কটাক্ষে এ দাসের নয়নের ধারা
দেখ তুমি; এ সান্ত্বনা পারি কি ভুলিতে!
বেঁচে আছি এই সুখে; তবে করযোড়ে
এই চাই, দেখো দেব! দেখো হে আমারে
সংসার-যন্ত্রণা-চক্রে দেখো পিতা মোরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি নিবেদন— তত্ত্ব কৌমুদীর গত দুই সংখ্যায় এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদে মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক ২১এ নবেম্বরের পূর্ব্বে আপন আপন নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমরা জানিয়াছি সভ্যগণ অধ্যক্ষসভার সভ্য হইবার জন্য এখনও আশানুরূপ নাম প্রেরণ করেন নাই। গত দুই বৎসরও সভ্যগণ এ বিষয়ে বিশেষ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে প্রণালীতে অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই প্রণালীকে বিশেষ সুফলপ্রদ করিতে হইলে সকলেরই তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যত অধিক সংখ্যক সভ্যের মধ্য হইতে এই মনোনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, ততই অধিক পরিমাণে কার্য্যক্ষম ও উপযুক্ত লোক সকল অধ্যক্ষসভায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হাতে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে উপযুক্ত সংখ্যক নাম না পাওয়া গেলে তাঁহারা সভ্যগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের বিবেচনার উপযুক্ত লোকদিগের সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক পরে অধ্যক্ষসভার সভ্যপদপ্রার্থীগণের নামের লিষ্ট প্রস্তুত করিতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বাধ্য হইয়াই এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের বিবেচনায় যতদুর সম্ভব তাঁহারা কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণের নাম সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এমনও ঘটিতে পারে যে তাঁহাদের ভুলক্রমে বা প্রকৃতরূপে কার্য্যক্ষমতার কথা না জানায় অনেক উপযুক্ত লোকও সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। সুতরাং সভ্যগণের ঔদাসীন্য সুন্দররূপে কার্য্য হইবার পক্ষে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক। এই নিমিত্ত অনেক সময় উপযুক্ত লোকের সাহায্য হইতে সমাজ বঞ্চিতও হইয়া থাকেন। সভ্যগণের নিকট বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা ঔদাসীন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর অধ্যক্ষসভার সভ্যপদপ্রার্থী হইবার জন্য আবেদন করুন। অধ্যক্ষসভার সভ্যগণের মধ্য হইতেই যখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণও মনোনীত হইয়া থাকেন তখন প্রকৃতকার্য্যক্ষম এবং কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এরূপ ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য কখনই প্রার্থনীয় নহে।

গত দুই বৎসরে দেখা গিয়াছে যে অধ্যক্ষসভার সভ্যপদপ্রার্থীগণের নামের লিষ্ট (ভোটিং পেপার) যখন সভ্যগণের নিকট মত (ভোট) প্রদানের জন্য প্রেরিত হয় তখন আশানুরূপ অধিক সংখ্যক সভ্য আপনাপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফল এই হয় যে অতি অল্প সংখ্যক সভ্যের মতেই নির্ব্বাচন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ হওয়া কখনই প্রার্থনীয় নহে। সকলের মত লইয়া কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা উচিত। আর কিছুদিন পরেই ভোটিং পেপার সকল সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। সভ্যগণ যেন আপনাপন অভিপ্রায়।

জ্ঞাপন করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ মনোযোগী হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মসমূহ অধ্যক্ষসভা দ্বারা বিবেচিত হইয়া যে আকারে পরিণত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহা তত্ত্বকৌমুদীর গত দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী মাঘোৎসবের সময়ে বার্ষিক সভায় তাহার বিচার হইবে। এই নিয়মগুলিতে অতি গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আছে। সুতরাং এখন হইতে সভ্যগণ উক্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিবেচনাপূর্ব্বক আপনাদের মন্তব্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়ে জ্ঞাপন করিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সামাজিক বিধি—ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস পূর্ব্বক যাঁহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটী সমাজ রূপে পরিণত হইতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সকল কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে, তাহার সম্বন্ধে কোন বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন ব্রাহ্মগণ সাধারণ নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক আপন আপন সদ্‌বিবেচনায় যে রীতি অনুসারে চলা আবশ্যক মনে করিয়াছেন, তদনুসারেই চলিয়া আসিয়াছেন। কোন একটী পদ্ধতি অনুসারে সকলের চলিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাও এত দিন হয় নাই। কারণ সমাজের এরূপ শৈশব অবস্থাতে কোন বিধিই প্রণীত হইতে পারে না। হইলেও তাহা সমীচীন না হইবারই কথা। অনেক অবস্থা আছে যাহা সেই প্রাথমিক সময়ে উপস্থিতই হয় না। সুতরাং সেরূপ সময়ে কোন বিধি প্রচলিত হইলেও অতি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাহা বিহিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের এখনই যে সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, যে অবস্থায় কোন একটী বিধির অধীনে সকলে চলিতে পারেন, তাহাও নয়। তবে সাধারণ ভাবে আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় মূল নীতিগুলি নির্দ্ধারণ এখনও করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ইহার মধ্যে নানা শ্রেণীর লোকের সমাবেশ ঘটিতেছে! আবার ব্রাহ্মদিগের গৃহের বালক বালিকাগণের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এসময় কোন বিশেষ প্রণালী অনুসারে যদি ইহারা চলিবার জন্য শিক্ষিত না হয়—যদি সুনিয়মে সুশাসিত হইতে অভ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে সমাজের অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কতকগুলি বিশৃঙ্খল প্রকৃতির লোকের সমাবেশে সমাজের যাদৃশ পরিণতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা কখনই আশঙ্কা-শূন্য নহে। এজন্য কি নিয়মে সমাজের নরনারীগণ আপনাদিগকে পরিচালিত করিবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং সে বিষয়ে অন্ততঃ নিয়মের সাধারণ মূলসূত্র গুলি নির্ণয় করাও আবশ্যক হইয়াছে।

সামাজিক প্রশ্নের বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এরূপ সভায় অধিকাংশ চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া যদি সাধারণের মত সংগঠনের বিশেষ চেষ্টা করেন, তবে নিয়ম সকল প্রণয়ন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মবন্ধু সভা অনেক সময় আপনার আলোচ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাহা তত ক্ষতির কারণ না হইলেও সভা এক একটী বিষয় আলোচনার জন্য যেরূপ সময় প্রদান করা আবশ্যক তাহা প্রায় করিতে সমর্থ হন না এবং সুপ্রণালীতে আলোচনা করিতে হইলে ইহার যেরূপ অধিক সংখ্যক অধিবেশন হওয়া উচিত তাহাও করিতে সমর্থ হন না। এই নিমিত্ত সামাজিক প্রশ্ন আলোচনার সুবিধা প্রকৃত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবিষয়ে নিতান্ত উদাসীন না হইলেও কার্যতঃ তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রণালী অনুসারে কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া বিশেষ সময় সাপেক্ষ। আবার অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হওয়া কঠিন। কিন্তু কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পক্ষে যে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা উদ্যোগী হইলে এসম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়তা করিতে পারেন।

মফস্বলে যে সকল সমাজের সভ্য-সংখ্যা অধিক? তাঁহাদের উচিত সামাজিক প্রশ্ন সকল মীমাংসার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভার ন্যায় কোন সভায় সম্মিলিত হইয়া সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে সাধারণের মত গঠনের চেষ্টা করেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এরূপ গুরুতর কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা আশা করি এ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

কিন্তু সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা এবং সামাজিক বিধি প্রণয়ন করা সম্বন্ধে বিশেষ একটী প্রতিবন্ধক আছে। তাহা এই—সমাজ মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক শ্রেণী সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজস্থ লোককে নীতিমান করিবার জন্য নিয়মের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বিধির একান্ত পক্ষপাতী। অন্য শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার অধীন হইয়া চলাকে প্রার্থনীয় মনে করেন না। উভয় পক্ষের যুক্তির বলাবল বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সাধারণভাবে এই বলা যাইতে পারে, যে যেখানে নানা শ্রেণীর বহু লোকের সমাবেশ হয় সেখানেই নিয়মের প্রয়োজন। অনিয়মে একটী সামান্য সমিতির কার্য্যও যখন চলে না, তখন একটী সমাজ নিয়মহীন হইয়া চলিবে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু একমাত্র নিয়মেই কোন কার্য্য হইতে পারে না। যাহারা নিয়মানুসারে চলিবে, তাহারা যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হয়, তাহাহইলে নিয়ম কখনও চালক হইয়া মানুষকে সুপথে চালাইতে পারিবে না। নিয়মের অধীন হইলেই তাহার কার্য্যকর অন্যথা তাহা কেবলই বিড়ম্বনার কারণ। সেরূপ নিয়ম কাগজ পত্রেই চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া যায়, মানবের কার্য্যের সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। নিয়মানুসারে যাহারা চলিবে, তাহাদিগকে সংযত করা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা অবশ্যই অন্যবিধ উপায়ে সাধন করিতে হইবে। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নিয়ম যাহা হইবে তাহা যে সর্ব্বদাই সমা-

জের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল এবং উন্নতির সহায় হইবে, সে বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। আমরা আশা করি সুশৃঙ্খলরূপে যাঁহারা চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এবং আপনাপন সন্তানদিগকে যাঁহারা সুশীল ও উপযুক্ত নীতিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কল্যাণকর নিয়মগ্রহণে কথনই বাধা প্রদান করিবেন না। এ বিষয়ে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাহায্য পাওয়া আবশ্যক। ২।৪ জনের বিবেচনা সর্ব্ব সময়ে সমীচীন এবং উপযুক্ত কল্যাণসাধনে উপযুক্ত হইবে তাহার সম্ভাবনা কি?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অকিঞ্চনতা।

দুর্ব্বলকে সর্ব্বদাই অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে যদি আপন দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হইয়া সবলের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যায়, তাহাতে তাহাকে কেবলই বিফলমনোরথ হইতে হয়। কেবলই অপদস্থ হইতে হয়। একথানি বাষ্পীয়পোত যেমন সতেজে নদীর প্রবল স্রোতকে অগ্রাহ্য করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যায়, একথানি নৌকাও যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া সেইরূপ তেজের সহিত সদর্পে চলিবার বাসনা করে, সে যদি প্রবল স্রোত-মুখে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় তাহা হইলে তাহার কি দশা হয়? অতি শীঘ্রই স্রোতবেগে তাহাকে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া আসিতে হয়। তাহার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। তাহার স্রোতের বিপরীতদিকে যাওয়া প্রয়োজন হইলে, অন্যের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। অনুকূল বায়ুর সাহায্য লওয়া আবশ্যক। একজন সন্তরণপটু সবল ব্যক্তিকে সহজে নদী উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, যদি কোন দুর্ব্বল ব্যক্তিও সেই সাধ করে, তবে কি সে নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারে? সে অতি সত্বর অবশ-দেহে স্রোত-বশে ভাসিয়া যায়। তাহার সকল বল সকল সাহস উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপে দুর্ব্বলের পক্ষে যে কার্য্য তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়, তাহা সাধন করিতে হইলে নিজের শক্তিতে কথনও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না। তাহাকে পদে পদেই অন্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হয়। পৃথিবীর সামান্য কার্য্য সাধনের সময়েই যথন দুর্ব্বলকে নিয়ত পরের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হয়; তথন মহান্ ঈশ্বর যিনি, অনন্ত স্বরূপ যিনি, তাঁহাকে মানুষ কি নিজের শক্তিতে প্রাপ্ত হইবে? তুলনা এথানে সম্ভব নয়। কোন প্রকারে যে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার পরিমাণ বা শক্তি বিষয়ে তুলনা দ্বারা কিছু প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহাও নয়। বলিতে গেলেই বলিতে হয় অনন্ত আর অন্তবিশিষ্ট। এরূপ প্রভেদ যেথানে, এরূপ উচ্চতা ও হীনতা যেথানে, সেস্থানে হীনের পক্ষে কি উপায় অবলম্বন করা সম্ভবে, যে উপায়ে সে মহান্‌কে লাভ করিতে পারে? বলের কথা এথানে একবারেই আসিতে পারে না। তবে কিরূপে সে পরমেশ্বরকে লাভ করিবে? ঈশ্বরকে পাওয়া মানবাত্মার পক্ষে এমন একটা প্রয়োজনীয় বিষয় নয় যে যেমন পৃথিবীর আর দশটা প্রয়োজনীয় বস্তু পাইলে ভাল হয়, না পাইলেও চলিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর মানবাত্মার যথাসর্ব্বস্ব—তাহার সহিত বিচ্ছেদ আর মৃত্যু একই কথা। সুতরাং মানবাত্মার পক্ষে ঈশ্বর লাভ কথন এমন ব্যাপার নয় যে হইলে ভাল হয় না; হইলেও চলে! তবে কোন্ প্রণালীতে মানব ঈশ্বরকে পাইতে সমর্থ হইবে?

আমরা সংসারে যেভাবে শিশুর নিকট মাতাকে পরাস্ত হইতে দেখি, সেই প্রণালী ভিন্ন অন্য এমন কোন প্রণালী দেখা যায় না, যাহা দ্বারা মানুষ এমন দুর্ব্বল ও হীন হইয়াও অতুল মহিমান্বিত মহান্ পরমেশ্বরকে টানিয়া আনিতে পারে বা প্রাপ্ত হইতে পারে? শিশু মাকে কিরূপে পরাস্ত করে? প্রথমে কেবলই ইহা দাও, উহা দাও—আমাকে দিতেই হইবে না দিলেই নয় এইরূপে আব্দার চলিতে থাকে। মাকে নানা প্রকারে ত্যক্ত করিতে থাকে। তাঁহাকে কাজে যাইতে দিবে না, কোনমতেই ছাড়িবে না। আঁচল ধরিয়া টানাটানি এমন কি প্রহারাদি পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এইরূপে শিশু তাহার শক্তিতে যতদূর কুলায় তাহার অনুষ্ঠানের কোনটীরই বাকী রাথেনা। মা কিন্তু তথনও স্থির। তিনি বুঝিতেছেন এ সকল আব্দার কোন কাজের নয় সে যাহার জন্য এমন করিতেছে তাহা তত দরকারি নয়। সুতরাং তিনি স্থিরভাবেই আছেন। কিন্তু শিশু প্রথম আব্দার করিয়া যথন পারিল না তথন বল প্রয়োজন করিতে লাগিল। ধর পাকড় করিতে করিতে যথন আর তাহার শক্তিতে কুলায় না, যথন সে একবারেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তথন সে কি করে একবারে কাঁদিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অবসন্ন দেহে মাকে জড়াইয়া ধরে কাঁদিয়া একবারে আকুল হয়। তথন কি আর মা স্থির থাকিতে পারেন? তথন তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞা সকল জেদ একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। তিনিই তথন পরাস্ত হইয়া যান। সবল হইয়াও দুর্ব্বলের নিকট হার মানেন। শিশুর বলে নয়, কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতাও আত্মসমর্পণ হইতেই মাতা পরাস্ত হইলেন। অমনি মাতা বাহু প্রসারিত করিয়া সন্তানকে বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক আদরের উপর আদর করিতে করিতে কতরূপেই তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। সন্তান তথন মাকে একবারে পাইয়া বসে, কত কি চায়, প্রথম যাহা চাহিয়াছিল তাহার উপর নূতন নূতন আরও কত কি চাহিতে থাকে। মায়েরই তথন বিপদ, কোন রূপে সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান। তবে এই প্রণালীতেই আমরা পরম মাতাকে লাভ করিতে পারি। নিজের শক্তিতে নয়, কিন্তু তাঁহার শক্তিতেই তাঁহাকে পাইতে পারি। পরম মাতা অবসন্ন সন্তানকে যথন স্নেহের থাতিরে ধরা দেন তথনই আমরা তাঁহাকে পাইতে পারি।

পরম মাতার সহিত স্বভাবতঃই যে আমাদের বিচ্ছেদ ছিল বা বিরোধ ছিল তাহা নয়। কিন্তু আমরা নানা কারণে তাঁহা হইতে যেন সরিয়া আসিয়াছি। এথন বোধ হইতেছে যেন তাঁহার সহিত কত যোজনের ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়াছি।

এই ব্যবধান কি? না আত্মবলের অভিমানের ব্যবধান, জ্ঞানের অহঙ্কার এবং ধন, জন, মান প্রভৃতির অহঙ্কাররূপ ব্যবধান। এই সকল অহঙ্কার থাকাতে আমাদের তাঁহার নিকট যেরূপ বিনীত থাকা উচিত, যেরূপ তাঁহার বশীভূত থাকা উচিত, তাঁহার উপর যাদৃশ নির্ভর থাকা উচিত এবং তাঁহার সাহায্যও সঙ্গ লাভের জন্য যাদৃশ ব্যাকুলতা থাকা আবশ্যক, এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই। আমরা নিজদোষে যে বিরোধ ঘটাইয়াছি। নিত্য সম্বন্ধ যাঁহার সহিত, তাঁহার সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি, তাহা অপনোদন করিতে হইলে আমাদিগকে সেই শিশুর মতই কাঁদিতে হইবে। সে যেমন শ্রান্ত দেহে অবসন্ন হইয়া একবারে মায়ের শরণাপন্ন হয়, আমাদিগকে সেইরূপ একান্ত নির্ভরের সহিত তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার উপর আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কিন্তু মানুষ প্রথমেই ইহা পারে না। তাহার নিজের শক্তির অভিমানের হাত অতিক্রম করিয়া একবারেই আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিতে পারে না। আপনাকে এরূপ অকিঞ্চনও অক্ষম বলিয়া জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে সে তাহার চেষ্টাকে যথাশক্তি নিয়োগ করিতে থাকে। সে নানাবিধ উপায় গ্রহণ করে—শারীরিক মানসিক নিগ্রহ সকল গ্রহণ করিতে থাকে। মন যাহা চায় তাহা হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করে। মন চায় লোক-কোলাহলে বাস করিতে, সে যায় নির্জ্জন বনপ্রদেশে। মন চায় ধনৈশ্বর্য্যের সহিত থাকিতে, সে একবারে পথের ফকীরী গ্রহণ করে। এইরূপে প্রবৃত্তিকে দমন করিবার যত উপায় মানুষ জানে তাহার সকলগুলিই গ্রহণ করে। এইরূপে প্রচলিত সাধন প্রণালী সকল সবই সে অবলম্বন করিতে থাকে। একটাতে হইল না; অন্যটা গ্রহণ করে। এই ভাবে উপায়ের পর উপায় গ্রহণ করিয়া করিয়া যখন আর পারে না—যখন আর কিছুতেই কুলায় না—সকল প্রকার বল ও সাধনের অভিমান যখন চূর্ণ হইয়া যায়, যখন সে একবারেই শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে প্রার্থনা বাহির হয়, যে আকুল ক্রন্দন উপস্থিত হয়—তখন তাহার প্রাণে যে একান্ত নির্ভরের ভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় হয়। এরূপ ক্রন্দন, এরূপ ব্যাকুলতা, এরূপ নির্ভর মানুষ সহজেই যে লাভ করিতে পারে তাহা নয়। সে যতদিন আপন বলের পরিচয় প্রকৃতরূপে না পায়, আপনার শক্তিতে কতদূর হইতে পারে তাহা বুঝিতে সমর্থ না হয়, ততদিন এই অকিঞ্চনতা প্রাপ্ত হয় না।

অতএব প্রকৃত অকিঞ্চনতা লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ যে অকিঞ্চনতা ভিন্ন প্রকৃত ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা উপস্থিত হয় না তাহা পাইতে হইলে সাধন ভজনের বিশষ প্রয়োজন। সাধন ভিন্ন কখনও আপনার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না এবং আপনাকে জানা যায় না। আপনাকে জানিতে না পারিলে নিজ শক্তির পরিচয় না পাইলে কোনরূপেই প্রকৃত আনুগত্য বা নির্ভরশীলতা আসিতে পারে না। এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে সাধন ভজন করিয়া দেখা, যে আমরা কতদূর করিতে পারি। তাহা না করিয়া দুষ্ট ছেলের মত যদি কপট ক্রন্দন করি, তাহাতে মহান্ ঈশ্বরের সহিত নিত্য-যোগে সংযুক্ত হইবার আশা অতি অল্প।

বিশেষ বিধান সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায় আমরা "ঐশাশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ ত্রয়ে কতক পরিমাণে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষ ভাবে তাহার দুই একটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এবং বিশেষ বিধান সম্বন্ধে আমাদের মত আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে আশা করি পাঠকগণ একটু সহিষ্ণুতার সহিত ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

বিশেষ বিধান সম্বন্ধে একটী গুরুতর আপত্তি এই যে, বিশেষ বিধান মানিতে গেলে ইহাই বলা হয় যে ঈশ্বর সময়ে সময়ে এক একটী বিধান প্রচার করেন, অর্থাৎ একটী বিধান প্রচার করিয়া যখন দেখেন তাহাতে উপযুক্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে না তখন আর একটী বিধান প্রচার করেন। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞত্বে দোষারোপ করা হয়। "বিধান সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরেও পরিবর্ত্তনশীলতা আরোপ করিতে হয়। বিধানকে উপযুক্ত ফলোৎপাদনে অক্ষম বলিলে ঈশ্বরের প্রতিও শক্তিহীনতা ও অজ্ঞতার আরোপ করিতে হয়।"

আমরা "ঐশীশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কতক পরিমাণে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐশাশক্তির কার্য্য সর্ব্বদাই সাধারণভাবে চলিতেছে। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে, প্রত্যেক দেশে ও সমাজে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা স্ফূর্ত্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্থান, সময় ও অবস্থা বিশেষে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেই তাঁহার শক্তির বিশেষভাবে স্ফূরণ বা প্রকাশ হইয়া থাকে। জন সমাজে যে এইরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিলে (fact) প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা হয়। এইরূপ ঘটনা সাধারণ নিয়মেই ঘটে; কিন্তু বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় ইহা ঘটে বলিয়া ও সেই সময়ে ও সেই স্থানে ইহার ফল বিশেষভাবে অনুভূত হয় বলিয়াই ইহাকে বিশেষ বিধান বলা হইয়া থাকে। এ কথা বলিলে এরূপ বলা হয় না যে একটী বিধান ব্যর্থ হইল বলিয়া পরমেশ্বর অন্য বিধান প্রচার করিলেন। সকল বিধানই এক বিশ্বব্যাপী পরিত্রাণ প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। তাঁহার প্রেমনদী বহিয়া যাইতেছে; বিশেষ বাধা পাইলেই তাহাতে তরঙ্গ উঠে। এক একটী বিধান তাঁহার সেই একই প্রেমনদীর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ মাত্র। বিশেষ বিধান তাঁহার সাধারণ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বিশেষ ফল মাত্র। সুতরাং সময়ে সময়ে এক একটী বিধান প্রকাশিত হয় বলিলেই ঈশ্বরে পরিবর্ত্তনশীলতা আরোপ করা হয় না, এবং একটী বিধানে উপযুক্ত ফল হইতেছেনা বলিয়া ঈশ্বর অন্য বিধান প্রচার করিলেন এরূপ কথাও বলা হয় না। যে অবস্থা ও যে সময়ের জন্য যাহা উপযুক্ত তিনি ঠিক্ তাহারই বিধান করিতেছেন। তাঁহার একই পরিত্রাণ প্রণালী সময় ও অবস্থা বিশেষে এক এক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার দিক্ হইতে দেখিলে একভাবে যাহা তাঁহার সাধারণ বিধানের অন্তর্ভূত—মানুষের দিক্ হইতে, জনসমাজের দিক্

হইতে দেখিলে তাহাই আবার বিশেষ বিধান। তিনি মানবাত্মায় যে সত্য ও দেবভাবের বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, বিশেষ বিধান সকল অবস্থাবিশেষে তাহারই বিশেষ প্রকাশ মাত্র। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য যে বিধান করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রথম হইতে এই প্রকৃতির যে তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক নাই। বাস্তবিকই উহা এই প্রকারের যে তাহাই একমাত্র কার্য্যসাধনক্ষম। বিশেষ বিধানগুলিকে যদি তাঁহার এক বিশ্বব্যাপী পরিত্রাণ প্রণালীর বিকাশ বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিন্তু আপত্তিকারী বলিবেন, যে সকল ঘটনাকে "এক একটী বিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে" তাহাদের মধ্যে "সামঞ্জস্য বা মিল নাই।" সুতরাং একই উপায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হইয়াছে এরূপ কথা বলা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর যদি এক বিধানের দ্বারা অন্য বিধানের অন্যথা করিয়া থাকেন তবে "অজ্ঞতা ও শক্তির অভাব দুইই তাঁহাতে বর্ত্তমান।" আর যখন দুইটী বিধানের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে বিভিন্নতা দেখা গিয়া থাকে (যেমন যজ্ঞে পশুবধ ও অহিংসা) তখন কিরূপে উহাদিগকে মূলতঃ এক বলিবে?

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ আপত্তি অত্যন্ত স্থূলদর্শিতার পরিচায়ক। বিধান যাহা তাহা ঈশ্বরের, তাহা কেবল ঈশ্বরের সত্যই প্রচার করে। কিন্তু মানুষের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশিত হয় বলিয়া মানুষের ভ্রম, অপূর্ণতা তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। যাঁহারা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিপ্লবকে বিশেষ বিধান বলেন, তাঁহারা এরূপ মনে করেন না যে ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে কিছু অসত্য, যে কিছু ভ্রম প্রমাদ আছে তাহাও ঐশ্বরিক। যাহা কিছু সত্য তাহাই ঈশ্বরের। এবং সত্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা অমিল থাকিতে পারে না। যদি দুইটী বিষয় যাহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখি এবং তাহার একটীকে ঠিক সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তবে নিশ্চয়ই অপরটী অসত্য বা অসত্যমিশ্রিত সত্য। এইজন্য এস্থলে এরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে "বিধান বলিয়া যাহা উক্ত হইবে, তাহার সম্বন্ধে বিচার করা বা তাহার দোষ গুণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা বিধানবাদীর পক্ষে শোভা পায় না।" কারণ যাঁহারা বিশেষ বিধানের পক্ষ সমর্থন করেন তাঁহারা এরূপ কথা বলেন না যে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় প্রভৃতি ধর্ম্মে যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বরের বিধি। তাঁহারা ইহাই বলেন যে ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে তাহাই ঈশ্বরের যাহা কিছু অসত্য আছে তাহা মানবের অপূর্ণতাসম্ভূত। সুতরাং বিশেষ বিধান মানিতে গেলে "মানুষের বিবেক বা কর্ত্তব্য জ্ঞানের কোন মূল্যই থাকে না" এরূপ আপত্তিও খাটে না। কারণ, যে সকল ব্যাপারকে বিশেষ বিধান বলা হয়, তাহার মধ্য হইতে মানবীয় অপূর্ণতা ও ভ্রম পৃথক্ করিয়া সত্য বাছিয়া লইবার জন্য বিবেক ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশেষবিধানবাদিগণ কখনই এরূপ কথা বলেন না যে যে সকল ব্যাপারকে বিশেষ বিধান বলা হয় তাহা পূর্ণ ভাবে সত্য, তাহাতে অসত্যের লেশ মাত্র নাই। একথা বলিলে তাঁহারা যাহা স্বীকার করেন না এরূপ মত তাঁহাদের স্কন্ধে আরোপ করা হয়।

প্রাপ্ত।

পরলোক।*

অনন্তের মেয়ে আজ অনন্তের মহাকোলে
ছুটে গেল পৃথিবীর খেলা ধুলা দূরে ফেলে;
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে হেথা কি বাঁচিতে পারে?
না মিটিতে এক তৃষা শত তৃষা চারিধারে!
বাসনা, পিপাসা, ক্ষুধা নিভে যেথা অবশেষে,
মানবী অমরী হয়ে ছুটিয়াছে সেই দেশে!
কেন তবে হায় হায়, ম্রিয়মাণ হাহাকারে,
কি দিয়ে বাঁধিবে তায়, অনন্তে টেনেছে যারে।
শোকাশ্রু কেনগো তবে? প্রেমাশ্রু বহিয়া যাক্
অনন্তের কণা গিয়া অনন্তে মিশিয়া থাক্।
উল্লাসে ছুটুক্ সব হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা
চারিধারে ফুটে র'ক এ শুভ আশা-বারতা।
দিগ্দিগন্ত পূর্ণ হ'ক আনন্দের জয় রোলে,
মানবী অমরী হয়ে ছুটেছে অনন্ত কোলে;
আর কিবা চাই বল আর কিবা সাধ আছে;
চেয়ে দেখ মহাছবি ওই স্বরগের মাঝে!
বিস্তারি অনন্ত কোল, জননী, ভগিনী হয়ে
বসিয়া অমরী ওই জ্যোতির্ম্ময় দেবালয়ে;
অমর ফুটন্ত ফুল, চারিপাশে হাসি তার
আভাসে বিকাসে স্বর্গ, স্বর্গ কোথা আছে আর!!

একাকী একেশ্বরে।

একাকী একাগ্রচিত্তে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে আপনাকে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ভাব। পাশ্চাত্য দেশের লোকে এ ভাবের মর্ম্ম এতকাল পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। এখন তাঁহাদিগের মধ্যে এ ভাব অল্প পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। Alone to the Alone ইহার গূঢ় মর্ম্ম এখন তাহারা কতক বুঝিতে পারিতেছেন; কিন্তু তাহাও অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। সমগ্র ইউরোপ সকর্ম্মক ভাবে বিভোর; তথাকার লোকে সকর্ম্মক আরাধনায় মত্ত; অকর্ম্মক অবস্থা তাহাদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ নহে। নির্জ্জন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা বড় অনুভব করিতে পারেন না। এই হেতু তাঁহাদিগের ঈশ্বরোপাসনা সচরাচর সজনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মালয়ে সমগ্র উপাসকমণ্ডলী সমবেত ভাবে উপাসনা করেন। কেবল তাহা নহে, পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিলেই পারিবারিক উপাসনার এই সমবেত পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই পূজা হয় তাহা নহে; যে পরিবারে যে যে সময়ে ঈশ্বরাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার

---

* কোন একটী মহিলার মৃত্যুর দিনে রচিত।

সকল সময়েই সমবেত উপাসনা হইয়া থাকে, সমবেত উপাসনা ব্যতীত একাকী নির্জ্জনে উপাসনা করিবার রীতি সাধারণতঃ কোন পরিবারে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহের বিষয়। এই সজন উপাসনা প্রধানতঃ পাশ্চত্যভাব মূলক। প্রাচ্য উপাসনার প্রধান অঙ্গ নির্জ্জন আরাধনা। বহু পরিবার একান্নভুক্ত থাকার রীতি এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত; কিন্তু উপাসনার সময়ে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাবে নির্জ্জনে উপাসনা করেন। প্রাচ্য সাধকের সাধনা গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকার সাধন প্রণালীর আপেক্ষিক ফলাফল বিচার করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় প্রকার সাধনার রীতি একত্রে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই সমন্বিত সাধন প্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে; তাহার ফল সর্ব্বাংশে শুভজনক হইয়াছে কি না একবার তাহা বিবেচনা করা অসাময়িক নহে।

প্রাচীন ঋষিরা একাকী একেশ্বরে নিমগ্ন হইবার আশায় জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গিরিগুহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়ের ধ্যানে নিযুক্ত হইতেন। নানা চিন্তা স্রোতে মন ভাসিতেছে, তাহা হইতে মনকে কোন ক্রমে ফিরাইয়া লইতে পারিতেছেন না; মনের এই ভ্রাম্যমান্ গতি দূর করিয়া একাগ্র ভাবে চিন্তাশক্তিকে একমুখীন করিবার জন্য সাধক প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। এই অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর গত হইয়া যাইতেছে, তথাপি সাধকের চেষ্টার নিবৃত্তি নাই, কঠোর সাধনার পর সাধকের কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি আপনার সমগ্র চিন্তাশক্তিকে একমুখীন করিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়ের ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পারিলেন; তাঁহার জীবন সার্থক হইল। প্রাচীন ঋষির এই অকর্ম্মক জীবনাবস্থা পাশ্চাত্য ভাব বিভোর আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা নাই। অল্পজীবন মানুষের পক্ষে দশবৎসর নির্জ্জনে নৈমিষারণ্যে অতিবাহিত করা জীবনের অপব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নহে অনেকেরই সম্ভবতঃ এরূপ ধারণা জন্মিবে। কিন্তু অনেক সময়েই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্মই যাহার ধর্ম্ম এবং জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। তিনিও সময়ে সময়ে কর্ম্ম-ক্লান্ত হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল অকর্ম্মক অবস্থায় নির্জ্জনে বাস করিয়া নববল সঞ্চয় করিতে অভিলাষী হন। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার মূলে লক্ষ্য করিলে একটী নিগূঢ় ভাব দৃষ্ট হইবে, যে ভাব মানুষকে নির্জ্জন পথে চালায়; সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করায়। কর্ম্ম জগতে শক্তির প্রয়োজন; শক্তি ভিন্ন কর্ম্ম-সাধন হয় না। সঞ্চিত শক্তি যখন ক্ষয় হইয়া যায়, তখন নবশক্তি লাভের প্রয়োজন হয়। এই শক্তি লাভ হইবে কোথা হইতে? যিনি সর্ব্ব শক্তির মূলাধার তাহা হইতে নববল সঞ্চয় করিতে না পারিলে ক্লান্ত মানুষ পুনরায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এই হেতু মানুষ ক্লান্তাবস্থায় সর্ব্বক্লান্তিহারী পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করিতে আকুল হয়; তাঁহার চরণে বিশ্রাম করিয়া নববল সঞ্চয় করে। কেবল নববল সঞ্চয়ের জন্যই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একাকী একেশ্বরে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা নহে। একাগ্রতা ভিন্ন কর্ম্ম সাধনা অসম্ভব। দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে হইলে সমগ্র চিন্তা সমগ্র শক্তি অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাহাতে নিযুক্ত করিতে হয়। মানুষের চিন্তা ও শক্তিকে একমুখান করিবার পক্ষে একেশ্বরে নিমগ্ন হইবার চেষ্টার ন্যায় এমন প্রশস্ত সাধনা আর কি আছে। যিনি এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে জগতের সকল কার্য্যই সহজসিদ্ধ। এপথে অসিদ্ধ চেষ্টাও মানুষের পক্ষে পরম মঙ্গল কর; চেষ্টায় যে শিক্ষাটুক লাভ হইয়া থাকে, তাহা তাহার চির জীবনের সম্বল হয়; কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতার্থতা লাভের পরম সহায় হয়। সুতরাং যিনি এ সাধনায় জীবনের দশ বৎসর অতিক্রম করেন, তিনি বৃথা জীবন নষ্ট করেন না, কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভের মূলমন্ত্র শিক্ষা করেন। আমরা যে কর্ম্মক্ষেত্রেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা প্রকৃত সাধন শিক্ষা করি নাই। আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য ভাব-সমুদ্রে জলবুদ্বুদের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এই আছে, আর এই লয় পাইতেছে। কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে অগ্রে এইরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কেবল কর্ম্মময় জীবনের পক্ষেও সময়ে সময়ে একাকী একেশ্বরে নিমগ্ন হওয়া যে প্রয়োজন তাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু মানুষের জীবন কেবল কর্ম্মময় নয়। অকর্ম্মক শান্তির অবস্থার জন্য মানুষকে লালায়িত হইতে দেখা যায়। শ্রমজীবী সমস্ত দিন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত শরীরে গৃহাভিমুখে কি আশায় প্রত্যাগমন করিতেছে? গৃহে আসিয়া অকর্ম্মক অবস্থায় সে শান্তি সুখ উপভোগ করিবে; পরিবারবর্গের প্রেমপূর্ণ মুখ দর্শন করিয়া সমস্ত ক্লেশ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবে। গৃহ ও পরিবার এই কারণে কি এত মধুময় নহে? কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া বহুদিন অকর্ম্মক শান্তির অবস্থায় এই পরিবার মধ্যে বাস করিতে পারিলে কেহ মনে করেন না যে তিনি আত্মজীবন বৃথা নষ্ট করিতেছেন। ক্ষণভঙ্গুর গৃহ ও পরিবারে শান্তিতে বাস করা যদি এত মধুময় হয়, তাহা হইলে জীবনদাতা, সর্ব্বসুখের আধার পরমেশ্বরের সহবাসে তাহার চিরপ্রেমময় পবিত্র গৃহে অবস্থিতি করিবার জন্য সাধনার পথে যে সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা বৃথা নষ্ট হইল ইহা মনে করা গুরুতর ভ্রম। সামান্য সাধনায় যদি এই মহাসিদ্ধি লাভ হইত, তাহা হইলে প্রাচীন ঋষিরা কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইতেন না। ঋষিরা যে সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য বহু বৎসর একাকী নির্জ্জনে তপস্যা করিয়াছেন; অন্য চিন্তা সংযত করিয়া এক চিন্তায় মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য তাঁহাদিগের পক্ষেও বহুদিন নির্জ্জন বাস প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সাধনা, সেই এক চিন্তানুসারিতা আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলমানস লোকের পক্ষে অনায়াসে লভ্য বস্তু হইয়াছে, ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে চিন্তা করিতে পারিলে সুখের বিষয় হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত ব্রাহ্মসমাজ অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারেন কি না যে, প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, সে সাধনার

প্রয়োজন নাই, এ সম্বন্ধে সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের চিন্তাশক্তিকে এমনভাবে আত্ম আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারেন। এ কথা যে অধিকাংশ ব্রাহ্মই অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য সামাজিক অথবা পারিবারিক উপাসনায় ধ্যান করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করা কি সঙ্গত হইয়াছে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাসনা প্রণালীর এই বিষম সমন্বয় কি শুভকর ফল উৎপন্ন করিতেছে? এইরূপে একটী অতি গভীর সাধনার বিষয়কে কি অতি লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনায় ধ্যান করার রীতি পরিত্যাগ করিয়া উহাকে গুপ্ত সাধনার সামগ্রীরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

সমালোচনা।

"স্বর্গের চাবি" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এই পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর সুন্দর বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটী গল্পদ্বারা সরল ভাষায় বিশ্বাস ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ধর্ম্মসাধনে এরূপ পুস্তক অনেক সময় সাধকের উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু পুস্তকের নাম নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যেন কিছু বিবেচনার ত্রুটী হইয়াছে। "স্বর্গের চাবি" নামটী হইতে যেন কেমন একটু গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পায়।

ভ্রমসংশোধন।

গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ২২শ নিয়মে একটী ভুল হইয়াছে। উক্ত নিয়মে লিখিত হইয়াছে যে "কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত ঃ অংশ সভ্য অনুমোদন করিলে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। কিন্তু "এই নিয়মের ব্যতিক্রম" এই কয়েকটী কথার পূর্ব্বে "বয়স ও সভ্য থাকার কাল সম্বন্ধে" এই কয়েকটী কথা বসিবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

কিন্তু ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিনাজপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বসু মহাশয়ের পুত্রের জাত কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার বাসাতে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন এবং উপাসনাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন কর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই কার্ত্তিক রবিবার শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ দত্তের প্রথম পুত্র ও প্রথমাকন্যার নাম করণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বৈকুণ্ঠ বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগের পর এই তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বালকের নাম শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র ও বালিকার নাম শ্রীমতী চারুলতা রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি, মৌসমাই এবং শেলাপুঞ্জি প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত স্থান সকলের যে কার্য্য বিবরণ জানাইয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

"চেরাপুঞ্জি—এখানে দুই দিন সভা হয়। অধিক লোক উপস্থিত হন নাই। অনেকে বর্ষা কাল শেষ হইয়াছে বলিয়া কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ২।৩ জন ব্রাহ্ম এখানে আছেন।

মৌসমাই—শেলায় যাইবার সময় দুই দিন এবং ফিরিবার সময় ২ দিন এখানে সভা হয়। অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক স্ত্রীলোকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটী সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ৬ জন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। আরও অনেকে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

শেলাপুঞ্জি—এখানে ৯ দিন ছিলাম। এক প্রান্তে এক খাসিয়ার গৃহে ৫ দিন। অপর প্রান্তে চারি দিন। প্রত্যহ সভা হইয়াছে। কোন দিন চারি ঘণ্টার অধিক কাল ব্যাপিয়া সভা হইয়াছিল। কোন কোন দিন দুইবার সভা হয়। এখানে লোক সংখ্যা বিস্তর। আমার বাসায় সমস্ত দিন, রাত্রি ১১।১১॥ পর্য্যন্ত লোক আসিয়াছে। এক দিন খৃষ্টিয়ানদিগের সঙ্গে বিচার হয়। এই স্থানের দুই প্রান্তে দুইটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ২০ জন যোগ দিয়াছেন। আরও অনেকে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। খাসিয়া ভাষা জানিলে খুব কাজ হইত। অতি সুন্দর কার্য্যক্ষেত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম (Natural religion) ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই লোক অধিক আকৃষ্ট হয়। অনেকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। এক খাসিয়া যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভরণ পোষণের কোন উপায় হইলেই হয়।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লাহোর নগরে গমনপূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "১২ই অক্টোবর শনিবার—এখানকার সমাজগৃহে আমার ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা হয়—বক্তৃতার বিষয় Revolution in Modern India, its bearings and its prospects —"বর্ত্তমান ভারত-ক্ষেত্রে বিপ্লব ইহার গতি ও ইহার নিয়তি" —উক্ত বক্তৃতাতে আমি এই কথাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম যে ভারতসমাজে বর্ত্তমান সময়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিবে না কিন্তু আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকেও পরিবর্ত্তিত করিবে। ভাবী ভারত স্বাধীনতা ও একতার ভিত্তির উপরে দাঁড়াইবে। পরাধীনতা ও জাতিভেদের ভিত্তি আর থাকিবে না।

১৩ই অক্টোবর—এখানকার সমাজে হিন্দিতে উপাসনা করি ও ইংরাজীতে উপদেশ দি। উপদেশের বিষয় ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে—তাহা অনিবার্য্যরূপে কার্য্যে প্রকাশিত হয়। লৌকিক গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর থাকাতেই সভা, সমিতি, বিষয় বাণিজ্য, গতায়াত নিঃশঙ্কে চলিতেছে। আজ যদি

কোথাও বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর ভগ্ন হইয়া যায়, অমনি বিষয়, বাণিজ্য, গতায়াতে কত প্রভেদ লক্ষিত হইবে। সেইরূপ ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস স্বাভাবিক ও দৃঢ়। তাহার বিষয় বাণিজ্য, গতায়াত,অশন বসন, শয়নে সে বিশ্বাস প্রকাশ পাইবেই পাইবে। একটী কুক্কুর অপর কুকুরদিগের হাতে পড়িলে কত ভয় পায়, কিন্তু তাহার প্রভু আসিলে সেই কুকুরের কত বল আসে, বিশ্বাস ও নির্ভরের এমনি গুণ। আমাদের প্রভু আমাদের নিকটস্থ। আমরা সেইরূপ বল পাই না কেন?

১৪ই অক্টোবর সোমবার—এখানকার বাঙ্গালি ভদ্র লোকদিগের জন্য বাঙ্গালাতে "পূর্ব্ব পশ্চিমে ধর্ম্মবিপ্লব" এই বিষয়ে একটা বক্তৃতা করি। তাহাতে প্রায় শতাধিক বাঙ্গালি উপস্থিত ছিলেন। এখানে বাঙ্গালির সংখ্যা অধিক হইবে না, তাঁহারা আমাদের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মভাবের কিপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাই কিঞ্চিৎ বর্ণন করা হইয়াছিল। ঐ সকল দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মভাবের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্তি ও পরোপকার-প্রবৃত্তি বিশেষ প্রবল দৃষ্ট হইতেছে। এই দুইটী ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও প্রবল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্রান্ত গুরু বা শাস্ত্রের ধর্ম্ম নয়, কিম্বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মও নয়।

তৎপরে দুই এক দিন এখানকার সমাজের দুই এক জন সভ্যের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা ও প্রীতি ভোজন প্রভৃতি হইয়াছিল।

১৯এ অক্টোবর—শনিবার। এখানকার সমাজ গৃহে আর একটী ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয়—"The great problem in India"—"ভারত ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা কি?"—এই বক্তৃতাতে নিম্ন লিখিত সত্যটী প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যায়। প্রাচীন ও নবীনে যে সংগ্রাম দাঁড়াইয়াছে, এই সংগ্রামের সমাধা কিরূপে হইবে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন। কেহ বলেন প্রাচীন সব থাকুক, নবীন চাই না; সে আশা পূর্ণ হইবে না। কেহ বলেন নবীন সব আসুক,প্রাচীন চাহি না, সে আশাও পূর্ণ হইবে না। জাতীয় জীবনের প্রয়োজনানুসারে প্রাচীন ও নবীনের সম্মিলন হইবে। কিন্তু কঠিন ধাতুদ্বয়কে সম্মিলিত করে কে? অগ্নিরই সে সাধ্য আছে। ভারতক্ষেত্রে এক নব অনুরাগাগ্নি জ্বালিতে হইবে। কিন্তু এই অগ্নি কি প্রাচীন রোমের ন্যায় রাজনৈতিক ও জাতীয়তার অগ্নি হইবে? অথবা মহম্মদের ধর্ম্মের ন্যায় নব ধর্ম্মভাবের অগ্নি হইবে? উপসংহারে বলা যায় ভারতক্ষেত্রের কঠিন ধাতুপুঞ্জ যে অগ্নিতে গলিয়া মিশিবে, প্রাচীন ও নবীন মিলিয়া যাহাতে এক হইবে, তাহা নব আধ্যাত্মিকতার অগ্নি, ব্রাহ্মসমাজ সেই অগ্নি জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছেন।

২০এ অক্টোবর—রবিবার। এখানকার সমাজের উৎসব আরম্ভ হয়, সে দিন প্রাতে এখানকার সমাজ মন্দিরে বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালিদের জন্য উপাসনা হয়। তৎপরে রাত্রিকালে হিন্দীতে উপাসনা করি ও ইংরাজিতে উপদেশ দি।

২১এ অক্টোবর—সোমবার। সমাজ মন্দিরে ইংরাজিতে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা, স্বরূপ, উপাসনা, চিত্তশুদ্ধি, স্বর্গ, নরক এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।

২২এ অক্টোবর মঙ্গলবার—অদ্য এখানকার বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ বিশেষ ভাবে আমাকে একটী প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে এখানকার শিক্ষা সভা হল Sikha Sabha Hall নামক স্থানে বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের এক সমিতি হয়, সেখানে আমি বঙ্গ দেশের বর্ত্তমান উন্নতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করি। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গ দেশের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা বলা হয়।

২৩এ অক্টোবর বুধবার—সমাজমন্দিরে আর একটী বক্তৃতা করি। বিষয়—The spirit giveth life.—ধর্ম্মের বাহির ও ধর্ম্মের ভিতর এই উভয়ে প্রভেদ কি তাহাই উক্ত বক্তৃতাতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। গত কল্য আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্র কুমারী ও শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার নামকরণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। উপাসনা কার্য্য শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ জী করেন। নাম আমি দি। কন্যার নাম কুমারী লতিকা চৌধুরী হইয়াছে।

২৬এ অক্টোবর শনিবার—পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মভাব ও তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি (Religious Life in the West, what does it teach us) এই বিষয়ে লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজিতে এক বক্তৃতা হয়। উক্ত বক্তৃতায় এই বলা হয় যে পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে চারিটী ভাব বিশেষ প্রবল—

(১ম) শাস্ত্র নিরপেক্ষতা (Independence) (২য়) উদারতা (Catholicity) (৩য়) নরহিতেচ্ছা (Philanthropy), ৪র্থ নীতি প্রবণতা (Morality) ভারতের ভাবী কালের জন্য যে ধর্ম্ম আসিতেছে তাহাতে এই চারিটী বিদ্যমান থাকা চাই। ব্রাহ্মসমাজ যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাতে এই চারিটী লক্ষণ বিদ্যমান সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের ভাবী ধর্ম্ম।

২৭এ অক্টোবর রবিবার—অদ্য লাহোর সমাজের উৎসব দিবস। এ দিন প্রাতে আমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে শাস্ত্র হইতে পাঠ। হিন্দীতে এবং ইংরাজীতে ব্যাখ্যা।"

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

গত ১লা কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রদ্ধেয় বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় কয়েকটী হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার সহিত বিধান

বাদ সম্বন্ধে তাঁহার আর তর্ক চলিতে পারে না; বলিয়া তর্ক বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত হেতুগুলি উপযুক্ত হইলেও তাঁহার পক্ষে আরও কিছু বলা উচিত ছিল। কারণ আমার প্রথম পত্রের উত্তরে তিনি যখন পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে আমার অনেক উক্তির সহিত তিনি একমত। কিন্তু পত্রের শেষভাগে বলিয়াছিলেন যে আমার সকল কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, পরে সে সব কথার উত্তর দিবেন। ২য় পত্রেও লিখিয়াছিলেন যে আমার উত্তর পাইলে পরে অন্য কথা বলিবেন। এখন কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি আমার সহিত একমত এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ভিন্নমত তাহা জানা গেল না এবং সেকল বিষয়ের উত্তরও পাওয়া গেল না। সুতরাং সীতানাথ বাবুর পক্ষে আরও কিছু বলা সঙ্গত হইতেছে।

সীতানাথ বাবুর সহিত এখন যে বিষয়ে প্রধানতঃ তর্ক চলিতেছে; বাস্তবিক তাহাই আমাদের তর্কের মূল বিষয় নহে। তর্কের বিষয় বিধান কি? তাহা এক কি বহু? তাহা সময় সময় ঘটিতেছে কিম্বা নিত্যই ঘটিতেছে। সীতানাথ বাবুর মত এই যে নিত্য নূতন বিধান হইতেছে। এই কথা যে সকলে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁহার নিজের পূর্ব্ব বিশ্বাসের সহিত যে ইহার মিল নাই, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমার ২য় পত্রে তত্ত্বকৌমুদীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা হইতে অনেক স্থান উঠাইয়া দেখাইয়াছিলাম। সীতানাথ বাবু অন্যের উক্তিগুলি সমর্থন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের কথা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল তাঁহার সহিত এই নিত্য নূতন বিধানবাদের সামঞ্জস্য আছে কি না তাহা প্রদর্শন করা কিন্তু উচিত ছিল।

এখন সীতানাথ বাবুর সহিত বিধান প্রকাশের রীতি সম্বন্ধেই তর্ক চলিয়াছে। বিধানের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর এ কথায় তাঁহার সহিত আমার মতদ্বৈধ নাই। বিধানের বীজ যে আত্মা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে থাকে একথায় আমি বিশ্বাস করি। সীতানাথ বাবুও যে একবারে বিশ্বাস করেন না এমন নয়। কারণ তাঁহার লিখিত বিধানতত্ত্ব নামক প্রস্তাবে নূতন সত্যের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা আমার ২য় পত্রে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। তত্ত্বকৌমুদীতে সম্প্রতি 'ঐশীশক্তি' বিষয়ে যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতেও এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ ঐ প্রস্তাবের একস্থানে লিখিত হইয়াছে যে "ঐশ্বরিক ভাব সকলের বীজ প্রত্যেকের হৃদয়েই নিহিত আছে ইহা সত্য" অন্যত্র লিখিত হইয়াছে সকলের প্রকৃতিতেই দেবভাব বা ঐশীশক্তির অঙ্কুর আছে ইহা সত্য" তবে এ বিষয়েও মত ভেদ দেখিতেছি না। এই যে বিধান ইহার প্রকাশ কি প্রণালীতে হয়? সীতানাথ বাবু এই প্রকাশকেই বিধান বলিতেছেন এবং জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশকে মনবের সম্পূর্ণ ইচ্ছা নিরপেক্ষ বলিতেছেন। আমি আমার ২য় পত্রে এসম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি মাত্র করিয়াছিলাম এবং তৃতীয় পত্রেও এসম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। আমার তৃতীয় পত্রের কথাগুলি হয়ত পরিস্কার হয় নাই। তাই সে বিষয়ে এবারেও কিছু লিখিতে হইল। "জ্ঞান প্রেম, পবিত্রতার আদর্শের উদয়কে মানবইচ্ছাসাপেক্ষ বলিবার কারণ এই যে আমরা দেখিতে পাই—যেখানে পরিশ্রম, যত্ন চেষ্টা, যেখানে আত্যান্তিক ব্যাকুলতা সেখানেই উচ্চ উচ্চ সত্য সকল প্রকাশিত হয়। যে যেখানে চেষ্টা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, এরূপ অলস, উদাসীন আত্মায় যে হঠাৎ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশিত হইল এরূপ ঘটনা কখনও ঘটিতে দেখা যায় না। অনুগত জীবনেই সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। অনুগত জীবনেই ঈশ্বরের ক্রিয়া কার্য্যকরী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছুক, যত্নশীল, অনুগত জীবনেই সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্য প্রকাশের রীতিই যখন এইরূপ যে ব্যাকুল—নিয়তযত্নশীল আত্মাতেই সত্যের প্রকাশ হয় তখন ইহা বলাও সঙ্গত যে ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে কোন সত্যই প্রকাশ হয় না। আমার কথা ২।১টী দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শ্রেণীর সকল বালককেই শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু যে বালক তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনে তাহারই শিক্ষা লাভ হয়। যে তাহা না শুনিয়া অন্যমনস্ক হইয়া বৃথা গল্পামোদে সময় কাটায়, তাহার শিক্ষা লাভ হয় না। এখানে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষক সকলের শিক্ষার জন্যই উপদেশ প্রদান করেন যাহারা তাহাতে মনোযোগ করে তাহারাই শিখিতে পারে অন্যেরা যে শিখিতে পারে না তাহা শিক্ষকের অনিচ্ছায় নয়, কিন্তু তাহাদের নিজের অনিচ্ছায়। সূর্য্যোদয়ে দিক্ সকল প্রকাশিত হইলেও যদি কেহ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রাখে তাহার পক্ষে আলো লাভ কখনই ঘটে না। এখানেও দেখা যাইতেছে আলো দেওয়া সূর্য্যের কাজ। তাহা সকলের জন্যই আসে। কিন্তু যে ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রাখে, সে তাহা পায় না। আলো পাইতে হইলেই গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখা আবশ্যক। আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনন্যমনা হইয়া যখন কোন বিষয় চিন্তা করা যায়, তখন চক্ষু কর্ণ খোলা থাকিলেও দর্শন শ্রবণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে চক্ষু কর্ণ খোলা থাকিলেও দর্শন বা শ্রবণ জ্ঞান লাভ হয় না। আর দৃষ্টান্ত না দিলেও চলিতে পারে, আমি যাহা বলিলাম ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে যে কোন অর্থে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শের উদয় সম্বন্ধে মানবের ইচ্ছার সাপেক্ষতা আছে।

সীতানাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে "ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ক্রিয়ামাত্র" অন্যত্র "মনোবৃত্তি যে চালনাকরি ইহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ক্রিয়ামাত্র এই ক্রিয়া ঘটিলেও জ্ঞান না আসিতে পারে।" এখন জিজ্ঞাস্য এই চক্ষু খুলিয়া থাকিলেও এবং মনোবৃত্তি চালনা করিলেও জ্ঞান না আসিতে পারে; কিন্তু এই সকল ক্রিয়া যাহাকে সীতানাথ বাবু আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা না ঘটিলেও জ্ঞানলাভ সম্ভবপর কি না। দর্শন জ্ঞানলাভের পক্ষে চক্ষু খুলিয়া রাখা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পক্ষে মনোবৃত্তি চালনা করা প্রতিনিয়তই আবশ্যক কি না। যদি আবশ্যক হয়—যদি চক্ষু না খুলিলে দর্শন জ্ঞান লাভ না হয় এবং মনোবৃত্তি চালনা ভিন্ন

আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা না থাকে এবং এই চক্ষু খোলা ও মনোবৃত্তি চালনা যখন আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ তখন কিরূপে বলা যায় আমাদের জ্ঞান ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ রূপে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।

এখন সীতানাথ বাবু বলিবেন লোকে যাহা একবার জানিয়াছে, তাহাই অধিকতররূপে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারে, যাহা কখনও জানে নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন ইচ্ছা বা যত্ন চেষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। মানবের প্রথমে যে আত্ম জ্ঞান জন্মে তাহা মানবের নিজ ইচ্ছায় জন্মে না ইত্যাদি। এইরূপ যে কোন কোন বিষয় আছে তাহাতে সন্দেহ কি? সহজ জ্ঞান—যাহা আত্মার সৃষ্টির সঙ্গেই জন্মে এইরূপ কোন বিষয় জানিবার পক্ষে অবশ্যই তাহার ইচ্ছার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সীতানাথ বাবু কি এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভের ন্যায় জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশ উভয়কেই একই শ্রেণীর বলিয়া মনে করেন? যদি তাঁহার কথার অর্থ এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমার আপত্তি করা অবশ্যই সঙ্গত হয় নাই। আমি প্রাথমিক আত্মজ্ঞান লাভকে এবং জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশকে কখনই একই শ্রেণীর মনে করি না। এজন্য আদর্শ প্রকাশ সম্বন্ধেই আপত্তি করিয়াছি। এবারকার পত্রে তিনি যে মৌলিক সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন্ অর্থে বলিয়াছেন? তাঁহার প্রথম পত্রে জ্ঞান প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশের কথাই বলিয়াছিলেন। মৌলিক সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের কথার উল্লেখ ছিল না। মৌলিক সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ আর জ্ঞানের আদর্শ লাভ উভয়কেই যদি একই অর্থে ব্যবহার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা যদি প্রথমেই প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমি এ তর্ক উপস্থিত করিতাম না।

কোন বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেও যে চেষ্টা যত্ন হইতে পারে, তাহা বিশেষ বিশেষ সত্য যে প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে এবং শিশুর শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলেও জানা যাইতে পারে। শিশু বিদ্যালয়ে যাইতেছে। কেন যাইতেছে? না সে শিক্ষা করিবে। কি শিক্ষা করিবে সে তাহা জানে না। কিন্তু শিক্ষা করিবার জন্যই যাইতেছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে শিশু কি শিখিবে তাহা না জানিয়াও শিখিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে। শিশু অঙ্ক শিক্ষা করিবে; কিন্তু অঙ্ক কি তাহা সে জানে না। এখন যদি সে বলে অঙ্ক কি আমি যখন জানি না, তখন কি শিখিব তাহা না জানিয়া শিখিব না। এরূপ শিশুর পক্ষে বোধহয় অঙ্ক শিক্ষা লাভ কখনই হয় না।

নিউটন দেখিলেন বৃক্ষ হইতে ফল ভূমিতে পতিত হইল। কেন হইল? উর্দ্ধদিকে না যাইয়া কেন ফল নিম্নদিকে ভূমিতে পতিত হইল? তাঁহার প্রাণে এই প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি কারণ জানেন না অথচ কারণ জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। বহু চিন্তা ও যত্নের পর তিনি ইহার কারণ অবগত হইলেন এবং মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মের আবিষ্কার করিলেন। বুদ্ধ দেখিলেন লোকের নানা প্রকারের দুঃখ। রোগ, শোক জরা, মৃত্যু এই সকল দেখিয়া তাঁহার প্রাণে প্রশ্ন হইল এ সকল হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায় নাই? মহম্মদ আপনার দেশীয় লোকের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাহা নিবারণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার প্রাণে প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলতা আসিল। মনে এই সকল প্রশ্নের উদয় হওয়া এবং তাহার উত্তর পাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া হইতেই জগতে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সকল স্থানেও দেখা যাইতেছে প্রকৃত বিষয় জানিবার পূর্ব্বেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়াছিল।

কোন বিষয় ইচ্ছা করিয়া জানে—বা ইচ্ছা করিয়া জানে না। আমার কথা ঠিক এই ভাবের নয়। কিন্তু যেখানে ইচ্ছা নাই, আনুগত্যও আশা নাই সেখানে যে ঈশ্বর জোর করিয়া তাহার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া কোন সত্য প্রকাশিত করেন, এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। নির্ভরশীল আত্মাতেই সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। শিশু যেমন জানে না কি শিখিবে অথচ শিক্ষকের উপর নির্ভর করিয়াই শিখিতে ইচ্ছা করে, তেমনি মানবও প্রথমেই জানে না কোন্ সত্য সে জানিবে কিন্তু তাহার শিক্ষাদাতা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর হইতেই তাহার শিক্ষালাভ হয়। সীতানাথ বাবু ধর্ম্মসাধন ও প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রদর্শন জন্য বলিয়াছেন "ঈশ্বর সম্প্রতি যাহা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাও আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ" এখন কথা এই ঈশ্বর যদি কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা ভিন্ন ও কতকটা জানাইয়াছেন, পরে কি ইচ্ছা ভিন্ন আর জানাইতে পারেন না বা জানাইবেন না। যদি জানাইবেন, তবে আর বৃথা পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবার কি প্রয়োজন আছে? আর সেই সময় মানব যাহা জানিয়াছে সীতানাথ বাবুর মতে শুধু তাহার সম্বন্ধেই সে ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু তাহার অধিক যে কি তাহা যখন জানে না; তখন কিরূপে সে সেই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে? সীতানাথ বাবুর এই মতানুসারে প্রার্থনা বা ধর্ম্মসাধন পণ্ডশ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন বিষয় জানিবার জন্যও সাধন করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। কারণ "তিনি বলিয়াছেন কিন্তু বস্তুটা একবার জানিলে তাহার সম্বন্ধে আর যাহাই করি, তাহাকে জ্ঞানের বাহিরে আর নেওয়া যায় না।" যখন বিনা চেষ্টায় বিনা ইচ্ছায় যাহা জানিয়াছি, তাহা আমার জ্ঞানে সর্ব্বদাই থাকিবে, তখন তাহার জন্য আর সাধন কেন।

আমি লিখিয়াছিলাম "কোথাও একের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না" এই কথাটী সীতানাথ বাবুর ভাল লাগে নাই। আমি পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত নহে। ঈশ্বর আলো প্রকাশ করিতেছেন, সকলের জন্যই আলো আসিতেছে। কিন্তু যে গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রাখে সে কি আলো পায়? এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা আলো প্রদান করা। আমার ইচ্ছা তাহার সহিত মিলিলে অর্থাৎ আমি দ্বার খুলিয়া দিলেই আলো পাইতে পারি। অন্যথা আলো পাই না। এখানে কি দুই ইচ্ছার কার্য্য দেখিতেছি না? তত্ত্বকৌমুদীর গত সংখ্যায় "ঐশীশক্তি" নামক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে "চেষ্টা ব্যতীত শক্তির স্ফুরণ হয় না, আবার শক্তি ব্যতীত চেষ্টারও স্ফুরণ হয় না।" এখানেও

দুইয়ের মিলনেই কার্য্য দেখিতেছি। শিশুর শিক্ষার দৃষ্টান্তেও তাহা দেখিতেছি; শিক্ষক শিক্ষা দিতেছেন বালক মন দিয়া না শুনিলে সে কিছুই শিখিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষক ও বালক উভয়ের ইচ্ছা মিলিলেই শিক্ষা হয়। অজ্ঞান জড়-পদার্থেরপ্রতিই জ্ঞানবানের ক্রিয়া সম্পূর্ণ একের ইচ্ছায় হয়। কিন্তু ইচ্ছাবান্ জ্ঞানবানের প্রতি জ্ঞানবানের ক্রিয়া কখনই সেরূপ-ভাবে হইতে পারে না। মানবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই ইচ্ছা যখন ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হয় তখনই তাহার ক্রিয়া আত্মার:প্রবল হইতে পারে, অন্যথা হইতে পারেনা। এই ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সকল আপদই চুকিয়া যায়। আর তর্কেরই বা কি প্রয়োজন থাকে?

সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন "প্রথমে যখন আত্মজ্ঞান জন্মিল তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কার ইচ্ছা ছিল? যখন প্রথম চক্ষু খুলিল তখন কার ইচ্ছায় খুলিল ইত্যাদি"। মানবের আত্মজ্ঞান কার ইচ্ছায় হইল সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। কারণ আত্মজ্ঞান শূন্য আত্মা ত সম্ভবে না। যখন আত্মার সৃষ্টি ঈশ্বর করেন তখন আত্মজ্ঞানও তাঁহা হইতেই আসে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই আত্মার সহিত শরীরের যোগের পূর্ব্বেও কি কোন শরীর চক্ষু খোলে? যদি না খোলে তবে বলিতে হইবে শরীরে আত্মার সঞ্চার হইলেই চক্ষু খোলা প্রভৃতি আরম্ভ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই আত্মার ইচ্ছা ভিন্ন তাহার শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি চালিত হইতে পারে? এস্থলে শরীরের মধ্যে যে সকল অনৈচ্ছিক যন্ত্র আছে তাহার কথা বলা হইতেছে না, জড়পদার্থ যেমন অন্য শক্তিতে চলে শরীরও কি ঠিক্ তেমনই ঈশ্বর-ইচ্ছাতে চলে? যদি বলা যায় শরীর চালনা সম্বন্ধে আত্মার কোন ইচ্ছার প্রয়োজনই নাই—সেই প্রথম অবস্থাতেও নাই, তবে আর এখানে আত্মা বলিয়া একটা কিছু মানিবার কি প্রয়োজন আছে? যদি চক্ষু খোলা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার কোন ইচ্ছাই ছিল না, বলা যায় তাহা হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে সে সময়ে তাহার চক্ষু খুলিয়া গেলেও তদ্দ্বারা সে কোন জ্ঞানই লাভ করে নাই। কারণ যে জ্ঞান লাভ করিবে তাহার মনো-যোগ ভিন্ন কোন জ্ঞান জন্মিবার উপায় নাই। শরীর অর্থাৎ যন্ত্র মধ্যস্থ আত্মার মনোযোগ যখন তাহাতে আসে তখনই জ্ঞান লাভ হয়। আমি পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি অর্থাৎ অনন্যমনা হইয়া কোন বিষয় গাঢ়ভাবে চিন্তা করিলে চক্ষু কর্ণ খোলা থাকিলেও যেমন দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞান লাভ হয় না। এখানেও তেমনি বলিতে হয় শিশুর চক্ষু খুলিয়া গেলেও তাহার মনোযোগ ভিন্ন সে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পায় না। মনোযোগ অবশ্যই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

এখন যদি স্বীকারও করা যায় যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ প্রকাশ সম্বন্ধে মানবের ইচ্ছার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে স্বভাবতঃই এই কথা উঠিবে যে তবে সকলে তাহা পায় না কেন? সীতানাথ বাবু এই কথার উত্তরে বলিয়া-ছেন যে ঈশ্বর তাহাদের নিকট বিধান প্রকাশ করেন নাই তাহাতেই তাহারা জানিতে পারে নাই। ইহার পর যদি আমি বলি যে ইহা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার নয়। এবং অপক্ষপাতিতা নয় তবে সে কথার উত্তর দেওয়া সীতানাথ বাবু আবশ্যক বোধ করিবেন না। কারণ ইহা বিচারের সোজাপথ নয়। বক্রপথ। কিন্তু সীতানাথ বাবু এই পথকে বক্র বলিয়াও কিন্তু এই বক্রপথেই চলিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন ইহা যদি পক্ষ-পাতিতা তবে উহাও পক্ষপাতিতা। স্বাধীনতা যে বৈষম্যের কারণ নয় তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থাৎ পৃথিবীর মেরু সন্নিহিত স্থান কেন এত শীতল এবং বিষুবরেখার সন্নিহিত স্থান বা কেন এত উষ্ণ। ইহা কি বিচারের পক্ষে বক্রপথ অবলম্বন নয়? তত্ত্ব-কৌমুদীতে ঐশীশক্তি সম্বন্ধে যে তিনটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ত কথায় কথায় এই প্রণালীতে বিচার করা হইয়াছে। তবে কেমন করিয়া এই প্রণালীকে বক্রপথ বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে? তিনি বক্রপথ বলিয়া যদি উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ না করেন, তাঁহার সে স্বাধীনতা অব-শ্যই আছে। কিন্তু কথাটা অমীমাংসিত রহিয়া গেল বলিতে হইবে।

প্রাকৃতিক বৈষম্যের জন্য ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিবার হেতু নাই। কারণ ঈশ্বর মানবকে জড়বৎ কোথাও ফেলিয়া রাখেন নাই যে সে চিরকাল একস্থানেই পড়িয়া কাল কাটাইবে। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থান, মেরু সন্নিহিত স্থান, মরুময় প্রদেশ বা নিয়ত ভূমিকম্প বিশিষ্ট স্থান যদি মানবের পক্ষে একান্তই বাসের অনুপযুক্ত হয় এবং তাহা যদি নিতান্তই কষ্টকর হয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন অন্তরায় স্বরূপ হয়, তবে মানব কেন সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণ স্থানে যায় না? ঈশ্বর কি মানবকে কোন একস্থানেই চিরকাল বাস করিতে হইবে এরূপ বলিয়াছেন? বরং ইহা হইতে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন, তোমার বুদ্ধি আছে আপন কল্যাণ বুঝিবার শক্তি আছে, সুতরাং যেখানে গেলে তোমার আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়, সেখানেই তুমি যাইতে পার। শান্তিপূর্ণ স্থান বা নিরাপদ স্থানের কি অভাব আছে? তুমি যদি তোমার বুদ্ধির দোষে কুস্থানকে বাসের জন্য মনোনীত কর তাহাও কি ঈশ্বরের দোষ? বাস্তবিক শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈষম্যকে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ বলিবার কি সুবিধা আছে? ধর্ম্মলাভ সকল স্থানের লোকের পক্ষেই সম্ভবে। সকল স্থানেই ধার্ম্মিক-গণ দৃষ্ট হইতেছেন। শীতাতপ কাহাকেও আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধা দেয় না। বাহ্যিক সুখ দুঃখ এত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে যে তাহাকে গণনার মধ্যে না আনিলেও চলিতে পারে। সুতরাং প্রাকৃতিক ভিন্নতাকে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব বলিবার কি সুবিধা আছে?

সীতানাথ বাবু তাঁহার শেষপত্রে এমন কোন কোন কথা লিখিয়াছেন যাহা বাস্তবিক বলা সঙ্গত হয় নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "আদিনাথবাবুর মতে জগতে বৈষম্য কেন?" এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে বিধানবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না"। আমি এইরূপ কিছু বলিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার ভাব এই যে বিধান প্রকাশের যে রীতি সীতানাথ বাবু প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা সত্য হইলে জগতের বৈষম্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁহার কাজ। যদি তিনি তাহা দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত রীতি প্রকৃত নহে। বিধানবাদ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না এমন কি কিছু বলিয়াছি?

আর একস্থানে বলিতেছেন "আদিনাথ বাবু বৈষম্যের একমাত্র কারণ বুঝিয়াছেন মনুষ্যের স্বাধীনতা।" আমি স্বাধীনতাকে যদিও বৈষম্যের একটী কারণ বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বাধীনতাই একমাত্র কারণ এরূপ কোথাও বলিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার প্রথম পত্রে একস্থানে লিখিয়া-ছিলাম মানব যদি আপন হৃদয়স্থিত সেই অমূল্য উপদেশ ও শাস্ত্র পাঠ করিতে যত্ন করে। সে যদি তাহার নিত্য সঙ্গী ও উপদেষ্টার সাহায্য উপযুক্তরূপে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহার কোন অভাবই থাকে না ইত্যাদি। মানুষ এই স্বাধীনতাও সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতেই লাভ করিয়াছে। একমাত্র এই-স্থলে ভিন্ন আর কোথাও স্বাধীনতা কথা ব্যবহার করি নাই। এখা-নেও নিজ নিজ উন্নতি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সীতানাথ বাবুর উক্তরূপ উক্তির কোনই হেতু ছিল না। স্বাধীনতাকে বৈষ-ম্যের একটী কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু একমাত্র কারণ বলিয়া কোথাও বলিও নাই এবং স্বীকারও করি না।

মানুষের স্বাধীনতা বৈষম্যের একমাত্র কারণ না হইলেও তাহা যে একটী কারণ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানবের স্বাধীনতা অসীম নহে তাহাও সত্য। কিন্তু আধ্যাত্মিক বৈষম্য কেন হয়? আমরা দেখি যেখানে স্বাধীনতা যে পরিমাণে অধিক প্রস্ফুটিত সেখানেই অধিক বৈষম্য—উদ্ভিজ্জগতে স্বাধীনতা নাই। তাহারা একই নিয়মে বাড়ে একই নিয়মে অবস্থিতি করে। তাহাদের আকার সম্বন্ধে প্রকৃতির বিভিন্নতা হইতে যে কিছু ভিন্নতা ঘটে তাহা ভিন্ন আর কোন বৈষম্য নাই। ইতর প্রাণীজগতে পক্ষীদিগকে ত আমাদের চক্ষে একরূপই দেখিতে পাই। তাহাদের স্বাধীনতাও সামান্য ভিন্নতাও সামান্য। অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধেও এইরূপই দেখা যায়। মানুষের সংস্রবে আসাতে তাহাদের অনেক বৈষম্য ঘটে বটে। কিন্তু বনে স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাও দেখা যায় না। দেখা গেলেও মানবের মধ্যে যেমন রাত্রিদিনের মত প্রভেদ এমন প্রভেদ ত দেখিতে পাই না। এখানে স্বাধীনতা যে পরিমাণে অধিক বিকশিত বৈষম্যও তেমনি প্রবল। সীতানাথ বাবু তাহার পত্রে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেখা যাক্ স্বাধীনতা বিষয়ে তিনিই বা কি বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থের ২য় ভাগে আত্মার স্বাধীনতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাহার এই লক্ষণ লিখিয়াছেন—"মানবাত্মার নিজের শক্তি আছে, মানুষ আত্মশক্তি দ্বারা আপনাকে অন্ততঃ আংশিকরূপে পরিচালিত করিতে পারে। মানুষ অন্য কোন শক্তির সম্পূর্ণ অধীন নহে——মনুষ্যের স্বতন্ত্র শক্তি আছে" ইত্যাদি। তৎপর পাপ কি? এই প্রস্তাবে বলিয়াছেন "পাপ তবে কোথায়? স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদের ক্রোধাদি রিপুর অপব্যবহারে পাপ। মানুষ অপব্যবহার করে কেন? স্বাধীনতা আছে বলিয়া"। আধ্যাত্মিক জগতে পাপ পুণ্যের বৈষম্যই প্রধান বৈষম্য। তাহা যখন স্বাধীনতা হইতেই হয় তখন স্বাধীনতা যে আধ্যাত্মিক বৈষম্যের একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ কি? মানুষ যদি সর্ব্বাংশেই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিত, তাহা হইলে কখনও জগতে পাপ সম্ভব হইত না। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আনুগত্য হইতে পাপ হয় না। মানুষ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হয় না বলিয়াই এত গোলযোগ ও বৈষম্য। তাঁহার ইচ্ছা পাপ সৃষ্টি করে না। তবে মানুষের স্বাধীনতা যে অসীম নহে। ইহা কেহই অস্বীকার করে না সে কথাটা না বলিলেও চলিত।

সীতানাথ বাবু আর একস্থানে বলিয়াছেন "তখন আদিনাথ বাবুর নিজের মতেই আমার জানা বা অনুভব করা কেবল আমার কাজ নয়, ইহা ঈশ্বরেরও কাজ, তিনি জানাইলেন আমি জানিলাম" ইত্যাদি। এখানে সীতানাথ বাবু "কেবল" কথাটী কেন যে ব্যবহার করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। কোন বিষয় জানা কেবল আমার ইচ্ছাতে হয়, আমি কি তাহা বলিয়াছি? দুই ইচ্ছার মিলনে শিক্ষা বা কাজ হয়, ইহাই বলিয়াছি। সুতরাং "কেবল আমার কাজ" এই ভাবে কথাটী ব্যবহার করিবার কোনই হেতু দেখি না।

কোন পুরাতন সত্য লোকে যখন শিক্ষা করে, তখন তাহা তাহার পক্ষে নূতন জানা হয়। কিন্তু সেই বিষয়টী ঈশ্বরের পক্ষে নূতন সৃষ্টি নয়, বলাতে আমি নিষ্ক্রিয়তা ব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই নয় যে তিনি কখন কখন কার্য্য করেন আবার কখন কখন করেন না। কিন্তু নূতন নূতন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেন। শিক্ষার বিষয়টী নূতন নয়। তাহা তাঁহার নূতন সৃষ্টি নয়। এরূপ বলাতে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি নিষ্ক্রিয়? আমার কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। যেমন জ্যামিতি শাস্ত্র যখন নূতন প্রকাশিত হইল, তখন সেই স্রষ্টা এবং জগত উভয়ের সম্বন্ধেই তাহা নূতন। কিন্তু পরে যখন নূতন নূতন লোককে তিনি তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন তখন সেই বিষয়টী যাহারা শিখিতে লাগিল তাহাদের শিক্ষাই নূতন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দিলেন তাহার পক্ষে তখন আর বিষয়টী (জ্যামিতি শাস্ত্র) নূতন নয়। তিনি পুরাতন বিষয়ই শিক্ষা দিলেন। সেইরূপ পরমেশ্বর আত্মার সৃষ্টিকালে তাহাতে যে সকল সত্যের বীজ সৃজন করিয়াছিলেন পরে তদতিরিক্ত যদি আর কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে নূতন বিধান সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু যদি সেরূপ নূতন কিছু সৃষ্টি না করিয়াও পূর্ব্বসৃষ্ট বিষয় সকল নূতন নূতন লোককে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাকে নূতন বিধান বলা উচিত নয়। পূর্ব্বসৃষ্ট সত্যকে যে নূতন নূতন লোকে শিক্ষা করিতেছে সীতানাথ বাবু যদি ইহাকেই বিধান বলিতে চাহেন, অবশ্য তাহা বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু ইহা কখনই বিধান নামে অভিহিত হয় না। সীতানাথ বাবু যদি দেখাইতে পারিতেন, যে ঈশ্বর নিয়ত যে সকল বিষয় শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে আর কোন আত্মায় বিহিত ছিল না বা কেহ শিক্ষা করে নাই; নূতন নূতন লোকে যাহা কিছু শিখিতেছে তাহার সমস্তই নূতন—ঈশ্বরের পক্ষেও নূতন সৃষ্টি, তাহা হইলে আমি সীতানাথ বাবুর কথা মানিতে অসম্মত হইতাম না। কিন্তু যখন তিনি নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াও তেমন কিছু দেখাইতে পারিতেছেন না, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক শিক্ষাকেই নূতন বিধান বলিতে যাওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। ঈশ্বরের কার্য্যের বিশ্রাম নাই, তিনি নিয়ত শিক্ষা দিতেছেন সুতরাং ক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না।

সীতানাথ বাবু তিনটী কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার সহিত বিচার বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে—তিনি প্রথম যে কারণটী প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমার ত্রুটী স্বীকার করিতে হইতেছে। তিনি যে স্থলে ঘটনা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থলে আমার জানা শব্দ প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই। তবে এরূপ ভ্রম হইবার পক্ষে যে কোনরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহা সীতানাথ বাবুর এবারের পত্র পাঠ করিলেও বুঝা যাইতে পারে। যাউক আমি আমার পূর্ব্বপত্রে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।

সীতানাথ বাবু আমার একটী ভুল প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ আমি লিখিয়াছিলাম সীতানাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব পত্রে ঈশ্বরকে একরূপ পক্ষপাতী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ইত্যাদি। যে লেখা সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছিল সীতানাথ বাবু তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমি আর তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। সীতানাথ বাবু ঈশ্বরের অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিবার জন্য কিছু না বলিয়া যখন "যাহা হউক" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তখন কথাটী একরূপ যে মানিয়া লওয়া হইল তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভাষা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। তিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার ভাষা যদি এরূপ হয় যে ঈশ্বর সময়ে সময়ে আমাদিগকে দুঃখ দেন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা ঈশ্বরের দয়াশীলতার বিরোধী। যাহা হউক দুঃখ প্রদর্শনটা নিঃসন্দেহ। এরূপ লেখা হইতে যদি কেহ বলে যে লেখক ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা এক প্রকার স্বীকার করিতেছেন; তাহাতে আপত্তি করিবার কি হেতু আছে? সীতানাথ বাবুর ভাষাতে যাহা বুঝা যায় আমি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে আমার এমন কি ভুল হইয়াছে যে তাহা আশ্চর্য্য ভুল নামে অভিহিত হইল।

সীতানাথ বাবুর সকল কথার উত্তর দিতে হইলে পত্র আরও বড় হইয়া যায়, এ জন্য এবার এইখানেই শেষ করা গেল, আগামীতে অন্যান্য কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৫ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩ৎ
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

কামনা।

ওহে দেব, ভেঙ্গে দেও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদায় আপনারে দিই একেবারে—
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।
স্বামিন্ নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ—
ছোট হোক্, বড় হোক্ পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ।
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার
আমার কি লাজ আমি ততটুকু দিব
তুমি দেছ যে টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে
প্রেমের আলোকে দাও নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

আলো ও ছায়া

নিবেদন ও প্রার্থনা।—হে প্রাণারাম পরমেশ্বর! আমরা কি বৃথা আশার আশায় এপথে চলিয়াছি? আমাদের আশা পূর্ণ হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? এমন কি ঘটিবে যে উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি সমস্তই আমাদের কেবল পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে? মৃগ যেমন তৃষ্ণাকুলচিত্তে মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে নিরাশ হয়, আমরাও কি তেমনি বৃথা কাল্পনিক বস্তুর পশ্চাতে যাইতেছি? মরীচিকা যেমন জলাশা প্রদান করিয়া শেষে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেয়, আমাদের কি দশা তেমনি হইবে? মরীচিকার ন্যায় তুমিও কি অবস্তু? মরীচিকা যেমন বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তুমিও কি সেইরূপ। না, এমন অবস্তুর পশ্চাতে—এরূপ ছায়ার পশ্চাতে আমরা যাইতেছি না, তুমি বাস্তবিকই আমাদের প্রাণের অবলম্বন ও আরাম দাতা। তোমাতেই আমাদের বিশ্রাম এবং পরিতৃপ্তি। হে প্রভু, কবে সেই শুভ দিন আসিবে যে দিন আমরা তোমাকেই বস্তুরূপে জানিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব? এখন যে ভাবে তোমার কথা বলি বা শুনি যেন অবস্তুর বিষয়েই বলি বা শুনি। এমন অবস্থাতেই দিন যাইতেছে। হে সারাৎসার, শীঘ্র সেই দিন আনয়ন কর যে দিনে আমাদের মনের সকল ক্ষোভ দূরে যাইবে। আমরা বাস্তবিক প্রাণারাম ও পরিতৃপ্তির হেতু রূপে তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষা।—কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে সচরাচর এই একটী অভিযোগ হইয়া থাকে যে তাঁহারা অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধে উদাসীন। বিশেষতঃ মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের পুত্র ও কন্যাদিগের শিক্ষার কোন সদুপায় অবলম্বন সম্বন্ধে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ গ্রামে বা অন্যান্য নগরে থাকিয়া আপনাপন বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহার প্রতিকারের জন্য যখন বিশেষ কোন আয়োজন হইতেছে না তখন মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের এরূপ অভিযোগ করিবার যে কোনই হেতু নাই তাহা নহে। কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণ এসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন না হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেছেন না। যে অভাব মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ তীব্ররূপে অনুভব করিতেছেন, সে অভাবের প্রতিকার করা যে শুদ্ধ তাঁহাদের পক্ষেই কঠিন সমস্যা এমন নয়, কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করা একটী বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরের স্কুল এবং কলেজে, সাধারণভাবে বালকগণ শিক্ষা করিতে পারিলেও নানা কারণে এই সকল স্কুল কলেজে বালকদিগকে পাঠান সুবিধাজনক নয়। বালকদিগকে সুনীতিপরায়ণ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ের নানা প্রকৃতির বালকদিগের সহিত মিলিতে দেওয়া প্রার্থনীয় নয়। বিশেষতঃ যে সময় অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, অথচ সুপথে চালাইবার জন্য বিশেষ কোন উপায় থাকে না, এমন অবস্থায় কুসংসর্গ বিষম অনিষ্টের কারণ। শৈশবাবস্থায়

কুসংসর্গ হইতে যে বিষ তাহাদের প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার জ্বালা বহুদিন পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়; এমন কি অনেকস্থলে সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে বালকদিগের শিক্ষার বিশেষ সুব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা ও মফস্বলবাসীগণের সকলেরই অবস্থা সমান। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সকলের সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত লোক এবং অর্থসংগ্রহ ভিন্ন এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইবার আশা নাই। উপরে বালকদিগের শিক্ষার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল,বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ বিষম কাঠিন্য না থাকিলেও অন্যবিধ এমন বহু অসুবিধা আছে, যাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। এ বিষয়ে আমরা গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে আলোচনা করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা আশা করি আগামী উৎসবের সময়ে ব্রাহ্মগণের যে সম্মিলন হইবে, তাহাতে এই বিষয়ে কার্য্যতঃ কোন উপায় অবলম্বনের জন্য বিশেষ ভাবে আলোচনা হইবে। এরূপ গুরুতর বিষয়ে ব্রাহ্মগণ যদি কোন কারণে উদাসীন হন তাহার বিষম অনিষ্ট ফল প্রতি পরিবারকে বিশেষ ভাবে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং এমন সাধারণ-প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় যেন আমরা উদাসীন না হই।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার কথা উপস্থিত হইলেই একদিকে যেমন উপযুক্ত লোকের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়, অপর দিকে তেমনি অর্থাভাবের কথা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। উপযুক্ত লোকের কথা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। কারণ এখন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারাই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ইহাপেক্ষা উপযুক্ত লোক ত হঠাৎ গড়িয়া লইবার সাধ্য নাই। কিন্তু অর্থাভাবমোচন আমাদের যত্ন চেষ্টায় হইতে পারে এবং এরূপ যত্ন চেষ্টা না করিলে কখনই আপনা হইতে অর্থ সংগৃহীত হইবে না। এরূপ কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রতিও যে আমাদের ঔদাসীন্য আছে তাহা বাস্তবিকই আমাদের হীনতার পরিচায়ক। এমন গুরুতর বিষয়ের জন্যও যদি ব্রাহ্মগণ সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে উন্মুক্তহস্ত না হন, যদি এমন সাধারণ-স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যও তাঁহারা আপনাপন কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে এই ঔদাসীন্যে প্রত্যেকের ভাবীবংশীয়দিগকে যে কি বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা কি আবার বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে? আমরা আশা করি এমন সাধারণ-প্রয়োজন স্থলে অর্থ সাহায্য করিতে সকলেই আপনাপন উপযুক্ততানুসারে প্রস্তুত হইবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন সভ্য ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে সমাজের কার্য্যের জন্য আপনাপন আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রদান করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছেন, সেরূপ কোন উপায় সকলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন না করিলে কখনই উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের বিশেষ আশা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সকল বিষয়েই যদি সাধারণের সাহায্যে কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহার নামের প্রকৃত সার্থকতা হয়। সকলের মিলিত চেষ্টা ক্ষুদ্র হইলেও তাহা হইতেই মহৎ কার্য্য সাধনের সূত্রপাত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্য্যেই সামান্য হইয়াও কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছি, এরূপ চিন্তা প্রত্যেকের পক্ষে আত্ম-সন্তোষ লাভের কারণ হয়। এজন্য আমরা উক্ত প্রকারে অর্থ দানের বিশেষ উপযোগিতা অনুভব করিতেছি। সকলের প্রদত্ত অর্থ অবশ্যই সাধারণ প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অবশ্যই একটী সাধারণ-প্রয়োজনীয় বিষয়। এজন্য উক্তরূপে সংগৃহীত অর্থের কতক অংশ যাহাতে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা নির্দ্দিষ্টহারে আপনাদের আয়ের কোন অংশ সমাজের কার্য্যের জন্য দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে অতি সামান্য অর্থের সংস্থান হইতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মগণের সম্মিলনে যাহাতে এবিষয়েরও বিশেষ আলোচনা হয় এবং কার্য্যতঃ কল্যাণকর উপায় সকল অবলম্বিত হয় তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক।

মত পরিবর্ত্তন—"লিবারেল" পত্রিকায় "বিবিধ চিন্তা" প্রসঙ্গে বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন মহাশয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মসমাজ-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মধ্যবর্ত্তী পথ—অর্থাৎ নিয়মতন্ত্রপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই উপায়েই আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি। একমাত্র নিয়মতন্ত্র প্রণালীই আমাদের ধর্ম্মের অনুযায়ী—কারণ এই প্রণালীতেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। ইহা সকল লোক, সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর কল্যাণ লইয়াই গঠিত। বিশেষ আদেশ বিশেষ কার্য্যশীলতা, উচ্চতর ক্ষমতা, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রভৃতি সমুদায়ই এখানে স্ফূর্ত্তি পায়। এখানে সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিকাশ দেখিতে পাই। এইরূপ একটি সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইতে পারে না, কারণ নিয়মতন্ত্র প্রকৃতিরই বিকাশ মাত্র—যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত কার্য্য করিতেছে,—সেইখানেই বিশেষ অভাব মোচনের জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্মগ্রহণ দেখিতে পাই। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়কে কি আমরা পরিহার করিতে পারি? যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া কোন কৃতী আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়েন—আমরা কি যুক্তি তর্ক দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকে তুচ্ছ করিতে পারি? ভগবান করুন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদিগের প্রাচুর্য্য আমাদের নিয়মের অন্তর্গত হউক—শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ আমাদের সমাজের শোভা বর্দ্ধন করুন। আমাদের মধ্যে কেহ নেতা হইতে পারেন না, ইহা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক কথা—যত শীঘ্র বিশ্বাসী ভাইগণ এই ভ্রান্তি হইতে মুক্তি লাভ করেন ততই মঙ্গল।"

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন মহাশয় নববিধান সমাজের মধ্যে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার মতের যখন উক্তরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তিনি ধর্ম্মসমাজের শাসন জন্য "নিয়ম তন্ত্র প্রণালীকে যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন, তখন আশা করা যায় নববিধান সমাজের অন্যান্য বন্ধুগণও ক্রমে ক্রমে নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে সমাজের কার্য্য চালাইতে প্রস্তুত হইবেন। নববিধান সমাজের মধ্যে এখন যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় যদি তাঁহারা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে তাঁহারা সমধিকরূপে ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত এখন তাঁহাদের যে অনৈক্য আছে তাহাও আর থাকিবে না। আমরা কৃষ্ণবিহারী বাবুর এরূপ মত পরিবর্ত্তনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহার এরূপ মত পরিবর্ত্তনকে ব্রাহ্মগণের মধ্যে যে অনৈক্য আছে তাহা দূর হইবার পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি। নববিধান সমাজে কৃষ্ণবিহারী বাবুর যে প্রভাব আছে, তাহাতে সহজেই আশা হয়, তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দ্বারা নববিধান সমাজ মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তিকে এতদিন নববিধান সমাজের বন্ধুগণ যে বিদ্বেষমূলক বলিয়া অভিহিত করিতেছিলেন, এখন আর সেরূপ মনে করিবেন না এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীই যে বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী সে বিষয়ে আর তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবেনা।

একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলন—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সময় বোম্বাই নগরে ভারতীয় একেশ্বর বাদীগণেরও একটী সম্মিলন সমিতি হইবে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত সমিতির সম্পাদক মহাশয় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে একটী অনুরোধ এই ছিল যে, তাঁহারা সেই সঙ্গে উক্ত সমিতিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহাও যেন নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক মহাশয় উক্ত সমিতিতে ৫টী বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গত ১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বর্ত্তমান সময়ে সেই পাঁচটী বিষয়ের মধ্যে ১ম, ২য় এবং ৪র্থটীর আলোচনা হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। কারণ উক্ত বিষয় কয়টী সম্বন্ধে একমত হইয়া কার্য্য করিবার অবস্থা এখনও ভারতীয় একেশ্বরবাদীগণের পক্ষে উপস্থিত হয় নাই। এই সমিতিতে এমন সকল বিষয়ের আলোচনাই হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সকল সমাজ একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বোম্বে প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবিত ৩য় এবং ৫ম বিষয় এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য সমাজ সকলও এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।

১ম—একমেবাদ্বিতীয়ং—ঈশ্বরের উপাসক এবং যাঁহারা শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন না। এমন একেশ্বরবাদীগণের একটী তালিকা সংগ্রহ করা।

২য়। উক্তরূপ একেশ্বরবাদীগণের উপাসনার জন্য ইংরাজি ভাষায় একখানি উপাসনা পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন করা।

৩য়। ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ সকলের মধ্যে সম্মিলন ও সদ্ভাব স্থাপনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মনস্থৈর্য্য অস্বাভাবিক বা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

নিতান্ত চঞ্চলমতি শিশু যাহারা—যাহাদের মন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইতেছে, যাহাদিগকে অতি অল্প সময়ও একটী বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; তাহারাও যখন রূপকথা শ্রবণ করিতে থাকে, তাহাদের ঠাকুর মা কিম্বা পরিবারস্থ আর কাহারও মুখে যখন গল্প শুনিতে থাকে তখন তাহারা কেমন নিবিষ্টচিত্ত। কেমন গম্ভীর ভাবে সেই রূপকথার প্রত্যেক বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই সময় যদি কোনরূপে গল্প শুনিবার পক্ষে বাধা দেওয়া যায় কেমন তাহারা বিরক্ত হইয়া সেই বাধা প্রদানকারীর প্রতি মনের অকৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তখন কিছুতেই সেই সহজচঞ্চলমনা শিশুদিগের মনোযোগের বিঘ্ন ঘটাইতে পারা যায় না। যত বাধা পায় তাহারা আরও তত গভীর মনোযোগের সহিত সেই উপকথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এমন যে চঞ্চলমতি যাহাদিগকে একটী কাজের কথা বলিয়া অন্যত্র পাঠাইলে পথিমধ্যেই হয় ত কথাটী ভুলিয়া যায়। শিখিবার উপযুক্ত কিছু শিক্ষা দিবার সময় বহু চেষ্টা যত্ন করিয়াও যাহাদিগের মনে একটী কথা প্রবেশ করান যায় না, সেই সকল শিশুরা একবার মাত্র উপকথাটী শ্রবণ করিয়াই কেমন তাহারা আদ্যোপান্ত স্মরণে রাখিতে সমর্থ হয়। চঞ্চলমতি শিশুদিগের এই আচরণ হইতে বিশেষ রূপে জানা যাইতেছে যে বিষয়টী মনের আরামদায়ী—যাহা মিষ্ট এবং অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ এমন কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা বা একান্ত মনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে রত হওয়া কিছু বিশেষ কঠিন ব্যাপার নয়। বরং তাহাতে নিবিষ্টতার সহিত সংলিপ্ত থাকাই সহজ ও স্বাভাবিক।

কারণ শিশু যে রূপকথা শুনিতে এত মনোযোগী হয় তখন যে তাহার সকল অস্থৈর্য্য বিদূরিত হইয়া যায়, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই হয়। সেই কথা তাহার নিকট বিশেষ মিষ্ট ও আরামদায়ক বলিয়াই সে এমন গভীর মনোযোগের সহিত সেই কথা শ্রবণে সমর্থ হয়। সুতরাং আমরা যে উপাসনার সময় মনস্থির করিতে পারি না এবং যে মনস্থিরের মত কঠিন কার্য্য আমাদিগের নিকট আর কিছুই মনে হয় না; তাহার কারণ এই নয় যে আমাদের মন কোন বিষয়ে নিমগ্ন হইতে পারে না বা একান্তমনে কোন বিষয়ের অনুধ্যানে রত থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের নিকট তেমন মিষ্ট—তেমন আরামদায়ক নহেন; যেরূপ মিষ্ট ও আরামদায়ক হইলে শিশুর চঞ্চল মনও স্থির হইতে

পারে। আমরা যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট ও উপাদেয় রূপে অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে উপাসনার সময় মনস্থির করিবার জন্য এমন আয়াস করিতে হইত না। এখন উপাসনায় বসিলেই যে সকল প্রকার বিষয় চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিতে থাকে, একটির পর একটী করিয়া সকল প্রকার বৈষয়িক সুখ-চিন্তা, আত্ম-গৌরবাত্মক-চিন্তা আসিয়া মনকে বিচলিত করিতে থাকে ইহার কারণ কি? মুখে একটী মাছি বসিয়া আছে; তাহাকে না তাড়াইলে সে হয়ত খানিক পরে আপনিই উঠিয়া যাইত, কিন্তু যাই তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম, অমনি ঘুরিয়া আসিয়াই আবার মুখের উপর বসিল। যাই আবার তাড়াইলাম অমনি আবার এসে বসিল। এইরূপে মনের উপর জোর করিয়া ক্রমাগত এই যে একটীর পর একটী চিন্তা মাছির মত আসিয়া বসিতে থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের নিকট নানা প্রকার বিষয়-চিন্তা যাদৃশ আরামদায়ক সে সকল প্রিয় চিন্তাকে মনে স্থান দিতে আমরা যত ভাল বাসি, সেই পরিমাণে ঈশ্বর-চিন্তা আমাদের নিকট আরামদায়ক নয়। মনের স্বভাবই এই যে, সে সর্ব্বদাই প্রিয়তর বিষয়ের অনুধ্যানে লিপ্ত থাকিতে চায়। যাহা তাহার নিকট মিষ্ট লাগে সে বিষয়েই সে সর্ব্বদা নিযুক্ত হইতে থাকে। আমরা সকলেই জানি কোন উপন্যাস পাঠে আমরা যাদৃশ মনোযোগী হই, গণিত বা অন্য কোন শাস্ত্র পাঠে আমরা সেরূপ গভীর মনোযোগের সহিত নিযুক্ত হইতে পারি না। সুতরাং ইহা দ্বারা সহজেই জানা যায় মন প্রিয় বিষয়ের চিন্তাতেই সহজে নিমগ্ন হইয়া থাকে। তাহাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রিয় ও সুন্দর বস্তুতে মনোনিবেশ করা সহজ, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনায় কেন মন সহজে নিমগ্ন হয় না?

উপাসনার সময়ও দেখা যায় উপাসনার যে অঙ্গটী মনের যত আকর্ষণের কারণ আমরা ততই তাহাতে অধিকতররূপে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হই। সরল প্রাণে ব্যাকুলতার সহিত যখন কেহ প্রার্থনা করিতে থাকে তাহাতে মনোযোগ প্রদান অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ প্রাণে সেই ভাবটী অনেক পরিমাণে আরামদায়ক, প্রাণের আকর্ষক। সংগীত সম্বন্ধে একথাও আরও বিশেষ ভাবে খাটে। সুন্দর সুরে সুন্দর ভাবযুক্ত গান যখন বিশুদ্ধ তান লয়ের সহিত গায়ক সুকণ্ঠে গান করিতে থাকেন, তখন নিতান্ত চঞ্চলমতিও আকৃষ্ট হইয়া গভীর একাগ্রতার সহিত তাহাতে যোগ প্রদানে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই গানের কথাগুলি যদি কেহ অমনি অমনি পড়িয়া যায়, তাহাতে তত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। এখানে দেখা যাইতেছে গানের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যাহা অর্থাৎ গানের বিষয় যাহা তাহাতেই যে প্রাণ সকল সময় অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় তাহা নয়। কিন্তু মিষ্ট স্বর প্রভৃতিতেই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে মনের প্রিয় বিষয় যাহা তাহাতে বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট থাকা স্বাভাবিক এবং সহজসাধ্য। সে জন্য আর বেশী সাধন করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু তবে আমাদের প্রাণ উপাসনার সময় পরম সুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আরামদায়ক ও শান্তির প্রস্রবণ পরমেশ্বরে কেন নিবিষ্ট হয় না? কেন মগ্ন-চিত্তে তাঁহার আরাধনায় আমরা নিযুক্ত হইতে পারি না? এই ঘটনা হইতে অবশ্য এমন প্রমাণিত হইতেছে না যে পরমেশ্বর সুন্দর নহেন বা তাঁহাতে প্রাণের আকর্ষণোপযোগী কিছু নাই কিম্বা অশান্ত মনের শান্তি লাভের পক্ষে তিনি একটী বিশেষ কারণ নহেন। যাঁহার শোভার কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া চিরদিনই বর্ণনাকারীকে মনের ক্ষোভের সহিত বলিতে হইয়াছে যে, ভাষায় এমন শক্তি নাই যদ্দারা তাঁহার বর্ণনা যথাযথরূপে হইতে পারে। সে ভাব প্রকাশের জন্য এমন ভাষা নাই যে সম্যক্‌রূপে তাহা অপরের হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে। কবির কবিত্ব সেখানে পরাস্ত হইয়াছে! চিরদিন সাধু ঈশ্বর ভক্তগণ মধুলুব্ধ মধুকরের ন্যায় যাহাতে নিমগ্ন হইয়া, বাহ্যিক সকল সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহাতে নিমগ্ন হইতে না পারি, আমাদের মন যদি সে মধুপানে বিমুগ্ধ হইতে না পারে, তাঁহার উপাসনায় সুস্থির চিত্তে নিযুক্ত হইতে না পারে, তবে ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইবে না যে তিনি সুন্দর নহেন বা তাঁহার মাধুর্য্যের কিছু অভাব আছে! ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে আমরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাই নাই। আমাদের প্রাণ তাহাতে নিমগ্ন হইবার জন্য ব্যাকুল নহে।

সুন্দর বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া—মিষ্ট যাহা তাহার আস্বাদনের জন্য লালায়িত হওয়া যখন স্বাভাবিক এবং পরমেশ্বরও যখন পরম সুন্দর ও রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, তখন কেন আমাদের মন তাঁহাতে সহজে নিমগ্ন হয় না? এমন পরমসুন্দরের উপাসনা করিবার জন্য কেন লোককে আবার অনুরোধ উপরোধ করিতে হয়, কেন লোকের পক্ষে উপাসনা করা এত কঠিন কার্য্য হইয়া পড়ে যে বিশেষ সাধন ভিন্ন কেহই প্রকৃতভাবে তাহাতে নিমগ্ন হইতে পারে না? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই একটী কারণ সর্ব্বদাই মনে হয় যে, আমরা যেরূপ সংসর্গে অধিক সময় যাপন করি ক্রমে তাহাতেই অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হই এবং তাহাই ভাল লাগে। তাহাতেই মন আবদ্ধ থাকে। মন যে সেই সেই বিষয়ে অধিক নিমগ্ন হয়, তাহার প্রধান কারণ সে তাহার অতিরিক্ত আর কিছু সুন্দর বস্তুর সন্ধান জানে না, বা তাহার সহিত অন্য কিছুর ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। আমরা জন্মাবধি বাহ্যিক বিষয়ের পরিচয়ই লাভ করিয়া আসিতেছি। যাহা চক্ষে দেখা যায় না অথচ সুন্দর, যাহা স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না অথচ যাহার সহিত সংযুক্ত হইলে প্রাণ আরাম লাভ করে, যাহা বাহিরের রসনা আস্বাদন করিতে পারে না, অথচ যাহার মত সুমিষ্ট আর কিছুই নাই, তাহার পরিচয় আমরা কোথায় পাই? জন্মিয়াই দেখি পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি প্রিয় পরিজন। তাঁহারাই রোগে পরিচর্য্যা করেন, শোকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাঁহারাই সকল সময় কাছে থাকেন। সুতরাং মন সহজেই এই সকল বাহ্যিক বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। এসকল বিষয়ের সহিতই ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা হয়। এতদতিরিক্ত কিছু যে আছে তাহার সন্ধান আমরা পাই কই? তাহার সন্ধান কে আমাদিগকে বলিয়া দেয়? যখন একটু সুবুদ্ধি হয়—যখন বাহ্যিক বিষয় ছাড়া

আর কিছু আছে বলিয়া বুঝিবার জন্য মনের একটু গতি হয়, তখনও কি আমরা সে চেষ্টায় অধিক সময় যাপন করি? দিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা বা একঘণ্টা না হয় দুই ঘণ্টা সে চিন্তা ও সে চর্চ্চায় যাপন করিলাম। কিন্তু বাকী ২২।২৩ ঘণ্টা যে বাহ্যিক বিষয়ের অনুধ্যানেই যায়, বাহ্যিক সুখের সেবাতেই যায়। সুতরাং আমাদের প্রাণ এই সকল বাহিরের বিষয়েই যে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, এসকল বাহ্যিক বিষয়েই নিমগ্ন থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এখন আমাদিগকে যদি সেই বিষয়াতীত সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে হয়, যদি তাঁহার উপাসনাও ধ্যান ধারণায় বিশেষভাবে নিমগ্ন হইতে হয়, তাহা হইলে এত কালের যে অভ্যাস,তাহার সহিত বিশেষভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে। বহুদিনের অভ্যাসে যাহাদের সহিত একান্ত সখ্যতা জন্মিয়াছে, তাহাদিগের আকর্ষণকে—সেই সকল প্রিয় চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম যিনি তাঁহার চিন্তা ও তাঁহার প্রসঙ্গে অধিক সময় যাপন করিতে হইবে। সংগ্রাম দ্বারা পূর্ব্ব শিক্ষা, ও অভ্যাসকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার স্থানে নূতন বিষয় ও প্রিয়তম বিষয়কে বসাইতে হইবে। এজন্য যে সাধনের প্রয়োজন তাহা কখনই সামান্য নয়; এজন্য যে চেষ্টা তাহা কখনই অন্য বিষয়ের চেষ্টার মত হইলে চলিবে না। কারণ বহুকাল আমরা মন্দ সংসর্গ ও শিক্ষায় বিকৃত ও হীন হইয়া পড়িয়াছি। যেমন আমাদের পূর্ব্ব অভ্যাস সকল বহুকালের ও অত্যন্ত বলবান, তেমনি আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রাণের টানে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যে বিশেষ কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই কঠিন কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং মনকে জোর করিয়া বার বার সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে কার্য্য এক সময় আনন্দকর ছিলনা, তাহা প্রাণের বিশেষ আরামের কারণ হইয়াছে—প্রাণের তৃপ্তিকর বিশ্রামের হেতুস্বরূপ হইয়াছে। উপাসনা কখনই আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অভ্যাস দোষেই যাহা কিছু কঠিন এবং অপ্রিয় বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে। একবার উপাস্যের সহিত পরিচয় হইলে আর মন সহজে তাঁহার সংসর্গ ছাড়িতে চাহিবে না। তখন সহজ-চঞ্চল মধুকর যেমন মধুর আস্বাদন পাইয়া একবারে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হয়, আমাদের প্রাণও পরম মধু-স্বরূপ পরমেশ্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে চির-বিশ্রাম লাভ করিবে।

বিশেষ বিধান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ বিধান সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি গুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবারে অবশিষ্ট আপত্তি গুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহার মধ্যে একটী এই —

"যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে বিধান বলা হইয়া থাকে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিকাশও বলা যায় না। কারণ জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি এক একটী বিশেষ ভাবের প্রচারকগণ ঐ সকল ভাব ভিন্ন অন্য ভাবও প্রচার করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা অন্য পথাবলম্বীদিগের প্রদর্শিত পথ পথই নয়, তদ্দ্বারা ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াও সেই সেই পথাবলম্বীদিগকে নিজপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমানের "কার্য্য সর্ব্বদাই পূর্ণতা ও সর্ব্ব প্রকারের উপাদান সম্পন্ন হইবে। যখন জ্ঞানের বিধানে ভক্তি ছিল না বা ভক্তির বিধানে জ্ঞান ছিল না, তখন এমন অসম্পূর্ণ কার্য্য কখনই ঈশ্বরের হইতে পারে না।"

ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে কোনও একটী বিধানকে ভক্তিপ্রধান বা বিশ্বাসপ্রধান বলিলেই তদ্দ্বারা কেবল ঐ একটী বিশেষ ভাব প্রচারিত হইয়াছে, আর কিছু হয় নাই এরূপ বুঝায় না। ঐশ্বরিক ভাব সকল এমন প্রকৃতির যে উহারা প্রায়ই একটীকে ছাড়িয়া আর একটী থাকিতে পারে না। বিধানের মধ্য দিয়া নানা ভাব প্রকাশিত হয়, তবে স্থল বিশেষে কোনও বিশেষ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইতে পারে এই পর্য্যন্ত। আর মানুষ এক পথকে পথই নয় বলিলেই, তদ্দ্বারা কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিলেই যে ঐশ্বরিক বিধানের বিধানত্ব চলিয়া গেল ইহারও কোন অর্থ নাই। অপূর্ণ মানুষের মীমাংসা যে একেবারে ভ্রমশূন্য হইবে এমন কথা কে বলিল? তুমি আমি কোনও বিধানকে অকার্য্যকর বলিলাম বলিয়াই যে তাহাতে ঈশ্বরের সত্য নাই এমন কথা বলা যায় না। আর যদি তাহাতে ঐশ্বরিক সত্য না থাকে, তবে সেই সত্যের প্রকাশকে বিধান বলিব না কেন? উহার মধ্য হইতে মানবীয় ভ্রম, অপূর্ণতা বাদ দিয়া যেটুকু প্রকৃত সত্য পাইব তাহাই ঈশ্বরের বিধান বলিয়া গ্রহণ করিব। অপরদিকে কোনও বিধানের দ্বারা কোনও বিশেষ ভাব প্রচারিত হইয়াছে বলিলেই বিধানকে, ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালীকে অসম্পূর্ণ বলা হয় না। আমরা গতবারে বলিয়াছি যে পরমেশ্বর যে সময়ের জন্য যাহা ঠিক আবশ্যক, তাহাই বিধান করেন। ইহাতে অপূর্ণতা দূরে থাকুক বরং পূর্ণতা ও জ্ঞানই প্রকাশ পায়। সকল সময়ের জন্য সকল পদার্থের প্রয়োজন হয় না। মহাত্মা চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের যেরূপ শুষ্ক অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে সে সময়ে ভক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তিনি বিশেষ ভাবে ভক্তিই প্রচার করিয়া ছিলেন। অথচ তিনি যে পবিত্রতা প্রচার করেন নাই এরূপ কথা বলা যায় না; এবং তৎকালে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানীও অতি অল্পই ছিল। যে সময়ে ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন সেই সময়েই ভক্তি বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কোথায় আমরা ত বুঝিতে পারি না। কাহারও নিকট একটু পানীয় জল চাহিলে সে যদি সেই সঙ্গে আমার আহার ও শয়নের আয়োজন পর্য্যন্ত করিয়া না দেয় তবে কি তাহার জল দান অসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে?

বিশেষ বিধান সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি এই ;—

"নিত্য চৈতন্যময় যিনি, তাঁহার পক্ষে দুই শত পাঁচশত বৎসর পরে পরে বিধান প্রেরণ কখনই সম্ভবে না।" "উদাসীন বা সকল অবস্থা যাঁহার জ্ঞান গোচর হয় না, তাঁহার পক্ষে কখন কখন জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথা সাজে।" কিন্তু নিত্য জ্ঞানময় নিত্যক্রিয়াশীল ঈশ্বরের কার্য্য এরূপ হইতে পারে না।

আমরা "ঐশীশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ বিধানের যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই স্থলে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে যখন কোনও স্থানে অসত্য ও পাপ প্রবল হইয়া উঠে, তখন স্বাভাবিক নিয়মের বলেই জনসমাজে ঘোর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, এবং মানবের প্রকৃতি-নিহিত দেবভাব সকল পাশব শক্তির উপর আধিপত্য সংস্থাপনের জন্য বিষম সংগ্রাম উপস্থিত করে। তখন আত্মার আধার-ভূত ঐশী শক্তি ধর্ম্ম-বিধান বা সমাজবিপ্লবরূপে প্রবল ঝটিকার ন্যায় আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে প্রবল হইয়া উঠে, তাঁহারাই বিধান প্রবর্ত্তক ও প্রচারকরূপে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপ ঘটনাকে যদি কেহ বিধান ও বিধান-প্রবর্ত্তক-প্রেরণ বলেন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে ঈশ্বর জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন বা অজ্ঞ; এবং বহু বৎসর পরে পরে হঠাৎ জগতের দিকে দৃষ্টি পড়াতে জগতের দুঃখ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা অপরিবর্ত্তনীয় এবং তাঁহার ইচ্ছাই নিয়ম। মানুষের বিভিন্ন ইচ্ছা সকল যেমন অনেক সময় পরস্পরের বিরোধী হয়, তাঁহার ইচ্ছা সেরূপ নহে এবং তাঁহার ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছার ন্যায় অব্যবস্থিত (whimsical) নহে। পাপ বিনাশ সম্বন্ধে দেবভাবের প্রতিক্রিয়াই তাঁহার নিয়ম। যে ভাবে মানব চরিত্রের বিকাশ হয়, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে পরমেশ্বর মানুষকে যেটুকু স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার উপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষ সেই স্বাধীনতা অনুসারে সুপথ বা কুপথ অবলম্বন করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি যেরূপ অনন্ত, অবনতি সেরূপ নহে। অবনতির একটা সীমা আছে। সেই সীমায় উপনীত হইলে অথবা তৎপূর্ব্বেই তাহার প্রকৃতিস্থ দেবভাবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহার আত্মা পাপের পথ ছাড়িয়া পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। মানুষের এই স্বাধীনতা টুকু না থাকিলে ধর্ম্মজীবনের কোনও সৌন্দর্য্যই থাকিত না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন দেখা যায় যে কেহ কেহ এই স্বাধীনতার সুবিধা পাইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ঘোর পাপাচারে রত থাকে, সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও যে তাহার অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে, অর্থাৎ কোনও একটী বিশেষ সমাজের লোকও যে সেইরূপ বহুদিন পর্য্যন্ত পাপ, অন্যায় ও অসত্যের পথ অবলম্বন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবং এরূপ ঘটনা যে জনসমাজে মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। ইতিহাসে ইহার প্রমাণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কারের পূর্ব্বে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সদেশের এবং মহাত্মা চৈতন্য ও রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে এইরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ক্রমে লোকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মীলিত হইতে থাকে এবং যখন অনেকের হৃদয় সমাজস্থ পাপ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তখন তাহাদেরই মধ্য হইতে বিশেষ ক্ষমতাশালী বিশ্বাসী ও সাহসী ব্যক্তিগণ উত্থিত হইয়া বজ্রধ্বনিতে ঐ সকল অন্যায় অসত্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ক্রমে দুই চারিজন করিয়া লোক তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে থাকে। নবপ্রকাশিত সত্যের বলে বলীয়ান্ ও পরস্পরের সহানুভূতি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা সিংহবিক্রমে অসত্য ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকেন। বাঁধ বাঁধিয়া জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে প্রথমে কিছুদিন সেই বাঁধের নিকট জল সঞ্চিত হইতে থাকে এবং বাঁধের নিকটস্থ জলের স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যখন ঐ সঞ্চিত জলরাশির ভার বাঁধের প্রতিরোধক শক্তি অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে, তখন প্রথমে উহার দুই এক স্থান ভগ্ন হইয়া জল নির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ স্রোতের বলে বাঁধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ঐরূপ দুই চারিটী ক্ষুদ্র স্রোত একত্রিত হইয়া বর্দ্ধমান বেগে ছুটিতে আরম্ভ করে, ও অবশেষে ঐ স্রোত এরূপ ভীষণ বেগ ধারণ করে যে, উহা সকল প্রতিবন্ধক চূর্ণ করিয়া আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লয় এবং যতক্ষণ না বাঁধের উভয় দিকের জলের ভারের সমতা হয় ততক্ষণ জলস্রোত পূর্ব্বের ধীর গতি পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ জনসমাজে যখন বহুদিনের অন্যায় অত্যাচারের পর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে দুই একজনের চরিত্রে তাহা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; ক্রমে বিশ্বাসিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত উহা এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে সেই সমবেত শক্তির নিকট সকল বাধা বিঘ্ন পরাস্ত হইয়া যায় এবং যতদিন না উহার কার্য্য সিদ্ধ হয় ততদিন উহার তেজ সমতা প্রাপ্ত হয় না। এই জন্যই আমরা বলি, যে, বিধান প্রকাশের সময় বড় সুসময় এবং যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় ইহার স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়েন তাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্। এই সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল দেবভাবের সঞ্চিত তেজঃ প্রভাবে, নবপ্রকাশিত পুণ্যাদর্শের অদ্ভুত শক্তিতে ও পরস্পরের সহানুভূতিজনিত উৎসাহের বলে বিশ্বাসিগণের প্রাণে এমন এক আশ্চর্য্য ও অভিনব শক্তি উদ্ভূত হয়, বহুদিনের অন্ধকারের পর সত্য ও পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণে এত ব্যাকুলতা ও উৎসাহ জন্মে যে, অন্য সময় যে কার্য্য সাধন করিতে অনেক দিন লাগে, এই সুসময়ে তাহা অল্পদিনেই সম্পন্ন হইয়া যায়। পরমেশ্বর যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়া, কেহ কেহ অনেক দিন ধরিয়া পাপের পথে পরিভ্রমণ করে, সামাজিক

জীবনেও সেইরূপ তিনি আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়া কোন কোন সমাজ অনেকদিন ধরিয়া অসত্য ও পাপের মধ্যে পড়িয়া থাকে। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন দেবভাবের প্রতিক্রিয়া দ্বারা জীবনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ দেবভাবের প্রতিক্রিয়াদ্বারা ধর্ম্ম বিপ্লব বা ধর্ম্ম-বিধান সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। মানবজীবন পর্য্যালোচনা করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহাই বিধাতার কার্য্যপ্রণালী বলিয়া বোধ হয় এবং একথা বলিলেই এরূপ বুঝায় না যে ঈশ্বর উদাসীন হইয়া বসিয়া আছেন, হঠাৎ জগতের দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে ব্যথিত হইয়া একটী বিধান প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাই নিয়ম। তাঁহার ইচ্ছার বা নিয়মের কার্য্য নিয়তই চলিয়াছে। মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁহার নিয়ম বিরুদ্ধ। তন্নিবন্ধন কোন কোন লোক বা সমাজ কিছুদিন পাপ ও অসত্যের মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং তাঁহারই নিয়মে দেবভাবের প্রতিক্রিয়াদ্বারা অল্প বা অধিক দিন পরে সেই সেই লোকের হৃদয়ে বা সেই সেই সমাজে সত্য ও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ কথা বলিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও নিত্য ক্রিয়াশীলতায় কেন দোষারোপ করা হইতেছে মনে করা হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একটী কথা। মানব সমাজের নিয়ম ও ঈশ্বরের নিয়মে একটু প্রভেদ আছে। মানব সমাজে ব্যবস্থাপক সভা নিয়ম প্রচার করিলেন, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারিগণ তাহা দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন, সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল। ঈশ্বরের নিয়ম ঠিক্ এরূপ নহে। অনেকের মনে ঈশ্বরের নিয়ম সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আছে যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে কতগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতেই জগতের কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কথা তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছাই নিয়ম, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই জগতের কার্য্য সুনিয়মে চলিতেছে। এক নিমেষের জন্য তাঁহার এই শক্তির বিরাম হইলে জগৎ থাকিতে পারে না। জগতের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে, আমাদের প্রতি নিশ্বাসে, আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটী কীটাণুর ও জন্ম বা মৃত্যু হয় না। তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ ব্যতীত আমরা সাধুতার পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। তাঁহার ইচ্ছা বা শক্তির প্রকাশই বিধান। এই অর্থে প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি জগতের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিতেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানুষের স্বাধীনতা বলিয়া একটা জিনিস আছে। এই স্বাধীনতার জন্য তাঁহার শক্তির, প্রকাশ স্থল বিশেষে কিছুদিনের জন্য বদ্ধ থাকে, উহা নিস্তব্ধ ভাবে বলসঞ্চয় করিতে থাকে ও অবশেষে দেবভাবের প্রতিক্রিয়ারূপে উহা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই অপ্রকাশের অবস্থায় উহার কার্য্য বন্ধ থাকে না। কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা শক্তি-ব্যতীত আমরা একদণ্ডও বাঁচিতে পারি না। যখন বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে ও বিশেষ কারণ পরম্পরার সমবায়ে বিশেষ ভাবে এই আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখনই আমরা আমাদের দিক্ হইতে, জনসমাজের দিক্ হইতে উহাকে বিশেষ বিধান বলি। এই বিশেষ বিধানের মতের সহিত ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, অপরিবর্ত্তনশীলতা বা নিত্য ক্রিয়াশীলতার কোনও বিরোধ নাই।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীরামপুর।

বিগত ১৭ই কার্ত্তিক শনিবার ও ১৮ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে পর কীর্ত্তনের দল উৎসাহেরসহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্ম-সমাজ ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। শতাধিক লোক কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রায় ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া নগরের পথে পথে বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিয়া সায়াহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সকলে সমাজ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। নগেন্দ্র বাবুর অন্তঃস্থল-স্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বৎসর মন্দিরে মহিলাদিগের বসিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ মহিলাগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। উৎসবের এই শনিবার রাত্রের ব্যাপারে তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মেরদিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্নে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব" সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী মহাশয় সায়ংকালের উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশ উপাসকমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।

অপরাহ্নে দরিদ্রদিগকে পয়সা মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। এ বৎসর অনেক গরীব লোক উপস্থিত হওয়ায়, অন্যান্য বৎসর হইতে তাহারা কম পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এবারকার উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় প্রধান জমিদার বাবু হেমচন্দ্র গোস্বামী ও বাবু রাজেন্দ্রলাল গোস্বামী এবং বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ নানাভাবে সমাজকে সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নেতা মহাশয়গণ যে এতদূর উদারভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন তাহা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

খালড়।

নিম্নলিখিত প্রকারে খালড় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৯এ কার্ত্তিক সোমবার বৈকালে সংকীর্ত্তন ও উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা। ২০এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, ধ্যান, সংকীর্ত্তন ও রাত্রে উপাসনা। উৎসবের দিন দুই বার বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক ও একবার বাবু রসিকলাল রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অন্যান্য দিন প্রিয় বাবুই উপাসনা করেন।

বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিকটস্থ চন্দ্রপুর গ্রামে বাবু লালবিহারী পালের বাড়ীতে যাইয়া উপাসনা হয়। উপাসনান্তে লালবিহারী বাবু উপাসকদিগকে প্রীতিভোজন করান।

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা।—বিগত ৭ই আশ্বিন রবিবার বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন সামাজিক উপাসনান্তে খুলনা জেলার অন্তর্গত উৎকুল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ধর্ম্মরাজ্যে নবপ্রবিষ্ট বন্ধুর প্রাণে দিন দিন ধর্ম্ম পিপাসা প্রবল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বিবাহ—বিগত ২৩এ আশ্বিন মঙ্গলবার বরিশাল নগরে একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বয়স অনূন ২৫ বৎসর। ইনি খুলনা জেলার অন্তর্গত নলধা মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করেন। কন্যার নাম শ্রীমতী কাদম্বিনী সেন, বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। ইনি বরিশালের অন্তর্গত লাখুটীয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ২য়া কন্যা। স্থানীয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান প্রাপ্তি—কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিগণের হস্তে এককালীন একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই টাকার সুদ দ্বারা দরিদ্রদিগের সহায়তা করা হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে এই অযাচিত দান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে যেসকল কার্য্য করেন তাহা তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"৩০এ অক্টোবর বুধবার—অদ্য অপরাহ্নে কাশীর শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের ভবনে (যেখানে প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে) ব্রহ্মোপসনা হয়। উপাসনা-স্থলে বড় অধিক সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন না। উপদেশে পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা এই উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করা যায়। তাহাতে বলা যায় যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বলা যায় বা করা যায় সমুদায় বাহিরের ব্যাপার, প্রাণবিহীন ক্রিয়ামাত্র। সে রূপ ধর্ম্ম সাধন কেবল মৃতধর্ম্মের শব বহন মাত্র।

৩১এ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে উক্ত মহাশয়ের ভবনে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যায়। তাহাতে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি মত বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

১লা নবেম্বর শুক্রবার কাশীর বাঙ্গালিটোলাস্থ স্কুলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সামাজিক উন্নতির ইতিহাস বিষয়ে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা করি।

২রা নবেম্বর শনিবার কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরি নামক প্রকাশ্য স্থানে পশ্চিমে ধর্ম্ম বিপ্লব ও তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি Religious Revolution in the West—what does it teach us এই বিষয়ে লাহোরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করি। এই সভাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। কাশীর সুবিখ্যাত ও সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামকালী চৌধুরি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই ছিল যে পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় প্রদেশ এক মহা বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের এক নবধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৩রা নবেম্বর রবিবার—অদ্য মধ্যাহ্নে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবার দিন। কিন্তু Benares Union নামক ছাত্রদিগের সভাদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রাতে উক্ত Carmichael Libraryতে তাহাদের সভাতে Duties and Responsibilities of Educated Indians বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিতে হয়। সেই বক্তৃতা করিয়াই লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি।

৫ই নবেম্বর মঙ্গলবার—অদ্য লক্ষ্ণৌনগরে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী বসু মহাশয়ের বাসাতে ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। উপাসনাস্থলে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের মর্ম্ম এই—যে চরিত্র ব্রহ্মেতে স্থিত নহে অর্থাৎ যাহার মূল ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা সত্যে ও সাধুতাতে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকে না। দুইটী পদ্ম ফুল সরোবরের জলে ভাসিতেছে, একটীর মূল মৃত্তিকাতে আবদ্ধ, আর একটীর মূল ছিন্ন। ক্ষণেক পরে হঠাৎ এক স্রোত আসাতে যেটীর মূল ছিন্ন ছিল সেটী ভাসিয়া গেল। এইরূপ যে সদনুষ্ঠানের মূল ঈশ্বরে আবদ্ধ নয় তাহা ঘটনাও প্রলোভনের স্রোতে ভাসিয়া যায়।

৬ই নবেম্বর বুধবার—অদ্য লক্ষ্ণৌএর Refiam Hall এ Religious Revolution in the west—what does it teach us বিষয়ে কাশীতে যে ইংরাজী বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাই প্রদর্শন করি।

৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার। অদ্য লক্ষ্ণৌএর Rueen's School নামক স্কুলের হলে "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" এই বিষয়ে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করি। বক্তৃতাস্থলে বহুসংখ্যক বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ভারতে প্রাচীন ও নবীনে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এই বিরোধে প্রাচীন পরিবর্ত্তিত হইয়া নবীন সেই স্থান অধিকার করিতেছে। এই সময়ে ভারতের ধর্ম্মভাবকে নবীন প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজন হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

৮ই নবেম্বর শুক্রবার অদ্য প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদে উপস্থিত হই।

১০ই নবেম্বর রবিবার। অদ্য প্রাতে এলাহাবাদ সমাজে ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্মালোচনা হয়। সায়াহ্নে কাটরা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা এলাহাবাদের Students Association এর সভ্যদিগের অনুরোধে এখানকার কায়স্থ পাঠশালা নামক স্থানে এক ইংরাজী বক্তৃতা করি। বক্তৃতার বিষয়—Rammohun Roy, the Pioneer of Indian Reform ইহাতে রাজার জীবন চরিত্র আলোচনা করা হয়।

১২ই নবেম্বর মঙ্গলবার। এলাহাবাদের বালিকাবিদ্যালয়ে ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব বিষয়ে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা হয়। নিরাকার উপাসনা যে সম্ভব ও সাকার উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিরাকার উপাসনার যে প্রণালী কি তাহা নির্দ্দেশ করা উক্ত বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল।

১৬ই নবেম্বর প্রাতঃকালে জব্বলপুরে উপস্থিত হই। আমার আসিবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভাই লছমন প্রসাদ সেথানে আসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৬ই নবেম্বর শনিবার ভাই লছমন প্রসাদ জব্বলপুরের চার্চ্চ মিশন স্কুলে হিন্দীতে একটী বক্তৃতা করেন। যুবকগণের কর্ত্তব্য বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তৃতাস্থলে সেথানকার কলেজের অনেকগুলি ছাত্র ও কয়েক জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা দীর্ঘ হয় নাই। কিন্তু সেই স্বল্পপরিসর বক্তৃতাতে যুবক দলের মনের উপরে অনেক কাজ হইল বলিয়া বোধ হইল। বক্তৃতান্তে যুবকগণ বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৭ই নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্নে আমরা খাণ্ডোয়াতে পৌছি।

১৮ই নবেম্বর সোমবার এখানকার Morris Memorial Hallএ ভাই লছমন প্রসাদের এক হিন্দী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতার বিষয় "জীবনের উদ্দেশ্য"। বক্তৃতাস্থলে এখানকার ভদ্র লোকদিগের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সচরাচর এখানে এত লোক প্রায় একত্রিত হন না। ১৯এ নবেম্বর আমার এক ইংরাজী বক্তৃতা হয় বিষয় The Brahmo Samaj: its History and its Principles

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়—

বিগত ১৬ই কার্ত্তিকের "তত্ত্বকৌমুদীতে" এবং কয়েক সংখ্যক "মেসেঞ্জারে" "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপন আপন আয়ের কত অংশ প্রদান করিবেন" এসম্বন্ধে আলোচনার বিষয় পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং আশান্বিত হইয়াছি। যে শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে এই বিষয়ের নূতন অবতারণা হইয়াছে যে শুভদিনে ব্রাহ্মের হৃদয়ে এই অত্যাবশ্যকীয় চিন্তার অভ্যুদয় হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সেদিনের কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে! ব্রাহ্মসমাজ যে সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাভাবে তাহা অসম্পন্ন রহিয়া যাইতেছে, ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের অপদার্থজীবনের উপর তীব্র ধিক্কার উপস্থিত হয়! এ হতভাগ্য দেশ চির-দুর্দ্দশার রঙ্গভূমি। এই অনন্ত অভাব ও ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজ্যে মঙ্গলময় বিধাতা পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন উৎকট রোগ, তেমনি মৃত-সঞ্জীবনী মহৌষধ! কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এহেন পবিত্র, মহান্ দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া ব্রাহ্মগণ আত্মসুখে বিভোর! অশিক্ষিত মানব জীবনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কোটী কোটী স্বদেশবাসীর জ্ঞানদানের ভার, পুঞ্জ পুঞ্জ কুসংস্কার নাশ করিয়া বিশুদ্ধতর নীতি প্রচারের ভার, স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূরীকরণের ভার, বিধবার অশ্রু মুছাইবার ভার, অসহায় বালক বালিকার শিক্ষার ভার, অন্ধ খঞ্জ দীনহীনের সেবার ভার এবং পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত সুসমাচার জগৎময় প্রচারের সুমহান্ ব্রত পিতা যে ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে দয়া করিয়া অর্পণ করিয়াছেন, অর্থাভাবে সেই সমাজের এই সমস্ত গুরুতর কার্য্যের কথা দূরে থাকুক মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচারকেরও অন্ন জোটে না এ লজ্জা রাখিবার স্থান ব্রাহ্মের নাই। দূরে যাইবার দরকার নাই, এ দেশে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা নিস্বার্থতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। একবার গিয়া ক্যামাক ষ্ট্রীটের "ভগ্নী সম্প্রদায়ের" Little sister of charity অনুষ্ঠিত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আইস; ভিন্ন দেশীয়েরা এদেশের জন্য কি করেন আর আমরা এহেন ধর্ম্ম লাভ করিয়া কি করি। একবার মুক্তি ফৌজ দলের (Salvation Army) সৎকীর্ত্তির কথা স্মরণ কর, সহস্র সহস্র সাধুহৃদয় ব্যক্তি যথা সর্ব্বস্ব সপিয়া দিয়া জগতে কি অত্যাশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। খৃষ্টের শিষ্য দলকে ছাড়িয়া একবার পুরাতন হিন্দু এবং জৈনাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ কর, তাহাদের ধর্ম্মের জন্য দানের তালিকা গ্রহণ কর; উন্নত ধর্ম্মাভিমান লজ্জায় মুখ লুকাইবে। আমাদের প্রচারক পরিবারের অন্ন জোটে না; ব্রাহ্ম বালক বালিকার সুশিক্ষার কি ভয়ানক অভাব। আমরা প্রচারককে সেণ্ট পলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়া নিজে বিলাসতরঙ্গে ভাসিতেছি। এ সব গভীর মনোবেদনার কথা। ব্রাহ্ম সমাজে ধনবান লোকের

অভাব আছে একথা বিশ্বাস করি না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কি এত কম যে কোন প্রকার ব্যয়-সাধ্য-কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না—একথা আরো অমূলক। তবে এদশা কেন? আমরা স্বার্থের অন্ধকারময় নীচতম, ঘৃণিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। পিতাকে গ্রাহ্য করি না, ভালবাসি না—তাই তাঁহার কার্য্য ভাল করিয়া চলিতেছে না।

ভগবানের কৃপায় শুভ দিন আসিয়াছে, ব্রাহ্ম জীবনে প্রীতির আলো পতিত হইয়াছে তাই এ শুভ আন্দোলনের অভ্যুদয়। ব্রাহ্ম বহুদিনের বাক্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাই আজ ছুটিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবার আনন্দের সঙ্গে প্রিয়তম ব্রাহ্ম সমাজের জন্য নিজ আয়ের প্রস্তাবিত সামান্য অংশ অকাতরে দান করিয়া তাঁহার সমাজের গুরুতর কর্ত্তব্য সমূহ সম্পন্নের সহায়তা করিবেন। ২৫ টাকার অনধিক যাঁহার আয় তাঁহাকে টাকায় এক পয়সা এবং তদূর্দ্ধ আয়সম্পন্ন লোকদিগের প্রতি টাকায় দেড় পয়সা দান অতিশয় সামান্য, অথচ এই সামান্য দানের উপর দেশের এবং সমাজের মহোপকার নির্ভর করিতেছে। পিতার রাজ্যে এমন কে আছে, এই শুভ প্রস্তাবে আপত্তি তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মলিনমুখে আরো কালী লেপিবে? শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি, এমন লোকেরও নাকি অভাব নাই! দয়াময় পিতা এই অধঃপতিত জাতির সহায় হও, এ কলঙ্কিত জাতির কলঙ্ক দূর কর।

ব্রাহ্মসমাজময় এ শুভ আন্দোলন উত্থিত হউক। মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী। তখন দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের মহাসম্মিলন হইবে। সেই মহাসম্মিলনে এই সাধুপ্রস্তাব উপস্থিত করা হউক। সে শুভ সম্মিলনে সকলে এক মন হইয়া এ শুভ প্রস্তাবে অবশ্যই সম্মতি দিবেন, ইহাতে কে সন্দেহ করিবে?

নলহাটী ব্রাহ্মসমাজ } অনুগত গরিব

সবিনয় নবেদন,

মহাশয়—

অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষেরা এই একটি মাত্র যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নিম্নবর্ণের সহিত উচ্চবর্ণের বিবাহ হইলে উচ্চবর্ণ সম্ভূত ব্যক্তিদিগের জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের অবনতি হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, ভারতবর্ষে এরূপ উচ্চবর্ণ বস্তুতঃ নাই; কারণ উচ্চ বলিতে নীতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা বুঝায়, কিন্তু এদেশে যখন নীতিমানের কন্যার সহিত দুর্নীতিমান পাত্রের, জ্ঞানীর কন্যার সহিত অজ্ঞানীর বিবাহ হইতেছে, তখন গুণজাত উচ্চতা নিম্নতা আর নাই। তবে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি ভেদ রহিয়াছে, তাহা কেবল শব্দের ভেদ, বাস্তবিক নহে। বাস্তবিক ভেদ রক্ষা করিতে হইলে নির্গুণের সহিত গুণবাণের বৈবাহিক সম্বন্ধ কখনই হইতে দেওয়া উচিত নহে। এবং এরূপ হইতে দিলে কখনই বংশের উচ্চতা নিম্নতা থাকে না। আর এরূপ ভেদ যে নাই ফলেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণ বংশে অব্রাহ্মণোচিত পুত্র জন্মিতেছে, এবং অন্যপক্ষে শূদ্রবংশে ও ব্রাহ্মণোচিত গুণান্বিত পুত্র উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণকে উচ্চ বংশজাত বলাও যাহা সোণার পাথরের বাটী বলাও তাহা। কোন বৃক্ষে তিক্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়াও তাহাকে মিষ্টফল-প্রসূ বলা যেমন, আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবংশকে উচ্চবংশ বলাও তদ্রূপ। ইহাতে জাতিভেদের শৃঙ্খল যে দৃঢ়রূপে মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাই কেবল প্রতিপন্ন হয়।

অতএব আমি এই প্রশ্নের বিচার এই করিব যে, এরূপ কোন বাস্তবিক বর্ণভেদ না থাকিলেও বিবাহ সম্বন্ধে বাস্তবিক গুণাগুণ বিচার না করিয়া অথবা গুণবান শূদ্রপাত্র সত্তেও কেবল শূদ্রবংশজাত বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা ব্রাহ্মের উচিত কিনা? আমার এই বিশ্বাস যে, এরূপ কাল্পনিক প্রভেদানুসারে কার্য্য করিলে সততার অনাদর করা হয়, শরীরকে আত্মার উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয়, সুতরাং ঈশ্বর ও মানবাত্মার উভয়েরই অবমাননা করা হয়। অতএব এরূপ ব্যবহার ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর এপ্রকার জন্মগত প্রভেদ বিচার উদার প্রেম ও ভ্রাতৃভাব বিরোধী, সুতরাং উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী। এবং যে ব্রাহ্ম এরূপ বিচার করেন সদ্গুণের অবমাননা করাতে তাহার হৃদয়ের ও অবনতি হয়। কোন কোন ব্রাহ্ম হয়ত বলিবেন "আমরা শূদ্রকে নীচ মনে করি না, কেবল ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বিবাহটা আমাদের ভাল লাগে বলিয়াই সবর্ণবিবাহ দিয়া থাকি।" এ কথাটা শুনিতে খুব নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কথা এই যে, এরূপ ভাল লাগে কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে এই পছন্দের অন্তরালে জাতিভেদের কুসংস্কার মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। নতুবা তোমার এরূপ রুচি হয় কেন? এই স্থলে কেহ বলিতে পারেন, "ব্রাহ্মণ পাত্রে কন্যাদান করিলেই কি শূদ্রকে নীচ মনে করা হইল?" আমি বলি তাহা হইল না বটে, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইলেই যদি তুমি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পাত্রের অনুসন্ধান কর, অথবা উৎকৃষ্ট শূদ্রপাত্র সত্তেও যদি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ পাত্রে বিবাহ দাও, তাহা হইলেই তোমার অন্তরে যে অলক্ষিত ভাবে শূদ্রের প্রতি ঘৃণা রহিয়াছে, তাহা বুঝা গেল।

আমি উপরে বিপক্ষদিগের যুক্তি যথাসাধ্য খণ্ডন করিয়াছি, এখন দেখাইব যে অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা আমাদের কি কি শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ শূদ্রজাতির প্রতি অযথা ঘৃণা না করাতে সমাজের পুণ্য সঞ্চয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের মধ্যে যে অসদ্ভাবের প্রাচীর দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ভগ্ন হওয়াতে একতা ও প্রেম বর্দ্ধিত হইবে। তৃতীয়তঃ বিবাহক্ষেত্র প্রসস্ত হওয়াতে নব নব শোণিতের সমাগমে এই দুর্ব্বল জাতির শারীরিক ও মানসিক বলের বৃদ্ধি হইবে। দুর্ব্বল ক্ষীণ বাঙ্গালিজাতির শারীরিক বল বৃদ্ধির পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

শান্তি নিকেতন, বোলপুর। } জনৈক ব্রাহ্ম

মহাশয়—

প্রায় ২ বৎসর হইল "নলহাটী মিশন" সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত একটী ব্রাহ্মসমাজ, একটী নৈশ-বিদ্যালয় এবং একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় আছে। হীনবল ব্যক্তিগণের হাতে পড়িয়া ভগবানের এই সুমহান্ কার্য্য অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছে মাত্র। যে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মহান্ ঈশ্বর বিগত ২ বৎসর কাল এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকে নানা প্রকার কঠিন বাধা বিঘ্নের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় এবং বন্ধু বান্ধবের শুভাশীর্ব্বাদে ইহা চিরস্থায়ী হইয়া ভগবানের নাম মহিমান্বিত করুক এই প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনারকার্য্য গৃহের অভাবে সমাজের জনৈক সভ্যের গৃহে প্রতিবুধবার হইতেছে। রবিবার বৈকালে সন্নিহিত পাহাড়ে যাইয়া ভগবানের নাম করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণের কোন আয়োজন এ পর্য্যন্তও হয় নাই। এই সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত।

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় দিন দিনই উন্নতি লাভ করিতেছে। প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে দরিদ্র লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এ বৎসর এই কয়েক মাসের মধ্যে ৪৭০ জন লোককে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় তাহারা আশাতীত ফল লাভ করিতেছে। ঔষধ এবং চিকিৎসার অভাবে এস্থানে বৎসর বৎসর কতলোক অকালে অশেষ যাতনা পাইয়া জীবন হারায় কে তাহার গণনা করিবে। ইহারা যে ঔষধ ব্যবহার করিতে শিখিতেছে, ইহাও মঙ্গলের বিষয়।

বিগত ২ বৎসর নৈশ-বিদ্যালয়কে কতই অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠিত কার্য্য বলিয়া হিংসা পরবশ লোকেরা ইহাকে শিশু অবস্থায় বিনাশ করিতে কতই চেষ্টা করিয়াছে, এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভগবানের শিশুকে কে মারে? বিগত বৎসর শিক্ষকের অভাবে অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল, সে অভাবও সম্পূর্ণ মোচন হইয়াছে, বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। দুর্নীতি ও সুরাপ্লাবিত দেশে নৈশ-বিদ্যালয় যথাসাধ্য নিজকার্য্য সাধন করিতেছেন। বিগত বৎসর কুলি-আড়কাটীর উপদ্রবের বিরুদ্ধে নৈশ-বিদ্যালয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় যে এখানকার ৩টী কুলি ডিপোর একটীরও অস্তিত্ব নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মাসিক গড় ৩৮.২, দৈনিক গড় ২০ জন গত মাসে ছাত্র সংখ্যা ৪৬ জন ছিল। "লোক্যালবোর্ড" ৫৲ টাকা মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। লোক্যালবোর্ডের ২ জন সভ্য বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপুরহাটস্থ কোন কোন সহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে এই দুরভিসন্ধি সাধিত হইতে পারে নাই।

সম্প্রতি নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য একখণ্ড জমি লইয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। ৭০০৲ টাকা গৃহের ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে! অনধিক ২৫০৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। গৃহ আর ১ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু অর্থাভাব বড়ই অনুভূত হইতেছে। ভরসা কেবল "ভগবানের কার্য্যের সহায় তিনি নিজেই" মহৎ হৃদয় দয়াশীল জন সাধারণের মুক্তহস্ত হইতে শীঘ্রই দানের স্রোত আসিবে এ আশা আমাদের আছে। এই নলহাটীতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি অদ্ভুত উপায়ে সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এ হতভাগ্য স্থানের অধিবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া যাঁহারা সে সময় সাধু হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন আশা করি ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন। যাঁহারা এপর্য্যন্ত দয়া করিয়া দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"নলহাটী মিশন" যে সমস্ত সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন উপযুক্ত জীবন এবং অর্থাভাবে তাহার পক্ষে নিয়তই বাধা উপস্থিত হইতেছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও নীতি বিস্তার করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচার ইহার চরম লক্ষ্য। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচুররূপে শিক্ষা প্রচার এবং তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নৈতিক উন্নতি করা ব্যতীত দেশের কল্যাণ নাই। যতদিন এই উপায়ে প্রচার আরম্ভ না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম "সাধারণ লোকদিগের জন্য নহে" এ কলঙ্ক দূর হইবে না—এ পরিত্রাণপ্রদ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। "নলহাটী মিশন" যথাসাধ্য এই মহান্ সঙ্কল্প সাধনে সচেষ্ট আছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা দয়াময় মহান্ ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র কার্য্যের সহায় হউন।

চাঁদাদাতাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বহরমপুর ১৫৲ রাধাকিশোর মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲ A friend ঐ ১৲ নিবারণচন্দ্র দাস ঐ ১৲ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ ১৲ শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার ঐ ১৲ A Friend ঐ ৷৷০ মহম্মদ নবী লালবাগ ২৲ ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ ঐ ৷৷০ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲ সাহানগর নিবাসী ঐ ১৲ গৌরমোহন দাস ঐ ২৲ A Friend ঐ ১৲ কালীকুমার বর্দ্ধন ঐ ১৲ কালীদাস মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲ রামগোপাল রায় ঐ ১৲ নবীনচন্দ্র গুপ্ত ঐ ১৲ যদুনাথ রায় রামপুরহাট ৪৲ গিরীশচন্দ্র সোম ঐ ১৲ রামদয়াল রায় ঐ ১৲ A friend ঐ ৷৷০ অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ২৲ রাজেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ৷৷০ চন্দ্রকুমার রায় ঐ ১৲ যুগলকৃষ্ণ সরকার ঐ ১৲ নীলকান্ত সিদ্ধান্ত নলহাটী ২৲ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ ১৲ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৫৲ অক্ষয়কুমার মিত্র ঐ ১৲ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর ২৲ গোপালচন্দ্র সিংহ ঐ ১৲ N. C. Banerjee ঐ ২৲ * * * ঐ ১৲ N. C, Chakravarty ঐ ১৲ পার্ব্বতীচরণ দাস পুর্নীয়া ১০৲ নন্দলাল পাল ধুলীয়ান ১৲ শরদিন্দু ঘোষ ঐ ৪৲ A Friend ঐ ৫৲ অমৃতলাল কর আজীমগঞ্জ ১৲ রাজেন্দ্রমোহন বসু ঐ ৷৷০ পাঁচকড়ি দত্ত ঐ ৷৷০ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ৸০ মহেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ ১৲ রায় মেঘরাজ বাহাদুর ঐ ৪৲ গোলাবচাঁদ ঐ ৫৲ N. D. chatterji ঐ ১৲ গৌরচন্দ্র সেন গোরাবাজার ১৲ A Friend ঐ ১৲ Dwarka Nath dass ঐ ১৲ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মুর্সীদাবাদ ২৲ অক্ষয়চন্দ্র

দাস ঐ ২ * * * * *—ঐ ২ জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত নশীপুর ২ প্রতাপচন্দ্র দত্ত রামপুরহাট ১ প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ২ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজার ৫০ শ্রীমতী কিশোরবালা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৫ শ্রীযুক্ত বাবু নীমচাঁদ দে নলহাটী ১০ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর ১ হরিদাস বসু ঐ ১ নবীনচন্দ্র মিত্র ঐ ॥০ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ঐ ১ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ঐ ১ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ১ নৃসিংহমুরারী পাঁজা ঐ ১ D. N. Singha রাইপুর ১ গৌরাঙ্গসুন্দর সিংহ ঐ ১ দেবেন্দ্রনাথ সেন নশীপুর ১ বিজয়কৃষ্ণ বসু কলিকাতা ১।

ক্রমশঃ

নলহাটী।
নবেম্বর ১৮৮৯ খৃঃ।
৬০ ব্রাঃ সং

একান্ত বশম্বদ
প্রমথনাথ সরকার, সম্পাদক।
নলহাটী ব্রাহ্মসমাজ।

মহাশয়—

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ এ পর্য্যন্ত যে সকল দাতাগণ আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদের দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়াছে, যাহা বাকি আছে তাহার জন্য আর ৩০০ তিনশত টাকার প্রয়োজন, এজন্য ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা আমাদের এই অভাব পূর্ণ করেন। যাঁহার যাহা দিতে ইচ্ছা হয় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বাঁকুড়া স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইবেন। নিবেদন ইতি

দাতাগণের নাম ও দানের টাকা।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০ শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব ৫ শ্রীমতী অম্বিকা দেব ২ বাবু শিবচন্দ্র কুলভি ১ মৌলুবি আবদুলসামেদ ৫ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ২৫ ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ ৫০ মনমোহন রায় ৪০ কেদারনাথ কুলভি ৪৫ ক্ষেত্রমোহন সেন ১৫৫ রাজেন্দ্রকুমার বসু ১০ গতিকৃষ্ণ নিয়োগী ২৫ কুঞ্জবিহারী পাল ১০ শ্রীকণ্ঠ দত্ত ১০ হরিহর মুখোপাধ্যায় ২ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২ মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ বিনোদবিহারী মণ্ডল ২ বসন্তকুমার নিয়োগী ১ রাজনারায়ণ রায় ১ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৪ ননীলাল ঘোষ ৫ বাবু গোরাচাঁদ গোস্বামী ১০ ব্রহ্মমোহন মল্লিক ২৫ বেণীমাধব দে ১০ আনন্দমোহন বসু ১০ দুর্গামোহন দাস ১০ কানাইলাল পাইন ৫ রসিকলাল পাইন ৫ বৈকুণ্ঠনাথ সেন ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন ৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ কোন বন্ধু ৫ শুভাকাঙ্খী ২ রামেশ্বর সেন ৫ রামতারক মুখোপাধ্যায় ৫ রমানাথ চট্টোপাধ্যায় ৫ অক্ষয়কুমার দত্ত ৫ জগবন্ধু বিশ্বাস ৫ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫ নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ শশীভূষণ সরকার ৫ ত্রিপুরারী দে ২॥০ কানাইলাল নন্দী ১ গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী ২ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ ১০ ডাক্তার পি কে রায় ৭ বাবু রজনীনাথ রায় ১০ অনন্তরাম মাড়য়ারী ২ সুখময় সাণ্ডেল ১ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২ কোন বন্ধু ১ শ্যামাচরণ বটব্যাল ॥০ বাবু হরমোহন রায় ৪ মাধবচন্দ্র মহাপাত্র ১ কাশীশ্বর মল্লিক ১ পরাণচন্দ্র রায় ১ মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১ শশীভূষণ মণ্ডল ১ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ রাধানাথ রায় ১ রামচরণ দে ১০ বিপিনবিহারী দে ৩ নবকুমার দে ৫ রসিকলাল ঘোষাল ২ দ্বারিকনাথ পাল ১ নেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২ কেদারনাথ কুণ্ডু ৪ মুনসী আলিজামিন ২ আমদু আহম্মদ ১ ফকিউদ্দিন ১৸০ সায়েদ রহমন ৫ মউপুরের মহম্মদ চৌধুরী ৫ ক্ষুদ্রদান ২॥৶১০ বাবু হৃদয়নাথ দত্ত ২ শ্যামাকান্ত নাগ ৫ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ২ রঘুরাম হাজরা ৫ সূর্য্যনারায়ণ রায় ১ পরেশনাথ রায় ১॥০ রাখালচন্দ্র বিট ॥০ রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥০ কালিপ্রসাদ সেন ১ ধর্ম্মদাস গোস্বামী ১ কালিকুমার দাস ১ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪ বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ৫ তারাপ্রসন্ন ঘোষ ৫ ভুবনমোহন রাহা ১০ শশধর রায় ৫ সুবলচন্দ্র সেন ২ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১ অযোধ্যানাথ মুখো ॥০ হারাধন ঘোষ ১ কুঞ্জবিহারী নন্দী ৩ ঈশানচন্দ্র দত্ত ১ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১ শশীশেখর মুখোপাধ্যায় ৫ শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ॥০ হৃদয়নাথ কুণ্ডু ॥০ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০ ক্ষুদ্রদান ৩।০।

কেদারনাথ কুলভি
গৃহনির্ম্মাণ কমিটির অনুমত্যানুসারে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক বিবরণ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

বাকী মূল্য আদায়	৯১॥/১৫	অপরের পুস্তকের	
নগদ বিক্রয়	১৩৫॥৴১৫	মূল্য শোধ	১৭৫॥/০
সমাজের ৯৬৸৫		কমিশন	৮॥৶০
অপরের ৩৮৸৴১০		পুস্তকের ডাক মাশুল	৭৶১০
		কাগজ	৪৸৶০
	১৩৫॥৴১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
কমিশন	৭৸৴১২॥	ডাক মাশুল	৶১০
পুস্তকের ডাক মাশুল	৬৸৴১৫	পুস্তক বাঁধাই হিঃ	৫৲
সুদ	২৯৲	বিবিধ হিঃ	৴১০
	২৭১।১৭॥		২২২॥/১০
পূর্ব্বস্থিত	২১৫২৲১০	স্থিত	২২০০॥৴১৭॥
মোট	২৪২৩।/৭॥	মোট	২৪২৩।/৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৩৮৶	ডাক মাসুল	৩৩।১৫
নগদ বিক্রয়	৸৶	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৩৲
বিবিধ হিঃ	১৲	কাগজ	৩৭॥
		মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	৮১৲
	২৪০৲	কমিশন	১।৶
পূর্ব্বস্থিত	১২৩৯৸৶১০	বিবিধ হিঃ	৭৸০
মোট	১৪৭৯৸৶১০		১৯৩৸৶১৫
		স্থিত	১২৮৫৸৴১৫
			১৪৭৯৸৶১০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার

মূল্য প্রাপ্তি	২৬৭।/৫	ডাকমাশুল	১২৬৲১৫
বিবিধ	১৴১০	বিবিধ	১৭/০
নগদ বিক্রয়	।৴১০	মুদ্রাঙ্কণ	৮০৲
বিজ্ঞাপন	১১৲	কাগজ	৫৭॥০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৫২৸৶০
	২৮০৲৫	কমিশন	৸০
পূর্ব্ব স্থিত	২৭২৶৫		
			৩৩৪৴১৫
	৫৫২৶১০	স্থিত	২১৭৸৶১৫
			৫৫২৶১০

মেসেঞ্জারের দেনা প্রায় ২২০০ টাকা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ রবিবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

দীনের বাসনা।

রাজা রাজধানী মাঝে স্বর্ণ সিংহাসনে
দীন প্রজা সাম্রাজ্যের দূর প্রান্ত হ'তে
বর্ষে বর্ষে রাজকর করে নিবেদন,
দৈবাৎ কখন যদি করে আগমন
রাজ পুরে, লোকারণ্যে দূরে দাঁড়াইয়া
একবার রাজ মূর্ত্তি হেরে কি না হেরে।
রাজার নিদেশ মানে, সুশাসনে তাঁর
রহে সুখে; কখনও বা দুই হাত তুলে
আশীর্ব্বাদ করে তাঁরে। ওহে বিশ্বরাজ
চিরদিন দীন প্রজা দূর হ'তে আমি
নিবেদিব রাজ পূজা, উদ্দেশে তোমারে
করিব প্রণাম প্রাতঃ সন্ধ্যা? সিংহাসনে
তুমি নৃপ, ক্ষুদ্র আমি পড়ে আছি দূরে
প্রভাময়ী মূর্ত্তি তব পাবনা দেখিতে
আঁখি ভরি? রাজপথে জনতার মাঝে
"অই রাজা" বলি যবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি
অপরে দেখায়, নাহি পাই দেখিবারে,
চলে যাও জ্যোতির্ম্ময় নিমেষের মাঝে,
দূরে পরিচ্ছদ শোভা দেখি যদি কভু
ভাবি মনে পাইয়াছি রাজ দরশন
অতৃপ্ত-পরাণ ফিরি গৃহে। ওহে দেব
তুমি নাকি জগতের পিতা? তুমি নাকি
স্নেহ করুণার খনি জীবের জননী?
তবে কেন দূরে রাখ সন্তানে তোমার?
কাছে ডাক হে জননী, অথবা আপনি
নিভৃত কুটীরে থাকি দাও দরশন,
শুনাও বচন তব, মস্তকে আমার
আশীর্ব্বাদ হস্ত তব রাখি স্নেহ ভরে;
তব রূপ তব স্বর স্পর্শ মধুময়,
জানাইবে কাছে তুমি জননী আমার।

নিবেদন ও প্রার্থনা—আমাদিগের পথ প্রদর্শক অনন্ত জীবনের আদর্শস্বরূপ পরমেশ্বর! আমরা যে কিছুতেই আর এ পথের অন্ত পাইনা? আমরা যেমন একটু অগ্রসর হইয়াছি, অমনি দেখি তুমি যেন আরও মহানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যায়, দর্শক যতই অগ্রসর হইতে থাকে, দৃষ্টির শেষ সীমাস্থ রেখা যেমন ততই অগ্রসর হইয়া যায়, কিছুতেই আর তাহার শেষ পাওয়া যায় না, আমাদের দশাও যে তেমনই হইয়া পড়িল। কোন ক্রমেই আর আমরা তোমার সহিত পারিয়া উঠিতেছি না। যে স্বার্থ পর ছিল সে যদি একটুকু পরার্থে জীবন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইল; তুমি অমনিই তাহার নিকট আরও কত কি দাওয়া করিয়া বসিতেছ। যে দিনের মধ্যে একবার তোমাকে ডাকিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, যাই সে একটু অধিক পরিমাণে ডাকিতে ইচ্ছুক হইল, অমনি তুমি আরও অধিক সময় তোমার উপাসনাতে এবং প্রার্থনায় ব্যাপৃত হইবার জন্য জেদ করিতে থাক। এইরূপে আমাদের আদর্শ কেবলই অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র প্রাণ কতকটা যাইয়া মনে করিতেছিল এইবার একটু বিশ্রাম করি। বোধ হয় আর অধিক যাইতে হইবে না। তুমি কিনা বলিলে সে কি সন্তান! তোমার পথের যে শেষ নাই। আরও অনেক দূর চলিতে হইবে। বহু পথ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিবার জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নাই। তোমার জীবন যেমন ক্ষুদ্র বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, তোমার পথ এবং আদর্শ ও তেমনি সামান্য বা সীমাবদ্ধ নয়। অবসন্ন হওয়া তোমার পক্ষে সাজে না। "পারিনা" একথা তোমার মুখ হইতে বাহির হওয়া সাজে না। নিয়ত খাটিবে নিয়ত অগ্রসর হইবে। যদি একবার এ পথে চলিতে অভ্যস্ত হও তাহা হইলে ইহাকে আর কঠিন মনে হইবে না। কিন্তু বহু দিন বিদেশ-বাসের পরে প্রিয় জনের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে গমন যেমন তৃপ্তিকর ও উৎসাহজনক। তেমনি এপথে চলাও আরাম ও আনন্দের হেতুজনক হইবে। প্রভু পরমেশ্বর! যদি অনন্ত কালই আমাদিগকে চলিতে হয়, তাহা হইলে প্রাণকেও তেমনি চির-উৎসাহশীল ও উদ্যমপূর্ণকর। চলিতে চলিতে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে না হয়। মধ্যে মধ্যে

যেন তোমার সুমধুর আহ্বান এবং আশ্বাস ধ্বনি শ্রবণ করিতে পাই। যেন তোমার আরামদায়ক সান্ত্বনা ও সম্মিলনানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। অন্যথা আমাদের দুর্ব্বল প্রাণ কোন ভরসায় এত দীর্ঘ পথ চলিতে সমর্থ হইবে। আমাদিগকে আশা দেও এবং পথের চালক হইয়া তোমার অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পর-হিতৈষণা।—মানুষের অবস্থা যখন সচ্ছল থাকে—যখন শরীর সবল ও সুস্থ থাকে, প্রয়োজনাতিরিক্ত আয় হইতে থাকে, পৃথিবীর অন্যান্য অবস্থা সকল অনুকূল থাকে, চারি দিক হইতে সাহায্য সহানুভূতি বিনা প্রার্থনাতেও আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন সে যদি অন্যের সাহায্যের জন্য কিছু চেষ্টা করে, সে ব্যক্তির পক্ষে তাহা প্রশংসার বিষয় হইলেও বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। কারণ সচ্ছল অবস্থায়, সক্ষম অবস্থায় অন্যের সহায়তা না করা অমানুষোচিত কার্য্য, বিষম নিন্দার কারণ। মানুষ হইয়া মানুষের সাহায্য করিবে, তাহার জন্য আপন শরীরের শোণিতের বিন্দু বিন্দু ব্যয় করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং সচ্ছল অবস্থায় অন্যের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা না করিলেও চলিতে পারে! কিন্তু তাহাই প্রশংসনীয় যে পর হিতৈষণা লোককে আপন সুবিধার প্রতি উদাসীন করিতে সমর্থ হয়। যে পরহিতৈষণা নিজের প্রাপ্য অন্নের অর্দ্ধাংশ অপরকে প্রদানের জন্য উত্তেজিত করে তাহাই প্রশংসনীয়। কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবে না, আমার সুখ স্বাস্থ্য যোল আনা বজায় থাকিবে, কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত হইব না, অথচ পরহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইব এরূপ আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মগণের মধ্যে এইরূপ আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-ক্ষতি সাধন করিয়া, একটু নিজ সুখ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের হিত করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছেনা, ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। দিন দিন আত্মসুখেচ্ছা যদি প্রবল হইতে থাকে, অন্যের প্রতি যদি উদাসীনতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ কখনও লোক সমাজে আপনাদের আশ্রিত ধর্ম্মকে প্রশংসিত করিতে সমর্থ হইবেন না। এ ধর্ম্মের প্রতি লোকের কোন আকর্ষণ হইবে না। ধর্ম্মের উচ্চ মত সকল প্রচার করা বিশেষ কিছুই কঠিন নয়। উচ্চ আদর্শের কথা জগতে ঘোষণা করা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে নূতন নূতন রং দিয়া আরও উচ্চ হইতে উচ্চতম আদর্শ ও উন্নতভাব সকল বাক্য বা লেখনীর সাহায্যে জনসমাজে প্রচার করা বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু তদনুরূপ আচরণ করাই প্রয়োজনীয় এবং প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মগণ উচ্চ ধর্ম্মমতের প্রচারের যেন চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তদনুরূপ আচরণ কোথায়? "আত্মবৎ জগৎকে ভাল বাস" বা "জগৎবৎ আপনাকে ভাল বাস" ইত্যাকার কথা বলিতে বা লিখিতে অনেক সময়ের বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিন্দু বিন্দু পরিমাণে নিজ রক্ত অপরের সেবায় প্রদান করিতে হইলে বিশেষ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। অপরের সুখ স্বাস্থ্যের জন্য নিজের সুখের কিয়ৎ পরিমাণে হানি করিতে প্রস্তুত হওয়া এবং নিজ স্বার্থের কিছু ক্ষতি করিয়া, আপনাকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া অপরের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। ইহা শুধু মুখের বাক্য নিঃস্বরণের বা লেখনী চালাইবার মত সহজ বা অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মগণের পক্ষে কর্ত্তব্য এ বিষয়ে তাঁহাদের যে ত্রুটী আছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে যত্নশীল হওয়া। এ চেষ্টায় তাঁহাদের শরীর মন এবং সুখ, স্বাস্থ্য নিযুক্ত না হইলে তাঁহারা কখনই এ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন না।

ভাল পরের জন্য নিজের কিছু অসুবিধা করা কি এতই কঠিন ব্যাপার? যে ব্যক্তি নিজের তিনটী সন্তানের পরিচর্য্যা করিতেছে সে অপর একটী দুঃখী বালক বা বালিকাকে আপনার সন্তান বলিয়া কি ভাবিতে পারে না? যে ব্যক্তি আপন ভাই ভগিনীদিগের পাঁচটীর ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে কি অপর একটী নিঃসহায় বালক বা বালিকাকে আপনার ভাই বা ভগিনী বলিয়া মনে করিতে পারে না? ইহাতে এমন কি কাঠিন্য আছে? তিনটী সন্তান আছে, মনে করিলেই হয় যেন আরও একটী সন্তান জন্মিয়াছিল। ৫টী ভাই, ভগিনীর জন্য খাটিতেছে, মনে করিলেই হয় তাঁহার যেন আর একটী ভাই বা ভগিনী জন্মিয়াছিল। রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কি অন্য সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর নয়? এবং তাহা কি সময়ে সময়ে রক্তের সম্পর্ককে অতিক্রম করে না? আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাই যাঁহাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের লেশও নাই অথচ তাঁহারাও কেমন ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কেমন আত্মপরের প্রভেদ তাহাদের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে। তবে ইহা ভাবিয়া লওয়া কিছুই বিচিত্র বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। মনের ধাঁধাঁ, পর পর ভাব একবার দূর করিয়া দিলেই দেখা যায় পর আর পর থাকে না; সে আপন জনের স্থান অধিকার করে। ব্রাহ্মগণের যদি পরকে আপনার ভাবিবার মত অবস্থা না হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা যে উচ্চ ধর্ম্ম পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাহার আর সার্থকতা কি? তাঁহাদের সেরূপ মনে করিবারই বা অধিকার কি? আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ পরার্থে আত্ম-ত্যাগের জন্য দিন দিন প্রস্তুত হইতে যত্নশীল হইয়া তাঁহাদের এ সম্বন্ধীয় ত্রুটী অপনোদনের চেষ্টা করিবেন।

প্রচার প্রণালী—যে ধর্ম্মসমাজ আপনাদিগের কার্য্যের পরিচালক ও শাসকরূপে কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র বা মনুষ্যকে গ্রহণ করে না, যাহাদের আদর্শ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ বা অনুদার নহে, তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারার্থ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করা সুযুক্তিসম্মত তাহা নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। ব্রাহ্মসমাজ কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র বা মনুষ্যের আবশ্যকতা স্বীকার

করেন না এবং এই সমাজের মতগুলি এখনও এমন আকার প্রাপ্ত হয় নাই, যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তির মতকে নিয়মিত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, তাহাও এমন সাধারণ ও বিস্তৃতঅর্থ-ব্যঞ্জক যে তাহাদ্বারা কোন ব্যক্তিকেই নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারকের যদি বিশেষ মতের পরিবর্ত্তনও ঘটে, তথাপি তাঁহাদিগকে এমন বিশেষ কিছু প্রদর্শন করা যায় না, যাহাদ্বারা সেই পরিবর্ত্তিত মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। এই উদারতা প্রার্থনীয় হইলেও কোন সমাজের পক্ষে এভাবে কার্য্য করা বিশেষ কঠিন ও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। যেখানে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই, যাহা দ্বারা সকলে নিয়মিত হইবেন, সেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের মতের প্রতিবাদ করিতে গেলেই সহজেই এই উত্তর প্রদত্ত হয়,যে আমার মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত নয়, তাহার কি প্রমাণ আছে? এই সকল কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণের মধ্যে মত-বৈষম্য জনিত বিচ্ছেদ প্রায়ই দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত কম প্রবল নহে। যতদিন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের পরস্পর মতের অনৈক্যের কথা সহজে জানা যায় নাই। তাঁহাতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিত, অপরেরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতেই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ আর ঐক্য হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টিও অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে বলিতে হইবে। কোন এমন এক বন্ধনসূত্র ছিল না যে সূত্রদ্বারা সকলে একত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারা যাইত বা এমন কোন শাসক ছিল না যাহা সকলকে এক শাসনে বা এক নিয়মে শাসিত ও নিয়মিত করিতে পারিত। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও শিক্ষাসম্পন্ন লোকগণ আপন আপন মনোনীত দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এখানেও দেখা যাইতেছে যে কয়েকজন প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আপনাদিগের জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের সহিত এখন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ আর নাই। এই দুই জনেরই বিশ্বাস তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু অন্য ভাবে এ ধর্ম্মের প্রচার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের জীবন যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কোনও অংশে হীন হইয়াছে, এরূপ বলিবারও উপায় নাই। অথচ তাঁহাদের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর সাক্ষাৎভাবে যোগ নাই। এরূপ বিচ্ছেদ প্রার্থনীয় না হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহা ঘটিবেই। স্বাধীন বিচার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে এরূপ ঘটনা নিবারণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের মধ্যে দুই জনের সহিত যেমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে যে আর সেরূপ ব্যাপার ঘটিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এরূপ ঘটনা ঘটিবে এবং ইহার প্রতিকার করা সম্ভবপর নহে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের সহিত এরূপ বিচ্ছেদজনিত অনিষ্ট নিবারণের আশায় বর্ত্তমান সময়ে যে নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কতক পরিমাণে অনিষ্ট নিবারিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এক বারেই অনিষ্টের হাত এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে নিয়ম হইয়াছে তদনুসারে নিয়মিতরূপে পরীক্ষাধীন হইয়া চলিলে, কোন ব্যক্তিই ছয় বৎসরের পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত হইতে পরিবেন না। এইরূপ প্রথা অবলম্বনেই যে মতের অনৈক্য ঘটিবে না, এমন কোনই ভরসা নাই। কারণ আমরা মত পরিবর্ত্তনের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি,তাহার তুলনায় ছয় বৎসরের পরীক্ষা কেন তাহার দ্বিগুণ সময়ের পরীক্ষার উপরও আস্থা স্থাপন করিতে ভরসা হয় না।

যখন দেখা যাইতেছে যে বহুদিনের পরীক্ষিত ব্যক্তিগণেরও ধর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মলাভের সাধন প্রণালী গ্রহণ সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বিশেষ ভাবে মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তখন প্রচারপ্রণালী কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে সহজেই প্রশ্ন উত্থিত হয়। যিনি আজ আমাদের প্রচারক আছেন, পাঁচবৎসর পরে যে তিনি প্রচারক থাকিবেন, তাঁহার মতের যে স্থিরতা থাকিবে, সে সম্বন্ধে যখন কোন নিশ্চয়াত্মক ভরসা নাই, তখন এরূপ ব্যক্তিগত অস্থিরতার উপর প্রচার কার্য্য কিরূপে সমর্পণ করা যাইতে পারে এবং কিরূপেই বা তাহাতে আমরা নিঃশঙ্ক হইতে পারি? এজন্য ইহারই মধ্যে এমন কথা উপস্থিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে প্রচারক নিযুক্ত না করিলে চলিতে পারে কি না, অর্থাৎ সাধারণব্রাহ্মসমাজ কিম্বা কোন বিশেষ সমাজের নামে কেহ প্রচারক থাকিবেন না। যাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য হইবে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন। যে সকল স্থানে তাঁহারা কার্য্য করিয়া বেড়াইবেন, তত্তৎ স্থানের লোকেরা তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিবেন, অথবা তাঁহারা স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানের উপাসকমণ্ডলী সাময়িকরূপে এক এক জনকে আপনাদিগের আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে আবশ্যকমত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এই রূপে কার্য্য হইলে প্রচারক বিশেষের মত পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং এক ব্যক্তির কোন্ কথায় লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, কোন্ কথায় করিবে না, এখন যে তাহাই স্থির করিতে পারা যায় না, এ সকল অসুবিধা আর থাকেনা। প্রচারের এমন উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে যে কোন কোন সমাজ উপযুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল, বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা লেখাইয়া লইয়া প্রচার করিতে পারেন এবং লেখককে উপযুক্তরূপ পারিশ্রমিক প্রদান করিতে পারেন। ইহাদ্বারা সেই সকল প্রচারার্থীর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যও বিশেষ ভাবিতে হয় না, অথচ কোন সমাজের নামে যাহা প্রচারিত হয়, তাহাতে একটা সামঞ্জস্য থাকিতে পরে। প্রচারকের ব্যক্তিগত মত

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নামে যাহা প্রচারিত হয়, যাহার মধ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না, তাহা দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এবং সেরূপ ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে। আমরা এই বিষয়টী ব্রাহ্মসাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করিলাম মাত্র। এ বিষয়ে যে কোন একটী মত বিপক্ষের প্রতি আমাদের বিশেষ কিছু পক্ষপাতিতা আছে এখন তাহা বলিবার মত ব্যবস্থা উপস্থিত হয় নাই। আশা করি ব্রাহ্মগণ বিশেষ ভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন এবং প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে কোন সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে যত্ন করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ২।৩ বৎসর হইতে প্রচারকগণের কার্য্য-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণ এই প্রণালীকে অনুমোদন করেন কি না এবং এই প্রণালীতে কার্য্য হইলে অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করেন কি না, তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে না পারিলেও একথা বলা যাইতে পারে, যে যে সকল প্রচারক এই প্রণালীতে কার্য্য করিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, তাঁহারা অন্য প্রণালীতে যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার পক্ষে বিশেষ একটী সুবিধা এই যে তাঁহাদের কলিকাতা হইতে কোন একটী স্থানে গমন এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতিতে যে সময় ও অর্থ অকারণ বৃথা ব্যয় হয় তাহা আর হইতে পারে না। অথচ নিকটে প্রচারক থাকায় সকল স্থানের ব্রাহ্মগণই তাঁহাদিগকে বার বার পাইতে পারেন। পূর্ব্বে এমনও ঘটিত যে কোন সমাজের হয়ত আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় তাঁহারা সকল সময় প্রচারককে আহ্বান করিতে সুবিধা পাইতেন না এবং অনেক সময় সে সকল স্থানে প্রচারকের গমনও ঘটিয়া উঠিত না। আর একটী সুবিধা এই যে যদি প্রচারকগণ আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন যে কখন কোন সমাজে গমন করিলে প্রচারের সুবিধা হইতে পারে, তাহা হইলে সকল সমাজেই প্রচারকগণ অধিক সময় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বিশেষতঃ কোন এক স্থানের ভার গ্রহণে সেই স্থানের সম্বন্ধে প্রচারকের বিশেষ কিছু দায়িত্ব উপস্থিত হয় এবং তথায় ভালরূপে কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে। কোন স্থানের প্রতি বিশেষ কোন কর্ত্তব্য নাই, যখন যেস্থান হইতে আহ্বান আসিতেছে, তখন তথায় যাইতেছি; এরূপ উদাসীন ভাবে কার্য্য না করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানের ভার লইলে যে অধিকতররূপে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার বিরুদ্ধে প্রধান একটী আপত্তি এই শুনা গিয়াছে, একজন প্রচারককে যদি কোন এক স্থানের লোকেরা বিশেষ ভাবে পছন্দ করে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যদি তাহার কার্য্য-ক্ষেত্র সে স্থলে নির্দ্দিষ্ট না করিয়া অন্যত্র নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে প্রচারকের পক্ষে কার্য্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। যে স্থানে প্রাণ যাইতে চায়, সে স্থানে যাইতে না দিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য করিলে প্রচারকের কার্য্যের অসুবিধা হয়। প্রচার কার্য্য জোর জবরদস্তির কার্য্য নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, এরূপ কিছু জানিতে পারিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক যে অন্যরূপ বন্দোবস্ত করেন আমাদের এরূপ জানা নাই। কিন্তু এখন একটী কথা এই উঠিতেছে যে কোন এক স্থানের লোকেরা এক জনকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহারা এই যে পছন্দ করেন, তাহা কি তথাকার সর্ব্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া করিয়া থাকেন? বাস্তবিক কার্য্যতঃ তাহা হয় না। তত্তৎস্থানের ব্রাহ্মগণই যাঁহাকে ভাল মনে করেন; তাঁহাকেই চাহিয়া পাঠান। কিন্তু প্রচারকের কার্য্য কিছু একমাত্র ব্রাহ্মগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাঁহারা নিত্য নূতন লোকের মধ্যে কার্য্য করিবেন, নিত্য নূতন লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যজ্ঞাপন করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা এই কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। যদি বলা যায় পছন্দ না করিলে সেখানে কার্য্য করা যায় না, তবে কিরূপে নূতন নূতন লোকের নিকট বক্তৃতা করা সম্ভবে? বক্তৃতাস্থলে যত লোক উপস্থিত হয় কখনই তাহারা একজনলোককে জানে না। বিশেষতঃ যে সকল লোক এই সকল সত্য জানে না বা জানিতে ইচ্ছা করে না, তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রচারক যদি কোন স্থানের লোকের পছন্দ অপছন্দের প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহার কার্য্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দের কথাটা কতক পরিমাণে খাটে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষম লোকের প্রতি কোথাও একটা চিরবদ্ধসংস্কার থাকার কখনই সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের সত্য লোককে জানান এবং তাঁহার মহিমা প্রচারই প্রচারকের কার্য্য। তাহা সকলের জন্যই প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্তভাবে প্রচার করিতে পারিলে সকলেই তাহা গ্রহণ করিবে। অতএব প্রচারকের নিত্য নূতন লোকের নিকট যাইয়া সত্য প্রচার করাই কর্ত্তব্য। লোকে যদি না শুনে তিনি তাহার জন্য দায়ী নহেন। কোন এক স্থানের লোকে চিরদিন একজন লোককেই পছন্দ করিতেছে এমন দৃষ্টান্তও প্রায় দেখা যায় না, সুতরাং এই আপত্তিকে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিবার কোন প্রবল হেতু দেখা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের বার্ষিক সভায় এরূপ বিষয়ের মীমাংসার জন্য যদি কিছু সময় যাপন করেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে এবং তাঁহারা যাঁহাদিগকে কার্য্যের ভার প্রদান করেন, তাঁহাদের পক্ষেও কার্য্য করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মহিমা জ্ঞান ও সত্তানুভব হইলে সহজেই মনস্থৈর্য্য হয়।

আমরা গত বারে লিখিয়াছি যে মানবের মন সহজেই প্রিয় পদার্থে আকৃষ্ট হয় ও যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আরামদায়ক ও পরিতৃপ্তির কারণ তাহাতে সংলিপ্ত হওয়া—তাহাতে মনোনিবেশ করা

আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য ব্যাপার। এরূপ বিষয়ের অনুধ্যানে নিযুক্ত হইতে আর কোন অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন হয় না। প্রাণ আপনা হইতেই তাহাতে মগ্ন হইতে ব্যাকুল হয় এবং তাহাতেই সংযুক্ত হইয়া আরাম লাভ করে। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রিয় ও আরামদায়ক হন, যখন অন্য প্রকার আসক্তি ও আকর্ষণ হীন হইয়া ঈশ্বরানুরাগ প্রবল হইতে থাকে—অন্য সকলের সংস্রব অপেক্ষা ঈশ্বরের সহিত মিলন আরামের কারণ হয়, অন্য প্রসঙ্গ অপেক্ষা তাঁহার প্রসঙ্গ অধিক তৃপ্তিকর হয়, তখনই মানবের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে নিমগ্নচিত্তে উপাসনায় রত হওয়া সহজ ও সম্ভবপর হয়। তখন তাঁহা হইতে অন্তরে থাকাই কষ্টের কারণ হয়—তাঁহার আরাধনার বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই আত্মার অসুখের হেতু হয়।

এক দিকে যেমন দেখা যায়, মানব মন প্রিয় ও আরামদায়কের সহিত একত্রে থাকাকে প্রার্থনীয় মনে করে, সেরূপ কিছুতে মনোনিবেশ করা তাহার পক্ষে অতি অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। সেরূপ বিষয়ে মনোনিবেশ করা কখনও কঠিন বা কষ্টকর সাধন নয়, তেমনি অন্য দিকে দেখা যায়, যাঁহা সম্মানার্হ, যাঁহার প্রতি প্রাণের সরল ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার সহবাসে থাকা বা তাঁহার প্রসঙ্গে রত থাকাও স্বাভাবিক এবং সহজসাধ্য ব্যাপার। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মন আরামের আশায় আপনা হইতেই সে দিকে ছুটিয়া যায়। যাইয়া এমন মগ্ন হয় যে তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়াই কষ্টের কারণ হয়, এ স্থলে সেরূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া না গেলেও অলক্ষিত ভাবে অন্য শক্তির প্রভাব আসিয়া তাহার মনকে বশীভূত করিয়া তাহাতে নিযুক্ত রাখে। সেই মহৎ ব্যক্তি হইতে এমন কিছু শক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে, যাহার বলে চঞ্চল ও সদাবিক্ষিপ্ত মনও শান্তভাবে—স্থিরপ্রাণে তাহার নিকট বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এক প্রাণের টানে ছুটিয়া যাইয়া মুগ্ধ হয়। অপর অন্য শক্তির প্রাবল্যে পরাজিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার সহবাসে থাকিতে বাধ্য হয়।

আমরা প্রায় সর্ব্বদাই এরূপ দেখিতে পাই, যখন অপরসাধারণ সকলের শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তির নিকট গমন করি, তখন আর অন্যমনস্ক হইয়া অস্থিরতার সহিত বাচালতা করিতে পারা যায় না। তখন সমনোযোগে তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার প্রত্যেক বাক্য শ্রবণ জন্য প্রাণ আপনা হইতেই ব্যস্ত হয়। তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হয়। সাধারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির আশ্চর্য্য প্রভাবে চঞ্চলতা পরাস্ত হইয়া যায়। মর্য্যাদা সম্পন্নের নিকট যাইয়া তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আমাদের পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হইতে হয়। পৃথিবীর রাজার নিকট যখন দরিদ্র প্রজা গমন করে, তখন তাহার পক্ষে কি রাজ-গৌরবের হানিকর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব? তখন সে বাধ্য হইয়াই রাজার দিকে গভীর মনোযোগের সহিত তাকাইয়া থাকে। সেখানে রাজকীয় প্রভাব অলক্ষ্য ভাবে দীন প্রজাকে শান্ত ও ধীর-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইতে বাধ্য করে। বাচালতা বা চঞ্চলতা অথবা যে কোন আচরণ রাজ-গৌরবের লঘুতা-ব্যঞ্জক এমন কোন অনুষ্ঠান সে করিতে পারে না এবং করিবার সুবিধা বা ভরসা পায় না। এইরূপ সর্ব্বত্রই সম্মানিত জনের প্রতি লোককে বাধ্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে মনোযোগী হইতে হয়। তাহাতে অভিনিবেশ চিত্তে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়।

পৃথিবীর সম্মানিত জনের প্রতি যখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মনোনিবেশ করিতে হয়, রাজার রাজগৌরব রক্ষার জন্য যখন অলক্ষিত ভাবে তাহার শাসনে আমাদিগকে শান্ত ও সুস্থির চিত্ত করিয়া থাকে, তখন রাজরাজেশ্বর মহান্ ঈশ্বরের সন্নিধানে যখন আমরা যাই, তখন কেন আমাদের মন তাঁহার প্রভাবে বশীভূত হইয়া তাঁহাতেই নিমগ্ন ভাবে অবস্থিতি করে না? কেন তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমরা সমর্থ হই না? পৃথিবীর সম্মানিত ব্যক্তি বা রাজার সহিত তাঁহার কি কোন রূপ তুলনা সম্ভবে? জ্ঞান বা চরিত্র যেখানে শ্রদ্ধার কারণ সেখানে সহজেই উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার তারতম্যের একটা পরিমাণ করা যাইতে পারে। সেই পরিমাণের মধ্যে যতই অধিক ব্যবধান থাকুক না কেন—কখনই এমন তারতম্য হয় না যে তাহা কোন প্রকারে প্রকাশ করিবার মত ভাষা পাওয়া যায় না। রাজার সহিত প্রজার যে তারতম্য তাহার সম্বন্ধেও উক্ত কথা খাটে। এখানেও ন্যূনাধিক্য যতই অধিক হউক না কেন তাহার পরিমাণ করা সম্ভবে। কিন্তু ভাষার কি এমন শক্তি আছে যে, মানবাত্মা হইতে পরমাত্মা কত গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা ব্যক্ত করে। অনন্ত ও সীমাবিশিষ্টের তারতম্যের পরিমাণ করিবার ক্ষমতা ভাষার নাই। যে কোন বিষয় ধরা যাউক সে বিষয়েই বলিতে হয় অনন্ত ও অন্তবিশিষ্ট। পরমাত্মা—জ্ঞানে অনন্ত, প্রেমে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত। সকল বিষয়েই তিনি অনন্ত আর আমরা সকল বিষয়েই ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ। সুতরাং তিনি কত বড়, কত সম্মানের পাত্র তাহার পরিমাণ করা সম্ভবে না। ভাষায় এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা এই পরিমাণগত তারতম্যের একটা ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার নিকটে যাইয়া কি পরিমাণে আমাদের শান্ত ও ধীর চিত্তে তাঁহাতে মনোযোগী হওয়া—তাঁহার ধ্যান ও আরাধনায় নিযুক্ত হওয়া উচিত তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের ব্যবহার কিরূপ হইতেছে? আমরা কি উপাসনার সময় পরমদেবের উপাসকের যে ভাবে অবস্থিতি করা উচিত তাহা করিয়া থাকি? আমরা কি তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অন্ততঃ যত্নশীল হইলেও যে সকল লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারিতেছি?

উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেত পারিই না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে অসম্মানজনক ব্যবহারই বিশেষ ভাবে করিয়া থাকি। আমরা যথাবিধি তাঁহার মর্য্যাদা হানি করিতেই রত থাকি। পৃথিবীর রাজার বা সম্মানিত ব্যক্তির ন্যায় যদি তিনি সহজে রুষ্ট হইতেন বা অসম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডবিধান করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আর মুখ খুলিয়া লোক সমাজে বেড়াইতে হইত না। অপরাধির গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে করিতেই শেষ দশা প্রাপ্ত হইতে হইত।

আমরা সেই রাজার রাজা মহান্ পরমেশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে ডাকিতে যাইয়াও কেন তবে এমন চঞ্চল ও

তাঁহার প্রতি উদাসীন হইয়া বিষয়ান্তরের অনুধ্যানে নিযুক্ত হই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আমরা পৃথিবীর সম্মানিত ব্যক্তি বা রাজার নিকট যাইয়া তাঁহাকে যেমন ভাবে উপলব্ধি করি, তাঁহাদের সত্তা যেমন প্রত্যক্ষ দর্শন করি, পরমেশ্বরের সত্তা সেইরূপ অনুভব ত দূরের কথা তাঁহায় তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণেও আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। তাঁহার বর্ত্তমানতা—তিনি যে ব্যক্তিরূপে মহান্ পুরুষরূপে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন, তিনি যে সর্ব্বসময়ে উজ্জ্বল ও মহতোমহান্ হইয়া আমার কথা শুনেন, আমাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করেন, সে জ্ঞান উজ্জ্বল ভাবে ত আমাদের থাকেই না, তাঁহার বিদ্যমানতা অতি সামান্য ভাবেও প্রাণে অনুভব হয় না। আমরা কথাবার্ত্তায় যে ভাব সচরাচর প্রকাশ করি, আলোচনার সময় তাঁহার বর্ত্তমানতার কথা যেমন ব্যক্ত করি, বাস্তবিক প্রাণে কার্য্যতঃ সেইরূপ উপলব্ধি কিছুই করিতে সমর্থ হই না। আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ সেই মহতোমহান্ বিষয়াতীত পরম পুরুষকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। তাই মন উপাসনায় যাইয়াও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের অনুধ্যানে রত হইতে থাকে।

আমরা তাঁহার বিদ্যমানতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারি না। তাই তাঁহার মহিমা-জ্ঞানের ও অভাব ঘটে। তাই মহতের প্রভাব ক্ষুদ্রের প্রতি যাদৃশ কার্য্যকর হওয়া উচিত তাহাও আমাদিগের উপর হয় না। মহৎ হইতে যে শক্তি অলক্ষিত ভাবে আসিয়া ক্ষুদ্র ও হীনকে পরাজিত করে—বশীভূত করে, তাহা আমাদের পক্ষে ঘটে না। আমরা জীবনে তাঁহার কোন প্রভাব অনুভব করিবার সুবিধা পাই না। সাধারণতঃ সাধক মাত্রেই অবগত আছেন,যে মুহূর্ত্তে তাঁহার আবির্ভাব সামান্য রূপেও অনুভূত হয় সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণ যেন অজ্ঞাতসারে শান্ত ও সমাহিত হইয়া যায়। বাচালতা আন কোথায় লুক্কায়িত হয়। অন্যমনা হইয়া বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হওয়া একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতেছে,তাঁহার পূজার মনস্থিরের পক্ষে সত্তা অনুভবেরই বিশেষ প্রয়োজন। তাহার অভাবেই চিত্তচাঞ্চল্য আসিয়া আমাদিগকে পূজা হইতে দূরে লইয়া যায়।

এখানেও দেখা যাইবে আমরা আমাদের নিত্য-সহায় এবং নিত্য আশ্রয় সার সত্যস্বরূপের বিদ্যমানতা, তাঁহার জাগ্রত সত্তা যে অনুভব করিতে পারি না, তাহার কারণ—আমাদের চেষ্টা এজন্য অতি সামান্য। আমরা দিবসের অধিকাংশ সময় বহির্বিষয়ের চর্চ্চায় যাপন করি। স্থূল বিষয়ে যত সহজে আমরা নিমগ্ন হই সেই আলোচনায় যত অধিক সময় ব্যয় করি, অস্থূল কিছুর চিন্তা বা আলোচনার জন্য আমরা সেরূপ সময় প্রদান করি না। এই স্থূলবিষয়ের চিন্তারূপ প্রবল অভ্যাসের সহিত যেরূপ সংগ্রাম করা আবশ্যক আমরা যে তাহাও করিতেছি না, ইহা দ্বারাই আমাদের প্রাণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আশয় বুঝা যায়।

ভূমা মহান্ পরমেশ্বরের উপাসনায় যাহারা মগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের চেষ্টা চরিত্র কখনই এমন হয় না। তাঁহারা কখনও এত বহির্বিষয়প্রিয় হন না। সুতরাং যদি আমাদের সেই অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার সহবাস লাভ করা একমাত্র আবশ্যক ও উদ্দেশ্য হয়, তাঁহাতে নিমগ্নচিত্ত হইয়া যদি অপার আনন্দও শান্তিলাভ করা প্রাণের একান্ত প্রার্থনীয় হয়, তবে এরূপ উদাসীন ও বহির্বিষয়াসক্ত হইলে চলিবে না। অধিক সময় এই কার্য্যে যাপন করিতে হইবে। আমাদের বহির্বিষয়ে আসক্ত থাকিবার অভ্যাস যেমন বহুদিনের এবং প্রবল পরাক্রান্ত, আমাদিগকেও তেমনি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত তাহার বিরুদ্ধে চলিবার জন্য প্রাণপণে লাগিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের পশ্চাতে এমন একজন বর্ত্তমান আছেন, যাঁহার অভয় হস্ত আমাদিগকে নিরন্তর সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং যাঁহার প্রভাব আশ্চর্য্য ভাবে আমাদিগকে সেই বিষয়াতীত রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত ব্যগ্র।

বিশেষ বিধান।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

ডাক্তার মার্টিনো একস্থলে বলিয়াছেন,—"তোমরা বলিতেছ ঈশ্বর অনন্ত ও পরিবর্ত্তনশীল। যদি ইহার অর্থ এই হয় যে এমন সময় ও স্থান নাই, যখন এবং যেখানে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে না, তবে এ কথা নিতান্ত সত্য। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বত্র ও সমান ভাবে প্রকাশিত হইতেছে—এই প্রকাশের আধিক্য বা অল্পতা নাই—সাধুলোকের জীবনে ও একখণ্ড প্রস্তরের ভূপতনে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ একই প্রকারের—আমাদের পক্ষে তাঁহার নৈকট্য বা তাঁহা হইতে দূরত্ব ইত্যাকার অবস্থান্তর নাই—তবে আমার বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা গুরুতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না।"

তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন, "গৃহে বসিয়া নিজের প্রকৃতির গঠন প্রণালীই পর্য্যালোচনা কর, আর বাহিরে গিয়া জগতের ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ই চিন্তা কর, সর্ব্বত্র এই নিয়মটী দেখিতে পাইবে;—যে, তাঁহার কার্য্যের, তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশের মধ্যে যাহা সর্ব্ব নিম্নস্থানীয় তাহাতেই পরিবর্ত্তনের ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সেই গুলিই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক্ এক ভাবে চলে; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাবের কার্য্য ও ইচ্ছার প্রকাশ সকলের প্রকৃতি জোয়ার ভাঁটার ন্যায়; তাহারা তরঙ্গের ন্যায় সময়ে সময়ে উদ্বেলিত হইয়া লুক্কায়িত গহ্বর সকল প্লাবিত করিয়া দেয়।"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাস গ্রহণ, পাকযন্ত্রের কার্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু শুদ্ধ জীবন রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়,তাহার কার্য্য কি নিদ্রা কি জাগরণ সকল অবস্থাতেই সমভাবে চলিয়াছে; কিন্তু দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সেরূপ নহে; উহাদের কার্য্য থাকিয়া থাকিয়া হয়, উহারা কখনও কার্য্য করে, কখনও নিশ্চেষ্ট ভাবে নিদ্রা যায়। আবার মানসিক শক্তি সকলের কার্য্য এক দিকে শারীরিক শক্তির কার্য্য অপেক্ষা আরও বিরামশীল; মানসিক অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য অধিকক্ষণ ধরিয়া করা যায়। অপরদিকে মনের যে সকল শক্তি যত উন্নত তাহাদের কার্য্য

ততই অধিকক্ষণ অন্তর প্রকাশ পায়,এবং তাহারা সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার অনধীন; অপরের আবিষ্কৃত জ্ঞান শিক্ষা করা, সমালোচনা করা, বিচার করা, জ্ঞাতবিষয় শ্রেণীবদ্ধ করা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানসিক কার্য্য, সাধারণতঃ আমাদের ইচ্ছাধীন; কিন্তু নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার, নূতনভাব বা আদর্শের অবতারণা প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক শক্তির প্রকাশ আমাদের ইচ্ছাধীন নহে; আমরা ইচ্ছা করিয়া নূতন সত্য, ভাব, বা আদর্শ মনে আনিতে বা অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না; মনের অবস্থা বিশেষে উহারা আপনাপনি আসে, আবার আপনাপনি চলিয়া যায়। সংগ্রাহক বা সঙ্কলনকারীর কার্য্য ইচ্ছাধীন; পরিশ্রম করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু কবি বা উদ্ভাবকের মনের ভাব ঠিক্ যেন অন্য কাহারও ইচ্ছাসাপেক্ষ—কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও উচ্ছ্বাস কখনও অবসাদ তাঁহাদের প্রাণকে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করিয়া থাকে। আবার মানসিক শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ আরও বিরামশীল। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও সাধু যাঁহারা তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা কর, শুনিতে পাইবে যে প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন বহুকাল অন্তর অন্তর ঘটিয়া থাকে; অন্ধকার বা মৃদুআলোকের অবস্থার তুলনায় উজ্জ্বল আলোকের অবস্থা অতি অল্পই সম্ভোগ করা যায়। যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিক পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদিগকেও কত সময় অন্ধকারময় পথে চলিতে হয়; তখন স্বর্গের আলোক কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, কেবল পূর্ব্বানুভূত শুভ মুহূর্ত্তের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্ত ভিন্ন অন্য কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য পাওয়া যায় না। এই স্থলে সাধু মার্টিনো বলিয়াছেন, "যদি বল আত্মার এই অবসাদ, কেবল উৎসাহের তারতম্য ও দুর্ব্বলতার ফল, তবে সে কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। অগষ্টাইন, টলার লুথার প্রভৃতি উন্নত ও গভীর ভাবসম্পন্ন মহাত্মাদের জীবনেও কি এই প্রকার পর্য্যায়ক্রমিক উচ্ছ্বাস ও অবসাদের অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না?" পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টের জীবনেও এই অবসাদের অবস্থা বিরল নহে। যাঁহারা মহাত্মা চৈতন্য দেবের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাও জানেন যে তিনি এইরূপ অবসাদ নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই বরং দেখা যায় যে যাঁহাদের প্রাণ পরমেশ্বরের জন্য অধিক ব্যাকুল তাঁহাদের জীবনেই এই অবসাদের ভাব যেন অধিক প্রবল। তবেই দেখা যাইতেছে যে উচ্চতর সত্যের ভাব ও আদর্শ লাভ কেবল আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ নহে। তবে চেষ্টা ভিন্ন, ব্যাকুলতা ভিন্ন কিছুই হয় না এ কথাও ঠিক্।

তাহার পর মহাত্মা মার্টিনো দেখাইয়াছেন যে মানব প্রকৃতি ছাড়িয়া যখন বিশ্বব্যাপারে ও ইতিহাসে ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করা যায় তখনও ইতিপূর্ব্বে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে তাহার যাথার্থ্যের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও তাঁহার ইচ্ছার যে সকল প্রকাশ উচ্চতর ভাবাপন্ন তাহা অধিকতর বিরামশীল, তাহা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির বিরাম নাই, উহারা প্রতিনিয়তই চলিয়াছে, কিন্তু পুষ্প ফলাদির উৎপত্তি, জীব জন্তুর জন্ম প্রভৃতি উচ্চতর দৈহিক কার্য্য সকল বিরামশীল। উহা সময়ে সময়ে ঘটে। আধ্যাত্মিক ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যায় যে সকলের জীবনে, সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসে ঐ সকল ভাবের প্রকাশ সমান নহে। যদিও পরমেশ্বর প্রতিহৃদয়ে বাস করিতেছেন, কেহই তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নহে, তথাপি সকলের জীবনেই যে তাঁহার প্রকাশ সমান এমন কথা বলা যায় না। যাঁহার জীবন যত উন্নত আমরা তাঁহার জীবনে সেই পরিমাণে পরমেশ্বরের প্রকাশ স্বীকার করি। আবার জনসমাজের বিশেষ সঙ্কটের অবস্থায় সাধু মহাত্মা ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের প্রাণে তাঁহার যে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বহুদিন অন্তর অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি অপেক্ষা আত্মার কার্য্য প্রণালী অধিকতর স্বাধীন ভাবাপন্ন। উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাব সকল থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হয়—ইহাই এ রাজ্যের নিয়ম।

অতএব নিয়ম বলিলেই যে প্রতিমুহূর্ত্তে ও সর্ব্বস্থলে সমভাবে তাহার কার্য্য হইতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। মানব সমাজের নিয়ম হইতে একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—মনে করুন ব্যবস্থাপক সভা চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি নির্দ্ধারণ করিবেন। এস্থলে তাঁহাদিগের শুদ্ধ সাধারণভাবে একটী নিয়ম করিলে চলিবে না; অপরাধের গুরুত্ব, অপরাধীর পূর্ব্ব চরিত্র প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম করিতে হইবে। প্রথম অপরাধ অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তি নির্দ্দেশ করিতে হইবে; দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয়বারের অপরাধে আরও গুরুদণ্ড দিতে হইবে ইত্যাদি। আবার এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম সত্ত্বেও বিচারককে প্রায়ই আনুষঙ্গিক অবস্থা বিচার করিয়া আপনার বিবেচনা অনুসারে দণ্ডের ইতর বিশেষ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অবস্থা অনুসারে নিয়মের কার্য্য ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। নিয়ম এক অর্থে সকল স্থলেই সমান; কিন্তু নিয়মের কার্য্য বা প্রকাশ সকল অবস্থায় সমান নহে। পরমেশ্বর যে অবস্থার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় ঠিক্ তাহারই বিধান করিতেছেন। অবস্থার ভিন্নতা অনুসারে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। একদিকে যেমন তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল, অপরদিকে তেমনি তাঁহার সহিষ্ণুতা অনন্ত। তাঁহাকে আমরা পাপের দণ্ডদাতা বলিয়া স্বীকার করি। অথচ পাপ করিবামাত্র তখনই কি তিনি পাপীকে দণ্ড দেন? যতদিন না পাপী নিজের জঘন্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুতপ্ত হয় ততদিন পাপের প্রকৃত শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু এই জঘন্যতা বুঝিতে সকলের কি সমান সময় লাগে? বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে অল্প বা অধিককাল পরে প্রাণে অনুতাপের সঞ্চার হয়। পরমেশ্বর সকলের প্রাণেই আছেন। অথচ সকলের জীবনে দেব ভাবের প্রকাশ সমান সময়ে হয় না। তিনি সহিষ্ণু ভাবে উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করেন। জনসমাজের আধ্যাত্মিক অবনতি সম্বন্ধেও এইরূপ। এ সকল স্থলে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশই নিয়ম।

জড় জগৎ যেমন নিয়মাধীন, আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি নিয়মাধীন। কিন্তু জড় জগৎও আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নহে। মানবাত্মা গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় জড়পিণ্ড নহে যে উহাদের সম্বন্ধে যে প্রকৃতির নিয়ম উপযোগী মানবাত্মার পক্ষেও সেই প্রকৃতির নিয়ম উপযোগী হইবে। মানব প্রকৃতিকে পরমেশ্বর স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,এই স্বাধীনতাই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি। কাজেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম জড়জগতের নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। প্রত্যেক আত্মার প্রকৃতি অপর আত্মা হইতে পৃথক্; অথচ সকল আত্মার মধ্যে সাধারণ সৌসাদৃশ্য আছে। সেই জন্য যদিও সকল আত্মার পরিত্রাণ প্রণালী সাধারণতঃ একভাবের, তথাপি প্রত্যেক আত্মার অবস্থা ও প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে উহার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। জনসমাজসম্বন্ধেও সেইরূপ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি ভিন্নভাবে হইল বলিয়া পরমেশ্বরকে পরিবর্ত্তনশীল বা পক্ষপাতী বলা যায় না।

অপরদিকে তিনি প্রতিহৃদয়ে থাকিয়া তাহার দেবভাব রক্ষা করিতেছেন। নতুবা উহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি মানবের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়া, নিজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বলপূর্ব্বক কাহাকেও কিছু করান না বলিয়া, আমরা সর্ব্বস্থলে তাঁহার সমভাবে প্রকাশ দেখিতে পাই না। তিনি দেবভাবের প্রতিক্রিয়াদ্বারা আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংসাধন করেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার জন্য বলসঞ্চয় আবশ্যক এবং বলসঞ্চয় সময়সাপেক্ষ। কাজেই মানবহৃদয়ে ও জনসমাজে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ সর্ব্বদা ও সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি প্রাণরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব সকলকে জীবিত না রাখিলে এই প্রতিক্রিয়া কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। এই অর্থে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল।

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে কয়েকটী কথা

প্রাপ্ত।

(৩)

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি ব্রাহ্মবিবাহে যে কন্যার ভারার্পণের রীতি আছে, তদ্দ্বারা নারীজাতিকে কিয়ৎপরিমাণে হীন করা হয়। উভয়ের সমান অধিকার স্বীকার করিলে একজনের প্রতি অন্যের ভার অর্পণের রীতি অবলম্বন করা কখনও যুক্তিযুক্ত হয় না; ব্রাহ্মবিবাহের প্রণালী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে আরও এমন কোন কোন ক্রিয়া এই বিবাহানুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যদ্দ্বারা নারী জাতিকে যে হীন চক্ষে দেখা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। প্রায় অধিকাংশ বিবাহেই কন্যাকর্ত্তা বরকে অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। অর্ঘ্য একটী পূজার উপকরণ বিশেষ। দেবতা কিম্বা পূজনীয় ব্যক্তিকেই অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি এমন মনে করা যায় যে কন্যাকর্ত্তা বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কারণে বর কন্যাকর্ত্তার সম্মানের পাত্র সেই কারণেই কন্যাও বর কর্ত্তার সম্মানের পাত্রী। সম্মান প্রদর্শন করা যদি ভাবী জামাতার প্রতি সঙ্গত হয় তাহা হইলে ভাবী পুত্রবধূর প্রতি কেন সে সম্মান প্রদর্শিত হইবে না? এস্থলে যে ইতর বিশেষ করা হয় তাহাদ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে কন্যাকর্ত্তা বরকে সম্মান করা যেমন আবশ্যক মনে করেন, কন্যাকে বরকর্ত্তা তেমন সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক মনে করেন না; কারণ সে তাহা পাইবার উপযুক্ত নয়। আর যদি বলা হয় যে অর্ঘ্যপ্রভৃতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রদত্ত হয় না, কিন্তু স্নেহ, ও আশীর্ব্বাদের চিহ্নস্বরূপে বা আন্তরিক সম্মতির প্রকাশকরূপে কন্যাকর্ত্তা বরকে তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কন্যাকে কেন বরকর্ত্তা তাঁহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ প্রভৃতির চিহ্নস্বরূপে কিছু প্রদান করেন না? তিনি যে কিছু দেন না এমন নহে, কিন্তু সেই সভাস্থলে কন্যাকর্ত্তা যে ভাবে বরকে প্রদান করেন, তিনিও কেন সেইভাবে প্রদান করেন না? বাস্তবিক আমাদের দেশের যে রীতি আছে কন্যাকর্ত্তা বরকে অর্চনাপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেও চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোন প্রথা একবার চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই যে তাহা চিরদিনই চলিতে থাকিবে, এমন কোন হেতু নাই। ব্রাহ্ম অবিচারে কোন একটী পদ্ধতিকে যদি গ্রহণ করেন,তবে তাহা কোন মতেই প্রশংসনীয় হইবে না। বিবাহ পদ্ধতিতে যেমন কন্যাকর্ত্তার বিশেষ কিছু করিবার থাকে,তিনি যেমন তাহার অনুষ্ঠানের একটী অংশ গ্রহণ করেন তেমনি বরকর্ত্তারও বিশেষ কিছু করা আবশ্যক। অনুষ্ঠানের কোন অংশ তাঁহাদ্বারাও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বরকর্ত্তা যেন বিবাহসভায় আর দশজন দর্শকের ন্যায় উপস্থিত থাকেন। এরূপ সাক্ষীগোপালের মত উপস্থিত থাকা তাঁহার পক্ষেও শোভার কারণ নয়; বর কন্যা উভয়ের প্রতিও তুল্য ব্যবহারের পরিচায়ক নয়।

ব্রাহ্মবিবাহে আর একটী পদ্ধতি স্থানে স্থানে অবলম্বিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। তাহা এই যে কন্যাকর্ত্তা বরকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এই প্রথাটী যে আমাদের প্রাচীন সমাজ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ মনুসংহিতাতে যে আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে দেখা যায়,শ্রেষ্ঠ বিবাহ কয়েকটীতেই কন্যাকর্ত্তা কর্ত্তৃক কন্যাকে উপযুক্তরূপে সজ্জিত করিয়া দক্ষিণা সহকারে বরকে সম্প্রদান করিবার বিধান আছে। দক্ষিণা ভিন্ন যেমন যজ্ঞ হয় না, তেমনি হিন্দু সমাজে দক্ষিণা ভিন্ন কন্যা সম্প্রদানও হয় না। বরকে যথাবিহিতরূপে অর্চনা করিয়া কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কিছু প্রদান করিয়া হিন্দু কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এই কন্যাদানের বহু ফলের কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সুতরাং কন্যা সম্প্রদান শব্দের অন্য অর্থ করা সম্ভবে না। হিন্দুসমাজ মনে করেন পুত্র কন্যা পিতা মাতার সম্পত্তি। সুতরাং তাঁহারা পুত্র কন্যাকে দান বিক্রয় করিতে পারেন। এই জন্যই হিন্দুসমাজে অন্যের পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার রীতি আছে। তাঁহারা পুত্রকে অপরের বংশ রক্ষার জন্য দান করিতে পারেন। বাস্ত-

বিক নিজের যে বস্তুর প্রতি সত্ব আছে, তাহাই অপরকে দান বা বিক্রয় করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মগণ কখনই আপনাদের পুত্র কন্যাদিগকে আপনাপন সম্পত্তি বিশেষের মত মনে করেন না। কোন আত্মাকে দান বিক্রয় করিবার উপযুক্ত অধিকারী বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন না। সুতরাং বিবাহের সময় কন্যা সম্প্রদান প্রথা ব্রাহ্মগণ যে কিরূপে অবলম্বন করেন আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দুগণ কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিজের ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের সৎগতি হইল বলিয়া যেরূপ আশ্বস্ত হন ব্রাহ্মগণের সেরূপ বিশ্বাস নাই যে কন্যা সম্প্রদান দ্বারা কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে। তবে এমন একটী অর্থহীন কার্য্যকে কেন বিবাহরূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়? এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা নারীজাতি সম্বন্ধে এখনও যে ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকেও যে সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক, সংসারের আর দশটী বস্তুর ন্যায় তাঁহাদিগকে মনে না করিয়া অক্ষয় অমর আত্মারূপে তাঁহাদিগকে দেখিবার পক্ষে এ সকল অনুষ্ঠান বিশেষ বাধা আনয়ন করে। নারিগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবার উপযুক্ত মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাতেও যদি ব্রাহ্মগণ তাহা প্রকাশ করিতে না পারেন বা অকারণে একমাত্র পূর্ব্বসংস্কারের অধীন হইয়া যদি এমন গুরুতর বৈষম্যের পোষকতা করেন, যাহা করা কোনওক্রমেই উচিত নয়, তাহা হইলে সে পরিতাপ রাখিবার স্থান কোথায়? আমরা আশা করি অর্থহীন জাতীয়-তার অনুরোধে বা কোন একটী প্রথা অনুসারে চলিতে ভাললাগে বলিয়া ব্রাহ্মগণ কোন কুসংস্কারের পোষকতা করিবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনাদিগের জন্য কোন অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার জন্য যত্নবান আছেন? তাঁহারা অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণয়নকালে এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন ইহাই বিনীত অনুরোধ।

আমি কার?

(প্রাপ্ত)

ব্যক্তিমাত্রেই যখন এই বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মনে এক মহা সমস্যার উদয় হয়,—আমি কার? সংসারি ব্যক্তি বলিবেন, এত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আমি এই সংসারের, অর্থাৎ পিতা মাতার, ভাই ভগ্নীর, স্ত্রী পুত্রের;—কিন্তু যথার্থই কি তাই? তুমি মনে করিতে পার, "আমি যথার্থই তাহাদের নইত আবার কার? আমার জর হইল, শয্যাশায়ী হইলাম, উঠিবার শক্তি নাই,—অমনি আমার যেখানে যে ছিল দৌড়িয়া আসিল। মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, আহার নাই নিদ্রা নাই, কেবল ভাবিতেছেন "বাবা আমার কবে ভাল হইবেন।" পিতা ভাল ভাল ডাক্তার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। যে যাহা বলিতেছেন, তিনি তাহাই করি-তেছেন। তাঁহার মনে কেবল উদয় হইতেছে,—কবে আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। ভ্রাতা দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন। ভগ্নী ক্রমাগত খাটিতেছেন। দেখ দেখি আমার জন্য এত কাণ্ড হইয়া গেল, আমার জন্য ইহারা প্রাণপণ খাটিয়া মরিলেন, আর আমি কিনা তাঁহাদের হইলাম না?

তুমি আমি, মা বাপ এবং ভাই ভগ্নীকে আপনার বলিয়া জানি। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনই বলিবেন না যে, 'সংসার আমার, আমি সংসারের'। যিনি একবার তলাইয়া ভাবিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, "আমি সংসারের নহি, সংসার আমার নহে"। কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইবেন, এবং বলিবেন, 'এমন একটা প্রত্যক্ষ সংসার, আমি সেই সংসা-রের কর্ত্তা, আমার উপর তাহাদের সমস্ত ভার ন্যস্ত, আমাকে কিনা বল, "তুমি এ সংসারের নহ?" এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র;—আবার আমি কার?

হায়! সংসারে এসে মানুষ কি ভয়ানক হয়! মানুষকে যখন ছয়টা ভূতে ধরে, তখন সেই ভূতগুলা ছাড়ানই বড় দায় হইয়া উঠে। ভূতে ধরা যত মানুষ আছে, তাহারা সকলেই বলিবে 'সংসার আমার, আমি সংসারের।' কিন্তু যিনি প্রকৃত মানুষ, অর্থাৎ যিনি ঐ ছয়টা ভূতকে বশ করিয়াছেন, তিনি বলিবেন "সংসার অসার"। যিনি 'সংসার অসার' এই কথা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন আরো কিছু অমূল্য জিনিষ আছে, আরো কিছু সুখকর পদার্থ আছে;—তবে তুমি আমি ইহার কি বুঝিব? যিনি বুঝিয়াছেন তিনি মনীষী;—তাঁহার পদাঙ্কাণুস্মরণ করিলে, আমরা পবিত্র হই। আমাদের এখন সে চক্ষু ফুটে নাই। আমরা তাই দেখিতেছি 'সংসার সার'। আমাদের চিন্তাশক্তি থাকিতে চিন্তা করি না। একবার ভাবি না এ সংসার কি? আমরা কে? আমরা মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইলাম, স্তনের দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলাম। স্তনের দুগ্ধ কোথা হইতে আসিল? কে উহাতে তেমন সুমিষ্ট, পুষ্টিকর খাদ্য দিল? উহা কি আপনা আপনি আসিল? চক্ষে দেখিতেছি মাত্র। জিনিষ থাকিলে স্রষ্টা থাকে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। এই দোয়াত ও কলম দিয়া লিখিতেছি;—ইহা কি আপনা আপনি হইয়াছে? সামান্য একটা দোয়াত দেখিয়া কি মনে হয়? আমরা কি একটা সামান্য কলম দেখিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি না যে এই দোয়াত এই কলমের কেহ নির্ম্মাতা আছেন? এই যে মসী দিয়া এত কথা লিখিতেছি, ইহা দেখিয়া কি বোধ হইতেছে না যে, এই মসীর কেহ প্রস্তুত-কর্ত্তা আছে? জানিয়া শুনিয়া কেন আমরা পশুর ন্যায় কেবল আহার বিহার করিয়া বেড়াই? চিন্তাশক্তি থাকিতে কেন আমরা উহার চর্চ্চা করি না?

দুদিন পূর্ব্বে দেখিলাম স্নেহময়ী মার স্তনে আদৌ দুগ্ধ নাই। মা যাই পুত্র প্রসব করিলেন অমনি স্তনে দুগ্ধ আসিল? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জিনিষ থাকিলে, তাহার নির্ম্মাতা থাকে। মাতৃ স্তনে দুগ্ধ দেখিয়া কি আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে পারি না? এই দুগ্ধ কে আনিয়া দিল? যিনি দুগ্ধ আনিলেন তিনি কি আমাদের মত একজন মানুষ? মানুষের ত কই ওরূপ ক্ষমতা নাই! তবে তিনি কে? তিনি আমাদের সকলের মা। সুধু মা কেন, তিনি ভাই বন্ধু, তিনি, মা বাপ, তিনি আমাদের সব! আমাদের পিতা মাতাও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন! মা

নইলে কি ছেলেকে কেহ যত্ন করিতে পারে? মা নইলে ছেলেকে কি বুকে ক'রে ধরে থাকতে পারে? মা নইলে কি এমন ক'রে সুমিষ্ট পুষ্টিকর দুগ্ধ দিতে পারে? তিনি আমাদের বিশ্বজননী মা! সেই মাকে একবার প্রাণ ভ'রে, এক মনে, মা ব'লে ডাক দেখি! অমনি তিনি তোমার প্রাণের ভিতরে এসে বলিবেন, "কেন বাবা ডাকছ, এই যে আমি এসেছি?" আহা! কি মধুর স্বর। কি শান্তি জনক! আমাদের এমন স্নেহময়ী মা, বিশ্বজননী মা থাকিতে কেন আমরা তাঁহাকে ডাকি না? কেন আমরা এত দিন তাঁহাকে ডাকি নাই? আমাদের অন্তরের ভিতরে এমন সোণার জিনিষ থাকিতে, বাহিরের মাটীর জিনিষ নিয়ে কেন ভুলে থাকি? এমন মার কেন আমরা আপনার হই না? এবং এমন মাকে কেন আমরা আপনার বলি না?

এ সংসার কি? মানুষ এখন তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ যে এসংসার কি? আমি কার? আপনাদের চক্ষু সকলি অন্ধ। অন্তরে এক জ্যোতির্ম্ময় আছেন! আমরা সে আলো দেখিতে পাই না! তিনি না থাকিলে আমরা কি জীবনধারণ করিতে পারি? তিনি না খাইতে দিলে আমরা কি খাইতে পাই? তিনি না সুখে রাখিলে, আমরা কি সুখে থাকিতে পারি? তিনিই সকল সুখের মূল! আহা! ঐ যে, সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর আহার, উহা কে আনিয়া আমাদের মুখে দিতেছে? উহা আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম! ঐযে পাত্রে জল রহিয়াছে উহা কোথা হইতে আসিল? উহা কে আনিয়া দিল? আমরা পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলাম। স্নেহময়ী মা আমাদের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত। কিসে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন! আহা! কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! কি চমৎকার প্রেম! নির্ম্মম কোন্ পাষণ্ড তাঁহাকে দিনান্তে একবার স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে?

মানুষ তুমি এখন কি বুঝিতে পারিলে যে, এ সংসার কিছুই নয়? এসংসারে তুমি, আমি এবং সকলেই তাঁহার;—সেই স্নেহময়ী বিশ্ব জননী মার! আর'ও কি বুঝিতে চাও? এত এত বুঝিয়া সুঝিয়া, তবু কি তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর ন্যায় আহার বিহারে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে? আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে?

মানুষ যখন প্রকৃত মানুষ হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে এ সংসার যথার্থই মায়া; পরমেশ্বর এমনি কৌশলে সৃজন করিয়াছেন যে সকলেই মনে করে "এই আমার, ঐ আমার, এই আমার মা, ঐ আমার বাপ।" কিন্তু যাই পশুবৃত্তি গুলি অসির দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা হয়, অমনি মনে হয় "সংসার মায়াময়;—আর সেই সারাৎসার পরমেশ্বর।" প্রথমেই মনে হয়, "আমি কার? কোথা হইতে আসিলাম? কি করিব? কেন আসিলাম?" এই সকল প্রশ্ন ক্রমাগত মনোমন্দিরে আন্দোলিত হইতে থাকে। তখনই তিনি ভাবিতে থাকেন, "আমি আর একটা কে? এই যে সংসার, এটাই বা কি? আমি কোথা হইতে আসিলাম? আমি কি আকাশ হইতে আসিলাম? না আমাকে কি কেহ এখানে পাঠাইয়াছেন?" প্রকৃত ভাবুক যিনি, তিনি হৃদয় মন্দিরে এই সকল চিন্তা করিয়া অজস্র রোদন করিবেন। তিনি চিন্তায় আকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে বসিবেন, "হায়! আমি জালে পড়া পাখির ন্যায় পড়ে আছি, একবারও জাল কাটীবার চেষ্টা করিলাম না! মায়ায় পড়ে প্রাণের সখাকে ভুলিয়া রহিয়াছি! আমার প্রকৃত মা বাপকে ভুলিয়া রহিয়াছি! আমি কে? আমি ত আমার নহি! আমি ত তাঁহার অংশ! সবই ত তাঁহার! মা বাপ, ভাই বন্ধু যে যেখানে আছেন, সে সবই ত তাঁহার। তবে পৃথিবীতে আমার বলিবার ত কিছু নাই! আমি নিজে আমার নই, আমার আবার কে? এত দিন মায়ায় পড়ে আমার আমার করিলাম, সে সকলইত ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে! কেন আমি সেই পবিত্র জ্যোতি স্বরূপকে আমার বলি নাই;—তিনি আমার, আমি তাঁর। মানুষ তুমি এখানে কদিনের জন্য? তুমি ত তাঁহার নিকটে যাইবে! সংসার ত জল বিম্ব স্বরূপ! এই আছে, এই নাই। আজ তুমি হয় ত ধনে মানে একটা মস্ত লোক! আজ তুমি হয় ত পৃথিবীকে সরা খানা জ্ঞান করিতেছ! আজ তুমি এজলাসে বসিয়া ফাঁসির হুকুম জারি করিতেছ! কিন্তু বলি, ওভাই, কাল তুমি কোন্ এজলাসে? কাল যে তোমার ফাঁসির হুকুম হইল।

যে মানুষ এক মুহূর্ত্ত সময় কি তাহা নির্ণয় করিতে পারে না, সে কাল, পরশু, এক মাস এক বৎসর কি করিয়া বলে? তবে তুমি মিছে 'আমার' 'আমার' কেন কর?

তাই বলিতেছিলাম মানুষ তুমি কার? সেই আদি, অনন্ত অপার, অগম্যকে স্মরণ করিয়া সুখী হও। পার্থিব কোন সুখ নাই। এ সংসার আশা মরীচিকার ন্যায়। মানুষ তুমি ঈশ্বরের; তুমি এ পৃথিবীর কাহারও নহ; এই কথা বেশ বুঝিয়া সংসারে থেকো! সংসারের কুহকে কদাচ পড়িও না। সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ ইহা ঘোর পরীক্ষার স্থল। তুমি যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার চরণ কমল দেখিতে পাইবে, তাঁহাতে লীন হইবে। মনে যদি বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে কিসের ভয়? নির্ভয় হও। বীরের ন্যায় কার্য্য কর। তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকিতে শিখ। আসুক সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আসুক, পুত্রের মৃত্যু শোক, পিতা মাতা, বন্ধু পরিজনের মৃত্যু শোক আসুক, কিছুতেই তোমাকে টলাইতে পারিবে না;—সমভাবে সকল অবস্থাতেই তোমার চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে। *

জিতেন্দ্রিয় হও। রিপুপরবশ হইও না। কিন্তু এটা যেন বেশ মনে থাকে, "আমি তাঁর, তিনি আমার" ভয় কি তাহা হইলেই তুমি তাঁহাকে পাইবে। সংসারেরদিকে নামমাত্র মন রাখিবে; এবং মনে করিবে আমি তাঁহারই সংসারে খাটিতেছি। পরোপকারের জন্য আপনাকে বলি দিবে। ধর্ম্মান্ধদিগকে চক্ষু ফুটাইয়া দিবে। সকল কাজ করিবে; কিন্তু সেই মহাত্মা যোগী যীশুখ্রীষ্টের বাণী হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাখিয়া সকল কাজ করিবে;—" Not my will, but thine be done O Father!"

প্রেরিত পত্র

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় কাশীতে আগমন পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার বিবরণ সংক্ষেপে তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার একদিনের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক বোধে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলাম।

১৭ই কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় ইজ্বর নগরের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল লাইব্রেরীতে

* মিঃ Addison তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন;—"Pain and sickness, shame and reproach, poverty and old age, death itself, considering the shortness of their duration, and the advantage we may reap for them, do not deserve the name of evils. A good mind may bear up under them with fortitude, with indolence, and with cheerfulness of heart. The tossing of a tempest does not discompose him, which he is sure will bring him to a joyful harbour."

From the Spectator.

শাস্ত্রীমহাশয় ইংরাজীতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় Religious Revolution in the West what does it teach us. অত্রত্য খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বাবু রামকালী চৌধুরীমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতাস্থলে হিন্দু, আর্য্য, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রায় ৩।৪ শতলোকে হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতায় শাস্ত্রীমহাশয়ের বাগ্মীতা ও প্রাণের আবেগ একত্র মিশ্রিত হইয়া, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের এমনি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে রক্ষণশীল পুনরুত্থানকারী হিন্দুসমাজের কোন কোন ব্যক্তি যে সকল আপত্তি করিয়াছিলেন, বক্তা পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সদুত্তর এমন দক্ষতার সহিত প্রদান করিলেন, যে সকলকেই মৌনাবলম্বন করিতে হইল। সভাস্থলে কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারিও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক এই সুযোগে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া আপনাদের স্বাধীন ভাষায় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। পরে সভাপতি মহাশয় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে এরূপ বক্তৃতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করায়, বক্তার সদুক্তির কিছুমাত্র খণ্ডন হইবে না, অধিকন্তু বিরুদ্ধবাদীর অযথা বাক্যব্যয়ে আমাদের কেবল সময় নষ্ট হইবে। ফলতঃ উপসংহারে ইহাই বলা যায় যে কাশীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে এরূপ বক্তৃতা লোকসমাগম, শুনিবার জন্য একাগ্রতা, সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের স্বাধীনভাবে বক্তার সপক্ষে ও বিপক্ষে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ, এবং সভাভঙ্গ কালে সভাপতি মহাশয়ের উদারভাবে সকলকে বুঝান, এই গুলির একত্র সমাবেশ এখানে কখনই হয় নাই। এই জন্যই কাশীনগর, বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই পক্ষে এই দিনটী একটী স্মরণীয় দিন।

অনুগত

বেনারস — শ্রীনীলমণি পাল

মহাশয়!

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এলাহাবাদ ছাত্রসমাজ সমিতি দ্বারা আহূত হইয়া ১০ই নবেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদে আগমন করেন। রবিবারে তিনি অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা কালে উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা, নীতি ও প্রেমপূর্ণ কথা, উপস্থিত সকলে শুনিয়া বিশেষ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন; এমন কি উপাসনা শেষ হইলেও কেহ সমাজগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি ১১ই তারিখে "রাজা রামমোহন রায় প্রথম ভারতবর্ষীয় সমাজ সংস্কারক" এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, তাহাতে পাদরী জনসন্ সাহেব সভাপতি ছিলেন।

তিনি ১২ই তারিখে সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় বালিকা বিদ্যালয়ে "আধ্যাত্মিক উপাসনা" সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। অতি সুন্দর সরলভাষায় এরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে অনেক মূর্ত্তিউপাসকের অনেকদিনের প্রাণের ধাঁধাঁ দূর হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, ঈশ্বর উপাসনার এমন সুন্দর—উপায় আমরা কখন শুনি নাই বা মনে ধারণা করিনাই।

একান্ত বশম্বদ

এলাহাবাদ — শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল।

মহাশয়!

ফরিদপুর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ যে সকল সদাশয় ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় ২০৲ ডাক্তার ডিঃ বসু ১০০৲ ভুবনমোহন সেন ২০৲ শ্রীনাথ দাস ৫৲ উমাচরণ আচার্য্য ১০৲ শ্রীনাথ গুহ ৫৲ আনন্দমোহন দাস ১৩।০ কৃষ্ণকুমার দত্ত ২৲ গগনচন্দ্র সেন ৪৲ তারকনাথ সেন ১০৲ শশীকুমার গুপ্ত ৫৲ দুর্গাদাস দাস ১৲ কেদারনাথ রায় ২৲ শিবচন্দ্র দেব ৫৲ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ২॥০ সতীশচন্দ্র দাস ৫৲ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১০৲ রাধামাধব বসু ১০৲ গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১০৲ কৃষ্ণনাথ রায় ১০৲ রাসবিহারী ঘোষ ৫০ দুর্গাচরণ ঘোষ ১০৲ কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ১০৲

৩৩৮৷৵০

ক্রমশঃ

ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ — শ্রীরাজকুমার চন্দ, সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ জী মধ্যভারতবর্ষে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ শিবনাথ বাবুর পত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"২০এ নবেম্বর খাণ্ডোয়াতে বাঙ্গালিদের জন্য বাঙ্গালাতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। ২২এ নবেম্বর Mhow (মৌ) নামক নগরে পৌঁছি। এখানে ২৩এ নবেম্বর শনিবার লছমন প্রসাদ জী "সত্যধর্ম্মের লক্ষণ কি" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন—বক্তৃতান্তে আমিও ইংরাজীতে ঐ বিষয়ে কিছু বলি। সকলে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সকলেই আমাদের প্রতি অতিশয় সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪এ নবেম্বর রবিবার—অদ্য আমরা ইন্দোরে পৌঁছি এবং State guestরূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হই। সেইদিন সায়ংকালেই আমাদের বাসভবনে এখানকার প্রার্থনাসমাজের সভ্যদিগকে লইয়া উপাসনা হয়। লছমন প্রসাদ জী হিন্দীতে উপাসনা করেন। ২৫এ নবেম্বর সোমবার। অদ্য সায়ংকালে এখানকার পবলিক লাইব্রেরি হলে, লছমন প্রসাদ জী "ঈশ্বর-ভক্তি ও মানব-প্রেম" বিষয়ে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইয়াছিলেন। এই দিন প্রাতে আমরা উভয়ে এখানকার মহারাজার Secretary ও Prime Minister মহাশয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। ২৬এ নবেম্বর মঙ্গলবার অদ্য সায়ংকালে লাইব্রেরি হলে আমার এক ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় "মুক্তি ও তৎসাধনের উপায়" বক্তৃতাস্থলে এখানকার প্রধান রাজমন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ২৭এ নবেম্বর—এখানকার প্রার্থনাসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা। লছমন প্রসাদজী হিন্দীতে উপাসনা করেন। আমি পাঠ ও হিন্দীতে ব্যাখ্যা ও হিন্দীতে প্রার্থনা করি। লছমনপ্রসাদজী "মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব ও তৎসাধনের উপায়" বিষয়ে উপদেশ দেন। ২৮এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার। অদ্য প্রাতে মহারাজা হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যথেষ্ট সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি লিখিতেছি—"আমি চাই তোমরা এই বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ধর্ম্মকে পরাজয় কর "but my HEART BROKE when I heard there were dissensions amongst you: yours is an infant movement, internal dissensions will greatly weaken it" কতক হিন্দী কতক ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। অদ্য সায়ং কালে এখানকার ছাত্রদের অনুরোধে লাইব্রেরি হলে, Culture and Higher

Life বিষয়ে আমার এক বক্তৃতা হয়। ২৯এ নবেম্বর শুক্রবার—অদ্য সায়ংকালে ইন্দোর cantonment ছাউনীতে মিশন স্কুলের তথাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অনুরোধে Duties and Re-posisibilities of Educated Indians বিষয়ে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা হয়। ৩০এ নবেম্বর শনিবার অদ্য প্রাতে লছমন প্রসাদজী এখানকার প্রার্থনা সমাজের কতিপয় সভ্যের বাসায় মহিলা দিগকে একত্রিত করিয়া উপাসনা করেন। আমাদের আগমনে কেহ কেহ এখানকার প্রার্থনা সমাজের সভ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক লোক ধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের বাসাতে যাতায়াত করিয়াছেন। কোন কোন যুবা পুরুষ সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় উজ্জয়িনীর জজের সেরেস্তাদার মহাশয়ের বাসাতে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপাসনা কার্য্য লছমন প্রসাদজী হিন্দীতে করিয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বর রবিবার।—অদ্য উজ্জয়িনীর কলেজ লাইব্রেরি হলে লছমনপ্রসাদজী, "সত্যধর্ম্ম ও মতান্তরের কারণ" বিষয়ে হিন্দীতে এক বক্তৃতা করেন ও আমি ইংরাজীতে কিছু বলি। ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতি সকল ধর্ম্মের সার এবং ধর্ম্মের এই সার ভাগই অবলম্বনীয় ইহাই বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার, অদ্য প্রত্যূষে আমরা রতলাম পৌঁছি। পৌঁছিয়া শুনিলাম রতলাম পতি মহারাজা রণজিৎ সিং দুই দিন পূর্ব্বে কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে রাজ অতিথিরূপে গ্রহণ ও সম্মান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তদনুসারে এখানেও আমরা রাজ অতিথিরূপে বাস করিয়াছিলাম! অদ্য সায়ংকালে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দীমহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হয়, লছমন প্রসাদজী উপাসনা করেন। উপাসনাস্থলে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত সংগীতাদিতে যোগ দিয়াছিলেন, দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম। এই সমাজটী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নবীনচন্দ্র রায়মহাশয়, তাঁহার রতলাম অবস্থিতি কালে স্থাপন করিয়াছিলেন।

৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—অদ্য সায়ংকালে রতলাম কলেজ ভবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বিষয়ে লছমন প্রসাদজী একটী বক্তৃতা করেন এবং আমিও ইংরাজীতে কিছু বলি। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের" প্রতি সমাদর ও সদ্ভাব প্রকাশ করিতে কেহ ত্রুটী করেন নাই।

নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা—আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষিরার সবডিবিশনে গত ২৫এ কার্ত্তিক একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তথায় গমন করাতেই এই সমাজটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার বাসাতেই ইহার কার্য্য চলিতেছে।

দান প্রাপ্তি—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজী যখন ইন্দোরে মহারাজা হোলকারের রাজধানীতে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাজা আমাদের প্রচারকগণের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখান। তিনি শিবনাথ বাবুর নিজব্যয় নির্ব্বাহার্থ তথাকার ১২৫ টাকা এবং লছমন প্রসাদজীকে ৭৫-টাকা প্রদান করিয়াছেন। মহারাজা হোলকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়-নির্ম্মাণের ঋণ শোধের জন্য ও ৪০০ চারিশত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই অনুগ্রহের দান প্রাপ্ত হইয়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চারুবার্ত্তা লিখিয়াছেন "বরিশালের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশন এবং সূর্য্যকান্ত হলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছেন। সরল ভাষায় বিশদ করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা বক্তার বেশ আছে। ধর্ম্মের কথা ইনি মর্ম্মস্পর্শী করিতে পারেন।"

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন চেরাপুঞ্জি এবং শেলায় গমন করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সলমন যব এবং থম নামক দুই জন যুবকও গমন করিয়াছিলেন। যব সলমন দুই দিন এবং থম এক দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন।

বিবাহ—গত ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার কটক নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র বয়স ২৫ বৎসর। এই ইঁহার প্রথম বিবাহ। কন্যার নাম শ্রীমতী সরস্বতী, বয়স ১৭ বৎসর। বাল্যকালে ইনি বিধবা হন। বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

দীক্ষা—বাগআঁচড়া হইতে বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন দিনে বাগআঁচড়ার ভিন্ন ভিন্ন পল্লিনিবাসী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতেছি। বাগআঁচড়া নিবাসী বাবু রতিকান্ত মল্লিক, শ্রীমতী কুসুম কুমারী মল্লিক, শ্রীমতী দাক্ষায়ণী মল্লিক, শ্রীমতী মাতঙ্গিনী মল্লিক, শ্রীমতী পটেশ্বরী মল্লিক, শ্রীমতী তারিণী মল্লিক, শ্রীমতী হরিদাসী মল্লিক। সংকরপুর নিবাসী বাবু প্রসন্ন কুমার মল্লিক, শ্রীমতী গিরিবালা মল্লিক, শ্রীমতী সৌদামিনী মল্লিক, শ্রীমতী শান্তিময়ী মল্লিক। কুলবেড়িয়া নিবাসী বাবু পরেশ নাথ মল্লিক, বাবু সীতানাথ মল্লিক, বাবু তিনকড়ি মল্লিক, বাগুড়ি নিবাসী বাবু অমৃতলাল মল্লিক শ্রীমতী মানদা মল্লিক, শ্রীমতী মেঘমালা মল্লিক। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ধর্ম্মরাজ্যে নবপ্রবিষ্ট এই সকল ব্যক্তিগণের প্রাণে দিন দিন ধর্ম্ম পিপাসা প্রবল করিয়া সকলকে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন!

পত্র প্রেরকগণেরপ্রতি

বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর শান্তিকেতন। গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে বোলপুর শান্তিনিকেতন হইতে জনৈক ব্রাহ্ম স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রতিবাদ করিয়া আপনি যে পত্রলিখিয়াছেন অনাবশ্যক বোধে তাহা প্রকাশিত হইল না। সৎলোক কোন বংশ বিশেষেই জন্মে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সুতরাং সৎলোক দেখিয়াই পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনকরা উচিত। বংশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ হইলে কেবলই জাতিভেদের প্রতি অনুরাগ দেখান হয়।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ ভোটিং পত্র সকল সভ্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য তাহা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলেই ভোটিং পেপার প্রেরণ করা যাইবে। আগামী ৬ই জানুয়ারির পরে আর ভোটিং পত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক১লা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

১২শ ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ সোমবার, ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

প্রার্থনা।

তোমার মহিমা, নাথ, ছোট ছোট ক্ষুদ্র তারে
অতুলন স্নেহভরে ঘিরে আছে চারি ধারে;
সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, নিরখি তোমারি জ্ঞান,
অনন্ত শকতি তব দিশি দিশি বিদ্যমান;
আছি মোরা পূর্ণ জ্ঞান প্রেম শকতির কোলে,
জানিনা, মনের ব্যথা জানাব কি কথা বলে;
তুমিই জানিছ, দেব, কি চাহি তোমার কাছে,
তুমি জান, ক্ষুদ্রদের অনন্ত অভাব আছে,
আর জানি, নাহি জানি, আমরা প্রার্থনা জানি
হৃদয় তোমারে চাহে মুখে 'দাও, দাও' বাণী।

নিবেদন ও প্রার্থনা—আমাদিগের চিরন্তন সুহৃদ পরমেশ্বর! আমাদের দিন কি এমন ভাবে বৃথা আক্ষেপ ও হা হুতাশ করিয়াই কাটিয়া যাইবে? বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আমরা জীবনের এমন একটা অবস্থায় যাইয়া পৌছিতে পারিতেছি না, যেথানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি আমরা নিরাপদ হইয়াছি—যে অবস্থায় যাইয়া মনে এমন সান্ত্বনা পাইতে পারি যে আমাদের দুঃখের দিন অবসান হইল। আর আক্ষেপ করিয়া করিয়া দিন কাটাইতে হইবে না। কবে আমাদের জন্য সেই শুভ দিন আনয়ন করিবে, যে দিনে "বরষ বরষ চলিয়া যায়, না হেরি প্রেম বয়ান" এইরূপ আক্ষেপ করিয়া আর মনক্ষোভে দিন কাটাইতে হইবে না। প্রভু পরমেশ্বর! তুমি কি সংসারের চতুর পিতার ন্যায় আমাদিগের সহিত চতুরতা করিতেছ? সংসারের পিতা যেমন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে বাহিক চাক্‌চিক্যশালী পুতুল এবং খেলনা দিয়া তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেয়, তুমিও কি আমাদিগকে সেইরূপ বাহিক চাক্‌চিক্যশালী দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া ভুলাইতে চাও। সংসারের অবোধ বালক বালিকারা ক্ষণিক বাহিক শোভা দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, তাহারা আপাত-মনোহর চক্ষুর আনন্দকর বস্তু সকল পাইয়াই একবারে আনন্দে উথলিয়া উঠে, সহজেই সন্তুষ্ট মনে খেলায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের কিছুই দেখিতে সমর্থ নয়। উপস্থিত শোভাময় কিছু পাইয়াই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কিছুকাল গত হইলেই দেখিতে পায় যাহাকে অতি সুন্দর ও রমণীয় জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং বিশেষ কিছু পাইয়াছি বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিল, তাহা আর তেমন সুন্দর তেমন মনোহারী নাই। তাহার সকল শোভা, সকল চাক্‌চিক্য কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথন তাহাদের যেমন আক্ষেপ করিতে হয় যে, না জানিয়া কি সকল সামান্য বস্তুতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমরাও তোমার রাজ্যের বাহিরের পদার্থ,—যাহা বাস্তবিক জীবনদানে সমর্থ নয়, যাহা পাইলে জীবনের স্থির ও অটল ভিত্তি পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষণিক অসার বস্তু পাইয়া বাহিক আড়ম্বর ও ধূমধামে মত্ত হইয়া আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইব? বৎসরের পর বৎসর উৎসব আসিতেছে, তুমি আমাদের সম্মুখে কত কি উপস্থিত কর, কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ ও লঘুচিত্ত যে যাহা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা লইয়াই আশ্বস্ততা ও সন্তুষ্টির সহিত গৃহে গমন করি। কিন্তু হায়! কিছুকাল পরেই দেখিতে পাই সে সকল বস্তু আমাদিগকে স্থায়ী জীবন প্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমাদিগকে আবার হা হুতাশ করিতে হয়। প্রভু আমাদিগের দৃষ্টিকে প্রকৃত বস্তু চিনিবার মত উপযুক্ত কর, যেন বিশ্বাস, ভক্তির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া জীবনের স্থায়ী ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়া অটলভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি। কর্ত্তব্যপথ হইতে যেন বিচলিত হইতে না হয়। দিন দিন তোমার সহিত ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিয়া যাহাতে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারি, এমন কোন উপায় করিয়া দেও। হে উৎসবের দেবতা এবারকার উৎসবান্তে যেন আমাদিগকে আর আক্ষেপ করিতে না হয় যে, ক্ষণিক বাহিক আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস মাত্রেই আমাদের সকল আশা ও উদ্যমের পরিসমাপ্তি হইল। স্থায়ী জীবনদায়ক কিছু আমাদিগকে প্রদান কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ,—ঈশ্বরকে কেন পাই না? যাঁহার আলোক বিনা কেবল অন্ধকার দেখি, যাঁহার সহ-

বাসে ইন্দ্রত্ব পদ অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পারি, সংসারের সহস্র আকর্ষণের মধ্যে যাঁহাকে একবার ভুলিতে পারি না, সর্ব্বদাই যাঁহার জন্য প্রাণ বিরলে অশ্রুপাত করে, তাঁহাকে কেন পাই না? পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন বিজ্ঞান বলেন ঈশ্বর বহুদূরে বলিয়া তাঁহাকে শীঘ্র লাভ করা যায় না। পুরাতন শাস্ত্র পুরাতন বিধানের মতে ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন এবং অনেক তপস্যা সাধনা ও পরিশ্রমের পর সে স্থানে উপনীত হইতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রশ্নের অন্যবিধ উত্তর প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, যে ঈশ্বর দূরে বলিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না, একথা ঠিক নহে, ইহার বিপরীত কথাই সত্য। ঈশ্বর অতিশয় নিকটে বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি সাদক বলিয়াছেন, 'অন্ধকার রজনীতে কৃষ্ণ প্রস্তরে ক্ষুদ্রতম পিপীলিকার গতি যেমন নিগূঢ়, তদপেক্ষা অধিক গূঢ়রূপে ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে স্থিতি করেন। মহাত্মা পার্কার বলিয়াছেন যে, যখন তুমি প্রার্থনা কর তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন থাকিয়া তোমাকে প্রার্থনা করান। অনন্ত ঈশ্বর যদি আপনি আপনার পূজা না করান কে তাঁহাকে পূজা করিতে পারে? কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, বলিয়া ভ্রান্তজীব হাহাকার করিয়া ভবারণ্যে ঘুরিয়া মরে, কিন্তু সে জানে না যে তাহার ব্যাকুলতা, বিরহ ও আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া তাহার ইষ্ট দেবতা আপনাকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর বিলম্বে অথবা কদাচিৎ প্রকাশ হন একথা পুরাতন শাস্ত্রের; ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন শাস্ত্র নূতন কথা বলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বর দিবা নিশি প্রকাশ হইতেছেন ও তাঁহার প্রকাশের বিরাম নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন অতীত নাই, সকলই বর্ত্তমান, তাঁহার প্রকাশ সম্বন্ধেও সেইরূপ। তিনি নিত্য প্রকাশবান; আলোক অন্ধকার, জীবন মৃত্যু, সকলেই তাঁহাকে প্রকাশ করে। consciousness বা সংজ্ঞার প্রত্যেক স্ফূরণে তাঁহার প্রকাশ। জীবনবেদের লেখক তিনি, প্রত্যেক পংক্তি তিনি লিখিতেছেন। প্রত্যেক জীবন-লীলা লীলাময় পরম দেবতার লীলা। তবে পাই না কেন? চিনি না বলিয়া। যিনি সাধক, যিনি ভক্ত, তিনি দেবতাকে তাঁহার প্রকাশে চিনিয়া ধরিয়া ফেলেন; অভক্ত দেবতাকে চিনিতে না পারিয়া হারায়। মাদাম গেয়ে কারাগারের প্রাচীরস্থ প্রস্তর খণ্ডে তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, আমরা অতি মনোহর প্রকৃতির শোভা পূর্ণ স্থানেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না। সুচতুর সেই, যে সচেতন থাকিয়া নিত্য প্রকাশবান দেবতার অবিশ্রান্ত প্রকাশের প্রতি আপনার চিত্তকে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রকৃত মনন—মন সর্ব্বদা উচ্চ ভূমিতে থাকে না, মাঝে মাঝে নামিয়া পড়ে। মোহ বিপদে পদে পদে জড়াইতেছে; মনকে জাগ্রত রাখা কি সহজ কথা; বহুআয়াসে দীর্ঘ কালব্যাপী উপাসনাদি দ্বারা কষ্টে যোগ-সূত্র বাঁধিলাম; খানিক পরে দেখি কোথায়ও কিছু নাই; এই মনে করিতেছিলাম যে দেবতাকে দৃঢ় যোগে বাঁধিয়াছি, এই দেখি কোথায় বা দেবতা কোথায় বা যোগ-সূত্র। মননই মোহের ব্রহ্মাস্ত্র; মননই বিক্ষেপ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়; মোহ সকল পাপের মূল। আত্মা যখন মুগ্ধ বা নিদ্রিত, সময় বুঝিয়া তখন সকল পাপ-দৈত্য আক্রমণ করে। আত্মাকে নিত্য জাগ্রত রাখাই সাধনের কৌশল। জাগ্রত রাখিবার উপায় মনন। যেমন তেমন মনন হইলে কিন্তু চলিবে না। একাগ্র মনন চাই। মহর্ষি সাদক বলিয়াছেন "ঈশ্বরের পার্শ্বে সমুদায় বস্তুকে বিস্মৃত হওয়া প্রকৃত ঈশ্বর মনন। ঈশ্বর মননকারীর সম্বন্ধে সমুদায় পদার্থের স্থান ঈশ্বর অধিকার করেন।" যিনি সাধক নহেন তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যোগ থাকে না, তাঁহার কাজে কথায় যোগ নাই। কথায় কথায়, কাজে কাজে, ভাবে ভাবে, যোগ নাই, ভাবে কাজে ও ভাবে কথায় যোগ নাই। ভক্ত সাধক মহাজনদিগের জীবন অন্য প্রকার, সাধ্য দেবতার একাগ্র মননসূত্রে তাঁহাদের জীবন, কার্য্য, ভাব ও ইচ্ছা সকলই বদ্ধ। তাঁহারা একজনের অধীন, জীবনও তাঁহাদের এক ভাবাপন্ন। এক ইষ্ট দেবতার প্রবল মননে অন্য বিষয়ের মনন তাঁহাদের মনে নিবিয়া যায়। অনুরাগের নিয়ম এই যে অনুরাগের বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরে যাইবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। এক বিন্দু আসক্তি থাকিতে মননের পূর্ণতা হয় না। যখন ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হন, যখন তাঁহার প্রতি অনুরাগ অন্য সকল অনুরাগ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, তখন মন ঈশ্বরের পার্শ্বে সমুদায় বস্তু বিস্মৃত হয়। মননের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য চাই। যাঁহারা মনন বা স্মরণ সাধনা করিতেছেন, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। যদি দেখিতে পান, মন ইষ্ট দেবতা ভিন্ন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে, অমনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে যথার্থ আমরা ঐ ইচ্ছাকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করি কি না; যদি বাস্তবিকই ঈশ্বর হইতে ইচ্ছা-বিশেষ আমাদের প্রিয় হয়, অমনি অনুতাপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে, এবং প্রাণ দগ্ধ হইয়া ঈশ্বর সহবাসে অধিকতর উপযোগী হইবে। এমনই সাধনা চাই শতকাজে ব্যস্ত থাকি না কেন, মন প্রাণের দেবতার কাছে পড়িয়া থাকিবে। অনুরাগীকে আর একথা বুঝাইতে হয় না। আমাদের অনুরাগ কিনা বড় অল্প, তাই এত প্রবর্ত্তনার আবশ্যক!

এ জগৎ কাহার নিকট আনন্দময়?

"আনন্দ আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব, তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন, মধুর কিরণ বরষে।"

পৃথিবীর অসীম দুঃখ দুর্গতির দিকে যদি তাকান যায়, যদি একবার ভাবা যায় কত লোক দিনান্তে উদর পূরিয়া আহার পাইতেছে না। সমস্ত দিন খাটিয়া মাতার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, গৃহে ফিরিয়া গিয়া প্রিয় তনয় তনয়াদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া চারিটী অন্ন প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, এমন লোকের সংখ্যা কত?—দারুণ শীতে উপযুক্ত বস্ত্র পায় না—বিষম শীতের প্রকোপে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই অবস্থাতেই প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়, রৌদ্র বৃষ্টি হইতে শরীর রক্ষা করিতে পারে না, উপযুক্ত গৃহের অভাবে বৃক্ষতলে

বাস করিতে হয় অথবা লতা পাতার কুঁড়ে ঘর করিয়া দিন কাটাইতে হয় এমন লোকের সংখ্যাই বা কত। রোগে উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না, ঔষধ ও পথ্যাভাবে অকালেই দেহ নাশ ঘটে এমন লোকের সংখ্যাই বা কত। এইরূপ পৃথিবীর দীন দরিদ্রগণ রোগ, শোক এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রতিকূলতা হইতে যে সকল উপদ্রব প্রতিনিয়ত মানবমণ্ডলীকে সহ্য করিতে হয়, তাহার কথা মনে ভাবিলে কি আর সহজবুদ্ধিতে বলা যায় যে "আনন্দ আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব"। দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুঃখ যন্ত্রণারদিকে তাকাইয়া যেন এরূপ উক্তি করিতে পারা না গেল, যেখানে দীনতা নাই যেখানে বিদ্যা বুদ্ধির অভাব নাই, লোকে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া করিয়া যেখানে কি উপায়ে সেই সঞ্চিত ধন রক্ষা করা যাইতে পারে, একমাত্র এজন্যই উপযুক্ত বুদ্ধিমান মন্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক হয় কোন্ উপায়ে তাহার ধন সুরক্ষিত হইবে তাহার ভাবনাতে যেখানে লোককে অস্থির হইতে হয়। যেখানে চারিদিকে প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষায় উৎকর্ণভাবে অনুচরগণ অবস্থিতি করিতে থাকে; মুখের কথাটী বহির্গত হইতে না হইতে যেখানে একজনের স্থলে পাঁচ জন আজ্ঞা পালনে ধাবিত হইতেছে, এমন যে ধনী, এমন প্রতাপশালী রাজা তাহার পক্ষেই কি উক্ত কথা বলা সকল সময় শোভা পায়? ধনীর পরিবারে কি শোকের ভীষণ মূর্ত্তি দেখা দেয় না? সেখানে কি পিতা মাতাকে সন্তানের শোকে, পুত্রকে মাতা পিতার শোকে, ভাইকে ভগিনীর শোকে, ভগিনীকে ভাইয়ের শোকে, পত্নীকে স্বামীর শোকে স্বামীকে পত্নীর শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতে হয় না? শোকের দারুণ মূর্ত্তি কাহার গৃহে না উপস্থিত হইতেছে? সেখানে কি অপ্রেমের বিষম কোলাহল শ্রুত হয় না? বিবাদ বিসম্বাদ কি সেই ধনীর গৃহ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে? এইরূপে এক বিষয়ে যাহাকে সুখী মনে হইতেছে অপর দিকে অন্য বহু বিষয়ে হয়ত তাহাকে অসুখী হইতে হইতেছে। দুঃখ এক বেশে মানবের সহিত সাক্ষাৎ করে না। নানা আকারে নানাবিধ ঘটনায় দুঃখ লোককে নিরন্তর জ্বালাতন করিতেছে। পৃথিবীর নানাবিধ দুঃখের দিক দিয়া দেখিলে উপরের উদ্ধৃত সংগীতাংশকে কখনই সমীচীন উক্তি বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু যে সংগীতাংশ উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহা ত অসার বা বৃথা কবিকল্পনামাত্র নয়। কবি উচ্ছ্বসিত মনাবেগে সেরূপ ভাব মাত্র প্রকাশের জন্য নানাবিধ চিত্র কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা ত বাস্তবিক সেরূপ কল্পনার ব্যাপার নয়। তবে কাহার পক্ষে এ জগৎ আনন্দময়? পৃথিবীর দুঃখ রাশি কাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়? পৃথিবীর দুঃখরাশির দিকে তাকাইয়া যদি উক্তরূপে উক্তি করা সম্ভব না হয়, তবে কাহার পক্ষে এ কথা বলা সাজে যে "আনন্দ আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি একি স্নেহ তব" তাঁহার পক্ষেই খাটে, যিনি প্রেমিক। ঈশ্বর-প্রেম যাঁহার প্রাণকে সংসারের লাভ ক্ষতি গণনার অতীত করিতে সমর্থ করিয়াছে; একমাত্র সেই প্রেমাস্পদের সহবাস যাহার প্রাণকে এ সকল পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার প্রাণ সেই অমৃত সরোবরে চিরমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রেম আস্বাদন করিয়া সংসারকে ভুলিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার পক্ষেই উক্ত কথা সকল বলা সাজে। প্রেমিক যিনি তিনি এই সৃষ্টিকে তাঁহার অমূল্য দান বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি দেখেন চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, আকাশ, জল, বায়ু সকলই সেই প্রেমাস্পদের প্রদত্ত অমূল্য বস্তু। এ সকল ভোগ্য বস্তুর মধ্যে তিনি তাঁহারই হস্ত দেখিতে পান। সংসারের নর নারী যেন তাঁহার প্রদত্ত প্রেম-পুতুলের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। মাতার স্নেহে, ভাই ভগিনীর বিমল-প্রেমে, দম্পতির পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ে তিনি কেবলই সেই প্রেমাস্পদেরই প্রকাশ অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার প্রাণ সহজেই বলিতে থাকে "হেথা আমি আছি একি স্নেহ তব"। চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পায়। কিন্তু কাহার পক্ষে এরূপ উক্তি করা সম্ভব যে "তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে" আমরা রোজ সূর্য্যোদয় দেখিতেছি কই তেমন ত কিছু অনুভব করি না। বিমল চন্দ্রমা কত বার দেখিয়াছি কই তাহাতে ত এমন মনে হয় নাই যে এ সকল তাঁহারই মধুর কিরণ বরষণ করিতেছে। আমরা দেখি চন্দ্র আমরা দেখি সূর্য্য, আমরা দেখি বাহির—জড়ীয় শোভা। সুতরাং আমরা ইহার মধ্যে স্বর্গীয় কিছু কি করিয়া অনুভব করিব। কিন্তু প্রেমিক দেখেন চন্দ্র সূর্য্যে তাঁহারই প্রকাশ। নক্ষত্র ভূষিত আকাশে সেই তাঁহার প্রেমাস্পদেরই আবির্ভাব। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্রই তাহার ভাবে ভাবুক হইয়া এ জগতকে মধুময়রূপে অনুভব করেন। জগতের দুঃখ দারিদ্র্য তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি প্রেমিক তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের সহবাসে থাকিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। সুতরাং এ জগতকে তাঁহার প্রেমাস্পদের আবির্ভাবের আধাররূপে দেখিয়া তাঁহার হাতের গড়া বস্তুরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে, এক সঙ্গে বাস করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যদি উক্ত গান করেন তাহা হইলেই শোভা পায়। অন্যের পক্ষে কেবল গাওয়াই সার হয়, বৃথা বাক্য উচ্চারণই লাভ হয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মাঘোৎসব।

দূরাগত সংগীত ধ্বনি যেমন অজ্ঞাতসারে লোকের মনকে আকর্ষণ করে, বহুদিনের প্রবাসীর নিকট স্বদেশবাসীর স্বর যেমন মধুর ও চিত্তের আকর্ষণের কারণ হয়, তেমনি আমাদের প্রাণে সমাগতপ্রায় মাঘোৎসবের সুমিষ্ট আহ্বান ধ্বনি মিষ্ট হইতে মিষ্টতররূপে অনুভূত হইতেছে। যেন বহু দিনের পর প্রিয়জনের সমাগমের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে। নূতন আশা প্রাণকে উৎফুল্ল করিতেছে। কেন মাঘোৎসবের আগমন বার্ত্তা আমাদের নিকট এমন মধুর বোধ হইতেছে? আমাদের পক্ষে কি ইহা অপেক্ষা সুখের এবং চিত্তোন্মাদকারী দিন আর নাই? সংসারের চক্ষে দেখিলে মানবের পক্ষে ইহাপেক্ষা আনন্দের দিন আরও

যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিকই মাঘোৎসবের আগমন বার্ত্তা ব্রাহ্মের পক্ষে যেমন উৎসাহ, যেমন আশা ও আনন্দের ব্যাপার,তেমন আর কোন দিন থাকিতে পারে না, যাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মগণ এমন প্রফুল্ল হইতে পারেন।

আমাদের প্রাণ যে উৎসাহিত হইতেছে, তাহার কারণ ইহা নয় যে বিষয়ী বিষয় লাভ করিবার আশায় যেমন আহ্লাদিত হয়, আমরা তেমন কিছু পাইব বলিয়া উৎসাহিত হইতেছি। অথবা সংসারে সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া বা তৎসম্বন্ধীয় কোন পারিবারিক উৎসবে পিতা মাতা যাদৃশ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন আমরা সেরূপ কিছুর লাভাকাঙ্ক্ষায় আশান্বিত হইতেছি। আমাদের আশা অন্য কিছু পাইবার আশা। যে দিনে লোকে নবজীবন পাইবার আকাঙ্ক্ষা পাইয়াছে, যে দিনে বহুকালের পাপতাপাক্রান্ত নরনারী অনুতাপের প্রবল অনলে নিরন্তর-দগ্ধ-হৃদয় স্নিগ্ধ করিবার সন্ধান পাইয়াছে;—যেদিন পাপীর অশ্রু-মোচনের উপায়রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন কি পারিবারিক কোন উৎসবের দিন অপেক্ষা মহত্তর নহে? সে দিন কি পাপীর পক্ষে আশাও আনন্দের দিন নহে? বহুদিনের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশ যখন পরিষ্কার হইয়া যায়, যখন সেই মেঘমালা ভেদ করিয়া সূর্য্য হইতে সমাগত রশ্মিজাল মানবনয়নের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করে, তাহা যদি আনন্দ ও উৎসাহের কারণ হয়,তাহা হইলে বহুকালের অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের আকাশমণ্ডল যাহা বহুদিন কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীর আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, সে আবরণ ভিন্ন করিয়া, যে দিনে উদার সত্যালোক প্রকাশের সূত্রপাত হইয়াছে, যে সত্যালোক পাইয়া বহু নর নারী প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন জীবন পরিত্যাগ করিয়া নবীন জীবন পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে দিনের স্মৃতি কি বিষয়ীর বিষয় সুখলাভের দিন অপেক্ষা অধিক আনন্দের ও উৎসাহের হেতু স্বরূপ নয়। ব্রাহ্মসমাজ বহুদিনের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন, এপথে যাহারা চলিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিরাশার হেতু নাই। যাহারা নানাপ্রকার বাহ্যিক উৎকট ক্রিয়াকাণ্ডের বা শঙ্কটপূর্ণ সাধনাড়ম্বরের বিভীষিকায় ভীত হইয়া নিরাশ মনে এপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, নিরাশ হইবার হেতু নাই। এপথের যিনি চালক তিনি সরল পিপাসুর পিপাসা কখনই অতৃপ্ত রাখেন না। নিরাশ মনে আত্ম-কল্যাণ সাধনে বিমুখ হইবার প্রয়োজন কাহারও নাই। নবজীবনের আশা আমরা আমাদের এই পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। সুতরাং আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের মহোৎসবের আগমন বার্ত্তায় যে উৎসাহিত হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি?

জীবন্মৃতের জীবন লাভ, অন্ধের চক্ষুঃ লাভ, পঙ্গু ও চলৎ-শক্তিহীনের চলিবার শক্তি লাভ এবং পাপের গভীরকূপে মগ্ন হইয়া যাহার প্রাণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, আশার একটি কণাও যাহার প্রাণে জাগে নাই, তাহার পক্ষে পুণ্যের কিরণ মালার দর্শন কি আনন্দের ব্যাপার নহে, যদি এসকল ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও মাঘোৎসবের দিনের স্মৃতিতে যে আনন্দ ও উৎসাহের উৎস খুলিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু আমরা যে উৎসব করিব আমাদের কি উৎসব করিবার মত কোন আয়োজন আছে? আমরা কি ধনী যে উৎসব করিবার সাধ করিতেছি? পৃথিবীতে দেখিতে পাই, ধনী যাহারা—যাহারা ঐশ্বর্য্যবান তাঁহারাই উৎসব করিয়া থাকেন। দীন দরিদ্র যাহারা তাহারা উৎসব করিবার বাসনা করিতে পারে না। তাহারা উৎসবের কোন আয়োজন করে না বটে কিন্তু তাহারা ধনীর উৎসবের আনন্দের অংশী হইতে চায় এবং দান প্রাপ্ত হইয়া লাভবান হইতে চায়। বাস্তবিক ধনী অপেক্ষা দরিদ্রেরই উৎসবে লাভ বেশী। ধনী দান করেন, দরিদ্র লাভ করে। আমরা যে উৎসবের বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি তাহাও এজন্য যে আমরা লাভবান হইব। পুণ্য-ধনের কাঙ্গাল আমরা—প্রেম ভক্তির কাঙ্গাল আমরা, উৎসবে যাইয়া পুণ্য ও প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। নিরাশ-প্রাণে আশা লাভ করিয়া, মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার দেখিয়া ধন্য হইব। এই আমাদের আশা এবং তাই আমাদের উৎসবের বার্ত্তায় অধিকতর আনন্দ হইতেছে। সংসারের উৎসব কর্ত্তা ধনী। আমাদের উৎসবের কর্ত্তা কোন মানুষ নহেন। কিন্তু স্বয়ং জগজ্জননী। তাঁহার দীন-হীন সন্তানের দুঃখ মোচন উদ্দেশে এই উৎসব আনয়ন করিতেছেন। তাঁহার সদাব্রত অন্নছত্রে সকলকে ডাকিতেছেন, ক্ষুধিত তৃষিত কে আছ সত্বর করিয়া এস, তোমাদের দুঃখ দারিদ্র্য আর থাকিবে না, আর নিরাশ মনে মলিন মুখে পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইবে না; একবার এই অন্নছত্রে আগমন পূর্ব্বক প্রেমান্ন গ্রহণ কর, চিরদিনের দুঃখ সন্তাপ দূর হইয়া যাইবে। তিনি নিজেই দানব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কাহারও প্রতি এ ভার তিনি প্রদান করেন না। কেহ বা নিরাশ হইয়া উৎবের দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়, মানুষের দোষে অমনোযোগে তাঁহার কোন সন্তান বা বিফলমনোরথ হয় এই নিমিত্ত তিনি নিজেই উৎসবের প্রধান কার্য্য দান-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসবের যাত্রীগণকে, তাঁহার মধুর আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র সকলের জন্যই বাহির হয়, কিন্তু উদাসীন ও আত্ম-কল্যাণ-বিমুখ অলস দরিদ্রের নিকট তাহা পৌছে না। এ জন্য আমাদিগকে আশান্বিত অন্তরে জাগ্রত ও উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে, যেন তাঁহার মধুর আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ হইতে বঞ্চিত না হই।

আমরা যখন দীন দুঃখী তখন আমাদিগকে দীনতার ভূষণ মস্তকে ধারণ করিয়াই উৎসবে গমন করিতে হইবে। দীনহীন যে সে যদি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পরের নিকট হইতে ধার করিয়া সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া দান গ্রহণ করিতে যায়, সে কি দান প্রাপ্ত হয়? সেরূপ লোকের কিছুই পাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া, শঠ ও প্রবঞ্চক জ্ঞানে দানকর্ত্তা তাহাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেন। সুতরাং আমরা যেন আত্ম-প্রতারিত না হই, নিজ নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইয়া যেন অহঙ্কারী না হই। দীন যে সে দীনবেশে যাইবে, তাহাতে আর লজ্জা কি? সুতরাং প্রবল

আশা, দীনতা ও বিনয়কে সঙ্গী করিয়াই যেন আমরা উৎসবে গমন করি। সদা জাগ্রত প্রাণে সচকিত মনে উৎসবের প্রত্যেক ব্যাপারে যোগ দান করিতে হইবে। কোন্ সময় কোন্ সুযোগে জগন্মাতা আমাদের দীনতা দূর করিবেন, তাহা যখন আমরা জানি না অথচ আমাদের যখন পাওয়া প্রয়োজন, তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যাকুল প্রাণে দানক্ষেত্রে হাজির থাকিতে হইবে। অন্যথা দানের সময় বহিয়া গেলে আমাদিগকে নিরাশ হইয়া উৎসবক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইবে। বাতাসের প্রয়োজন যাহার, তাহার পক্ষে উচিত, সর্ব্বক্ষণ দ্বার জানালা খুলিয়া রাখা। কারণ বাতাস নাই বলিয়া যদি কেহ দ্বার অবরুদ্ধ রাখে, তাহা হইলে যখন বাতাস বহিতে থাকিবে তখন ত তাহার গৃহে বাতাস প্রবেশ করিবে না। এজন্য সদা সচকিত মনে আকুল-প্রাণে আশা এবং উৎসাহের সহিত উৎসবে গমন করিতে হইবে। যখন সময় আসিবে, উপযুক্ত অবস্থা আসিবে, তখন দাতা দান করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না। তবে সকলে আশান্বিত হই, বিশেষ প্রার্থনার সহিত সেই শুভ সময়ের জন্য অপেক্ষা করি। উৎসবের দ্বারে ত্বরা করিয়া যাইয়া উপস্থিত হই। দীনবন্ধু আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

উৎসবের পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন।

উৎসব আগত প্রায়। উৎসবের পূর্ব্বে আমরা প্রতি বৎসর উপাসকদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি, এবারও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের আশা, প্রত্যেক ভাই ভগিনী উৎসব গ্রহণের জন্য আপনাদিগের আত্মাকে প্রাণপণে প্রস্তুত রাখিবেন।

তিনটী কারণে উৎসবের ফল স্থায়ী হয় না। ১ম—উৎসবের পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত না হওয়া, ২য়—উৎসবের সময় উপযুক্তরূপে উহা গ্রহণ না করা ও ৩য়—উৎসবের পরে যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে উৎসবের ফল না রক্ষা করা। মুক্তি-লাভার্থী উৎসব পিপাসু নর নারী এই ত্রিবিধ কারণ পরিহার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

বাহিরের আড়ম্বরে মাতিলে যে আত্মার অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যদি ভিতরে কিছু না থাকে, তবে বাহিরের ধুমধামে যোগ দেওয়ায় বা না দেওয়ায় যে সমান ফল, ইহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা অন্তর্মুখী, তাঁহারা বিনীত ও গম্ভীরভাবে যত টুকু বাহিরের করা উচিত, ততটুকু করুন, বহির্মুখী আত্মাসকল আপনা আপনি আকৃষ্ট হইবে। মধু বৃষ্টি হউক, মক্ষিকাকুল আপনা হইতে ছুটিয়া আসিবে, আলোক প্রজ্বলিত হউক, পতঙ্গবৃন্দ আপনা হইতে উড়িয়া পড়িবে। যার মধু নাই, সে যেন মধু আছে বলিয়া না দেখায়। বিনীত ও অনুতপ্ত-হৃদয়ে সে মধুচক্রের শরণাপন্ন হউক।

পর্ব্বদিন সকল ক্রীড়া বা আমোদের বস্তু নহে। যে সকল পর্ব্বদিনে ইতিহাস ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তিত হয়, সেরূপ দিন অতি অল্পই আছে। সুতরাং অতি গম্ভীর ভাবে এই সকল দিন গ্রহণ করিতে হইবে। অনুষ্ঠান বিশেষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সংযমের বিধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরাতন সুবিধি লোপ করিতে আসেন নাই। সংযমের নিয়ম আমাদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের সংযমে ও অন্যশাস্ত্রের সংযমে কিন্তু একটী প্রভেদ থাকিবে। অন্যশাস্ত্রের সংযমে অনেক বাহিরের ব্যাপার আছে, আমাদের সংযম খাটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

"তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না, নতুবা আমি তাহা দিতাম, হোমেতেও তুমি তুষ্ট নহ। ভগ্ন আত্মারূপ বলিই ঈশ্বরের গ্রাহ্য; ভগ্ন ও অনুতাপিত হৃদয়কে, হে ঈশ্বর! তুমি তুচ্ছ করিবে না।" (দায়ুদের সঙ্গীত ৫১—১৬, ১৭) ইহাই আমাদের সংযম।

সংযমের আরম্ভে অনুতাপ, মধ্যে দীনতা ও শেষে নির্ভর। আপনাকে খাট না করিলে, আপনার ভিতর যে একজন মহান্ পুরুষ আছেন, তাঁহাকে কিরূপে বাড়াইবে? দিবসের আলোক কমিয়া না আসিলে আকাশের তারা কি রূপে নয়ন-গোচর হইবে? উপাসক মাত্রেই সাক্ষ্য দিবেন, যে উপাসক যখনই আপনার অসারতা বোধ করেন, তখনই উপাস্য দেবতার সারবত্তা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। অনুতাপ ও অসারতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। বারি বিন্দু যখন সাগরে পড়িয়া আপনাকে হারায়, তখনই শুক্তিগর্ভে সেই বিন্দু রাজমুকুট-ভূষণ-মুক্তা-আকার ধারণ করে। এই দীনতাও অনুতাপে নিরাশের নাম গন্ধ থাকে না। আপনার উপর যতক্ষণ আশা অর্পিত থাকে, ততক্ষণ যে নিরাশা থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কি? আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও অক্ষমতা কার অবিদিত আছে? দীন ও অনুতপ্ত সাধকের আশা কিন্তু সাধ্য দেবতার উপর স্থাপিত; নিরাশা কখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। আপনাকে অসার ও কৃপা লাভের অনুপযুক্ত জানিয়া উৎসবের দ্বারে যিনি আপনাকে লইয়া যাইবেন, উৎসবের দেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিবেন।

মহদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠাতাগণের মানস বা সঙ্কল্প করিবার বিধি আছে। নিঃসঙ্কল্প হইয়া "যেখানে ইচ্ছা স্রোত লইয়া যাউক" ভাবে যোগ দিয়া অনেক বার দেখা গিয়াছে কোন ফল হয় নাই। কোন বিশেষ সংকল্প বা উদ্দেশ্য লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিতে হয়, একথা অন্যান্য বৎসর অনেক বলা হইয়াছে, স্মরণার্থ এবার উহা কেবল উল্লেখ করা গেল। উদ্দেশ্য স্থির করিবার সময় কিন্তু স্মরণ করা উচিত, যে

"তিনি হে উপায়, তিনিই উদ্দেশ্য
তিনি স্রষ্টা পাতা, তিনি হে উপাস্য"

শ্রীচৈতন্য গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া ছাত্রদিগকে বলিতেন, "ভাই সকল সর্ব্বদা হরিনাম স্মরণ কর, আদি অন্ত মধ্যে শ্রীহরি ভজনা কর।" আমাদেরও সেই কথা, উৎসবই কর আর যাহাই কর, আসল কথা ভুলিবে না। উৎসবের আদি অন্ত মধ্য যিনি, তাঁহার সহিত যোগ সংস্থাপিত করিবার চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। অনেক সময় এমন হইয়াছে, আমরা বাহিরের আড়ম্বর, জনসমাগম ও কার্য্য বাহুল্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, ভিতরে কিছু ধরিতে পারি নাই। মাঘ

দিবস সকলের এতদপেক্ষা অধিকতর অসদ্ব্যবহার আর কি হইতে পারে? সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে এই প্রধান উদ্দেশ্য থাকা চাই, যে একবার ভাল করিয়া উৎসবের দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। সাধু মহাজনগণ বলিয়াছেন, যে দর্শন অমূল্য এবং এক একবারের দর্শনের বলে জীবন দশ পনর বৎসরের পথ অগ্রসর হয়। "দেখিলে তোমারে, হৃদয় জুড়ায় হে" বাস্তবিক কথা, ইহাতে অণুমাত্র অত্যুক্তি বা প্রচলিত ধর্ম্মের ভাষা প্রয়োগ নাই। যে সকল মুহূর্ত্তে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা পরিচয় হয়, সেই সকল মুহূর্ত্তই জীবনের চিরস্মরণীয়। সহস্র প্রতিজ্ঞার বল অপেক্ষা অধিক বল একবারের দর্শনাভাসে পাওয়া যায়। সম্বৎসর যে সংসার রূপ বিদেশে প্রবাসীর কষ্ট ভোগ করি, একবারের দর্শনাভাসে তাহা বিস্মৃত হওয়া যায়। উৎসবের জলোচ্ছ্বাস আমার উপর দিয়া চলিয়া গেল, অথচ দেবতার সঙ্গে পরিচয় হইল না, একি রূপ উৎসবে যোগ দেওয়া!

আনন্দের দিনে আপনার লোককে মনে পড়ে না, এমন স্বার্থপর লোক বিরল। সাধু মহাজনগণ অপেক্ষা আমাদের অধিক আপনার লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ল্লভ। তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবিত, কেননা তাঁহাদের জীবন আদর্শরূপে এখনও আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছে। তাঁহারা যে সত্য প্রচার করিয়া ও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর উন্নতির ইতিহাসের অক্ষয় সম্পত্তি। তাঁহাদের উক্তি, ক্রিয়া ও জীবন যথার্থই আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের অন্নপান। উৎসবে তাঁহাদিগকে স্মরণ, তাঁহাদের জীবন বিশেষ ভাবে আলোচনা, ও তাঁহাদের জীবনের শিক্ষার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করা ঘোর অকৃতজ্ঞতা। তাঁহাদের মহত্ব যে পরিমাণে বুঝি, উৎসবের মহত্ব সেই পরিমাণে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। মৃত ও জীবিত সাধু মহাজনদিগের প্রতি তাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সকল সাধকেই অনুরোধ করেন। গত বৎসর আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, এবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

মানব ও ঈশ্বর-প্রেম তুলনা করিলে দেখিতে পাই, যে মানব প্রেম সঙ্কীর্ণ, ঈশ্বর-প্রেম বিশ্বজনীন। মানব-প্রেম যখন আপনার সঙ্কীর্ণ বৃত্ত ছাড়াইয়া বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, তখন উহা ঈশ্বর প্রেমের নিকটবর্ত্তী হয়। প্রকৃত সাধকগণ সেই জন্য আপনার অপরাধ ও ক্লেশের ভারে প্রপীড়িত হইয়াও অন্যের জন্য না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। আরাধ্য দেবতাকে তাঁহারা কেবল নিজ-ত্রাতা বলিয়া দেখেন না, জগতের ত্রাতা বলিয়া তৃপ্ত হয়েন, ঈশ্বর বলিয়া সুখী হন না, পিতা বলিয়া ডাকিয়া ফেলেন। দেবতাকে পিতা বলিলে সাধক কেবল আপনার কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, আপনা হইতেই ভাই ভগিনীর জন্য চিন্তা আসিয়া পড়ে। আমরা যে কেবল একাই উৎসবে যাইব তাহা নহে, শত শত শ্রান্ত পিপাসু ও মুক্তি-ভিখারী নরনারী পিতার সদাব্রতে অতিথি হইবে। সম্বৎসরের হৃদয়-বেদনা বহিয়া সবাই পিতার দ্বারে আসিবে, আমি কোন্ লজ্জায় কেবল আমার নিজের কথা ভাবিব, নিজের জন্য দান ভিক্ষা করিব। আপনার জন্য যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলি, ভাই ভগ্নীর জন্য দশ ফোটা ফেলিব, আপনার জন্য যদি একবার কাঁদি, ভাই ভগ্নীর জন্য বিশবার কাঁদিব, আপনার জন্য যদি একটা প্রার্থনা করি, ভাই ভগ্নীর জন্য শত প্রার্থনা করিব, এই ভাবে উৎসবে প্রবেশ করিলে উৎসব "আমার" না হইয়া প্রকৃতপক্ষে "আমাদের" উৎসব হইবে। ব্যক্তিগত উৎসবই প্রায় ঘটিয়া থাকে, যদি পরস্পরের ভাব ও ভাবনা লইয়া আমরা যাই, তবে উৎসব "সাধারণ" উৎসব হইবে।

পুনরায় বলিতেছি, যে সাবধান! বাহিরের মত্ততা ও আড়ম্বরের স্রোতে আত্মাকে ভাসিয়া যাইতে দিওনা। যদি ভিতর না নাচে, তবে বাহিরের নৃত্য শোচনীয়, যদি ভিতর না মাতে, তবে বাহিরের মত্ততা অনিষ্টের কারণ হইবে। মন না নাচিলে কোন্ সুবুদ্ধি সাধক চরণকে নাচাইয়া তৃপ্ত হইবেন। মন প্রাণ যদি দেবতার প্রেমে মাতে, তবে তাহাকে কিছু বলিতে হইবে না, আপনা আপনি সে প্রকৃত মত্তের বেশ পরিধান করিবে। সেই মত্ততাই প্রকৃত মত্ততা যাহা আত্মাকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি দান করে, সেই নৃত্যই প্রকৃত নৃত্য, যাহাতে মত্ততার অবসান না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর-প্রেম আমাকে কীর্ত্তন করায় তবেই আমি কীর্ত্তন করিব, নতুবা কীর্ত্তনে ফল কি?

আগামী উৎসবে যোগ দিতে আমরা সকলকে বিনীত ভাবে এবং শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছি। দুঃখী-কাঙ্গালী যিনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন, তিনি সেই অবস্থায় আসুন। পিতা আমাদের পরম দয়াল, তিনি আমাদের অনুপযুক্ততা ও উৎকৃষ্ট চেষ্টার বিফলতা জানেন, তিনি কাহাকেও শূন্য হস্তে ফিরাইয়া দিবেন না। সরল ও ব্যাকুল ভাবে যে তাঁহাকে ডাকিবে, সেই তাঁহাকে পাইবে, সন্দেহ নাই। দুঃখী কাঙ্গালী মুক্তি-পিপাসু আত্মাগণের জন্যই তাঁহার এই আয়োজন, অবশ্য তিনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

যাঁহার কৃপায় আমরা বৎসর বৎসর এই পরম পর্ব্ব সম্ভোগ করি, তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার প্রেম স্মরণ পূর্ব্বক আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আমরা যে তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইব, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই; তিনি রাজা আমরা ভিখারী, তিনি পরিত্রাতা আমরা পতিত; তিনি যে আমাদের জন্য ব্যস্ত, ইহা চিরকালই বিস্ময়ের বিষয় থাকিবে। যিনি কটাক্ষে কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও অসংখ্য জীব সৃজন করিতে পারেন, তিনি এই ক্ষুদ্র নগণ্য কীটাণুদিগকে আপন হৃদয়ে স্থান দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, একথা স্মরণ করিয়া যে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে, সে নিতান্তই পাষাণে নির্ম্মিত। জন্মাবধি যে প্রেম সম্পদ বিপদ সকল সময়ে আমাদের সঙ্গী হইয়াছে, ঘোরতম অন্ধকার ও দুঃখ দুর্দ্দিনে যাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, আর কিছু করি আর না করি, এমন প্রেমের আধারের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতে যেন আমাদের কখনও ত্রুটী না হয়। তাঁহার প্রেমের জয় জয়কার হউক। পাপী তাপী সকলে তাঁহারই প্রেমান্নে চিরদিন প্রতিপালিত, তিনি বিনা তাহাদের আর গতি কোথায়?

প্রভুর কার্য্য।*

ধর্ম্ম সাধনের সময় সম্বন্ধে কি প্রাচীনকালে কি বর্ত্তমান সময়ে দুইটী বিপরীত মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বলিতেছেন,—

"বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্ বাল্যে ধনং দারাঞ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎসুধীঃ॥"

বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে; যৌবনকালে ধনোপার্জ্জন করিবে ও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে; প্রৌঢ় বয়সে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। কেহ কেহ আবার বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এখনকার লোকের মুখেও এইরূপ উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক লোকেরা সর্ব্বদাই বলিতেছে, ধন মান সুখের সেবা কর, ধর্ম্ম-চর্চ্চার সময় যখন আসিবে তখন দেখা যাইবে। অপর দিকে এক শ্রেণীর লোক বলিতেছেন,—

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

মৃত্যু তোমার কেশ ধরিয়া আছে এইরূপ ভাব হৃদয়ে লইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যু কখন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। জীবন অনিশ্চিত, কিন্তু মরিতে যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই দুই বিপরীত মতের মধ্যে শেষোক্ত মতটী যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল মৃত্যুভয় হইতে যে ধর্ম্মসাধন, তাহা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নহে। প্রেমই আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ দেখাইয়া দেয়। প্রেমের উপদেশ এই যে তোমার জীবনের যাহা কিছু ভাল তাহা সেই প্রেমাস্পদের সেবায় নিয়োজিত কর। যথার্থ প্রেমিক যিনি তিনি কেবল বার্দ্ধক্যকে ধর্ম্মাচরণের প্রশস্ত সময় মনে করিতে পারেন না। দেহ মন প্রাণ সকলই যাঁহার প্রেমের দান, জীবনের সারাংশ সংসারের সেবায় অতিবাহিত করিয়া জরাজীর্ণ অক্ষম দেহ মন তাঁহার কার্য্যের জন্য যথেষ্ট মনে করা ঈশ্বর-প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব। 'কি জানি কবে মৃত্যু আসিয়া আমাকে পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে প্রভু যে কার্য্যের জন্য আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমা দ্বারা সাধিত হইবে না, এই ভাবিয়া তিনি সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই প্রভুর ইচ্ছা পালনে যত্নবান্ থাকেন। তবে কি সংসারের সকল কার্য্য ছাড়িয়া কেবল ধ্যান ধারণা ও ধর্ম্মপ্রচারে জীবন কাটাইতে হইবে? সকলের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে আজীবন ধর্ম্ম সাধনের অর্থ কি?

এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন বিদ্যা-উপার্জ্জন ও ধ্যানধারণা, ধনোপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপদেশদান সকলই সেই মঙ্গলময় প্রভুর কার্য্য। ধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই তাঁহার। কিন্তু যে ভাব লইয়া কার্য্য করা যায়, তাহাতেই স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ হয়।

এই জন্যই দেখা যায় যে একজন প্রচারকের বক্তৃতায় যাহা না হয়, একজন নগণ্য লোকের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া যায়। কার্য্যের মূলে প্রেম ও বিশ্বাস চাই। অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কাহাকেও অনর্থক এখানে আনেন নাই। প্রত্যেক লোকেরই প্রকৃতি ও ক্ষমতার অনুযায়ী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। নিজের কার্য্য চিনিয়া লইয়া, বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত তাহা করিতে পারিলে সে কার্য্য যতই যৎসামান্য হউক না কেন তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে। আমরা তাহা করি না, তাই আমরা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি মান অভিমান স্বার্থ সুখ প্রভৃতি নীচ ভাব ছাড়িয়া প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত আমাদের জীবনের কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ এত দিনে দেশ মধ্যে মহাশক্তিরূপে, উজ্জ্বল অগ্নিস্তম্ভরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রভুর করুণা ও মহিমার সাক্ষ্য দিতে পারিত—কত অন্ধ ও দুর্ব্বল লোক সেই শক্তি ও আলোকের সাহায্যে পরিত্রাণের পথে চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ আমাদের দোষে ব্রাহ্মসমাজের মুখ মলিন হইয়া রহিয়াছে। ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়?

আবার প্রভুর প্রেমোৎসব আসিতেছে। আসুন, আশা ও বিশ্বাসের সহিত আবার প্রতিজ্ঞা করিয়া লাগি। আমরা যতই কেন অপরাধী হই না, তাঁহার প্রেম অপেক্ষা আমাদের অপরাধের পরিমাণ কখনই অধিক হইতে পারে না। আসুন এখন হইতে প্রস্তুত হই, আপনাদের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন সর্ব্বদা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি। কে জানে কখন তাঁহার শক্তি আসিয়া অবসন্ন আত্মাকে উন্নত ও মৃত প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে? কে বলিতে পারে আগামী উৎসবে তিনি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তিনি মনে করিলে অতি হীন সামান্য লোকের দ্বারাও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার শক্তি পাইয়া একজন সামান্য সূত্রধরের সন্তান ও তাঁহার অশিক্ষিত সহচরগণ পৃথিবীতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত করিয়া গিয়াছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রেমময় প্রভু সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহার কৃপাস্রোত প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তিনি প্রেমভরে সর্ব্বদাই আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমরা যেন নিজের দোষে তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত না হই। আমরা যেন আমাদের জীবনের কার্য্য চিনিয়া লইয়া বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত তাহা সাধন করিতে পারি। বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত করিতে পারিলে ধর্ম্ম প্রচার যেমন মহৎকার্য্য পাদুকানির্ম্মাণও সেইরূপ মহৎকার্য্য। মহাত্মা পল তাঁবু সেলাই করিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। বিদ্যা উপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, পরোপকার, ধর্ম্মপ্রচার সকলই প্রভুর অভিপ্রেত কার্য্য। নিজের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে যাঁহার যে কার্য্য তাঁহাকে তাহা চিনিয়া লইয়া বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত তাহা সাধন করিতে হইবে। প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন সকল প্রকার নীচ-

* শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গত ১লা পৌষ রবিবার সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার ভাব লইয়া লিখিত।

ভাব ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার ইচ্ছা পালনের জন্য উৎসুক হই এবং তাঁহার শক্তি ও কৃপা লাভের জন্য আমাদের হৃদয়দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে পারি।

বার্ষিক লিপি।

প্রাপ্ত।

উৎসব সমাগত। জীবনের পাতা উল্টাইয়া একবার পুরাতন হিসাব দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রাণে ততটা ব্যাকুলতা নাই যে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিয়া অন্তরের সমুদয় মলিনতা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি এবং প্রিয়তমের চরণে পড়িয়া হাহাকার করি! তবে সাধকদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া, তাঁহাদের উৎসবের আয়োজন দেখিয়া, মনে যেন কেমন একটা ইচ্ছা হইতেছে একবার আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখি।

উৎসব ত আসিল। আমার প্রাণকে ত উৎসবানন্দ ভোগের জন্য একটুমাত্রও ব্যস্ত দেখিতেছি না। যাহারা অপরাধী তাহারা বিচারকের ধীর ও গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখিয়া বিচারাসনের, সমীপবর্ত্তী হইতে ভীত হয়। সেও ত ভাল। যাহারা নিজ-অপরাধ স্মরণ করিয়া এতটা ভীত অথবা লজ্জিত হয়, তাহাদের ভবিষ্যৎ ত আশাজনক। তাহারা কি যেন একটু কারণে একবার অপরাধ করিয়াছিল, এখন অপরাধ বোধ হইয়া তাহাদের বরং কল্যাণের পথ পরিষ্কার হইল। কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিতেছে, পুনঃ পুনঃ অপরাধ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ক্রন্দন করিয়াই আবার পাপপঙ্কে নিপতিত হইতেছে, পাপের মধ্যে বাস করিয়া সুখী হইতেছে—যে বিচারকের সম্মুখে ঘৃণিত ভাবে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতেছে এবং কৃত-অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছে; শাস্তি ভোগ করিয়াও ভীত অথবা লজ্জিত হইতেছে না, তাহার দশা কি হইবে? বিন্দু বিন্দু করিয়া যাহার শক্তি ক্ষয় হইতেছে, ঘোর পাপে ও অপরাধে লিপ্ত থাকিয়া যাহার অন্তরাত্মা দিন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার যদি এখনও চৈতন্য না হয়; যদি এখনও সে বিচারকের সমীপবর্ত্তী হইতে ভীত না হয় তবে তাহার কি আর গতি আছে?

সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম। ক্লেশ বা দুঃখ কাহাকে বলে জানিতাম না। প্রিয়তমকে কখনও চিনিতে পারি নাই; তখনও চিনিতাম না। তবে কখনও কখনও তাঁহার নিকট কোন কোন সামগ্রী চাহিতাম; তিনি আমার অভিলষিত সামগ্রী দিতেন কি না অত দেখিবারও আমার অবসর অথবা আকাঙ্ক্ষা হইত না; কেন না তখন সংসারের সুখী লোক ছিলাম। আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতাম। সংসারের কোন অভাবই ছিল না। পিতা, মাতা, ভ্রাতার আদরের বস্তু ছিলাম। কিন্তু হায়! সে সুখে বিষম ব্যাঘাত পড়িল। শোকের প্রবল বাত্যা বেগে প্রবাহিত হইল। সংসারের সেই তুফানে আমার সাধের তরণী লইয়া আমি আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। কোথায় যাই, কি করি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কে যেন ধীরে ধীরে আমাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আনিয়া ফেলিল। ক্রমে আবার আকাশ পরিষ্কার হইল। আকাশ পরিষ্কার হইল বটে; কিন্তু আর পূর্ব্বের মত সুখ-সাগরে ভাসিতে ইচ্ছা হইল না। দেখিলাম এখানে সকলেই যেন একজন প্রিয়তম পাইয়াছে। মনে হইতে লাগিল ইঁহাদের বোধ হয় কোন গুপ্ত কৌশল আছে যদ্দ্বারা ইঁহারা সেই প্রিয়তমকে লাভ করিয়াছেন। এই বিশ্বাস বশতঃ এক দিন কোন এক অতি শ্রদ্ধেয় সাধককে আমার মনের ভাব জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, না, তেমন কিছু নাই ব্যাকুল ভাবে চাও, প্রিয়তমকে লাভ করিতে পারিবে। সেই অবধি প্রাণ যেন কেমন করিতে লাগিল। প্রিয়তমকে পাইবার জন্য বাসনা যেন একটু একটু করিয়া জাগ্রত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রিয়তমকে পাইলাম কি না জানি না। তবে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সজনে ও নির্জ্জনে অনেক সময় ক্রন্দন করিয়াছি, তাহা আমার একটু একটু মনে আছে। আর যে কি করিয়াছি তাহা মনে নাই। জীবনের পাতা উল্টাইয়া দেখি তাহার কোন কথা ইহাতে লেখা নাই। ক্রন্দনের কথাও ভাল রকম লেখা নাই, তবে একটু একটু ঈষৎ দাগ যেন এখনও আছে, তাহা কেবল আমিই পড়িতে পারি। অপরে পারিবেন কি না জানি না। বোধ হয় পারিবেন না। সেই সময় আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমি যদি মসিদ্বারা কোন পুস্তকে লিখিয়া রাখিতাম তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যদি জীবনের পাতায় পাতায় দৈনন্দিন ঘটনা লিপিবদ্ধ না থাকে; তা হইলে পুস্তকের লেখায় কি হইবে? আর যদি জীবনের পাতায় পাতায় সমস্ত ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা পাইতাম তাহা হইলে অপর কোন স্মৃতি-পুস্তকের ত প্রয়োজন হইত না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এত কান্না কাটী এত গোল মাল, এর একটাও জীবনে ভাল করিয়া মুদ্রিত রহিল না। সকলই বৃথা হইয়াছে। জীবনে যখন ইহার কিছুরই হিসাব পাইতেছি না। তখন সমস্তই বৃথা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং আমার ভয় হইতেছে, বুঝি বৃথা ভগবানের নাম লইয়া নামাপরাধে অপরাধী হইয়াছি।

উপাসনা ত অনেক দিন করিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু উপাসনা করিয়া ত আমার কিছুই হয় নাই। আমার ত এখন উপাসনায় বসিতে ইচ্ছা হয় না। শরীর আমার উপাসনার স্থানে বসিয়া থাকে বটে, কীর্ত্তনের সময় আমার হাত করতাল বাজায় বটে, আমার মুখ ও জিহ্বা ও আমার সেই না জানা প্রিয়তমের নাম গান করে বটে। কিন্তু আমার প্রাণ তাহাতে যোগ দেয় না। এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব। সুতরাং আমার এমন নাম সংকীর্ত্তনেরই বা কি প্রয়োজন, আর এমন উপাসনার স্থানে বসিবারই বা কি প্রয়োজন। সকল সাধুরাই বলেন, যে প্রিয়তম কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন না। আমাকে সাধুরা একথা বলিলে আমার তাহাতে আশা হয় বটে, কিন্তু আশায় মানুষকে প্রার্থনীয় বস্তু হইতে বহুকাল দূরে রাখিয়া দিলে, প্রাপ্তির আশা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। তুমি বলিবে বিশ্বাসের সহিত আশা কর। তাঁহার উপর সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর কর। যদি তেমন করিয়া নির্ভর করিতে অথবা বিশ্বাস করিতে পারিতাম তাহা হইলে কি আর ভাবনা

ছিল? না আছে বিশ্বাসের একবিন্দুর বিন্দু; না আছে নির্ভরের এক কণার কণা। আশা আমাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আবার একবার ফিরিয়া চাই। দেখি কখনও কখনও মন যেন সেই প্রিয়তমের একটু আভাসের আভাস প্রাপ্ত হয়। বহুদূর হইতে পবন যেমন সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া গিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর সমীপে উপস্থিত হয়; সেইরূপ সময়ে, সময়ে কৃপা-পবন যেন সেই প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রেম ও পবিত্রতার সুঘ্রাণ লইয়া আমার মোহ-বন্দী চিত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বন্দী যেমন কারাগারের উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের উদ্দেশে গমন করিতে পারে না; সেইরূপ আমার চিত্তও সংসার এবং বিষয় সুখের দুর্ভেদ্য অশরীরী প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেই দেবাদিদেবের সমীপে উপস্থিত হইতে কখনও সমর্থ হয় না। অহঙ্কার, নীচতা, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রাচীর অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। বরং কারাগারের প্রাচীর অতিক্রম করা সহজ, কিন্তু এই যে অশরীরী প্রাচীর চতুষ্টয়, আমি ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমার শক্তি সাধ্য সমস্তই নিস্তেজ হইতেছে। যিনি মুক্তিদাতা তিনিই নাকি এরাজ্যের সহায়। কিন্তু তাঁহাকে তেমন করিয়া না ডাকিলে না কি তিনি মুক্তি দেন না। আমার ত তেমন করিয়া ডাকিবার শক্তিও নাই; অথচ মুক্তিও চাই। এমন সমস্যায় কেহ কখনও পড়িয়াছেন কি? আমি অমরধামে যাইতে চাই অথচ মরণের রাজ্য ছাড়িতে আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয় কেহ যদি বলপূর্ব্বক আমাকে এই বন্ধন ও মরণের রাজ্য হইতে মুক্ত করে। আমি বন্ধন ও মরণকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেও যদি সেই মুক্তিদাতা আমার আসক্তি ও বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া প্রবলবেগে আমাকে আকর্ষণ করিতে করিতে অমররাজ্যে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আত্মদান করিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত করি। কেন না এমন প্রিয়তম যিনি, এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যিনি, তাঁহাকে পুরস্কার করিব না ত আর কাহাকে করিব। আর আমার তখন এই আত্মা ছাড়া ত পুরস্কার দিবার কিছুই থাকিবে না। অথচ যিনি আমার জীবনদাতা তাঁহাকে কি আমি পুরস্কারের কথা বলিতে পারি! তাঁহার আমি ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।

আমি এত হীন হইয়াছি যে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। অন্ধ কাপুরুষ। অথচ আমার বন্ধুগণ আমাকে ভাল লোক বলিয়া জানেন। এ আর এক দুঃখ। জগতের লোকে এমনই ভ্রান্ত যে তাহারা মানুষ না চিনিয়াও মানুষ চিনে। সংসারের এমন পাগলামি দেখিয়া এই দুঃখের মধ্যেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমি আসল জিনিস যাহা তাহা যদি লোকে আমাকে জানাইয়া দিত তাহা হইলে আমার একটু কল্যাণ হইত; তাহা না হইয়া যাহা আমি নই তাহা বলিয়া লোকে আমার প্রশংসা করাতে অনেক সময় আমাকে ভ্রমে পাতিত করে। আমি যাহা নই তাহা ভাবিয়া আমি ভ্রমে পতিত হই।

আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি। আমার অন্তরে মৃত্যুর শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমি জীবিত হইয়াও মৃত হইয়া আছি। উৎসবে যদি এই মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে কবে কি প্রকারে তাহা জীবিত হইবে তাহা আমি কি করিয়া জানিব। আর আমার মত মৃতজীবন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি প্রার্থনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও হয় ত বাঁচিতে পারি কেন না আমার নিজের প্রার্থনা করিবার শক্তি নাই।

কে আমায় অকিঞ্চন করিবে? আমি এখনও আহার পাইতেছি ও ভালবাসা পাইতেছি। আমাকে সর্ব্বস্বহীন না করিলে হইবে না। যে শক্তি জগৎময় মূলাধাররূপে নিত্য বিদ্যমান সেই শক্তি আমাকে সবলে আকর্ষণ করিতে থাকুন। কবে আমি গাহিব! "ডুবেছি ডুবেছি অকূল পাথারে, ধরিবার নাহি তৃণ খান।" কেননা আমাকে যেন কোন এক অসুরের শক্তি করতলগত করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও করিতে চায় না। কেবল মাত্র তাহারই জন্য আমি সনাথ হইয়া আছি। আর আমার কেহ নাই। সে আমাকে অনাথ হইতে দেয় না। আমার একটু একটু ইচ্ছা হয় আমি অনাথ হইয়া পড়ি; আর সেই প্রিয়তম আমাকে সনাথ করেন।

ব্রহ্মধামের যাত্রী।

প্রাপ্ত।

একদিন বেহার প্রদেশীয় কোন রেইলওয়ে ষ্টেশনে উপবেশন করিয়া আছি, এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুলিসম্যান চীৎকার করিয়া বলিল গাড়ী ছাড়িয়াছে। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া প্লাটফরমে আসিয়া উপনীত হইলাম। কিছু কালপর গাড়ী বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। গাড়ী দাঁড়াইলে দেখিলাম, অনেক যাত্রী কোলাহল করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। আবার অনেক যাত্রী তাড়াতাড়ি গাড়ীতে আরোহণ করিল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ঘটনা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে মনে কোন এক বিশেষ চিন্তার স্রোত খেলে নাই। কিন্তু এদিন হঠাৎ নবভাবে চিন্তার লহরী উথলিয়া উঠিল। মনে হইল ঠিক এইরূপ ঘটনা আধ্যাত্মিক রাজ্যে ও ঘটিতেছে। সময়ের অসীম গাড়ীতে কোটী কোটী যাত্রী পরিভ্রমণ করিতেছে। গাড়ী দ্রুতবেগে অবিশ্রান্ত ব্রহ্মধামের দিকে চলিয়া যাইতেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলে শকটারোহণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মধামই কি সকলের গন্তব্য স্থল? না, দেখিতেছি শত শত যাত্রী কোলাহল পূর্ব্বক যৌবনের ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল। গাড়ী যে ব্রহ্মধামেরদিকে ছুটিয়াছে, তাহাদের এই জ্ঞান পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যৌবনের নয়নানন্দকারী সুরম্য ষ্টেশন তাহাদের মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, আর তাহারা অগ্রসর হইল না। দুইচার জন পথিক যাহারা ইতিপূর্ব্বে ঐ ষ্টেশনে অবস্থান করিয়া তাহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ী যৌবনের ষ্টেশন ছাড়িয়া ধনের ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইল। এখানে বাহিরের সৌন্দর্য্য কি মনোমুগ্ধকর। চারিদিক কেমন অপূর্ব্ব ভূষণে

ভূষিত। 'দেখিলে বোধহয় যেন মানবের জীবনের আশাতৃপ্তি সাধন জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সমস্তই সেখানে স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। যাহারা চিত্ত প্রফুল্লকর সৌন্দর্য্যরাশির উপরিস্থিত স্তর বিদীর্ণ করিয়া অন্তরালের দৃশ্য দেখিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সকলে আনন্দে বিহ্বল হইয়া এই স্থানে নাবিয়া পড়িল। অতি অল্প সংখ্যক পথিক এস্থানে গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ী বায়ুবেগে মানের ষ্টেশনে উপনীত হইল। এ ষ্টেশনটী পরিপাটী। অনেক প্রবীণ প্রবীণ লোক ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাহারা বাহিরের চাকচিক্যের দিকে তত চাহিলেন না। কেবল আনন্দভোগের আশায় অবতরণ করিলেন। ইহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া গাড়ী যশোধামে পঁহুছিল। এখানে প্রায় সমস্ত গাড়ী শূন্য প্রায় হইল। যাঁহারা প্রাণপণে ধর্ম্ম সাধনের জন্য উৎসুক ছিলেন। ব্রহ্মধাম কি অপূর্ব্ব আনন্দ স্থল, যাঁহারা ইহা জ্ঞান চক্ষে অবলোকন করিয়া ছিলেন। এমনকি যাঁহারা ব্রহ্মধামে যাইবার জন্য টিকেট ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারাও এই ষ্টেশনে আসিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ষ্টেশনের কি আকর্ষণী শক্তি। সকলে গাড়ী মধ্যে কোলাহল করিয়া উঠিল। কেবল দুই চারি জন সৌম্যমূর্ত্তি বিশিষ্ট সাধু প্রেমিক স্থির ও গম্ভীরভাবে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তাঁহাদের চিত্তের চঞ্চলতা না ঘটিয়াছিল এমত নহে। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মনাম স্মরণে সে চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া দিলেন। যাঁহারা পরিমিতের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলে নামিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রেমিকদিগকে পরিমিত পদার্থ আবদ্ধ করিতে পারে না। সংসারের চাকচিক্য ধনের রূপরাশি সমন্বিত নয়ন মুগ্ধকর মূর্ত্তিমানের মনোমুগ্ধকর আহ্বান, যশের চিত্ত চাঞ্চল্য-উৎপাদিকা শক্তি আর তাহাদিগকে অস্থির করিতে পারে না। 'তাঁহারা ব্রহ্মধামের যাত্রী, ব্রহ্মধামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। গাড়ী অবশেষে ব্রহ্মধামে পঁহুছিল। এখানকার পবিত্র বায়ুসেবনে তাঁহাদের প্রাণে নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভ্রমণকালে পথে যে সকল দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ইহার সহিত তাহার কাহারও তুলনা হয় না। স্বয়ং ভগবান তাঁহার কৃপার হস্ত প্রসারিত করিয়া, তাঁহাদিগের অঙ্গ শ্রান্তি অপসারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতার প্রেমময় সংস্পর্শে, তাঁহাদের সমস্ত শ্রান্তি কোথায় চলিয়া গেল। যাহা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, যাহা কখন কল্পনার চক্ষেও অবলোকন করেন নাই, এইরূপ বিমল শান্তি সুধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চাৎদিকে ফিরিল না। আর কোনরূপ কুচিন্তা তাঁহাদিগের মনের ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারিল না। তাঁহারা ভয় ভাবনার অতীত হইয়া ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসহবাসে পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। হায় আমাদের সে দিন কবে হবে? প্রভো আশীর্ব্বাদ করুন। যেন আমরা অচিরে তাঁহার ব্রহ্মধামে উপনীত হই।'

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বিশেষ কোন গুরুতর কারণে এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে কার্য্যপ্রণালীর সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা আমাদের পাঠক এবং ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ও সহানুভূতিকারী প্রত্যেককে বিনীত ভাবে এই উৎসবে যোগ দান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। সকলের সমবেত চেষ্টা এবং ঐকান্তিক ব্যাকুল প্রার্থনাই উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে প্রধান আয়োজন। আশা করি সকলে সদয় হইয়া এই উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে সাহায্য করিতে যত্নশীল হইবেন।

ষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

১লা মাঘ (১৩ই জানুয়ারি)	সোমবার—ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।
২রা " ১৪ই "	মঙ্গলবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।
৩রা " ১৫ই "	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বাঙ্গালা বক্তৃতা।
৪ঠা " ১৬ই "	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৫ই " ১৭ই "	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে হিন্দি বক্তৃতা।
৬ই " ১৮ই "	শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ইংরেজিতে উপাসনা।
৭ই " ১৯এ "	রবিবার—প্রাতঃকালে হিন্দিতে উপাসনা। মধ্যাহ্নে বাহিরে প্রচার। সায়ংকালে উপাসনা (শ্রমজীবীদিগের জন্য উপদেশ)
৮ই " ২০এ "	সোমবার—ছাত্রসমাজের উৎসব।
৯ই " ২১এ "	মঙ্গলবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।
১০ই " ২২এ	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন।
১১ই " ২৩এ	বৃহস্পতিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই " ২৪এ	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। অপরাহ্নে বালক বালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে বাঙ্গালা বক্তৃতা।

১৩ই „ ২৫এ শনিবার—প্রাতঃকালে সঙ্গত সভার উৎসব। মধ্যাহ্নে আলোচনা সায়ংকালে ইংরেজিতে বক্তৃতা তৎপর ব্রাহ্মবন্ধুসভার উৎসব।

১৪ই „ ২৬এ উদ্যানসম্মিলন।

বিবাহ—গত ৭ই পৌষ কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী হেমন্তকুমারীর সহিত বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৮ বৎসর পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—গত ১৭ই অগ্রহায়ণ বাগেরহাট প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাস মহাশয়ের মাতা পরলোক গমন করেন। গত ১লা পৌষ রবিবারে বাগেরহাটে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ধর মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে হরিনাথ বাবু এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এক কালীন ২ দুই টাকা এবং বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজে ২ দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন।

প্রচার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং লছমন প্রসাদজী মহাশয় আজমীর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যে কোন কার্য্য করিয়াছেন তাহা শিবনাথ বাবুর পত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"আমরা ১১ই ডিসেম্বর সায়ংকালে আজমীর হইতে আমেদাবাদে পৌঁছিয়াছি। আজমীরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রেরণ করিতেছি। আজমীরে বাঙ্গালীদিগের ব্রাহ্মসমাজ নাই কেবল মাত্র দুই জন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম আছেন তন্মধ্যে এক জন আনুষ্ঠানিক। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। তাঁহারই অনুরোধে ও আগ্রহে আমরা আজমীরে গিয়াছিলাম।

"৭ই ডিসেম্বর শনিবার। অদ্য সায়ংকালে আমাদের বাসভবনে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে আমাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিকরিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। ষ্টেশনের অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদিন কেবল আলাপ পরিচয় গল্লাদি ভিন্ন অন্য কোন কাজ হয় নাই। প্রাতে চন্দ্রশেখর বাবুর পরিবারে উপাসনা হয়।

"৮ই ডিসেম্বর রবিবার। অদ্য প্রাতে এখানকার Pay master Lala Mulchand নামক একজন হিন্দুস্থানী ভদ্র লোকের বাড়ীতে উপাসনা হয়। ইঁহার বাড়ীতে একটী হিন্দুস্থানী সমাজ আছে; সপ্তাহে দুইবার উপাসনা হইয়া থাকে। লছমন প্রসাদজী হিন্দীতে উপাসনা করেন। আমি হিন্দী ও ইংরাজীতে শাস্ত্রীয় বচন অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করি। সেই দিন সায়ংকালে এখানকার একজন মুসলমান বড়লোকের বাড়ীর দালানে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয়— Religious Revolution in the East and the West—and the lesson to be derived therefrom। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃতার পুনরুক্তি মাত্র। স্থূল উদ্দেশ্য এই মাত্র ছিল যে, ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম-জীবন ভগ্ন হইতেছে, সেই ধর্ম্ম-জীবনকে এক নূতন প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্ম সমাজ তাহাই করিতেছেন।

"৯ই ডিসেম্বর সোমবার। অদ্য সায়ংকালে লালা মূলচন্দ্রের বাড়ীতে লছমনপ্রসাদজী হিন্দীতে এক বক্তৃতা করেন এবং আমিও ইংরাজীতে কিছু বলি। "মানবের ধর্ম্ম" বক্তৃতার বিষয় ছিল। তাহাতে তিনি সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করেন, আমি ইংরাজিতে সেই সকলকে আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

"১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সায়ংকালে একজন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বাসাতে বাঙ্গালাতে এক বক্তৃতা হয়। তাহাতে স্থানীয় বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও মহিলাগণ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বক্তৃতাতে ঈশ্বর মানবের একমাত্র উপাস্য কেন, নিরাকারের উপাসনা সম্ভবে কিনা? ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য কেন? পরিবারে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করা হয়। সেই রাত্রেই আমরা আমেদাবাদ যাত্রা করি।

"১১ই ডিসেম্বর বুধবার আমরা সায়ংকালে আজমীর হইতে আমেদাবাদে পৌঁছি।

"১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সায়ংকালে এখানকার সমাজ মন্দিরে আমাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য স্থানীয় সমাজের সভ্যগণকে আহ্বান করা হয়।

"১৩ই ডিসেম্বর শুক্রবার অদ্য অপরাহ্নে লছমন প্রসাদজী সমাজ মন্দিরে হিন্দীতে "প্রেমই ধর্ম্মের মূল" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে মানব-প্রীতি ও ঈশ্বর-প্রীতির সাধারণ লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করা হয়।

"১৪ই ডিসেম্বর শনিবার। সায়ংকালে সমাজমন্দিরে ইংরাজীতে আমার এক বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় Theism—Message of deliverence.

"১৫ই ডিসেম্বর রবিবার। প্রাতে নগর কীর্ত্তন; বাজারে লছমন প্রসাদজী ও আমি হিন্দীতে সাধারণ লোকদিগকে কিছু কিছু বলি।

"১৬ই ডিসেম্বর সোমবার সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে আমার দ্বিতীয় ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বিষয় The Social reconstruction of Modern India

"১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার, অদ্য সায়ংকালে আমরা বোম্বাই যাত্রা করিতেছি। বোধ হইতেছে আমাদের এখানে আগমনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনেকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ বাড়িয়াছে। ঈশ্বর করুন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সুচারুরূপে তাঁহার নাম প্রচার করিতে সমর্থ হউক।"

উৎসব—সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ, বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ও সিরাজগঞ্জে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গমন করিয়াছেন। বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ছিলেন। নবদ্বীপ বাবু তথা হইতে সম্প্রতি

কলিকাতায় সমাগত হইয়াছেন। আমাদের প্রচারকগণ এই সমাগত-প্রায় মাঘোৎসবের পূর্ব্বে সকলে এখানে আগমন পূর্ব্বক উৎসবের পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন করিতে যত্নশীল হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। আমরা প্রচারক মহাশয়দিগকে এসময় একত্রিত হইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

নামকরণ—গত ২১এ আশ্বিন কালীকচ্ছ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল সিংহমহাশয়ের ৫মা কন্যা ও প্রথম পুত্রের এবং শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দীর ৪র্থ পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুরুদয়াল বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ৫৲ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা—আমাদের কোন বন্ধুকে বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় (আড়া ন্যাসন্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার) মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এখানে আসাতে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে একটী সমাজ ছিল সেটী বিশেষরূপ নববিধান সমাজভুক্ত। এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী যাঁহারা তাঁহারাই এসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর এই নূতন সমাজকে দীর্ঘজীবী করুন, এসমাজের কার্য্য এখন একটী বন্ধুর গৃহে হইতেছে। ইহার সঙ্গে একটী নৈতিক বিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী তাঁহারা এইরূপ সমাজ স্থাপনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন এই আমাদের অনুরোধ।

ভোটিং পেপার—আগামী বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনয়নের ভোটিং পেপার সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আগামী ৬ই জানুয়ারির মধ্যে তাহা প্রতিপ্রেরণ করিতে হইবে। তাহার পরে আসিলে কোন কাগজই গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং সভ্যগণ শীঘ্র আপনাদের ভোটিং পেপার পাঠাইয়াদিবেন। অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ অধিক সংখ্যক সভ্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেই অধিক পরিমাণে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। সুতরাং সকলে এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এই আমাদের অনুরোধ।

বিজ্ঞাপন

আগামী ২১এ জানুয়ারি (৯ই মাঘ) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১২শ বাৎসরিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
২। সভাপতির বক্তৃতা।
৩। কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন।
৫। সভ্য মনোনয়ন।
৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিচার
৭। বিবিধ।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি;—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক চাঁদা—১৮৮৯

বাবু মথুরামোহন মৈত্র রাজসাহী ২৲ ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু ময়মনসিংহ ২০৲ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কলিকাতা ২৲ বাবু পরেশনাথ সেন কলিকাতা ১৲ বাবু কালীপ্রসন্ন দাস কলিকাতা ৩৲ বাবু রামোত্তম ঘোষ যশোর ২৲ বাবু জগৎচন্দ্র দাস শিবসাগর ৯৲ বাবু মথুরানাথ ঘোষ থরসিয়াং ২৲ বাবু মনমোহন রায় বাঁকুড়া ৬৲ বাবু দুর্গানারায়ণ বসু বাঁকুড়া ॰ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়া ॥॰ বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়া ॰ বাবু গোপালচন্দ্র নন্দী শিবপুর ১৲ বাবু হারাণচন্দ্র বসু শিমলাহীল ৯৲ বাবু নন্দকুমার মল্লিক বাগআঁচড়া ॥॰ বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক বাগআঁচড়া ॥॰ বাবু মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বাগআঁচড়া ॰ বাবু অমৃতলাল মল্লিক বাগআঁচড়া ॥॰ বাবু নবীনচন্দ্র রায় রতলাম ৬৲ জি, ভেঙ্কাটা স্বামী নাইডু ভিলোর ১৲ বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূম ৪৲ বাবু নিশ্লিকুমার ঘোষ গৌহাটী ॥॰ বাবু যোগেশচন্দ্র সেন ধুবড়ী ২৲ শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ রঙ্গপুর ১৲ শ্রীমতী যোগমায়া দে রঙ্গপুর ১৲ বাবু ভুবনমোহন কর দিনাজপুর ॥॰ বাবু পার্ব্বতীনাথ সেন দিনাজপুর ২৲ বাবু রাখালচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ১৲ বাবু নন্দলাল দাস কুমিল্লা ১॥॰ অভয়চরণ বসু মেদিনীপুর ১৲ ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৬৲ বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব সিলং ১৲ বাবু সদয়চরণ দাস সিলং ॥॰ বাবু অভয়চরণ ভড় হুগলি ১৲ বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোন্নগর ১৲ বাবু গিরিশচন্দ্র দে কলিকাতা ১৲ বাবু লালমাধব বসু সিলং ॥॰ বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন বাঁকুড়া ১৲ বাবু কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ১॥॰ বাবু হরগোবিন্দ চৌধুরী জনাইবাকসা ২৲ রাধানাথ মল্লিক বাগআঁচড়া ॥॰ বাবু কালীনাথ দত্ত মজিলপুর ৬৲ বাবু বিনোদ বিহারী বসু কালনা ৪৲ বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র বোলপুর ১৲ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ফরিদপুর ১৲ শ্রীমতী কাদম্বিনী সান্যাল আলিপুর ৩৲ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ফরিদপুর ৩৲ বাবু বৈষ্ণবচন্দ্র মল্লিক হুগলি ১৲ বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় টাঙ্গাইল ১৲ বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার নওগাঁ ১০৲ শ্রীমতী অম্বিকা দেব কোন্নগর ৬৲ বাবু সাতকড়ি দেব কোন্নগর ১৲ বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগর ১৲ বাবু বিপিনচন্দ্র পাল পাবনা ২৲ বাবু কালীনারায়ণ রায় চাঁচল ৬৲ বাবু লক্ষ্মণ সিংহ দার্জ্জিলিঙ্গ ॥॰ বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মল্লিক বাগআঁচড়া ১৲ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর ॥॰ বাবু আনন্দমোহন দত্ত বরিশাল ॥॰ বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লাহোর ২৲ বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় রাঁচি ॥॰ বাবু ভগবতীচরণ মল্লিক বগুড়া ৩৲ বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা ৪৲ বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী কামিনী সেন কলিকাতা ৩৲ বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন শিলং ॥॰ কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১৲ বাবু যোগেন্দ্রনাথ খাস্তগীর কলিকাতা ॥॰ বাবু বঙ্কুবিহারী বসু কলিকতা ২ বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১॥॰ বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু কলিকাতা ১॥॰ বাবু রজনীকান্ত তপাদার মেদিনীপুর ১॥॰ বাবু হরকুমার গুহ কলিকাতা ১৲ কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী কলিকাতা ৬

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ সোমবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

কোথায় সে জন ?

জগৎ ঘুমায়, আকাশ অন্তরে,
আত্মাবিন্দু রয় পরাণ সাগরে ;
ভাবের তরঙ্গ, সঙ্গীত প্রকাশে,
তাঁহার প্রসঙ্গ এ বিশ্ব উল্লাসে ;
নয়নঅতীত বায়ু আর মন,
মনের অজ্ঞাত জগৎ কারণ ;
কুসুমের কান্তি, নহে একস্থানে,
পরমাত্মা নাই বদ্ধ কোন খানে ;
পুষ্পের সৌরভ, পাই সবস্থানে,
তাঁহার প্রকাশ সকলেরি প্রাণে ;
প্রেমের কাহিনী, শুনায় নয়ন,
প্রেমগীতি তাঁর গাইছে ভুবন ;
মায়ের নয়ন, ছাড়া কভু নই,
যথা যাই তথা তাঁর কোলে রই,
হেরিলে তাঁহারে, শান্তি-ধন মিলে,
সকলি পাইবে তাঁহারে পাইলে।

নিবেদন ও প্রার্থনা—উৎসবপতি জীবনদাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার উৎসবের দ্বারে সমাগত দীনদুঃখী সন্তান, তোমারই প্রসাদ লাভার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমার অনুকম্পা না হইলে—তোমার অনুমতি না হইলে উৎসবের দ্বার আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত হয় না। আমাদের সাধ্য নাই যে এ দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করি। আমরা মুষ্টি-ভিখারী কাঙ্গাল, আমাদের কি সাধ্য আছে, দানকর্ত্তা তুমি, তোমার দানভাণ্ডারের দরজা না খুলিলে তাহার ভিতরে যাই! আমাদের সে সাধ্য নাই, কাঙ্গাল যে সে দানকর্ত্তার মুখাপেক্ষী হইয়াই দ্বারে অবস্থিতি করিতে থাকে, আমরাও তোমার অনুগ্রহাপেক্ষায় দ্বারে সমাগত হইয়াছি। বহুস্থান বহুদেশ দেশান্তর হইতে আমরা তোমার দ্বারে সমবেত হইয়াছি। আমাদের নানা জনের নানাঅবস্থা ; কিন্তু সকলেরই অন্তর্যামী পিতা তুমি, তোমার নিকট হইতে আমাদের সকলেরই দুঃখ দুর্গতি ও অভাব মোচন হইবে। তাই আমরা অনন্যোপায় দীনদুঃখী সন্তানগণ তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমার গৃহের ভিতর হইতে আনন্দের গভীর ধ্বনির আভাস আমাদের কর্ণে আসিতেছে, গৃহাগত উল্লাস ধ্বনিতে আমাদের প্রাণের উল্লাস ও ঔৎসুক্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তোমার গৃহে স্থানপ্রাপ্ত সন্তানগণ উৎসবানন্দে বিভোর হইয়া যেরূপ উল্লাসধ্বনি করিতেছেন, তাঁহাদের আনন্দসংগীতধ্বনির মিলিতস্বর মাত্র যাহা আমাদের কর্ণে আসিতেছে, তাহাতেই যে আমাদিগকে উৎসাহিত ও আকুলিত করিতেছে। আমরা কি সেই আনন্দধ্বনির সমভাগী হইয়া তোমার গৃহের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে সমর্থ হইব না? প্রভু পরমেশ্বর, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দেও তোমার দ্বারে বিষম জনতা হইতেছে, লোকের আগ্রহ ও আকুলতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহারা আর কতক্ষণ চিৎকার করিয়া শুষ্ককণ্ঠ হইবে। আর কতক্ষণ আশার আশায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিবে? আমাদের দয়াল পিতা, তুমি কি আমাদের অবস্থা জাননা? আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা কতদূর তাহা কি জান না? আমরা যে অতি সহজেই নিরাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ি, আমাদের সহিষ্ণুতা যে অতি সামান্য। তবে আর কেন বিলম্ব কর। শীঘ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেও, আমরা কাঙ্গাল সন্তানেরা তোমার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যথেচ্ছা তোমার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীবন পাই। জীবনহীনদিগের গতি তুমি তোমার কৃপাভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই। তাই তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিলাম। উৎসবের দিন আসিয়াছে, কিন্তু তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের উৎসব করিবার সাধ্য নাই। তোমার স্পর্শলাভ ভিন্ন হে পরশমণি! আমাদের এই লৌহদেহ সুবর্ণে পরিণত হইবে না। কাঙ্গালদিগের পিতা! শীঘ্র এস আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া লও। আমরা তোমার অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। উৎসবে চিরমগ্ন হইয়া, চিরমত্ততা লাভ করি। প্রাণ প্রাপ্ত হইয়া জীবিতের ন্যায় সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করি।

আমাদের স্নেহময়ী জননি! তুমি ত আমাদের উদাসীন মাতা নও যে আমরা ডাকিয়া ডাকিয়া পরিশ্রান্ত না হইলে আর তোমার দয়া হইবে না। তোমাতে উদাসীনতা নাই, তুমি নিরন্তর আমাদিগকে পরিষ্কার করিবার জন্য অমৃতজল লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছ। আমাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া বার বার পরিষ্কার করিয়াও

দিতেছ, দুষ্ট ছেলেকে মা যেমন জোর করিয়া ধরিয়া তাহার শরীরের ধূলা মাটী পরিষ্কার করিয়া সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া দেন, তুমিও আমাদিগকে বার ২ ধরিয়া আনিয়া আমাদের প্রাণ মনের মালিন্য দূর করিয়া দিতেছ। কিন্তু কি দুঃখ আমরা যাই একটু অবসর পাই অমনি যে মলিন সেই মলিন হইয়া যাই। আবার সংসারের দুর্গন্ধময় কর্দ্দমরাশি দুই হাতে মুখে লেপিয়া দেই। হস্তীকে তাহার মাহুত কত যত্নে স্নান করাইয়া দেয়, কত পরিশ্রম করিয়া তাহার শরীরের মাটী ধূলা সব ধুইয়া দেয়, কিন্তু সে এমনি মূর্খ, যেমন তাহাকে তাহার মাহুত একটু অবকাশ প্রদান করিয়াছে, অমনি সে আবার মাটী ধূলা প্রভৃতি যত জঞ্জাল শরীরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। সে আবার যে মলিন সে মলিন হইয়া থাকে, এ ভাবে কুঞ্জর-স্নানের মত কি আমরা একবার তোমার নিকট হইতে পরিস্কৃত হইব, আবার মলিনতার কুৎসিৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিব? এরূপে যদি দিন যায় তবে আর আমাদের আশা ভরসা কি? হে জননি! তুমি এবার আমাদিগকে এমন করিয়া দেও যেন আমাদের আর মতিচ্ছন্ন না হয়। তোমার সুসন্তানেরা যে বেশ—যে মনোরম ছবি পাইয়া থাকেন, আমরাও যেন সেই বেশ ও সুন্দর ছবি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। উৎসবে যাইয়া যদি আমাদের এমন সুমতি লাভ না হয়, যদি আমরা নবজীবন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ-প্রকৃতি ও তোমার সুসন্তানের স্বভাব প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে উৎসবের সমস্ত আয়োজনই যে পণ্ড হইয়া যাইবে। প্রভু আমাদিগকে সুমতি দাও। তুমি যাহা প্রদান করিবে, যেন তাহার সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে পারি। সযত্নে তাহা রক্ষা করিয়া আমরা যেন ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

উৎসব-সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

নবীন কিরণ পুনঃ হের এ বিশ্বের ঘরে,
আসিছে সুখ-উৎসব হরষে বরষ পরে।
জগতে ফুটিছে প্রাণ, নীলিমা গাহিছে গান,
গাহিছে অমরকুল বিমল আনন্দভরে।
যাদের নয়ন ধারা, ঝরিছে বরষ সারা,
নিরাশ মোহের ঘোরে মুমূর্ষু যাহারা হায়;
এস সবে এস ভাই, সে মহাযজ্ঞেতে যাই,
মিটিবে জ্বলন্ত তৃষা সুধামৃত পান ক'রে।
কি নব নবীনালোকে, হৃদয় উঠিবে জেগে,
নিরখি প্রাণেশে প্রাণে প্রেমাশ্রু বহিবে আহা;
বিষাদ যাইবে ঘুচে, মলিনতা যাবে মুছে,
ফুটিবে স্বরগ-জ্যোতি সবার আনন পরে।
মহা বিশ্ব-কোলে ক'রে, নিরখিব বিশ্বেশ্বরে,
ইহ পর কাল মাঝে ভেদাভেদ নাহি রবে;
সম্মুখে জ্যোতির দেশে, উল্লাসে যাইব ভেসে,
লভিব বিরাম শেষে অনন্ত কালের তরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে"—শুষ্কতার দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই লোকে মরুভূমির সহিত দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকে, বলে লোকটার অন্তর যেন মরুভূমি সদৃশ, নিংড়াইলেও বারিবিন্দু নিঃসৃত হয় না। কঠোরতা ও কাঠিন্যের দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই লোকে প্রস্তরের সহিত তুলনা দিয়া থাকে, বলে লোকটার প্রাণ যেন প্রস্তরের মত কঠিন। বাস্তবিক মরুভূমি ও প্রস্তর ইহাদের বাহ্যিক দৃশ্যও যেমন কর্কশ ভিতরকার দৃশ্যও তদ্রূপ। দেখিতে যাইয়া চক্ষু কেবলই বিরক্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে এই শুষ্ক মরুভূমি এবং প্রস্তরদেহ ভেদ করিয়া যাদৃশ জলরাশি নির্গত হইয়াছে এবং হইতেছে আর কোথায়ও হইতে সেরূপ হইতেছে না। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নদী যাহাদিগের পরাক্রম সমতল ভূমিতে বিশেষ প্রবল। যাহাদিগের উচ্ছ্বসিত জলরাশি পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জের আহারীয় প্রস্তুতের সাহায্য করিতেছে, যাহাদিগের প্রভূত জলরাশি অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জের পিপাসার শান্তি করিতেছে, সেই সকল নদীর জল কোথা হইতে আসিতেছে? প্রায় সমস্ত নদীরই উৎপত্তি স্থান কি উন্নত পর্ব্বত নহে? সমভূমি হইতে কয়টী নদী নির্গত হইয়াছে? পৃথিবীর যাবতীয় উৎস-পুঞ্জ কি পর্ব্বতের কঠিন দেহ ও মরুভূমির শুষ্ক বালুকারাশি ভেদ করিয়া নির্গত হইতেছে না? সুতরাং আমাদের মধ্যে যে কেহ শুষ্ক অন্তর থাকি না কেন, তাহাদের নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। পার্থিব জগতে যেমন শুষ্ক মরুভূমি ও কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া উৎস সকল নির্গত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতে কি সে দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নাই বা দেখিতেছি না অথবা দেখিবার আশা নাই? অদ্ভুতকর্ম্মা পরমেশ্বর প্রতিনিয়ত এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন। মানুষ যাহা অসম্ভব মনে করিতেছে তিনি তাহাই সম্ভব করিতেছেন। মানুষ নিজের শুষ্কতা ও কঠোরতার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছে আমার আর আশা ভরসা কি? আমার দিন এমনি ভাবেই যাইবে। মানুষ জানে না যে পরমেশ্বর চিরদিন এই ক্রিয়া করিতেছেন। তিনি কবির মুখ দিয়া বাহির করিতেছেন "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে"। শুধু বলাইতেছেন না, কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে প্রতিনিয়ত এই কাণ্ড ঘটাইতেছেন। মানুষ মনে করে মরুভূমি শুষ্ক, তাহাতে আবার জল কোথা হইতে আসিবে। মানুষ মনে করে প্রস্তর যেরূপ কঠিন ও কর্কশ তাহার ভিতর হইতে আবার কি করিয়া জলবিন্দু নিঃসৃত হইবে, কিন্তু দেখ চক্ষুর সম্মুখে কি ঘটিতেছে। কত নদী, কত উৎস, কত জলস্রোত নিরন্তর উচ্চ পর্ব্বতদেহ বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতেছে। অন্তর্জগতে কি এ দৃষ্টান্ত নাই? যে দুই দিন পূর্ব্বে পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ে নরনারীর উপর দারুণ অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছিল, সে কি দুই দিন পরে কোথায়ও সহৃদয়তার সহিত নরনারীর সেবায় নিযুক্ত হইতেছে না? নিষ্ঠুরতা যাহার দৈনন্দিন ব্যবসায় ছিল সে কি দয়াশীলতার উচ্চশিখরে যাইতেছে

না? এরূপ দৃষ্টান্ত ত নিয়ত দেখা গিয়াছে এবং চিরদিন দেখা যাইবে। তবে আর কেন ম্লান-মুখে বসিয়া আছ? কেন প্রাণে সরস ভাবের অভাব দেখিয়া আশার মূল ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছ? নিরাশা এ রাজ্যের জন্য নয়। আশাই আমাদের অবলম্বন। চিরদিন মলিন থাকিবার জন্য কেহ এখানে জন্মগ্রহণ করে নাই। চিরদিন নিরাশপ্রাণে এ পথ হইতে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগের সহিত কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় নাই, হইবেও না। আশার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখিতে পারি "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।" কতই বা আমাদের প্রাণের কাঠিন্য? অসীম প্রতাপান্বিত অদ্ভুতকর্ম্মা পরমেশ্বরের পক্ষে আমাদের মত কঠোর ও শুষ্কহৃদয়কে বিগলিত করা কিছুই কঠিন বা আশ্চর্য্যের কার্য্য নহে। আমাদের কাজ তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকা, আমাদের কাজ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া অপেক্ষা করা। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিবে, তাহা কি জানি? তাহা যথন জানি না এবং যথন নিশ্চয় জানি তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেনই, তখন আর নির্ভরসা হইব কেন? আমাদের কর্ত্তব্য ডাকা, তাহা করিতে থাকি। দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাঁহার দ্বারে যাই, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, এবং মানবের স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য আছে কি না, এসম্বন্ধে বার বার লোকের মনে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি। মানবের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হইলে সে তাহার কোন কার্য্যের জন্যই দায়ী হয় না। পাপপুণ্যের প্রভেদ বেশী কিছু থাকে না। আবার অন্যদিকে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি সকলই অবগত আছেন, আমার জীবনে কখন কি ঘটিবে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যাহা জানিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই আমার শত চেষ্টাও সে বিষয়ের অন্যথা করিতে পারিবে না। সুতরাং মানবের স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই বলিলে কিছুই দোষ হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনেকে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং নানাপ্রকারে ঐই কথা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু লোকের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচিতেছে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই প্রশ্ন বার বার উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা একরূপ পণ্ডশ্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে কি মানবজীবনের কর্ত্তব্যসাধনে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে? ঈশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ তিনি আমার জীবনে কখন কি ঘটিবে, তিনি যে তাহা নিশ্চয়ই জানেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে আমার কার্য্যের জন্য দায়িত্বের পরিমাণ কিছুই কমিতেছে না। কারণ ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা যদি আমিও জানিতাম এবং তাহার অন্যথা করিবার শক্তি আমার না থাকিত, তবেই একথা বলা সম্ভব হইত যে আমার কার্য্যের জন্য আমি দায়ী নই। আমার শক্তি ও সদসৎ বিবেচনানুসারে যথন কার্য্য করিবার উপায় নাই, তখন আমি সে নিমিত্ত দায়ী হইব কেন? কিন্তু যথনই আমরা কোন কার্য্য করি সে সম্বন্ধে ঈশ্বর কি জানিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা যেমন জানি না, তেমনই কার্য্য করিবার সময় এইরূপ ভাবিও না যে ঈশ্বর যথন এরূপ জানিয়া রাখিয়াছেন, তখন আর কিরূপে তাহার অন্যথা করিব। কিন্তু কার্য্য করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সদসৎ বিবেচনা দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করি। সুতরাং আমার কার্য্যাকার্য্যের জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যথন আমাদিগকে অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যথন কিছুই জানি না এবং কার্য্য করিবার সময় আমাদের নিজ বিবেক দ্বারাই চালিত হই, তখন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে আমার কার্য্যের দায়িত্ব কিছুই হ্রাস হইতেছে না। এই নিমিত্তই আমাদের অকার্য্যের জন্য আমাদের প্রাণে আত্মগ্লানি আসিয়া থাকে এবং সৎকার্য্যের জন্য প্রাণে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা না হইলেও মানবের কার্য্য করিবার কোন ব্যাঘাত ঘটেনা এবং তাহার স্বাধীনতারও ব্যাঘাত হয় না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্যাকুলতা।

"আর চলেনা, চলেনা, চলেনা, জননি! তোমা বিনা দিন আর চলেনা।"

উপরে যে সংগীতাংশ উদ্ধৃত করাগেল, এরূপ উক্তি করা কাহার পক্ষে সম্ভবে? সংসারে ত এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে অবস্থায় এমন উক্তি সম্ভবে? একমাত্র পুত্র যাহার উপর মাতা পিতার সমস্ত আশা ভরসা সংস্থাপিত ছিল, যাহার জীবনের উপর তাঁহাদের পার্থিব সকল প্রকার সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছিল, অন্ধের যষ্টির ন্যায় একমাত্র অবলম্বন এমন পুত্র ধনকে ইহ সংসার হইতে বিদায় দিয়া পিতা মাতার অসহ্য যাতনা হইলেও তাঁহাদের পক্ষে দিন চলেনা এমন অবস্থা হয় না। তাঁহাদের দিন কষ্টের সহিত হইলেও চলিয়া যায়, অকৃত্রিম প্রেমজাত বিমল সুখের মধ্যে যে দম্পতির বাস, পরস্পরের বিচ্ছেদ যাহাদের বিষম যাতনার কারণ, এমন যে দম্পতি তাহাদের মধ্যেও যদি এক জনকে হারাইতে হয়, প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া যদি এক জন আর এক জনের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করে, সে যাতনা যতই তীব্র হউক না কেন, এমন হয় না যে তাহাদের দিন আর চলে না। বন্ধুর সহিত বন্ধুর বিচ্ছেদ প্রভৃতি সংসারের যত প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার কোন স্থলেই এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না, যে আর দিন চলেনা। দিন চলেনা একথা কে বলিতে পারে? সংসারে যত সুমিষ্ট ও প্রিয়তম সম্বন্ধ আছে তাহার এক একটী করিয়া খুজিলেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না যে একের বিচ্ছেদে অপরের দিন চলিল না। কিন্তু বাস্তবিকই দিন চলেনা, এমন অবস্থা ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুল আত্মায় উপস্থিত হয়। যেথানে অকৃত্রিম প্রেম

ও অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। যে আত্মায় সরলও ঐকান্তিক ব্যাকুলতার আবির্ভাব আছে, সেই স্থলেই আমরা দেখিতে পাই, অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে একথা উপস্থিত হয় যে "চলেনা চলেনা চলেনা জননি! তোমা বিনা দিন আর চলেনা"। বিশ্বাসী ও ব্যাকুলাত্মাদিগের অগ্রগণ্য মহম্মদের জীবনচরিতে তাঁহার ব্যাকুলতা সম্বন্ধে এই রূপ বর্ণনা আছে "যখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর সেই সময় হইতে বিশেষ রূপ ধ্যানপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন; সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল, পূর্ব্বে দুই এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন এখন দিবা রাত্রি ধ্যান করিয়াও আর তৃপ্তি হয় না। ধ্যান ছাড়িয়া আহারে রুচি হয় না, নিদ্রার সময় পান না—অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া গেলেন, নিরাশ হইয়া কত বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু খাদিজার সতর্কতায় বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। * * * পরমেশ্বরকে না পাইয়া তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। লোকে তাঁহাকে দিশাহারা উন্মাদ মনে করিয়া গাত্রে ধূলি দিত, শত শত লোক তাঁহার পশ্চাতে জড় হইয়া বিদ্রূপ করিত, কি বিষম জ্বালায় মহম্মদের প্রাণ পাগল তাহা না জানিয়া তাঁহার উপর কত অত্যাচার করিত। মহম্মদের সংসারাতীত প্রাণে মানুষের ঠাট্টা উপহাস কখনও কোন ক্লেশ দিতে পারিত না। কিন্তু যার জন্য পাগল এসংসারে তাহা না পাইয়া শূন্য-প্রাণ পূর্ণ করিবার উপায় না দেখিয়া প্রাণের ক্লেশ ও নিরাশার দংশন আর সহিতে না পারিয়া একদিন নিশীথকালে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে খাদিজা তাঁহাকে বাহুদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। খড়্গাঘাতে বিচ্যুত-মুণ্ড ছাগ শিশুর ন্যায় মহম্মদ যাতনায় ধড় ফড় করিতে লাগিলেন এই যাতনায় কতদিন কত যামিনী অতি বাহিত হইল"। ভক্তগণের অগ্রগণ্য চৈতন্যের জীবনেও দেখা যায় তিনি কখনও ঈশ্বর বিরহে আকুল হইয়া হাহাকার করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখন অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহের দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করিতেছেন, কখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাণ ক্রমে এমন হইল যে আর এ জীবন রাখা আবশ্যক বোধ করেলেন না, প্রাণ ত্যাগের জন্য সমুদ্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। শিষ্যগণ অনেক যত্নে তাহাকে সেবার রক্ষা করিল। এই দুই ব্যাকুলাত্মার আচরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহাদের দিন আর চলিতেছিল না। একবারে অচল অবস্থা হওয়াতে উভয়েই প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। এরূপ ব্যাকুলতা সংসারের নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্য হওয়া সম্ভবে না। প্রিয়তম পরমেশ্বরের বিরহে তাঁহার ভক্তের প্রাণে যে যাতনা উপস্থিত হয়, তাহার তুলনা নাই। একমাত্র সেই জীবনেই একথা উপস্থিত হয় এবং তাঁহার পক্ষেই এরূপ উক্তি করা সাজে যে "আর চলেনা চলেনা চলেনা জননি! তোমা বিনা দিন আর চলে না।" তাঁহাদের দিন চলে না বলিয়াই পাগলের মত হাহাকার করিয়া বেড়ান, লোক-নিন্দা বা সংসারের কোন অপমান কিম্বা ক্ষতি তাহাদের প্রাণে গণনার স্থলে আসে না। তাঁহারা ঈশ্বর বিরহিত প্রাণ রাখা প্রার্থনীয় মনে করেন না। বাস্তবিক এরূপ ব্যাকুলতা যাহাদের প্রাণে উপস্থিত হয় তাঁহাদেরই পক্ষে ঈশ্বর লাভ ঘটিয়া উঠে। অন্যের পক্ষে তাঁহাকে পাওয়া কতদূর সম্ভবপর কে জানে। যাহাদের প্রাণ এরূপ ব্যাকুল হয় না, যে তাঁহার অভাবে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে উক্তরূপ গান করা কি উচিত? তবে আমরা কেন এরূপ গান করি? আমাদের প্রাণ সেই প্রাণেশ্বরের জন্য কি সেরূপ ব্যাকুল? সেই ব্যাকুলতার কথা বলিতেছি না যে ব্যাকুলতা দুই ফোটা চক্ষের জল পড়িলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যাকুলতার কথা বলিতেছি না যাহা একটী প্রার্থনা বা ২।১ ঘণ্টার উপাসনাতেই শেষ হয়, অথবা ২।১ ঘণ্টা সৎপ্রসঙ্গ বা সংকীর্ত্তনেই শেষ হয়, এরূপ ব্যাকুলতা আমাদের মধ্যে অনেকের থাকিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যাকুলতার কথা বলিতেছি, যাহা উপস্থিত হইলে প্রাণের মায়া কাটাইতে প্রবৃত্তি হয়, যাহা উপস্থিত হইলে সংসারে ঈশ্বর বিরহিত দেহ ধারণ করিয়া থাকাকে অসার মাংসপিণ্ড বহনের হেতু ও কষ্টের কারণ বলিয়া মনে হয় এবং সেরূপ ভার বহন করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ ব্যাকুলতা আমাদের নাই সুতরাং আমাদের মুখ হইতে উক্তরূপ সংগীত বাহির হওয়া কি শোভা পায়?

ভক্ত ও প্রেমিকের প্রাণে যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, আমাদের ত তাহার অভাব আছেই, তাহার পরিবর্ত্তে বরং আমাদের প্রাণে বিপরীত ভাবই প্রবল আছে। ভক্তগণ ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রিত হওয়াকে কষ্টের হেতু বলিয়া মনে করেন, আমরা উপাসনা বা সৎপ্রসঙ্গের অনুরোধে একটু নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে কষ্টানুভব করি। তাঁহারা সংসারের বিলাস ও সুখসেব্য বস্তু সমূহে পরিবেষ্টিত থাকাকে কষ্টের কারণ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাহার অভাবে বিষম অসুখ অসুবিধা হইল বলিয়া মনে করি। ভক্তগণ পৃথিবীর প্রশংসা ও সম্মান লাভকে আপনার বিষম অনিষ্টকর জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য ব্যাকুল হন, অতি নির্জ্জনে নিভৃত প্রদেশে আপন অভীষ্ট দেবতার ধ্যান ধারণায় সময় যাপন করিতে ব্যাকুল হন, আর আমরা সামান্যরূপ সৎকার্য্য করিয়া অন্যে তাহা জানিবার পূর্ব্বেই নিজে ঢক্কানিনাদে তাহা জগতে ঘোষণা করিতে থাকি। বাস্তবিক ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলআত্মার প্রাণে স্বভাবতঃ যে সকল লক্ষণ আপনা হইতে উপস্থিত হয়, আমাদের প্রাণে তাহার সমাবেশ ত দেখিতেই পাই না, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ভাবই দেখিতে পাই। কিন্তু সেই ব্যাকুলতাই আমাদের পাইতে হইবে, যাহা পাইলে ঈশ্বর-বিরহকে অসহ্য যাতনার কারণ মনে হইবে। যাহা পাইলে তাহার বিচ্ছেদযুক্ত প্রাণ ধারণে অপ্রবৃত্তি জন্মিবে, প্রাণের প্রতি আপনাপনি ধিক্কার উপস্থিত হইবে, বিষয় ভোগের সহিত থাকাকে কষ্টের ও অতৃপ্তির হেতু বলিয়া মনে হইবে। কারণ এরূপ ব্যাকুল না হইলে, তাঁহাকে পাওয়া সম্ভপর নহে। এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নাই যে ধর্ম্মজীবন লাভ বা ঈশ্বর লাভ ঘটিল অথচ তাঁহার জন্য তেমন আকুলতা তেমন আগ্রহ ছিল না। ধর্ম্ম জীবন পাইতে হইলেই এরূপ ব্যাকুলতা থাকা আবশ্যক। ব্যাকুল প্রাণের প্রার্থনাই আত্মাকে সেই প্রাণারাম

পরমেশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দেয়। যদি এই প্রকা ব্যাকুলতা ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়, যদি ঈশ্বর লাভের পক্ষে আশা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদাসীনতা বা অক্ষুধা ত কখনই অনিন্দনীয় নয়? কারণ ধর্ম্ম জীবন লাভ কিছু এরূপ একটী লাভের ব্যাপার নয়—ঈশ্বর লা কিছু এমন ব্যাপার নয় যে তাহা সংসারের আর দশটী সুখসেব্য বস্তু লাভের পাইলে ভাল হয় না পাইলেও চলে। ঈশ্বর লাভ ও ধর্ম্মজীবন লাভ যদি পৃথিবীর আরাম ও বিশ্রামের জন্য অন্য দশটী পার্থিব বস্তু লাভের ন্যায় না হয় তবে এবিষয়ে আমাদের এত ঔদাসীন্য কেন? আমরা পৃথিবীর সুখ-সেব্য বস্তু যাহা পাইলে ভাল হয়, না পাইলেও চলে, তাহার প্রতিও ত এমন উদাসীন হই না। দিন রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমরা সংসারের অর্থোপার্জ্জন বা অন্যরূপ সম্মান অর্জ্জনের জন্য যে পরিশ্রম করি, তাহার তুলনায় যদি অতি সামান্য পরিমাণেও ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইতাম, তাহা হইলেও এমন অবস্থায় আর দিন কাটাইতে হইত না। তাহা হইলে ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য, ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য, তাঁহার পূজা অর্চ্চনার জন্য আর এত অনুরোধও করিতে হইত না। উপদেশের পর উপদেশের স্রোত আমাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, প্রস্তর-দেহের উপর প্রচুর বারিধারা বর্ষিত হইলেও যেমন তাহার গাত্র বহিয়াই নিম্নে চলিয়া যায়, কিন্তু অন্তরে প্রবৃষ্ট হয় না, তেমনি এই উপদেশের স্রোত যেন আমাদের উপর দিয়াই বহিয়া যাইতেছে, ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অসাড় প্রাণের জড়তা কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইতেছে না। অথচ আমরা ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি। এরূপ মনে করিয়া আত্ম-সান্ত্বনা লাভ করিতে আমাদের মনে কোন সঙ্কোচ নাই। এভাবে জীবন চলা আর না চলায় প্রভেদ কি? আমাদের যে জীবন তাহার সহিত নির্জীবতার প্রভেদ অতি সামান্য। এরূপ জীবন লইয়া আমরা যে সন্তুষ্ট আছি, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে আমরা জীবনের স্বাদ পাই নাই। ধর্ম্মজীবন লাভ করা একটা কথার কথার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক সেরূপ জীবন লাভ যে সম্ভব বা লাভ করা যে আবশ্যক আমাদের বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া তাহাও বুঝিবার সুবিধা হয় না। আমরা উৎসব করিবার জন্য আয়োজন করিতেছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই আয়োজনই গুরুতর ও অতি প্রয়োজনীয়। এই ব্যাকুলতার আয়োজন যাহার আছে, সে ব্যক্তিই উৎসব ক্ষেত্রে যাইয়া প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। সেই জীবনই চরিতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য ও সুখী হইতে সমর্থ। অন্যের পক্ষে উৎসবে গমন আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাদের শরীর উৎসব ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু প্রাণ উৎসবের সেই মাধুর্য্য লাভ করিতে পারে না, ব্যাকুলাত্মাগণ প্রাণারামের সহিত সংযোগে যাহা প্রাপ্ত হন। সুতরাং আমরা যাহাতে ব্যাকুল প্রাণে উৎসবে যাইতে পারি, তাহার জন্য উদ্যোগী হই।

প্রকৃত বৈরাগী কে?

যাহার সংসারাসক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত বৈরাগী। এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারেন সংসার বাহিরে কি ভিতরে? জগতের অধিকাংশ লোক মনে করে সংসার বাহিরে। দিব্য অট্টালিকা, মনোরম উদ্যান, মণি মুক্তা খচিত রাজপাট, প্রফুল্ল কুসুম সদৃশ বালক বালিকা সমূহে সুশোভিত সুন্দর পরিবার, কার্য্যক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট বহুব্যাপী বাণিজ্যের কোলাহল, ধর্ম্মাধিকরণের চাকচিক্য, বিদ্যালয়ের গম্ভীর কলরব, তাহাদের মতে সংসারের উপাদান। সংসাররূপ মহাক্ষেত্রের বিরাট দেহ এই সমস্ত উপাদানে গঠিত। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় ঋষিগণ বনবাসী হইয়া তপ জপ করিতেন। পর্ব্বতের জনমানব শূন্য গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, আজিও অনেক ভগবদ্ভক্ত নিরাশার গভীর কূপে নিমগ্ন হইয়া নির্জ্জন বনভূভাগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত সংসার বাহিরে নয়। একবার বহির্ম্মুখীন দৃষ্টি শক্তির গতির দিক পরিবর্ত্তন করিয়া যদি অন্তরের দিকে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় অন্তরেই বিরাট সংসার। সেই খানেই ভোগ্য বস্তুর প্রকাণ্ড বাজার, বিলাসিতার রম্য বস্তু সমূহের সমধিক আমদানি। এই জন্য সর্ব্বত্যাগী জটা চিরধারী বনবাসী সন্যাসীরও অনিত্যাসক্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সন্যাসী বাহিরের সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ লোক যাহাকে সংসার আখ্যায়িকা প্রদান করিয়া সাধন পথের অন্তরায় মনে করিতেছে, তিনি তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের সংসার ভাঙ্গে নাই। সেখানে বাণিজ্যের কলরব সেখানে ধর্ম্মাধিকরণের লীলা খেলা, সেখানে বিষয়ের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, সেখানে বেশ ভূষার চকমকি সকলই রহিয়াছে। তাহার প্রেম দেশাধারে অবস্থিত পদার্থ সমূহ ছাড়িয়া এখন মানসিক রাজ্যের ভাব রাশির উপর পড়িয়াছে। সাকার ছাড়িয়া এখন নিরাকারে মগ্ন হইয়াছে। অন্তরে সংসার বজায় রাখিয়া কে বৈরাগী হইবে? এখানকার সংসার বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইতে না পারিলে প্রকৃত বৈরাগী হওয়া যায় না। আমরা মানব মণ্ডলীর নিকট বৈরাগী সাজিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী পরম ব্রহ্মের নিকট আমরা বৈরাগী হইতে পারিব না। সর্ব্বদর্শী পরম ব্রহ্মের নিকট বৈরাগী হইতে হইলে আমাদের অন্তরকে সংসার বিবর্জ্জিত করিতে হইবে। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সংসার এখনও সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নাই। পরিমিত কোন কোন পদার্থ প্রাণের পুতুলি হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। কবে এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে জানি না। কবে আমাদের হৃদয় ঘর সংসার শূন্য হইয়া ব্রহ্মে পরিপূর্ণ হইবে জানি না। পর্ব্বোপলক্ষে ভারতবর্ষীয় জনক জননী সন্তান দিগকে সুন্দর সুন্দর নব নব পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দেন। আমাদের উৎসব আসিতেছে, আমরা কি প্রার্থনা করিব। বলিব পিতাগো আমরা বেশ ভূষা চাই না। আমা-

দিগকে প্রকৃত বৈরাগী সাজাইয়া দাও। আমরা মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া জটাজুটদ্বারা মস্তক পরিবৃত করিয়া, শান্তিপ্রদ তব দত্ত পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিতে চাহি না। আমাদিগকে স্বার্থত্যাগী বৈরাগী করিয়া দেও, আমাদের অন্তর হইতে আসক্তির পুতুল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমরা আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের রক্ত শীতল এবং মাংসপেশী শিথিল এবং স্নায়ু-সূত্র অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কঠোর বৈরাগ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেছি না। প্রভু! আশীর্ব্বাদ কর উৎসবে যেন আমরা বৈরাগ্যের নবজীবন লাভ করিতে পারি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক ১৮৮৯ কার্য্যবিবরণ।

বিগত তিন মাস নিম্নলিখিতভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই তিন মাসে উক্ত সভার ১০টী সাধারণ ও ৩টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

বাগআঁচড়া স্কুল—এই স্কুলের কাজ নিয়মিতভাবে চলিতেছে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন নিজেই সমস্ত অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্কুলটী এখন ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের জন্যই চালিত হইতেছে। নানা কারণে এইরূপ ভাবে কার্য্য চালান বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে।

খাসিয়া মিশন—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই মিশনের সমস্ত ভার লইয়া কার্য্য করিতেছেন। খাসিয়া পাহাড়ের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, তিনি প্রচার করিতেছেন। প্রথমে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে মৌথারে একটী ব্রাহ্মসমাজ ছিল। ইতিমধ্যে আর তিনটি নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টান মিশনারিরাও এখানে অনেক কাজ করিতেছেন। এ জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে হয়। অনেক খাসিয়া পূর্ব্বেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এক জন খাসিয়া যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রতি খাসিয়া ভাষায় দুইখানি পুস্তক বাহির করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এই তিন মাস বাগআঁচড়ায় থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। একভাবেই তাঁহার কার্য্য চলিতেছে। তজ্জন্য তাহার বিশেষ বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার নিয়মিত কার্য্যের বিবরণ এইরূপ—

রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে উপাসনালয়ে কয়েকটি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও বালক বালিকা লইয়া উপাসনা করিয়াছেন। তৎপর অন্য গ্রামস্থ সমাজে উপাসনা করিয়াছেন (অর্থাৎ শঙ্করপুর, কুলবেড়িয়া ও বাগুড়ী) রবিবার ব্যতীত উক্তরূপ উপাসনান্তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। অন্য গ্রামের উপাসনা দিনে সন্ধ্যার সময় তথাকার ব্রাহ্মিকাসমাজে উপাসনা করিয়াছেন। সন্ধ্যার উপাসনান্তে ছাত্র ছাত্রীদিগের পাঠাভ্যাসে সহায়তা করিয়াছেন। বাগুড়ী ব্রাহ্মসমাজে কিছুদিন হইতে প্রাতে উপাসনা না করিয়া অপরাহ্নে ব্রাহ্মিকাগণ ও ছাত্র ছাত্রীগণ লইয়া যাইয়া উপাসনা করিয়াছেন। রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও বালক বালিকাগণকে লইয়া সমাজের উপাসনা করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাজারে যাইয়া তথায় বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিয়াছেন। তৎপর পুনরায় নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনালয়ে আসিয়া উপাসনা এবং পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। শরীর অসুস্থ থাকায় এবং অন্যান্য কোন কারণ বশতঃ শঙ্করপুর, কুলবেড়িয়া ও বাগুড়ী গ্রামত্রয়ের মধ্যে কোন গ্রামে একদিন কোন গ্রামে দুই দিন সামাজিক উপাসনা তিনি করিতে পারেন নাই। উল্লিখিত নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত কয়েকটী শ্রাদ্ধ ও দীক্ষায় উপাসনার কাজ করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—গত তিন মাসে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ভাগলপুর সমাজে এবং বন্ধুদের গৃহে উপাসনাদি করেন। তৎপরে তথা হইতে মুঙ্গেরে যান। এবারে ২।৩ দিন মুঙ্গেরে ছিলেন। তাহাতে সমাজে উপদেশ হয় এবং একটী বন্ধুর পরিবারেও উপাসনাদি হইয়াছিল। মুঙ্গের হইতে গয়া যান। এখানে প্রায় ৩ সপ্তাহের অধিক ছিলেন এ সময়ে এখানকার সমাজে উপাসনা উপদেশাদি হয়, বন্ধুদের পরিবারে পরিবারে উপদেশাদি হয়, প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন পরিবারে উপাসনাদি হইয়াছে। একদিন বিশেষরূপে একটী মহিলার যত্নে তাঁহার গৃহে সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবার এবং ব্রাহ্ম বন্ধুগণ একত্রিত হইয়া সমস্ত দিন উপাসনা উপদেশ পাঠ কীর্ত্তনাদিতে যাপিত হইয়াছিল। এইবার গয়া থাকাকালীন একবার বুদ্ধগয়া নামক স্থানে কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাতে কাটান হইয়াছিল। গয়া হইতে বাঁকিপুরে যান। এখানে ২।১ দিন থাকিয়া আরা যান। বাঁকীপুরে কথাবার্ত্তা ভিন্ন অন্য কাজ হয় না। আরাতে যে কয়দিন ছিলেন প্রায় প্রতিদিনই উপাসনা উপদেশ আলোচনাদি হইয়াছিল। আরা হইতে পুনরায় বাঁকীপুরে আসেন। এবার এখানে প্রায় ১৫ দিন ছিলেন। পারিবারিক উপাসনা এবং আলোচনা ও দেখাসাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য কাজ হয় নাই। এখান হইতে মোকামায় গমন করেন এখানে সঙ্গীত এবং প্রার্থনাদি হয়। মোকামা হইতে বৈদ্যনাথে আসেন। এখানে একদিন থাকিয়া বুড়াই পাহাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে যান। এবং বন্ধুদের সঙ্গে উপাসনাদি হয়। তৎপর পুনরায় বৈদ্যনাথে আসেন। এখানে উপাসনাদি হয়। একদিন স্কুলের ছেলেদিগকে কিছু বলা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যে সামাজিক উপাসনা হয় তাহাতে প্রার্থনাদি হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ হইতে সবান্ধবে মধুপুরে যান এখানে স্থানীয় ভদ্র লোকদিগকে লইয়া উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। তথায় তিনি ৪।৫ দিন থাকেন। প্রতিদিনই পারিবারিক উপাসনা এবং সন্ধ্যাকালে আলোচনা ও কথাবার্ত্তাদি হইত। পরে গিরিধি গমন করেন এবং গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে উপাসনা ও উপদেশ হয়। এখান হইতে এক দিন পচম্বা গিয়াছিলেন। তথায় উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। প্রায় ১৫ দিন এখানে ছিলেন ২৩এ ডিসেম্বর উৎসবের কার্য্য শেষ হইলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৭ই কার্ত্তিক—শ্রীরামপুর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ১৮ই কার্ত্তিক—শ্রীরামপুরে 'রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরেও কিছু কিছু কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সভার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার উল্লেখ করা হইল না। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ করাতে প্রচার কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে ও হইতেছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই তিনি এখান হইতে লাহোর যাত্রা করেন। ১২ই অক্টোবর তারিখে তথাকার সমাজগৃহে 'Revolution in Modern India, its bearings and its prospects' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ১৩ই তারিখে হিন্দিতে উপাসনা করেন এবং ইংরাজীতে উপদেশ দেন। ১৪ই তারিখে বাঙ্গালাতে "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধর্ম্ম বিপ্লব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে দুই এক দিন পারিবারিক উপাসনা করেন। ১৯ শে অক্টোবর তারিখে ইংরাজীতে 'The great problem in India' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২০শে তারিখে পাঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে বাঙ্গালায় উপাসনা করেন ও রাত্রিতে হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ইংরাজিতে ২১শে তারিখে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন। ২২ শে তারিখে Sikha Sabha Hall এ বাঙ্গালী ভদ্র লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক সমিতিতে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে আলাপ করেন। ২৩শে তারিখে "The Spirit giveth life" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন ২টী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৬শে তারিখে "Religious Life in the West, what does it teach us" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৭শে তারিখে প্রাতে উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ এবং হিন্দিতে ও ইংরাজিতে ব্যাখ্যা করেন। পরে কাশী গমন করেন ৩০শে তারিখে কাশীতে বাবু রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা করেন। ৩১শে তারিখে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১লা নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালিটোলাস্থ স্কুলে "বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সামাজিক উন্নতির ইতিহাস" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। ২রা তারিখে Carmichael লাইব্রেরীতে একটী ইংরাজি বক্তৃতা করেন। ৩রা তারিখে উক্ত স্থানে "Duties and Responsibilities of Educated Indians" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে লক্ষ্ণৌনগরে গমন করেন। ৫ই তারিখে বাবু বিপিন বিহারী বসু মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৬ই তারিখে Raffian Hall এ একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। ৭ই তারিখে Queen's school এ "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৮ই তারিখে এলাহাদ যাত্রা করেন। ১০ই তারিখে এলাহাবাদে সমাজে উপাসনা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মালোচনা হয়। সায়াহ্নে কাটরা ব্রাহ্মসমাজে 'Ram Mohun Roy, the Pioneer of Indian Reform' বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। ১২ই তারিখে বালিকা বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। ১৬ই তারিখে জব্বলপুরে গমন করেন এই স্থানে লছমন প্রসাদ জি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং পরদিন খাণ্ডোয়াতে গমন করেন। তথায় ১৯এ তারিখে 'The Brahmo Samaj, its History and its Principles' বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। ২০শে তারিখে বাঙ্গালাতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। ২৩শে তারিখে Mhow নামক নগরে গমন করেন এবং শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজী হিন্দিতে একটী বক্তৃতা করিলে তিনি সেই সময়ে ইংরাজিতে কিছু বলেন। ২৪শে তারিখে ইন্দোরে গমন করিয়া State guest রূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ২৫শে তারিখে মহারাজার Secretary ও Prime Minister মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৬শে তারিখে Library Hall এ "মুক্তি ও তৎসাধনের উপায়" বিষয়ে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা হয়। ২৮শে তারিখে মহারাজা হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সায়ংকালে Library Hall এ "Culture and Higher Life" বিষয়ে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। ২৯শে তারিখে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। ৩০শে উজ্জয়িনীতে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত লচমন প্রসাদ একটী বক্তৃতা করিলে তিনিও সেই সম্বন্ধে ইংরাজীতে কিছু বলেন।

৪ঠা তারিখে রতলামে গমন করেন এবং সেখানেও State-guest রূপে অবস্থিতি করেন। বাবু রজনীনাথ নন্দীর বাড়ীতে উপাসনা করেন। ৫ই তারিখে শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ হিন্দিতে বক্তৃতা করিলে তিনিও ইংরাজীতে কিছু বলেন। ৬ই তারিখে আজমীর গমন করেন। ৭ই তারিখে স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করেন এবং প্রাতে বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা করেন। ৮ই রবিবার প্রাতে Lala Mulchand নামক একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ইংরাজী ও হিন্দিতে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সায়াহ্নে একজন মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। ৯ই তারিখে শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ হিন্দিতে বক্তৃতা করিলে, তিনিও ইংরাজীতে কিছু বলেন। ১০ই তারিখে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন রাত্রিতে আহমেদাবাদ গমন করেন। ১২ই তারিখে স্থানীয় সমাজের সভ্যদিগের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। ১৪ই তারিখে সমাজ মন্দিরে "A Message of deliverance" বিষয়ে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। ১৫ই তারিখে নগরকীর্ত্তন হয় এবং বাজারে হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। ১৬ই তারিখে সমাজ মন্দিরে "The Social reconstruction of Modern India" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ১৭ই তারিতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

বাবু শশীভূষণ বসু—কুমারখালী সমাজের উৎসবোপলক্ষে কয়েকদিন সমাজে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন এবং "আত্মার উন্নতি ও অবনতি" সম্বন্ধে সমাজ

গৃহে একটি বক্তৃতা করেন। তথা হইতে পাবনা গমন করেন। কোন এক পরিবারে, উপাসনাদি করেন ও উপাসক দিগের জন্য এক দিন বিশেষ উপাসনা ও একটি উপদেশ প্রদান করেন ও "স্বর্গীয় শক্তি" সম্বন্ধে সমাজ গৃহে একটি বক্তৃতা করেন। রাজসাহী সমাজে উৎসবোপলক্ষে কয়েকদিন কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। ইংরাজী স্কুল গৃহে "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও ধর্ম্মমত" সম্বন্ধে ও সমাজ গৃহে "সমাজ ও জীবন" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। সামাজিক উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। ও সাধারণ লোকদিগের জন্য বক্তৃতা করেন। পুটিয়ায় গমন করেন। তথায় কীর্ত্তন ও ভদ্র লোকদিগের জন্য একটি উপদেশ দান করেন। ইহা ব্যতীত লোকদিগের সহিত আলোচনাদি করেন। "ধর্ম্মবন্ধু"—পত্রিকা সম্পাদনের সাহায্য করেন ও স্বর্গীয় গিরীন্দ্রমোহন গুপ্তের জীবনী প্রকাশ করেন।

কালীপ্রসন্ন বসু—ঢাকায় গিয়া অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন,তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে প্রত্যেক দিবস ছাত্র, ব্রাহ্ম ও অন্যান্যের জন্য ঢাকা প্রচারক নিবাসের নিম্নতলে ৫টার সময়ে প্রার্থনা সঙ্গীত ও কিছু কিছু সৎপ্রসঙ্গ হইবে। কয়েক দিবস ইহা ভালই চলিয়াছিল। স্কুল ও আফিসাদি খোলার পর হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই কার্য্য মন্দ চলে নাই। সপ্তাহে বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে যে নিয়মে কার্য্য হইয়াছে তাহা এই:—রবিবার দুইবেলা সমাজ মন্দিরে উপাসনা। সোমবার কোন বন্ধুর আলয়ে ক্ষুদ্রমণ্ডলীর মধ্যে উপাসনা, এই মণ্ডলীতে কেবল এক দিন কার্য্য হইয়াছিল। মঙ্গলবার ছাত্র সঙ্গতে উপাসনা ও আলোচনা। অনেক দিবস হইতে সমগ্র উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়া আসিতে ছিল তৎপর উপাসনার একটী অঙ্গ প্রার্থনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আরও দুই সঙ্গতে কার্য্য করিয়াছেন। বুধবার বন্ধুদিগের সহিত উপাসনা আলোচনাদি হইয়া থাকে। বৃহস্পতিবার এক বন্ধুর আলয়ে উপাসনা হইয়া থাকে, এখানে অনেকে উপস্থিত হন। শুক্রবারও এইরূপ কার্য্য হয় কিন্তু তিনি সকল দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ছাত্র সমাজে এক দিন "কোন পথে জ্ঞান পাইব" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রবিবার দিবস অপরাহ্নে সামাজিক উপাসনা হয়।

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—প্রথমাংশে চেরাপুঞ্জী ও শেলায় গমন করেন। পথে মৌকাডক নামক স্থানে এক খাসিয়ার গৃহে সঙ্গীত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে প্রভেদ কি তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। চেরাপুঞ্জিতে দুই দিন সভা হয়। একদিন ইংরাজীতে কিছু বলেন। তথাকার রাজার এবং অন্যান্য কয়েক বাড়ীতে যাইয়া আলাপাদি করা হয়, এক পরিবারে একদিন সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনা হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হয়। মৌসমাইএ দুই দিন সভা হয়। এক দিন ইংরাজীতে উপদেশ প্রদান করেন। শেলায়, ৮ দিন সভা হয়। একদিন ইংরাজীতে এবং অন্যান্য দিন বাঙ্গালাতে উপদেশ দেওয়া হয়। একদিন খ্রীষ্টিয়ানদিগের সঙ্গে বিচার হয়। জেসির ও মৌরাংথং নামক স্থানে দুইটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। নূতন ৮ জন লোক যোগদান করেন; পূর্ব্বের ১২ জন আছেন। সর্ব্বসমেত ২০ জন। খাসিয়াতে এক দিন প্রার্থনা করেন। ফিরিবার সময় মৌসমাইএ আর দুই দিন সভা হয়। এক দিন সমাজ স্থাপনের জন্য উপাসনাদি হয় এবং লিখিয়া খাসিয়া ভাসায় উপদেশ প্রদান করেন। নূতন ৫ জন যোগ দেন। চেরাপুঞ্জীর এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাসায়ও এক খাসিয়ার গৃহে সঙ্গীতাদি হয়। আর এক খাসিয়ার গৃহে সঙ্গীত ও খাসিয়াতে প্রার্থনা করেন। চেরাপুঞ্জীর এক যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিবেন। শিলংএ থাকিতে শিলং সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা অধিকাংশ সময় করেন। সময়ে সময়ে মৌথার সমাজের উপাসনা কার্য্য করেন। শেষে কয়েক দিন খাসিয়াতেই উপাসনা করিয়াছেন। মৌথারের রবিবাসরিক বিদ্যালয়েও কয়েক দিন শিক্ষা দান করেন। "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" সম্বন্ধে খাসিয়া ভাষায় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। শিলং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে দুই দিন উপাসনা করেন। এক দিন শিলা সমাজে "অনুতাপ ও নবজীবন" এই বিষয়ে এবং এক দিন মৌথার সমাজে "ধর্ম্মের স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দিক্" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শেষেয় বক্তৃতা খাসিয়া ভাষায় হইয়াছিল। চারিটী নামকরণ অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। পারিবারিক উপাসনাও করিয়াছেন। কয়েক জনকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রদান করিয়াছেন; নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া খাসিয়াদের গৃহে আলাপাদি করেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে মৌথারের কোন কোন খাসি য়ার গৃহে গিয়া সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু মনরঞ্জন গুহ প্রভৃতি মহাশয়গণও বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ শিবনাথ বাবুর সহিত মিলিত হইয়া অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অনেক স্থানে উপাসনা করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন।

প্রচার ফণ্ড—বিগত অক্টোবর মাসের শেষে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের অনেকে Botanical Garden গমন করেন। তথায় উপাসনাদি হয়। উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপন আপন আয়ের কত অংশ প্রদান করিরেন সে বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে যাঁহাদের মাসিক আয় অনধিক ২৫৲ টাকা তাঁহারা টাকাপ্রতি ৫ এক পয়সা এবং তাহার অধিক আয়বান সভ্যগণ টাকায় ৭॥ দেড় পয়সা হিসাবে দান করিবেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে তথায় উপস্থিত সকলেই এই হারে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন; আরও অনেকে এই নিয়মে দান করিতেছেন। আশা করা যায় অন্যান্য সভ্যগণও এইরূপে সমাজকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সঙ্গত সভা—এই সভার ১২টী অধিবেশন হয়। সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া উপাসনান্তর ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়—"জীবনের বদ্ধভাব কিরূপে মোচন হয়" "সংসার বন্ধন কিরূপে ঘোচে" ও "রিপুদমন" পবিত্রতা ও ব্যাকুলতা।

রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়—একমাস ছুটীর পরে নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়াছে। এই মাসে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৭।৪৮ জন হইয়াছে, এবং প্রায় প্রতি রবিবারেই দুই একটী করিয়া বালক বালিকা বাড়িতেছে। বালক বালিকাগণ সংগীতশিক্ষা করিতেছে। সকল প্রকারেই পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা এখন কিছু আশা জনক।—

উপাসকমণ্ডলী—এই সময় মধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত এবং বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিরাছেন। রবিবারের প্রাতঃকালীন উপাসনা নিয়মিতরূপে হইতেছে।

সম্প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আদেশানুসারে মণ্ডলী উপাসনালয়ের জীর্ণ সংস্কারে নিযুক্ত আছেন। সংস্কার কার্য্যের অধিকাংশই সমাধা হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে আশা করা যায় তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে

দাতব্য বিভাগ—গত তিন মাসে দাতব্য বিভাগের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। দাতব্য বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
বার্ষিক চাঁদা আদায়		মাসিক চাঁদা দান	
৩ মাসে	১৲	৩ মাসে মোট	৩২৲
মাসিক চাঁদা আদায়		এককালীন চাঁদা দান	।০
৩ মাসের মোট	৫৲	বিবিধ	।১৫
এককালীন আদায়			
৩ মাসে মোট	৪৬৸৵০		৩২।১৫
		স্থিত	১০৭৶১০
	৫২৸৵০		
পূর্ব্বকার স্থিত	৮৬৷৷৵৫		১৩৯৷৷৫
	১৩৯৷৷৫		

আমরা বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে চোরবাগানের বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় দাতব্য বিভাগের জন্য ১০০৲ টাকা একখানি দানপত্র সহিত দান করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার দান পত্রের লিখিত প্রস্তাবানুসারে এই টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা হইবে। আমরা এই দানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

দান প্রাপ্তি—আমরা আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে মহারাজা হোলকার বিল্‌ডিংফণ্ডের সাহায্যার্থ ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ১২৫৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকেও ৭৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দান প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় দেখিয়া ইণ্ডিয়া মেসেঞ্জার কমিটি প্রস্তাব করেন যে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও প্রেসের দুই জন স্বতন্ত্র ম্যানেজার না রাখিয়া এক জন ম্যানেজারের দ্বারা কার্য্য চালাইলে মেসেঞ্জারের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া, যাহাতে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এইরূপ বন্দোবস্তে কার্য্য হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে লাহোরস্থ শ্রীযুক্ত সরদার দয়াল সিংহ মহাশয় মেসেঞ্জারের জন্য এক কালীন ২০০ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই দান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তত্ত্বকৌমুদী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচারার্থ বাহিরে গমন করাতে, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ৩ মাসের জন্য সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। ইহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়।

পুস্তক প্রচার—আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সম্প্রতি দুই খানি খাসিয়া পুস্তক ছাপান হইতেছে ১ম খানি—উপাসনা পদ্ধতি এবং ২য় খানি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস সম্বন্ধীয়।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—নলহাটী ব্রাহ্মসমাজ তথায় নৈশ বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ বীরভূম দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ২৫০ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই নিমিত্ত টাকা দিতে পারেন নাই।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটি কলেজ গৃহে এক বৃহৎ সভা হয়। এই সভায় মাননীয় জষ্টিস ডাঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ কে, এস ম্যাকডন্যালড ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

Theistic Conference—ডিসেম্বর মাসে বোম্বে সহরে একটী Theistic Conference হইবে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এই Conference এ কিকি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত, তাহার বিচার হয় এবং উক্ত Conference এ আমাদের মতামত জ্ঞাপন করিবার জন্য বাবু আনন্দ মোহন বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, উমেশ চন্দ্র দত্ত, কালীশঙ্কর সুকুল, বিপিন চন্দ্র পাল, উপেন্দ্র কিশোর রায় চোধুরী, দুর্গামোহন দাস ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম-বন্ধু সভা—এই তিন মাসের মধ্যে ব্রাহ্মবন্ধু সভার কেবল একটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "নর নারীর সামাজিক সম্বন্ধ" বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন।

নূতন সমাজ—এই তিন মাসের মধ্যে খাসিয়া পর্ব্বতে

তিনটি নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সাতক্ষীরা, উজ্জয়িনী, এবং আরাতে এক একটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার কমিটি, Theological Institution ও সামাজিক নিয়ম প্রণয়নকারীকমিটির কার্য্যের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই। প্রচার কমিটির কোনও কার্য্য হয় নাই।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই তিন মাসে স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ১৯৲ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব স্থিত ২৩৩৪॥/১৫ সহিত ২৩৫৩॥/১৫। এই টাকার অধিকাংশ প্রচারক বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধার দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—এই প্রেস মধ্যমরূপে চলিতেছে। গত তিন মাসে ৮৩৮।৶ টাকার কাজ হইয়াছে, ৬৬৫॥৫ টাকা খরচ হইয়াছে ও ৫৩০৸৫ টাকা আদায় হইয়াছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	১৬৭।০	প্রচার ব্যয়	৫১১৵০
বার্ষিক চাঁদা ১০৭৲		কর্ম্মচারীর বেতন	১৬৫॥০
মাসিক ৩০।০		ডাকমাসুল	৯॥৵০
এককালীন প্রাপ্ত ১৪৲		মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	৪১৲
শুভকর্ম্মোপলক্ষে ১৬৲		পাথেয় হিঃ	৮॥০
	———	প্রচারক গৃহ হিঃ	৯৪।/৫
	১৬৭।০	দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দান	৫৬
প্রচারফণ্ড	৩৫২॥৵১০		
বার্ষিক চাঁদা ৮৮৸১০			
মাসিক ২২০।৵৪		বিবিধ হিঃ	৩৮।/২॥
এককালীনপ্রাপ্ত ৪১৲			
প্রাপ্তচাউলের মূল্য ২॥০			৯২৪।৵৭॥
		হাওলাত শোধ	২৯৲
	৩৫২॥৵১০		———
পাথেয় হিঃ	৩॥৵০		৯৫৩।৵৭॥
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ীভাড়া)	১৫০৲	স্থিত	১৫৫।৵৫
			———
		মোট	১১০৮৸১২॥
কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ড	১০০৲		
সিটীকলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত	৫৬৲		
কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ তত্ত্বকৌমুদী ও বুক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৬০		
	৮৮৯॥১০		
হাওলাত হিঃ	১৬০॥		
	———		
	১০৫০৲১০		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৫৮৸১২॥		
মোট	———		
	১১০৮৸১২॥		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

বাকী মূল্য আদায়	৩৯॥৵১৫	অপরের পুস্তকের মূল্য শোধ	৩১/৫
নগদ বিক্রয়	১৩৫৲	পুস্তক বাঁধাই	৪৬॥/০
সমাজের—৭৫/৫		কমিশন	৭।/৭॥
অপরের—৫৯৸৵১৫			
পুস্তকের ডাকমাসুল	৩৷১০	পুস্তকের ডাকমাসুল	৭৶০
কমিশন	৫॥/১০	ডাকমাসুল	।৫
সুদ	১০॥/০	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
	———	বিবিধ হিঃ	॥১০
	১৯৪।/১৫		
পূর্ব্বস্থিত	২২০০॥৶১৭॥		১১৩৸৶৭॥
মোট	———	স্থিত	২২৮১৵৫
	২৩৯৫/১২॥	মোট	———
			২৩৯৫/১২॥

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৪৪॥০	ডাকমাসুল	৫৩/১০
নগদ বিক্রয়	॥০	মুদ্রাঙ্কণ	৮১৲
	———	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৩৲
	২৪৫৲	কাগজ	৫৫৵০
পূর্ব্বস্থিত	১২৮৫৸৶১৫	কমিশন	৮।৶১০
মোট	———	বিবিধ	৭।১০
	১৫৩০৸৶১৫		———
			২৩৭৸৶১০
		স্থিত	১২৯৩ ৫
		মোট	———
			১৫৩০৸৶১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্যপ্রাপ্তি	৩২০৵	ডাকমাসুল	১২০॥
বিজ্ঞাপনাদি হিঃ প্রাপ্ত	৫৸০	কাগজ	৬৮৵১০
নগদ বিক্রয়	।৶১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬০৸০
দান প্রাপ্তি	২০০৲	মুদ্রাঙ্কণ	২৬২
		কমিশন	৯৸/০
	৫২৬।/১০	বিবিধ হিঃ	১৫।১০
হাওলাত	৩০৲		———
	———		৫৩৬॥০
	৫৫৬।/১০	হাওলাত শোধ	৩০৲
পূর্ব্বস্থিত	২১৭৸৵১৫		
মোট	———		৫৬৬॥
	৭৭৪।৫	স্থিত	২০৭৸৫
		মোট	———
			৭৭৪।৫

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

গিরিধি।

ঈশ্বর কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গিরিধী ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩এ ডিসেম্বর—সন্ধ্যাকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। "ব্রহ্মোৎসব" অতি কঠিন ব্যাপার এবং ধর্ম্মপথ অতি দুর্গম, কিন্তু দেব প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগ ও ব্যাকুলতাতে ইহাও সহজ এবং সুগম হয়। ব্রাহ্ম সাধারণে ঈশ্বর কৃপার উপর নির্ভর করুন এবং অনুরাগী ও ব্যাকুল হউন" এই উপদেশের সার মর্ম্ম। ২৪এ ডিসেম্বর—প্রাতে উপাসনা হয়। একটী হিন্দি উপদেশ পঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর সঙ্গীতাদি হয়। রাত্রিতে পুনরায় উপাসনা হয়। ঈশ্বর উপাসনা ব্যতীত শুধু ঈশ্বর মানি, ইহা স্বীকার করাতে আত্মার কল্যাণ হয় না। নিত্য উপাসনাতেই জীবন বাঁচে" উপদেশের ভাব এইরূপ ছিল। ২৫ এ ডিসেম্বর—প্রাতে উপাসনা হয় প্রাচীন কালের ঋষিরা সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, অসতো মা সদগময়'‚এখন সংসারে লিপ্ত সংসারী লোক সকল এই প্রার্থনা সর্ব্বদা অন্তরে না রাখিলে কিরূপে অসত্য হইতে রক্ষা পাইবেন? এই প্রার্থনাকে সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখা প্রত্যেক সাধকের উচিত' এই ভাবের উপদেশ হয়। অপরাহ্নে গরিব দুঃখীদিগকে চাউল, ডাল, তরকারী, পয়সা ও কাপড় বিতরণ করা হয়। তৎপর নগর সংকীর্ত্তন হয়, রাত্রিতে উপাসনান্তে উৎসবের কার্য্য শেষ হইয়াছে। দয়াময় কৃপা করিয়া উৎসবের ফল জীবনে রক্ষা করুন।

উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রামপুর হাট হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

একটী সৎ প্রস্তাব—ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদের প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট ২টী প্রস্তাব করেন। তাহার প্রথমটী এই যে আমাদের আরাধনায় 'সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম' প্রভৃতি যে স্বরূপ পাঠ করা হয়, তাহার সঙ্গে-"ধর্ম্মাবহপাপনুদং ভগেশং" ইহাও যোগকরা হউক! শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ইহাতে শুধু তাঁহার নির্ম্মলতা ও পাপরাহিত্য বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার নামে পাপ ক্ষয় হয় ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এটী বেশ বুঝা যায় না। এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটী এই যে গায়ত্রী মন্ত্র যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই গায়ত্রীতে অনুপ্রানের ভাব বেশ স্পষ্ট আছে। "তিনিই আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" সম্প্রতি রাজনারায়ণ বাবু এই কলিকাতা সহরে অবস্থিতি করিতেছেন। মাঘোৎসব পর্য্যন্তও তিনি এখানে থাকিতে পারেন। এ সময় এবিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে।

একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণ বিগত পঞ্চম জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া একেশ্বরবাদি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ২৭ এ ২৮এ ও ২৯এ ডিসেম্বর বম্বে প্রার্থনা সমাজে উক্ত মিলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত স্থান সমুহ হইতে ব্রাহ্ম প্রতিনিধিগণ উক্ত সম্মিলনিতে সমাগত হইয়া ছিলেন। মান্দ্রাজ, কইম্বাটুর, বেলারী, পুনা, আমেদনগর, পান্ধারপুর, বরোদা, আমেদাবাদ, ইন্দোর, নাশিক, লাহোর, কোয়েটা, হায়দাবাদ (সিন্ধুপ্রদেশ) ডুমরাওঁ, করাচী, ধুবড়ী, বাগেরহাট, কলিকাতা এবং শিলং। স্থানাভাবে এই সম্মিলনের অলোচ্যবিষয়ের উল্লেখ করিতে পারাগেল না।

দীক্ষা।—গত ১৮ই পৌষ বুধবার সায়ংকালে পিরোজপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ উপাসনাতে খুলনা জেলার অন্তর্গত নলহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথমোহন দাস ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। করুণাময় পরমেশ্বর নব প্রবিষ্ট বন্ধুর ধর্ম্ম-পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি করুন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এই প্রার্থনা।"

প্রচার।—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় এবং লছমন প্রসাদজী বোম্বাই নগরে গমনপূর্ব্বক যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা শিবনাথ বাবুর পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।

"বোম্বাইয়ে পৌছিয়া প্রচারের কাজ বিশেষ করা হয় নাই। কেবল মাত্র ১৮ই ডিসেম্বর এখানকার আলোচনা সভাতে এক জন শিক্ষিত যুবকের নাস্তিকতা পোষক বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী রবিবারে এখানকার সমাজ মন্দিরে লছমন প্রসাদজী হিন্দীতে উপাসনা করেন, আমি ইংরাজীতে উপদেশ দি। তৎপরবর্ত্তী বুধবার আবার আলোচনা সভায়, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্মজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহাতে বক্তৃতা করিতে হয়? অপরাপর সময় Theistic Conference এর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সেকার্য্য একপ্রকার সমাধা হইয়া গিয়াছে। ৪ঠা জানুয়ারি অপরাহ্নে এখানকার সমাজ মন্দিরে আমার এক ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় Social Reconstruction of modern India,"

শ্রাদ্ধ—বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল দে মহাশয় তাঁহার পরলোক গতা পিতামহীর শ্রাদ্ধক্রিয়া ১৫ই নভেম্বরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে হীরালাল বাবু বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে একটাকা দান করিয়াছেন।

২৯এ পৌষ কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধ পালিতের পরলোকগত মাতা ঠাকুরাণীর আদ্য

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, রাজেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৬৲ টাকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব—মাঘোৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্ববারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন হওয়ায় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী পুনরায় প্রকাশ করা গেল।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে।*

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

৬০ ব্রাহ্মাব্দ।

১লা মাঘ	(১৩ই জানুয়ারি)	সোমবার—ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।
২রা	১৪ই	মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় উৎসবের উদ্বোধন।
৩রা	১৫ই	বুধবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৪ঠা	১৬ই	বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৫ই ,,	১৭ই	শুক্রবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় "ভারতবর্ষকা ধর্ম্ম-বিষয়ক অভাব" বিষয়ে হিন্দি বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ।
৬ই ,,	১৮ই	শনিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উপাসনা।
৭ই	১৯এ	রবিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন। তৎপর উপাসনা। মধ্যাহ্নে বাহিরে প্রচার। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় উপাসনা (শ্রমজীবীদিগের জন্য উপদেশ)
৮ই	২০এ	সোমবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন তৎপর হিন্দিতে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ইংরাজিতে উপাসনা।
৯ই	২১এ	মঙ্গলবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।
১০ই	২২এ	বুধবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় উপাসক মণ্ডলীর উৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় নগর সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা।
১১ই	২৩এ	বৃহস্পতিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই	২৪এ	শুক্রবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় আলোচনা। অপরাহ্ন ৩½ ঘটিকার সময় বালক বালিকা-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ছাত্রসমাজের উৎসব।
১৩ই	২৫এ	শনিবার—প্রাতঃকালে সঙ্গত সভার উৎসব। অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় আলোচনা। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় "সংস্কারের দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৪ই	২৬এ	রবিবার উদ্যানসম্মিলন।

* উৎসবের কার্য্যাবলীর মধ্যে যে যে কার্য্যের জন্য স্থানের নির্দ্দেশ নাই সেই সকল কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সম্পন্ন হইবে।

দান প্রাপ্তি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাসিক দান।

ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু ময়মনসিংহ ১০৲, বাবু শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ২৩৲, ডাক্তার পি, কে, রায় কলিকাতা ২২৲, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ৫॥০, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ ১১৲, বাবু ভুবনমোহন দাস ঐ ২৪৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় মানিকদহ ১০৲, বাবু কেদারনাথ রায় কলিকাতা ২৲, বাবু দুর্গামোহন দাস ঐ ১০৲, বাবু হরকুমার রায়চৌধুরী ঐ ২৲ বাবু আনন্দমোহন বসু ঐ ২৬৲, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ ঐ ৭॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ঐ ।০, ডাক্তার পি, সি, রায় ঐ ২৲।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক-দান।

বাবু রজনীনাথ রায় মান্দ্রাজ ৫৲, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন কলিকাতা ॥০, বাবু উমেশচন্দ্র মাইতি ঐ ॥০, বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ ৬৲, শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র ঐ ২৲, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল ঐ ১॥০, বাবু মধুসূদন সেন ঐ ১॥০ বাবু হরকিশোর বিশ্বাস ঐ ২৲ শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দত্ত ঐ ১৲, বাবু কেশবচন্দ্র দাস ভবানীপুর ১৲, বাবু রাধামাধব বসু ভুভুয়া ৪৲, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল পাবনা ১৲, বাবু রামোত্তম ঘোষ যশোহর ২৲, বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার কলিকাতা ১॥০, বাবু শরৎকুমার সিংহ বর্ম্মা ৩৲, বাবু দীননাথ সেন ঢাকা ১৲, বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঢাকা ৩,

(ক্রমশঃ)

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩রা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ মঙ্গলবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নিবেদন ও প্রার্থনা—করুণাময় পিতা! আমরা তোমার আহ্বানে আহূত হইয়া তোমার মহোৎসবে গমন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি দীন দুঃখী সন্তানগণের প্রাণে আশা এবং ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া তাহা পরিপূরণ করিতে কোন অংশেই কৃপণতা কর নাই। তোমার অবারিত অন্নছত্রে এবার কাঙ্গাল গরিব সকলেই উদর পূর্ণ করিয়া প্রচুর আহার পাইয়াছে। আমাদিগকে তুমি অনেক দেখাইয়াছ এবং অনেক শুনাইয়াছ। সে সময়ের জন্য যেন সকল ক্ষোভ আমাদের অন্তর হইতে বিদায় লইয়াছিল। আমাদের আর আক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ তুমি রাখ নাই। প্রভু পরমেশ্বর! এখন তোমার নিকট এই ভিক্ষা আমাদের স্মৃতি-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখ, আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা যেন প্রাণে চির জাগ্রত থাকে। যেন দুঃখ দুর্দ্দিনে, শুষ্কতা ও নিরাশার অবস্থায় আমরা সে সকল স্মরণ পূর্ব্বক আশা ও উৎসাহের সহিত তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি। হে পিতা! তুমি আমাদের প্রকৃতি ত ভাল করিয়াই অবগত আছ। আমরা যে সহজেই ভগ্নোদ্যম হই। কত সহজে সংসার চক্রে পড়িয়া অবিশ্বাসের মধ্যে যাইয়া পড়ি, কত সহজে নিরাশা আসিয়া আমাদের প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। প্রভু তুমি এই দুর্ব্বল সন্তানদিগের ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রহরী হইয়া থাক, আমরা তোমার কার্য্যে নিযুক্ত হই। নবজীবন দাতা নব জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে চির নবীন করিয়া রাখ। নিরুৎসাহ, নিরাশা, ও অবিশ্বাস আমাদিগের মধ্য হইতে চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করুক। তুমি আমাদের সহায় হও আমরা নিরন্তর তোমারই অনুসরণ করিতে থাকি।

ষষ্টিতম মাঘোৎসব।

ঈশ্বরের প্রসাদে এবারকার মাঘোৎসব আমরা প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিয়াছি। এবার যেরূপ ভাবের গভীরতা ও প্রাণস্পর্শীতা অনুভব করা গিয়াছে এরূপ সচরাচর হয় না। নানা কারণে বিগত বৎসর ব্রাহ্ম সাধারণের মনে মলিন ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও পরস্পরের সহিত অমিল একটী প্রধান। একে ত দেশের লোক ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের সহিত বিরোধ ও অনাত্মীয়তা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার উপরে বিগত বর্ষে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে সেই অবজ্ঞার ভাব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মগণের মনও একপ্রকার নিরাশায় ডুবিতেছিল। অনেকের মন নিরাশ হইয়া ভাবিতেছিল যে এই ব্রাহ্মসমাজদেহ বুঝি এইরূপ টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেই চলিল; মিলন স্থান বুঝি আর পাওয়া যাইবে না; ঈশ্বরের সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক বলিয়া যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা বুঝি আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠিতেছে না; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমরা যে কিছু আয়োজন করিয়াছি তাহা বুঝি পণ্ড হইয়া যায়! অনেকের মনে এই সকল নিরাশার চিন্তা উদয় হইতেছিল। এই সকল নিরাশাজনক ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসিগণ গভীর ক্ষোভে ম্রিয়মান হইতেছিলেন; তাঁহাদের ব্যাকুল প্রার্থনা ঈশ্বরের চরণে পৌঁছিতেছিল। সুতরাং মাঘোৎসবের আহ্বানধ্বনি যখন উত্থিত হইল, তখন তাঁহারা ব্যাকুল অন্তরে দশদিক হইতে ধাবিত হইলেন; এবার আমাদের উৎসবে যত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল অন্যান্য বৎসর সেরূপ হয় না; যেখানে আমাদের দুর্ব্বলতা সেই খানেই ঈশ্বরের সবলতা; যেখানে আমাদের নিরাশা তাহার মধ্যে তাঁহার আশার ধ্বনি। মানুষ যখন অবসাদে নিমগ্ন হয় এবং পথ দেখিতে পায় না, তখনই তাঁহার করুণার লীলা আরম্ভ হয়, তিনি যাদুকরের যাদুবিদ্যার ন্যায় তাঁহার ঐশী শক্তির লীলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন; এক ফুৎকারে মানবের দুর্ব্বলতাকে সবলতাতে পরিণত করেন; মরুর মধ্যে বীজের অঙ্কুর প্রদর্শন করেন; শূন্যকে পূর্ণতা প্রাপ্ত করেন; অপ্রেমকে প্রেমে পরিণত করেন; শক্ত হৃদয়গুলিকে আর্দ্র করিয়া পরস্পরের সহিত গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ করেন। এবার আমরা ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াছি, আমরা যে প্রকার মন লইয়া উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সে প্রকার মন লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলাম না। বসন্তের সমাগমের প্রারম্ভে যেমন দুই একটী কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করে, প্রাতে এক একটু

ফুর ফুর করিয়া মলয় বায়ু বহিতে থাকে; লোকে বলিতে আরম্ভ করে ঋতু ফিরিতেছে, সেইরূপ উৎসবের প্রারম্ভ হইতেই আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম, যে যেন কি এক নূতন হাওয়া দেখা দিয়াছে; কি এক শক্তি নামিতেছে; কি এক আশার সঞ্চার হইতেছে। বহু ভক্তের ব্যাকুল হৃদয়ের প্রেম সূত্র ধরিয়া ব্রহ্মশক্তি নামিতেছেন। ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব যখন হয়, তখন যে কাজটা কর জমিয়া যায়, যে কথাটা বল লাগিয়া যায়, যে আয়োজনটা কর সফল হয়। এবার তাহাই ঘটিল। তখন যে উপাসনা হয়, যে বক্তৃতা হয়, যে সংগীত হয়, কেমন মিষ্ট লাগে, প্রাণে প্রাণে বসিয়া যায়। আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম একি! এই না সেই লোকগুলো যাহাদের শুষ্ককথা লোকের ভাল লাগে নাই, আজ উহারা এরূপ মধুর বাণী কোথায় পাইল। এই রূপে ভাব গড়িতে গড়িতে ১১ই মাঘের দিনে উপস্থিত হইলাম! এরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্য ৪০ বৎসর বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক নয়, এ দৃশ্য দেখিবার জন্য সাগর পার হইয়া আসা নিরর্থক নয়। ঐশী শক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! উদ্বোধনের সময় আচার্য্য বলিলেন "তোমরা প্রেমে প্রেমে এক করিয়া সেই প্রেম সিংহাসন তুলিয়া ধর জগৎপতি তাহার উপরে বসিবেন। বত্রিশ সিংহাসন—বত্রিশ পুত্তলিকার স্কন্ধের উপরে স্থাপিত ছিল, আজ পবিত্র স্বরূপের সিংহাসন তোমাদের শত শত নরনারীর স্কন্ধের উপরে স্থাপিত হউক।" যেই এই কথা বলা হইল, অমনি দেখা গেল সিংহাসন সকলে যেন তুলিয়া ধরিয়াছেন, অপ্রেম গিয়াছে, ক্ষমা আসিয়াছে। অনাত্মীয়তা ঘুচিয়াছে, অনুতাপ জন্মিয়াছে। অমনি ব্রহ্ম-কৃপার তুফান লাগিয়া প্রেম সাগরে তরঙ্গ উঠিল। বোধ হইল যেন জগৎপতির তরিখানি ভক্তজনের প্রেম সাগরের তরঙ্গের উপর নাচিতেছে। এই ভাবে এবার আমাদের উৎসবের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। ফলের দ্বারা উৎসবের ভাব সকলে গ্রহণ করিতে পারিবেন; প্রথম এবার নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ সমাগত হইয়াছিলেন।

বাগআঁচড়া, খাসিয়াপাহাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মাগুরা, বড়বেলুন, নলহাটী, ধুলিয়ান, বগুড়া, মানিকদহ, নালী, বজ্রযোগিনী, বরাহনগর, খালোড়, বানিবন, উলুবেড়িয়া, বাগেরহাট, ধুবড়ী, কুমারখালি, হিজলাবট, দেবিগঞ্জ, চন্দ্রভি, রঙ্গপুর, কোন্নগর, নেলফামারি, বর্দ্ধমান, জোগ্রাম, বাঁশবেড়ীয়া, জগন্নাথপুর, নওগাঁ, (রাজসাহী) বসিরহাট, জালাল-পুর, (টাকী) দোগাছিয়া, মধ্যপাড়া, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মুর্শিদা-বাদ, মাতাবঘর, জঙ্গীপাড়াকৃষ্ণনগর, মাধবপুর, বাদুড়িয়া, সেনহাটী, নড়াল, শান্তিপুর, বহরমপুর, কালনা, রামপুরহাট, কুমারভোগ, বিজগ্রাম, পার্ব্বতীপুর, খলিলপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সমসপুর, হরা, বাগনান, বাঁকুড়া, সাতক্ষীরা, মজীলপুর, হাওড়া, রসপুর, বরিশাল, শিবপুর, জলপাইগুড়ী, গয়া, মুঙ্গের, আরা, লাহোর, ইন্দোর, ডেরাধুন, চান্দৌলি, কোয়েটা, এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

২য়—যে সকল স্থলে বহুদিন হইতে বন্ধুতে বন্ধুতে, সহোদরে সহোদরে বিবাদ ছিল, মাঘোৎসবের সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই সেখানে পুনর্মিলনের আয়োজন হইয়াছে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাতে ৬২ জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; ৭ জন যুবক জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া, ঈশ্বরের হস্তে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, সকল বিভাগের কর্ম্মচারিগণ উৎসাহের সহিত আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; মিলন, সন্ধি ও আত্মীয়তার ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজের মনে প্রবল হইয়াছে। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট! জয় প্রভু! করুণাময় ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। উৎসবের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

উৎসবে সমাগত ব্যাকুল আত্মাগণের প্রাণে যেরূপ ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছে, যেরূপ আগ্রহ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত তাঁহারা উৎসবের উপাসনাদিতে যোগপ্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সকলের সম্মিলনে যেরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ চিত্র পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার কোনই উপায় নাই। সংক্ষেপে উৎসবের কথঞ্চিৎ ভাব মাত্র পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা যাইতেছে। যে প্রণালীতে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এজন্য এখন আর তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে অতি প্রত্যুষে কয়েক জনে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা উৎসবের পূর্ব্বাভাসের চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল এবং মানসিক জড়তা দূর হইয়া সজীবতা আসিবার উপায় হইতেছিল।

১লা মাঘ হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দিন ব্রাহ্ম-গণের গৃহে গৃহে অতি প্রত্যুষ হইতেই উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। সকলেই আমাদের অশেষ কল্যাণের হেতু স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল কামনা অন্তরে লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন। এই দিন গৃহে গৃহে বিশেষ পারিবারিক উৎসব হইয়াছিল। যাঁহার যখন সুবিধা তিনি তখন এই পারিবারিক উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দিনের দৃশ্য অতি মনোহর, গৃহ সকল যেন আনন্দময় হইয়াছিল।

উৎসবের উদ্বোধন।

২রা মাঘ সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় এই দিনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই দিন এই নূতন গানটী গাওয়া হইয়াছিল।

কীর্ত্তনের সুর।

আমরা এসেছি, এসেছি গো আজ দাঁড়ায়ে আছি তোমার দ্বারে।
শীঘ্র খোল গো, উৎসব দ্বার, আজ বাহিরে রাখিও না আর,
(আশা করে এসেছি গো) দেখা পাব বলে,
আমরা দাঁড়ায়ে আছি মলিন মুখে, তোমার ভিতরে লহগো ডেকে,
কত দুঃখী তাপী কাঙ্গাল জনে, (জগতের ত্যাজ্য মোরা গো)
এসেছি তোমার মহিমা শুনে। (শুনেছি তুমি নাকি পাপী সব
উদ্ধারিবে গো)

(আশা করে এসেছি গো) (উদ্ধার পাব বলে)
(এই উৎসব দিনে)
আজ আর ফিরাও না শূন্য প্রাণে, আশা পূরাও গো
অমৃত দানে।
(আশা করে এসেছি গো)।

উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালীন আচার্য্যের উত্তেজক ভাষা ও প্রাণের উচ্ছ্বাসে বাস্তবিকই সকলের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রেমের স্বভাব এই যে ইহা পারিতোষিক চায় না। আমার প্রেমাস্পদ সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ আমাকে কিছু দিবেন এরূপ চিন্তা প্রেমিকের মনে উদয় হয় না। যেখানে অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, সেখানে লোকে পরস্পরকে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপহারাদি দিয়া থাকে। ইহা সত্য, কিন্তু প্রেমিকের সে উপহারের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ যে উপহার প্রদত্ত হয় তাহার মূল্য ও পরিমাণের প্রতি প্রেমিকের দৃষ্টি থাকে না। এক টাকার জিনিষ দিল কি দশ টাকার জিনিষ দিল প্রেমিক তাহা গণনা করে না। প্রেমাস্পদ যদি দুই আনা মূল্যের একখানি গ্রন্থ কিংবা দুই পয়সা মূল্যের দুইটী ফুল প্রেরণ করেন, তাহাই প্রেমিকের চক্ষে অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। বরং লোকসমাজে প্রতিদিন এইরূপ দেখা যায় যে যেখানে অকৃত্রিম অনুরাগের অল্পতা সেইখানেই লৌকিকতার প্রতি দৃষ্টি। অমুক পরিবার পদস্থ তাহাদের বাড়ীতে ৫৲ টাকা মূল্যের জিনিষ প্রেরণ করা ভাল দেখায় না। অমুক ৩৲ টাকার জিনিষ দিয়াছে তাহাকে অন্ততঃ ৪।৫ টাকার জিনিষ দিতে হইবে, নতুবা শোভা পায় না, ইত্যাদি গণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন ভক্ত সাধক বলিয়াছেন উপাসনা কালে আমরা যে ভাবের মধুরতা ও উচ্ছ্বাস অনুভব করি, তাহা ঈশ্বরের বিশেষ দান, ভক্তের প্রতি তাঁহার প্রীতির উপহার স্বরূপ। তিনি কখন ভক্তকে এই আনন্দ বিধান করেন, কখন করেন না, কেন এক স্থলে বিধান করেন এবং তদনুরূপ অপর স্থলে বিধান করেন না, তাহার গূঢ় মর্ম্ম কেহ নিরাকরণ করিতে পারে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে যে এই ভাবের মধুরতা ও উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। গড়ের উপরে বলা যায় যেখানে ভক্ত জনের সমাগম হয়, যেখানে ব্যাকুল আত্মা সকল একত্র মিলিত হন, মিলিত হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ও গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত হন, সেখানে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বাস করেন এবং তাঁহাদিগকে সেই বিমলানন্দ বিধান করেন। কিন্তু ইহা কি কেহ বলিতে পারেন, যে এই মাঘোৎসবে সমাগত ভক্ত দল, যদি ভাবের মধুরতা লাভের আশায় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অর্দ্ধ সমস্ত রাত্রি এখানে বসিয়া জাগরণ করেন এবং ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে যাপন করেন, ঈশ্বরের এই বিশেষ কৃপা তাঁহারা লাভ করিবেনই করিবেন। তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই জন্যই সাধকেরা বলিয়া থাকেন, ঐশী শক্তির গতি বায়ুর গতির ন্যায় কখন প্রবাহিত হয়, কেন প্রবাহিত হয়, তাহা কেহই নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন না।

কিন্তু একটা সত্য ভক্ত মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন, গুণানুকীর্ত্তন করি, তাহা ভাবের মধুরতা লাভের লোভে নহে, ভাবকে তিনি মিষ্ট করেন করিবেন, না করেন না করিবেন, তাঁহার অর্চ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে উপহারের লোভে আত্মীয়তা দেখায় সে যেমন স্বার্থপর ও নীচ প্রকৃতি সম্পন্ন, সেইরূপ যাঁহারা ভাবের মধুরতা ও উচ্ছ্বাসের লোভে উৎসব করিতে আসেন তাঁহারাও স্বার্থপর ভাবে কার্য্য করেন।

অতএব এই উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় আমাদিগকে এই সত্যটী স্মরণ করিতে হইবে যে আমরা উপহারের প্রতি এবং উপহারের পরিমাণ ও মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিব না। আমরা যাঁহার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি তাহারই প্রেম মুখের দিকে চাহিব, তিনি দু আনা দিলেন কি দশ আনা দিলেন তাহার গণনা করিব না। নিমন্ত্রিত হইয়া দশজনে আসিয়াছিলাম, একজন দু আনা পাইল, আর একজন দশ আনা পাইল, একজন ভাবের সমুদ্রে ডুবিল আর এক জন শুষ্ক থাকিল, এ সকল দেখিব না, কিন্তু প্রাণ মন খুলিয়া ঈশ্বরের কৃপা ভরসা করিয়া তাঁহার স্তুতি অর্চ্চনাদিতে নিমগ্ন হইব।

এই ত প্রথম ভাব; দ্বিতীয় বিশ্বাস। আমরা ঈশ্বরের চরণে প্রতিনিয়ত কত বিশ্বাস ও প্রেমের কথা বলি বটে, কিন্তু গূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী নহি। আমরা যে তাঁহাকে বিধাতা বলি বাস্তবিক কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে তিনি বিধাতা? অতি গভীর স্থানে আমাদের অবিশ্বাস রহিয়াছে। যখনই বৃক্ষলতা ও পশু পক্ষীর প্রতি চিন্তাশীল চিত্তে দৃষ্টিপাত করি তখনই যীশুর কথা মনে পড়ে। তিনি আকাশের পক্ষিদিগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—হে অবিশ্বাসী মানবগণ তোমাদের আত্মার মূল্য কি একটী পক্ষীর মূল্য অপেক্ষা অধিক নয়। তোমাদের পিতা যদি একটী পক্ষীকে এত যত্নে রক্ষা করেন, তখন কি তিনি একটী অমর আত্মাকে রক্ষা করিবেন না। ইহা ত ঠিক কথা। আমরা যাহা বলি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানবাত্মাকে তিনি নিজ সহবাসের জন্য অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা যদি হয় তবে ইহা কি সম্ভব যে যিনি অজ্ঞ পশু পক্ষীকে তাঁহার জগতে পরম আনন্দে রাখিতেছেন, তিনি কি এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মানবকে দেখিতেছেন না। আজ আমরা উৎসবের দ্বারে এই অবিশ্বাস হৃদয় হইতে দূর করি। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই যে, যিনি সুসময়ে বৃক্ষগণকে হরিদ্বর্ণ পত্রে ভূষিত করেন, যিনি শুকদিগকে হরিদ্বর্ণ পক্ষে মণ্ডিত করিয়াছেন, হংসদিগকে সুকোমল সুশ্বেত আবরণে আবৃত করিয়াছেন, যিনি ঋতুর পর ঋতুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরণীকে ধন ধান্য শালিনী করিতেছেন। ও ইহার সমুদায় প্রাণীকে আনন্দিত করিতেছেন, তিনি আমাদের আত্মার জন্য ও নব বসন্ত রাখিয়াছেন, আমাদিগকেও সুসময়ে নবজীবন বিধান করিবেন।

তৃতীয় বিনয়, দেশে যখন বন্যা আসে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সকল গাছ কঠিন, ও মস্তক উন্নত করিয়া থাকে

তাহারা সেই জলের স্রোতে পড়িয়া হয় ভাঙ্গিয়া যায়, না হয় সমূলে উৎপাটিত হয়, কিন্তু ধানের ক্ষেত্র বা বেতস্ লতার অবস্থা অন্য প্রকার হয়। তাহারা মস্তক নত করিয়া সেই স্রোতকে ধারণ করে এবং বন্যান্তে নব বল ও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ শোভা ধারণ করে। উৎসবের স্রোতও সেই প্রকার, এতদ্দ্বারা অহঙ্কৃত-প্রকৃতি ভগ্ন হইয়া যাইবে এবং বিনয়ীর বল বৃদ্ধি হইবে।

অতএব আমরা এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়া চল উৎসবের দ্বারে উপস্থিত হই। ফলাফল বিধাতা স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে।

৩রা মাঘ।

পূর্ব্বাহ্ন ৬ ছয় ঘটিকা হইতে মন্দিরে সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইতেছিল। ক্রমে উপাসকগণ উপাসনার্থ সমাগত হইতে লাগিলেন। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এই দিনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপ —"প্রাচীন ব্রহ্ম সাধকগণ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মকে যে জানিয়াছি এমনও নহে, তাঁহাকে যে জানি নাই এমনও নহে" আমরাও বলি তাঁহাকে যে দেখিয়াছি এমনও নহে তাঁহাকে যে একবারে দেখি নাই এমনও নহে। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে কেহ জানিতেও পারে না, দেখিতেও পারে না। তবে আমরা সকলেই তাঁহাকে জানিতে এবং দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

হে ব্রহ্মসাধক, তুমি কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে এখানে আসিয়াছ কেন? সকলে বল অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়াছি। ইহা অহঙ্কারের প্রকাশক নয়, কিন্তু সত্যের প্রকাশক। সত্য সত্যই তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ। অনেকে জ্ঞানে তাঁহাকে জানিয়াছ, কিন্তু একমাত্র ইহা দ্বারাই তাঁহাকে ঠিক জানা হইল না। তাঁহাকে ভাল করিয়া সম্ভোগ না করিলে, তাঁহার সহিত ভালরূপ পরিচয় না হইলে বাস্তবিক তাঁহাকে দেখা হইল না। আমাদের সে অবস্থা এখনও হয় নাই কিন্তু তাঁহাকে আমরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি ইহাই সত্য।

হে ব্রাহ্ম, তুমি কি আপনার পরিবার মধ্যে তাঁহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? এই প্রস্ফুটিত কুসুমে কি তাঁহার মাধুরি দেখ নাই? দেখিয়াছ বইকি? সত্য সত্যই দেখিয়াছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার পরিবার মধ্যে পিতা মাতাকে, ভাই বন্ধুকে যেমন ভাবে দেখিয়াছ কি দেখিয়া থাক, সেইরূপ কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তাঁহাদের সঙ্গে যেমন পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যেমন ভালবাসিয়া থাক, তাঁহাদের সঙ্গে আহার বিহার করিয়া থাক, সেইরূপ কি তাঁহার সঙ্গে মিশামিশি করিয়াছ, পরিবারদিগকে যেমন দেখিয়াছ সেইরূপ কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছ? এই রাজপথে রাজপুত্রকে যেমন ক্ষণ কালের জন্য দেখিয়াছ, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়, ভালবাসা কিছুই হয় নাই, সেইরূপ কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় ভালবাসা কিছুই হয় নাই। হে সাধক এরূপ দেখায় চলিবে না। তাঁহার সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ পরিচয় হওয়া চাই, - ভালবাসা হওয়া চাই। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে এই সময় তাঁহাকে ঘেরিয়া বস, তিনি যদি এখনও পরের মত থাকেন, তবে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও, মনের কথা সব এই সময় খুলিয়া বল, যেমন পৃথিবীর বন্ধুকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া থাক, সেইরূপ প্রাণের সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বল। পৃথিবীর বন্ধু হয়ত তোমার প্রাণের পাপের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি তোমার পাপের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন না। কিছু গোপন করিওনা, তিনি পাপীর বন্ধু। পৃথিবীর বন্ধু হয়ত তোমার গোপন কথা প্রকাশ করিয়া তোমাকে লজ্জিত করিতে পারেন, পৃথিবীর বন্ধু হয়ত বিশ্বাসঘাতক হন, তিনি তোমার কথা কখনই প্রকাশ করিয়া তোমাকে লজ্জিত করিবেন না, অতএব এই মহোৎসবের সময় তাঁহার সঙ্গে সকলে পরিচয় করিয়া লউন। যুবকগণ এই সময় তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লও। যিনি বৃদ্ধ, যিনি দুদিন পরে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তিনিও এই সুযোগে তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া লউন, যেন পৃথিবী হইতে যাইবার সময় কোন অপরিচিত স্থানে বা অপরিচিত কাহারও নিকটে যাইতেছেন এমন মনে না হয়, যেন আনন্দ করিতে করিতে ভবধাম হইতে চলিয়া যাইতে পারেন। এখানেই—এই পৃথিবীতেই সকলে তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিয়া লউন, তাহা হইলে যাঁহারা এখানে থাকিবেন, তাঁহারাও সুখে সময় কাটাইতে পারিবেন, যাঁহারা চলিয়া যাইবেন তাঁহারাও আনন্দের সহিতই চলিয়া যাইতে পারিবেন। হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া দেখা দিয়াছ, এখন ভাল করিয়া আমাদের সঙ্গে পরিচিত হও, এই প্রার্থনা।

এই দিন সায়ংকালে "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মন্দিরে লোক-সমাগম হইতেছিল। যথা সময়ে সংগীত ও প্রার্থনার পর নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াথাকিলেও বক্তা তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাটী নূতন আকারে শ্রোতাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এখন প্রকাশের সুবিধা হইল না। সময়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

৪ঠা মাঘ।

রাত্রি শেস হইতে না হইতেই উপাসনালয়ে উপাসকগণ সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় অদ্যকার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশের সার নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"এই উৎসবের সময় প্রেমের কথাই বলিতে ইচ্ছা করে, এবং প্রেমের কথা বলিতে গেলেই ভক্তকুল চূড়ামণী মহাত্মা চৈতন্যের কথা বলিতে ইচ্ছা করে। মহাত্মা চৈতন্য যখন প্রেমে উন্মত্ত

হইয়া রাত্রিদিন কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন নগরের লোকে তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তনে লোকের রাত্রে নিদ্রা হয় না; লোকে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল এ লোক কোথা হইতে আসিল; ইত্যাদি। এইরূপ শুনা যায় যে গৌর তাঁহার শিষ্য বৃন্দের সহিত এক চণ্ডালের বাটীর নিকট প্রায় সমস্ত দিন কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনের ধ্বনীতে চণ্ডালের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিল। সে ভাবিল যে এই ব্রাহ্মণকে (চৈতন্যকে) খুন না করিলে আর নিস্তার নাই। চণ্ডাল এই স্থির করিয়া এক দিন অতি প্রত্যূষে এক খানা ছোরা কাপড়ের ভিতর করিয়া চৈতন্যের কীর্ত্তনের দলের নিকট গমন করিল। তখন গৌর তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগের সহিত প্রেমে বিহ্বল হইয়া চারিদিক কাঁপাইয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। চৈতন্য মধ্যস্থলে আর তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার চারিদিক ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছেন। "গৌর কাঁদেন আর বলেন হরি, স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভেদ করি" গৌর একবার ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, আবার উঠিতেছেন, আর হরি হরি বলিয়া অশ্রুজলে বুক ভিজাইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। চণ্ডাল কিছুক্ষণ সেই মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেল! চৈতন্য এবং তাঁহার শিষ্য বৃন্দের কীর্ত্তন ও মত্ততা দর্শন করিয়া তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে দৌড়িয়া গিয়া অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চৈতন্যের চরণে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল" "আমি আপনাকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" চৈতন্য প্রেমে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লোকে বলিতে লাগিল একজন ব্রাহ্মণের ছেলে একজন চণ্ডালের ছেলেকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। "চৈতন্য আচণ্ডালে দিয়ে কোল, কোল দিয়ে বলেন হরি বোল"।

আমরা যখন এই বিষয় চিন্তা করি, তখন দেখি ইহার মূলে আর কিছুই নাই কেবল প্রেম। প্রেম না হইলে কি একজন ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতে পারে? যে মাতাল হয় তাহার কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না; তখন সে চণ্ডাল মুসলমান সকলকেই আলিঙ্গন করে। চৈতন্য প্রেমে মাতাল হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর যখন কৃপা করিয়া মানুষকে মাতাইয়া তোলেন তখন তাহার এই দশা হয়।

খৃষ্ট বলিয়াছেন "Seek ye first the kingdom of God and then all other things shall be added unto you." অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকলই তুমি প্রাপ্ত হইবে। মাতিতে হইলে অগ্রে পরমেশ্বরে মন সমর্পণ করিতে হইবে। অগ্রে পরমেশ্বরকে লাভ করা চাই, তাহা হইলে প্রেম ও উন্মত্ততা আপনা আপনি আসিবে। মত্ততা চাই, মাতাল না হইলে কোন কাজ হয় না। মাতাল না হইলে লোককে কোলে লওয়া যায় না। যখন ভাল উপাসনা হয়, তখন ভেদাভেদ চলিয়া যায়, ভাল উপাসনার পর দেখি, যাহাদের উপর বিরক্ত ছিলাম, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তখন আর কাহারও উপর কোন মন্দভাব থাকে না। আমরা সেই প্রেম চাই। অনেকে জাতিভেদ তিরোহিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু যদি ভগবৎ প্রেম প্রাণে একবার লাগে, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে জাতির শৃঙ্খল একবারে ছিন্ন হইয়া যায়। সেই প্রেম পাইলে সমস্ত ভেদাভেদ একবারে কোথায় চলিয়া যায়, যে পর্য্যন্ত আমরা সেই প্রেমে মত্ত হইতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত জগতের নর নারীকে প্রকৃত রূপে ভাই ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না। জাতিভেদ দূর করিতে পারিব না। কিন্তু এই প্রেম লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রতি প্রেম স্থাপন করিতে হইবে। "স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, তোমার সব অভাব দূর হইবে' ইহা খৃষ্টের কথা, চৈতন্যের কথা। আমরা অগ্রে মাতিয়া তবে জগতকে মাতাইব। আমরা অনেক সময় শুষ্ক প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকি, শুষ্ক আলিঙ্গন করিয়া থাকি, প্রেমে মত্ত হওয়া চাই। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ সকলকে সমভাবে প্রেমালিঙ্গন দাও, সকলের হাত ধরাধরি করিয়া একাসনে দণ্ডায়মান হও, মত্ততার পাত্র হস্তে লও। সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, অমিল চলিয়া যাইবে। "ঈশ্বর করুন আমরা সেই প্রেম লাভ করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে। প্রেমের জয় হইবে।"

অদ্য সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রথমতঃ সংগীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। তৎপর প্রার্থনা হইলে বিদ্যালয়ের সম্পাদক গতবর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সভাপতিরূপে গতবর্ষের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এবং ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। তৎপর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" এই বিষয়ে একটী সুন্দর ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ বক্তৃতা দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা এবং এই বক্তৃতা স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় উৎসবের কার্য্য শেষ করেন। আমরা এই বক্তৃতা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এখন এরূপ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রকাশ করা সুবিধা জনক নহে।

৫ই মাঘ।

রজনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উপাসকগণ মন্দিরে সমবেত হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দিনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে তিনি নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করেন।

"নগরে এত আনন্দ কোলাহল হইয়া গেল কিসের জন্য? কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন নগরবাসিগণ নানা প্রকার রাজভক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার কারণ কি? ঐ যে স্থানে স্থানে সভা সমিতি হইতেছে, ঐ যে চারিদিক্ হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে উহা কিসের জন্য? আপনারা সকলেই জানেন উহা কিসের জন্য— ইংলণ্ড ও ভারতের অধীশ্বরী যিনি, যিনি স্বীয় অসাধারণ সদ্গুণ পরম্পরায় ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহার উদার শাসনাধীনে বাস করিয়া আমরা পাশ্চাত্য

জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক উপভোগ করিতেছি এবং দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার পথে চলিয়াছি, সেই অশেষ গুণবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র, ভাবী যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টর কলিকাতায় আসিতেছেন। তাই নগরবাসিগণ সমবেত হইয়া কিরূপে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, আগ্রহের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন, এবং কেহ বা আমোদ আহ্লাদদ্বারা, কেহবা যুবরাজের আগমন সূচক স্থায়ী স্মৃতি চিহ্নস্থাপনদ্বারা, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে মনে করিয়া তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার দেখুন নগরবাসী সকল কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে সহরের দক্ষিণ অংশে ও গঙ্গাতীরের দিকে চলিয়াছে। সংবাদ কি? না আজি যুবরাজ এখানে পদার্পণ করিবেন! তাই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তিনি যে স্থানে তীরে অবতরণ করিবেন, সেই স্থানে সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ প্রজাগণ নদীতীর হইতে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে পথদিয়া যুবরাজ যাইবেন সেই পথের দুইধারে রৌদ্রতাপ, জনতা, পুলিসের উৎপীড়ন প্রভৃতি সকল অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়া, মুহূর্ত্তকাল মাত্র তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ইহার মধ্যে যে অধিকাংশ লোকই, ঠিক্ রাজভক্তিদ্বারা না হউক, রাজবংশধরের দর্শন লালসাদ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা গঙ্গাতীরে সম্ভ্রান্তদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য মহারাণীর পৌত্রকে সম্মান প্রদর্শন করা। ইহাদের মধ্যে এমন কতলোক আছেন যাঁহারা হয়ত যুবরাজের সহিত একটী কথা কহিতে পাইলে আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিবেন; যাঁহারা যুবরাজের করস্পর্শ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবেন;যাঁহারা যুবরাজের সদ্ভাব পরিজ্ঞাপক একটী সামান্য বস্তু উপহার পাইলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ করিবেন এবং বিশেষ গৌরবের চিহ্নস্বরূপ পুত্র পৌত্রাদির ও আত্মীয় স্বজনের দর্শনের জন্য মহাযত্নে বংশ পরম্পরাক্রমে তাহা রক্ষা করিবেন। রাজভক্ত ভারতবাসী রাজবংশধরের আগমনে আজি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কতপ্রকারে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়া চারিদিকে আনন্দোৎসব করিতেছে। কৃতজ্ঞতা, প্রেম ও ভক্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ মানুষের জন্য কি করিতে পারে এই ঘটনা হইতে তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এই গেল এক দৃশ্য। আবার এই দৃশ্য ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া সেদিন ভারতের পশ্চিম উপকূলের প্রধান নগরে যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছে কল্পনা চক্ষে তাহা দর্শন করুন। ঐ দেখুন কত দূরদেশ হইতে ভারতের সুসন্তানগণ উৎসাহ, আনন্দ, ও ভ্রাতৃভাবে পূর্ণ হইয়া মাতৃপূজার জন্য সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা কত শারীরিক কষ্ট ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই মহাব্যাপারে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। স্বদেশ প্রেমে ও ভবিষ্যতের আশায় তাঁহাদের হৃদয় আজি উচ্ছ্বসিত। জাতি, ধর্ম্ম ও মর্য্যাদাগত বিভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া আজি তাঁহারা ভারতমাতার সন্তান বলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সুদূর ইংলণ্ড হইতে আগত বিদেশীয়দিগকে ভারতের উপকারী বন্ধু বলিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও প্রেম উপহার দিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহারা মাতৃভূমির অভাবের কথা সহৃদয় ইংলণ্ডবাসীদিগকে জানাইবার জন্য সেই সভাস্থলেই যাহার যাহা সঙ্গে আছে তাহা প্রদান করিয়া,অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন! যে সন্ন্যাসী, যাহার এ সংসারে কিছুই সম্বল নাই সেও দেখুন মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে গাত্রাবরণ একমাত্র কম্বলখণ্ড অকাতরে প্রদান করিল। আবার কয়েকদিন পরে দেখুন বিদেশীয় ভারতবন্ধুগণের স্বদেশগমনের দিন ভারতবাসী তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া,তাঁহাদের শকট ছাইয়া ফেলিল। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ কি? স্বদেশপ্রেম। স্বদেশবাৎসল্যের অনুরোধে মানুষ কি করিতে পারে এই ঘটনা হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আমাদেরও আনন্দোৎসবের সময় আগত প্রায়। আমাদের গৃহে আমাদের প্রভু আসিতেছেন,রাজরাজেশ্বর আসিতেছেন। সমস্ত জগতের অধীশ্বর যিনি, রাজার রাজা প্রভুর প্রভু যিনি, সেই পরমদেবতা আমাদের গৃহে আসিতেছেন। "প্রভু আসিতেছেন বলিলাম কেন? তিনি ত অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়েই রহিয়াছেন, তবে আবার আসিতেছেন কি? ইহার অর্থ এই যে তিনি উৎসবের মধ্যে বিশেষ ভাবে আমাদের প্রাণে প্রকাশিত হইবেন। তাই বলিলাম, প্রভু আসিতেছেন। আমাদেরও মাতৃপূজার সময় আসিতেছে। সমস্তজগতের জননী যিনি, যাঁহার কৃপায় আমরা জনক জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিলাম, সেই পরম মাতার মহাপূজার সময় নিকটবর্ত্তী। দেশ বিদেশ হইতে তাঁহার ভক্ত সন্তানগণ এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। আমরা তাহার উপযুক্ত আয়োজন কি করিয়াছি? সেই রাজরাজেশ্বর স্বর্গের দেবতা হইয়াও আমাদের ভগ্ন হৃদয়কুটীরে আসিবেন, আমাদের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে দর্শন দিবেন, আমাদিগকে প্রেমের সহিত সম্ভাষণ করিবেন, আমাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করিবেন। ঐ যে নগরবাসী মুহূর্ত্তকাল রাজদর্শন লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে পথ চাহিয়া আছে, আমরা কি সেই রাজরাজেশ্বরকে দেখিবার জন্য অন্ততঃ সেই পরিমাণেও ব্যাকুল হইয়াছি? আসুন উৎসবের প্রাক্কালে একবার নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখি, প্রভুর দর্শন লাভের জন্য, আমাদের হৃদয় বাস্তবিক ব্যাকুল হইয়াছে কি না। মুহূর্ত্তকাল মাত্র পার্থিব রাজদর্শন লাভের জন্য যদি মানুষ এত ব্যাকুল হইতে পারে,তবে যাঁহার চরণে পৃথিবীর মহাবল পরাক্রান্ত নরপতিরও মস্তক সর্ব্বদা অবনত, সেই রাজাধিরাজ প্রাণেশ্বরের দর্শন লাভের জন্য আমাদের কত অধিক ব্যাকুল হওয়া উচিত! কিন্তু আমাদের সেরূপ ব্যাকুলতা আছে কি? মাতৃভূমির জন্য মানুষের প্রাণে যে ভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাস আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহার ইচ্ছায় জন্মলাভ

করিয়া ও যাঁহার কৃপায় প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া আমরা সেই মাতৃভূমি সন্দর্শন করিলাম, স্বদেশ প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিলাম, তাঁহার পূজার জন্য প্রাণে তাহা অপেক্ষা আরও কত অধিক পরিমাণে অনুরাগ ভক্তি থাকা আবশ্যক! কিন্তু আমাদের সে অনুরাগ আছে কি? আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি আমাদের মাতৃভূমির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিদেশীয় বন্ধুগণের প্রতি আমরা যে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার ভাব প্রাণে অনুভব করি, আমাদের দেহ মন প্রাণ ও অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য আমরা যাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ, আমাদের সমস্ত জীবন যাঁহার অনন্ত প্রেম সাগরের কণিকা, সেই প্রেমাস্পদ পরম সুহৃদের প্রতি তাহা অপেক্ষা আরও কত অধিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে! কিন্তু আমাদের তাহা আছে কি? কৈ? নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া ত তেমন ব্যাকুলতা, তেমন অনুরাগ ভক্তি, তেমন কৃতজ্ঞ ভাব দেখিতে পাই না। তবে কি লইয়া আমরা উৎসব করিব? হৃদয়ে ভাব না থাকিলেও বাহিরের আড়ম্বর দেখাইয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই অন্তর্যামী হৃদয়দর্শী পরমেশ্বরকে ত আমরা বাহ্যিক আয়োজনের ঘটা, সঙ্গীত বা বক্তৃতার ছটা দ্বারা ভুলাইতে পারিব না। তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহাকে লইয়া প্রকৃত ভাবে উৎসব করিতে হইলে, ভিতরের ভাব চাই, গভীর ব্যাকুলতা, প্রেম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা চাই। প্রিয় ১১ই মাঘ আসিতে যে কয়েক দিবস বাকি আছে, আমাদিগকে সেই কয়েক দিবস ধরিয়া আত্মচিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা এই ব্যাকুলতা, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার ভাব প্রাণে আনিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই উৎসবের প্রকৃত আধ্যাত্মিক আয়োজন। আমরা যেন বাহিরের গোলমালে ব্যস্ত হইয়া এবিষয়ে অমনোযোগী না হই।

উপরে যে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে উৎসব সম্বন্ধে আমরা আরও দুইটী শিক্ষা লাভ করিতে পারি। এই যে মহারাণীর পৌত্রের প্রতি ভারতবাসী সম্মান দেখাইল, ইহা দ্বারা কেবল তাঁহারই প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা হইল তাহা নহে। এতদ্দ্বারা মহারাণীর প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করা হইল। যুবরাজ যে সম্মানের অধিকারী তাহা তাঁহাকে না দিলে প্রকৃত রাজভক্তির পরিচয় দেওয়া হইত না। তাঁহার পদের অবমাননা করিলে প্রকারান্তরে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অবমাননা করা হইত। এই যে সেদিন মাতৃপূজার জন্য সমবেত ভ্রাতৃগণ পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তদ্দ্বারা কেবল ভ্রাতৃপ্রেমের নহে, কিন্তু মাতৃভক্তিরও পরিচয় দেওয়া হইল। যে ব্যক্তি মত, আচার ব্যবহার ইত্যাদিগত ভেদ বিস্মৃত হইয়া ভাইকে কেবল ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে না পারে, তাহার মাতৃভক্তির কোনও মূল্য নাই। তাহার মাতৃপূজায় যোগ দিবার অধিকার নাই। আমাদের পক্ষেও একথা বর্ণে বর্ণে খাটে। আমরা যদি পরমেশ্বরের পুত্র কন্যাদিগকে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করিতে না পারি, তবে কখনই আমরা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ভাই ভগ্নীর সহস্র দোষ সত্ত্বেও, তাঁহাদের সহিত প্রভেদের সহস্র কারণ সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ভাই ভগ্নী বলিয়া, আলিঙ্গন করিতে হইবে। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, সেই জগৎজননীর পুত্র কন্যা বলিয়া সরল অনুরাগের সহিত যাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা মিশিতে হয় না, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার উদয় হওয়া তত কঠিন নহে। কিন্তু সর্ব্বদা যাঁহাদের সংস্রবে আসিতে হয়, যাঁহাদের সহিত সতত আমিত্বের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, যাঁহাদের জন্য আমাদের সুখ স্বার্থ অহঙ্কারে আঘাত পড়ে, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের সদ্ভাব রক্ষা করা, তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া ভাই ভগ্নী বলিয়া আলিঙ্গন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতেই হইবে, নতুবা উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি ভাই ভগ্নীর সম্বন্ধে অসদ্ভাব পোষণ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত করিয়া, পরমেশ্বরের প্রেম সম্ভোগ করিবার আশা করেন তাঁহার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? সকল হৃদয় প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া এক না হইলে, সকলে এক প্রাণে জগৎ জননীর পূজায় প্রবৃত্ত না হইলে আমরা কখনই বিধানের মহিমা বুঝিতে, পরমেশ্বরের প্রেম ও শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যেখানে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগ্নীতে ভগ্নীতে, প্রাণের মিলন নাই, সেই পরম মাতার প্রেমের মহিমা সেখানে প্রকাশিত হয় না।

আর একটী কথা—যুবরাজের সম্মানের জন্য কেহ বা ক্ষণিক আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিলেন, কেহ বা স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আগামী উৎসবে আমাদের ব্যবহার সম্বন্ধেও উহার অনুরূপ দুইটী বিষয় বিবেচ্য। আমরা কি ক্ষণিক প্রেমোচ্ছ্বাসের আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য উৎসবে যোগ দিব, না হৃদয়ে সেই প্রেমাস্পদের শুভাগমন-সূচক কোনও স্থায়ী নিদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট হইব? কেবল সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসজনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্য উৎসবে যোগ দেওয়া যে নিতান্ত চিন্তাহীনের কর্ম্ম তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? উৎসবে প্রেমময় আমাদিগকে কত প্রেমোপহার দিবেন, আমাদের প্রাণে কত উচ্চ ভাব ও আদর্শ প্রকাশিত করিবেন। আমরা কি তাহা চিরদিনের জন্য প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারিব? কৈ? আমরা ত তাহা পারি না। চিরদিনের জন্য দূরে থাকুক আমরা যে এক বৎসরের উৎসবের দান পর বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণে রাখিতে পারি না। কিন্তু উৎসব হইতে কোন প্রকার স্থায়ী উপকার, কোনও একটী প্রিয় পাপের বিনাশ, অথবা কোনও একটী উচ্চ আদর্শের বিকাশরূপ স্থায়ী নিদর্শন লাভ করিতে না পারিলে উৎসবে যোগ দিয়া বিশেষ কোনও ফল নাই। উৎসবে প্রকৃত ভাবে যোগদিতে হইলে একটী স্থায়ী ও পরিষ্কার উদ্দেশ্য প্রাণের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখা ও তাহা জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা কেবল ক্ষণিক আনন্দোচ্ছ্বাস সম্ভোগের জন্য উৎসবে যোগদিয়া কোনও ফল নাই। বরং এরূপ উদ্দেশ্যে উৎসবে যোগদিলে অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন প্রকৃত ভাবে তাঁহার প্রেমোৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি; আমরা যেন বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা, ভ্রাতৃভাব ও কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে লইয়া, এবং

কোনও স্থায়ী উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতে পারি। পার্থিব রাজাকে দেখিবার জন্য যদি লোকে এত ব্যাকুল হইতে পারে, তবে বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বরকে দেখিবার জন্য আমাদের প্রাণে কি একটু ব্যাকুলতা হইবে না? মাতৃভূমির নামে যদি লোকে পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে, তবে সেই পরম মাতার নামে আমরা কি পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিয়া ভাল বাসিতে পারিব না? স্বদেশবৎসলতায় যদি লোকের হৃদয় এত উচ্ছ্বসিত হইতে পারে, তবে সেই জগৎজননীর আগমনে আমাদের প্রাণে কি ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিবে না? রাজ পৌত্রের এ দেশে আগমনের জন্য যদি লোকে স্থায়ী স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্য এত ব্যস্ত হইতে পারে, তবে সকল রাজার রাজা যিনি আমাদের গৃহে তাঁহার শুভাগমনসূচক কোনও স্থায়ী চিহ্ন কি আমরা প্রাণে রাখিতে পারিব না? তাঁহার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে। আমরা যে তাঁহার কৃপার অনুপযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে নিতান্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও তিনি দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। আমরা যদি সকলে একপ্রাণ হইয়া কাতর ভাবে তাঁহাকে ডাকি তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা আমাদের উপরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে।"

সায়ংকালে আবার মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই দিন শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদজি হিন্দি ভাষায় "ভারৎবর্ষকা ধর্ম্মবিষয়ক অভাব" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা এমন সরল ভাষায় হইয়াছিল যে বাঙ্গালিগণের পক্ষেও সে বক্তৃতা বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"আমাদের অভাব সমুদয় জানিবার পূর্ব্বে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। মানব জীবনকে তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা কেবল মাত্র শরীরের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের জীবনকে পশুজীবন বলা যাইতে পারে! আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্টি গোচর হয়—জ্ঞান উপার্জ্জন করাই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সে জ্ঞান সংসারের কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তত ব্যস্ততা নাই। ইহাদের মুখে বহু প্রকার ধর্ম্মের কথা শুনা যাইতে পারে কিন্তু সে সমুদায় কথা তাহাদের জীবনে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু আর এক প্রকার তৃতীয় শ্রেণীর লোকে আছেন, যাঁহারা এই শরীরকে আত্মার কারার স্বরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলেন কি বিদ্যা আর কি সামাজিক জীবন ইহার কিছুই মানবের প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহারা আরও বলেন৽ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন কর এবং তথায় নিজ আত্মার অভ্যন্তরে সেই বিশ্বাত্মাকে ধ্যান কর। কিন্তু যে মানবের আত্মা বিশুদ্ধ হয় নাই, সে কিরূপে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি এ সমস্তই এক সঙ্গে সাধিত হওয়া আবশ্যক। মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতির জন্য এবম্প্রকার অবস্থা লাভ করিতে যত্নবান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন!

শিশু যেমন গর্ভে বাস করে, জীবাত্মাও সেইরূপ মানব শরীর মধ্যে বাস করিতেছে। শিশু যেমন পূর্ণাঙ্গ লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও সমুদয় বৃত্তি পরিচালনা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ লাভ করিয়া মৃত্যুর পর আপন কর্ত্তব্য পালনে সম্যক উপযুক্ত হয়।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক! ধর্ম্ম কখনই ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ দিতে পারে না। মানুষ যতক্ষণ স্বাভাবিক নিয়মের অনুসরণ করে, ততক্ষণ তাহাদের সকলের পক্ষে ধর্ম্ম একই বস্তু। কিন্তু যখন নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, তখন অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংশোধনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইবে। ক্রোধাদি ঋপুর বশীভূতদিগকে পুনরায় স্বাভাবিক নিয়মের অনুগামী করিতে হইলে নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্বাভাবিক ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক। কারণ ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সকল কেবল মাত্র ঈশ্বরেচ্ছার বিভিন্নপ্রকার বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইজন্য এই প্রকার ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে জানিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সত্যই কি আমরা সকল স্থানে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করিয়া থাকি। কখনই না। কারণ তাহা হইলে আমাদের জীবন নিশ্চয়ই পবিত্র হইত। যখন একজন পুলিসের কর্ম্মচারীকে দেখিলে লোকে মন্দকার্য্য হইতে বিরত থাকে, তখন তাঁহার বর্ত্তমানতা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই মানুষ অন্যায় আচরণ করিতে পারে না। এই কারণে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান অভাব তিনটী। ১ম ভৌতিক জগতের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান। ২য় সৎসাহসের অভাব। লোক কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝে কিন্তু এই সৎসাহসের অভাবে কার্য্যত কিছুই করিতে পারে না। পান দোষ, বাল্য বিবাহ, মিথ্যা কথার কুফল জানে কিন্তু লোক ভয়ে এই সকল দুর্গতি ও কুপ্রথা দূর করিতে পারে না। শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কোন দূষনীয় কার্য্যের অধীন হইলে, অশিক্ষিত লোকেরা তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করে। এই জন্য আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের স্কন্ধে অতি গুরুতর দায়িত্ব ভার নিহিত আছে। কারণ তাহাদের দ্বারাই ভারতের উন্নতি বা অবনতি হইবে। যখন জলেতে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত করা যায়, তখন তরঙ্গের রেখা সকল ক্রমশঃ যেমন বিস্তৃত হয়, দৃষ্টান্তের শক্তিও সেইরূপ। যে সকল সাধু বা অসাধু কার্য্য আমরা করি, তাহা আমাদের সঙ্গেই বিনষ্ট হয় না, তাহা আমাদের প্রতিবেশী এবং পরিবারদিগকে হয় উন্নত না হয় অবনত করে।

৩য়—আত্মবিসর্জ্জন ভাবের অভাব। অন্যের উদ্দেশে জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋষিদিগের বিষয় একবার স্মরণ করুন। অন্যের কল্যাণের জন্য তাঁহারা আপনাদের জীবন কিরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা প্রচারের জন্য মুক্তি ফৌজের প্রচারকেরা কি ক্লেশই না স্বীকার করিতেছেন।

জীবনের দ্বারাই আমাদের প্রচার করা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের দ্বারা নহে, সমস্ত নরনারী এই অর্থে প্রচারক হইতে পারেন।

৬ই মাঘ।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকগণ আবার মন্দিরে মিলিত হইতে লাগিলেন। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই দিনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। এই দিনের উপদেশের সারমর্ম্ম এইরূপ—

"আমাদিগের মাঘোৎসবের আয়োজন হইতেছে। একদিন উৎসবের উদ্বোধন হইল। কিন্তু একদিনের উদ্বোধনে কি উৎসবের উদ্বোধন হইতে পারে। ক্রমাগতই আমরা আয়োজন করিতেছি। নিকটের, দূরের ব্রাহ্ম ভাই সকল একত্রিত হইয়াছি। নানাস্থানে এবং মন্দিরে নানা প্রকারে উৎসবের আয়োজন করিতেছি। উৎসব শেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আবার ভয়ও হয় উৎসবলব্ধ প্রসাদ কোথায় ভাসিয়া যাইবে। এখন আমরা কি করিলে উৎসব করিতে পারি এবং উৎসবের ফল ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি? কত সাধু ভক্ত আমাদিগকে কত কি উপহার দিতেছেন। আমরা সকলে আনন্দে আনন্দবাজারে ঘুরিতেছি, আনন্দ করিতেছি। কিন্তু এ আনন্দ তো বাহিরের। অন্তরের আনন্দ বাজারে প্রবেশ করিতে না পারিলে উৎসবের আনন্দ পাইব না ও তাহা রক্ষা করিতেও পাইব না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন—কৃষক বীজ বপন করে, তাহার কতকগুলি বিজ প্রস্তরময় স্থানে পড়ে। রসাভাবে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কতকগুলি ক্ষেত্র-পার্শ্বে পড়ে। পক্ষীগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কতকগুলি বনের মধ্যে পড়ে, মৃত্তিকাভাবে তাহাও অঙ্কুরিত হয় না। আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রও সেইরূপ প্রস্তরময় ও কণ্টকময়। এত যে উপদেশ, আরাধনা, ধ্যান, কীর্ত্তন, আলোচনা, বক্তৃতাদি হইতেছে, সে সকল বীজ স্বয়ং পরমকৃষক পরমেশ্বর নিজে আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিতেছেন। আমরা সমস্ত বৎসর ঘৃণা বিদ্বেষ নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা হৃদয়কে প্রস্তর ও বনের মত করিয়া রাখিয়াছি। একদিনের উদ্বোধনে কি তাহা প্রস্তর বা বনমুক্ত হইতে পারে? দিনের পর দিন যাইতেছে, বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইতেছে, কত কি ব্যাপার চলিতেছে। এই সকলের মধ্যে থাকিয়া পরমকৃষক আমাদিগের হৃদয়ের কোথাও কোন ভগ্ন যন্ত্র খানি সংস্কার করিতেছেন, কোথায় বা রস ছিটাইতেছেন, কখন বা বারিধারা রূপে আমাদিগের চক্ষু হইতে তাঁহার কৃপা নির্গত করিতেছেন এবং কোথায় বা ধর্ম্মবন্ধুর ভিতর দিয়া, অথবা কোন পুস্তকের একটি উপদেশ কিম্বা কোন বন্ধুর একটি উপদেশ কিম্বা একটিমাত্র কথার ভিতর দিয়া অথবা অন্য কত প্রকারের উপায়ে আমাদিগের অন্তরের পাপপঙ্কল ধুইয়া আমাদিগকে দেবতার মত সাজাইতেছেন! তিনি তো এ সকল করিতেছেন। আমরা এখন কি করিব? আমরা যদি ক্রমাগত তাহার নিকট প্রার্থনা করি এবং বলি "প্রভো! তুমিই আমাদিগের অন্তরে জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার বীজ বপন করিয়াছ, যাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হয় তাহা কর!" নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রের ঘৃণা প্রভৃতি প্রস্তর ও বন সকল মুক্ত করিবেন এবং সেই সেই স্থানে জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এই দিন সায়ংকালে আবার উপাসনা হয়। সংকীর্ত্তন ও সংগীতের পর উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাঁহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"একটী নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। নগরবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শত্রু পক্ষ প্রবল বলিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। নগর অবরোধ হইবার কয়েক দিবস পরে নাগরিকেরা ভগ্নোৎসাহ ও নিরাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল। খাদ্য দ্রব্য যাহা ছিল সব নিঃশেষ হইয়া গেল, নগরবাসিগণ যুদ্ধ করিতে বিরত হইলেন না, কিন্তু বুঝিলেন আর রক্ষা নাই।

এমন সময়ে এক পত্র আসিল। নগরবাসীদিগের একজন সেনাপতি নগরের বাহিরে ছিলেন। তিনি নগরের অন্য এক শত্রুদলকে দমন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, শত্রু জয় করিয়া তিনি আসিতেছেন, অবিলম্বে আসিয়া নগরবাসীগণকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। সেই সেনাপতির পত্র ও দূত আসিলে নগরবাসীদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল, তিনি যে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি যে আমাদের শত্রুর সহিত মিশিবেন না কে বলিল। কেহ কেহ বলিল, না, তিনি বরাবর আমাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার শক্তি ও পরাক্রমও আমাদের উত্তম রূপ বিদিত আছে, তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। শেষোক্ত লোকদিগের মতই বজায় রহিল। সেই সেনাপতি যথাসময়ে শত্রুদল পরাভূত করিয়া নগর রক্ষা করতঃ আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

প্রকৃতিতে আমরা এই অঙ্গীকার পালনের সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। প্রকৃতি যদি আপনার নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে সংসারে কি বিশৃঙ্খলাই না উপস্থিত হয়। সূর্য্য প্রতিদিন উঠে বলিয়া আমরা সূর্য্যোদয়কে বড় একটা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু একদিন যদি সূর্য্যোদয় না হয়, তবে পৃথিবীতে হাহাকার পড়ে। সূর্য্য চন্দ্র, নক্ষত্র কেহই আপনাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। বৃষ্টির আশায় কৃষক ধান্য রোপণ করে, বৃষ্টি না হইলে কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়। প্রকৃতির এই অঙ্গীকার পালনকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রাকৃতিক নিয়মের অনতিক্রমনীয়তা বলে। এই নিয়মের অনতিক্রমনীয়তার উপর সংসার ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

মনুষ্য সমাজেও দেখিতে পাই যে অঙ্গীকার ও অঙ্গীকারে বিশ্বাস ভিন্ন সমাজের কার্য্য চলে না। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, প্রভু ভৃত্যকে, ভৃত্য প্রভুকে বিশ্বাস না করিলে সংসার থাকে না। বণিকদের অধিকাংশ কার্য্য নগদ টাকায় না হইয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে নিষ্পন্ন হয়। রাজনৈতিক জগতেও দেখি, এই

প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। রাজা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন প্রজা বিশ্বাস করিতেছে, প্রজা অঙ্গীকার করিতেছে, রাজা বিশ্বাস করিতেছেন। নোট, কোম্পানির কাগজ হুণ্ডী সকলই অঙ্গীকার পত্র মাত্র। এই সকল কাগজ খণ্ডের এরূপ সমাদর যে ধনাগারে উপস্থিত মাত্র তাঁহার মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে। রাজা ও বণিকদের নোট ও হুণ্ডিতে যদি বিশ্বাস করা না যাইত, তবে অনর্থ ঘটিত।

ধর্ম্মরাজ্যে—ধর্ম্মসমাজেও আমরা প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাই। প্রতিজ্ঞায় দুই পক্ষ আছে এক প্রতিজ্ঞাকারী, আর এক জন সেই লোক যাহার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করা যায়, এক উপকারী আর এক জন উপকৃত। মনুষ্য সমাজে যে প্রতিজ্ঞা দেখি, তাহাতে উভয় পক্ষই মনুষ্য। ধর্ম্ম সমাজে যে প্রতিজ্ঞা দেখা যায় তাহা গুরুতর কেন না প্রতিজ্ঞাকারী আর কেহ নয়, স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর।

ঈশ্বর যেমন প্রতিজ্ঞা করেন তেমনি তাহা পালন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা পালন করেন মানিলেই, মন প্রমাণ অন্বেষণ করে। সেই প্রমাণ আমরা ধর্ম্ম শাস্ত্র ও সাধু জীবন হইতে লাভকরি। গীতায় রূপকের আকারে ঈশ্বরের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা কথিত হইয়াছে, কয়েকটী প্রতিজ্ঞা তাহার মধ্যে এই—

"যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিযোগে আমাকে ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি শীঘ্রই তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।"

"তুমি আমাতে মন স্থির কর, তাহা হইলে দেহান্তে তুমি আমাতে নিবাস করিবে।"

"যদি তুমি আমাতে তোমার চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুসরণরূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।"

"যদি তাহাতে অসমর্থ হও তবে আমার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান কর, মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

"যদি তাহাতেও অশক্ত হও, তবে আমার শরণাপন্ন হইয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান কর।"

অন্যান্য শাস্ত্রেও আমরা এইরূপ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাই; যথা "আঘাত কর, উন্মুক্ত হইবে;" "অনুসন্ধান কর প্রাপ্ত হইবে" ইত্যাদি। সমগ্র বাইবেল শাস্ত্র একটী প্রকাণ্ড ঐশ প্রতিজ্ঞার ক্রম বিকাশের ইতিহাস।

হাফেজ বলিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকট যে অঙ্গীকার করেন, তাহা পালন করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাধুরাও এক-বাক্যে একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হীন জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে আমারাও একথার সাক্ষ্য দিতে পারি। আমরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, তখন কাহার কথা শুনিয়া আসিয়াছিলাম? পৌত্তলিকতা ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া কে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে বলিল?' সে কি নিজের কথা! নিজের কথায় সামান্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না, নিজের কথায় পাপ ছাড়িয়া আত্মীয় বন্ধু ও সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাওয়া কি সম্ভব? নিজের কথা নহে। ঈশ্বর ডাকিয়াছিলেন "পাপী আয়, ভয় নাই, সহস্র পাপ থাকুক, আয় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, প্রাণদান করিব" এইরূপ কোন আহ্বান শুনিয়া কি আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি নাই। সাধকগণ আপনার বক্ষে হস্ত দিয়া সাক্ষ্য দিন, ঈশ্বরের কোন প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহারা জীবনের গতি ফিরাইয়া ছিলেন কি না?

ঈশ্বর দুই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক প্রতিজ্ঞা যে তিনি আমাদিগকে সুখী করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা কি তিনি রক্ষা করিয়াছেন? আমরা কি সুখী হইয়াছি? সাধকগণ বলুন, তাঁহাদের প্রাণ ইষ্টদেবতার মধুর সহবাস জনিত আনন্দে নৃত্য করিয়াছে কি না? "যে তাঁহাকে ভজে সে আনন্দ পায়" একথার সত্যতা কি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বাহিরে আমরা দীন দুঃখী, আমাদের ধন বল, লোক বল নাই, আমরা পথের কাঙ্গাল ও ভিক্ষুক। ভিতরে আমারা কিন্তু বড় সুখী, রাজার চেয়েও সুখী। যিনি রাজার রাজা সামান্য ভাবে একবার একটু ডাকিলেই যিনি আসেন, তাঁহার সহিত আমা-দের ভাব হইয়াছে। তিনি অনেকবার আমাদের প্রাণের ভিতর আসিয়াছেন, আসিয়া আমাদিগকে হাসাইয়া ও আনন্দ সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, ইহা রূপক বা অলঙ্কার নহে, প্রকৃত কথা।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা যে তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "আয় পাপী আয়, তোকে আলিঙ্গন করিয়া নূতন ও পবিত্র করিয়া দি।" ভক্তগণ সাক্ষ্য দিন, ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। আমাদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু আমরা কি একথা বলিতে পারি, যে আমাদের জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হয় নাই? আমরা কি মুক্তকণ্ঠে জগতের নিকট সাক্ষ্য দিব না, যে পবিত্রতার প্রতি আমাদের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, যে ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর শাসনে আমাদের জীবন নিয়মিত হইতেছে এবং নূতন নূতন সাধুসঙ্কল্প প্রাণে উদিত হইয়া পাপের মস্তক হেঁট করিয়া রাখিয়াছে। মহাপাপী হই-য়াও যে আমরা পবিত্রতার আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা ঐশ প্রতিজ্ঞাপালনের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের এই উৎসব ঈশ্বরের একটী বিশেষ প্রতিজ্ঞা পূরণ। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে প্রতি বৎসর আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিবেন। আমরা প্রস্তুত হইতে জানি না, প্রস্তুত হইতে পারি না। কিন্তু আমাদের এই সমস্ত ত্রুটী সত্বেও উৎসব-পতি আমাদিগকে লইয়া উৎসব করিয়া থাকেন। উৎসবে কিরূপ ভাবে চলিতে হয়, কিরূপ ভাবে উৎসব ধারণ ও সম্ভোগ করিতে হয়, আমরা কিছুই জানিনা, অথচ দেখিতে পাই উৎসবের দিন উৎসব-পতি আমাদিগকে তাঁহার সহবাসামৃত এরূপ সম্ভোগ করান যে সম্বৎসরে একদিনও সেরূপ হয় না। তিনি সত্যপরায়ণ, তিনি উৎসবের যাত্রীগণকে লইয়া উৎসব করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন।

আমরা কি উৎসবপতির সেই মধুর প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছি? যদি শুনিয়া থাকি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের দায়িত্ব আসিয়াছে। ঈশ্বরের অঙ্গীকার শুনা সহজ নহে, সে অঙ্গীকার শুনিলেই সেই অঙ্গীকার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য আছে। তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন,আমাদিগকে উৎসবে প্রমত্ত করিবেন, আমাদিগকেও প্রতিঅঙ্গীকার করিতে হইবে যে আমরা প্রাণপণে উৎসব-লব্ধ প্রমত্ততা রক্ষা করিব ও আমাদের প্রাণ সকল তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব। ঈশ্বরকে লইয়া যদি উৎসবে প্রমত্ত হই, তাহা হইলে ইতর বিষয় লইয়া অন্য সময় প্রমত্ত হওয়া হইবে না, ঈশ্বরের মধুর সহবাস রূপ প্রলোভনে যদি প্রলুব্ধ হই, তবে সংসারের ইতর প্রলোভনে আর প্রলুব্ধ হইলে চলিবে না।

উৎসবের যাত্রীগণ উৎসবের জন্য প্রস্তত হইয়া না থাক, ব্যাকুল ভাবে একবার উৎসবের দেবতাকে আহ্বান কর। সমস্ত বৎসর তো সংসারের সেবায় প্রাণ মন ক্ষয় করিলে, এখন একবার সংসার সরাইয়া দিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হও। প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ দেখি, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিবে না। পাপ তাপ ঘুচিবে, সংসার অপ্রিয় হইবে, প্রাণ বিভু-প্রেমরসে মত্ত হইবে। উৎসবের দেবতার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ কর। যে সে প্রতিজ্ঞা নহে, যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। সত্যপরায়ণ, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর আপনি পূরণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞারূপ প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া উৎসবের বাজারে চল। সংসারের বাজারে লোকে পার্থিব রাজদত্ত প্রতিজ্ঞাপত্র বা নোট ভাঙ্গাইয়া তাহার মূল্য পায়। উৎসবের বাজারে গিয়া ত্রিভুবনপতি দত্ত প্রতিজ্ঞাপত্র ভাঙ্গাও অমূল্য সম্পত্তি লাভ করিবে। উৎসবের দেবতার সর্ব্বশক্তিমত্তাতে কি আমাদের বিশ্বাস নাই। তিনি কি না করিতে পারেন? তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, অঘটন ঘটে, কটাক্ষে কোটী পাপী উদ্ধার পায়। তাঁহাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে উৎসবে প্রবেশ কর, প্রবেশমাত্র সর্ব্বসঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, সকল আশা পূর্ণ হইবে।

আসুন তবে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালন-শক্তি স্মরণ করিয়া উৎসবের জন্য প্রাণকে প্রস্তত করি। বিশেষ অভাব ধরিয়া উৎসবে না গেলে বিশেষ ফল হয় না। যে সকল অভাবের জন্য সম্বৎসর আর্ত্তনাদ করিয়াছি, আসুন প্রাণের সেই সকল অভাব খুঁজিয়া বাহির করতঃ, উৎসবপতির অঙ্গীকার পালনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, আশাতীত ফল লাভ হইবে।

৭ই মাঘ।

অদ্য স্কুল এবং কার্য্যালয় সকল বন্ধ থাকায় অনেকের পক্ষে প্রাতঃকালের উপাসনায় উপস্থিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল এবং এই দিন হইতেই উৎসবের ভাব ক্রমে গভীর হইয়াছিল। প্রত্যুষে সকলে মন্দিরে সমবেত হইলে সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন! তাঁহার উপদেশের সার প্রকাশিত হইল।

"খ্রীষ্টের অনুকরণ 'Imitation of Christ' প্রণেতা টমাস্ এ কেম্পিসের নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই সাধুর জীবনী আমি কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। ইহার জীবনীর কোন স্থানে এই রূপ পাঠ করি যে তিনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রোমান ক্যাথলিক আশ্রমে প্রবেশ করেন, তথায় আশ্রম বাসীদিগের সহিত বাস করিয়া তিনি অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন। তিনি এক স্থলে এই রূপ বলিয়াছেন যে যখন তিনি সেই আশ্রমবাসীদিগের সহিত একত্রে বসিতেন তখন তিনি স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করিতেন। আশ্রমবাসী সাধুদিগের সহবাস লাভ করিয়া তিনি যেমন অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তেমনি অনেক অমূল্য ধর্ম্ম-রত্নও সঞ্চয় করিতেন 'Imitation of Christ' কে তাহার ফল স্বরূপ এক উপাদেয় অমূল্য গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

আজ সাধুসঙ্গ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক্। সাধুসঙ্গে মানবের মহৎ উপকার হয়। সাধুদিগের সহবাসে থাকিয়া ঘোর জঘন্য লোক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে কত পাপী পরমেশ্বরের সাধু ভক্ত সন্তানদিগের নিকট আসিয়া তরিয়া গিয়াছে! এই জন্য সাধুদিগের মাহাত্ম্য এ জগতে এত কীর্ত্তিত হইয়াছে। লোকে এই জন্য এই সকল লোককে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়াছে, কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছে তাহা নহে, এই সকল লোককে দেবতা ও পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, পরমেশ্বরের সিংহাসনের নিম্নে স্থান দান করিয়াছে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সকল সময়ে ও সকল দেশে—সৃষ্টির আদি অবধি আজ পর্য্যন্ত লোকে সাধুর গুণানুবাদ করিয়াছে, ধর্ম্মজগতের ইতিহাস সাধুগুণ কীর্ত্তনে পূর্ণ।

আমরা যদিও এ সকল লোককে দেবতা অথবা পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করি না, লোকে যদিও এই সকল লোককে ইহাঁদের যথোচিত সম্মানের অতিরিক্ত প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে কি কোন সত্য দেখিতে পাই না? লোকে এই সকল লোককে এত সম্মান করে, এবং ইহাঁদের চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার পুষ্প অর্পণ করে, ইহার কি কারণ নাই? ইহারা মানবের সম্মুখে ভগবানের মুখচ্ছবি ভাল করিয়া ধরিয়া দেন। লোকে অনেক সময় বুঝিতে পারে না যে পরমেশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানদিগের দ্বারা জগতে কত উপকার হইয়া থাকে। যে সকল লোক পরমেশ্বরের ভাবে বিভোর হন যাঁহারা নির্ম্মল হৃদয়ে পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের মুখ হইতে সর্ব্বদা এক স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইয়া থাকে। লোকে এই জন্য ইহাঁদের সহবাসে থাকিয়া ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে ও প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় এই জন্য সাধু সহবাস ভিন্ন মানুষ প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা মণ্ডলী করিয়া বসেন এবং পরস্পরে পরস্পরের মুখের মধ্যে

পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি দর্শন করিবার জন্য প্রয়াসী হন। আমরা এত দূর স্বীকার না করিলেও ইহা স্বীকার করি যে মানুষের মুখের মধ্যে পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। মানবের কার্য্যের মধ্যে যেরূপ পরমেশ্বরের কার্য্য প্রতিফলিত হয়, এমন আর কোথাও হয় না। প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু মানব জগতে পরমেশ্বরের লীলা বিশেষ ভাবে দর্শন করা যায়। কোন একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন Nature conceals God, but man, reveals God. প্রকৃতি ভগবানের মুখকে আবৃত করিয়া রাখে, কিন্তু মানব তাঁহার প্রেমানন প্রকাশ করিয়া থাকে। কি মিষ্ট কথা! এ কথাটি বড় সত্য। সত্যই মানব ভগবানের মুখচ্ছবি প্রকাশ করিয়া থাকে। রাজ্যের উত্থান এবং পতনের মধ্যে, ক্ষুদ্র শিশুর মধুর হাস্যের মধ্যে, পিতা মাতার মুখে ও পতি পত্নির প্রেমালাপের মধ্যে পরমেশ্বরের কার্য্য যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, এমন আর কোথায় তাঁহার লীলা সন্দর্শন করা যায়, এই জন্য ইতিহাসের মধ্যে পরমেশ্বরের কার্য্য অতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়, এই বিষয়ে ধার্ম্মিকেরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই একত্রে মিলিত হইয়া সাধন করিয়াছেন, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গত সভা তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। এই সঙ্গত সভা হইতে অনেক ব্যক্তি প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা বলেন একাকী ধর্ম্ম সাধন করিলেই চলে, তাঁহারা সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। একাকী সাধনের যেমন উপকারিতা আছে, মিলিত হইয়া সাধনের ও তেমনি উপকারিতা আছে। যাঁহারা নির্জ্জন সাধন করেন, তাঁহারাই আবার সজন সাধন করেন। দুইটী সাধনেই জীবনের উন্নতি হয়। বরং মিলিত হইয়া সাধন না করিলে "প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় না।" আমরা সংগীতে বলিয়া থাকি "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ" একথার অর্থ কি? যাঁহারা একাকী ধর্ম্ম সাধন করিতে চান তাঁহাদের হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ভাল বিকাশ পায় না—মিলিত হইয়া সাধন করিলে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হয়, শুষ্ক হৃদয় সরস হইয়া যায়। একত্রে উপাসনা ও একত্রে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা মানব এসংসারে স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

যখন সজন উপাসনার প্রতি কাহারও অরুচি জন্মায়, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্তরের কোন স্থানে বিশেষ ব্যাধি জন্মিয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে অনেকে বিদায় লইবার পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন, যে তাঁহার সজন উপাসনা ভাল লাগে না। কত যুবা পুরুষ যাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে কত আশা হইত, তাঁহারা এই সজন উপাসনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এরূপ অনিষ্ট নিবারণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন গঠন করা বড় কঠিন ব্যাপার। সপ্তাহান্তে একবার মন্দিরে আসিয়া উপদেশ অথবা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সপ্তাহ ধর্ম্মবন্ধু অথবা সৎসঙ্গীদিগের সহিত যদি ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ না করা যায়, তাহা হইলে, তোমার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কে রক্ষা করিবে? সংসারে নিরন্তর শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, আচার্য্যের উপদেশ প্রাণে পুরিয়া গৃহে যাইতে না যাইতে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এই কারণে ধর্ম্মসাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলীর প্রয়োজন, সেই সকল মণ্ডলী, তোমার ধর্ম্মভাব ও সাধুভাব সকল সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত রাখিবে। যদি সমস্ত সপ্তাহ সংসারে লিপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে ব্রহ্ম মন্দিরের উপদেশ কিরূপে তোমার প্রাণকে অধিকার করিবে? রোগীকে কেবল ঔষধ সেবন করাইলে কি তাহার পীড়া আরোগ্য হয়? রোগীর পক্ষে ঔষধ সেবন যেমন আবশ্যক, তেমনি তাহার সুপরিষ্কৃত এবং যে গৃহে বায়ু খেলে, এমন গৃহে থাকা চাই, তবে ত ঔষধে কার্য্য করিবে। ভাল ডাক্তারেরা যদি দেখেন যে রোগীর থাকিবার ও পথ্যের ভাল ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে সে রোগীর ঔষধ সেবনে কোন ফল হইবে না বলিয়া থাকেন।

সাধুসঙ্গ এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেখানে পরমেশ্বরের কয়েকটী সন্তান একত্রে বসিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ করেন সে স্থলে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। পরমেশ্বর বলেন, যেখানে আমার নামে, দুই চারিজন ব্যক্তি একত্রিত হন, আমি সেই স্থানে স্বয়ং অবতীর্ণ হই।

একত্রে পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তনে মানব অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। যে পরিবারে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে সেই দেবাদিদেবের চরণ বন্দনা হয়। সেই স্থানেই যথার্থ স্বর্গ প্রকাশ পায়। স্বর্গ, দক্ষিণে, বামে, অথবা উর্দ্ধে ও নিম্নে নহে। কিন্তু প্রকৃত স্বর্গ সেই স্থলে যেখানে ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণ একত্রিত হইয়া ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করেন। সেস্থানের ন্যায় এ ধরায় মনোহর স্থান আর কোথায় আছে? উৎসবের সময় আমায় কেহ যদি বলে, এক অতি মনোহর স্থান আছে, যেখানে কুল্ কুল্ ধ্বনীতে নদী প্রবাহিত হইতেছে, নানা জাতির বিহঙ্গ মধুর কণ্ঠে গান করিতেছে, নানা বিবিধ ফুল ফুটিয়া সৌরভে সে স্থানকে আমোদিত করিতেছে "তুমি কি সেস্থানে যাইতে চাও" আমি তাহার উত্তরে বলি, না, আমি এ উৎসবের স্বর্গ ছাড়িয়া সেস্থানে যাইতে চাই না।

ব্রাহ্মসমাজ এই মিলিত সাধন বিশেষরূপে দেখাইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ভাই; ব্রাহ্মিকা ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর।

পত্র প্রেরকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে তাঁহাদিগের বার্ষিক উৎসব এবং মাঘোৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এখানকার মাঘোৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন পত্র বা উৎসব বিবরণ পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। আগামীতে সেই সকল পত্র প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। পত্রপ্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৪ঠা ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা ফাল্গুন বুধবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১ | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

৬ম মাঘোৎসব।

৭ই মাঘ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

অদ্যকার অপরাহ্ন বাহিরে প্রচারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এজন্য দুইখানি ট্রামগাড়ী রিজার্ব করিয়া ভবানীপুরে গমন করা হয়। দুই ঘটিবার সময়ে মন্দিরের নিকটে প্রচারযাত্রীগণ সমবেত হইলেন, পুষ্পদ্বারা সজ্জিত দুইখানি ট্রাম গাড়ীতে সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বক্তৃতাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র সবজজ মহাশয়ের ভবনের প্রাঙ্গন বক্তৃতাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথাকার উৎসাহী বন্ধুগণ বক্তৃতার স্থানটী পুষ্প পত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভাস্থলে সকলে উপবিষ্ট হইলে সংকীর্ত্তন হইল, তৎপর শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। তৎপর প্রচার-যাত্রীগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় মন্দিরে সমাগত হইলেন। এদিকে বরাহনগরের শ্রমজীবিগণ নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন। শ্যামবাজার হইতে কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেও অনেকে তাঁহাদিগের সহিত শ্যামবাজারে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মন্দিরে সমাগত হইলে উপাসনা হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বেলার উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাঁহার সার মর্ম্ম এইরূপ—

"যখন কোন তীর্থবিশেষে উৎসব সমাগত হয়, তখন দেশ বিদেশ হইতে কত যাত্রী সেই উৎসব দেখিতে গমন করিয়া থাকে। জগন্নাথের উৎসব উপলক্ষে কত দেশ হইতে কত যাত্রী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। কুলের কুলবধূ, বৃদ্ধ, যুবা সকলে নানা দেশ হইতে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতে থাকে। হাঁটিতে হাঁটিতে কত লোকের পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। কেহ পায়ে বস্ত্র জড়াইয়া চলিতে থাকে। চলিতে পারে না তবু চলিতেছে। এক একটী আড্ডায় পৌছিয়া সকলে রাত্রিতে একত্রে বাস করে। যাহার প্রথমে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই সকলকে জাগাইয়া তোলে, প্রাতঃকালে আবার প্রফুল্ল মনে চলিতে আরম্ভ করে। তখন জাতি বিচার থাকে না। সকলে একত্রে গমন, একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, প্রভৃতি দ্বারা জাতিভেদ ও আত্মপর জ্ঞান থাকিতে পারে না। আবার যখন জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন সকলে একত্রে আহার করিতে লাগিল, একজন চণ্ডাল একজন ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য।

আমাদের ব্রহ্মোৎসবও ঠিক এইরূপ। আমরা সকলে এক পথের যাত্রী। সেই পরমদেবতাকে দেখিব বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি। এখানে জাতিভেদ নাই। কিন্তু আমাদের অভিমানে সকল সময় উল্লাসের সহিত একত্রে যাইতে পারি না। কেহ আপনাকে বড় উপাসক বলিয়া মনে করেন। কেহ আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করেন। কেহ আপনাকে প্রেমিক বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য আমাদের মধ্যে এত গোলযোগ। যদি একত্রে এক হৃদয় হইয়া যাইতে পারি,তবে পথে কত আনন্দ ভোগ করিতে পারি। এবং পরস্পরের সাহায্যে পথক্লান্তি ভুলিয়া যাইয়া, পরস্পরে উৎসাহিত হইতে পারি। অবশেষে পরমেশ্বরকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

আমরা সকলে ঘর বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু বাহিরের ঘর ছাড়িলে কি হইবে? ভিতরে যে কুটিলতা রহিয়াছে। পরচর্চ্চারূপ ঘর ছাড়িতে পারি নাই। এই সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর আমাদের পথে এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত না। পথে যত দিন কাটাইব, ততদিন আমাদের কাহাকেও ফেলিয়া যাইলে চলিবে না, কেহ যদি চলিতে চলিতে ক্লান্ত হন, কাহার পদ যদি ক্ষত বিক্ষত হয়, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। দুর্ব্বল বলিয়া কাহাকে ফেলিয়া যাইব না। এই ভাবে প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের সহায়তা করিতে পারি, যদি আত্মমর্য্যাদা ও অভিমান ভুলিয়া সকলের সহিত এক প্রাণে মিলিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। পরমদেবতার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিয়া

ধন্য হইতে পারিব। তবে আমরা সকলে সেই উদ্দেশ্যেই মিলিত হই এবং পরস্পরে মিলিয়া উৎসবের দেবতার সহিত পরিচিত হই।"

৮ই মাঘ।

অদ্য মন্দিরে প্রাতঃকালে হিন্দিতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজী উপাসনা করেন। অতি প্রত্যুষেই মন্দিরে উপাসকগণ সমাগত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংকীর্ত্তন ও সংগীতের পর উপাসনা আরম্ভ হইল। হিন্দী সংগীত ও কয়েকটী গাওয়া হইয়াছিল। উপাসনান্তে লছমন প্রসাদজী একটা সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা লিখিত না হওয়াতে আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অদ্য সায়ংকালে ইংরেজিতে উপাসনা হয়। গত বৎসর এখানে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার উপাসনার কার্য্য ইংরেজিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে সাহেবদিগের জন্যই এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সমাজের সভ্যগণের জন্যই অদ্যকার উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন এবং মিঃ বেকার সাহেব মহাশয় পাঠ করেন। উপাসনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানে অনেক প্রভেদ। পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কোন স্থান বা জনসমাজের যে ছবি কল্পনায় মনে অঙ্কিত হয়, নিজে পর্য্যটন করিবামাত্র সেই সকল ছবি এত অন্যরূপ ধারণ করে যে তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ঠিক্ সেইরূপ শারীরবিধান (physiology) ও শরীরতত্ত্ব (anatomy) সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক ব্যক্তি রীতিমত শরীরের অঙ্গাদি কর্ত্তন করত এবং চিত্রের (Diagrams) সাহায্য লইয়া যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহার সহিত কেবলমাত্র পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের বিশেষ প্রভেদ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্মৃতির সাহায্যে শরীরের নানা বিভাগীয় অঙ্গাদির বিবরণ পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু সে জ্ঞান কোন্ কাজের? তাহাতে তাহার প্রকৃত বিদ্যা হয় না। প্রথম ব্যক্তির মত সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলে তবেই তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত স্বাধীনতা নাই। পরোক্ষ জ্ঞানী অপরের মুখাপেক্ষা করেন ও অপরের পরামর্শ অনুসারে চলেন। আমরা প্রতিদিন ইহার প্রমাণ দেখিতেছি। গৃহমধ্যে কেহ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইলে আমরা অজ্ঞান বলিয়া কিরূপ অসহায় হইয়া পড়ি। আমরা যেন বুদ্ধিভ্রংস হইয়া মস্তক পাতিয়া চিকিৎসকের আদেশ পালন করি। কিন্তু যাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে তাঁহার সেইরূপ অবস্থা হয় না। তাঁহার জ্ঞানালোকেই তাঁহাকে স্বাধীন করে এবং তিনি অভিজ্ঞতারূপ যন্ত্রালয় হইতে আবশ্যকীয় অস্ত্রাদি লইয়া শত্রু নিপাতে তৎপর হয়েন।

পার্থিব বিষয়ে যেরূপ অতি অল্প সংখ্যক লোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, আর অধিকাংশের তাহা থাকে না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ অধিকাংশ লোক অন্যের উপর নির্ভর করে। নিজ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বহুদর্শিতা না হইলে, ধর্ম্মের সেই পরাভবকারী শক্তি (যাহার জন্য ধর্ম্ম মূল্যবান্) জন্মে না। তাহার বাহ্য চাকচিক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদিগের স্বার্থপরতা নাশ অথবা ইন্দ্রিয়দমন করিতে সমর্থ না হইলে, এ জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা অল্প হইয়া পড়ে। অথচ সকল সম্প্রদায়েরই শত শত নর নারী এই শ্রেণীভুক্ত, যাহারা কেবল নিয়ম মত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে ও বেদাদি অথবা অন্য শাস্ত্রের প্রত্যেক শাসন মানিয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে ধর্ম্ম ও ভগবানের রাজ্য হইতে তাহারা অনেক দূরে অবস্থিতি করে! ইহার অন্বেষণে দূরে যাইতে হইবে না। প্রতি সম্প্রদায়েই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। স্কট্‌লণ্ডের একটি ব্যাঙ্কের কতকগুলি অসৎ কার্য্যাধ্যক্ষ রীতিমত উপাসনালয়ে যাইতেন এবং লণ্ডন নগরের একটি মহিলা যিনি প্রবৃত্তির নিকট নির্দ্দোষ বালিকাদিগকে বলিদান দিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন, তিনিও উপাসকমণ্ডলীর চাঁদা রীতিমত দিতেন। এই সকল নরনারী এরূপ আচরণ কেন করে? ইহাদের নিজ নিজ চরিত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই অথচ কেবলমাত্র সামাজিকতা রক্ষা করিবার জন্যই এই সকল অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। ধর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তির কারণ না হইয়া, কেবল গলদেশে একখণ্ড মৃত পাষাণের ন্যায় অবস্থিতি করিতে থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই। কি হইলে ধর্ম্ম একটি সঞ্জীবনী শক্তিতে পরিণত হয়? সত্য ও জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে মানবাত্মাতে ভগবানের বর্ত্তমানতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক। এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে ইহাই সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন। অন্যান্য প্রমাণ পরোক্ষ মাত্র। প্রমাণের সহিত মিল থাকিলেই মহাজনদিগের বাক্য অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ সকল কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞান যাঁহার জাগ্রত হয় নাই অথবা যিনি নিজ অন্তরে ভগবানের স্পর্শ অনুভব করেন নাই, তাঁহার নিকট মহাজনই বা কি আর শাস্ত্রই বা কি! আধ্যাত্মিক বিষয়ের আস্বাদনাভাবে দেবতাদিগের সঙ্গও তাঁহাতে কোন ফল উৎপত্তি করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মস্পর্শ ব্যতীত সাধু ও দেবতাদিগের অতি প্রিয় ধর্ম্ম পুস্তক সমূহ যাহা বংশ পরম্পরাকে আধ্যাত্মিকতা প্রদান করিয়াছে সে সকলও তাহার নিকট স্বাদ-শূন্য ও বিস্বাদ। পুরাকালের আধ্যাত্মিক ধন-ভাণ্ডারের চাবি তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। মহর্ষি ঈশা ঠিক্ এই সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন যে পিতাকে না জানিলে তাঁহার নিকট কেহই যাইতে পারে না। আত্মার নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আধ্যাত্মিক উপদেশ অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে না। আধ্যাত্মিকতার গভীরতানুসারে আধ্যাত্মিক শিক্ষকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। তাহার অল্পতায় শ্রদ্ধার ও অল্পতা হইয়া থাকে।

আত্মার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে নিজ অন্তরে যাহা থাকে তাহাই অপরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পবিত্র মন স্বভাবতই প্রত্যেক পদার্থকে পবিত্র এবং অপরের অভিপ্রায়ের পবিত্রতা দর্শন করে। সেইরূপ অপবিত্র মনও যেখানে

অপবিত্রতা নাই সেখানেও অপবিত্রতা দেখে। আধ্যাত্মিক জীবনের ঘটনা সমূহে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নিজ আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত পুরাকালের আধ্যাত্মিক ধন-ভাণ্ডার অধিকার করা যায় না।

এই যে ভগবান প্রদত্ত আধ্যাত্মিকতা ইহা পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণন হইতেই জন্ম লাভ করে। অনুপ্রাণনের অর্থ কোন অদ্ভুত কৃপা নহে। যাহা ভগবান তাঁহার কোন বিশেষ প্রিয় ব্যক্তির অভ্যন্তরে ধ্যানযোগের প্রণালী স্বরূপ খুলিয়া দিলেন, কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষের উন্নতির নিমিত্ত আলোক ও বায়ুর স্বাভাবিক কার্য্য, তেমনি আত্মার উন্নতির নিমিত্ত অনুপ্রাণন। বৃক্ষ উপর হইতে যেরূপ আলোক ও বায়ু প্রাপ্ত হয়, আমরাও ব্যাকুলান্তরে যখন সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের দিকে তাকাই তেমনি আমাদিগের অন্তর তাঁহার কৃপায় অনুপ্রাণিত হয়। প্রার্থনা আত্মার চক্ষু খুলিয়া দেয়, এবং ধ্যান আমাদিগকে সেই অন্তরতম দেশে লইয়া যায়। যেখানে আমাদিগের জীবন্ত দেবতাকে জীবনের জীবনরূপে দর্শন করিতে পাই।

এই যে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইহা ধর্ম্মকে একেবারে জীবন্ত সত্তায় পরিণত করে এবং আমাদিগের অন্তরে পবিত্র অগ্নি জ্বালিয়া দেয়, আমাদিগের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা প্রবল করিয়া দেয়; প্রেম, পবিত্রতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি জীবনের উচ্চতর ভাব সকল নবতর শক্তিলাভ করে এবং চরিত্রকে নিয়মিত ও সুগঠিত করে। এইরূপ জ্ঞানলাভ যাঁহার হয় তিনিই জীবন প্রবাহ মধ্যে একখানি পা সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিয়া পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়েন। আত্মার বিশ্রামস্থল পাইয়াছি, এইরূপ জ্ঞানই সংগ্রামকারী আত্মাকে সেই চিরশান্তি প্রদান করে, যাহাকে আর কিছুতেই চঞ্চল করিতে পারে না।"

৯ই মাঘ।

অদ্য ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসবের দিন। এজন্য পুরুষদিগের জন্য অন্য স্থানে উপাসনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে ব্রাহ্মিকাগণ এবং অনেক হিন্দু পরিবার হইতেও মহিলাগণ সমাগত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ন ৮ আট ঘটিকার সময় উপাসনা হয়। তাহার পূর্ব্ব হইতেই মহিলাগণ সংগীত করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সুকণ্ঠের ধ্বনিতে মন্দিরের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া অতি মধুময়রূপে উপাসনায় সমাগত সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিতেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"আমরা মহাত্মা খ্রীষ্টের জীবনে কি দেখিতে পাই? তিনি যখন প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন রমণীগণ তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হন। মেরী নাম্নী এক পাপীয়সী তাঁহার কথা শুনিয়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। ঈশার প্রতি তাহার অতি আশ্চর্য্য প্রীতি ও ভক্তি ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে খ্রীষ্ট যখন কবর হইতে পুনরুত্থান করেন, তখন প্রথমে মেরীকে দেখা দেন। যেরুযেলম সহরে মেরী ও মার্থা নাম্নী দুইটী দরিদ্র মহিলা বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রতি ঈশার গভীর প্রীতি ছিল। এইরূপ কথিত আছে তাহাদের ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের পুরুষ ও নারী শিষ্যের ব্যবহারের মধ্যে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুরুষ শিষ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থের লোভে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের কারণ হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যখন প্রচার হয়, তখন স্ত্রী জাতির নিকট হইতে ইহা অনেক সাহায্য পাইয়াছে। এখন খ্রীষ্টধর্ম্ম পণ্ডিত দিগের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আজ যে ইহার এত প্রতাপ তাহা অনেকটা মহিলাদের গুণেই বলিতে হইবে। তাঁহারা হৃদয়ে ও গৃহে যত্ন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করিতেছেন।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্ম ত এখন বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি আজও তাহার এত প্রভাব কেন? হিন্দু নারীগণ আজও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মকে এখন ত তাঁহারা প্রাণে পুরিয়া রাখিতেছেন। যে দিন তাঁহারা ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন, সেদিনই ইহার বিনাশ হইবে!

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রথমে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করিতেন বটে, কিন্তু পরিবারে ও সমাজে এ সত্যকে লইয়া যান নাই। তাই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম একরূপ মৃতপ্রায় ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন একা একা স্বর্গরাজ্যে যাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না, পিতা তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বলিলেন বৎসগণ! তোমরা ত আসিয়াছ? আমার কন্যাগণ কোথায়? তাহাদিগকে না আনিলে এ গৃহে তোমাদের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারা দেখিলেন সর্ব্বনাশ! অমনি ফিরিলেন। ছুটিয়া গিয়া ভাই ভগিনীর, স্বামী স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ওগো আমরা তোমাদের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলি, আমাদের সঙ্গে এস তোমরা সঙ্গে না এলে আমরা পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না। তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজে রমণীগণের সমাগম হইল। তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের বলও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একথা সত্য বটে, যে ভগিনীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি আজও ভাল করিয়া লাগে নাই, তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ দুর্ব্বল ভাবে রহিয়াছে। যখন ভগিনীগণের প্রাণে এই অগ্নি লাগিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বল শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। এক প্রাণ হইতে অন্য প্রাণে, সে প্রাণ হইতে আর এক জনের প্রাণে, পত্নীর প্রাণ হইতে পতির প্রাণে, মাতার প্রাণ হইতে সন্তানের প্রাণে ভৃত্যের প্রাণে এইরূপে প্রাণে প্রাণে অগ্নি লাগিয়া ব্রাহ্মসমাজে কি অগ্নিকাণ্ডই উপস্থিত হইবে! দেখ দেখ করিতে করিতে এই অগ্নি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইবে, তখন জগৎবাসী অবাক্ হইয়া এ ধর্ম্মের তেজ দেখিবে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের প্রাণে অগ্নি লাগিয়া তাহারাও জ্বলিয়া

উঠিবে। ঈশ্বর করুন সেই দিন শীঘ্র আসুক। ভগিনীগণ! আপনারা এ অগ্নি প্রাণে না ধরিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্বলিয়া উঠিবে না।"

উপাসনান্তে মহিলাগণের প্রীতি ভোজন হইলে বেলা ৩ ঘটিকার সময় মন্দিরে বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশন হয়। প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। তৎপরে গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে, মহিলাগণের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধ ও সংগৃহীত সদুক্তি সকল পাঠ করেন। তৎপরে বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

বঙ্গ মহিলা সমাজে পঠিত একটী প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পারিবারিক সুখ।

সারি সারি বৃক্ষ, নানা জাতীয় পুষ্প ও ফলে সুশোভিত। পক্ষিগণ ডালে ডালে বসিয়া সুমধুর কলরব করিতেছে। ঐ বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরালে যে সুন্দর কুটীরখানি দেখা যাইতেছে, তাহা সংসার পথে পথিকের গৃহ। বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথিক শ্রান্ত হইয়াছে, চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, তখন সেই কুটীর খানি পথিকের আরামস্থল। পথে কত লোক যাইতেছে, আসিতেছে, কে তাহার গণনা করে; কিন্তু তাহারা কেহ পথিকের দিকে ফিরিয়াও চাহে না, এক বিন্দু সহানুভূতি দিয়া যে তাহার কষ্ট দূর করিবে, তথায় এমন কেহ নাই। তখন কোথায় যাইতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইবে? সেই তাহার শান্তি আলয়ে, সেই কুটীরে। তথায় কত ভালবাসা, কত আনন্দ তাহার অপেক্ষা করিতেছে, তাহার জন্য দিবানিশি কেমন মধুর সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা তাহার আদরের বস্তু সেই কুটীরখানি, সেই গৃহ। এমন গৃহকে মানব কিরূপে সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে?

কেবল কি ধনে মানে পূর্ণ হইলেই গৃহের সুখ হইল? তবে কি পৃথিবীর ধনীরাই পরম সুখের অধিকারী, দরিদ্রেরা কি কেবল দুঃখের ভাগী হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? তাহা নহে। অনেক দরিদ্রের কুটীর দেখিলে শান্তির ছবি বলিয়া মনে হয়, ধনীর অট্টালিকাতেও সচরাচর সেরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে কেবল ঐশ্বর্য্যে গৃহের সুখ হয় না। পারিবারিক ভালবাসা চাই, নিঃস্বার্থভাব চাই। আবার ভাল-বাসার উপর ধর্ম্মের জ্যোতি পাড়িলে তাহা আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়। যে পারিবারিক ভালবাসার উপর বিশ্ব-দেবের আশীর্ব্বাদ পড়িয়াছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। একখানি গৃহ কল্পনা কর, যেখানে প্রতিদিন জনক জননী ও সন্তান, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী সকলে মিলিয়া এক হৃদয়ে সমস্বরে সেই পরম-দেবের বন্দনাগীতি গান করে, পৃথিবীতে এমন সুন্দর দৃশ্য আর কি আছে? সেই ভক্তি-উচ্ছ্বাস প্রণোদিত মিলিত হৃদয়ের বন্দনাগীতি কত মধুর! বহুদিন তাহার স্মৃতি মানব হৃদয়ে থাকিয়া যায়, ভবিষ্যতে সেই শৈশব স্মৃতি কত পাপ হইতে কত প্রলোভন হইতে মানবকে বিরত করিতে পারে। উষাকালে সেই বন্দনাগীতি পক্ষী-কলরবের সহিত মিশ্রিত হইয়া চারিদিকে আনন্দ বর্ষণ করে। আবার দিবা শেষে মৃদু মৃদু সান্ধ্যসমীরণ তাহা ভক্তিভরে বহন করিয়া তাহার প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। আকাশে সান্ধ্যতারকা গুলি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই দেবাদিদেবের শ্রীচরণ নীরবে বন্দনা করে।

বলিতে গেলে পারিবারিক সুখ স্ত্রীজাতির উপর অধিক নির্ভর করে। রমণী গৃহকে শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত এবং সুশাসিত করিবেন, এ কর্ত্তব্য তাঁহার। পুরুষের ক্ষমতা—পুরু-ষের কার্য্য অধিকাংশ স্থলে বাহিরে, রমণীর কার্য্য সাধারণতঃ গৃহে, পরিবার মধ্যে, রমণী গৃহকে শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিবেন, গৃহে শৃঙ্খলা ও সুনীতি বিধান করিবেন। ইহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। রমণী চেষ্টা করিলে গৃহকে স্বর্গতুল্য করিতে পারেন, আবার স্বভাব দোষে তাহা নরকেও পরিণত করিতে পারেন। যে গৃহে রমণীকণ্ঠ হইতে অনবরত কর্কশ বাক্য নির্গত হইতেছে, যে গৃহ কলহ ও অশান্তির চির আবাস বলিয়া অনু-ভূত হয়, তাহাকে মূর্ত্তিমান নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর একদিকে যে গৃহে রমণী নিজ সদ্গুণরাশি দ্বারা মধুরতা ও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন, যে গৃহে নিয়ত আনন্দ সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে, অশান্তি ও কলহ যে গৃহ হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গ বলিব না? পৃথিবীতে আর স্বর্গের ছবি কোথায়? এই দুই খানি চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম, স্বভাবতঃ দ্বিতীয় খানির দিকে সকলের প্রাণ আকৃষ্ট হইবে ইহা নিশ্চয়। কারণ মানব সুখ চায়, দুঃখ চায় না। শান্তি চায়, অশান্তি চায় না। কিন্তু কিরূপে দ্বিতীয় চিত্রখানি ঘরে ঘরে অঙ্কিত হইতে পারে? এ কার্য্য অনেকটা রমণীর আয়াস সাধ্য। তিনিই কেবল স্নেহের তুলিকা হস্তে লইয়া এই স্বর্গের ছবি গৃহে গৃহে অঙ্কিত করিতে পারেন। অনেক স্থলে পুরুষের কঠোর ব্যবহারে পুরুষের অবিবেচনায় গৃহের শান্তি ভঙ্গ হয় স্বীকার করি, কিন্তু সে গৃহের রমণী যদি স্নেহশীলা ধৈর্য্যশীলা হয়েন তবে সে অশান্তি কতদিন থাকে? তাই বলিয়া আমি বলিতে চাহি না যে পরিবার মধ্যে পুরুষের কোন দায়িত্ব কোন কর্ত্তব্য নাই। তাঁহারও গুরুতর কর্ত্তব্য আছে।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে পুরুষ রমণীকে অবহেলা করেন। এ স্থলে রমণীকে প্রপীড়িত এবং পুরুষকে অত্যাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীও নীরবে পুরু-ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। পরস্পরের এইরূপ সম্বন্ধই উভয়ের স্বভাব গঠিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের রমণী অধিক স্নেহশীলা, অধিক ধৈর্য্যশীলা কিন্তু তাঁহার চরিত্রে তেমন উৎসাহ, তেমন তেজস্বিতা নাই। তিনি লক্ষ্যবিহীন, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাবিহীন জীবন বহন করি-তেছেন। একেতো কঠিন অবরোধ প্রথায় রমণী গৃহে আবদ্ধ, তাঁহাতে বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা নাই, তাহার উপর সমাজের অত্যা-চার সহ্য করিয়া করিয়া তিনি যেন নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছেন। পুরুষও অভ্যাস বশতঃ রমণীকে অপেক্ষাকৃত হীন মনে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এরূপ ভাব যতদিন আমাদের দেশে থাকিবে, ততদিন কখনও পারিবারিক সুখ পূর্ণ হইতে পারিবে না। এস্থলে একথা বলা উচিত যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এরূপ ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে।

পুরুষ রমণীকে শ্রদ্ধা করিবেন, রমণীও পুরুষকে সম্মান করিবেন। ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, মাতা পুত্র, পিতা ও কন্যা, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা আবশ্যক, নতুবা পরিবারে সুখ কোথায়? যে পরিবারে পুরুষ রমণীকে অবহেলা না করিয়া শ্রদ্ধা করেন, যেখানে প্রতিকার্য্যে, প্রতিকথায় রমণীর প্রতি তাঁহার সম্মানের ভাব প্রকাশ পায়, সেই পরিবারই সুখী। যেখানে পুরুষ রমণীকে ভার স্বরূপ মনে না করিয়া জীবনপথে তাঁহার সহায় এবং সঙ্গী মনে করেন এবং সর্ব্বকার্য্যে রমণীর সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন সেই পরিবারই যথার্থ সুখী। ভগিনী ভ্রাতাকে, স্ত্রী, স্বামীকে, কন্যা পিতাকে সব সময়, সব কাযে সহানুভূতি ও সাহায্য করিবেন ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। পুরুষ যখন ঘোরতর জীবন সংগ্রামে যুঝিবেন রমণী স্বর্গীয় প্রেম ও সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন, তবেতো স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনি হইবে এবং দেবতারা তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন।

রমণী সহৃদয়া ও সুশিক্ষিতা না হইলে সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের সহিত সহাভূতি করিতে পারেন না। আমাদের দেশে পুরুষগণ কত শিক্ষা লাভ করিতেছেন, এদিকে রমণীরা অজ্ঞানতার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অধিকতর সঙ্কীর্ণা হইয়া পড়িতেছেন, তবে আর উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি কিরূপে হইবে? যখন গৃহে গৃহে স্ত্রীশিক্ষা ভালরূপে প্রচলিত হইবে,তখনই রমণীগণ স্ব স্ব গৃহকে সুখের ভাণ্ডার করিতে পারিবেন। নতুবা নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরিবারে ভালবাসা ও নিঃস্বার্থভাব থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসাই মানবকে নিঃস্বার্থ করে। পৃথিবীতে এমন আর কি আছে, যাহা ভালবাসার ন্যায় মানবকে পবিত্র ও উন্নত করিতে পারে? প্রত্যেকে নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অপরের সুখ সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত থাকিলে পরিবারের সকলেই সুখী হইতে পারেন।

পারিবারিক সুখের জন্য আর একটী জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা উচিত। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই গৃহে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ জন্মায়। সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, জননী তাহা অবহেলা করিবেন না, তেমনি অন্যান্য সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

সন্তানের প্রতি জনক জননীর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। যাহাতে সন্তানের শৈশব জীবনে দুঃখের ছায়া না পড়ে, সর্ব্বদা তাহার জন্য যত্ন করা উচিত। সন্তান শৈশবে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে। ভাবী জীবনে তাহাকে কত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শৈশবের আনন্দ ভরা দিন গুলি মনে করিতেও তাহার একটু সুখ হইবে। সন্তানের সুশিক্ষা চাই! সুশিক্ষার অভাবে সন্তানের চরিত্র যদি মন্দ হইয়া যায়, তবে তাহাতে পারিবারিক সুখের বিচ্ছেদ ঘটে। পিতা মাতার নিকট শিশু যেরূপ শিক্ষা পায়, তাহা সে জীবনে বিস্মৃত হয় না। যে মানব শৈশবে সুশিক্ষা পাইয়াছে, সে কখনও চিরদিনের জন্য হতভাগ্য ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। জীবনের কোন না কোন সময়ে, বহুকাল বিস্মৃত সঙ্গীতের ন্যায় তাহার শৈশব স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে। এবং পাপের পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে। মহৎ লোকের জীবনী অনুসন্ধান করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের শৈশবকাহিনী বোধ হয় সকলেই জানেন। তিনি পিতার পরম যত্নের বৃক্ষটী ছেদন করিয়াও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা পিতার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পিতার আশাতিরিক্ত আদর ও সন্তোষ চিরজীবন তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। তাহাতে যে সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেণ্ট আগষ্টাইনের মাতা মণিকার কথা না জানে এমন কে আছে? পুত্র যখন কুপ্রবৃত্তির পরবশ হইয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মবিরোধী ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল, তখন ধর্ম্মশীলা মণিকা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। স্নেহময়ী জননী সর্ব্বদা পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং যাহাতে ধর্ম্মে তাঁহার মতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। আর নির্জ্জনে বসিয়া সেই অগতির গতি, শরণাগত বৎসল পরমেশ্বরের চরণে অবিরল অশ্রুজল বর্ষণ করিতেন। অবশেষে বিশ্বদেবের সিংহাসন বিচলিত হইল। পবিত্র হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা কতদিন অপূর্ণ থাকে? পুত্রের হৃদয়ের পাপের অন্ধকার দূর হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। আগষ্টাইন খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেই দুরাচারী ধর্ম্মবিদ্বেষী আগষ্টাইন যে পরিণামে সাধুপুরুষ হইয়া সেণ্ট নাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কে মনে করিয়াছিল? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সন্তানের হৃদয়ের উপর পিতা মাতার শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের যেমন প্রভাব এমন আর কিছুরই নহে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে সন্তানের চরিত্র দেবতুল্য হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে এ বিষয়ে অত্যন্ত শিথিলতা দেখিতে পাই। শৈশব হইতে সন্তানের চরিত্রকে সুগঠিত করিতে না পারিলে পরিবারে স্থায়ী সুখ কোথা হইতে হইবে? অন্য সর্ব্ব প্রকার সুখ থাকিলেও অগঠিত চরিত্র সন্তানের ভাবী জীবন সুখের গৃহে দুঃখের অন্ধকার আনয়ন করিবে। অতএব সন্তানের সুশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পারিবারিক সুখের জন্য আর একটী গুণ চাই, তাহা না থাকিলে গৃহে সম্পূর্ণ শান্তি থাকিতে পারে না। ইহা বলা বাহুল্য যে সে গুণটী সহিষ্ণুতা সংসারের পথ কোথাও কণ্টক বিহীন নহে। পথে যাইতে যাইতে মানবকে কত বিঘ্ন, কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? জীবন সংগ্রামে যুঝিতে যুঝিতে মানবকে কত আঘাত পাইতে হইবে, তখন যদি তিনি ঈশ্বরে নির্ভর হারাইয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার পতন হইবে। তিনি সংসারে কেবল দুঃখই সঞ্চয় করিবেন! আর যদি তিনি স্বর্গীয় বলে হৃদয় বাঁধিয়া বীরের ন্যায় অবিচলিত চিত্তে সমুদায় সহ্য করিতে পারেন এবং প্রফুল্ল হৃদয় লইয়া স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন,তবেই তাঁহার জয়। পরিবারের সকলেরই সহিষ্ণুতা থাকা অত্যাবশ্যক।

ঈশ্বর যেমন পুরুষের হৃদয়ে তেজ সাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ রাশি দান করিয়াছেন, তেমনি রমণীকে প্রীতি ও স্নেহের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের নিকট

শিক্ষা করিবেন এবং পরস্পরের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।; তাঁহারা হৃদয়ের উদারতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণরাশি দ্বারা সংসারকে সুখপূর্ণ শান্তিপূর্ণ করিবেন, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কিন্তু অনেক স্থলে সুশিক্ষার অভাবে তাঁহাদের হৃদয় এমনি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় যে কোথায় তাঁহারা উদারতার পরিচয় দিয়া সকলকে সুখী করিবেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা আপনাদের চারিদিকে স্বার্থপরতার জাল নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। কেবল যে সুশিক্ষার অভাবই ইহার কারণ তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সুশিক্ষা কি? কেবল কি দুই চারিখানি পুস্তক পাঠ করিলে অথবা কতকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই সুশিক্ষা হইল? তাহা নহে। হৃদয়ের শিক্ষা চাই। যদি স্বগৃহকে সুখ ও শান্তির চির প্রস্রবণ করিতে চাও তবে তোমার হৃদয়কে এত প্রশস্ত কর যেন অখিল জগতকে হৃদয়ে ভরিয়া ভাল বাসিতে পার।

বিদেশ হইতে সমাগত বন্ধুগণের বাসের জন্য যে বাটী ভাড়া করা হইয়াছিল সেই বাটীতে অদ্য প্রাতঃকালে পুরুষদিগের জন্য উপাসনা হইয়াছিল। গয়া হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। তিনি উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সার এইরূপ।

"পুরাণ-বর্ণিত বলিরাজার যজ্ঞে বামন ভিক্ষার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কল্পতরু হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যে যাহা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবেন এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কশ্যপ প্রজাপতির পুত্র বামন যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া রাজসমীপে স্বীয় ক্ষুদ্র পদের তিন পদ পরিমাণ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। সভাস্থ সকলে শিশুর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পরিহাস করিতে লাগিল। কিন্তু বামন সেই তিন পদ পরিমাণ ভূমি ভিন্ন অন্য কিছু লইলেন না। রাজা তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অবশেষে দুই পদ পরিমাণ ভূমি দিতেই সমস্ত রাজ্য ফুরাইল, ও তখন তিনি আপনার হৃদয় ভূমি দান করিয়া চিরপদানত হইয়া রহিলেন। আমাদের এই উৎসবযজ্ঞে আমাদের উপাস্য পরম দেবতা কি আমাদের কাছে কিছু চাহিতেছেন না? হাঁ, তিনি একটু স্থান চাহিতেছেন। হৃদয়ে একটুমাত্র স্থান চাহিতেছেন। এই একটু স্থান যিনি দিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন কিরূপ সর্ব্বগ্রাসী এই জীবন্ত ব্রহ্ম। কিরূপ দুর্জ্জয় শক্তির সহিত তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে আপন অধিকার বিস্তার করেন, তাহা তাঁহার উপাসক অনুভব করিয়া অবাক্ হন। সফল তাঁহারই উৎসব যিনি হৃদয় রাজ্যের অধিকার এই সুন্দর দেবতাকে দিয়া আপনি তাঁহার দাস হইবেন।"

অদ্য সায়ংকালে ৬॥ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভ্যগণ যথাসময়ে মন্দিরে সমাগত হইলে প্রথমতঃ উপাসনা হয়। তৎপর বাবু হীরালাল হালদার মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১২শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। কার্য্য বিবরণ পাঠ হইলে, উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তদ্বিষয়ে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপর কার্য্যবিবরণ আবশ্যকানুরূপ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশের সহিত গৃহীত হয়।

কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তৎপর বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কর্ম্মচারীনিয়োগ, অধ্যক্ষ সভার সভ্য-মনোনয়ন এবং একেশ্বরবাদী সমাজ সকল ও বিলাতস্থ আমাদের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীমতী কুমারী কলেটকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। সমাজের প্রচারকগণ, গতবর্ষের কর্ম্মচারীগণ এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদীর লেখকগণকেও ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। তৎপর নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনের দিন বিজ্ঞাপিত হইয়া এবং অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইবার জন্য স্থগিত অধিবেশনের দিন স্থিরীকৃত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার সার এই—

ভারতের নানা স্থান হইতে যে সকল বন্ধুগণ একেশ্বরবাদীদিগের মহাসমিতিতে—মাঘের এই মহোৎসবে যোগদান করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ধনের লোভে বা কোন প্রকার পার্থিব লাভের আশায় আমরা হেথায় মিলিত হই নাই—কিন্তু প্রেমের টানে ধর্ম্মের বাঁধনে আজ প্রাণে প্রাণে গাঁথিতেছি। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্ব প্রথমে এদেশে জাতীয় সম্মিলনের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেন; ভারতবাসীদিগের মনে রাজনৈতিক মহাসমিতির ভাব জাগিবার বহু পূর্ব্ব হইতেও ব্রাহ্মসমাজের এই মহা সম্মিলন প্রতিবৎসর হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমিতি রাজনৈতিক সমিতির অগ্রবর্ত্তী হইবে, ইহাই চাই; ঈশ্বরের বিজয় পতাকা রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রে উড্ডীন হইবে, এই চাই।

হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে মিলিত হয়—আত্মার ক্ষুধা যেথায় মিটে—যে মহাসমিতির কথা আলোচনা করিবার প্রারম্ভে একটি প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগাইয়া দিব। গতবৎসরও আমাদের এই মহাসম্মিলন—এই মাঘোৎসব হইয়া গিয়াছে; আসুন আজ একবার ভাবিয়া দেখি সে উৎসবের স্রোত আমাদের জীবনের উপর দিয়া কিরূপে প্রবাহিত হইয়াছে। সে প্রেমের বন্যা কি আমাদের হৃদয়ে সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া ছুটিয়া পলাইল? না—আমরা সেই উৎসবের স্রোতে বহু মূল্য কার্য্যে পরিপূর্ণ জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি? ভগবানের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আমরা সম্মিলিত হইয়াছি,—সুতরাং গতবৎসর আমরা কিরূপ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিয়াছি—কিরূপ প্রেমের ভাব জীবনে পরিণত করিতে পারিয়াছি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিব এবং তদনুযায়ী আগামী বৎসরের জীবন সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইব। তবে আসুন এই উৎসবে—এই নববর্ষের প্রারম্ভে প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে গতজীবনের ত্রুটী সকল সংশোধন করিব, প্রেমের দুর্গে আত্মাকে সুরক্ষিত করিয়া—শান্ত সমাহিত হইয়া—পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সেই শান্ত স্বরূপের সম্মুখে আসিবার উপযুক্ত হইব। তবে আসুন, যদি কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে হৃদয়ে

অপ্রেমের ভাব পোষণ করিয়া থাকি—আজ তাহা দূর করিয়া ফেলি,—প্রেমে গলিয়া প্রেমময়ের সম্মুখে উপস্থিত হই।

ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে আসুন একবার আমাদের প্রিয়সমাজের কার্য্য বিবরণের পর্য্যালোচনা করি। আমাদের শত ক্রটীও দুর্ব্বলতার কথা আমরা বিশেষ রূপে জানি তবুও ভগবানে নির্ভর করিয়া আমরা আনন্দ করি। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল এবং আমাদের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই ভগবানের প্রেম এত অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষার ভিতর দিয়াই মঙ্গলময়ের প্রেম মুখ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল;—ভগবানের নাম মহিমান্বিত হউক; আমাদের সমাজের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছন্দে তাঁহারই অজস্র করুণা দেখিতে পাই। আমাদের এ শিশু সমাজের জন্ম সময়ের সে বিপদ দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ আছে—চারিদিকে নিরাশার ঘন আঁধার ইহার জীবন আকাশকে ছাইয়া ছিল—কিন্তু ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হইল, সে সকল ভয়াবহ বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিবার জন্য ভগবান্ আমাদের প্রাণে আশা ও হৃদয়ে বল দিলেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে ভগবান আমাদের এই ক্ষীণ চেষ্টার ভিতর দিয়াই দেখাইলেন যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীই ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসন প্রণালী। এ সময়ে যাঁহারা আমাদের সফলতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আজ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া দেখাই ভগবানের কৃপায় আমাদের প্রিয় সমাজ এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে—আজ তাঁহাদিগকে প্রেমভরে আহ্বান করি—আসুন আমাদের স্কন্ধের পার্শ্বে স্কন্ধ পাতিয়া—আমাদের শক্তি মিলাইয়া ভারতের উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হই।

কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রকাশ করা হয়। সেই সকল কথা পূর্ব্বে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিকট জ্ঞাপন করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রচারক অথবা অন্য যে কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানের নাম প্রচারে এবং তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আজ এই সভার পক্ষ হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানাইতেছি। তাঁহাদের নাম কার্য্যবিবরণে প্রকাশিত হউক বা না হউক তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ স্বর্গের ইতিহাসে ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ সযতনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইতেছে। ভগবান তাঁহার ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে এরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মীবৃন্দ দিয়াছেন, তজ্জন্য আজ কৃতজ্ঞ হইতেছি। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমার মনে হইতেছে যে, কার্য্যবিবরণে কোথায় কোন দিন কি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে প্রভৃতি বিষয় এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না লিখিয়া বরং প্রচারের ফল কিরূপ হইতেছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদার সত্য সকল লোকে প্রাণে ধারণ করিতে কত দূর সমর্থ হইতেছে তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রচারকগণ কত মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিলেন তাহা জানিতে ব্যগ্র নহি। কিন্তু কতদূর ভগবানের রাজ্য বিস্তারিত হইল—কতগুলি জীবনের গতি ফিরিয়া স্বর্গোন্মুখীন হইল—কতগুলি আত্মা পাপের সাগরে ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পাইল, তাহা জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করি।

গত বৎসর ইংলণ্ড ও বাগআঁচড়ার প্রচারের বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছিলাম—এবৎসর মধ্যভারত যাত্রা ও খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারের প্রতি আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল প্রতি পদক্ষেপে আমরা টলিয়া থাকি, কিন্তু ভগবান দুর্ব্বলের ভিতর দিয়াই তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন। তাঁর কৃপায় শিশু জ্ঞানের কথা কয়—আমাদের অস্ফুট ভাষাতেই তিনি তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। অসংখ্য দুর্ব্বলতা সত্বেও বঙ্গদেশবাসীগণই ভগবানের কৃপায় প্রথম একেশ্বরবাদের আলোক পাইয়া দেশের সর্ব্বত্র তাহা প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছেন। কে জানে কে সে ধর্ম্মের বর্ত্তিকা ধারণ করিবে, যাহার উজ্জ্বল রশ্মি ভারতের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সকল আঁধার ঘুচাইবে? আমার বোধ হয় আমাদের সমাজ হইতে এই প্রথম মধ্যভারতে প্রচার যাত্রা হয় এবং এই প্রথম বারেই তথাকার একজন রাজার সহানুভূতি এতদূর পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তিনি সমাজের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন; এজন্য তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাগআঁচড়া প্রচার সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, গতবৎসর ইংলণ্ডে প্রচার যাত্রা ও বাগআঁচাড়ায় ভগবানের একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি, এ বৎসর খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারের কথা স্মরণ করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ কার্য্য হইয়াছে তাহাতে খাসিয়াদিগের মনের উর্ব্বরতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি খাসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তথায় ৩টী ব্রাহ্মসমাজও স্থাপিত হইয়াছে। আমি যে সময়ে ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তখন সমাজ মন্দিরের অবস্থা অতি জীর্ণ ছিল, কিন্তু খাসিয়াদিগের মুখ হইতে যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতার নাম গভীর শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারিত হইতে শুনিলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তথায় সুস্পষ্ট জানিলাম। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত কি এখানে দেখিতে পাইতেছি না? ভাবার অজ্ঞতা বিশ্বাসীর কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারে না। বিশ্বাসে "অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে"। আমি বিশ্বাস করি যে সকল ভাই প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা ভগবানের কৃপার প্রতি অটল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। আমাদের সমাজ আবালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে ভগবানের কৃপা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। বালক বালিকাদিগের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, যুবকদিগের জন্য ছাত্রসমাজ, মহিলাদিগের জন্য বঙ্গমহিলা সমাজ প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানেই আশাজনক ফল লাভ হইতেছে। রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যা-

লয়ের প্রসঙ্গে যে সকল মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। মহিলাদিগের মনে ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিবার বাসনা দিন দিন জাগিতেছে ইহা বড়ই আনন্দজনক ও আশাপ্রদ।

বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে এ বৎসর পুস্তক প্রচার বিভাগের আশাজনক কার্য্য হয় নাই; খাসিয়া ভাষার কয়েকখানি পুস্তক ব্যতীত আর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুলেখকের বিশেষ অভাব নাই, তবে এই বিভাগের কার্য্য এরূপ সামান্য হইল কেন? ভারতের কোটী কোটী লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব। আমার বোধ হয়, মহৎ জীবনী সংগ্রহ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এবং অনুষ্ঠানের উপযোগী প্রার্থনা সংগ্রহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক বহুল পরিমাণে প্রচার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আর একটি ক্ষোভের বিষয় এই যে বালক বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগের নিতান্ত অভাব রহিয়াছে। বালক বালিকারা আমাদের সমাজের ভাবী আশা তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার উপর আমাদের সমাজের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, এ বিষয়ে আমাদের উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমি আশা করি ব্রাহ্মদিগের আলোচনা সভায় এই বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যের বন্দোবস্ত হইবে।

গত বৎসর আমাদের সভ্য সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপিও তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। নানা কারণে আমাদের সভ্য সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। ভারতের একেশ্বরবাদ যাহাতে সুদৃঢ় অধিকার লাভ করে তজ্জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যাহাতে প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা;—আমি সকল সভ্যকে অনুরোধ করি, যাহাতে প্রতিবৎসর প্রত্যেকে অন্ততঃ একজন সভ্যের নাম তালিকাভুক্ত করাইয়া দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন।

উপসংহার কালে, বোম্বেনগরের একেশ্বরবাদীদিগের মহাসমিতির গত অধিবেশন ও কলিকাতায় ইংরাজ একেশ্বরবাদীদিগের সমাজের কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি; একেশ্বরবাদ যে জীবন্ত ধর্ম্ম, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ইহা প্রচারিত হইবে, তাহারই লক্ষণ সকল আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি। আমরা আশা করি আগামী বৎসরে প্রেম ও একতার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইব। আসুন তবে হৃদয় মন্দিরে সেই প্রেমময়ের পূজা করি। পিতার অপার করুণায় আমাদের সকল ক্ষোভ দূরে যাইবে। আমাদের সকল অভাব ও বিপদের কথা তিনি জানেন এবং তিনিই তাহা অতিক্রম করিবার বল দিবেন। স্বর্গের আলোক আমাদের পথ প্রদর্শক হইবে এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে, ভগবানের কৃপায় নির্ভর করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যে আমরা জীবন উৎসর্গ করি।

১০ই মাঘ।

অদ্যকার প্রাতঃকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দিনেই আমাদের উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবও এই দিনই সম্পন্ন হয়। অতি প্রত্যুষে সকলে মন্দিরে সমাগত হইতেছিলেন। সংকীর্ত্তন ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এই বেলার উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মিত উপাসকগণ, ব্রহ্মসাধকগণ, আপনারা নিয়মিতরূপে উপাসনা করেন, উপাসনার উপকারিতা, উপাসনার মাধুর্য্য, উপাসনার সুখ আপনারা বেশ জানেন, যদি আজ এই মাত্র প্রথম দিন উপাসনা করিতেন তবে বিশেষ করিয়া উপাসনার কথা বলিবার প্রয়োজন হইত। এখন উপাসনাই যে প্রমত্ত হইবার প্রধান উপায় তাহাই আলোচনা করা যাউক।

আজ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, ভজনালয় না থাকিলে উপাসকগণের কি ক্লেশ হয়, তাহা আমরা বেশ জানি, আজ মনে কত আনন্দ হইতেছে, এত বড় গৃহেও এখন লোক ধরে না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

আপনারা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া তাঁহার ভজনায় যে মত্ত হইতেছেন, তাহার বিশেষ চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতেছে, নামে রুচি বাড়িতেছে। ব্রহ্মনাম-সুধা পান করিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল, ইহাতেই বুঝিতেছি আপনারা মত্ত হইয়াছেন। আরও মত্ত হইবেন। আজ ১০ই আগামী কল্য সেই প্রিয় দিবস ১১ই মাঘ। আপনারা খুব মাতামাতি করিবেন। কিন্তু মত্ততার সময় খুব সাবধান হইতে হইবে। গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে হইবে, অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সব ত্রুটী অপরাধ দেখিয়া সেই সকলকে ঈশ্বরের নিকট বলীদান করিতে হইবে।

লোকে কিছু পান করিয়া তবে মাতাল হয় কিন্তু এমনও দেখা যায় অনেকে খেয়ে মাতাল আবার অনেকে না খেয়ে মাতাল হয়। এই সাধু সঙ্গের এমন গুণ যাঁহারা ব্রহ্মসুধা পান করিয়া মাতাল হইলেন তাঁহাদের সঙ্গেও মন মাতিয়া উঠে। সঙ্কীর্ত্তনের রোলেতে খোল করতালের ধ্বনিতে আচার্য্যের কবিত্বে ও উৎসাহ জনক বাক্যেতে মন মাতিয়া উঠিবে। কিন্তু না খেয়ে মাতাল হইলে ঠকিতে হইবে, সত্যই বলিতেছি এরূপ ভাবে অনেকবার ঠকিয়াছি। নিজে খেয়ে মাতাল হও।

মাতাল দুই প্রকার, এক প্রকার মাতাল যতই পান করুক না কেন কিন্তু নিজকে হারায় না। নিজের অন্তর পরীক্ষা করে এবং প্রশান্ততা রক্ষা করে এবং রিপু সব বলিদান করিতে সক্ষম হয়। অন্য রূপ মাতাল যাহাকে পেচি মাতাল বলে অতি অল্পেই তাহারা অস্থির হয়। নিজকে আর দেখিতে পারে না, ভিতরে আর প্রবেশ করিতে পারে না, নিজে অস্থির হয় এবং অন্য লোকদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, প্রত্যেক সাধককে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মত্ততার সময় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। প্রশান্ততাকে রক্ষা করিতে হইবে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া একএকটী আসক্তি বলিদান করিতে হইবে। এখানে এমন যোগী ও ভক্ত আছেন যাঁহাদের মুখ দিয়া মত্ততার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু বাহিরে কোন অস্থিরতা নাই, সেই রূপ হইতে হইবে।

মত্ততা রক্ষা করিবার প্রধান উপায় পুনঃ পুনঃ পান করা, যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাকে কোন না কোন উপায়ে প্রাণে রাখিয়া সেই সুধা পান করিতে পার, তাহা করিবে। আরাধনা কর, নাম জপ কর, প্রার্থনা কর, কীর্ত্তন কর এবং সেবা কর; যে কোন উপায়ে তাঁহাকে প্রাণে রাখ, তাহা হইলেই মত্ততা রক্ষা করিতে পারিবে।"

দয়াময় তাঁহার উৎসবে মত্ত করিয়া, আমাদিগকে সমুদয় আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করুন এই প্রার্থনা।

অদ্য অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদনুসারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার পর হইতেই মন্দিরে লোক সমাগম হইতেছিল। ৩টার পর সকলে একত্রিত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গমন করিলেন। সেখানে বেলা ৪টার পর হইতে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজী এবং তৎপরে বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। পরে প্রার্থনা হইয়া নিম্নলিখিত নূতন সংকীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে গায়কগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট, পুনরায় কলেজ ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে সমাগত হইলেন। কীর্ত্তনকারী দল মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছুকাল মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইল এবং তৎপর সায়ংকালীন উপাসনা হইল। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশ লিখিত না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

নগর সংকীর্ত্তনের গানটি এই—

তাল তিওট।

ভুলে কত দিন ভবে রবে বল না। (নগর-বাসিরে)
আর কত কাল পাবে এ ঘোর যাতনা।
বিষয়-বিষের নেশায়, জনম বয়ে যায়,
ঘোর মোহে পড়ে দেখেও দেখ না:
আগুন জ্বালিয়ে নিজের হাতে, রাত্রি দিন পোড় তাতে
(মরি হায় রে)
কর হাহাকার কেন (বিষয় মরীচিকায় পড়ে রে) না হয় চেতনা

তাল যৎ।

ও ভাই জেন মনে, (আর গতি নাই নাই রে) প্রেম বিহনে,
এ জীবনে পাবে না পাবে না শান্তি পাপের দহনে।
ডুবে বিষয়-বিষে (একবার ভেবে দেখ রে) বল কিসে,
তোদের যুড়াবে তাপিত প্রাণে?
সেই প্রেমদাতার (অকিঞ্চন হয়ে রে) শ্রীচরণে,
সঁপরে ভাই (চির দিনের মতরে) দেহ মনে,
তাঁর অপার করুণা-গুণে, পাবে পাবেরে সেই প্রেমধনে।
(আর ভয় নাই রে)।

তাল খয়রা।

ত্রাণ যদি পাবে, (শুধু কথায় কিছু হবে নারে) প্রাণ দিতে হবে,
নতুবা এ জ্বালা যাবে না।
ও ভাই প্রেমের অনলে, (আহুতি না দিলে রে) নিজে না দহিলে
সে দ্বারে পশিতে পাবে না। (জেন জেন মনে)
ও সেই শান্তিধামে (সবে মিলে চল রে) একা যায় না যাওয়া,
একা ডাকিলে দেখা হবে না। (জেন জেন মনে)
তাই প্রেম-ডোরে (এক হৃদয় হয়ে রে) বাঁধ পরস্পরে,
বেঁধে কর রে সত্য সাধনা। (যদি ত্রাণ পাইবে)
তোদের প্রাণে প্রাণে (ব্রহ্ম নামের গুণে রে) শক্তি জ্বলে উঠুক
দূরে যাক্ সব পাপ-বাসনা। (পতিত পাবন-নামে)

তাল খেম্টা।

ব্রহ্ম-প্রেম-সুধারস কর সবে পান,
মধুর সে সুধারস, অমিয় সমান। (নব জীবন পাবে সবে রে)
যে প্রেম পরশে জীব পায় দিব্য জ্ঞান; (মানব দেবতা হয় রে)
যে প্রেমে পাপের অগ্নি হয় রে নির্ব্বাণ। (জ্বালা দূরে যায় রে)
যে প্রেমে জগত মিষ্ট, তুষ্ট মন প্রাণ; (প্রেমানন্দের উদয় হয় রে)
যে প্রেমে সকল দুঃখ হয় অবসান; (ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যায় রে)
যে প্রেমে ভকতবৃন্দ পিপাসিত প্রাণ; (সুধা পানে মত্ত সদা রে)
সুর-নরে সদাই করে যাঁর গুণ গান। (জয় জয় ব্রহ্ম বলে রে)
প্রেমের জয় বল সবে হয়ে একতান। (প্রেমের জয় হবেই হবে রে)
(গগন কাঁপায়ে বল রে) (ভেদাভেদ চলে যাবে রে)
মিল। দেখ দেখ নাথ দীন জনে, (মোরা) যাচিছে শ্রীচরণে,
(কাতর হয়ে হে) দেও প্রেম ধন প্রেমময় করি প্রাণদান।

১১ই মাঘ।

ক্রমে সেই দিন উপস্থিত হইল যে দিনের জন্য ব্রাহ্মগণ আশা ও উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১লা মাঘ হইতে ১১ই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া করিয়া আরও প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত ১০ই মাঘের দিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেমন সাগরের বিপুল জলরাশি হইতে বাষ্পকণাসকল বায়ুবলে উড়িয়া আসিতে আসিতে একস্থানে জমা হইতে থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে জলধারারূপে ধরাতলে পতিত হইয়া থাকে এবং পতিত হইয়া ধরার উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করিয়া থাকে, তেমনই এই কয় দিন যেন ব্রহ্মকৃপার পবন বহিয়া বহিয়া ব্রহ্ম-প্রেমসাগর হইতে অমৃতকণা সকল সঞ্চিত হইতেছিল, যেন তাহা জমাট হইতেছিল. ১১ই মাঘে সমবেত আকুল-প্রাণ দানহীন তপ্ত হৃদয় সকলের সম্মিলিত ব্যাকুল প্রার্থনার সূত্র ধরিয়া ক্রমে তাহা হইতে প্রচুর বারি বর্ষিত হইতে লাগিল। আমাদের স্নেহময়ী জননীর আশ্চর্য্য কৃপায় তাঁহার প্রেমবারি আস্বাদনে সকলের প্রাণ সেই শুভ সময়ে স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়াছিল।

১০ই মাঘের রাত্রি ৪টা বাজিতে না বাজিতে ব্রাহ্মগণ উপাসনালয়ে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ৫টার পূর্ব্ব হইতেই মন্দিরে কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিয়াছিল। ক্রমে ৬টার পূর্ব্বেই উপাসক এবং উপাসিকাগণে মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল। সুগায়কের সুমধুর কণ্ঠ হইতে মধুর সঙ্গীত ধারা বর্ষিত হইয়া সকলের প্রাণ বিমুগ্ধ হইতেছিল। এইরূপে যথাসময়ে আচার্য্য

বেদী গ্রহণ করিয়া অতি ব্যাকুল ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। উদ্বোধনের সূচনাতেই উৎসবের উপাসনার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছিল। তখন হইতেই ব্যাকুল আত্মাগণের প্রাণের ক্রন্দন ধ্বনি মহারাজরাজেশ্বরের সিংহাসন স্পর্শ করিতেছিল। তিনি যেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আকুল-প্রাণদিগের আকুল প্রার্থনা তাঁহাকে যেন সকলের প্রাণে টানিয়া আনিতেছিল, তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা সম্ভোগ করিয়া সকলের প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। আরাধনা চলিতে লাগিল ক্রমে এমন উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হইল যে আচার্য্য কথা দ্বারা উপাসনা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। অমনি সঙ্গীত হইতে লাগিল। আচার্য্য সেই দিন আর সাধারণ প্রার্থনা করিবারও সুবিধা পাইলেন না। এই ভাবে উপাসনা শেষ হইলে শাস্ত্রী মহাশয় নিম্ন লিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন।—

"যেখানে জীবন সেই খানেই যোগ। যতক্ষণ প্রাণী জীবিত আছে, ততক্ষণ তাহার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কি সুন্দর আত্মীয়তা। পা খানি হাত খানি হইতে কত দূরে আছে, পা খানি কিছু হাত খানির কাজ করে না; কিন্তু হাতখানিকে ক্লেশ দেও দেখি,হাত খানিকে কাট দেখি,পা খানিরও মহা অসুখ উৎপন্ন হইবে। পা আর ভাল করিয়া চলিতে চাহিবে না। চলিয়া আরাম পাইবে না। পা বলিবে, আমার "ভাই" হাত কাটা পড়িয়াছে, আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এইরূপ কর্ণের অসুখ হইলে চক্ষু সুন্দর বস্তু দেখিতে চায় না, দেখিয়া সুখী হয় না; দন্তের যাতনা হইলে তাহার প্রতিবেশী রসনা আর মধুর দ্রব্য আস্বাদন করিয়া সুখী হয় না। কি আশ্চর্য্য আত্মীয়তা, কি আশ্চর্য্য সম দুঃখ সুখতা। কিন্তু জীবনটা একবার যাউক—সেই সুন্দদেহ পূতিগন্ধময় হইবে, তখন পা দেহ হইতে খসিয়া পড়িলে, বলিবে আর "হাতের" সঙ্গে একদেহে থাকিব না, হাত খসিয়া পড়িয়া যাইবে, কর্ণ খসিয়া গলিয়া পড়িবে, চক্ষু তাহা গ্রাহ্যও করিবে না। যেখানেই মৃত্যু সেই খানেই যোগের বিচ্ছেদ। কেবল যে জীবদেহে এইরূপ তাহা নহে, উদ্ভিদ রাজ্যেও যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ যোগ। পিঁয়াজটী যতক্ষণ জীবিত অর্থাৎ কাঁচা আছে, তাহার দলগুলিকে একটী হইতে আর একটীকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা কর। বিচ্ছিন্ন করা কিরূপ কঠিন বোধ হইবে, সে চেষ্টাতে তোমার চক্ষে জল পড়িবে। কিন্তু সেই পিঁয়াজটী মরিয়া যাউক অর্থাৎ শুষ্ক হউক দলগুলি আপনাপনি খসিয়া যাইবে, ধরিবামাত্র একটী অপরটী হইতে স্বতন্ত্র হইবে। অতএব যেখানেই জীবন সেই খানেই যোগ।

জীবনের দ্বিতীয় লক্ষণ যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ সৌন্দর্য্য। জীবিত মনুষ্য যতই কদাকার হউক না কেন, তাহার একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে, মৃতের সঙ্গে তুলনা করিলে একথা বুঝিতে পারা যায়। জীবিত মানবের চক্ষের যে জ্যোতি তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। চক্ষে চক্ষে প্রেমের জন্ম হয়, এক চক্ষু হইতে প্রেমের বিজলী অপর চক্ষে ছুটিয়া যায়। ইহার অনেক বর্ণনা কবিগণ করিয়াছেন। চক্ষু নিঃশব্দ ভাষায় কথা কয়, চক্ষু সংবাদ দেয়, ও সংবাদ আনয়ন করে। সে চক্ষুর সৌন্দর্য্য কতক্ষণ? যতক্ষণ জীবন আছে। জীবন বিলুপ্ত হউক—পরম সুন্দর যে তাহার সে শ্রী আর থাকিবে না; মানবের মুখের যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্ধ কবি মিলটন মানব মুখকে, "মানবের স্বর্গীয় বদন" বলিয়াছিলেন, সে ভাব আর লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে না।

জীবনের তৃতীয় লক্ষণ যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ কাজ। হাত হাতের কাজ করে, পা পায়ের কাজ করে, হৃৎপিণ্ড নিরন্তর ব্যস্ত থাকে; শোণিত নিরন্তর ছুটিতে থাকে; অন্তর বাহিরের ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যেই নিযুক্ত থাকে। আবার বিধির এমনি ব্যবস্থা কাজ লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটনা হয় না, হাত পায়ের কাজ করিতে যায় না, পা হাতের কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। যেখানে জীবনীশক্তি সেখানে আলস্য নাই,—আলস্য মৃত্যুর সহোদর; মৃত্যু যখন আসে তখনই ইন্দ্রিয়গণ চির আলস্যে নিমগ্ন হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত সত্যগুলি ধর্ম্মসমাজের প্রতি প্রয়োগ করিলে কি দেখা যায়? দেহের পক্ষে জীবন বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ধর্ম্ম-সমাজের পক্ষে জীবন কি? ধর্ম্ম-সমাজের প্রাণ ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম-শক্তি যতক্ষণ জীবনরূপে বাস করে, ততক্ষণ ধর্ম্ম-সমাজের মধ্যেও এই ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথম সেখানে সকলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব যোগ ও ভ্রাতৃসম্বন্ধ লক্ষিত হয়। তাহাদের প্রাণে প্রাণে এতদূর আত্মীয়তা থাকে যে একজনের ক্লেশে অপরের ক্লেশ হয়। এই যোগের অর্থ এরূপ নয় যে তাহাদের মধ্যে মতগত ও রুচিগত পার্থক্য আর থাকে না। তাহাদের প্রকৃতিগত ও কার্য্যগত সকল প্রকার পার্থক্যের মধ্যেও উদ্দেশ্যগত একতা দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন একবার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিরূপ যোগ স্থাপিত হইবে। প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন দশ খানা যন্ত্র একত্র হইয়া বাজে, তখন যেমন দেখা যায় যে বেহালা বেহালার সুরে বাজিতেছে,এসরাজ এসরাজের সুরেই বাজিতেছে, হার্ম্মোনিয়মে হার্ম্মোনিয়মের সুরই বাজিতেছে, অথচ শুনিতে বোধ হয় যেন একখানি যন্ত্রই বাজিতেছে, সেইরূপ তুমি আমি দশজনে মিলিয়া যখন গান করিব, তখন তুমি বেহালা, আমি এসরাজ, অমুক হার্ম্মোনিয়ম, আমরা গুণ গুণ সুর তুলিব, কিন্তু সেই সমুদায় সুর ঈশ্বর প্রেমে মিলিত হইয়া, এক সুরের ন্যায় তাঁহারই চরণ প্রান্তে পৌঁছিবে। ইহা অপেক্ষা প্রকৃত যোগের সুন্দর দৃষ্টান্ত আর শুনি নাই। ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘুচাইয়া যে যোগ, তাহা সম্ভবপর নহে এবং সম্ভবপর হইলেও প্রার্থনীয় নহে, প্রেমও লক্ষ্যগত যে যোগ তাহাই প্রার্থনীয় ও তাহাই কল্যাণজনক। যতক্ষণ আমরা দশখানি সুরে মিশিয়া এক সুরে বাজিব, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মশক্তি আমাদের মধ্যে বাস ও কার্য্য করিতেছেন, আর যখন দেখিবে দশখানি যন্ত্র দশ রকম সুরে বাজিতেছে, জানিবে সে সকল যন্ত্র ব্রহ্মশক্তির সহিত মিলাইয়া বাঁধা হয় নাই।

ব্রহ্মশক্তির অধিষ্ঠানে যেমন লক্ষ্য ও প্রেমগত যোগ, সেইরূপ কার্য্যক্ষেত্রেও অবিবাদ। জীবিত জীবদেহে হাত যেমন পাকে বলে না তুমি আমার ন্যায় কাজ কর না কেন? সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত সমাজেও জ্ঞানী, ভাবুক কর্ম্মী

ইহাদের মধ্যে বিবাদ থাকে না। সমাজের মধ্যে দেখি কেহ জ্ঞান প্রধান, কেহ ভাব প্রধান, কেহ কর্ম্ম প্রধান। মানবীয় অজ্ঞতাতে জ্ঞানী যিনি, তিনি বিবেচনা করেন, এ ভাবুক লোকটা ইহার মধ্যে কেন? ইহার এখানে প্রয়োজন কি আছে? এ হয় আমার মত হউক, নতুবা ঈশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাউক; ভাবুক যিনি তিনি বিবেচনা করেন, ঐ লোকটা কেন ওরূপ জ্ঞান,জ্ঞান করে,ও ব্যক্তি ধর্ম্ম রাজ্যে কেন? উহার ক্ষেত্র ত জগতে আছে, সেখানে কেন যায় না? এখানে মরিতে থাকে কেন? ও হয় আমার ন্যায় হউক, নতুবা বাহির হইয়া যাউক। কর্ম্মী যিনি তিনি বলেন নর-সেবাই ঈশ্বরের সেবা, সে সেবাতে যার প্রবৃত্তি নাই, তাহার প্রেমের মূল্য কি আছে, ও ভাবুক লোকটাকে আমি দেখিতে পারি না; ও ব্যক্তি ধর্ম্ম রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহার দ্বারা ধর্ম্ম রাজ্যে কি উপকার হইবে? এরূপ ভাবে আমাদের অবিশ্বাসের গভীরতাই প্রকাশ করে। যিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, তিনি কখনই একথা বলিতে পারেন না। তুমি কেহে বাপু, যে খোদার উপরে আবার কারিগরি করিবে। জ্ঞানী তুমি যে কর্ম্মীকে তাড়াইতে চাও, তুমি কি মনে কর, ও ব্যক্তিকে আনা পরমেশ্বরের ভুল হইয়া গিয়াছে? এখন তোমাকে সেই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে? এই বেদীর উপস্থিত পুষ্প গুচ্ছটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা কর, যদি ইহার সমুদায় ফুলগুলি গোলাপ হইত, যদি সমুদয়গুলি এক বর্ণের এক আকারের ও এক গন্ধের হইত, তাহা হইলে এটী এত স্পৃহনীয় হইত কি না? কখনই না। কিন্তু যে মালী এটীকে করিয়াছে সে বুদ্ধিমান্, কারণ সে নানা বর্ণের, নানা আকৃতির, নানা গন্ধের ফুল ইহাতে দিয়াছে, তাহাতে ইহার বিচিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। সেইরূপ মনে কর, যে অনন্তলীলাময় মালী এই ব্রাহ্মসমাজটীকে একটী পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় বাঁধিতেছেন, তিনি গূঢ় কল্যাণোদ্দেশেই বিচিত্র ভাব ও বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেই ইহার মধ্যে আকৃষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী ভাই, তুমি এই তোড়াতে থাকিবে, কর্ম্মী ভাই, তুমি ঐ ভাবুকের পাশেই বসিবে। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে। তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু অনুদার ও অক্ষমাশীল হও, তাহাতে প্রকাশ পাইবে যে ব্রহ্মশক্তি জীবন-রূপে তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন না।

জীবনের তৃতীয় লক্ষণ সৌন্দর্য্য; কিন্তু ধর্ম্ম সমাজের সৌন্দর্য্য কি? ধর্ম্ম সমাজের কোন্ ভাব দেখিয়া জগৎবাসির মন আকৃষ্ট হয়। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম প্রভৃতিই ধর্ম্ম সমাজের মুখশ্রীর শোভা। ধর্ম্ম সমাজের অনেক প্রকার বাহিক শ্রী সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে। আমাদের এই মন্দিরটী কেমন সুন্দর; এখানে অনেকে কেমন সুন্দর সাজিয়া আসেন; কেমন বড় বড় গাড়ী দ্বারে দাঁড়ায়। এ সকল বাহিক শোভার দিকে যাহার দৃষ্টি আবদ্ধ সে মূর্খ। এই বাহ্য শোভার মধ্যেও মৃত্যুর কদর্য্যতা লুকাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যে পরিমাণে আমাদের সমাজ মধ্যে বৈরাগ্য আত্ম-সংযম ও পবিত্রতার লক্ষণ সকল লক্ষিত হইবে ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্ম-শক্তি আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে প্রশ্ন এই, ব্রহ্ম-শক্তি কি হইলে আমাদের মধ্যে বাস করিতে পারেন? তাঁহার আবাহনের মন্ত্র কি? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে কি ইহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়? খৃষ্টধর্ম্মের আদিম ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্ট ধর্ম্ম যে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ ধর্ম্ম যখন প্রথমে প্রচারিত হইল, তখন জেলে মালার দ্বারাই প্রচারিত হইল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহাকে দুইটী প্রবল শক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম তদানীন্তন রোমীয় সভ্যতা, দ্বিতীয় গ্রীস দেশের পাণ্ডিত্য। এই দুইটী দুইটী প্রাচীরের ন্যায় সেই নবোদিত ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হইল। রোমকগণ কেবল যে ঘৃণার চক্ষে ইহাকে দেখিতেন তাহা নহে, পদ দ্বারা দলন করিবারও চেষ্টা করিতেন; গ্রীক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ইহাকে অজ্ঞের জল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু চরমে তাঁহাদিগকে ইহারই নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল। এত বড় শক্তি কোথা হইতে আসিল? কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখা যায় যীশুর প্রথম শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর আপনাদের বুদ্ধি বা বলের উপর নির্ভর না করিয়া দিবারাত্রি ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং আপনাদের মধ্যে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে, যে কেহ তাহাদের মণ্ডলীতে প্রবেশেচ্ছু হইবে তাহাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ধন তাঁহাদের সাধারণ ধনাগারে দিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য স্বার্থনাশের কথা। এরূপ কার্য্য প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কি না সে প্রশ্নের বিচার এখন করিতেছি না। কিন্তু এই নিয়মের নিঃস্বার্থতার ভাব সকলে একবার গ্রহণ করুন; এবং আপন আপন হৃদয় দিয়া তুলনায় বিচার করুন। ব্যাপারটা যে কত কঠিন তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। আমাদের মধ্যে প্রস্তাব হইয়াছে যে যাহার মাসিক আয় ২৫৲ টাকার অল্প তাহাকে টাকা পিছু এক পয়সা করিয়া সমাজের জন্য দান করিতে হইবে এবং যাহাদের আয় ২৫৲ টাকার অধিক তাহাদিগকে টাকা পিছু দেড় পয়সা করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় যাহা করিয়াছে ও প্রতিদিন করিতেছে তাহার সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নয় বলিলেও হয়, অথচ দেখা যাইবে কত সময় হস্ত ইহাতে সঙ্কুচিত হইবে। সুতরাং আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যীশুর আদিম শিষ্যগণ কিরূপ নিঃস্বার্থতার অগ্নিতে উদ্দীপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মণ্ডলী সংক্রান্ত আর একটী ঘটনা আছে, তাহা হইতেও অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের মণ্ডলী যখন বাড়িতে লাগিল, তখন প্রথমে যীশুর দ্বাদশ জন প্রেরিত শিষ্যই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যা করিতেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অভিযোগ ও অসন্তোষের ধ্বনি, শ্রুত হইল, গ্রীকবাসী য়িহুদী শিষ্যগণ বলিতে লাগিল যে, তাঁহাদের বিধবাদিগের প্রতি প্রেরিতদিগের যথেষ্ট মনোযোগ নাই। ইহা শুনিয়া প্রেরিতগণ কি করিলেন? তাঁহারা কি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, “কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমরা প্রেরিত,আমাদের প্রতি দোষারোপ? আচ্ছা,তোমরা অভিযোগ করিয়া কি করিতে পার

দেখি। তাঁহারা এরূপ বলিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মণ্ডলীর সকল লোককে সমবেত করিয়া বলিলেন যে, ধর্ম্ম প্রচারে ও ধর্ম্ম সাধনে আমাদের অনেক সময় যায়, আমরা মণ্ডলীর পার্থিব পরিচর্য্যার সময় পাইতেছি না। অতএব তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সাত জনকে প্রতিনিধিরূপে মনোনীত কর, তাঁহারাই আমাদের সহকারী হইয়া পার্থিব বিষয়সকল দেখিবেন, তদনুসারে ৭ জন ব্যক্তি মণ্ডলীর দ্বারা মনোনীত হইলেন। ইহাকেই বলে নিয়মতন্ত্র প্রণালী। নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিরোধী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করুন। কিন্তু ইহা হইতে আমরা যে উপদেশ লাভ করিতেছি তাহা এই—যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ যদি আপনাদের মস্তক অবনত না করিতেন, যদি আপনাদিগকে হীন করিয়া তাহাদের সমাজের কার্য্যকে উচ্চস্থান না দিতেন তাহা হইলে, সেখানে শান্তি স্থাপন হইত না।

অতএব ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্ম শক্তির লীলা দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে দুইটি কার্য্য করিতে হইবে, প্রথম, কায়-মন-প্রাণে বিশ্বাসের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, প্রার্থনাকে একমাত্র সম্বলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের নিকটে আপনার মস্তককে সর্ব্বদা অবনত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্ম শক্তি আমাদের অন্তরে বাস করিবেন, আমাদের মধ্যে যোগ, পবিত্রতা ও সদনুষ্ঠান সমুদায় প্রস্ফুটিত হইবে।"

উপদেশের পর আবার আকুল প্রাণের প্রার্থনা উত্থিত হইল। সংগীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া আসিল। এই ৬।৭ ঘণ্টাকাল এমন ভাবে কাটিয়া গেল যে মনে হইল ২।৩ ঘণ্টার অধিক উপাসনাদিতে যাপিত হয় নাই। তৎপর বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য কিছুকাল মন্দিরের জনতার হ্রাস হইয়া গেল তখন মন্দিরের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে শ্লোক সকল পঠিত হইতেছিল। বেলা ১টার সময় আবার আধ্যাত্মিক উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই—

"মানুষের দেহের মধ্যে প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা সার ও মূল্যবান্ পদার্থ। মানুষ আহার করে, পরিশ্রম করে, বিশ্রাম করে, রোগ হইলে ঔষধ সেবন করে, সকলই এই প্রাণ রক্ষার জন্য। প্রাণ থাকিলেই শরীরের শ্রী সৌন্দর্য্য শক্তি কার্য্য সকলই থাকে। প্রাণ গেলে শরীর ও একখণ্ড কাষ্ঠ লোষ্ট্রে প্রভেদ কি? এই প্রাণ যে মানুষের প্রিয় হইবে এবং ইহার জন্য মানুষ যে আর সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যদি প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাতেই লাভ হইল। যদি একখান হাত কি পা কাটিয়া ফেলিয়াও প্রাণটা বাঁচে, তাহাতেও লোকে কুণ্ঠিত হয় না। প্রাণ যে বড় প্রিয় বস্তু—বড় সার বস্তু—বড় মূল্যবান্ বস্তু—ইহার সহিত পৃথিবীর অন্য বস্তুর তুলনা হয় না। কিন্তু এই প্রাণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বস্তু কি কিছু নাই? দেহের যেমন প্রাণ সেইরূপ এই প্রাণেরও আবার প্রাণ আছে। প্রাণের প্রাণ যে বস্তু, তাহা কত সার, কত মূল্যবান্ ও কত প্রিয়! প্রাণের মধ্যে সেই বস্তু আছে বলিয়া প্রাণের স্থিতি, শক্তি, চৈতন্য, কার্য্য, আরাম ও সুখ সকলই সম্পন্ন হইতেছে। প্রাণ অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম বস্তু, অথচ তাহার প্রভাব কত? এই প্রাণের প্রাণ আরও অদৃশ্য, আরও সূক্ষ্ম, তাহার প্রভাব আরও আশ্চর্য্য ও অচিন্তনীয়। যে প্রাণ প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিয়া সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছে, প্রাণ তাহারই জন্য। সে প্রাণের আরাম ও তৃপ্তি সাধনই এই প্রাণের উদ্দেশ্য। সেই প্রাণের সার বস্তুর জন্য যদি এ অসার প্রাণ যায়, তাহার অপেক্ষা আর ইহার সৌভাগ্য কি আছে? সেই অমূল্য ধনের নিকট যখন প্রাণের মূল্য কিছুই নাই, তখন প্রাণের আশ্রিত দেহ, এবং দেহাশ্রিত বিষয় সকলের মূল্য কি আছে? তাহার জন্য কি না ত্যাগ করা যায়? এখন দেখ প্রাণ কত যত্ন ও দরদের জিনিষ, প্রাণের প্রাণ তাহার অপেক্ষা কত যত্ন ও দরদের জিনিষ। ইহা দেখিয়াই ঋষি বলিয়াছিলেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়-মাত্মা।" অন্তরতর এই সে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়। তিনি অজর অমর নিত্য ধ্রুব সত্য সনাতন, তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং তিনি আনন্দঘন চিন্ময় পরমপুরুষ। তিনিই জানিবার উৎকৃষ্ট বস্তু, তিনিই সাধনের পরমধন, প্রাণের সর্ব্বস্ব করিয়া তাহাকে প্রাণে রাখিতে পারিলেই মানুষ পূর্ণকাম হইয়া যায়।

আবার যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণের মহাসাগরে সকলে ভাসিতেছে। সকলে নিমগ্ন। তাঁহার সহিত প্রাণ যুক্ত হইলে সকলের সঙ্গে এক প্রাণ হওয়া যায়। পর কে? আমি তাঁর, সকলে তাঁর, সকলে আমার। আমার ভিতরে যিনি, তাঁর ভিতরে সকলে, আমার প্রাণের ভিতরে সকলে। তাঁকে ভাল বাসিলে, সকলকে ভাল বাসিতে হয়। আবার আমার প্রাণের সার, প্রিয়তম, পরমধন যিনি সকলের প্রাণের সার, প্রিয়তম, পরমধন তিনি। তাঁকে লইয়াই সকলের জীবন, সকলের শক্তি সকলের তৃপ্তি ও আনন্দ। তাঁর সঙ্গে মিলন হইলেই সকলের সঙ্গে মহামিলন হয়, তাঁর প্রাণে জীবিত হইলে মহা প্রাণ লাভ হয়, তাঁর প্রেমানন্দে মাতিতে পারিলে সমুদায় জগৎ মহানন্দের মহোৎসব ক্ষেত্র হয়। আমাদের অদ্যকার মহোৎসবে এই প্রাণের প্রাণের সঙ্গে সকলে এক প্রাণ হইয়া প্রাণের পরম আশ্রয়, পরম শান্তি, পরম সম্পদ ও পরম আনন্দ জানিয়া তাহাকে সম্ভোগ করা। এস এই আনন্দে সকলে মগ্ন হইয়া আমাদের মনুষ্য জীবন সার্থক করি।

বিজ্ঞাপন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ২২এ ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০

ষষ্টিতম মাঘোৎসব

১১ই মাঘ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাধ্যাহ্নিক উপাসনান্তে পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাহার মাঝে মাঝে সংগীত হইয়াছিল। এইরূপে বেলা ৫টার পর আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং ৬টার পর সায়ংকালীন উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়া এই দিনের কার্য্য শেষ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বেলাও উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশের সার এই—

"একেশ্বরবাদ প্রচার জগতে নূতন নহে। প্রাচীন উপনিষদ্ গ্রন্থ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার অনেক গ্রন্থ একেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ। প্রাচীন হিন্দু একেশ্বরবাদের এই একটা প্রকৃতি ছিল, যে তাহা সাধারণ মনুষ্যের জীবনকে স্পর্শ করিত না। পণ্ডিতে পণ্ডিতে সে বিষয়ে আলাপ হইত; জ্ঞানিগণই সে সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন ও সেই সকল মত পোষণ করিতেন। যাঁহারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কোন সময়ে বা সাধারণ লোকের অবলম্বিত ক্রিয়া কলাপকে উপহাস করিতেছেন, আবার আর এক সময় নিজেরাই তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন। একস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন যে সেই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া মানুষ যদি সহস্র বৎসর হোম, যাগ যজ্ঞ করে তাহাতেও কোন ফল হয় না। আবার সেই ঋষিই হয়ত যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় পণ্ডিতদিগের উক্তি সকল পাঠ করিলেও উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিস, প্লেটো, ইপিকটেটস, মার্কস অরিলিয়স প্রভৃতি সুধীগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদিগের অনেকেও সাধারণ জনমণ্ডলীর অবলম্বিত মত ও অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করিতেন অথচ কার্য্যকালে সেই সকল মানিয়া চলিতেন। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে আবার মানবজীবনে রাখিয়া দেখিতে হইবে, মানব-জীবন কিরূপ দাঁড়ায়, এ চিন্তা প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণের মনে উদয় হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শিক্ষা। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে রাখিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রভাবে জীবন কিরূপ দেখায়। তৎপরে পরিবারে রাখিয়া দেখিতে হইবে পারিবারিক জীবন কিরূপ হয়। তৎপরে সামাজিক জীবনে রাখিয়া দেখিতে হইবে সে জীবন তাহার সঙ্গে মিলে কি না? পরে রাজনীতিতে রাখিয়া দেখিতে হইবে রাজনীতি কিরূপ হয়। ইহাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম উদয় হইতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন লোকে প্রথম প্রথম সেই পুরাতন বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবই গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহীর ধর্ম্ম ও জনসমাজের কল্যাণকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ক্রটী করে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম লোকে তাহার সে ভাব পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমে ভাবিলেন ভাল এই ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনে রাখিয়া দেখি। অমনি তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং মিথ্যা বলিতে পারিব না, ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং ঘুস লইতে পারিব না। ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং পৌত্তলিকতাচরণ করিতে পারিব না ইত্যাদি বিশ্বাস ও তদনুরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মজ্ঞানকে যে পারিবারিক জীবনে রাখিতে হইবে, এ বিশ্বাস ব্রাহ্ম সাধারণের মনে জন্মে নাই। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র আসিলেন,—তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পারিবারিক জীবনে রাখিতে হইবে। অমনি নারীগণের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া গেল। গৃহধর্ম্মের মূল রমণী; তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জ্যোতি দিতে হইবে এই সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মন্দিরে নারীদিগের জন্য আসন কর, ব্রাহ্মিকাসমাজ স্থাপন কর, এই সকল চেষ্টা দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানকে সামাজিক জীবনে রাখিবার চেষ্টা হইল। অমনি বিবাহনিয়মের সংস্কার, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে পারিবারিক

জীবনে যেরূপ করিয়া রাখা উচিত তাহা আমরা এখনও রাখি নাই। এখনও ও কত শত ব্রাহ্ম পরিবার রহিয়াছে,যেখানে প্রতিদিন পরব্রহ্মের পূজা হয় না; এমন অনেক ব্রাহ্ম রহিয়াছেন, যাঁহাদের এখনও এ বিশ্বাস জন্মে নাই, যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে যেমন কল্যাণকর, তেমনই তাঁহাদের পত্নীদিগের পক্ষেও কল্যাণকর। এদিকে তাঁহারা উপাসনা কালে বলিয়া থাকেন—দেবদুর্লভ নাম সুধা। কিন্তু এ কিরূপ দেবদুর্লভ নাম সুধা যাহা নিজ পরিবারে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে না? বাজারে বাহির হইয়া যদি একটী সুন্দর কপি কি দুইটী ভাল কমলা লেবু পাও, অমনি কিনিয়া বাড়ীতে আনিতে ইচ্ছা কর কিন্তু এ কিরূপ দেবদুর্লভ নাম সুধা, যাহা নিজে পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছ অথচ গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ না? এরূপ সময় আসিয়াছে যখন আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাহিরে রাখিলে চলিবে না। ত্বরায় ইহাকে গৃহে ও পরিবার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে যত্নশীল হইতে হইতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী করুন।"

১২ই মাঘ।

অদ্য প্রাতঃকালে আবার উপাসনা হয়। ১১ই মাঘের সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব ভোগ করিয়া উপাসকগণ আরও ক্ষুধিত অন্তরে মন্দিরে সমাগত হইতে লাগিলেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সার এই—

"মাঘোৎসব প্রতি বৎসর আমাদিগের নিকট আসিয়া থাকে, প্রতি বৎসর ইহাতে কৃপাময় ঈশ্বরের কৃপার অমূল্য দান আমরা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেই দান কোথায় চলিয়া যায়! উৎসবের সময় দেখি হৃদয় পাত্র পূর্ণ হইয়া প্রেম পুণ্য শান্তি উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু উৎসব শেষ হইতে না হইতে যে শূন্য হৃদয় পৃথিবীতে পড়িয়াছিল, আবার সেই শূন্য হৃদয় দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। উৎসবে ঈশ্বরের দান কি তবে মিথ্যা? ইহা যে সত্য আমরা সকলেই তাহার সাক্ষী। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি উৎসবে দুর্ব্বল সবল হয়, নিরাশ আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হয়, পাপী পুণ্যবান্ হইয়া সাধুদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেম-সুধা পানে মত্ত হইয়া থাকে। সেই ঈশ্বরীয় ভাব কেন স্থায়ী হয় না? চিরকালই কি আমাদিগকে আশার পর নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া কাঁদিতে হইবে? প্রকৃত কথা এই করুণাময় পরমেশ্বর উৎসবের সময় বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া স্বর্গীয় অবস্থার এক একটা নমুনা আমাদিগকে দেখান, তাহাকে স্থায়ী করিতে হইলে আমাদিগের কিছু করিবার আছে। আতর বিক্রেতা হাজার টাকা ভরীর আতর বিনামূলে দিয়া সুগন্ধে মাতাইয়া দেয়, কিন্তু তাহা নিজের করিয়া রাখিতে হইলে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। ঈশ্বরীয় ভাব স্থায়ী করিবার জন্য দুইটী উপায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। (১) নাম সাধন, (২) আত্ম-নিবেদন। ঈশ্বরের নামের কি আশ্চর্য্য গুণ কল্যকার মহোৎসবে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যা দ্বারা একটী সামান্য বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অতি সুন্দর বস্তু করিয়া দেয়, উৎসবে আসিয়া আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা কি সেইরূপ আশ্চর্য্য হই নাই? পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, ভগ্ন-প্রাণ যোড়া লাগিয়াছে, শুষ্কতরু সরস ও মুঞ্জরিত হইয়াছে। কিসে এইরূপ করিল? ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নামের রসায়ন হইয়া কি এক আশ্চর্য্য দৈবশক্তি উৎপন্ন হইল, তাহাতেই এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখাইল—পৃথিবী স্বর্গ লোক, মনুষ্য দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ঈশ্বরের নাম মহামন্ত্র এবং তাহার এইরূপ দৈবশক্তি সকল শাস্ত্রে এবং সকল সাধু লোকেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উৎসবের মহেন্দ্র ক্ষণে সাধু হৃদয় সকলের গভীর ভক্তি একত্র হইয়া নামের যে মহাশক্তি প্রকাশ করিল, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমরা তাঁর নামের মূল্য বুঝি না; ইহা ওষ্ঠে, রসনাতে বা কণ্ঠাগ্রে রাখি, ইহা এক কর্ণে শুনিয়া আর এক কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দি, সুতরাং আমাদের নিকট নাম শক্তিহীন, আমরা নামকে সামান্য ভাবিয়া অবহেলা করি। কিন্তু এই নাম প্রাণের যত্নের ও আদরের বস্তু। নামরূপ বীজকে প্রাণে ধারণ করিয়া ভক্তি দ্বারা ইহাকে পোষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ইহা হইতে অমৃত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া অমৃত ফল দান করিবে। তাহার অমৃত রস পান করিয়া নিজে চির সুখী হইব, অপরকে চির সুখী করিতে পারিব। দয়াময় নাম সাধন করিয়া নামের মধ্যে তাঁহাকে বিরাজমান্ দেখিতে হইবে, বিন্দু প্রমাণ নামের মধ্যে প্রেম পুণ্য শান্তির মহাসিন্ধু দর্শন করিতে হইবে। এই নাম তাহা হইলেই ইহকাল ও পরকালের সম্বল হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা অনন্তকাল পূর্ণ করিতে থাকিবে।

ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন বড় কঠিন কথা, সকল ধর্ম্মের সার কথা। এক অবস্থা আছে, যাহাতে "আমাতে" আমি থাকিয়া আমার সকল কার্য্য করি,—আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানও আমাতে থাকিয়া করি। কিন্তু পরে এই অবস্থাকে নিতান্ত অসার ও ছলনাজনক বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে 'আমি' জিনিষটা নিতান্ত আপদপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনার বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্ত্তৃত্বের অধীন করিয়া ধর্ম্মকে যত দিন রাখি, ততদিন তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, মলিন ও কৃত্রিম। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ যতটুকু শিক্ষা হয়, ততটুকু সার ধর্ম্ম। এই জন্য সাধকেরা আত্ম-নিবেদনকে পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

"আমাতে" আমি থাকিলে অন্তর ও বাহিরের সকল শত্রুই প্রবল হয়, পদে পদে সাধনার বিঘ্ন জন্মাইয়া আমাকে পরাস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সেই বলবানের আশ্রয়ে দুর্ব্বল আমি সাহসী ও বলীয়ান্ হই, কোন শত্রু আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেমন নিরাপদ স্থান তাঁর চরণাশ্রয়। সাধক সেখানে বাস করিয়া অটল ও অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের উপাসনান্তে তাঁতে আত্ম-নিবেদন করিয়া আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ পূজা করিতে হইবে। এই আত্ম-নিবেদন কিরূপে হয়? আমরা ত অনেক সময় ভাবোচ্ছ্বাসে ঈশ্বরকে বলিয়া থাকি,

"এই লও আমার প্রাণ মন এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।" ইহা ত কেবল কথার কথা হইয়া থাকে। কাজে দেখি কিছুই তিনি লন নাই, কিছুই তাঁহাকে দিই নাই। ফল কথা আমি মিথ্যাবাদী, আমার কথার মূল্য নাই। আমি যা বলি তাই লয় হইয়া যায়। যিনি সত্যবাদী, যাঁর কথা অমোঘ ও অকাট্য, তিনি যে কথা বলেন তাহা কখনও মিথ্যা হয় না। তাঁর মুখ হইতে যদি একবার শুনা যায়, "আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম।" তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সত্যবাদীর কথা সত্য হইবেই হইবে। যতক্ষণ তাঁর মুখের বাণী "তথাস্তু" শুনিতে না পাইব, ততদিন আমরা যেন নিরস্ত না হই। এই আত্ম-নিবেদন প্রতিদিনের সাধনার বিষয়। যেমন উপাসনার সময়, সেইরূপ কার্য্যের সময় ইহাকে সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্ম নাম প্রাণে ধারণ করিয়া যে ব্রহ্মশক্তি প্রাণে লাভ করিব, সেই শক্তির নিকট আপনাকে বলিদান করিয়া তাঁর জয় প্রাণে স্থাপন করিতে হইবে। তাঁর অধিকার প্রাণের উপর যত স্থাপিত হইবে, ততই আমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। ক্রমে 'তিনি আমার এবং আমি তাঁর' হইয়া যাইব। জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রামে এই সাধনার পরীক্ষা। সেই সত্য শিব সুন্দরের নিকটে জীবনের অসত্য পাপ মলিনতা দগ্ধ করিতে হইবে। প্রাণগত আত্ম-চেষ্টা এবং ব্রহ্ম কৃপাগুণে এই সাধনাতে সিদ্ধ হইলে আমরা ব্রহ্মবান্ হইব এবং ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া ব্রহ্মের সহিত কামনায় সমুদায় বিষয় উপভোগ করিব, আমাদের জীবনের আর পতন হইবে না।"

অদ্য বেলা ১টার পর আলোচনার জন্য আবার সকলে মন্দিরে মিলিত হইলেন। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য আপনাপন আয়ের কত অংশ দান করিবেন এ বিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রস্তাব হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা হয় এবং অনেকে পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে অর্থাৎ যাঁহাদিগের ২৫ টাকার কম আয় তাঁহারা টাকা প্রতি ৫ পয়সা, আর যাঁহাদিগের আয় ২৫ টাকার অধিক তাঁহারা টাকা প্রতি ৭॥ পয়সা হিসাবে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তৎপর এ বিষয়টী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশনে আলোচিত হইবে এইরূপে স্থির হয়। পরে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় (যিনি খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন) আপনার কার্য্যের কথা, খাসিয়াগণের অবস্থা এবং তথায় প্রচারের কিরূপ সুবিধা আছে এ সমস্ত বিষয়ে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন। অতঃপর ৩॥ ঘটিকার সময় বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। চারিশতাধিক বালকবালিকা সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে ফুলের মালা এবং তোড়া দেওয়া হয়। সকলে আপনাদিগের স্থানে উপবিষ্ট হইলে তাহাদের একটী সঙ্গীত হইল। এবং প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বালক বালিকাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সংগীতটী বালকবালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত হইলে তাহাদের উৎসব শেষ হয়। তৎপর সকলকে সন্দেশ ও লেবু প্রদান করা হয়। বালক বালিকা সম্মিলনের নূতন সংগীতটী এই—

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন" এই গানের সুর।

বালক। সকলে আনন্দ ভরে এ গৃহে উৎসব করে,
আমরা এসেছি আজি ছোট ভাই বোনে মিলে।
বালিকা। সবে যাঁর নাম গায়, এস মোরা ডাকি তাঁয়,
এ কণ্ঠ বিফলে যায়, তাঁর গুণ না গাহিলে।
বালক। তিনি জগতের পতি আমরা যে শিশু অতি
হইবে তাঁহার প্রীতি নাহি জানি কি বলিলে।
বালিকা। জানিছেন প্রেমময় মোরা ক্ষুদ্র অতিশয়,
সদয় হবেন শুধু ভকতি ভরে ডাকিলে।
সকলে। এস সবে সমস্বরে ডাকি তাঁরে ভক্তিভরে
সকলের বন্ধু তিনি এক দেব এ নিখিলে,
মোদের যা কিছু আছে, পেয়েছি তাঁহারি কাছে
কাহারে বাসিব ভাল তাঁরে না ভাল বাসিলে।

বালক বালিকাগণের উৎসব শেষ হইলে সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় ছাত্রসমাজের উৎসব হয়। সায়ংকালে আবার মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়া উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ ছাত্রসমাজের গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল, পরে ছাত্রসমাজ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কয়েকটী সদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া একখানি কার্ড বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইল এবং সেই দিনকার সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংরেজি ভাষাতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা এখন প্রকাশ করিবার সুবিধা হইল না। বক্তৃতান্তে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। ছাত্রসমাজ কর্ত্তৃক বিতরিত কার্ডের মর্ম্ম এইরূপ—

১। ঈশ্বর-ভীতি জ্ঞানের আরম্ভ
২। যিনি শ্রদ্ধাবান্ এবং সংযতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভে সমর্থ।
৩। যাহা কিছু সৎ তাহাতেই রত থাক। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলেও, তুমি তাহার অনিষ্ট করিবে না। পরন্তু নিয়ত পরহিতে-নিরত থাকিবে।
৪। সাধু জনের হৃদয় সর্ব্বদাই সাধু বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। আর অসাধু হৃদয় নিয়ত লাভালাভ গণনায় নিযুক্ত থাকে।

১৩ই মাঘ।

অদ্য প্রাতঃকালে সঙ্গত সভার উৎসব হয়। প্রথমতঃ সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে অনেকে সঙ্গত সম্বন্ধে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করেন। উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সার এইরূপ।

"হিন্দুশাস্ত্র মতে কাশীবাস পরম প্রার্থনীয়, কেন না তাহাতে মহাপুণ্য লাভ হয়। এই কাশী মাহাত্ম্য শাস্ত্রে অনেক প্রকারে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ইহার তিনটী বিশেষ লক্ষণ প্রাপ্ত

হওয়া যায়। (১) কাশী পৃথিবীর অতীত স্থান, মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভূমিকম্পে কম্পিত হয় না। (২) কাশীতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না, স্বয়ং অন্নপূর্ণা বিরাজমানা থাকিয়া অভুক্তকে প্রচুর অন্ন দান করেন। (৩) কাশীতে যে মরে, সে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, সেই শাস্ত্রেই বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস"। অর্থাৎ সৎসঙ্গে থাকিলে কাশীবাসের সমুদায় ফল লাভ হয়। এই কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মের অতি গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশীবাসের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সৎসঙ্গ-বাসে তাহা প্রত্যক্ষ হয়।

প্রথমতঃ সৎসঙ্গ পৃথিবীর অতীত স্থান। মোহ মায়া পাপ তাপ যে সংসারকে পূর্ণ করিয়া আছে, সৎসঙ্গকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের কৃপার উপর যেখানে অটল বিশ্বাস, সেখানে ভয় ভাবনা কিছুই নাই। রোগ শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর আবর্ত্তনে সংসার নিরন্তর কম্পিত, সাধুসঙ্গকে ইহা কম্পিত করিতে পারে না। সাধুসঙ্গে যাহারা বাস করে তাহারা সর্ব্বদা'ই নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও নিরাপদ।

দ্বিতীয়তঃ সৎসঙ্গে ধর্ম্ম জীবনের অন্ন প্রেমভক্তি পুণ্যশক্তির কখনও অভাব হয় না। প্রেমময়ী আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা সেখানে চিরবিরাজমানা। সংসারের মরুভূমিবাসী দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে সেখানে তিনি ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল প্রচুর পরিমাণে প্রদান করেন। সৎসঙ্গে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি।

তৃতীয়তঃ সাধু সঙ্গে কাশীতে জীবন ধারণে, পরম সুখ, মৃত্যুতেও আনন্দ। 'কাশীতে মরিলে যে শিব হয়, ইহা ত কথার কথা। সৎসঙ্গে থাকিয়া মঙ্গল ব্রত সাধনে যিনি জীবন যাপন করিতে পারেন তাঁহার জীবন শিবময় হয়, দেহের মৃত্যুতে তাঁহার মৃত্যু হয় না। যিনি অমৃতের চির-প্রস্রবণ, তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, অমর জীবন লাভ করেন। 'মায়াবদ্ধ জীব, মায়ামুক্ত শিব।' সৎসঙ্গে থাকিয়া জীব মায়া মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

সকল দেশে সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের অশেষ প্রশংসা দেখা যায়। ইহারই গুণে রত্নাকর, অগষ্টিন, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপাচারী লোক সকল পুণ্যাত্মা বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিলে আমাদিগের উন্নতি ও কল্যাণের মূলে সাধুসঙ্গের প্রভাব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। যখনি সাধু সঙ্গ লাভ হয় দয়াময় ঈশ্বরের অবস্থ করুণা তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়, কেন না তিনিই সাধুসঙ্গের প্রাণরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার দৈব শক্তি সাধুসঙ্গের ভিতর দিয়া পাপীর উদ্ধার সাধন ও ধার্ম্মিকের পুণ্যজীবন পোষণ করিয়া থাকে। আমরা যেন এই সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিয়া সাধুতার মূল প্রস্রবণের সহিত চিরকাল যুক্ত হইয়া থাকি। তাহাতে আত্মা নিরাপদ, পরিপুষ্ট ও শিবময় হইবে। আমরা জীবনে পরম কল্যাণ এবং মরণে পরম শান্তি লাভ করিয়া অমৃতজীবনের অধিকারী হইব।"

অদ্য অপরাহ্নে ১টার সময় আবার আলোচনার জন্য সকলে সম্মিলিত হইলেন। "অদ্য ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা" বিষয়ে বিবেচনা আলোচনার বিষয় ছিল। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনার সূত্রপাত স্বরূপ বক্তৃতা করেন। তৎপরে উপস্থিত সভ্যগণের অনেকে সে বিষয়ে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ আলোচনা হইলে, বালক বালিকাদিগের সুশিক্ষা বিধানের জন্য কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি ভার অর্পণ করা হয়। তৎপর সায়ংকালে "সংস্কারের দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী এখন প্রকাশের সুবিধা হইল না। পরে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইবে। বক্তৃতান্তে সংগীত হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

১৪ই মাঘ।

অদ্য উৎসবের শেষ দিন। উদ্যান সম্মিলনের জন্য প্রত্যুষেই সকলে প্রস্তুত হইতেছিলেন। বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাগান উদ্যান-সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পাঁচ শতের অধিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলে বাগানে উপস্থিত হইলে উপাসনা হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে নিম্ন লিখিত যুবকগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	জ্যোতিশচন্দ্র মৈত্র,
„ করালীচরণ রায়,	রাখালচন্দ্র মিত্র,
„ সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ,	অধরচন্দ্র কাঁড়া।

দীক্ষিতগণের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহা লিখিত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। উপাসনান্তে আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ হয় এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাম্বুলোপহার নামক মুদ্রিত সদুপদেশ বিতরণ করেন। তৎপরে প্রীতি-ভোজন হইয়া উদ্যান-সম্মিলন শেষ হইল। সকলে কলিকাতায় সমাগত হইলে সায়ংকালে নিয়মিত সামাজিক উপাসনা হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশ লিখিত না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারা গেল না। এইরূপে আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবের কার্য্য শেষ হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই উৎসবে প্রকাশিত সত্য এবং সুসংবাদ সকল আমাদের প্রাণে চির প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা।

(প্রাপ্ত)

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই মানব কার্য্যসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, যথা পাপ এবং পুণ্য। এই পাপ

এবং পুণ্যের অস্তিত্ব কোথায়? কেহ কেহ বলেন কার্য্যসমূহেই ইহাদের অস্তিত্ব। অর্থাৎ পুষ্পে যেমন সৌরভ, দুগ্ধে যেমন মাধুর্য্য, জলে যেমন তরলত্ব, সেইরূপ কাজে পাপ এবং পুণ্য। সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমরা কর্ত্তা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কাজকে দেখিতে পারি না। শ্যাম দ্বারস্থিত এক নিরাশ্রয় অন্ধকে দুইটী পয়সা দান করিল। শ্যামকে পরিত্যাগ করিয়া এই দানকার্য্য থাকিতে পারে না। অর্থাৎ দাতা নাই, কিন্তু দান হইয়াছে, কতগুলি নিরাশ্রয় অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব মোচিত হইয়াছে, এই কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। দাতাকে ছাড়িয়া দান কার্য্য যদি স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে না পারে, তাহা হইলে দানজনিত পুণ্যও দাতাকে ছাড়িয়া কেবল দানে থাকিতে পারে না। দাতার সহিত অবশ্য ইহার সম্বন্ধ থাকিবে।

এখন কার্য্য সম্বন্ধে একটু বিচার করা যাউক। কার্য্যসম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান হইলে পাপ পুণ্য কোথায় আছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিব। মানব শরীরে যত কার্য্য হইতেছে পণ্ডিতগণ তাহা দুই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এক শ্রেণীর কার্য্যকে ইচ্ছা প্রণোদিত (Co-heritary) এবং আর এক শ্রেণীর কার্য্যকে স্বতঃপ্রেরিত (Reflexive) কার্য্য বলিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। উল্লিখিত দানের কার্য্যটি ইচ্ছা প্রণোদিত। কারণ দরিদ্র অন্ধকে দেখিয়া দানের ইচ্ছা জন্মিল, এবং সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া হাত যথা স্থান হইতে পয়সা লইয়া অন্ধের হস্তে প্রদান করিল। চক্ষুর পাতার স্পন্দন দ্বিতীয় শ্রেণী নিবিষ্ট। আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি এই স্পন্দন কার্য্য চলিবেই চলিবে। আমি ইচ্ছা করিলেও ইহা নিবারণ করিতে পারি না। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই শ্রেণীর কার্য্য সমূহের উপর আমার ইচ্ছা শক্তির আধিপত্য নাই। যে সকল কার্য্য স্বাভাবিক, যাহাদের সহিত ইচ্ছা শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই সেই সকল কার্য্য নির্গুণ অর্থাৎ পাপ পুণ্য গুণে সেই সকল কার্য্যের বিশেষ করা যাইতে পারে না। যে সকল কার্য্য ইচ্ছা শক্তি হইতে প্রবাহিত হইতেছে কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই পাপ ও পুণ্য কথা প্রযুজ্য। এখন আমরা আর একটী গভীর তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইচ্ছাশক্তি প্রবাহিত কার্য্য সমূহের গুণ (পাপ পুণ্য) জানিবার উপায় কি? ইচ্ছা শক্তি বটে কিন্তু ইহার নেতৃ শক্তি বিভিন্ন। যেরূপ অশ্বের শক্তিতে শকট ধাবিত হয় অথচ অশ্বেরও আবার চালক থাকে। সেইরূপ ইচ্ছা শক্তির বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালিত হইয়া থাকে, অথচ ইচ্ছার আবার চালকের প্রয়োজন, এই ইচ্ছাকে যাঁহারা শাসন করেন, তাহাদিগকে অভিসন্ধি বলা যায় (Motive) অভিসন্ধি দুই শ্রেণীর, বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ। সচরাচর স্বার্থপরতা অর্থাৎ আত্মপ্রেমকে অবিশুদ্ধ অভিসন্ধি এবং ব্রহ্ম ও অপরের প্রতি প্রেমকে বিশুদ্ধ অভিসন্ধি বলা গিয়া থাকে। ইচ্ছা অবিশুদ্ধ অভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যাহা সম্পন্ন করে তাহাই পাপ। বিশুদ্ধ অভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যাহা সম্পন্ন করে তাহাই পুণ্য। পাপ এবং পুণ্য কি হয়ত পাঠক পাঠিকা এখন বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং কোনও কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মানব মাত্রেরই অভিসন্ধি পরীক্ষা করা উচিত। আত্মপ্রেম কি ব্রহ্মপ্রেম ইচ্ছা শক্তির বল্গা ধারণ করিয়া রহিয়াছে এইটী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায় ইচ্ছার বলগা আত্ম-প্রেমের হস্তে, যদি দেখা যায় ভোগ বাসনা ইচ্ছার মূলে, যদি দেখা যায় যশঃপ্রিয়তা ইচ্ছা শক্তির চালক তাহা হইলে সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিব না। যদি করি তাহা হইলে আমি পাপে লিপ্ত হইব। সে কাজ জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারে, অনেক আশু-মগ্নপ্রায় তরীকে তীরে আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু আমার আত্মারূপ তরী উহা দ্বারা গভীর জলে নিমজ্জিত হইবে! কোন একজন কপটাচারী ধর্ম্মাভিনেতার বাক্য-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া অনেক লোক প্রাণ পাইতে পারে, রঙ্গালয়ে নর্ত্তকীর সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত ললিত ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণে অনেকের মগ্নপ্রায় তরণী ভাসিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু ঐ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর তাহাতে জীবন লাভের আশা নাই। তাহারা পরকে প্রাণ দিবার জন্য অতি সামান্য পরিমাণেও ব্যাকুল নহে। অর্থ লাভ করিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা, যশের আপাতমধুর বীণা ধ্বনি শ্রবণে আত্মার তৃপ্তি সাধন করা তাহাদের অভিসন্ধি। সুতরাং এইরূপ অবিশুদ্ধ অভিসন্ধি হইতে যদি জগতের মঙ্গল সাধন হয় তাহাতে তাহাদের কি লাভ? তাহারা পাপকূপেই ডুবিতেছে। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ অভিসন্ধি হইতে জগতের অমঙ্গল ঘটিলেও তাহাতে আত্মার অধোগতি হয় না। যদি পাপনিমগ্ন নর নারীর, সুখ-পিপাসু জীবনপথের কণ্টক হইয়াও তাহাদিগকে সৎপথে আনয়নের প্রয়াস করা যায় তাহাতেও আপত্তি নাই। একজন ডাক্তার যেমন রোগীর গভীর রোগ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য তাহাকে আশু কষ্ট প্রদান করিতে পারেন, সেইরূপ অনেক ধর্ম্মবীর সংসারে সুখ এবং শান্তির স্রোত ঢালিয়া দিবার জন্য, অনেক জননীর বক্ষস্থলে শোকের আগুণ জ্বালিয়া দিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ধর্ম্মোন্মত্ত চৈতন্যের এবং বুদ্ধের নাম করিতে পারি। তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্য নহে। ব্রহ্ম প্রেমই তাহাদের অভিসন্ধি ছিল। তাই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা হেতু তাহারা পাপাক্রান্ত না হইয়া উত্তরোত্তর স্বর্গপথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। ভাই ভগিনী তাই বলি, অভিসন্ধি বিশুদ্ধ না হইলে কোন কাজ করিও না।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কোচবিহার।

দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের ১৮শ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে—

১৭ই পৌষ মঙ্গলবার—সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ১৮ই পৌষ বুধবার—প্রাতঃকালের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমন নহে এবং জানি যে এমনও নহে" এই বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়াই যে ঈশ্বর দর্শন তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। 'মধ্যাহ্নে

২টী সঙ্গীতের পর মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। তৎপরে উপনিষদ্ হইতে নচিকেতা ও যম সংবাদ পাঠান্তর বলা হয় যে, ধর্ম্মকথা যুবাই হউক বা বৃদ্ধই হউক—সকলেরই নিকট শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত। যুবারা যেরূপ সত্যের আদর করেন, বৃদ্ধেরা সংসারাসক্তি ও অন্যান্য কারণে সেরূপ আদর করিতে পারেন না। যম নচিকেতাকে যেরূপ প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, প্রত্যেক সাধকের নিকট সেইরূপ প্রলোভন উপস্থিত হয়। এই হেতু প্রত্যেক সাধকেরই দৃঢ়তার সহিত প্রলোভন অতিক্রম করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে আত্মার অমরত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর শরীরের সহিত সকল নষ্ট হয়, কিম্বা আত্মা অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকে এবং পরমার্থ-তত্ত্ব-ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা নচিকেতা যমের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা হয় যে এই বিষয় যত গুরুতর সেইরূপ অতি যত্নের সহিত জানিবার চেষ্টা করিলে মানব যতটুকু ভগবানকে জানিতে অধিকারী তাহা সে জানিতে পারে। প্রায় চারিটার সময়ে মাধ্যাহ্নিক কার্য্য শেষ হয়। সায়াহ্নে জমাট সঙ্কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। "যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই,—সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।—নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত পরিচয় হয়।" এই সম্বন্ধে উপদেশ হয়। ১৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উপাসনা। মাতাল এবং নাম সুধাপানে প্রমত্ত ব্যক্তির তুলনাপূর্ব্বক নাম স্মরণই যে হৃদয়কে ভাবে পূর্ণ রাখিবার উপায় এবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। সায়াহ্নে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় সমাজ গৃহে "ভারতের ভূতকাল ও বর্ত্তমান কাল" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ২০শে পৌষ শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। সায়াহ্নে সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর আলোচনা হয়। বিবেক ও বুদ্ধির বিভিন্নতা, আত্মার অমরত্ব, আদেশ ও ঈশ্বরানুপ্রাণন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের প্রভেদ সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ২১শে পৌষ শনিবার—সঙ্গত সভার উৎসব। প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন, এবং খৃষ্টের অনুকরণ প্রণেতা টমাস্ ক্যাম্পিসের সাধু জীবন উল্লেখপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ ও সঙ্গতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সায়াহ্নে আবার উপাসনা হয়। মহাত্মা চৈতন্য দেবের কীর্ত্তন বর্ণনা করিয়া প্রেমই যে প্রচারের প্রধান উপায় উপদেশে তাহাই বিবৃত করা হয়। ২২শে পৌষ রবিবার—প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং উপদেশ দেন যে, যেমন পুষ্পকলিকা আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে তাহাতে সূর্য্যের আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে না পাইয়া তাহা প্রস্ফুটিত হয় না, এবং তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হয় না। সেইরূপ আত্মাকে আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে প্রস্ফুটিত হয় না, এবং তাহা হইতে প্রেম পুণ্যের সুগন্ধ বাহির হয় না। মধ্যাহ্ন সময়ে একটী প্রার্থনার পর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারদিগের ভরণ পোষণের উপায় এবং ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রায় বেলা ৫টার সময়ে, বাজারে ভিক্টোরিয়া টাওয়ারের সন্নিকটে সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর, "ব্রাহ্মধর্ম্মই যে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার ও উদ্ধার হইবার একমাত্র উপায় এবং সকলেই যে, এই ধর্ম্ম লাভের অধিকারী" শ্রদ্ধেয় শশী বাবু তাহা স্পষ্টরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজে উপস্থিত হন এবং কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের পর উপাসনা হয়। সীতাদেবী কর্ত্তৃক হনুমানকে স্বর্ণহার প্রদান এবং হনুমান যে, তাহাতে রাম নাম লেখা নাই দেখিয়া, তাহা দন্ত দ্বারা কর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া, ভক্তি ও বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবারকার উৎসবের কার্য্য এইরূপে শেষ হইয়াছে। যাঁহারা উপাসক ও লোকের অভাব সর্ব্বদাই বোধ করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপার নিদর্শন এই উৎসবে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ২৩শে পৌষ সোমবার—জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়ের ছাত্র সভার ছাত্রদিগের অনুরোধে সায়ংকালে, শ্রদ্ধেয় শশী বাবু উক্ত বিদ্যালয়ে "প্রকৃত উন্নতির পথ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। জ্ঞান, ভক্তি ও ইচ্ছার (কর্ম্মের) সামঞ্জস্যই যে মানব জীবনের উন্নতির উপায় তাহা বিষদরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপরে রাত্রি প্রায় ৭॥টার সময়ে শ্রীযুক্ত রায় কালিকা দাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর মহাশয়ের আবাসে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, "যে চায়, সে পায়।" সংসারের ধন মান যদিও সকলে না পায়, কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্মে সকলেই অধিকারী। চাহিলে, যত্ন করিলে সকলেই পাইতে পারে। দিনে দিনে দিন অবসান হইয়া আসিতেছে, তাঁহাকে লইয়াই যেন এই অবশিষ্ট দিন কাটাইতে পারি। সংসারের খেলাধুলার মধ্যে যেন সেই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারি।" ২৪এ পৌষ মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, (জুনিয়ার) এম, আর, এ, সি, কৃষি ও বনবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার ভবনে সায়ংকালে উপাসনা হয়। নবদ্বীপ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর ব্রহ্ম জ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন পাঠান্তর আত্মার অমরত্ব লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে, গুড়িয়াহাটি নিবাসী প্রায় ৮০ জন বালক, যুবা ও বৃদ্ধ শ্রমজীবী "সদা 'দয়াল দয়াল দয়াল' বলে ডাকরে রসনা" এই মধুর কীর্ত্তনটী করিতে করিতে আসিয়া, কুমার সাহেবের সুপ্রশস্ত বাঙ্গালাটি পূর্ণ করিয়া প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উপাসকেরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দান করিলেন। যেন আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া সকলের মনপ্রাণ মোহিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণের পর সকলে উপবেশন করিয়া "হৃদে হেরব আর অভয় চরণ পূজব হে" এই সঙ্গীতটী করিলে পর, নবদ্বীপ বাবু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "যাহাদিগের অন্নবস্ত্রের অভাব আছে তাহারাই যে গরিব এমন নয় কিন্তু যাহারা ধর্ম্মধন লাভ করিতে পারে নাই, নামামৃত রসের

আস্বাদন পায় নাই তাহারাই যথার্থ গরিব। তোমাদের ভাল কাপড় নাই, জামা নাই বা উপযুক্ত গৃহ অথবা আহারীয় নাই' তাহার জন্য দুঃখ বিষাদ করিও না।' এই নাম ধন সার করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা কর, পরম সুখ লাভ করিবে।" এইরূপে তাঁহার বলা শেষ হইলে তাঁহাদের মধ্যে এক জন উঠিয়া বলিলেন যে, "যদিও আমরা অন্ন বস্ত্রের জন্য লালায়িত বা তাহার অভাব জন্য দুঃখিত নহি। ভগবান্ কৃপা কর তোমার হরি নাম যেন সার করিতে পারি। যেমন অন্ধকারে চলিতে ভয় ভয় করে, আর চন্দ্রালোকে চলিতে ভয় হয় না, সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে যেন অন্ধকার না থাকে। ভগবানের উজ্জ্বল আলোকে যেন আমরা চলিতে পারি। দয়াময় হরি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এবং আপনারাও আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।" কুমার সাহেব এই সকল লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন, তাঁহারা পুনরায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কুমার সাহেব এতদুপলক্ষে তাঁহার বাঙ্গালাটী নব পত্র, পুষ্প ও ক্রোটনাদি দ্বারা অতি মনোহর রূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া সকলকে উপাসনা স্থানে লইয়া যান। প্রচারক মহাশয়ের দ্বয়ের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ ও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি চিরদিনের জন্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করুন। অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্র এবং সিভিল জজ বাবু ও দেওয়ানজী মহাশয়গণ এদিবসের উপাসনা স্থানে উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা ও সংকীর্ত্তনের পর, তাঁহার ভবনে প্রীতি-ভোজন হইয়াছিল।

বিগত রবিবার—দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইয়াছে এবং অন্ধদিগকে কয়েক খানি বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে।

(মৌখার) শিলং।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে মৌখার ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয় খাসিয়া বন্ধু যব সুলমন (Job Solomon) উপাসনার কার্য্য করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—অদ্য উৎসবের দিন। প্রাতে উপাসনা। বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করেন। সায়ংকালে খাসিয়া বন্ধু সামসন রায় (Samson Roy) উপাসনা করেন। ইনি উৎসবে যোগ দিবার জন্য চেরাপুঞ্জী হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে বাবু জগদানন্দ দাস "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" এই বিষয়ে খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার—সায়ংকালে উপাসনা। বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করেন। বাবু মথুরানাথ নন্দী বি, এ, ইংরাজীতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত" সম্বন্ধে একটী উপদেশ পাঠ করেন। পরে খাসিয়া বন্ধু বাবু হরিচরণ রায় কিছু বলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল মানব ও সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি। কেবল তাহাই মানব হৃদয়ের আশাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।"

২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু তারিণী চরণ নন্দী ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ইংরাজীতে উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে বাবু তারিণীচরণ নন্দী ইংরাজীতে সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। "কিরূপে এরূপ একটী খাসিয়া উপাসক মণ্ডলী গঠন করা যাইতে পারে, যে তাঁহারা সকল কার্য্যের দায়িত্ব নিজের উপর লইতে পারেন"—এই বিষয়ে তৎপরে আলোচনা হয়। কয়েক জনের উপরে এ বিষয়ের উপায় অবলম্বনের জন্য ভার দেওয়া হয়। আলোচনার পূর্ব্বে বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালায় এবং শেষে বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী ইংরাজীতে প্রার্থনা করেন।

কাঁথি।

মঙ্গলময়ের কৃপায় কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে বিগত মাঘোৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

৯ই মাঘ, মঙ্গলবার—রাত্রে উৎসবের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য প্রার্থনা ও উপদেশ। ১০ই মাঘ, বুধবার—প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন, রাত্রে উপাসনা। উপদেশের ভাব এই—"মায়ের ডাক শুনিতে পাইলে কে ঘরে থাকিতে পারে? খৃষ্ট, চৈতন্য সেই ডাকেই বাহির হইয়াছিলেন। মা আনন্দময়ী উৎসবানন্দে মাতিতে ডাকিতেছেন শ্রবণ কর"। এ দুদিনই বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। ১১ই মাঘ,বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কাজ করেন। "ঈশ্বর অনন্ত প্রেমময় সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সকলই তাঁহার প্রেমের দান। এই ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসনান্তে অনেকে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে—শশী বাবু ও তারক বাবু মন্দিরে পাঠ ও আলোচনা করেন। শ্রীমতী সুশীলাবালা ঘোষ শশী বাবুর গৃহে কয়েকটী মহিলাকে লইয়া উপাসনা ও পাঠ করেন। রাত্রে—বাবু গোপাল চন্দ্র বসু উপাসনা করেন। উপদেশের ভাব "প্রথমে ধর্ম্মসাধন করিয়া পরে সংসারে প্রবেশ মানুষের কর্ত্তব্য।" ১২ই মাঘ, শুক্রবার—প্রাতে তারক বাবু উপাসনা করেন। "সরলতাই ধর্ম্মজীবন গঠনের মূল ভিত্তি" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। রাত্রে—মহিলাগণের জন্য উপাসনা। স্থানীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহিলা উপাসনায় যোগ দান করেন। বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত কার্য্য সম্পন্ন হয়। তারক বাবু উপাসনা করেন এবং "প্রেমময় পিতার পুত্র কন্যা উভয়েই তাঁহার সেবা ও প্রিয়কার্য্য সাধনে সমান অধিকারী" এইভাবে উপদেশ দেন। শ্রীমতী সুশীলা বালা ঘোষ প্রার্থনা ও একটী সঙ্গীত করেন। ১৩ই মাঘ, শনিবার—প্রাতে শশী বাবু উপাসনা করেন। "ঈশ্বর বিশ্বাস" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রাত্রে—গোপাল বাবু উপাসনা করেন। "ঈশ্বরাদেশ" উপদেশের বিষয়। ১৪ই মাঘ, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে তারক বাবুর গৃহে ব্রাহ্ম বালক-বালিকা সম্মিলন হয়। শ্রীমতী সুশীলাবালা, তারক বাবু ও শশী বাবু তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। সাদরে তাহাদিগকে আহারাদি করান হয়।

অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হয়। বাজারে গোপাল বাবু "সরল প্রাণে সর্ব্বকার্য্যে নাম সাধন" বিষয়ে ও শশী বাবু "নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা" বিষয়ে সুন্দর উৎসাহপূর্ণভাবে বক্তৃতা করেন। মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া তারক বাবু উপাসনা করেন ও জীবন্ত উৎসাহে "ব্রহ্মদর্শন ও বিবেকবাণী" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দয়াময়ের কৃপায় সুন্দরভাবে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম কৃপাবারি অনেক শুষ্ক আত্মাকে সিক্ত করিয়াছে।

নওগাঁ।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজে ষষ্টিতম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৭ই মাঘ রবিবার—প্রাতে বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা ও প্রার্থনা, বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনা করেন ও গণেশচন্দ্র ঘোষ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন; গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। ৮ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে বাবু গুরুনাথ দত্তের গৃহে উপাসনা হয়। গণেশ চন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন গুরুনাথ দত্ত ১ম পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে নাম সংকীর্ত্তন হয়। ৯ই মাঘ, মঙ্গলবার—সায়ংকালে মন্দিরে ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ হইতে যোগ ও ভক্তি তত্ত্ব পাঠ করিয়া গুরুনাথ দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। ১০ই মাঘ বুধবার—সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং "ব্রাহ্মসমাজ কাহাদিগের 'নিকট ঋণী" গুরুনাথ দত্ত এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিয়া একটী প্রার্থনা করেন। ১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে উপাসনা, ৩ বেলার উপাসনাই গুরুনাথ দত্ত করেন। ১১ই মাঘের উৎসব ব্রাহ্মদিগের এত আদরের কেন? এই বিষয়টী প্রাতে উপদেশরূপে বিবৃত করা হয়, সায়ংকালে উপাসনার পর ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের একটী উপদেশ পঠিত হয়। ১২ই মাঘ, শুক্রবার—সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এঃ এঃ কমিশনর উপাসনার কার্য্য করেন এবং গুরুনাথ দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে মহর্ষি মহাশয়ের একটী উপদেশ পাঠ করেন। ১৩ই মাঘ শনিবার—প্রাতে বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় উপাসনা ও তাঁহার ৪র্থ সন্তান (২য় পুত্রের) শুভ নামকরণ এবং অন্নাশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গুরুনাথ দত্ত উপাসনাদি কার্য্য করেন পুত্রের নাম শ্রীমান্ সরোজ কুমার সেন গুপ্ত রাখা হয়।

সায়ংকালে—বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। বাবু রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই মাঘ রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় বালক বালিকা দিগের সম্মিলন হয়। বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় নিরকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তৎপর প্রাণনাথ দত্তের প্রস্তাবে ও কালীমোহন বাবুর পোষকতায় এই বালক বালিকাদিগের সম্মিলন একটী স্থায়ী "বালক বালিকা সম্মিলনী সভা" প্রতি শনিবারে হওয়ার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। ১০ ঘটিকার সময় মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজ হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলা মজুমদার উপাসনার কাজ ও স্বর্ণলতা দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করেন ও প্রার্থনা করেন। ২ ঘটিকার পর সকলে নগর সংকীর্ত্তনে বহির্গত হন, সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করিয়া নূতন বাজারে উপস্থিত হইয়া খুব জমাট ভাবে সংকীর্ত্তন করা হয়, তথায় গণেশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলা ভাষায় ও গুরুনাথ দত্ত আসামিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় ও ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য সাধারণ লোকদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। সাত ঘটিকার সময় মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনা হয়। গণেশচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কাজ করেন, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ হয়, এই বিষয়ে উপদেশ হয়। ১৫ই মাঘ সোমবার রাত্রিতে রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, বাবু মধুসূদন গুপ্ত উপাসনার কাজ করেন। তৎপর প্রীতি-ভোজন হয়। ২১এ মাঘ রবিবার কয়েকজন ব্রাহ্ম, বালক বালিকাসহ মিকির বামনি গ্রামে বাবু তারিণী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দোকানে গিয়া আনন্দোৎসব হয়। সহর হইতে ১০ মাইল ব্যবধান উক্ত গ্রামে স্নানাদির পর দ্বিপ্রহরের সময় উপাসনা হয়, গুরুনাথ দত্ত উপাসনা করেন, সত্য সনাতন একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর সর্ব্বজাতির উপাস্য ও পরিত্রাণ কর্ত্তা, অতি সহজ ভাষায় এই বিষয়ে উপদেশ হয়, অনেক আসামিয়া ও মিকির তথায় উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার পর আহারাদি করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করা হয়! ৭ই মাঘ হইতেই পোষ্টাফিসের হেড্ ক্লার্ক বাবু আশুতোষ গুপ্তের বিশেষ উৎসাহে ব্রাহ্ম পল্লীতে প্রাতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া উৎসব পর্য্যন্ত প্রতিদিন ভোর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

উদ্ধৃত

আদি ব্রাহ্ম সমাজে গত মাঘোৎসবে ১১ই মাঘের সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"অদ্যকার এই শুভমাসে—শুভ দিবসে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিনব সূর্য্য উদয়াচলে সমুত্থান করিয়াছেন। অদ্যকার সূর্য্যের অভ্যুত্থানে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, সকল মঙ্গলের আকর পরম মঙ্গলময় বিশ্বের জনক জননীকে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিয়া—কিছুতেই হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি মানিতেছে না। পৃথিবীর সূর্য্য অস্ত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূর্য্য উদয়াচল হইতে এক পদও টলিবার নহে, মঙ্গলময়ের প্রেরিত মঙ্গলের সূর্য্য জগতে একবার উদয় হইলে কোন কালেই তাহা অস্ত হয় না। পূর্ব্বদিকের মুখ-জ্যোতি এখনো কুজ্ঝটিকায় ম্লান—ভারতের মুখ-জ্যোতি এখনো মোহাবরণে অবগুণ্ঠিত। নবোদিত মঙ্গল-সূর্য্য সেই কুজ্ঝটিকার আড়ালে সহস্র কোটি

কিরণ জাল ধীরে ধীরে প্রসারণ করিতেছে—কুজ্ঝটিকা তাহা জানে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মোহ-কোলাহলের মধ্য হইতে প্রেমভরা গভীর আহ্বান-ধ্বনি উচ্চে উদ্ঘোষণ করিতেছেন—এখনো তাহা জনসাধারণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলেই মোহ-কুজ্ঝটিকার দল-বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দশদিকে বিদ্রাবিত হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সূর্য্যের মধ্যদিয়া অনন্ত মহান্ পুরুষের শুভ্র মুখজ্যোতি দশদিকে বিকীর্ণ হইবে—কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই তাঁহার সর্ব্বসন্তাপ-নাশক মুখ-জ্যোতির কণামাত্র কিরণের প্রত্যাশায় বিমল প্রীতি-ভক্তির সাগরসঙ্গম হইয়া তাহার অভ্যন্তরে শত সহস্র হৃদয়-কমল অদ্যকার এই সুমঙ্গল দিবসে আমাদের পরম পিতা পরম মাতা পরম সুহৃৎ আমাদের প্রাণের শান্তির জন্য—ক্ষুধিত আত্মার ক্ষুধা নিবারণের জন্য—আমাদিগকে অমৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন; তাই আমরা তাঁহার চরণে আমাদের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিবার জন্য অদ্য এখানে একত্র সমাগত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বস্তুটা কি—তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! তাহা পরম পিতার কল্যাণের দান—পরম মাতার স্নেহের দান—পরম বন্ধুর প্রীতির দান—তাহার মূল্য কিরূপে মুখে ব্যক্ত করিব? তাহার মূল্য এক হৃদয়ে ধরে না—তাই শত সহস্র হৃদয় হইতে আজ প্রীতি ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীতে ধরে না—তাই ভূর্ভুবঃ স্বঃ সমস্ত জগতে মঙ্গলধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে; যাঁহার কর্ণ আছে তিনি তাহা প্রাণের অভ্যন্তরে শুনিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবাহিত হইতেছে এখনো আমরা তাহা চিনিতে পারি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরন্তন অথচ নূতন। ব্রাহ্মধর্ম্মেতেই আমাদের এই আর্য্যভূমির জন্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মেতেই আর্য্যজাতির মূল প্রতিষ্ঠিত; ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত পৃথিবীর পুষ্পবিকাশ এবং ফলপরিণতি। আজিকার এই উজ্জ্বল শতাব্দীতে এ কথা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না যে, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আমাদের দেশে গোড়া হইতেই আছে; মাঝে কেবল খণ্ড খণ্ড হইয়া এখানে ওখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। করুণাময় জগৎপিতার পরমাশ্চর্য্য মৃতসঞ্জীবনী কৃপায় সেই খণ্ডাংশগুলি একত্র সমানীত হইবামাত্র, তাহাতে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিনব শ্রীতে সমুত্থান করিল। আর্য্যধর্ম্মের নানা অঙ্গ আর কিছু নয়—আত্মার তিনটি মুখ্য অবয়ব—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম, প্রাণ-শব্দে এখানে শারীরিক প্রাণ নহে;—চাই প্রাণ বলো—চাই হৃদয় বলো—চাই প্রীতি বলো,—চাই ভক্তি বলো,—কাণে শুনিলে নানা শব্দ—মনে বুঝিলে একই অর্থ।

এ যাবৎকাল আর্য্য-ধর্ম্মের তিন অঙ্গ—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম এই তিন অঙ্গ—তিন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, একদিকে শুষ্ক জ্ঞান, আর এক দিকে অন্ধ ভক্তি, এবং আর এক দিকে জ্ঞান-শূন্য প্রাণশূন্য অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর—এই তিন বিরোধী স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক সম্প্রদায় জ্ঞানের পক্ষপাতী—ভক্তির বিরোধী; আর এক সম্প্রদায় ভক্তির পক্ষপাতী—জ্ঞানের বিরোধী; আর এক সম্প্রদায় শূন্য-গর্ভ যাগ যজ্ঞাদির পক্ষপাতী—জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই তাঁহাদের মৌখিক আড়ম্বরমাত্র। কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে আর্য্য-ধর্ম্মের কোন্ এক অলক্ষিত কোণে বিচ্ছেদানলের ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইয়াছে—কালক্রমে সেই এক বিন্দু অগ্নি-কণা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতভূমি ছারখার করিয়া দিল—তবুও তাহার উদর-পূর্ত্তি হইতেছে না; সর্ব্বনাশের বাকি রাখে নাই—তবুও তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না—আরো সর্ব্বনাশ চায়। নিজের বলে আর্য্যভূমিকে যতদূর দগ্ধ করিবার তাহা করিয়াছে—এখন দেশ বিদেশ হইতে আহুতি যাচিয়া আনিতেছে। ধর্ম্মের মূলগত বিচ্ছেদ কাজে কিরূপ ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহার যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে ভারত বর্ষের অধুনাতন শোচনীয় অবস্থাটি একবার সজল-নয়নে নিরীক্ষণ কর; হত্যাগৃহে অবরুদ্ধ গাভীবৃন্দকে বৎসেরা যেরূপ-নয়নে নিরীক্ষণ করে সেইরূপ নয়নে নিরীক্ষণ কর; দেখিবে যে, জ্ঞানবল খুবই দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে জ্ঞান প্রাণশূন্য এবং অকর্ম্মণ্য; দেখিবে যে, প্রেম-ভক্তি খুবই মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞানশূন্য অন্ধ ভক্তি; দেখিবে যে, বাহুবল খুবই ছাতি ফুলাইয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু তাহার ভিতরে না আছে অনুরাগ না আছে জ্ঞান; বাণিজ্য ব্যবসায় কাজ কর্ম্ম অবিশ্রাম চলিতেছে—রাশি রাশি অর্থের পুঁজি হইতেছে—কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানও নাই—প্রাণও নাই; দেখিবে যে, ক্ষুদ্র-প্রাণ কর্ম্ম-কার্য্যের মূর্ত্তিই স্বতন্ত্র; তাহার হৃদয় শুষ্ক কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত, মস্তিষ্ক কর্দ্দম পিণ্ডে বিনির্ম্মিত। জ্ঞান সকলেরই পূজার সামগ্রী—কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান কিছুই নহে। পুষ্পকে সকলেই মাথায় করিয়া পূজা করে বক্ষে করিয়া যত্ন করে; কিন্তু শুষ্ক পুষ্পকে গৃহ হইতে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু সেই আদরের সামগ্রী প্রীতিভক্তি সর্ব্বজগতেরই আদরের সামগ্রী; যখন অজ্ঞানের অন্ধকারময় গহ্বরে বাস করিয়া অন্ধ ভক্তি হইয়া বাড়িয়া হয়, তখন তাহা ভয়ের সামগ্রী! পুষ্প সূর্য্যালোকে নৃত্য করে বলিয়া তাহার বক্ষ সুধার ভাণ্ডার; সর্প অন্ধকারে বাস করে বলিয়া তাহার আপাদ মস্তক বিষে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জ্ঞান-শূন্য অন্ধভক্তি এবং প্রাণ-শূন্য নীরস জ্ঞান, পুরাকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ক্রমাগতই চলিয়া আসিয়াছে, আর তাহার ফল হইয়াছে এই যে, কর্ম্ম, যাহা জ্ঞান এবং প্রাণ-রূপী পিতামাতার পুত্র, সে কাহার কথা শুনিবে, তাহা ঠিক্ করিতে না পারিয়া তাহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে, তবে একের কথা শুনিলেই দুয়ের কথা শোনা হয়; পিতার অথবা মাতার কথা শুনিলে পিতা এবং মাতা উভয়েরই কথা শোনা হয়; কিন্তু জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে যেখানে মর্ম্মান্তিক বিরোধ, সেখানে একের কথা শুনিতে গেলে অন্যের কথা অমান্য করিতে হয়। এই জন্য জ্ঞান এবং প্রাণের পরস্পর বিরোধের অবস্থায় কর্ম্ম—কি আর করিবে, কর্ম্ম-বেচারী জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়েরই নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া জ্ঞান-শূন্য প্রাণ-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরেরই শরণাপন্ন হয়। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে তিনের এই প্রকার বিরোধ যেমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ আর কোনো দেশেই নহে; আর আমাদের সমস্ত দুর্গতি—অতলস্পর্শ অধোগতির—কারণই ঐ।

জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের মধ্যে সৌহার্দ্দবন্ধন যে, কেমন বাঞ্ছনীয়, তাহা অন্ধ প্রকৃতিও আমাদের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতেছে; বসন্ত কালের লতা পল্লব কুসুমে তিন ভাব আমরা একাধারে মূর্ত্তিমান দেখি—সমুজ্জ্বল ভাব, সরস ভাব এবং সতেজ ভাব; তেমনি মনুষ্যের আত্মা যখন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তাহাতেও ঐ তিন সুলক্ষণ একাধারে স্ফূর্ত্তি পায়—জ্ঞানের সমুজ্জ্বল ভাব, প্রেমের সরস ভাব এবং পুণ্যের সতেজ ভাব। এতকাল ভারত-ভূমিতে জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের যে তিন স্রোতস্বতী তিন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই ত্রিবেণী-সঙ্গম। কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল গ্রন্থ, কি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, কি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি—সর্ব্বত্রই জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান। ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানেরই সঙ্গে লোকে জাগ্রত-নয়নে সজ্ঞান-ভাবে যোগ দিতে পারে, তাহা কেবল নয়—প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারে। উপনিষদ্ যে ধর্ম্মের বীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের শস্য; উপনিষদে যাহা গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। বীজ যেমন নানা শাখা-উপশাখার মধ্য দিয়া শস্য-রাশি হইয়া উথলিয়া উঠে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই সূর্য্যালোকে সহস্রধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; আর্য্য-ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন বীজ সেইরূপ নানা ধর্ম্ম এবং উপধর্ম্মের মধ্যদিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে—এবং সমস্ত পৃথিবীময় শতধা হইয়া উথলিয়া পড়িতেছে।

জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের বিরোধ-প্রসূত তুমুল অশান্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি স্বর্গীয় শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না! বিরোধ বিচ্ছেদ এবং অমিল আমাদের দেশের অস্থিমজ্জায় এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট যে, তাহা মরিয়াও মরিতেছে না। বিরোধের ভঞ্জনের মধ্যেও—শান্তির অভ্যুদয়ের মধ্যেও আবার সেই পুরাতন বিরোধ থাকিয়া থাকিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া অনেক শান্তি-প্রিয় ভদ্রজন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়া-ইয়াছেন। কিন্তু এই সকল ভদ্রজনেরা যাহাকে মনে করি-তেছেন—নিরাপদ উপকূল, প্রকৃত পক্ষে তাহা পুরাতন বিভীষিকা; তাঁহারা তরঙ্গ দেখিয়াই অমনি নৌকা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—কেহ বা শুষ্ক জ্ঞানের চোরা বালিতে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, কেহ বা অন্ধভক্তির বাদা বনে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞান-শূন্য প্রাণ-শূন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং বাহ্যা-ড়ম্বরের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন; তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, যিনি সমস্ত জগতের কাণ্ডারী তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ণধার; তাহা যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মতরী হইতে কখনই পশ্চাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন না—তাহা হইলে তাঁহারা কোনো বাধাতেই ভগ্নোদ্যম না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দাঁড় টানিতেন—এত দিনে নৌকা নিরাপদে কূলে উপনীত হইত এবং সেখান-হইতে যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করিয়া নূতন উদ্যমের সহিত নবনব কল্যাণ-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিত। যাঁহারা মনে করেন যে, বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা কেবল ব্রাহ্মমণ্ডলীর অভ্যন্তরেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে সকলই শান্তির আলয়—সকলই শোভার ভাণ্ডার—সকলই জ্ঞানের জ্যোতি, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাঁহারা কি জানেন না যে, সমগ্র ভারত-ভূমি বিচ্ছেদ বিরোধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাদলির উত্তপ্ত মরুভূমি? তাঁহারা জানুন্ বা না জানুন্—আমাদের ইহা চক্ষে দেখা কথা যে, চতুর্দিকস্থ জ্বলন্ত দাবানলের মধ্যে (শুষ্ক জ্ঞান অন্ধ ভক্তি এবং শূন্য আড়-ম্বরের কঠোর সংঘর্ষ-জাত সুবিস্তীর্ণ দাবানলের মধ্যে) ব্রাহ্মধর্ম্ম সরস উপদ্বীপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় উপদ্বীপটীর গাত্রে হুতাশনের একবিন্দুও আঁচ লাগিবে না এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়! এ তো জানাই আছে যে, জ্বলন্ত হুতাশনের শত সহস্র ভুজঙ্গ-ফণা তাহাকে শত সহস্র দিক্ হইতে তাড়াইয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু আর তুলারাশি নহে যে, তাহা অগ্নিকে ভয় করিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম সমু-জ্জ্বল সুবর্ণ—অগ্নিতেই তাহার বিশিষ্টরূপে গুণ-পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার মুখ কত না উজ্জ্বল হইবে।

মহান্ প্রভু পরমেশ্বর আমাদের ধ্রুবতারা, ইহা না দেখিয়া অনেকে এই ভাবিয়া সারা হন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের কূল কিনারা কোথায়! কেবলি ঘূর্ণার ঘোর! সম্মুখে নূতন অপরিচিত পথ! এক আবর্ত্ত ছাড়াইলে আর এক আবর্ত্ত! নিম্নে রসাতল মুখ ব্যাদান করিতেছে! উত্তুঙ্গ তরঙ্গ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে এবং সম্মুখ হইতে পশ্চাতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে—কোথায় যাই-তেছি তাহার কিছুই ঠিকানা নাই!" এইরূপ মনে করিয়া যাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, বিরোধি কার্য্য তাঁহাদের নিজেরই কার্য্য তাঁহাদের নিজের বিরুদ্ধে এই হইতেই পোষকতা করে যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অটল মুখজ্যোতি জ্ঞানে ও নিরীক্ষণ করেন না এবং তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বারি প্রাণেও অনুভব করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে লাভালাভ গণনা এবং প্রাণাভ্যন্তরে লোকভয় এই দুই প্রতাপান্বিত প্রভু সর্ব্বোচ্চ দেব সিংহাসনে উপবিষ্ট। এইটি তাঁহাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য যে সুখ শান্তির সুবাতাস ঈশ্বরের হস্তে—কর্ত্তব্য সাধনের হাল এবং দাঁড় আমাদের প্রতিজনের নিজের হস্তে। বায়ু যেমনই বহুক্ না কেন যে দিকেই বহুক না কেন, কাণ্ডারিগণকে কূলের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া দৃঢ় রূপে হাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে, এবং দাঁড়িদিগকে দাঁড় টানিতেই হইবে তাহাতে একটুও শৈথিল্য করিলে চলিবে না। একই সময়ে আমাদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে—ঈশ্বরের দান এবং আমাদের নিজের নিজের কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হস্তে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সকল প্রকার কার্য্যের অভ্যন্তরেই দুই হস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এক হস্ত আমাদের নিজের এবং আর এক হস্ত ঈশ্বরের। চক্ষু দ্বারা বস্তুদর্শন যাহা আমরা প্রতি নিয়তই করিতেছি তাহার অভ্যন্তরে দুই হাত যুগপৎ কার্য্য করিতেছে; চক্ষুরুন্মীলন করা আমাদের আপনাদের হাত এবং সূর্য্যালোক প্রেরণ করা ঈশ্বরের হাত। আমরা সাধক, ঈশ্বর সিদ্ধিদাতা বিধাতা; সাধন আমাদের হস্তে সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে, এই কথাটি যেন আমাদের মনোমধ্যে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

কর্ত্তব্য সাধনের মধ্যেও দুই হাত বালকের হাত এবং ধাত্রীর হাত। বালক কে? না আমাদের প্রতি জনের নিজের স্বাধীন চেষ্টা; ধাত্রী কে? না আমাদের দেশের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য পৈতৃক সংস্কার। মাতা যেমন বালকের সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীকে প্রেরণ করেন, ঈশ্বর তেমনি সাধকের স্বাধীন চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-পরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাধীন চেষ্টা-টি জ্ঞান-মূলক এবং পৈতৃক সংস্কার-টি প্রাণ-মূলক, ইহা বলা বাহুল্য। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা আর কিছু নয়—বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করা—সচেতনভাবে কার্য্য করা—জ্ঞানের সহিত কার্য্য করা। প্রাণের সহিত কার্য্য করা কি? না পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার যাহা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল রহিয়াছে এবং বাহির হইতে উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই যাহা ভিতর হইতে উথলিয়া উঠে,সেই চিরাগত পৈতৃক সংস্কার অনুসারে কার্য্য করা'র নামই প্রাণের সহিত কার্য্য করা। পৈতৃক সংস্কারকে উচ্ছেদ করা কোনোমতেই বিধেয় নহে, বিধেয় কি? না স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের অনুগত হইয়া কু হইতে সু বাছিয়া লওয়া। ভারতবর্ষের মর্ম্মগত অস্থিগত মজ্জাগত একটি সুমঙ্গল ভাবসূত্র যাহা পুরাতন কাল হইতে একাল পর্যন্ত নানা দেশের নানা আচার ব্যবহারে মাটিচাপা পড়িয়াও অখণ্ডিত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে—সেই প্রীতি-ভক্তি-স্নেহের কুসুমবিকাশ—সেই পুণ্যের প্রশান্ত তেজস্বিতা—সেই অমায়িক সর্ব্বলোক-হিতৈষিতা যাহা অন্তঃশিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে অদৃশ্য ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আমাদের দেশের প্রাণ—তাহাই আমাদের দেশের পৈতৃক সংস্কার। দেশের মর্ম্ম-নিহিত প্রাণকে—পৈতৃক সংস্কারকে উচ্ছেদ করিলে, যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট সেই শাখার মূলোচ্ছেদ করা হয়; কখনই তাহা বিধেয় নহে। বিধেয় কি? না প্রাণের অন্ধ স্ফূর্তিকে—পৈতৃক সংস্কারের মূঢ় উত্তেজনাকে—স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত করা। স্ফূর্তিকে সুনিয়মে নিয়মিত করা স্বতন্ত্র এবং উচ্ছেদ করা স্বতন্ত্র। অশ্বকে রাস-রজ্জু দ্বারা নিয়মিত করিলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয় না—বরং তাহা না করিলে সারথী অচিরে বিপদগ্রস্ত হয়। আমাদের দেশের সেই যে মর্ম্মনিহিত প্রাণ, কিনা পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার, তাহা আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য-কার্য্যের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধাত্রী এবং এই ধাত্রীর হাত ধরিয়াই আমাদের স্বাধীন চেষ্টা নবোন্মেষিত জ্ঞানের আলোকে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হয়। এই ধাত্রীর হাত ছাড়িয়া আমাদের কিরূপ দুর্গতি হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্ম সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মচারী মনোনীত হইয়াছেন।

	নন্দমোহন বসু,	সভাপতি
„	উমেশচন্দ্র দত্ত	সম্পাদক
„	শশিভূষণ বসু	সহকারী সম্পাদক
„	আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়	সহকারী সম্পাদক
„ „	গুরুচরণ মহলানবিশ	ধনাধ্যক্ষ।

নিম্ন লিখিত সভ্য মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারী কামিনী সেন, বাবু হীরালাল হালদার, নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, শ্রীমতী সরলা রায়, কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র,দুর্গামোহন দাস, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ রায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মোহিনীমোহন বসু, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন সেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সীতানাথ দত্ত, সুন্দরী মোহন দাস, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বঙ্কবিহারী বসু, হরিমোহন ঘোষাল এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

মফস্বল।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘআঁচড়া, শিবচন্দ্র দেব; কোন্নগর, কালীশঙ্কর সুকুল নড়াল, লছমন প্রসাদ লাহোর, নবদ্বীপচন্দ্র দাস (প্রচারক) ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু ময়মনসিংহ, জগদীশ্বর গুপ্ত কুষ্টিয়া, রজনীনাথ রায় মান্দ্রাজ, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সিমলা; বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকা, মনোরঞ্জন গুহ বরিশাল, শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার ঢাকা, বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, চণ্ডীচরণ সেন সাতক্ষীরা, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর, চন্দ্রকুমার ঘোষ গয়া, রাও বাহাদুর মহিপত রাম রূপরাম আহমেদাবাদ, বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার কটক, নিবারণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর, এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া পাহাড়।

গত ২৬এ মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারি) তারিখের অধ্যক্ষসভার বিশেষঅধিবেশনে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, হীরালাল হালদার, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদন সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নীলরতন সরকার, সীতানাথ দত্ত, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাস।

নামকরণ—২৯এ মাঘ বাইনান নিবাসী রসিকলাল রায়ের তৃতীয় কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু ফকির দাস রায় উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন। কন্যার নাম সরলা বালা রাখা হইয়াছে।

বিগত ১৬ই মাঘ আসামস্থ মনাই চা বাগানের ম্যানেজার বাবু মতিলাল হালদার মহাশয়ের দ্বিতীয়া ও

তৃতীয়া কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা দ্বয়ের নাম যথাক্রমে প্রেমলতিকা ও আশালতিকা রাখা হইয়াছে।

উৎসব—বিগত ৬ই এবং ৭ই ফাল্গুন মধ্য ভারতবর্ষীয় রৎলাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৭ই হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত কটকস্থ উৎকল ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ—বিগত ১৯এ মাঘ কলিকাতা নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী ইনি জলপাইগুড়িতে কমিসনর অফিসে কার্য্য করেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী কুসুমকুমারী মল্লিক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী মিত্র গত ৬ই মাঘ তারিখে বৎসরাধিক কাল কঠিন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরলোকগতা হইয়াছেন। তিনি ৩টী কন্যা এবং ১টী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরের অধিক ছিল না। এরূপ অল্প বয়সে তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহার সন্তানগণ বিশেষভাবে নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। বিগত ২৮এ মাঘ তারিখে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের পরলোকগতা ভগিনীর আত্মাকে তাঁহার অনন্ত কুশলময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিয়া অনন্ত শান্তিতে রক্ষা করুন এবং তাঁহার পরিত্যক্ত সন্তান ও স্বামীর প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন এই প্রার্থনা। আনন্দ বাবু এই উপলক্ষে বিক্রমপুর প্রচার সভায় এককালীন ৫৲ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

দীক্ষা—গত ২১এ মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনার পর————নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানের প্রাণে ধর্ম্মক্ষুধা প্রবল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন এই প্রার্থনা।

ঢাকা নগরে গত মাঘোৎসবের সময় বাবু নলিনীকান্ত দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তত্রত্য হিন্দুসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সভা করিয়া যে সকল ব্যক্তি হিন্দু সমাজে থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছেন, তাঁহাদিগকে শাসন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। ঢাকার হিন্দুসমাজের এই চেষ্টাকে প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করা উচিত। কারণ বিশ্বাসী লোকের এইরূপ আচরণই শোভা পায়। কিন্তু এই উপলক্ষে কয়েকখানি সংবাদপত্র মনের আবেগে নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটূক্তি সকল প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। উপযুক্তরূপে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন না করিয়া, অন্যের কার্য্যের প্রতি অযথা দোষারোপ করিবার কোন প্রয়াসকে প্রশংসার বিষয় বলিয়া মনে করিবার এরূপ হেতু নাই। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রচার করিতেছেন এবং এ ধর্ম্ম প্রচার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া বা গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহাতে বাধা দেওয়া কি ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য? যদি কেহ ব্রাহ্মসমাজে আসিতে গেলেই বাধা দিতে হইবে এমন সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত হয়, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্রাহ্মগণ হঠাৎ কোন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না। উপযুক্ত বয়স না হইলে এবং দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করা হয় না। ২১।২২ বৎসর বয়সে দীক্ষিত করাকে হিন্দুসমাজের চালকগণ অনুপযুক্ত মনে করিতেছেন, কিন্তু হিন্দুসমাজেই সচরাচর কি এমন দেখা যায় না যে ১৫।১৬ বৎসরের বালক গুরু হইয়া অপরকে দীক্ষিত করিতেছে। যদি তাহাতে কোন দোষ না হয় তবে ২১।২২ বৎসরের যুবককে দীক্ষিত করিলে কি দোষ হইতে পারে? ২১।২২ বৎসর বয়সে বর্ত্তমান সময়ে যুবকগণ যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা বড় সামান্য নয়। এই বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কত যুবক শিক্ষাদান প্রভৃতি কত গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। সুতরাং উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে দীক্ষিত করিবার অভিযোগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অর্পণ করিবার উপায় নাই। ১৫।১৬ বৎসরে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে চায়, তাহাদিগকে দীক্ষিত করা ত হয়ই না বরং তাহাকে উপযুক্ত বয়সের জন্য অপেক্ষা করিতে বিধিমতে পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে। এই নলিনী বাবুও ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে উপযুক্ত বয়স এবং শিক্ষার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মগণ অল্পবয়সে প্ররোচনা দ্বারা যে কাহাকেও দীক্ষিত করেন, এমন অভিযোগ করিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে যে বালকটী সম্প্রতি ব্রাহ্ম সমাজে আগমন করিয়াছে, তাহাকে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং শীঘ্র যে দীক্ষিত করা হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যদি সে আপন ইচ্ছায় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিতে চায় এবং সহিষ্ণুতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রয়াসী হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার হেতু থাকিবে না। তখন সে অবশ্যই দীক্ষিত হইবে। এখন তাহার পিতা অতি সহজে আদালতের সাহায্য লইয়া তাহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি আপন পুত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করিলেন না, তখন ব্রাহ্মগণ কিরূপে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিবেন? ব্রাহ্মগণ সতীশকে তাহার আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেও সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং সে যে আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইতেছে না তাহার জন্য ব্রাহ্মগণকে দোষী মনে করা কখনও উচিত হইতেছে না।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৫ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নিবেদন ও প্রার্থনা।

আমাদিগের নিত্য-সহায় ও পথ-প্রদর্শক পরমেশ্বর! আমরা তোমার পবিত্র ধর্ম্মের—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদার আদর্শানুসারে চলিবার মত উপযুক্ত সামর্থ্যবান্ হইতে পারিতেছি না। আমরা দুর্ব্বল, আমাদিগের মন অতি সহজেই এক এক বিষয়ের দিকে এরূপ ঝুঁকিয়া পড়ে—এক এক সময় বিষয় বিশেষের এমন পক্ষপাতী হইয়া পড়ে যে অন্য বিষয়ে যে আমাদের কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহাতে যে কিছু জ্ঞাতব্য ও আমাদের কল্যাণকর বিষয় থাকিতে পারে তাহাও অনুভব করিবার সুবিধা থাকে না। যখন জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন হয়তঃ ভাব ভক্তি আর লভনীয় বলিয়া মনে হয় না। আবার ভক্তির দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখন হয়তঃ জ্ঞান বা কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য থাকে না। আবার নিজের যে বিষয়টী ভাল লাগে না, তাহা যদি অন্যের বিশেষ প্রিয় হয় তাহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও সমর্থ হই না। আমাদের শিক্ষার দোষে—আংশিক ও এক-দেশাত্মক শিক্ষার দোষে উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে আমরা প্রাণে ধারণ করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছি না। প্রভু পরমেশ্বর! সংসারের শিক্ষকগণ তাঁহাদের আত্মরুচি ও সংস্কারানুযায়ী শিক্ষাই আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। তাহা দ্বারা প্রকৃতরূপে প্রকৃত কল্যাণের পথে আমরা যাইতে পারি না। তুমি যদি শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদান না কর, যাহা উদার এবং সার্ব্বভৌমিক এমন সুশিক্ষা যদি তুমি প্রদান না কর, তাহা হইলে আমরা অজ্ঞান ও একদেশদর্শীদিগের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। সামঞ্জস্য একমাত্র তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। একমাত্র তুমিই আমাদিগকে সামঞ্জস্যের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতে পার। তাই বিনীতহৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে সেই শিক্ষা প্রদান কর যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি প্রেম একত্রে মিলিয়া আমাদিগকে তোমার অনন্ত কুশলের পথে লইয়া যাইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ত্যাগস্বীকার—সাধারণতঃ মানুষ বহির্দ্দর্শী। লোকচক্ষু বাহির দর্শন করে এবং বাহির দেখিয়াই বিচার করে। এই বহির্বিষয়ে মানবের দৃষ্টি এমন প্রবল যে যখন কেহ বাহিরে কোনরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে থাকে—ধন জন প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করে, তখন লোক-রসনায় তাহার আর প্রশংসা ধরে না। নানা প্রকারে এই প্রশংসার ভাষা বহির্গত হইতে থাকে। অত্যধিক প্রশংসা লাভ করিয়া আত্ম-বুদ্ধিকে প্রকৃতিস্থ রাখা সচরাচর সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এজন্য ত্যাগস্বীকারের প্রকৃত বিষয়ের প্রতি মানুষ প্রায় দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। আত্ম-দৃষ্টিহীন হইলে যে সকল অপকার সচরাচর ঘটিবার সম্ভাবনা; অতি সহজে তাহা প্রাণকে অধিকার করিতে থাকে। বাহিরের কোন বস্তু—যাহার সহিত প্রাণের স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত বিযুক্ত হওয়া, কথনই বিশেষ গুরুতর কঠিন কার্য্য নহে। তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া বা তাহার প্রতি বিরক্ত হওয়া মানবের ক্ষণকালের মানসিক উত্তেজনা বা প্রতিজ্ঞায় সম্পন্ন হইতে পারে। পরন্তু বাহিরের কিছু হইতে একবার বিযুক্ত হইলে তাহার প্রভাবও প্রাণে এমন কার্য্য করিতে পারে না যে নিশ্চয়ই আবার তাহার বশীভূত হইতে হইবে। বিশেষতঃ বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের যোগ অতি অল্পকালের জন্য;—তাহার শক্তি আমাদের প্রতি অতি সামান্যভাবে কার্য্য করে। সুতরাং তাহা হইতে দূরে থাকা বিশেষ কঠিন কার্য্য নয়, আমরা পথে ঘাটে এমন ফকীর, সন্ন্যাসী কত দেখিতে পাই, যাহাদিগের সংসারের সুখভোগের জন্য কোনরূপ চেষ্টা আছে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য প্রাণের কোনরূপ বিশেষ আকাঙ্ক্ষারও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের অন্তরের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর, তাহাদের অভিমানের উপর আঘাত পড়ে, এমন কোন কার্য্য কর, কিম্বা যে সকল প্রিয় বিষয় মনোরাজ্যে বিচরণ করে তাহার একটীকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর, তাহা হইলে

দেখিবে কেমন উগ্রতা ও তেজস্বীতা সহকারে তোমার সহিত তাহারা সংগ্রামে অগ্রসর হইবে। বাস্তবিক মনের সহিত যাহাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ, যাহাদের সহিত নিয়ত সংযুক্ত থাকিতে হয়, এমন যে মানসিক ব্যাপার, তাহা যদি পরিত্যাগ করা যায়, অভিমানকে একটু খাট করিয়া যাহার প্রতি প্রাণের প্রবল অনুরাগ আছে তাহাকে যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তবেই বাস্তবিক ত্যাগস্বীকার করিলাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নতুবা যাহার সহিত আমার প্রাণের তেমন যোগ নাই, যাহার সহিত আমাকে সর্ব্বদা সংস্রবে আসিতে হয় না, এমন বহির্বিষয় পরিত্যাগ করিলে আর বিশেষ কি হইল? আমি যে চিন্তাকে বিশেষ ভাল বাসি, তাহা যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে না পারি, যে আকাঙ্ক্ষাটী সর্ব্বদা প্রাণে জাগিতে থাকে, যদি প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারি, তবে আর বাহিরের বস্তুর সহিত সংস্রব পরিত্যাগে বিশেষ কি ফল হইল? উচ্চতর ত্যাগ স্বীকার তাহা, যাহা দ্বারা মানুষ আপন রুচি ও প্রবৃত্তিকে উচ্চতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিসর্জ্জন করিতে থাকে। যাহা আমার ভাল লাগে না, অথচ প্রবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যদি তাহাতেই নিযুক্ত হই। অথবা যাহা ভাল লাগে তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, তবেই তাহা দ্বারা আমার আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। প্রিয় প্রবৃত্তি সকলকে—চতুষ্পার্শ্ব হইতে উত্থিত প্রশংসাবাদের আসক্তিকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে বাস্তবিকরূপে কেহই কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। আপন রুচি, আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা যাহার নিকট কর্ত্তব্যসাধন অধিকতর প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তিই কেবল এইরূপ উচ্চতর ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ। নতুবা বিষয় কর্ম্মই ত্যাগ করি, আর ধনাকাঙ্ক্ষাই ছাড়িয়া দিই, কিম্বা প্রিয় পরিজন হইতেই দূরে থাকি, তাহাতে আমাকে বাস্তবিক উন্নত করিতে পারে না। আবশ্যক হইলে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার সকল প্রকার আসক্তি, প্রিয় চিন্তা, প্রিয় আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া এবং যাহা ভাল না লাগে তাহাতে নিযুক্ত হওয়া এবং যাহা ভাল লাগে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত ত্যাগস্বীকার। এইরূপ ত্যাগস্বীকারেই মানবকে উন্নত ও সাধু জীবন প্রদান করে। অন্যথা অহঙ্কার ও অস্বাভাবিক আত্মগর্ব্ব প্রাণের সকল সৎ ও সাধু উদ্দেশ্যকে দূরে লইয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন যাপন করিবার অভিলাষী তাঁহাদের পক্ষে এই উচ্চতর ত্যাগস্বীকারের দিকে যাওয়াই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন সভা—মাঘোৎসবের পরে ব্রাহ্মসাধারণের সম্মিলনের জন্য দুইটী সভা হইয়া গিয়াছে। ১ম সভা শ্রীমন্মহর্ষি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে, ২য়টী বাবু রজনীনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে হইয়াছিল। উভয় স্থলেই সকল সমাজ হইতেই ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে আবার সম্মিলন দেখিতে প্রয়াসী এবং সেই উদ্দেশ্যে নানা রূপ চেষ্টা, যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যোগ ও আয়োজন বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্মিলনের বিরোধী হওয়া ধর্ম্মরাজ্যে অতি গুরুতর অপরাধের কার্য্য। কারণ ধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষ্য বিচ্ছিন্নদিগকে সম্মিলিত করা, ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পরমেশ্বরের প্রেমে সকলকে একত্রিত করা। সুতরাং এইরূপ সদ্ভাব ও সম্মিলন স্থাপনের চেষ্টা যে বিশেষ প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা এক সময়ে এক স্থানে সমস্বরে পরমেশ্বরের স্তুতি গান করিবার জন্য মিলিত হইতেন, যাঁহারা সুখ দুঃখে পরস্পরে পরস্পরের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, পরস্পরে পরস্পরের আনুকূল্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্য হইতে এরূপ বিচ্ছিন্নতা ঘটিতে পারে এরূপ চিন্তা কাহার মনে ছিল? যাহাহউক এখন যদি সকলে মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বারম্বার একত্রিত হন এবং পরস্পরের পূর্ব্ব সদ্ভাবের স্মৃতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পুনর্ম্মিলনের প্রস্তাবটী এখন যেমন কল্পনার ব্যাপারের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর থাকে না। ক্রমে ক্রমে অনৈক্যের কারণ গুলি দূরীকৃত করিতেও বিশেষ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য আমরা এরূপ সম্মিলনের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা সম্মিলন সভাতে যেসকল ভাব প্রকাশ করি তাহা প্রকৃতরূপে সরল ও আন্তরিক হয়। একটি দোষ নিবারণ করিতে যাইয়া অন্যবিধ অপরাধে অপরাধী হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। মনের অসদ্ভাবের হেতুগুলিকে চাপা দিয়া রাখিয়া মৌখিক সদ্ভাব প্রদর্শন করিলে কপটতার অপরাধে আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে। এজন্য সরলতার সহিত মিলনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে যে সম্মিলন তাহা যদি এক ধর্ম্মগত না হইয়া এক মাত্র কোন সৎ কর্ম্ম সাধনের জন্যই হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ব্রাহ্ম-সম্মিলন হইল না। সকল ধর্ম্মসমাজের লোকের সহিত মিলিয়াই সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে এবং তাহা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে মিলন এক ধর্ম্ম, এক বিশ্বাস এবং এক অবস্থা বলিয়াই হওয়া উচিত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সভাস্থলে আলোচনার সময় অসম্মিলনের স্থানটিতে কেহই হস্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের মত শুদ্ধ মত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সদ্ভাবে আলোচনায় যদি বর্ত্তমান মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাতে কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই। আমার যে মতটা বর্ত্তমান সময়ে আছে, তাহাই চিরকাল থাকিবে, ভ্রম বুঝিতে পারিলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিব না। আলোচনা করিতে গেলে বা নিজ বিশ্বাসের কোনরূপ অযৌক্তিকতা প্রকাশ পায়, এরূপ ভয় করিয়া আলোচনায় বিরত হওয়া কখনই সরল সত্যপ্রিয় মুক্তিপ্রার্থীর পক্ষে শোভা পায় না। এজন্য সরলভাবে আমাদের পরস্পরে অসম্মিলনের স্থলগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। মতমাত্রই কিছু সত্যানুসারী নহে। একস্থলে ভ্রম ও অজ্ঞানতা আছেই আছে। সুতরাং তাহা দূর করিতে প্রয়াসী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে বিষয়ে উদাসীন হওয়ায় ইহাই প্রকাশ পায় আমরা বাহিরে বাহিরে সামান্যরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাই। কিন্তু অন্তরে গূঢ়-

ভাবে যে সকল অমিলের হেতু আছে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী নই। আমাদের একান্ত অনুরোধ সম্মিলন প্রার্থীগণ ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইয়া সত্যানুসরণকে আর সকল প্রয়োজন ও প্রিয় পদার্থ হইতে অধিকতর প্রার্থনীয় জ্ঞানে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হউন। ঈশ্বর আমাদের এই শুভ সংকল্পের সহায় হইবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের পথে প্রতিবন্ধক কি?

যে সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন, প্রায় তৎসমকালেই, জগতের অন্যান্য স্থানে অনেক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়, গুজরাটে স্বামী নারায়ণী সম্প্রদায়, মুসলমানদিগের মধ্যে ওহাবি সম্প্রদায়, ও আমেরিকার মর্ম্মন সম্প্রদায় প্রধান। এই সকল সম্প্রদায়েরই লোক সংখ্যা ব্রাহ্ম সমাজ অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। ইহার কোনও কোনও সম্প্রদায়কে আবার লোকের হস্তে যেরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নানা প্রকার অত্যাচার ও উপদ্রব সত্তেও প্রায় সকলেই জগতে স্বীয় স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেবল মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সামান্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নটী আমাদের একটী আলোচনার বিষয়।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিস্তার না হইবার তিনটী কারণ আছে। প্রথম, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় সকলের প্রায় সকলগুলিই প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিয়াছেন। কর্ত্তাভজাগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মতও ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া প্রচার করিয়াছেন; স্বামী নারায়ণী সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; মর্ম্মনগণ প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মকেই ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা প্রায় সকলেই লোকের প্রাচীন সংস্কারের সাহায্য অনেক পরিমাণে পাইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক পরিমাণে প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র এক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সকলের অভ্রান্ততা অস্বীকার করাতে ও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিবার প্রয়াস পাওয়াতে, ইহার হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের চক্ষে অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত সম্প্রদায় সকল, যে সাহায্য পাইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ সে সাহায্য পাইতেছেন না। ইহাকে ইহার বিস্তারের পথে একটী প্রতিবন্ধক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ উপরে যে সকল সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার প্রায় সকলেই নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন, এরূপ জনরব করিয়া স্বীয় স্বীয় মতে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কর্ত্তাভজাদিগের বিখ্যাত দাড়িম গাছ, ও শচীমার প্রদত্ত ঔষধ, স্বামী নারায়ণী মত প্রতিষ্ঠাকর্ত্তার অদ্ভুত দৈব শক্তি প্রভৃতির বিষয়ে যে সকল লোকপ্রসিদ্ধি আছে, তাহার বিষয় স্মরণ করিলে, উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারা যায়। এমন কি যীশুর নামে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়ার আরোপ না থাকিলে আদিম কালে খ্রীষ্টধর্ম্ম এত প্রচার হইত কি না সন্দেহ। সকল দেশেই সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা অলৌকিক ক্রিয়ার নামে ভুলিয়া থাকে। বিশেষ এদেশে। আজ যদি কেহ আসিয়া বলে, কলিকাতায় গঙ্গার ধারে একজন যোগী আসিয়াছেন, তিনি জলে ফুৎকার দিয়া দিলে সেই জলে সকল রোগ নিবারণ করে। অমনি কল্য হইতে সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনা বা ক্রিয়ার দোহাই দিতে পারিতেছেন না; সুতরাং সাধারণ জনমণ্ডলীর এদিকে ততটা আকর্ষণ হয় না। ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক পরিমাণে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা তাহাদেরই মধ্যে বদ্ধ আছে। ইহা একটা দুর্ব্বলতার কারণ। যাঁহাদের অন্তরে ইংরাজী শিক্ষার গুণে ধর্ম্মভাব একবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে আবার সেই ধর্ম্মভাবকে গড়িয়া তোলা বড় সহজ কার্য্য নহে। এরূপ কার্য্যে সত্বর ফল দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে। যে সকল অভ্যাস ও যে সকল মানসিক ভাব একবার বিনষ্ট হইয়া যায় তদনুরূপ ভাবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক দিন লাগে। এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের গতি আশানুরূপ ত্বরিত হইতেছে না।

ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও আশা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা মনে করেন যে ভারতের ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা জানি ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ইহার ঠিক বিপরীত। এই যুগ-সন্ধির সময়ে ভারতের ধর্ম্মভাব বিনাশোন্মুখ হইয়াছে, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে প্রবাহিত করাই ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। এই চেষ্টাতে কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে? সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে এই বলিতে হয়—ভারতের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে অনুরাগ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এই নূতন পথে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহার পথে পূর্ব্বোক্ত বিঘ্নগুলি বিদ্যমান্। যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত সহায়গুলির অভাব, সেই পরিমাণে যদি ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা জন্মে তাহা হইলেই এই দুষ্কর কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মজীবনের এই গাঢ়তা প্রতি জীবনে ও বিশেষতঃ প্রত্যেক পরিবার মধ্যে সাধন করিতে হইবে। দুই জন প্রচারকে ঘুরিয়া যে প্রচার না করিবেন, একটী ধর্ম্মজীবন সম্পন্ন ব্রাহ্ম পরিবার হইতে সেই কাজ হইবে। অতএব ধর্ম্মজীবনের এই গাঢ়তা ও পক্কতার দিকে ব্রাহ্ম-পরিবার সকলের ত্বরায় মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

আত্মসমর্পণ।

পরম ব্রহ্মে আত্মসমর্পণই ধর্মের চরম সীমা। আত্মসমর্পণ এই বাক্যের অর্থ কি? আত্ম ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে অন্যের ইচ্ছার অধীন করার নাম আত্মসমর্পণ। ক্রীত দাসের আত্ম ইচ্ছার লেশ মাত্র নাই। প্রভুর ইচ্ছাই তাহার কার্য্যের একমাত্র প্রেরক। এস্থলে দাস আত্মসমর্পণ করিয়াছে, একথা বলা কি সঙ্গত? না, দাস আত্মসমর্পণ করে নাই। দাস তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অথবা তাহার জ্ঞানের অগোচরে অপরের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। একজন প্রজা রাজকীয় বিধি ভঙ্গ করিয়া কারাগারে প্রেরিত হইল। কারাগারের প্রধান কর্ত্তার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বিধি ভঙ্গকারী সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এমন কি আহার বিহার, শয়ন, বিশ্রামেও তাহার স্বাধীনতা নাই। সে অধীনতার কঠিন নিগড় পায়ে পরিয়া অপরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেছে। এব্যক্তি কি আত্মসমর্পণ করিয়াছে? প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে এব্যক্তিও আত্মসমর্পণ করে নাই। সৈনিক পুরুষ সমরক্ষেত্রে আত্ম-সত্তা বিস্মৃত হইল। সেনাপতির আদেশ বাক্য যাই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি অপেক্ষা না করিয়া তাহা প্রতিপালনে প্রস্তুত। শত্রু পক্ষে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলা আসিতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল এক মনে সেনা-নায়কের ইচ্ছার অনুগমন করিতেছে। কোথায় স্ত্রী পুত্র, কোথায় জনক জননী, তাহাদের চিন্তালহরী মুহূর্ত্ত তরেও তাঁহার হৃদয় রাজ্যকে বিকম্পিত করিতেছে না, নির্ভীক চিত্তে, নির্ম্মম হইয়া প্রভুর ইচ্ছা সম্পাদনে প্রাণ মন ঢালিয়া দিতেছে। ইনি কি আত্মসমর্পণ করিতেছেন? সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইনিও আত্মসমর্পণ করিতেছেন না। ইনি কেবল কিয়ৎকালের তরে আত্ম-ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অবরুদ্ধ করিয়াছেন, সমরক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পুনর্ব্বার আত্ম-ইচ্ছার রাজ্য স্থাপিত হইবে। এমন কি সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন আহার বিহারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার আত্ম শক্তি দ্বারা পথ দেখিয়া পথ চলিতে থাকেন। একজন লোক সংসার পথে চলিতে চলিতে এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত পার্শ্বে উপনীত হইলেন। আপনার ক্ষুদ্র শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া তখন অপর বুদ্ধিমান ব্যক্তির শরণাপন্ন হইলেন। ইনি কি আত্মসমর্পণ করিলেন? না, কারণ এক বিষয়ে ইনি আপনার ইচ্ছাকে অপরের পদানত করিলেও সহস্র সহস্র বিষয়ে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া থাকেন। আমরা ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে আত্ম-ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে অপরের অধীন করিতে হইবে। সংসারে এরূপ আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত বিরল দেখা যায়। কেবল ঈশ্বর-প্রেমে প্রেমিক ব্যক্তিরাই এইরূপ আত্ম-বিক্রয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। প্রগাঢ় প্রেম না জন্মিলে লোক আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কিন্তু সংসারে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, মানুষ যাহাকে প্রগাঢ় প্রেমের নায়ক অথবা নায়িকা করিতে পারে। মানুষ মাত্রই অপূর্ণ তাহার শক্তি, তাহার রূপ, তাহার প্রেম, তাহার পবিত্রতা কিছুই পূর্ণ নহে, সুতরাং অপরের মনকে অনন্ত কালের জন্য মুগ্ধ করিতে পারে না। কেবল অনন্ত গুণাধার পরম ব্রহ্ম অনন্ত কাল জীবকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করিতে পারেন। যখন মানব তাঁহার প্রেমাকর্ষণের মুখে পতিত হয়, তখন মানবের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আপনার ভার সমুদায় তাহার হস্তে প্রদান করিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়, এবং নির্ভীক হইতে থাকে। সে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়। যদি অভ্যাস দোষে, কিম্বা মোহ পরবশে অহঙ্কার মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার শান্তির গভীরতাকে বিক্ষুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, তখন সে ত্রাহি ত্রাহি রবে সেই দয়াল ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়। এরূপ আত্মসমর্পণ সহজ সাধ্য নয়। সাধক প্রতিনিয়ত পরম ব্রহ্মের গুণরাজির ধ্যান করিতে করিতে যখন মোহিত হইয়া যায়, তখনই তাহার বিশ্বাসের আবির্ভাব হয়, বিশ্বাস গাঢ়তর হইয়া ভক্তিরূপে পরিণত হইলে, তখন আর আত্ম-শক্তির প্রতি বিশ্বাস থাকে না। ব্রহ্ম শক্তির উপর নির্ভর করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। পরে আত্মসমর্পিত হইয়া থাকে। অন্যথা আত্মসমর্পণ অসম্ভব।

সঙ্গত সভা।

গত মাঘোৎসবে সঙ্গত সভার উৎসবের আলোচনায় অনেকে আপনাপন জীবনের সার কথা ব্যক্ত করেন। তাহা আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারি নাই, এবারে তাহার স্থূল বিবরণ দেওয়া গেল।

১। এবার উৎকট পীড়ায় মুমূর্ষু হইয়া আপনার জীবনের যে অসারত্ব বুঝিয়াছি, একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা বর্ণনা করিতেছি। কথিত আছে দেবর্ষি নারদ এক সময় বীণাবাদনপূর্ব্বক এমনি হরিগুণ গান করেন যে তাহাতে বিষ্ণু দ্রব হইয়া গঙ্গারূপে ধরাতলে প্রবাহিত হন। তখন হইতে নারদের মনে মনে বড় অহঙ্কার যে গান বিদ্যায় তাঁহার মত আর কেহ নাই। কিছু দিন গত হইল, নারদ আর একবার বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নারদ! তুমি ত অনেকবার বৈকুণ্ঠে যাতায়াত করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয় ইহার সকল ঐশ্বর্য্য দেখ নাই, আইস তোমাকে দেখাইয়া লইয়া আসি। নারদ ভগবানের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রাজ্যের অনন্ত শোভা ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন; সব নূতন, সব অভাবনীয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। অবশেষে একস্থানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনন্ত সৌন্দর্য্যধাম বৈকুণ্ঠের এক নিভৃতদেশে কিম্ভূত কিমাকার কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ বিকৃতস্বরে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছে, দেখিলেন—কাহারও মস্তক নাই কাহারও হস্ত নাই, কাহারও পদ নাই, কাহারও নাসা কর্ণ ছিন্ন —সকলেই বিকলাঙ্গ। সকলের শরীর রক্তাক্ত দেখিয়া করুণ-হৃদয় দেবর্ষি কাঁদিয়া বলিলেন "প্রভো! এ ভীষণ শোচনীয় দৃশ্য আর দেখিতে পারি না—কোন্ পাষণ্ড তোমার রাজ্যে এ সুন্দর

মূর্ত্তিগুলির এ দুর্দ্দশা করিয়াছে? ভগবান্ গম্ভীরভাবে বলিলেন "উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবে। নারদ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহারা সকলে উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল "হতভাগা নারদ দেবলোকে আসিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা করিয়াছে।" নারদ অবাক্ হইয়া ভগবানের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "তোমার মায়া বুঝি না। একি কাণ্ড আমায় বুঝাইয়া দেও। আমি কোন কালে কাহারও উপরে অস্ত্রাঘাত করি নাই।" ভগবান্ বলিলেন ইহারা ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী, তুমি গীতবাদ্যে ইহাদিগের যে প্রকার প্রয়োগ করিয়াছ তাহাতে ইহাদের এই অঙ্গবিকৃতি ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। নারদের সুগায়ক বলিয়া যে অভিমান ছিল তাহা চূর্ণ হইল। ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভো! আমার গান বাদ্যে ধিক্, এখন ইহাদিগকে বাঁচাইয়া ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেও, ইহাদের ক্লেশ আর সহ্য হয় না। ভগবান্ বলিলেন তা ত আমার সাধ্যে নাই। দেব দেব মহাদেব নিকট যাও। নারদ মহাদেবের চরণে পড়িয়া আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিয়া অনেক কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পঞ্চানন দয়ার্দ্র হইয়া পিনাকযন্ত্র বাজাইয়া উন্মত্তভাবে গান করিতে লাগিলেন আর সেই বিকলাঙ্গ স্ত্রী পুরুষগণ সুন্দর পূর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চারিদিক্ বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নারদ বুঝিলেন তাঁহার সঙ্গীতাভিমান কি অসার। বিষ্ণুর নিকট গিয়া হার মানিয়া বিদায় লইলেন।

ঈশ্বরের কথা আমার মুখে শুনিয়া কেহ কেহ প্রশংসা করাতে আমার মনে নারদের মত অভিমান জন্মিয়াছিল। এই পীড়া ঘটনা দ্বারা ভগবান্ দর্পচূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন, আমি কি অপদার্থ, ভাল করিবার কর্ত্তা তিনি, যত মন্দের মূল আমি। এ শিক্ষা জীবনে ভুলিব না।

২। সঙ্গতে আসিয়া অনেক উপকার পাইয়াছি, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিব। পরের দোষ অনুসন্ধান না করিয়া গুণ দেখিতে হইবে এবং আপনার দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়া তাঁহার সকল সন্তানকে ভাল না বাসিলে উপাসনায় ফল কি? তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম যিনি জীবনের সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে সর্ব্বোপরি স্থান দেন। সাধুসঙ্গ ধর্ম্মলাভের সহজ উপায় এই আমার সিদ্ধান্ত।

৩। অবিশ্বাসের জন্য আমার মনে মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আইসে। শুষ্ক অবস্থায় শুভ মুহূর্ত্তের কথা ভুলিয়া যাই। আমাদের বিশ্বাসের আদর্শ উচ্চ, কিন্তু জীবন নীচ। ব্রহ্মশক্তি লাভ করিতে হইলে আমিত্ব বিসর্জ্জন করিতে হয়। সাধনে অগ্রসর হইতে হইলে নিয়ম ও শৃঙ্খলা চাই, জীবন স্বেচ্ছাচারী হইলে চলিবে না।

৪। ধর্ম্মজীবনের তিন অবস্থা, ১ম অন্বেষণ, ২য় ঈশ্বর স্মরণ, ৩য় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ। ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমে অনেক কষ্টে একটু প্রেমের ভাব আনিতে হইত। ক্রমে অনেক সাধু লোকের সঙ্গে মিলিয়া আত্মা সরস হইত। তখন ঈশ্বরের দয়াল নাম স্মরণ করিতে করিতে মন সন্তুষ্ট হইত। পরে তাঁর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে করিতে আত্মার সহিত তাঁর স্পষ্ট সাক্ষাৎকার উপলব্ধি হইল। তখন জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ঈশ্বরের দর্শনেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। নাম জপে অত্যন্ত উপকার হইয়াছে। নির্জ্জন সাধনও বিশেষ আবশ্যক। এই দুই উপায় দ্বারা তাঁহার সহিত যোগের ভাব স্থায়ী করিতে হয়।

৫। ছেলে দুর্দ্দান্ত হলে মা শাস্তি দেন, ভাল কাজ করিলে উৎসাহ দেন, এই কথাটী অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এখন একটু একটু বুঝিতেছি। মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর বাণী শুনা যায়। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নয় সংসারিক বিষয়েও ইহা সম্ভব। ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত একজন বহুদর্শী ধার্ম্মিক ডাক্তারের নিকট ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। যাঁহারা ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করেন তাঁহারা তাহার বাণী শুনিতে পান।

সঙ্গতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলা হয় যে ১৮৬০ সালের ২১এ ডিসেম্বর বাবু কেশবচন্দ্র সেন কয়েকটী যুবক বন্ধু লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইল। প্রথমে ইহার নাম "Society of Sympathy" বা সদ্ভাব সভা হইল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শিখ সঙ্গতের কথা উল্লেখ করাতে ইহার সঙ্গত নামকরণ হয়। সঙ্গত প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার হইত এবং ইহার সভা যে কয়েকটী ছিলেন তাঁহারা প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছিলেন। তাঁহারা কথায় যাহা স্থির করিতেন, কার্য্যেও তাহা করিতেন। তাঁহাদের কথা জীবনের কথা, এক এক দিন কথা কহিতে কহিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত। এক সময় সঙ্গত সভা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ছিল এবং ইহা হইতে অনেক শুভ কার্য্য হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারক দলের সৃষ্টি সঙ্গতের শুভফল। সঙ্গতের সভ্যগণ নানা স্থানে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। সঙ্গত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক পুস্তক ও ধর্ম্মসাধন নামক পত্রিকা বাহির হইত, ধর্ম্মসাধন পুস্তকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গতের লক্ষ্য জীবনে ধর্ম্মসাধন এবং সাধন পথে চিরকালই লোক সংখ্যা কম। প্রাচীন সঙ্গতে অনেক লোক আসিতেন, কিন্তু অল্প লোক টেঁকিয়া যাইতেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী যখন দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তখন একদল হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইল। সঙ্গত এই দলের সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। তদবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া ইহা রহিয়াছে। ইহার কখনও উন্নতি, কখনও অবনতি হইতেছে, কিন্তু ইহা এককালে গতাসু হয় নাই। গত বৎসর ইহার কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলে চলিয়াছে, এরূপ অনেক কাল হয় নাই। সঙ্গতের সভ্য সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ট প্রাণের যোগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ আশাস্থল। গত বৎসর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

"কি কি বিষয় দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ

করা যাইতে পারে, উপাসনা, ঈশ্বর-স্মরণ, সাধু সঙ্গ, সৎ গ্রন্থ পাঠ, আত্ম-চিন্তা, ঈশ্বর চিন্তা, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, দীনতা, মিসন ফণ্ড, জীবনের বদ্ধ ভাব কিরূপে মোচন হয়, রিপু দমন, সংসার বন্ধন কিরূপে মোচন হয়, পবিত্রতা, জীবনগত ও সমাজগত পবিত্রতা কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, ব্যাকুলতা, আমাদের অনেক অভাব আছে আর অভাব পূরণকর্ত্তাও আছেন, তবে কেন অভাব মোচন হয় না।

ঈশ্বরকৃপায় এই সঙ্গত সভা স্থায়ী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের কারণ হউক এবং সাধন পথে ব্রহ্মোপাসকদিগের জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিউক।

উদ্ধৃত।

মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"মনে কর একটি নবপ্রসূত বালককে জন-শূন্য অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসা গেল। আর, মনে কর একটা বন-মানুষী তাহাকে স্বীয় স্তন্য দুগ্ধে লালন পালন করিয়া তাহাকে বিধিমত হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ যুবা করিয়া দাঁড় করাইল। ক্রমে সেই মনুষ্যটি তাহার অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে বনমানুষদিগের দলপতি হইল; ইতিমধ্যে একজন মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহার মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহার ধীশক্তি মেধা ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্মনিষ্ঠা অসাধারণ তেজস্বী; এরূপ সত্ত্বেও আমাদের দেশের একজন কৃষি-বালক যাহা জানে তাহাও সে জানে না, ও তাহার সমস্ত আচার ব্যবহার বন-মানুষের মত। পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার হইতে—ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধাত্রী হইতে—বিচ্ছিন্ন হইলে, স্বাধীন চেষ্টার দশা এইরূপই হয়। ঘোড়া বা গাধা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই ঘোড়া বা গাধা হয়, কিন্তু মনুষ্যকে ধাত্রী মানুষ না করিলে মনুষ্য মানুষ হয় না; সে ধাত্রী কে? না পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার। নিকৃষ্ট জীবদিগের যত কিছু সংস্কার আছে সমস্তই নৈসর্গিক সংস্কার। মনুষ্যেরই মধ্যে কেবল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যেমন কার্য্য করে তাহার তেমনি সংস্কার জন্মে - আর, সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের প্রাণের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হইয়া দ্বিতীয় প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কার শব্দের অর্থ আর কিছু নয়—অভ্যাসের গুণে কার্য্যের প্রবৃত্তি প্রাণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া গেলে তাহাকেই আমরা বলি—সংস্কার। চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে ছাড়িয়া থাকা আর প্রাণকে ছাড়িয়া থাকা—একই। নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন মনুষ্যের প্রাণেরই ব্যাপার—অভ্যস্ত সংস্কার অনুসারে চলাও তেমনি মনুষ্যের প্রাণেরই ব্যাপার। শরীরের প্রাণ কি? না জীবন;— মনের প্রাণ কি? না সংস্কার; দুইই প্রাণ। মনুষ্যের সেই যে মনের প্রাণ (শরীরের প্রাণ নহে) মনের প্রাণ —কি না অভ্যস্ত সংস্কার, তাহা দুইটি অবয়বের সংঘাত; একটী অবয়ব পৈতৃক সংস্কার, আর একটি অবয়ব স্বোপার্জ্জিত সংস্কার। পৈতৃক-সংস্কারটিই মূল ধন;—স্বোপার্জ্জিত সংস্কারটি সেই মূল ধনের উপস্বত্ব; তাহার মধ্যে প্রধান একটি বিবেচ্য এই যে, মূল ধনটি অমনি পাওয়া যায়, উপস্বত্বটি ফলাইয়া তুলিতে হয়—কাজেই ইহাতে স্বাধীন চেষ্টা অপেক্ষিত হয়। কেবল মাত্র স্বাধীন চেষ্টাতে কিছুই হয় না—মূল ধনের উপর স্বাধীন চেষ্টা খাটাইলে তবেই তাহাতে ফলোৎপত্তি হয়। বন মানুষদিগের মধ্যে আজন্মকাল বাস করিলে, মনুষ্যের স্বাধীন চেষ্টা ব্যর্থ হয় কেন? না যেহেতু জন্মিয়া অবধি সে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির মুখাবলোকন করিতে পায় নাই—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত সংস্কার তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে মূল গাড়িতে পায় নাই—তাই তাহার স্বাধীন চেষ্টার এরূপ শোচনীয় অবস্থা। অতএব ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই যে, মনুষ্যের চিরাগত পৈতৃক সংস্কার তাহার স্বোপার্জ্জিত সংস্কারের ভিত্তি-ভূমি। মনুষ্য সেই চিরাগত পৈতৃক সংস্কারের হাত ধরিয়াই ধর্ম্ম পথে চলিতে আরম্ভ করে—প্রাণের হাত ধরিয়াই জ্ঞানের পথে চলিতে আরম্ভ করে; —পৈতৃক সংস্কারই মনুষ্যের প্রাণের অভ্যন্তরে মিশিয়া প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়; এবং সেই সংস্কাররূপী প্রাণই নব, প্রসূত জ্ঞানের ধাত্রী। মনুষ্য যদি প্রথমে ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া চলিতে না শেখে, তবে সে ক্রমাগতই হামাগুড়ি দেয়। পৈতৃক সংস্কার মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের ভিত্তিমূল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু শুধু ভিত্তিমূলে কিছুই হয় না। পৈতৃক সংস্কারের ভিত্তিমূলের উপরে স্বোপার্জ্জিত সংস্কারের গৃহ-প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। পৈতৃক সম্পত্তিও এককালে কাহারও না কাহারও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল;—তাহা আমার স্বোপার্জ্জিত না হউক, আমার পিতার স্বোপার্জ্জিত—পিতার স্বোপার্জ্জিত না হউক পিতামহের স্বোপার্জ্জিত—কাহারও না কাহারও স্বোপার্জ্জিত তাহাতে আর ভুল নাই; সর্ব্বাংশে না হউক—অন্ততঃ কতক অংশে স্বোপার্জ্জিত। ধাত্রী যখন বালককে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তখনও কি সে ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলিবে? তাহা হইতেই পারে না। ধাত্রীর কার্য্য ধাত্রী করিয়া চুকিয়াছে—এখন নিজের কার্য্য নিজে করিতে হইবে। বালক কোকিলের ন্যায় পরভৃত; তাহাকে অন্যে মানুষ করে; কিন্তু তাহার বয়স পাকিয়া উঠিলে ধাত্রীর কার্য্যটি তাহাকে নিজের হাতে টানিয়া লইতে হইবে—আপনাকে আপনি মানুষ করিতে হইবে—তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই প্রসঙ্গে অতীব একটী গুরুতর কথা সবিশেষ বিবেচ্য—সেটী এই যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য চিরকালই শিশু। এই জন্য ঈশ্বর চিরকালই মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক না এক ধাত্রী সংযুক্ত করিয়া রাখেন—কোনও কালেই মনুষ্যকে একা ছাড়িয়া দেন না। প্রথম ধাত্রী মাতা, দ্বিতীয় ধাত্রী পিতা, তৃতীয় ধাত্রী আচার্য্য, চতুর্থ ধাত্রী সমাজ, পঞ্চম ধাত্রী ঈশ্বর স্বয়ং। যখন আমরা মাতার হস্ত হইতে পিতার হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরের প্রথম ধাপে আরোহণ করি; যখন আমরা পিতার হস্ত হইতে আচার্য্যের হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা আত্মনির্ভরের দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করি; যখন আমরা আচার্য্যের হস্ত হইতে সমাজের হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা আত্মনির্ভরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করি, যখন সমাজের হস্ত হইতে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পিত হই তখন আমরা স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরের আর এক উচ্চতর সোপানে

(প্রথম ধাপের মুক্তিতে) উপনীত হই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য চিরকালই শিশু;—চিরকালই মনুষ্যকে ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলিতে হয়—এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-নির্ভর শিখিতে হয়। চিরকালই মানুষকে প্রাণের হস্ত ধরিয়া জ্ঞান এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, চির-কালই ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া চলা উচিত হয় না; এখন বলিতেছি—চিরকালই ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া না চলিলে, মানুষের গত্যন্তর নাই; দুই কথার তাৎপর্য্য দুই রূপ; প্রথম কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, এখন যে ধাপে আছ সেই ধাপের ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলা চিরকালই শোভা পায় না—স্বাধীন-চেষ্টা সহকারে উচ্চ ধাপে আরোহণ করা কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, সেই উচ্চতর ধাপে ঈশ্বর তোমার জন্য উচ্চতর ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন;—কোনো ধাপেই ঈশ্বর তোমাকে একাকী অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবেন না। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, তুমি যে কোনো ধাপে যে কোনো ধাত্রীর হস্তে থাকো না কেন—প্রত্যেক ধাপেই, ধাত্রীর হাত না ধরিয়া আপনি চলা শিক্ষা করিতে হইবে এবং নীচের ধাপে স্বাধীনভাবে চলিতে না শিখিলে উপরের ধাপে উঠিবার অধিকার তোমাতে বর্ত্তিবে না। প্রত্যেক ধাপেই মনুষ্যকে এক দিকে যেমন প্রাণের এবং প্রেমের হাত ধরিয়া চলা চাই, আর একদিকে তেমনি জ্ঞানের নিয়মানু-সারে স্বাধীনভাবে চলিতে শেখা চাই; জ্ঞান এবং প্রাণ দুইই আবশ্যক। পরমাত্মা যেমন জ্ঞান-স্বরূপ, তেমনি তিনি প্রাণ-স্বরূপ; জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে বাস্তবিক কোনো অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নাই;—একবারকার যাহা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি আর একবারকার তাহাই পৈতৃক সম্পত্তি; একবারকার যাহা জ্ঞান আর একবারকার তাহাই প্রাণ;—উপস্বত্ব যেমন মূলধনের সহিত সংযুক্ত হইয়া মূল ধনেরই অন্তর্ভূত হয়, তেমনি জ্ঞানের নিয়মানুযায়ী স্বাধীন কার্য্য অভ্যাস-গুণে প্রাণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দ্বিতীয় প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রাণ—এক, জ্ঞান দুই, এবং জ্ঞানে প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া উচ্চতর প্রাণ—তিন। এই-রূপ সোপান-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান এবং প্রাণের তরঙ্গমালা উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে থাকে। এক হইতে যেমন করিয়া দুই তিন হয়, তিন হইতে তেমনি করিয়া চার পাঁচ হয় পাঁচ হইতে তেমনি করিয়া ছয় সাত হয়—ইহা বলা বাহুল্য। এক হইতে কেমন করিয়া দুই তিন হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা-ইতেছি, তাহা হইলেই এক হইতে কেমন করিয়া শত সহস্র হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পৃথিবীতে প্রথম আগমনের সময় শিশু বালক যখন জ্ঞানেও কিছু জানে না এবং স্বাধীন চেষ্টাতেও কোনো-রূপ কার্য্য করে না, তখন সে শুদ্ধ কেবল প্রাণের হাত ধরিয়া চলিয়া ভাষা শিক্ষা করে। মাতা পিতা ধাত্রী প্রভৃতির কথাবার্ত্তা আকার ভাব-ভঙ্গী তাহার কোমল মনে চিরকালের মত বদ্ধমূল হইয়া যায়—এইরূপ করিয়া তাহার মনোমধ্যে মাতৃভাষার একটা দুরপনেয় সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়; আর, এই আজন্ম-সংস্কারটিই মাতৃভাষার প্রাণ-স্বরূপ। পরে সেই বালক বাড়িয়া উঠিয়া উপযুক্ত বয়সে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়িয়া সহস্র পণ্ডিত হউন্ না কেন—ভাষার সেই গোড়ার সংস্কারটিকে ছাড়িয়া, প্রাণটিকে ছাড়িয়া, তিনি একপদও সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালির মনের অভ্যন্তরে বাঙ্গালা ভাষার সেই মর্ম্মগত প্রাণ সর্ব্বক্ষণ জাগিতেছে বলিয়া সেই প্রাণের সঙ্গে যখন ব্যাকরণ-জ্ঞানের সংযোগ হয়, তখন সেই জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের সমবেত সাহায্যে বঙ্গভাষার ব্যবহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। একজন বিদেশী ব্যক্তি বঙ্গভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান খুবই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু তবুও সে বঙ্গভাষার প্রাণটিকে—পৈতৃক সংস্কারটিকে—নাগাল না পাওয়াতে, একছত্র বাঙ্গালা লিখিতে দশগণ্ডা ভুল করিয়া বসে। শিশু ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া যেমন চলিতে শেখে—তেমনি করিয়া সংস্কারের হস্ত ধরিয়া ইতর ভাষা অবলীলা ক্রমে শিখিয়া ফেলে; এই বৃত্তান্তটিকে "এক" বলিয়া ধর; দুই কি? না শিশু যখন পঠদ্দশায় উপনীত হয় তখন সেই প্রাণের শিক্ষাকে জ্ঞানের নিয়মানুসারে নূতন করিয়া শিক্ষা করে; নূতন ভাষা শিক্ষা করে না, কিন্তু শিক্ষিত ভাষাকে নূতন করিয়া শিক্ষা করে। ইতিপূর্ব্বে সে কথা কহিতে শিখিয়াছে এখন সে কথা কহিবার নিয়ম শিখিতেছে। এই দ্বিতীয় বৃত্তান্তটিকে দুই বলিয়া ধর। তিন কি? না কৃতবিদ্য ছাত্র পূর্ব্বশিক্ষিত প্রাণের ভাষাকে নূতন-শিক্ষিত জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে; এই তৃতীয় বৃত্তান্তটিকে তিন বলিয়া ধর। প্রথম, মাতৃক্রোড়ে ইতর ভাষার শিক্ষা লাভ—ইহাতেই প্রাণ-স্ফূর্ত্তি হয়, দ্বিতীয়, বিদ্যালয়ে ব্যাকরণাদি শিক্ষা—ইহাতে ভাষার জ্ঞান জন্মে; তৃতীয়, সেই জ্ঞান এবং প্রাণের সমবেত সাহায্যে সাধু ভাষার ব্যবহার—ইহাতে ভাষার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এইরূপে আমরা এক দুই তিন পাইলাম। চার পাঁচ ছয় ইহারই ধারাবাহিক অনুবৃত্তি। সাধুভাষা যখন আপামর সাধা-রণের প্রাণে মিশিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে—তখন, এখনকার যাহা সাধু ভাষা তখনকার তাহা ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে; এখন যাহা জ্ঞানের ফল, তখন তাহা প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে; এখন যাহা স্বোপার্জ্জিত তখন তাহা পৈতৃক হইয়া দাঁড়াইবে। তিনের পরে চার কি? না এখন-কার সাধু ভাষা তিন; এবং এখনকার সাধুভাষা যখন ভবিষ্যতের ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে—তখনকার সেই বৃত্তান্তটাকে চার বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তাহার পরে যখন উচ্চতর ব্যাকরণের নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে—তাহাই পাঁচ; এবং তাহার সাহায্যে যখন উচ্চতর সাধু ভাষা পরিগঠিত হইবে—তাহাই ছয়; চার পাঁচ ছয় এক দুই তিনেরই অনুবৃত্তি। প্রথমে প্রাণ, তাহার পরে জ্ঞান, তাহার পরে জ্ঞান এবং প্রাণের সংঘাত-জনিত উচ্চ অঙ্গের প্রাণ; আবার উচ্চতর জ্ঞান, আবার উচ্চতর প্রাণ; এইরূপে জ্ঞানপ্রাণের তরঙ্গমালা ক্রমাগতই উচ্চে হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে থাকে।

বীজের অভ্যন্তরে যেমন শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প সমস্তই একীভূত হইয়া অবস্থান করে, মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে তেমনি জ্ঞান এবং প্রাণ মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া অবস্থান করে। আবার, বীজ হইতে যেমন প্রথমে কোমল অঙ্কুর এবং পত্র পরিস্ফুট হয় ও তাহার পরে কোমল-কোমল

পত্রের বৃন্ত-মূল হইতে শাখা প্রশাখা উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হয়; মনুষ্য-জীবনেও তেমনি প্রথমে সুকোমল প্রাণ পরিস্ফুট হয়, তাহার পরে উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়। মাতৃ-দুগ্ধে যেমন করিয়া বালকের শারীরিক প্রাণ পরিগঠিত হয়, মাতৃভাষা হইতে তেমনি করিয়া বালকের মানসিক প্রাণ পরিগঠিত হয়, সে মানসিক প্রাণ আর কিছুই নহে—স্বদেশীয় সংস্কার। স্বদেশীয় সংস্কারের মধ্যে অনেক অসার বস্তু থাকিতে পারে; পৃথিবীতে যেখানে যত সার বস্তু আছে তাহাই অসার বস্তুতে পরিবৃত; এমন যে উপাদেয় বস্তু—ধান্য, তাহাও তুষে পরিবৃত; এমন যে স্বর্গীয় সুধা মাতৃ-দুগ্ধ তাহারও অসার হেয় অংশ আছে; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, তুষের দোষে ধান্যের প্রতি বিমুখ হয়—মাতৃ-দুগ্ধের হেয় ভাগের দোষে মাতৃস্তনে বিমুখ হয় —স্বদেশীয় সংস্কারের কু অংশের দোষে স্বদেশীয় সংস্কারের প্রতি সমূলে বিমুখ হয়। সকল দেশেরই স্বদেশীয় সংস্কার সুয়ে কুয়ে জড়িত—আমাদের দেশেরও স্বদেশীয় সংস্কার সুয়ে কুয়ে জড়িত; কিন্তু তাহাতে কি? তুমি একজন পরম কৃতবিদ্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি —তুমি যদি স্বদেশীয় সংস্কারের সুকে কু হইতে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইতে না পার, তবে তোমার জ্ঞান কিসের জন্য? আপনাদের কু হইতে যদি আপনাদের সু বাছিয়া লইতে না পার —তবে অন্যের কু হইতে কেমন করিয়া অন্যের সু বাছিয়া লইবে? তাহা তো হইতেই পারে না! ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লোকেরা আমাদের দেশের শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যত সু আছে তাহার অমৃত-রস এতকালের পরে—এখন—আস্বাদন করিতেছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাদের আপনাদের কু হইতে সুকে বাছিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন—এবং তাহারই গুণে তাঁহারা আমাদের দেশের সুয়ের রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছেন। যাহার বক্ষে আমরা শৈশবকাল হইতে লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি—সেই সকল স্বদেশীয় গার্হস্থ্য এবং সামাজিক সংস্কারের রসাস্বাদন করা এবং মাতার স্তন্য দুগ্ধের রসাস্বাদন করা—একই কথা। স্বদেশীয় সংস্কারের রসাস্বাদন করা প্রাণের কার্য্য;—জ্ঞানের কার্য্য কি? না জঠরানল যেমন স্তন্য দুগ্ধের সারভাগ আত্মসাৎ করে, অসার ভাগ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানানল তেমনি সংস্কারের সু-ভাগ আত্মসাৎ করে এবং কু-ভাগ পরিত্যাগ করে;—কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না—অন্ন উদরস্থ না হইলে জঠরানল কিছুই করিতে পারে না; স্বদেশীয় সংস্কার প্রাণে রীতিমত বদ্ধ-মূল না হইলে জ্ঞান একাকী কিছুই করিতে পারে না। প্রাণের তৃপ্তি-সাধক অন্ন হইতে সার মন্থন করিয়া লইয়াই জ্ঞান উচ্চতর প্রাণের মূল পত্তন করে। প্রাণকে ছাড়িয়া জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না; চিরাগত পৈতৃক সংস্কারকে ছাড়িয়া স্বাধীনতা কিছুই করিতে পারে না। আবার, জ্ঞানকে ছাড়িয়াও প্রাণ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারে না; জাগ্রত জ্ঞান এবং স্বাধীন চেষ্টা ব্যতিরেকে—পৈতৃক সম্পত্তিরও উন্নতি হইতে পারে না—পৈতৃক সংস্কারেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানও চাই, প্রাণও চাই,—দুয়ের কেহই কাহারো ছোটো নহে কেহই কাহারো বড় নহে দুইই সমান। ক্রমশঃ

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

পিরোজপুর।

"করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপাবলে পিরোজপুর ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠিতম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—

১০ই মাঘ বুধবার। সায়ংকালে, উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কাজ করেন। প্রকৃত, দীন ও ব্যাকুলভাবে উৎসবে উপস্থিত হইতে উপদেশ দেন।

১১ই বৃহস্পতিবার। দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনা ও কীর্ত্তন। মন্মথ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। আমাদের উপর দিয়া উৎসবের পর উৎসব চলিয়া যাইতেছে কিন্তু আমাদের উপযুক্ততার অভাবে তাহার স্থায়ীফল লাভ করিতে পারিতেছি না, এবার যেন আমরা তাহা প্রাণে স্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তুত থাকি" এই বলিয়া উপদেশ দেন। পরে মার্টিন লুথারের জীবন চরিত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে, উপাসনা, তৎপর অপরাহ্নে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন এবং সায়ংকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্যের কায করেন। তিনি প্রকৃতিবাদ, পৌত্তলিকতা অবতার বাদ ও মধ্যবর্ত্তী বাদের দূষণীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন।

১২ই শুক্রবার। প্রাতে, নগরমধ্যে উষাকীর্ত্তন হয় পরে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। মহিম বাবু উপাসনা করেন। সায়ংকালে, উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। মন্মথ বাবু উপাসনা করেন।

১৩ই শনিবার। প্রাতে, উপাসনা ও কীর্ত্তন হয় মহিম বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় উপাসক মণ্ডলী ও স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক বলেশ্বর নদের পার দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অনতি দূরে একটী রমণীয় স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিয়ৎকাল ব্রহ্মোপাসনা ও কীর্ত্তন করেন। পরে আবার সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সায়ংকালে মন্দির মধ্যে প্রত্যাগত হন। প্রত্যাগমন কালীন কীর্ত্তন অত্যন্ত প্রেমোচ্ছাসপূর্ণ হইয়াছিল। সায়ংকালে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়, মন্মথ বাবু আচার্য্যের কাজ করেন।

১৪ই রবিবার। প্রাতে, উপাসনা ও কীর্ত্তন, মহিম বাবু আচার্য্যের কায করেন। অপরাহ্নে, ৩ ঘটিকার পর বিশেষ প্রার্থনান্তে, সমাগত অন্যান্য বন্ধুগণ সহ উপাসক মণ্ডলী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করেন। সায়ংকালে, উপাসক মণ্ডলী নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে উপনীত হওয়ার পরই উপাসনা হয় এবং মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন হইয়াছিল। ক্রমশঃই ব্রহ্ম কৃপার স্রোতঃ সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেক শুষ্কতা ও নিরাশার পর এই প্রেম স্রোতঃ অত্যন্ত আনন্দজনক হইয়াছিল। উপাসনান্তে মন্মথ বাবু নিম্নলিখিত উপদেশ দেন। আধ্যাত্মিকতায় আমরা সকলেই অন্ধ। কিন্তু মায়ের কৃপায় বাহ্যিক অন্ধতার ন্যায় এই অন্ধতা দুরারোগ্য

নহে। জড়জগতের ন্যায় আমাদের হৃদয়াকাশে পুনঃ পুনঃ সূর্য্যোদয় ও গ্রহণ হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি অবিনাশী জানিয়া যিনি তদ্দর্শনের জন্য অন্ধকারের মধ্যেও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করেন তিনিই কৃতার্থ হন।"

উপাসনান্তে সমাগত বন্ধুগণকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। উৎসবের কয়েকদিন সমাগত কয়েকটী অন্ধ আতুরকে পয়সা দেওয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বাবু সারদাচরণ দত্ত প্রতিদিনের উপাসনাতে তাঁর বিশুদ্ধ সঙ্গীত ধ্বনিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ হউক, এই একান্ত প্রার্থনা।"

বাঁকুড়া।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের কার্য্য বিবরণ এই।—

১৫ই ফাল্গুন বুধবার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস প্রাতে উপাসনা হয়, উপাসনার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা হইতে আগমন করেন। বৈকালে গরিব দুঃখীদিগকে চিড়া দধি ও মিঠাই বিতরিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সায়াহ্নে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে উপাসনা হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গনে "নবযুগের নব আকাঙ্ক্ষা" সম্বন্ধে একটী সুযুক্তি পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে অনেক ছাত্র, আফিসের কর্ম্মচারি ও কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনরী উপস্থিত ছিলন। সুখের বিষয় এই বলিতে হইবে যে বক্তৃতা স্থলে দুইজন ইংরাজ মহিলা এবং কয়েকজন ভদ্র বাঙ্গালী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই ফাল্গুন প্রাতে উপাসনায় শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুই প্রহরে সমাজ গৃহে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনাতে কয়েক জন ছাত্র যোগ দিয়াছিলেন। অদ্য বৈকালে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনধার্য্য ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ছাত্রে ও বাহিরের লোকে সমাজ-প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটী গান এবং প্রার্থনার পরে ডিঃ ইঃ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ মহাশয় সমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। রাত্রি কালে উপাসনাতে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনায় আচর্য্যের কার্য্য করেন। বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্য রাত্রে কলিকাতায় গমন করেন

১৮ই ফাল্গুন শনিবার প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু কেদার নাথ কুলভি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মজ্ঞান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সময় মন্দিরে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে মন্দিরে স্থানাভাব বশতঃ অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছিল। কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সকলেই বক্তৃতায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯শে ফাল্গুন রবিবার প্রাতে বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে বিদ্যারত্ন মহাশয় শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। রাত্রে বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শান্তি নিকেতন।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ধর্ম্মধন জীবনে উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহা কি স্বর্গীয় মনোহর বস্তু। ধর্ম্ম লুকায়িত থাকিবার বস্তু নহে; একবার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলে, শতধারে নানা দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। নদী সকল যেমন নানা দিকে শাখা প্রশাখা প্রসারণ করতঃ সুদূরস্থিত ভূমিকেও শস্যশালিনী করিয়া তুলে, জীবন্ত ধর্ম্মও তদ্রূপ নানা আকারে বিবিধ প্রকারে দেশ জাতি নির্ব্বিশেষে মানবের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হয়। কখনও দয়ারূপ ধারণ করিয়া দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া দেয়, কখনও প্রেমরূপ ধারণ করিয়া জীবের সুখবর্দ্ধনে আত্মসমর্পণ করে; কখনও জ্ঞানরূপী হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানরশ্মি বিতরণ করে; আর কখনও বা জলন্ত নীতিরূপ ধারণ করিয়া জগতের পাপভার বিমোচন করিতে থাকে। ধর্ম্ম চিরজাগ্রত, চির কর্ম্মশীল ও নিঃস্বার্থ। বস্তুতঃ ত্যাগই ইহার প্রাণ এবং ইহার অস্তিত্বের অমোঘ প্রমাণ। ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি এই বৈরাগ্যের এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। যে বৈরাগ্য বিভূতিভূষণে চীরধারণে পর্য্যবসিত, আমি তাহার কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে বৈরাগ্য সংসারের বস্তু লইয়া থাকে সত্য, কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্বীয় ইষ্ট দেবতার জন্য সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। পুণ্যচেতা মহর্ষি ঈশ্বরের কৃপায় বিপুল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন বটে, কিন্তু যদি তাঁহার বৈরাগ্য দেখিতে চাও, তবে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি পরমেশ্বরের জন্য এই অতুল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়াছিলেন, সেই দিনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। যিনি রাজার সন্তান হইয়া ধর্ম্মের জন্য ফকির হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি নানা প্রকার বৈষয়িক বিঘ্ন বিপত্তির ও বিত্তনাশের আশঙ্কাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, ভগবানের চরণকেই একমাত্র সার বস্তু জানিয়া, অচল অটলভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার বৈরাগ্যই বাস্তবিক বৈরাগ্য; কারণ ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সমুদ্রস্থিত দিগ্দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্ব্বদাই উত্তরমুখী হইয়াই থাকে, তদ্রূপ তাঁহার আত্মাও সংসারের অতুল বিভবের মধ্যে ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে। স্বর্গীয় বৈরাগ্যের এই অসামান্য দৃষ্টান্ত স্মরণে, আমার সংসারাসক্ত হৃদয় আজ কম্পিত হইতেছে। যখন আমি এই বিবরণটি শুনিয়াছিলাম, তখন হইতে আমার অকিঞ্চিৎকর

হৃদয়ের বিষয় বন্ধন যেন কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। জীবন পুস্তিকার প্রত্যেক পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া দেখি, সেখানে একটিও এরূপ বৈরাগ্যের অক্ষর দেখিতে পাই না। মনে হয়, হায়! আমরা পথের ফকির, আমাদের বৈরাগী হওয়া ত সহজ, তথাপি আমাদের হৃদয়ে এত বিষয়াসক্তি কেন? ঈশ্বরের কৃপায় আমরা ব্রাহ্মসমাজে অনেক স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিয়াছি; প্রেম চিনিয়াছি ভক্তি চিনিয়াছি, সেবার আস্বাদন পাইয়াছি, ভগবানের প্রেম মুখের ছবি কথঞ্চিৎ দেখিয়াছি। সেই জন্যই সাক্ষ্য দিতেছি যে, যে সকল সাধু মহাত্মার নির্ম্মল, স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে এই সকল স্বর্গীয় ভাব প্রতিবিম্বিত হয়, মহর্ষির অসামান্য হৃদয় তন্মধ্যে একটি। তাঁহারই পুণ্যতেজ পূজ্যপাদ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া, সেই ধর্ম্মাগ্নি উৎপাদন করিয়াছিল, যাহার আলোক আজ ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মহামূল্য জীবনের যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মহর্ষির উজ্জ্বল জীবন অদ্যাপি উনবিংশ শতাব্দীর ঘোর নাস্তিকতার মধ্যে বিশ্বাসের সাক্ষী হইয়া বিরাজ করিতেছে। হে ভারতবর্ষ! তুমি আজ আনন্দে নৃত্য কর। হে হিন্দু জাতি! তুমি আজ আনন্দ-ধ্বনিতে গগন নিনাদিত কর। যে ঋষি-জীবনের তোমরা এত গৌরব কর, ও যাহা এত কাল প্রাণহীন বেদ বেদান্তের অক্ষরে নিবদ্ধ ছিল, তাহা আজ মূর্ত্তিমান দর্শন কর। কিন্তু হায়! কি গভীর দুঃখের কথা, এমন জীবন্ত বিশ্বাসের ছবি দেখিয়াও আমরা বিশ্বাস করিতে শিখিলাম না, প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া শোক সন্তাপ দূর করিতে পারিলাম না। দয়াময়! তুমি দয়া কর, এই যুগে ভারত-ক্ষেত্রে তুমি যে প্রেম লীলা করিতেছ, তাহা দ্বারা আমরা যেন লাভবান্ হইতে পারি।

মহর্ষির ধর্ম্মভাব কি কেবল বৈরাগ্য রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে? না। তাঁহার দয়া ও প্রেম অর্থাকারে কত স্থানে যাইয়া কত উপকার সাধন করিতেছে। "শান্তি নিকেতনও এই ভগবদ্ভক্ত হৃদয়ের এক তরঙ্গ। তিনি নির্জ্জনে ভগবানের সহবাস লাভ করিবার জন্য অনেক দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একাকী ইহা সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইলেন না; প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্ম সমাজকেও ইহার অংশী করিবেন বলিয়া তিনি এই গৃহটীকে একটী ব্রাহ্ম আশ্রম করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে দীন দুঃখী ব্রাহ্মগণ সেখানে যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ আয়োজনও করিয়াছেন। আগন্তুকদিগের সুবিধার জন্য নিজের ব্যয়ে পাচক ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, গৃহটিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একজন সুযোগ্য আশ্রমধারী নিযুক্ত করিয়াছেন। শারীরিক অভাব দূর করিবার জন্য যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, মানসিক অভাব পূরণের জন্য তেমন একটি ব্রাহ্ম পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, আর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত ও নিত্য উপাসনার অনেক সুবিধা করিয়াছেন। গৃহটি অতি সুন্দর, ঠিক এক খানি ছবির ন্যায়। চতুর্দ্দিকে ফল ফুলের উদ্যান, মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর অপ্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে, আর উদ্যানের পরেই সুদূর-প্রসারিত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র বিবরণ হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে স্থানটী কত নির্জ্জন ও নীরব। শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। কখন কখনও কেবল বিহঙ্গ-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত কল নিনাদ নির্জ্জনতার গভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া, আকাশকে নিনাদিত করিয়া মনে এক প্রকার অবর্ণনীয় বিষাদ উৎপাদন করে। আমি প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এখানে ছিলাম। এই সময়টি যে কি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মহর্ষির নিয়মানুসারে এখানে কোন প্রকার বৃথা জল্পনা হইতে পারে না, কেবল ধর্ম্ম, নীতি ও জনহিতকর বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে। সুতরাং কোন প্রকার বৃথা আলাপ অথবা ধর্ম্ম জীবনের মহা শত্রু পরনিন্দা আমার জিহ্বাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সৎপ্রসঙ্গে, সদালাপে ও অধ্যয়নাদিতে সময় অতিবাহিত হইত। ইহা অপেক্ষা জীবনের সদ্ব্যবহার আর কি হইতে পারে? আশা করি ব্রাহ্মগণ সময়ে সময়ে এখানে যাইয়া নির্জ্জনে আত্মার অন্তরতম স্থানে অবগাহন করতঃ প্রাণারাম পরমেশ্বরের ধ্যানে ও আত্ম-তত্ত্ব নির্দ্ধারণে কিয়ৎকাল যাপন করতঃ বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিয়া লইবেন, ও তদ্দ্বারা পূজ্যপাদ মহর্ষির মনোরথ সিদ্ধ করিবেন।

১১ই ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল } নিবেদক
৫৭।১ সিমলা ষ্ট্রীট। } শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়,

জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত পুলিশষ্টেশন সিংড়ার অধীন আতাইকুলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বাগছী মহাশয় তাঁহার পরলোক গতা সহধর্ম্মিণী ৺হরি মোহিনী দেবীর স্মরণার্থ ১০০৲ একশত টাকা বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব-কৌমুদীর পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়া চির বাধিত করিবেন। পত্রখানা এইরূপ।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মৈত্রেয়
বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়

আমার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী ৺হরি মোহিনী দেবীর স্মরণার্থ আমি এই সর্ত্তে বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে নিম্নলিখিত নম্বরের মঃ ১০০৲ এক শত টাকার এক কিতা গবর্ণমেণ্ট করেন্সি নোট সমর্পণ করিতেছি যে ঐ টাকায় বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নামে গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট, কোম্পানীর কাগজ, ক্রয় করিয়া তাহার বার্ষিক সুদ হইতে বর্ষে বর্ষে বাৎসরিক উৎসবসময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নির্ব্বাচনানুসারে যথোপযুক্ত দীন দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র দান করিতে হইবেক। আসল টাকা কোনও কারণে নষ্ট বা ব্যয়িত হইবে না এবং যিনি যখন সম্পাদক থাকিবেন তিনি কেবল সুদ হইতে উল্লিখিত দান নির্ব্বাহ করিবেন। যদ্যপি ভবিষ্যৎ কালে কোনও সময়ে

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তৎকালের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের অধিকাংশের মতানুসারে সম্পাদক উক্ত কোম্পানীর কাগজ উল্লিখিত সর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য অন্য কোন দানশীল সাধারণ সভার হস্তে প্রদান করিবেন। যদ্যপি কোন এক বৎসর ব্রাহ্মসমাজ উল্লিখিত দান প্রদান না করেন, তাহা হইলে সেই বৎসরের সুদসহ আসল টাকার কোম্পানীর কাগজখানি আমাকে অথবা আমার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনিকে প্রদান করিতে ব্রাহ্মসমাজ বাধ্য থাকিবেন; আশাকরি মহাশয় আমার এই ক্ষুদ্র নিয়োগ পরিপালন করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিবেদন ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারি।

নিতান্ত অনুগত

শ্রীদ্বারকানাথ বাগচি।

উক্ত দান পত্রানুসারে কার্য্য করিবার জন্য বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় যে সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়ের প্রশংসনীয় দানের জন্য সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও তাহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিক সদ্গতির প্রার্থনা উক্ত বাগচি মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইবেন ও তৎসহ অদ্যকার নির্দ্ধারিত প্রস্তাব গুলির প্রতিলিপি তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত বাগচি মহাশয়ের প্রদত্ত একশত টাকা আপাততঃ ব্রাহ্মসমাজের সেভিংব্যাঙ্ক হিসাবে জমা দিয়া, রাজসাহী ঘোড়া মারা পোষ্টাফিসের যোগে যত সত্বর সম্ভব, রাজসাহীর কালেক্টরী হইতে সুদ পাওয়ার সর্ত্তের একশত টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

৩। উক্ত কোম্পানীর কাগজ সম্পাদকের নামে ক্রয় করা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন সম্পাদক কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের কমিটী বা সভ্যগণ ঐ মূলধনের কোম্পানীর কাগজ কোন কারণে নষ্ট বা ব্যয় করিতে পারিবেন না।

৪। যিনি যখন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি বর্ষে বর্ষে ঐ কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করত তদ্দ্বারা বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নির্ব্বাচনানুসারে যথোপযুক্ত দীন দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিবেন।

৫। যদ্যপি ভবিষ্যৎ কালে, (ভগবান না করেন,) কোন কারণ বশতঃ বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তৎকালের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের অধিকাংশের মতানুসারে সম্পাদক উক্ত কোম্পানীর কাগজ উল্লিখিত সর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য অন্য কোন দানশীল সাধারণ সভার হস্তে প্রদান করিবেন।

৬। এই দান প্রতি বৎসরেই করিতে হইবেক। কোনও কারণে তাহার অন্যথা হইতে পারিবে না। যদ্যপি কোন কারণে এক বৎসর দান না হয় তাহা হইলে সেই বৎসরের সুদসহ আসল টাকার কোম্পানীর কাগজখানি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বাগচী মহাশয়কে, কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনিকে প্রদান করিতে সম্পাদক ও বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ বাধ্য থাকিবেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বাগচী মহাশয়ের লিখিত ১৮৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের উপরোক্ত নিয়োগানুসারে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সভ্যগণ কমিটী ও সম্পাদক বাধ্য থাকিয়া উক্ত নিয়োগ যথাধর্ম্ম পরিপালন করিবেন।

বশম্বদ

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ, } শ্রীগুরুগোবিন্দ সাহা, সহকারী সম্পাদক।

মহাশয়,

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত দুইটী প্রশ্ন অনেক দিন হইল আমার মনে উদিত হইয়াছে। কিন্তু কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই, আপনি কিম্বা অন্য কেহ উত্তর দান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

১। পুণ্যময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট রাজ্যে পাপের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

২। সমস্ত মানব পরম পিতা পরমেশ্বরের পুত্র, তাঁহার দয়া সকলের প্রতি সমান। সংসারে দেখিতে পাই পিতা মাতার কর্ম্ম দোষে কোন সন্তান জন্মাবধি নানা রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, কেহ বা জন্মান্ধ হইয়া নানা শোক তাপে জীবন যাপন করিতেছেন, আবার কেহ বা সচ্চরিত্র পিতা মাতার সন্তান হইয়া সুস্থ শরীরে সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কেহ বা জন্মাবধি প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, কেহ বা অল্প বুদ্ধি, কেহ বা ধনী, কেহ বা দরিদ্র। যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল ভোগে অবিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে জন্মগত এ পার্থক্য কেন?

ব্রাহ্ম সমাজ।

ত্রুটীস্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দিনাজপুরস্থ প্রতিনিধি পার্ব্বতীকান্ত সেন মহাশয় গত অগ্রহায়ণ মাসে, পরলোকগত হইয়াছেন আমরা যথাসময়ে এই সংবাদ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় দিনাজপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায় বিশেষভাবে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

নামকরণ—বিগত ২৩শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বনগ্রাম সবডিবিজনের কোর্ট সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে এই উপলক্ষে প্রসন্ন বাবু, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিবাহ—বিগত ৩রা চৈত্র শনিবার ভাগলপুর প্রবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলা ঘোষের সহিত সীতমারী প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে এই বিবাহোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৯৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিবাহ—বিগত ২৩এ ফাল্গুন কলিকাতা নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ইনি দার্জিলিংস্থ গবর্ণমেণ্ট ভুটিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার। পাত্রী শ্রীমতী কিশোরবালা দেবী। ইনি অল্প বয়েসে বিধবা হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্প্রতি বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

উৎসব—বিগত ২৩এ ফাল্গুন কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত দিবস প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে মন্দিরে পাঠ ও সংকীর্ত্তন হয়। এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে নব নির্ম্মিত চাঁদনীর নিচে বসিয়া সংকীর্ত্তন করা হয়। এই উৎসবোপলক্ষে গরিবদিগকে পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

প্রায় ৩৫ বৎসর হইল এই কুমিল্লা নগরীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজ সংস্থাপনাবধি অনেক কাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত স্থানও নির্দ্দিষ্ট গৃহাভাবে সমাজের সভ্যগণ নানা স্থানে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। অল্প দিন হইল, বহু আয়াসে একখণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হইয়া একখানা সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমাজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গৃহটীর ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম-পিপাসু সমাগত ব্যক্তিদিগকে তন্মধ্যে স্থান দান করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে; বিশেষতঃ কুমিল্লাতে অগ্নিভয়ের প্রবলতা থাকায় সামান্য খড়ো ঘরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও নিতান্ত শঙ্কিত থাকিতে হয়। এই সমুদয় অসুবিধা দূরীকরণার্থ সমাজের সভ্যগণ একখানা পাকা ঘর প্রস্তুত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই কার্য্যে অন্যূন ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার প্রয়োজন; কিন্তু এই প্রকার বহুব্যয় সাধ্য কার্য্য সাধারণের অর্থানুকূল্য ব্যতীত সম্পাদিত হওয়া কোন ক্রমে সম্ভবপর নহে। অতএব বিনীত প্রার্থনা এবং আশা এই যে, স্থানীয় এবং বিদেশীয় ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। যিনি যাহা দিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইবেন।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ
২৫এ শ্রাবণ, ১২৯৬।

নিবেদক
শ্রীগুরুদয়াল সিংহ
সম্পাদক।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি ১৮৮৯ ডিসেম্বর।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু অতুল চন্দ্র দাস,	ঢাকা	৩৲
,, শ্রীনাথ গুহ	ঐ	৬৲
,, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	লাহোর	২॥০
,, গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার,	কলিকাতা	॥০
,, জহরি লাল পাইন,	ঐ	১৲
,, শশিভূষণ সেন,	ঐ	১৲
,, কেদার নাথ রায়,	ঐ	২॥০
,, পার্ব্বতীনাথ দত্ত,	ঐ	২।০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	॥০
,, দ্বারকা নাথ ঘোষ,	ঐ	১৲
শ্রীমতী যোগেন্দ্র মোহিনী চট্টোপাধ্যায়,	কালনা	১৲
বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়,	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর,	সুলতানপুর	১॥০
বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১৲
,, রজনীকান্ত নিয়োগী,	ঐ	১৲
,, মনোমোহন বিশ্বাস,	ঐ	১৲
,, শরচ্চন্দ্র সোম,	ঐ	২৲
,, গুরুচরণ মহালানবিশ,	ঐ	২॥০
,, মতিলাল হালদার,	ঐ	২॥০
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত,	ঐ	১৲
,, শ্যামাপদ রায়,	ঐ	৩৲
,, অধর চন্দ্র দাস,	ঢাকা	৩৲
,, কালীনারায়ণ গুপ্ত,	ঐ	৬৲
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস,	ঐ	২৲
,, হারাণ চন্দ্র সরকার,	কুমারখালি	৩৲
,, শশিকুমার বসু,	ময়মনসিংহ	৫৲
,, গোলকচন্দ্র দাস,	ঐ	২৲
শ্রীমতী জয়াবতী চক্রবর্ত্তী,	ঐ	২৲
বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী,	ঢাকা	৩৲
,, জগদ্বন্ধু লাহা,	ঐ	৩৲
,, মতিলাল দাস,	ঐ	৩৲
শ্রীমতী বামাসুন্দরী সেন,	ঐ	॥০
বাবু গিরিশচন্দ্র গুহ,	নারায়ণগঞ্জ	৩৸০
,, রাজকুমার চন্দ,	ফরিদপুর	৫।০
,, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কুমারখালি,	৫৲
,, মহেশচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	১।০
,, বিপিনবিহারী সেন,	ঐ	১৸৴০
,, শ্রীশচন্দ্র দত্ত,	হুগলী	৩।০
,, দ্বারকানাথ গুপ্ত,	স্বর্ণগ্রাম	৭॥০
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত,	কলিকাতা	॥০
শ্রীমতী রাজবালা রায়,	হরিনাভি	৩৲

(ক্রমশঃ)

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১২ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১২শ ভাগ।
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র শুক্রবার ১৮১১ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

নিবেদন ও প্রার্থনা।

পূর্ণ ন্যায়বান্ পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তাই বুঝি আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না? তুমি নিজে ন্যায়ে পরিপূর্ণ হইয়া কেমন করিয়া আর অনধিকার চর্চ্চা করিবে, তাই বুঝি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও আমরা তোমার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছি, তুমি কিছুই বলিতেছ না। ইহা দ্বারা আমরা কি বুঝিব যে তুমি আমাদের উদাসীন? না প্রভু অনন্ত প্রেমের আধার তুমি তোমাতে এরূপ উদাসীনতাও ত সম্ভবেনা। তবে কেন তোমার প্রবল শাসন শক্তির পরিচয় আমরা পাইতেছি না? কেন তুমি দুর্জ্জয় শক্তিতে এই সকল অনাচারী অত্যাচারী সন্তানগণকে পরাস্ত করিয়া তোমার বশীভূত করিতেছ না? আমাদের এই অবাধ্যতা—তোমার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহারকেও যখন তুমি সহ্য করিতেছ, দেখিয়া শুনিয়াও যখন আমাদিগকে কেশে ধরিয়া সুপথে আনয়নপূর্ব্বক সুমতি প্রদান করিতেছ না, তখন বুঝিতেছি, তোমার ন্যায়পরতার ব্যাঘাত করিয়া তুমি কিছুই করিবে না। আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে ধরা না দিই, যদি প্রাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া না দিই, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমার করিয়া লইবে না, প্রাণে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণকে তোমার বশীভূত করিবে না। হে প্রভু আমরা তোমার নিকট হইতে যে স্বাধীনতা পাইয়াছি যাহা দ্বারা আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে। এখন দেখিতেছি—তাহাই আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে। যে উপায় দ্বারা পথের জঞ্জাল উন্মুক্ত করিব তাহা দ্বারাই আমরা জঞ্জাল বৃদ্ধি করিতেছি। হে প্রভু কৃপা করিয়া সুমতি দেও। এমন স্বাধীনতা তুমি কাড়িয়া লও। তোমার রাজ্যে তুমি থাকিবে, তোমার সন্তানের উপর তুমি কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাতে আবার ইতস্ততঃ কেন। কাটিয়া দেও, আমাদের বিকৃত স্বাধীনতার জাল, বিকৃত স্বাধীনতার অহঙ্কার। বশীভূত হইবার পক্ষে আমাদের প্রাণের ক্ষতি হউক, প্রাণের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষে যে কোন বাধা আছে, তাহা বিমোচন কর। সাক্ষাৎ ভাবে তোমার হইয়া তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া, তোমাকে মান্য করিতে শিখি। তোমার আনুগত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বর্ষান্ত—দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির অনতিক্রমনীয় নিয়মে আমরা আর একটী বৎসর অতিবাহিত করিয়া আসিলাম। আমাদের মস্তকের উপর দিয়া এই সম্বৎসর কাল কত সুখ দুঃখ স্রোত বহিয়া গিয়াছে। আমাদের কত পাঠক হয়ত আপনার প্রাণপ্রতিম প্রিয়তমের সহিত চিরবিচ্ছেদের শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কত জন বা আবার প্রিয়জন সম্মিলনে পরম পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিই ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন—যাঁহার প্রাণ সম্বৎসর পরে আত্ম-পরীক্ষায় আপনাকে পরমমাতার প্রেম-প্রসাদ লাভে লাভবান্ দেখিয়া আত্ম-প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছে। তিনিই যথার্থ সজ্জীবন যাপন করিয়াছেন, যিনি সংসারের সকল অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে চিরধ্রুব ও অবিনশ্বর পরম প্রভুর আশ্রয় অটলভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংসারের সুখ দুঃখ বন্যার স্রোতের ন্যায় আসে আর যায়। কিন্তু ধ্রুবসত্য পরমেশ্বরের সহিত ঘনিষ্ট যোগ হইতে যে শান্তি ও আরাম পাওয়া যায়, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আর কোনই আশঙ্কা নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সেই পরমৈশ্বর্য্যবানের সহিত আপনার ঘনিষ্টতা স্থাপনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন এবং দিন দিন সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমই সার্থক হইয়াছে। এই প্রকারের লোক সংখ্যা যে সমাজে অধিক হয় সে সমাজ ধন্য, এইরূপ লোক যে পরিবারে বৃদ্ধি পায় সে পরিবার ধন্য। বৎসরান্তে আমাদের মধ্যে সকলেরই এই সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য যত্নশীল হওয়া আবশ্যক যে আমরা চির সত্যের সহিত সংযুক্ত হইতেছি। তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। সে দিকে যদি আমাদের অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি পতিত না হয়, তবে বৃথা ধনোপার্জ্জন আর যশোপার্জ্জনে ফল ... তাহা সংসারের বস্তু সংসারেই থাকিবে। কৃপাময় পরমেশ্বর বৎসরান্তে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা সকলে সকল প্রকার অনিশ্চিত ও অস্থায়ী পদার্থের মধ্যে চিরস্থায়ী ধ্রুবসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। চির জ্যোতির

সন্ধান পাইয়া সকল প্রকার ভয় ও আঁধারের হাত হইতে উত্তীর্ণ হই।

পিপাসার চিহ্ন—পিপাসু লোকদিগের মধ্যে এই একটী বিশেষ চিহ্ন দেখা যায়, তাঁহারা যখনই কোন ধর্ম্ম কথা বা সাধন তত্ত্ব শুনেন, তখনই কিরূপে সেটী জীবনে পরিণত করিবেন, সেজন্য ব্যাকুল হন। অপর লোকেরা ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেই পরিসমাপ্তি। তাহার পরে আর সে বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ বা সে বিষয়ে কোন চিন্তা তাহাদের থাকে না। কিন্তু পিপাসু লোকেরা তাহাকে জীবনগত করিবার জন্যই ব্যাকুল হন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় দেখা গিয়াছে, মন্দিরে যে উপদেশ প্রদত্ত হইত শ্রোতাগণ তাহা শুনিয়াই তৃপ্ত হইতেন না। কিন্তু প্রায় সকলেই সপ্তাহ কাল সেই বিষয়ে চিন্তা ও সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেন, কিরূপে সেইটীকে নিজস্ব বস্তু করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রায় সকলেরই প্রাণপণে যত্ন ছিল। সঙ্গতের আলোচ্য বিষয় শুধু সঙ্গতের সময়ের জন্য নয়, কিন্তু তাহা সাংসারিক জীবনে প্রতিপালনের জন্য খুব যত্ন ছিল। এই সকল লোকেরাই কালে জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ পিপাসা ভিন্ন হাজার হাজার উপদেশ শুনিয়াও কোন ফল লাভ হয় না।

এই ত উৎসব চলিয়া গেল, উৎসবের মধ্যে কত কত ভাবের, কত নব চিন্তার উদয় হইয়াছে, উপাসকগণ কত নূতন তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন, নূতন সত্যের আদর্শ লাভ করিয়াছেন। যদি তাহা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায় তাহা হইলে এইরূপ কত উৎসব চলিয়া যাইবে, কিন্তু জীবনে কোন স্থায়ী ফল লাভ হইবে না। উৎসবের নূতন ব্যাপার সকল যাহাতে জীবনগত করিতে পারা যায়, তাহার জন্য বিশেষ রূপ সাধন প্রয়োজন। ক্রমাগত সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা, বিশেষরূপে চিন্তা এবং সাধন করা আবশ্যক, তবে ত একটী সত্য জীবনগত, প্রাণগত হইতে পারে, নতুবা সহস্রবার উৎসব কর, তাহার কোন ফলই জীবনে স্থায়ী হইবে না।

ব্রাহ্মদের মধ্যে এখন এ বিষয়ে বড় উদাসীনতা দেখা যায়, মন্দিরে উপদেশ হয়, পরক্ষণেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কি বিষয়ে উপদেশ হইল, অনেকের নিকট হইতে তাহার বড় সদুত্তর পাওয়া যায় না, সে বিষয় লইয়া সাধন ত পরের কথা, উপাসনা শেষ হইতে না হইতেই প্রায় সকলে সব ভুলিয়া যান। এজন্য কোন বিশেষ ভাবকে লইয়া যে কিছু দিন সাধন ভজন করা তাহা আর প্রায় দেখা যায় না। ধর্ম্মক্ষুধার মন্দাবস্থা ভিন্ন এরূপ কুলক্ষণ আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না। যতদিন সাধকদের ভিতরে এই পিপাসার প্রাবল্য দেখা না যাইবে, ততদিন যেন সাধক নিশ্চিন্ত না হন।

আত্মীয়-বিচ্ছেদ—নিশ্চিত ধ্রুব সত্য রূপে যত কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান কথা এই যে আমাদিগকে একদিন না একদিন এই সংসার হইতে বিদায় লইতেই হইবে। আমরা এই শরীরের সহিত চিরদিন বাস করিব না, ইহার মত সত্য কথা আর কটী পাওয়া যায়? পরমেশ্বর চিরদিন এ সংসারে থাকিবার জন্য কাহাকেও পাঠান নাই। সুতরাং আত্মীয়গণের সহিত বিচ্ছেদ প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। যতই কেন ভালবাসার পাত্র হউন না, যতই কেন তাঁহার বিচ্ছেদে আমাদের কষ্ট হউক না—যাঁহার এস্থান পরিত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। সংসার যতক্ষণ শিক্ষা এবং কল্যাণের স্থান থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর এখানে তাঁহার সন্তানকে রাখেন। যখন তাহার ব্যত্যয় ঘটে; তখন আর তিনি সন্তানকে এই অকুশলের ভিতরে থাকিতে দেন না। এজন্য আমাদের চক্ষের নিকট হইতে—স্নেহের বন্ধন হইতে কতজনকে তিনি সরাইয়া লইতেছেন। আমরা আক্ষেপই করি আর কাঁদিয়া আকুলই হই সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। আমরা আত্মীয়জনের বিচ্ছেদে কষ্ট পাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ি মনে করি ইহাপেক্ষা শাসন বুঝি আর সম্ভবে না। তখন পরম পিতার অতুল স্নেহের কথাও ভুলিয়া যাই, তিনি যে ইহা দ্বারা আমাদিগকে কুশলের পথে যাইবার সাহায্য করেন তাহাও মনে থাকে না।

কিন্তু কষ্ট যেরূপ গুরুতরই হউক না কেন, ইহা দ্বারা কি আমাদের কোনই লাভ হয় না? প্রিয়জন-বিচ্ছেদে এখানে থাকাকে যেমন এক দিকে বিষম কষ্টকর মনে হয়, তেমনই আর এক দিকে আমাদের পক্ষে অতি আশাপ্রদ একটী অবস্থা উপস্থিত হয়। পরলোক—যেখানে সকলকেই যাইতে হইবে এবং অনন্তকাল থাকিতে হইবে এই প্রিয়জনের তথায় গমন হইতে সে স্থানের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মিয়া যায়। সেই স্থানটী পূর্ব্বে যেমন আত্মীয়হীন, প্রিয়জন হীন বলিয়া মনে হইত, প্রিয়জন যখন তথায় গমন করেন, তখন আর তেমন থাকে না। সেস্থানে কি অবস্থা হইবে, যাইয়া কত কষ্টে যেন প্রিয়জন বিচ্ছেদে দিন যাইবে এরূপ একটা কূল কিনারাহীন উদাসভাব যাহা প্রাণে ছিল তাহা আর থাকে না। যেখানে মাতা গমন করিয়াছেন, যিনি কত আদরে এখানে প্রতিপালন করিতেন সেখানে আমি যাইব, আবার হয়ত তাঁহার সহিত মিলন হইবে একি সান্ত্বনার কথা নয়? ক্রমে ক্রমে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সংসারের প্রিয় পরিজন যদি সেখানে গমন করিতে থাকেন তাহা হইলে স্থানটা আর বড় একটা অপরিচিত দেশ বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদে যেমন কষ্ট হয় তেমনই আবার সান্ত্বনাও আসে। এজন্য পরলোকে বিশ্বাসীর পক্ষে আত্মীয়গণের সহিত বিচ্ছেদকে নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট ও পরিতাপের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার আর পথ থাকে না। আমরা সংসারে থাকিব অল্পদিন, না হয় এই সময়টুকু কষ্টেই গেল। কিন্তু যদি প্রাণে সেই ভরসা থাকে যে আমি যাইয়া আবার তাঁহাদের স্নেহ মমতা পাইব, তাহা হইলে নির্ব্বান্ধব দেশে যাইতেছি বলিয়া আর আক্ষেপ করিবার হেতু থাকে না। 'যাহা' অপরিচিত বান্ধবহীন ছিল, তাহা যে বান্ধবে পূর্ণ হইল এ আশা এ সান্ত্বনা পরলোকে বিশ্বাসীর পক্ষে কম লাভের নয়।

সরল মুক্তিপ্রার্থী—যাঁহারা সরল প্রাণে ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করেন, সরল প্রাণে যাঁহারা মুক্তিভিখারী হইয়া তাহা পাইবার আশাতেই ব্যাকুল থাকেন, তাঁহাদের প্রাণে অন্যান্য লক্ষণের সহিত এই একটী লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় যে তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মসমালোচনায় ব্যস্ত। নিজের দোষ দুর্ব্বলতা তাঁহারা এত অধিক দেখিতে পান যে অন্য ব্যক্তি যে তাহাপেক্ষা অধিক দোষে দুষ্ট হইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের মনে ধারণা হয় না। এজন্য তাঁহারা অন্যের দোষের কথা আলোচনা করিবার অবসরই প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা আপনাকে অতি কঠোর সমালোচনার সহিত পরীক্ষা করেন। নিজের দোষকে ছোট জ্ঞান করা বা ছোট করিয়া দেখা তাঁহারা অপরাধ বলিয়া জানেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যদি ক্ষুদ্রতম কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহারা আত্মচরিত্রের প্রতিই তাহার প্রয়োগ করেন এবং নিজ দোষ দেখিয়া তাঁহারা এমনভাবে অন্যের প্রতি সাহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন,যে কাহারও সহিত তাঁহাদের বিবাদ থাকে না। তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মদোষ দেখিয়া তাহা দমনের জন্যই ব্যস্ত থাকেন, একতঃ তাহাদের অন্যের দোষ দেখিবার অবসর হয় না ; তাহার উপর লোকের দোষ দুর্ব্বলতা কত অধিক তাহা আত্মপরীক্ষায় অবগত হইয়া অন্যকে সর্ব্বদা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করেন। অন্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে সর্ব্বাগ্রে নিজে সেই অবস্থায় কত অপরাধ করিতে পারেন বা করেন, তাহাই মনে হয়, সুতরাং তাহারা কাহারও অন্যায় ব্যবহার দেখিলেই বিরক্ত হন না এবং অভিমানের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া শাসন করিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাঁহার অভিমান সর্ব্বদাই নত মস্তকে অবস্থিতি করে। এজন্য কাহারও প্রতি প্রতিহিংসা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে প্রবল হয় না। সরল ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সকলেরই প্রিয়পাত্র হন, তাহার প্রধান কারণ তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাসন করেন এবং কাহাকেও আপনাপেক্ষা অধিক শাসন করেন না এবং আপনার দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়া যেমন দুঃখপূর্ণ অন্তরে তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, অন্যের দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও তেমনি দুঃখপূর্ণ অন্তরে তাহার মঙ্গলকামনায় সংশোধন করিতেই যত্নশীল হন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে শাসনের ভাব দেখিতে পায় না,কিন্তু স্নেহ ও প্রেমমিশ্রিত সংশোধনের ভাব দেখিতে পায়। এজন্য সহজেই লোকে তাঁহার বশীভূত হয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তিনি যদি কাহারও নিকট হইতে আত্মদোষের কথা শুনিতে পান ; যদি কেহ তাঁহার দোষের প্রতি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া দেয়, তাহাতে তিনি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বন্ধু বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন। আমরা যে নিজ দোষের কথা শুনিতেই ইচ্ছা করি না বা কেহ বলিলে তাহাকে শত্রুজ্ঞানে নির্য্যাতন করিতে যাই, ইহা দ্বারাই আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। আমাদের মন যখন নিজ দোষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া দোষ প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধ চিন্তার প্রবৃত্ত হয়, কোনও রূপে তাহার একটা দোষ বাহির করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তি মনে প্রবল হয়, তখনই বুঝিতে হইবে আমরা দোষ দূর করিতে চাই না ; কিন্তু যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে চাই। পাপ হইতে মুক্তি চাই না ; কিন্তু তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে চাই। এজন্য বন্ধুর কার্য্যকে বন্ধুর কার্য্য বলিয়া মনে না করিয়া তাহার বিপরীত ভাব পোষণ করি। আমরা সরল মুক্তি-প্রার্থী হইলে এরূপ বিকৃতভাব কখনই প্রাণে স্থান প্রাপ্ত হয় না

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ।

জড়জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও বিবর্ত্তনের নিয়ম লক্ষিত হয়। মানবের ধর্ম্মজীবন একটী বিকাশ মাত্র। মানব জীবনের এমন এক অবস্থা আছে যাহার সহিত পশুজীবনের পার্থক্য অতি অল্প লক্ষিত হয়। ভোগ বিলাসই মানবজীবনের এই অবস্থার নিয়ন্তা। কিন্তু মানবাত্মা চিরদিন ভোগসুখে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। মানবজীবনে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন ভোগের নেশা ছুটিয়া যায়, মানুষ সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা বুঝিতে সক্ষম হয়। এই অবস্থা সাধারণতঃ বৈরাগ্য নামে অভিহিত। বৈরাগ্যই ধর্ম্ম জীবনের প্রবর্ত্তাবস্থা। প্রকৃত বৈরাগ্য না জন্মিলে আধ্যাত্মিকতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগ্য সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নহে, শ্মশান বৈরাগ্য নহে, অথবা জীবনের সকল দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আরাম অন্বেষণ করা নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য নিত্য ও সত্য বস্তু। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক নরনারীর ভাগ্যেই একদিন না একদিন এই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন, কি অবস্থায় ও কি ভাবে বৈরাগ্য লাভ হইবে তাহা মানবের চিন্তার অতীত। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে ধর্ম্মসমাজে যোগ দিয়া, বহুকাল ধর্ম্ম চর্চ্চায় রত থাকিয়া এবং ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত হইয়াও ধর্ম্মের এই প্রবর্ত্তাবস্থা লাভ করিতে পারেন না ; হয়ত সাময়িক ব্যাকুলতা, অস্থায়ী উন্মত্ততা ও বাহিক উত্তেজনাকে প্রকৃত বৈরাগ্য জ্ঞান করিয়া আত্ম প্রতারিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর কৃপায় মানব প্রাণে যখন প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন মানব আর স্থির থাকিতে পারে না। সংসারে কি নিত্য, কি অনিত্য তাহার চিত্ত নিরন্তরই এই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই নিত্যানিত্য বিচারই প্রকৃত বৈরাগ্যের প্রাণ। মহাত্মা শাক্যসিংহের প্রাণে যখন বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য, অশেষ বিলাসভোগ, পিতার রাজপদ, প্রিয়তমা ভার্য্যা ও সুকুমার পুত্র এ সকলই অনিত্য বোধ করিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিত্য সার বস্তুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। দর্শন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পাইনোজার জীবনেও এই বৈরাগ্যের জ্বলন্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্পাইনোজার প্রাণে যখন বৈরাগ্যের উদয় হইল, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

"Experience had taught me," says Spinoza, "that all which life commonly offers is worthless and vain. I

therefore determined to know if there were any genuine good which might be attained, and with which the soul, abandoning everything else, might be content, the discovery and appropriation of which would yield a continual and supreme satisfaction. That which mankind, if we judge from their actions, regard as the highest good, is either wealth, honor, or sensual enjoyment. The pleasure derived from these are delusive, and only an infinite and everlasting good can impart pure joy to the soul. Therefore I resolved to collect myself, that I might lay hold of this supreme good." "Reason in Religion."

তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"জীবনের অভিজ্ঞতায় যখন জানিলাম যে, মানব জীবনে সাধারণতঃ যাহা কিছু লাভ করা যায়, তাহা নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর, তখন মানবাত্মার পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর কিছু আছে কিনা ইহার অন্বেষণ করিবার জন্যই আমি দৃঢ় সংকল্প হইলাম। আর সকল ছাড়িয়া আত্মা যাহা লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, যে বস্তু লাভ করিয়া ও যাহা জীবনে সম্ভোগ করিয়া আত্মার চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয়, এমন কোন বস্তু থাকিলে তাহা লাভ করা যায় কিনা তজ্জন্যই আমার একান্ত প্রয়াস জন্মিল। মানুষের কার্য্য দেখিয়া বিচার করিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, ধন মান কিম্বা ইন্দ্রিয়-সুখকেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মানুষ মোহবশতঃ এই সকলকে সুখ বলিয়া মনে করে বটে, বাস্তবিক এই সকলের দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয়। অনন্ত ও নিত্য মঙ্গলকর বস্তু ভিন্ন আর কিছুতেই মানবাত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি ও পূর্ণানন্দ দান করিতে পারে না। এই পূর্ণ মঙ্গলকর বস্তু লাভ করিবার জন্যই আমি আত্ম-সংযম করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।"

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু বৈরাগ্যের অপরিপক্কাবস্থায় অনেকে জীবনের গতি স্থির রাখিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বনবাসী হন এবং বৈরাগ্যের প্রচলিত বেশ ভূষা ও কঠোর নিয়মাদি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের সমস্ত সুখ ও কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সুবিধা আছে ও অবস্থা অনুকূল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই অবস্থায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রকাশ্যে ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যিনি সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়া—সংসারের সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া উজ্জ্বল হইতে পারেন তিনিই ধন্য। জনৈক সাধ্বী হিন্দু বিধবারমণী সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন, আজীবন তিল তিল করিয়া মরণজ্বালা সহ্য করা অপেক্ষা কি সহমরণ অধিক ক্লেশকর ও ভয়াবহ? বৈরাগ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৈরাগ্যের অবস্থায় সংসারে থাকিয়া পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিবার তুলনায় সংসার ত্যাগ অতি সামান্য কার্য্য। অপরিপক্কাবস্থায় বৈরাগ্যের ভাব প্রাণে যত ধারণ করা যায়, যত লুকাইয়া রাখা যায় ততই মঙ্গল। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, ভিতরের ভাব বাহিরে প্রকাশ হওয়াতে চিরদিনেরতরে সেই অমূল্য ভাবটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে; প্রকৃত বৈরাগ্য এক দিকে যেমন মানুষকে সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি তাহার নিজ জীবনের অপদার্থতা প্রকাশ করিয়া আত্মাভিমানকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। যে পরিমাণে জীবনের অসার ভাবসকল নষ্ট হইতে থাকে, জীবনের অস্ফুট আদর্শ ও সদাকাঙ্ক্ষা সকল সেই পরিমাণে জাগিয়া উঠিতে থাকে। তখন প্রাণ কি চায়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে এই সকল প্রশ্ন ক্রমশঃ মানবহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে।

দৈহিক জীবনের অভাব মোচনের জন্য করুণাময় পরমেশ্বর জড়জগতে যেমন সুব্যবস্থা করিয়াছেন, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক অভাব পূরণের জন্যও তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। জীবদেহের পুষ্টির জন্য যেমন তিনি জল, বায়ু, তেজ ও উদ্ভিজ্জাদি বস্তুরাশির মধ্যে জীবকে স্থাপন করিয়াছেন, জীবাত্মার পরিপোষণের জন্যও তিনি তেমনি সাধুসঙ্গ সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, করুণাময় পরমেশ্বরের নির্দ্দেশে জ্ঞানী ও সজ্জনগণের দ্বারা সর্ব্বত্রই সাধুসঙ্গ সংগঠিত হইতেছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসমাজ সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ধর্ম্মসমাজ যে পরিমাণে সাধুসমাজ সেই পরিমাণেই ধর্ম্মসমাজ নামের উপযুক্ত। চিরকাল দেশে দেশে ভগবানের মঙ্গল বিধায়িনী শক্তি, এই ধর্ম্মসমাজ—এই সাধুসমাজের মধ্য দিয়া মানবাত্মার কল্যাণ সাধন করিতেছে। প্রকৃত বৈরাগ্যের অবস্থায় মানব প্রাণে যখন আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয় তখন মানবের দৃষ্টি স্বভাবতঃই এই সাধুসমাজের প্রতি নিপতিত হয়। জড়জগতের জল, বায়ু, আলোক উত্তাপের সঙ্গে জীবদেহের যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সাধুসমাজের সঙ্গেও মানবাত্মার সেইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। মানব প্রাণে যে নীতির আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ অস্ফুট ভাবে থাকে, সজ্জনের জীবনে সেই আদর্শের পরিস্ফুট ভাব দেখিয়া মানুষ সৎসঙ্গ আশ্রয় করে। কিন্তু প্রকৃত সৎসঙ্গ লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ধর্ম্মরাজ্যেও মানুষের দুর্ব্বলতার অপ্রতুল নাই। সংসারের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের ন্যায় জীবনের অন্ন ধর্ম্মেরও ব্যবসায় হইয়া থাকে। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ভাবে ধর্ম্মের ব্যবসায় হইতেছে।

কতলোক সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের নামে মানুষকে বাহ্যাড়ম্বর শিক্ষা দিতেছে। এই বিষম শঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ প্রকৃত সাধুজনগণ স্বাভাবিক বিনয় বশতঃ লোকের নিকট আত্ম-গোপন করিয়া চলেন। সৌভাগ্য ক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ হইলেও সাধুজীবনের সাধুতা ও মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করাও সহজ ব্যাপার নহে। মানুষ যখন সাধু চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখনই সাধুসঙ্গের প্রতি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে। তখন তাঁহার প্রাণ নিরন্তরই সাধুসঙ্গের পবিত্র বায়ুর মধ্যে বাস করিতে চায়। সাধুসঙ্গের পবিত্র ভাবে তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকে, আত্মার দেব ভাব সকল জাগিয়া উঠে, হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হয়, নামে রুচি ও সাধনে নিষ্ঠা জন্মে। অজস্র ভাবে নাম সাধনা দ্বারা চিত্তকে কর্ষণ করিতে পারিলে ধর্ম্মভাব সহজেই বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা বিষয় কর্ম্মে

নিযুক্ত আছেন, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যাঁহাদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে নিরন্তর নাম সাধনে অনেক বাধা জন্মে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃথা গল্প, বৃথা চিন্তা, বৃথা বাক্ বিতণ্ডায় মানুষের কত অমূল্য সময় নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল সময়ে ভক্তির সহিত স্থিরচিত্তে একাগ্র মনে নামরূপ রসানে চিত্তকে মাজিতে পারিলে চিত্ত উজ্জ্বল হইতে থাকে। সাধন শব্দের যদি কোন গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, তবে তাহা আপনাকে নির্ম্মল করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নাম সাধন, বিচার, আত্ম-পরীক্ষা ও সংগ্রাম দ্বারা জীবন সর্ব্বপ্রকার রিপু, মলিনতা ও অপবিত্রতার হাত হইতে সময়ে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আত্মার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা যেমন মূলে একবস্তু, কেবল ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মানবের পাপরিপু সকলও তেমনি একমূল হইতে অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অতি সুন্দর একটী কথা আছে। তিনি কলমীলতার সঙ্গে পাপরিপুর উপমা দিয়া বলিয়াছেন, কলমীলতার মূল ধরিয়া টানিলে যেমন সমস্ত লতাগুলি চারিদিক হইতে একত্রিত হয় ও সমস্ত লতাটীকে অনায়াসেই তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়, পাপরিপুর কোন একটি ধরিয়া প্রাণপণে টান দিলেও তেমনি সমস্ত গুলিতে টান লাগিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় যদি অবিলম্বে সৎসঙ্গে ছুটিয়া যাওয়া যায়, অথবা চিত্তকে জোর করিয়া বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করা যায়, তবেই রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সাধুসঙ্গবিষয়ান্তরে মনোনিবেশ প্রবৃত্তি-তরঙ্গের পক্ষে তৈল নিক্ষেপস্বরূপ।

জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনায় মায়ামুগ্ধ মন যেদিকে চালাইতে চাহে, মানুষ যদি তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে, তবেই মন পরাস্ত হয়। আহার, বিহার, কথোপকথন প্রভৃতি জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যেও যদি মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা যায়, তাহা হইলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় ও নিশ্চয়ই মন আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে, চিত্ত যত নির্ম্মল হইতে থাকে, আধ্যাত্মিক ভাব সকল ততই বিকশিত হইয়া উঠে। এই সময়ে সাধককে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। এই সময় সাধকের প্রাণ আনন্দে বিহ্বল হয়, প্রাণে নব বলের সঞ্চার হয়। কিন্তু এ অবস্থায় সাধকের ধর্ম্মজীবনে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা আছে। চিরদরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলে তাহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয়, নিজে কত বড়লোক হইয়াছে, তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বর কৃপায় মানব জীবনে যখন ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানবের দেবভাব সকল জাগিয়া উঠে, মানব অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইতে থাকে। কিন্তু গভীর ধারণা শক্তির অভাবে, প্রখর চিন্তা শক্তির অভাবে, উজ্জ্বল বিশ্বাসের অভাবে মানব ব্রহ্মশক্তিকে নিজের শক্তি জ্ঞান করিয়া আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মাভিমান ধর্ম্মজীবনের প্রধান শত্রু। যথার্থ দীনতা লাভ করিয়া জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাপী ও উদ্ধার পাইয়া গেল, কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কতলোক ধর্ম্মাভিমানের হাতে পড়িয়া জীবন হারাইল। তস্করের ন্যায় মহাপাপ ধর্ম্মাভিমান অজ্ঞাতসারে মানবপ্রাণে প্রবেশ করে। মানব অনুভব করিবামাত্রই যদি এই চোরকে ধরিয়া ফেলিতে পারে তবেই নিস্তার, কাল বিলম্ব হইলে ইহা দ্বারা মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটে।

সাধু ভক্তি, দুর্ব্বল নরনারীগণের প্রতি সহানুভূতি, বিনয় প্রভৃতি ভাবদ্বারা ধর্ম্মাভিমান বিনষ্ট হয়। সাধকের আর একটি বিপদের সম্ভাবনা এই যে, যে উপায়ে মানুষ ধর্ম্মজীবনে উপকার লাভ করে, সেই প্রণালীটী স্বভাবতঃই মানুষের নিকট অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বিচিত্র মানব জীবন কখনও একভাবে এক উপায়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অনেক সাধক যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবে বিচার শক্তির অভাবে এ সম্বন্ধে এত সংকীর্ণ হইয়া পড়েন যে তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালীর বহির্ভূত অপর সমস্ত প্রণালীর গুরুত্বও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। এই সংকীর্ণতা আত্মার উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ইহাতে মানুষকে ঘোর সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলে এবং সত্য গ্রহণের ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির পথে বিষম বাধা উৎপন্ন করে। সাধকের আর একটি বিপদের আশঙ্কা এই যে, ধর্ম্ম জীবনের প্রথম সংগ্রামের পর যখন আত্মা শান্তি পবিত্রতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হয়, তখন সাধক তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তখন সাধকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তখন তিনি যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট মনে করেন, তিনি প্রথমতঃ আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। পরে ক্রমে ক্রমে এই নিশ্চিন্ত ভাব আধ্যাত্মিক অলসতা এ জড়তায় পরিণত হয়। এইরূপে অনেক সাধক ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াই পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে সাধক এই সকল শঙ্কটাপন্ন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার জীবনে এমন দুই একটি সত্য জলন্তভাবে প্রকাশিত হয়, যাহা আশ্রয় করিয়া তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারেন। ভগবানের অনন্ত সত্যের দুই একটী লাভ করিয়া মহাজনেরা আপনাদের ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের নিরাপদ অবস্থা লাভ হইলে জীবন স্রোত অনন্ত উন্নতি স্রোতে মিলিত হয়, জীবনের সকল বিভাগের উন্নতি হয়, এবং সংসার ও মানব জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। এই নিরাপদ ভূমি লাভ করিয়া মহাত্মা শাক্যসিংহ "অহিংসা সর্ব্ব ভূতেষু" এই মহা সত্য প্রচার করিয়াগিয়াছেন; "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" যীশু খ্রীষ্ট এই মহা সত্যের অধিকারী হইয়া ক্রুশদণ্ডে নশ্বরদেহধ্বংস করিয়া গিয়াছেন; শ্রীগৌরাঙ্গ হরিচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, "ভক্তিতেই মুক্তি এই আশ্চর্য্য" ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন; এক মাত্র চিত্ত শুদ্ধিও নামের শক্তিতেই জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, গুরুনানক

এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন; ভক্ত কবির স্বয়ং জোলা হইয়াও ভক্তির উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল যে ভগবানের রাজ্যে জাতি বিচার নাই, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, সংসারে নিতান্ত হীন ও নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে অসাধারণ প্রতিভা ও তাহার ফলস্বরূপ বিশ্বজনীন উদারভাব বিকশিত হইয়াছিল। এই সকল মহাপুরুষেরা সমস্ত হৃদয় মন ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া যে পরম বস্তুলাভ করিয়াছিলেন, সংসারাসক্ত আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে তাহার আস্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা কি?

তথাপি আশা করাই মানুষের স্বভাব, আশাই উন্নতির মূল। যেখানে আশা আছে সেই খানেই অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা বর্ত্তমান। ঐ বৃক্ষ কত ঝড় বৃষ্টি মস্তকে সহ্য করিয়া কতকালে সারবান্ হইতেছে! তুমি বৃক্ষাপেক্ষা উচ্চতর জীবন লাভ করিয়াও যদি অশ্রুপাত ও সংগ্রামকে ভয় কর, তবে মানব, তোমার মনুষ্যত্ব কোথায়? অতএব হে মানব! তুমি নিরাশ হইও না, অসহিষ্ণু হইও না, বিশ্বাস ও আশায় বুক বাঁধিয়া সাধন পথে অগ্রসর হও, সিদ্ধিদাতা করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় এক দিন নিশ্চয়ই তোমার জীবনের আশা পূর্ণ হইবে।

হৃদয় ও মনের ব্যাধি।

(প্রথম প্রস্তাব।)

আগে রোগ নির্ণয় তার পর ঔষধের ব্যবস্থা। পরে ঔষধ সেবন ও পথ্যাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উপরোক্ত কথাগুলি যেমন শরীরের পক্ষে প্রযোজ্য আত্মার পক্ষেও সেইরূপ। বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্ম-সাধন করিতে প্রয়াসী ও সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ততোধিক প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে অনেকে দৈনিক উপাসনা করেন, কেহ কেহ বা সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। কেহ বা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা, ধ্যান-ধারণাতে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদিগের পক্ষে এই উপাসনাই আধ্যাত্মিক রোগের মহৌষধি। উপাসনাকে ব্রহ্মাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগের ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মোপাসনা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উপাসকের মনও সাংসারিকতার দিকে টলিতেছে ও কুটিলতার আবিলময় ভাবের দিকে ছুটিতেছে। ইহা সন্দর্শন করিয়া উপাসনার ফলবত্তার উপর সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং সন্দেহ জন্মিবার কারণও আছে। উপাসনা যখন আধ্যাত্মিক রোগের ব্রহ্মাস্ত্র আর যখন পুনঃ পুনঃ এই অস্ত্র প্রয়োগ হইতেছে তথাপি রোগ উপশমিত হইতেছে না, হৃদয়ের মলিনতা দূর হইতেছে না, কথা ও কার্য্য এক হইতেছে না, তখন সাধারণের এই কথা বলিবার অধিকার জন্মিতেছে যে হয় উপাসনা আধ্যাত্মিক রোগের ব্রহ্মাস্ত্র নহে, না হয় ইহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেছে না। আমরা এই কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে ব্রহ্মোপাসনা আধ্যাত্মিক রোগের ব্রহ্মাস্ত্র নহে, আর এ কথাও বলি না যে উপাসনা একেবারেই হয় না। রোগ নির্ণয় না হইলে যেমন মহৌষধ সকল নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের আধ্যাত্মিক রোগ, হৃদয় মনের মহা ব্যাধি সুন্দররূপে নির্ণীত হয় নাই, অথবা নির্ণীত হইয়া থাকিলেও অনেকে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই নিমিত্তই নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে আমাদের হৃদয় মনের ব্যাধি কি! আমরা হৃদয় ও মন লইয়াই আধ্যাত্মিক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি, সেই হৃদয় ও মন যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে আর আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আর যতদিন হৃদয় মন ব্যাধিগ্রস্ত থাকিবে ততদিন আধ্যাত্মিক উন্নতি আকাশ-কুসুমের ন্যায় একটী শব্দ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাই এখন দেখা যাক্ আমাদের হৃদয় মনের ব্যাধি কি?

মানব প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহারা যাহা চায় তাহার ষোল আনা না পাইলে, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সাংসারিক ষোল আনা সংসার চায়, ধনী ষোল আনা ধন চায়, মানী ষোল আনা মান চায়, জ্ঞানী ষোল আনা জ্ঞান চায়, ধার্ম্মিক ও প্রেমিক ষোল আনা ধর্ম্ম ও প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া দিন রাত্রি খাটিতেছেন। ষোল আনার এক কপর্দ্দকও কম হইলে কাহারও মন ওঠে না। মুখে প্রফুল্লতা আসে না, প্রাণের পিপাসা ঘোচে না, জীবনের দুর্দ্দিন মেঘের অবসান হয় না। সুতরাং যে কোন প্রকারেই ষোল আনা চাই। প্রত্যেক বিভাগেরই উন্নতির লক্ষণ এই যে ষোল আনা চাই। এখন দেখিতে হইবে আমরা ষোল আনা ধর্ম্ম চাই কি না, ষোল আনা ঈশ্বরকে পাইতে চাই কি না। যদি দেখি আমরা দশ আনা সংসার চাই, আর ছয় আনা ঈশ্বর চাই—এই পিপাসিত হৃদয়ের মহা পিপাসা—দশ আনা সংসার-লবণ সমুদ্রের জল দ্বারা আর ছয় আনা ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ঈশ্বরের প্রেমদ্বারা পূর্ণ করিতে চাই, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে। এই মহা রোগের মহৌষধি ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহা ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, সর্ব্বদাই সরিয়া যাইতেছে, এক পল এক স্থানে স্থির থাকে না, তাহার নাম সংসার। সুতরাং এই সংসার সমুদ্রের লবণাক্ত জল দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করাও যা, আর শূন্যেতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুখ সৌভাগ্যের উপভোগের আশা করাও তাই। এমন কি জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত যদি বিবিধ উপচারে সংসারের সেবা করা যায়, নিশিদিন সংসারের গুণ কীর্ত্তন করিয়া রসনাকে সংসারের প্রকৃত স্তাবকরূপে পরিণত করা যায়, তথাপি হৃদয়ের পিপাসা ঘোচে না, মনের আঁধার ঘোচে না, প্রাণের মহাশূন্য পূর্ণ হয় না। হৃদয় ও মনের ব্যাধি যত দিন না ঘুচিবে, ততদিন উপাসনাই কর আর সঙ্গীত সংকীর্ত্তনই কর কিছুতেই কিছু হইবে না।

আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে আমরা ষোল আনা ধর্ম্ম চাই না। ষোল আনা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার বাসনা আদতেই নাই। সুতরাংই বলিতে হইবে আমাদের হৃদয়ের প্রথম মহাব্যাধি এই যে আমরা দশ আনা সংসার চাই আর ছয় আনা ধর্ম্ম চাই। দশ আনা আত্মনির্ভরের

ভাগে বা আপনার ভাগে, আর ছয় আনা ঈশ্বরের ভাগে ফেলিয়া তাঁহারই সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ধর্ম্ম-সাধন ও ব্রহ্মোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এই প্রথম মহাব্যাধির মহৌষধ ষোল আনা ঈশ্বর চাওয়া, ষোল আনা ধর্ম্ম চাওয়া। ইহাতে যদি সংসার অধঃপাতে যায় যাক, আর সমস্ত যদি আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত তিরস্কার, নিন্দা, অপমান বরিষণ করে, করুক; কিন্তু আমার ষোল আনা ধর্ম্ম চাই, ষোল আনা ঈশ্বর চাইই চাই।

আমরা বাল্যকাল হইতে অতি যত্নের সহিত হৃদয়ের ভিতর কতকগুলি শেল বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যতই বয়স হইতেছে ততই দেখিতেছি, সেই প্রোথিত শেল হৃদয়কে যাতনাময় করিয়া তুলিতেছে। অনেক সময় উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া সেই শেল গুলি উঠাইতে যাই, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে এই ভয়ে তাহা উঠাইতে পারি না। সুতরাং শেল-বিদ্ধ হৃদয় লইয়াই যাতনাতে দিন কাটাইতে হয়। প্রথম শেল বাসনা। এই বাসনার ভোগের ক্ষেত্র বিষয়। আমরা ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে চাই, বাসনা আমাদিগকে বিষয় ভোগের দিকে তাড়না করিয়া সেই দিকে লইয়া যায়। অনেক সময় মনে করি এই বাসনা শেলকে উন্মূলিত করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিব, সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু সময় কালে তাহা হয় না। মনে করি বাসনা শেল উঠাইলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে; রক্তাক্ত হৃদয় লইয়া আর থাকিতে পারিব না, থাক সাধের বাসনার শেল, থাক তুমি হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাক। আমরা ইন্দ্রিয়-রথে আরোহণ করিয়া বিষয় ক্ষেত্রে ভ্রমণ করি, বিষয়ের দাস হইয়া সংসারের নিকট দাসত্ব খত লিখিয়া দিয়াছি। ইহাই হৃদয়ের দ্বিতীয় ব্যাধি। এই বাসনার শেল সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতে হইবে। বাসনা থাকিতে ভাবনা ঘুচিবে না, হৃদয় হইতে ভাবনা না গেলে মন স্থির হইবে না, অস্থির মনে ব্রহ্মোপাসনার স্থান হইতে পরিবে না।

আমার ও আমি লইয়া সংসার। ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, ভাল বল, মন্দ বল, পাপ বল আর পুণ্যই বল ইহার সকলের মূলেই আমি ও আমার এই সম্বন্ধটি নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমিরূপ নল যখন সংসারের সমুদ্রের সঙ্গে যোগ করিয়া দি, তখন সংসারের লবণাক্ত জল আসিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ করে এবং সেই লবণাক্ত জল পান করিয়া নীচতা পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি মহাব্যাধি আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে। হৃদয়ের তৃতীয় মহাব্যাধি আমি ও আমার। এখন এই করিতে হইবে আমিরূপ নলটিকে "আমার"ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে; তারপর দেখিতে পাইবে এই নলের ভিতর দিয়া তাঁহার কৃপার পবিত্র বারি হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তোমার হৃদয়কে তাঁহার কৃপার দ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তোমার সমস্ত রোগ বিদূরিত হইয়া তাঁহার কৃপার বারিতে আরোগ্য-স্নান করিতেছে।

পূর্ব্বে হৃদয়ের তিনটী মহাব্যাধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্ম সাধকদিগের পক্ষে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক সাধক ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ আমাদের রোগও ভিতরে, ঔষধও ভিতরে বাহিরে আমরা বেশ আছি, সুন্দর সুন্দর কথা বলি, ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের কথা সকল প্রয়োগ করিয়া নিজের ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় দিতে ত্রুটি করি না, কথায় বার্ত্তায়, তর্কযুক্তিতে আমাদিগকে প্রায় কেহ পশ্চাৎপদ করিতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। কথায় ত আর প্রাণের পিপাসা মেটে না, হৃদয়ের ব্যাধির উপশম হয় না, হৃদ্য বস্তুর সন্দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং হৃদয়ের ব্যাধি সমূহকে দূর করা চাই, ঔষধ চাই, আরোগ্য হওয়া চাই। অনেকেই বলিতে পারেন, আমি যদি ষোল আনা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর চাই, তবে সংসার যায় যে, আমি যদি বাসনাকে ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করি তবে ভোগ্য সংসারকে উপভোগ করে কে। আমি যদি ঈশ্বরকে আমার বলি, তবে যে সংস্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। আমি বলি ধর্ম্ম বিষয়ে গণনা করিতে নাই। ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া সাধন ভজন হইতে পারে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না। আমরা ষোল আনা ঈশ্বর চাই, বাসনাকে হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিতে চাই। আমার সহিত সংসারের সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপন না করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে স্থাপন করিতে চাই, হৃদয় মনের এই সব ব্যাধি দূর করিতে চাইই চাই। ইহাতে যদি সংসার যায়, নাচার, করিব কি। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা উচিত সংসার আমার নয়, তোমার নয়, ঈশ্বরের। তাঁহার সংসার মরিবার নয়। সংসার থাকিবেই থাকিবে। আমরাও তাঁহার সংসারকে প্রসাদী ফুল স্বরূপ উপভোগ করিতে পাইবই পাইব। সুতরাং হৃদয়ের মহাব্যাধি নির্ণয় করিয়া যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা রূপ ব্রহ্মাস্ত্রে মহাব্যাধির বিনাশ করিতে পারি। সেই বিষয়ে যত্নশীল হই, তবে ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত সমাদর বুঝিতে সক্ষম হইব।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা।

ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি যে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সুশিক্ষা ও সদাচারের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল প্রত্যেক ব্রাহ্মই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। অথচ ব্রাহ্ম সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন প্রকার সদুপায় অবলম্বিত হয় নাই। মফস্বলের বন্ধুগণ এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ অভাব যে কেবল মফস্বল বাসীরাই অনুভব করিতেছেন, তাহা নহে। কলিকাতা বাসীদিগের মধ্যেও অনেকে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসী ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যখনই একত্রিত হইয়াছেন, তখনই এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এত দিনের আলোচনার পর সম্প্রতি এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। কমিটীর সভ্যগণের উপর এই ভার সমর্পিত হইয়াছে যে, যাহাতে সকল অবস্থার ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সুশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাঁহারা এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করুন। ইহার মধ্যে

সভার ক্রমে তিন বার অধিবেশন হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জ্ঞানার্জ্জনের সুব্যবস্থা করিতে হইলে শিক্ষা অতি অল্প ব্যয়সাধ্য হওয়া আবশ্যক। কমিটী এসম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াও ব্যয়ভার আমাদিগের প্রয়োজনানুরূপ লঘু করিবার উপায় এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন না। এই ব্যয়ভার অধিকাংশ ব্রাহ্মের বহনক্ষমতার আয়ত্তাধীনে আনিতে হইলে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা আজ কেবল সেই সকল উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

(১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন অনেক ব্রাহ্ম আপনার এক মাসের আয় এই শুভ কার্য্যের সাহায্যার্থ দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত অনেক স্থলেই সংক্রামক, একের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এরূপে ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ ব্রাহ্ম আপনাদিগের এক মাসের আয় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই উপাসনালয় অত শীঘ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের স্কুল গৃহ ও তৎসম্বলিত নিবাস গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনার এক মাসের আয় প্রদান করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে শিক্ষার সুব্যবস্থা করার সম্বন্ধে একটী অতি প্রধান অন্তরায় দূর হইতে পারে। এ সম্বন্ধে চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই স্বাক্ষর করিয়াছেন; স্বাক্ষরিত চাঁদা ২২।২৩ শত টাকার অধিক হইবে না। সকলে সম্মত না হইলেও অধিকাংশ ব্রাহ্ম যদি আপনার এক মাসের আয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে পনর কুড়ি হাজার টাকা অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে।

(২) স্কুলের সাহায্যের জন্য একটী কারবারের সূত্রপাত করা। পুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অনেক পরিমাণে নিরাপদ এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগের এই ব্যবসায় সম্বন্ধে কতক অভিজ্ঞতা আছে ও যাঁহারা এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে ইহা চালাইতে পারেন। বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে এই ব্যবসায় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু সূচনার পক্ষে দশ হাজার টাকা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত নহে। এক শত টাকা যদি এক এক অংশের মূল্য নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে এক শত অংশ গৃহীত হইলেই দশ সহস্র টাকা মূল ধনের সংস্থান হয়। মূল ধনীদিগকে এই নিয়মে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা লাভের অংশ বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা পর্য্যন্ত পাইবেন। ছয় টাকার অধিক লাভ হইলে সেই অতিরিক্ত লাভ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ব্যয় হইবে। তবে লাভ যদি বার্ষিক দশ টাকার অধিক হয়, তবে সেই অতিরিক্ত লাভের টাকা মূলধনী ও স্কুলের মধ্যে সমানাংশে বণ্টিত হইবে। অর্থাৎ বার্ষিক লাভ যদি শতকরা বার টাকা হয়, তবে অগ্রে মূল ধনী ছয় টাকা পাইবেন, পরে স্কুল আর চারি টাকা পাইবে; অবশিষ্ট যে দুই টাকা থাকিবে তাহা উভয়ের মধ্যে সমানাংশে বিভক্ত হইবে। এই স্থলে মূল ধনীর লাভের সমষ্টি সাত টাকা ও স্কুলের পাঁচ টাকা হইবে। বার্ষিক লাভ শতকরা চৌদ্দ টাকা হইলে মূল ধনীর আট ও স্কুলের ছয় টাকা লাভ হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন এক শত ব্যক্তি ন্যূন পক্ষে পাওয়া অসম্ভব নহে, যাঁহাদিগের প্রত্যেকে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থে এক শত টাকা এই রূপ একটী কারবার চালাইবার জন্য প্রদান করিতে পারেন। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগের প্রত্যেকে একাধিক অংশ অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন।

(৩) ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগের গ্রন্থাদি লিখিবার ও সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। অথচ সেই ক্ষমতা তাঁহাদিগের অনেকেই একেবারে অথবা উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন না। সকলের অথবা অধিকাংশের ক্ষমতা এক কেন্দ্রীভূত করিয়া অধিকার ভেদে যথা যোগ্য বিষয়ে প্রত্যেকের ক্ষমতা নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষা কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে নানা প্রকারের সৎ গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতে পারে। উহার অনেক গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজি বাঙ্গালা স্কুল সমূহের পাঠ্য রূপে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই রূপ নানা প্রকারের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যে লাভ হইবে, তাহার শতকরা ষাট টাকা গ্রন্থকার পাইবেন; অবশিষ্ট চল্লিশ টাকা স্কুলের সম্পত্তি হইবে। যে গ্রন্থকারের পুস্তকে যত টাকা লাভ হইবে, তিনি সেই লাভের শতকরা ষাট টাকা হিসাবে অংশ পাইবেন। যে গ্রন্থ একাধিক ব্যক্তি লিখিবেন বা সঙ্কলন করিবেন, সেই গ্রন্থের লাভ তাহার লেখক বা সঙ্কলনকারীদিগের মধ্যে প্রত্যেকের লিখিত বা সংগৃহীত বস্তুর পরিমাণানুসারে হারাহারি মতে বণ্টিত হইবে। উপযুক্ত অবকাশ কিম্বা অন্য কোন কারণে এখন যাঁহারা কোন গ্রন্থ লিখিবার ভার লইতে পারিতেছেন না, সেই ভার উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে তাঁহাদিগের অনেকে অপেক্ষাকৃত লঘু ভার গ্রহণ করিতে সম্ভবতঃ প্রস্তুত হইবেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নিজেরও কিঞ্চিৎ লাভ এবং একটী শুভ কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। যাঁহারা এখন গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন, অথচ নানা কারণে তাহা ভাল রূপে চালাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাঁহারাও এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটীর উপর নিজ গ্রন্থাদি চালাইবার ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম সমাজের লোক সমবেত হইয়া এই বিষয়ে চেষ্টা করিলে দেশে সৎ গ্রন্থ প্রচলনের বিলক্ষণ সহায়তা ও তৎসঙ্গে নিজেদেরও কতক লাভ হইতে পারে। অপর ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা সম্বন্ধেও ইহার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সাহায্য হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই ব্রাহ্ম মণ্ডলী যদি এই প্রস্তাব সঙ্গত ও কার্য্যকারী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে এই প্রস্তাবানুসারে শীঘ্র কার্য্য হইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেকে যেন বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন।

উদ্ধৃত।

মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে বিরোধই আমাদের দেশের সমস্ত বিরোধের মূল, আর, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বিরোধ ভঞ্জন করিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভাষার দৃষ্টান্তে এই কথাটা আরো স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইতর-ভাষাই ভাষার প্রাণ। ব্যাকরণাদির জ্ঞান সেই প্রাণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া এক-প্রকার কৃত্রিম সাধুভাষা গড়িয়া তুলিতে পারে, কিন্তু সে সাধু-ভাষা আর কিছু নয় নির্জ্জীব নিস্তেজ ভট্টাচার্য্য ভাষা; তাহার ভিতরে প্রাণ নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, ইতর ভাষা ব্যাকরণাদি জ্ঞানের সহিত বিরোধ করিয়া সাহিত্যসমাজে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে; কিন্তু সেরূপ ইতর ভাষা অতীব নীচ-শ্রেণীর গ্রাম্য ভাষা। জ্ঞান এবং প্রাণের বিরোধ হইতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা প্রসূত হয়—প্রাণ শূন্য ভট্টাচার্য্য ভাষা এবং জ্ঞান-শূন্য গ্রাম্য-ভাষা; দুয়ের কোনোটিই বিশুদ্ধ সাধুভাষা নহে। ইতর-ভাষার প্রাণ স্ফূর্ত্তি—ব্যাকরণাদির জ্ঞানমূলক নিয়মে নিয়মিত হইয়া যে এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা প্রসব করে সেই জ্ঞান প্রাণের সংযোগাত্মক ভাষাই বিশুদ্ধ সাধু ভাষা। এইদৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এইটি দেখানো যে, জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের যোগ ব্যতীত কোনো কর্ত্তব্য কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে তিনরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল, (১) অবিশুদ্ধ গ্রাম্য ইতর ভাষা; ইহাই প্রাণের ভাষা ছিল। (২) নীরস ভট্টাচার্য্য ভাষা; ইহাই জ্ঞানের ভাষা ছিল। (৩) এবং জ্ঞান শূন্য প্রাণশূন্য আদালতি-ভাষা ইহাই কার্য্যের ভাষা ছিল। ভাষার এ যেমন দেখা গেল—ধর্ম্মেরও অবিকল সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল; একদিকে অন্ধ ভক্তি আর একদিকে শুষ্ক জ্ঞান, আর এক দিকে ক্রিয়াকাণ্ডের বাহাড়ম্বর,এইরূপ তিন সহোদর—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম—পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া তিন দিকে ছুট্‌কিয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাবের পর হইতে ভাষার তিন অবয়ব একত্র ঘনীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষার শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সাধু-ভাষা জন্ম গ্রহণ করি-য়াছে;—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানাদির-ভাষাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরের লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান—কি? না জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মন্তব্য কথা দুইটা;—প্রথম মন্তব্য কথা এই যে জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের সম-বেত সাহায্য ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। জ্ঞানকে ছাড়িয়া প্রাণ অর্থাৎ প্রীতি-ভক্তি—অন্ধ; প্রীতি ভক্তিকে ছাড়িয়া জ্ঞান—পঙ্গু। জ্ঞানের নিয়ম এবং প্রেমের আদর্শ এই দুয়ের যুগল আধিপত্যেই কর্ত্তব্য-সাধনে বল পৌঁছে। জ্ঞান এবং প্রাণ এ দুই পদার্থ মূলে একই বস্তু; প্রাণের চক্ষু ফুটিলেই তাহা জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়—জ্ঞানে বল পৌঁছিলেই তাহা প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। নবোন্মেষিত জ্ঞানের নিয়ম সকল যখন অভ্যাস-গুণে তোমার প্রাণের মধ্যে বসিয়া যাইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে এখনকার জ্ঞান তখনকার, প্রাণ; দেখিতে পাইবে যে এখন যাহা তুমি দূর হইতে জ্ঞান-নেত্রে অবলোকন করিতেছ তখন তুমি তাহা হাত বাড়াইয়া মুষ্টির মধ্যে পাইয়াছ। এই জন্য প্রথম মন্তব্য কথা 'এই যে, জ্ঞান এবং প্রাণকে একতানে মিলিত করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয় মন্তব্য কথা এই যে, সাধন আমাদের নিজের হস্তে, সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে ঈশ্বরের দান ঈশ্বর দিবেন—ইহা একটী যৎপরোনাস্তি ধ্রুব তত্ত্ব। ঈশ্বরের মতো ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা আর কাহারো নাই—সমস্ত জগৎই ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ; ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ; ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে—সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। তিনি জগতের মঙ্গল চা'ন বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ভয় করে; পাছে প্রাণের প্রাণ মঙ্গলময় পরম পিতা এবং পরম সুহৃৎ কোনো কিছুর ত্রুটী দেখেন—এই ভয়;—এ ভয় শাসনের ভয় নহে—ভক্তির ভয়। সাধনের সঙ্গে সিদ্ধি যোগ করিয়া দিবার জন্য—তাঁহারই আজ্ঞায় সমস্ত জগৎ ব্যস্ত রহিয়াছে। যেমন সাধন তেমনি সিদ্ধি—এ কথাটা শুধু কেবল পরীক্ষার কথা নহে—ইহা পরীক্ষার মূলের কথা; সহস্র পরীক্ষা এ কথার তিল মাত্রও অন্যথা করিতে পারে না। আমরা যদি স্বচক্ষেও দেখি যে এক ব্যক্তি কাজ করিল অতীব উত্তম—ফল হইল অতীব মন্দ, তবুও আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে, ভাল কাজের ফল কখনই মন্দ হইতে পারে না; আমরা বলিব যে, হয় অনুষ্ঠিত কার্য্যটির গোড়ায় এরূপ কোনো দোষ প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না; নয় তাহার ফল ফলিবার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই—দুয়ের এক। জগতের সর্ব্বত্রই আমরা এই যে একটি অব্যভিচারী ধ্রুব নিয়ম দেখিতে পাই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, এ নিয়মটি কেমন সুবিচার-সঙ্গত—কেমন সুযুক্তি-সংগত—কেমন জ্ঞান-সঙ্গত! নির্ব্বোধ মনুষ্যের বিচারে কত শত স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, একগুণ আঘাত—দশগুণ প্রতিঘাত, ইহাতে কেবল এইটিই প্রকাশ পায় যে, মনুষ্য-জ্ঞানের খদ্যোত-জ্যোতি মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন! সর্ব্ব-জগতের মূলে একই অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ নিয়ন্তা অবিচলিত-রূপে বর্ত্তমান—মোহ-অন্ধকার তাঁহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না; তাই অন্ধ জড়জগৎও জ্ঞান-সঙ্গত যুক্তি সঙ্গত বিচার-সঙ্গত নিয়মে নিরন্তর নিয়মিত হইতেছে। সমস্ত জড়জগৎ একবাক্যে নিয়মটি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে,যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত তাহার এক চুলও বেশী নহে—একচুলও কম নহে। জড় পদার্থেরাই কি কেবল জ্ঞানসঙ্গত যুক্তি-সঙ্গত এবং বিচার সঙ্গত নিয়মে নিয়মিত হইবে; আর, জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরাই কি কেবল অযুক্তি-সঙ্গত এবং অবিচার সঙ্গত, নিয়মে নিয়মিত হইবে—তাহা হইতেই পারে না! নিয়মের অর্থই হ'চ্চে জ্ঞান-সঙ্গত নিয়ম—যুক্তি সঙ্গত

নিয়ম। যে নিয়ম অজ্ঞান-সঙ্গত, অযুক্তি-সঙ্গত, অবিচার-সঙ্গত, তাহা ত নিয়ম নহে—তাহা ঘোরতর অনিয়ম! যদি এরূপ নিয়ম করা যায় যে, একগুণ আঘাত—তাহার শতগুণ বা সহস্র-গুণ প্রতিঘাত, তবে সেরূপ নিয়ম কখনই নিয়ম-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তাহা অনিয়ম অপেক্ষাও অনিয়ম—তাহা নিয়মবদ্ধ অ-নিয়ম। জ্ঞান-সঙ্গত ন্যায়ের নিয়মই নিয়ম—অজ্ঞান-সঙ্গত অন্যায়ের নিয়ম,নিয়ম নহে—তাহা অনিয়মেরই নামান্তর। একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-সঙ্গত মূল নিয়মে সমস্ত জগতের আদ্যোপান্ত নিয়মিত হইতেছে—সে নিয়ম এই যে, যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত। জ্ঞান-সঙ্গত নিয়মের মূলে জ্ঞান নাই—আর সূর্য্যালোকের মূলে সূর্য্য নাই—দুইই অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। অজ্ঞান-সঙ্গত নিয়ম বলিলে অনিয়ম ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না; সুতরাং নিয়ম বলিতে জ্ঞান সঙ্গত নিয়মই বুঝায়; অতএব সমস্ত জগতের মূলে যদি একই অদ্বিতীয় কোনো প্রকার মূল নিয়ম থাকে—তবে সে নিয়ম অবশ্যই জ্ঞান-সঙ্গত, যুক্তি-সঙ্গত, বিচার-সঙ্গত, তাহাতে আর তিলমাত্রও সংশয় নাই; আর সেই একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-সঙ্গত নিয়মের মূলে একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। একই সূর্য্যালোক যেমন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ, তেমনি একই অদ্বিতীয় মূল নিয়ম সমস্ত জগতের প্রাণ; এবং একই অদ্বিতীয় সূর্য্য যেমন সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু, তেমনি একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা সমস্ত জগতের চক্ষু। সমস্ত জগতের একই অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতি-ক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত। একজন অনভিজ্ঞ লোক মনে করিতে পারে যে, ঐ যে জ্ঞান-সঙ্গত মূল নিয়ম উহা জড়-জগতেরই নিয়ম—জ্ঞান-জগতে উহা খাটে না; ইহাঁদের মনের ভাব এই যে, অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারই জ্ঞান-জগতের একমাত্র নিয়ম। ইহাঁরা আপনাদের মনোগত ভাব জগতের মূলে আরোপ করিয়া জগতের এক অদ্বিতীয় চক্ষুকে অন্ধ মনে করেন—এবং এক অদ্বিতীয় হস্তকে বলহীন মনে করেন। মনে কর, মাঝগঙ্গা দিয়া ধূম-পতাকা উড়াইয়া একটা বাষ্পীয় নৌকা চলিয়া যাইতেছে ও একজন নূতন আনাড়ি কিনারায় কিনারায় ডিঙি চালাইতেছে; নিকটস্থ আর আর নৌকার মাঝিরা আগমিষ্যৎ তরঙ্গের ধাক্কা সামলাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতেছে, কিন্তু আনাড়িটা মনে করিতেছে যে, এত সাবধানতা কিসের জন্য? মাঝগঙ্গার তরঙ্গ মাঝ-গঙ্গাতেই উঠিতেছে—মাঝ-গঙ্গাতেই মিলাইয়া যাইতেছে; কিনারার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক? এই ভাবিয়া সে যখন অন্যান্য মাঝিদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মনের সুখে হাস্য করি-তেছে—তখন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ হু হুঃ শব্দে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ডিঙিখানি জলমগ্ন করিয়া দিল। এ যেমন দেখা গেল তেমনি—যাঁহারা মনে করেন যে, "ঘাত প্রতিঘাতের নিয়ম জড়-জগতেরই নিয়ম—জড়জগৎই বুঝুক;—জ্ঞানজগতের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? জ্ঞান-জগতে যাঁহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিতে পারে—জ্ঞান-জগতে ফলাফলের কেনো নিয়ম নাই," তাঁহাদেরও পরিণামে ঐরূপ দশা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাই লিখিত আছে অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি, ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি। লোকে অধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত হস্তগত করে, পরে চতুর্দ্দিকে মঙ্গল দর্শন করে, পরে শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করে,—কিন্তু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন সে, শত্রু জয় করিতেছে, তখন হয় তো সমস্ত জগৎ তাহার শ্রীবৃদ্ধি অবলোকন করিতেছে—যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তখন কেহই হয় তো তাহার দুর্দ্দশা দেখিতেছে না; কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; যতক্ষণ সে অধর্ম্মকে স্বীয় বক্ষে পোষণ করিতেছে ততক্ষণই তাহার গতি বিনাশের দিকে হইতেছে এবং যতক্ষণ সে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে ততক্ষণই তাহার গতি ঊর্দ্ধ দিকে হই-তেছে—এবিষয়ে তিল মাত্রও সংশয় নাই। প্রকৃতিরাজ্যের যেমন এক অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, সমস্ত ধর্ম্ম-রাজ্যের তেমনি এক অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; উভয়-রাজ্যেই ঘাত-প্রতি-ঘাতের নিয়ম অব্যর্থ এবং অব্যভিচারী; তবুও যে লোকে অনেক সময়ে তাহার প্রতি সংশয়ান্বিত হয়, তাহার কারণ আর কিছু না—নদীর কিনারা অঞ্চলে বাষ্প-নৌকার প্রতিঘাত যেমন বিলম্বে উপস্থিত হয়, ধর্ম্মরাজ্যে অনেক সময়ে স্বকৃত কর্ম্মের প্রতিঘাত তাহা অপেক্ষাও অনেক বিলম্বে উপস্থিত হয়। এই জন্য সাধক প্রবল অনুতাপ-সহকৃত ধর্ম্মসাধন দ্বারা পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফল প্রতিহত করিবার জন্য অনেকটা অবসর হস্তে পাইতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্ম-দ্বারা অধর্ম্মের ফল এইরূপ যে প্রতিহত হয় তাহাও ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মা-নুসারেই হয়—তাহার জন্য নূতন কোনো নিয়ম আবশ্যক হয় না। যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত—এই নিয়মটী—কি জড় জগৎ কি জ্ঞান-জগৎ সর্ব্ব জগতেরই একাধিপতি; কোথাও ইহার এক চুলও অন্যথা সম্ভবে না। মনে কর এক জন রাজা একগুণ অপরাধের দশগুণ দণ্ড দিলেন; এমত স্থলে, সেই দশ গুণ দণ্ডের মধ্যে এক গুণ দণ্ডই ন্যায়সঙ্গত,অবশিষ্ট নয়গুণ দণ্ড ন্যায়-বিরুদ্ধ। ন্যায়ের অতিরিক্ত সেই যে নয়গুণ দণ্ড তাহা অপ-রাধী ব্যক্তির সহ্য হইতে পারে,কিন্তু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের তাঁহা সহ্য হইতে পারে না—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাহা সহ্য হইতে পারে না;—সেই অতিরিক্ত নয়গুণ দণ্ডের ভার অপরাধী ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে হরণ করিয়া দণ্ডদাতার স্কন্ধে ফেলিবার জন্য সমস্ত প্রকৃতিই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে থাকে;—সে চেষ্টা কেহই চক্ষে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার ফল এক না, এক সময়ে ফলিবেই ফলিবে—ইহা অভ্রান্ত বেদ-বাক্য। আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, বুঝিতে পারি বা না পারি, ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম কোন স্থানেই তিল-মাত্রও নিষ্ফল হইবার নহে।

অনেকে মনে করেন যে, ঈশ্বর যেমন ন্যায়বান্ রাজা, তেমনি করুণাময় পিতা, অতএব করুণার নিয়ম ন্যায়ের নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস্তবিক দুয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের করুণার পাত্র—তাহার মধ্যে যাঁহাদের হৃদয় ঈশ্বরের চরণে অনুতাপাশ্রু বর্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তাঁহারা বিশেষতঃ তাঁহার করুণার পাত্র। সাধারণতঃ আমরা লোককে উপদেশ দিবার সময়

বলিতে পারি যে, বর্ষার বারিধারা ভিন্ন পৃথিবীর গতি নাই, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন মনুষ্যের গতি নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে এই বিশেষ বৃত্তান্তটীও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মেদিনী যখন গ্রীষ্ম-উত্তপ্ত হয়, তখনই বর্ষার বারিধারা নিপতিত হয়; পাপী ব্যক্তি যখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-পথে ফিরিয়া আইসে তখনই তাহার সান্ত্বনার জন্য ঈশ্বরের অমৃত করুণাবারি নিপতিত হয়,—এইরূপে করুণার পাত্র নির্ব্বাচন ন্যায়ের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। সমানে সমানে সদ্ভাবের বিনিময়, দীনের প্রতি ক্ষমতাবানের করুণা, উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা, সমস্তই ন্যায়ের অন্তর্গত। মৈত্রীর নিয়ম (কি না সদ্ভাব-বিনিময়ের নিয়ম), করুণার নিয়ম, এবং কৃতজ্ঞতার নিয়ম—সমস্তই একই ন্যায়ের নিয়ম; সে নিয়ম এই যে, ছোটো'র নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, বড়'র সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; বড়'র নিকট হইতে যেরূপ প্রত্যাশা কর, ছোটো'র সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; সমানের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, সমানের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে। মৈত্রী করুণা এবং শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা সমস্তেরই পাত্রাপাত্র বিবেচনা ন্যায়ের উপরে নির্ভর করে; এই জন্য, সে সমস্ত সদ্‌গুণ ন্যায়েরই অভিব্যক্তি। ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া মৈত্রীও ভাল নহে, করুণাও ভাল নহে, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ভাল নহে। ন্যায়ের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে মৈত্রী অসৎসঙ্গে পরিণত হয়, করুণা অপাত্রে দান হইয়া দাঁড়ায়, আর, শ্রদ্ধা-ভক্তি এমন যে উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাহাও গোঁড়ামি এবং অন্ধ ভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত করুণা ন্যায়েরই প্রকার-ভেদ! পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এখন এইটী বুঝিয়া দেখা আবশ্যক যে, ন্যায় জ্ঞানেরই উচ্ছ্বাস এবং করুণা প্রাণেরই উচ্ছ্বাস; সুতরাং দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর স্থান-পাইতে পারে না।

ঈশ্বরের ন্যায় এবং করুণার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি কর্ত্তব্য-সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই, তবে সিদ্ধিদাতা বিধাতা-পুরুষ অবশ্যই আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন; তাহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। কিন্তু সে সিদ্ধি যে কিরূপ তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে অধিকারীও নহি—অনুমান করিতে ইচ্ছাও করি না। কেহ হয় তো মনে করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে হীরক দিবেন—ঈশ্বর তাঁহাকে সুবর্ণ দিলেন; কিসে যে, তিনি সুবর্ণ পাইবার উপযুক্ত ও হীরক পাইবার অনুপযুক্ত, ক্রমে যত তাঁহার চক্ষু ফুটিবে ততই তিনি তাহা জানিতে পারিবেন। তাহার বিপরীতও হইতে পারে, এমনও হইতে পারে যে, তিনি মনে করিতেছেন ঈশ্বর তাঁহাকে সুবর্ণ দিবেন—ঈশ্বর তাঁহাকে হীরক দিলেন। কোন্ ব্যক্তি যে কখন কিরূপ দানের উপযুক্ত, তাহা সে ব্যক্তি নিজে জানিতে না পারে—ঈশ্বর তাহা ধ্রুবরূপে জানিতেছেন। আবার এমনও হইতে পারে যে, আমরা ভাবিতেছি ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত দিবেন—তিনি আমাদিগকে হলাহল দিলেন; রোগীর পক্ষে বিল্ববড়ি যে কিরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা তাহা রোগী না জানিতে পারে কিন্তু চিকিৎসকের তাহা অবিদিত নাই। আমরা শুধু এইটী জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে, ঈশ্বর যাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করিবেন, তাহাই আমাদের পরম মঙ্গল—ও তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গল। ঈশ্বরের দান বলিয়াই সম্পদের যত কিছু মূল্য—নহিলে সম্পদের মূল্য কি? আমার এক জন প্রিয়তম বন্ধু যদি আমাকে এত অধিক মণিরত্ন দান করেন যে, সেই বন্ধুর প্রেম অপেক্ষা তাঁহার দান আমার নিকটে অধিকতর মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাঁহার দান কি সমূলে ব্যর্থ হয় না? ঈশ্বরের নিজের মূল্য তাঁহার দানের মূল্য অপেক্ষা অনন্ত-গুণ অধিক—এ কথাটি যেন সর্ব্বদাই আমাদের মনে জাগরূক থাকে। তিনি—দিতেছেন বলিয়াই তাঁহার প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র বালুকণার মূল্য সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও অনন্তগুণ অধিক। তিনি দিতেছেন না—আমরা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া লইতেছি—এরূপ স্বোপার্জ্জিত সুখ আগাগোড়াই দুঃখ। বাস্তবিকই দেখা যায় যে, অযাচিত সুখ যাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে আইসে—তাহার আস্বাদ যেমন সুমধুর এমন আর কোন সুখেরই নহে; আর ইহাও একটী কঠোর পরীক্ষার সিদ্ধান্ত যে, আত্ম-সুখের জন্য যে যত বেশী লালায়িত সে ততই সুখে বঞ্চিত হয়। অতএব যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখের জন্য লালায়িত হইও না; কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণপণে সাধন কর—উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তোমার মস্তকে এরূপ পরমাশ্চর্য্য সুখ শান্তি বর্ষণ করিবেন যে, তোমার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিবে।

ঈশ্বর আমাদের দেশে, জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মকে সৌহার্দ্দ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া আমাদের দেশের সকল দুর্গতি নিবারণের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ স্বর্গীয় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—সেই পথ অবলম্বন কর—সুখ দুখের জন্য চিন্তা করিও না। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময় করুণাময় মাতা পিতা এবং সুহৃদের হস্তে তোমার চিরন্তন সুখ-সমৃদ্ধি গচ্ছিত রহিয়াছে—তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই—কোন ভাবনা নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অবলম্বন করাই তোমার একমাত্র কার্য্য; তাহাতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইবে, এবং কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে;—পরম পিতা এবং পরম মাতার অমৃত ক্রোড় তোমার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে।"

চিন্তা-মঞ্জরী।

১। পার্থিব সুখ দুঃখের চিন্তা হইতে মনকে উদ্ধার করিয়া যেই মানব সত্য ও সাধুতার অনুধ্যানে আপনাকে নিযুক্ত করে, অমনি তাহার আত্মা বর্ত্তমানের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত কালের সীমাতে পদার্পণ করে, তাহার দৃষ্টি অনন্তের উপর পতিত হয় এবং সে, জগতের সমুদায় সাধু মহাত্মাকে সঙ্গী দেখিতে পায়।

২। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত অথবা ঈশ্বরে সর্ব্ব ভূত প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোনটী সত্য? তিনি মূলাধার চৈতন্য। সৃষ্টি তাঁহা হইতে উদ্ভূত ও তাঁহাতে স্থিত।

৩। এমারসন বলেন দুই জন লোক যখন মনোযোগের সহিত

কোন বিচারে প্রবৃত্ত হয় তখন অজ্ঞাতসারে এমন কিছুর দোহাই দেয়, যে বিষয়ে উভয়ের মিল—এই দোহাই স্থানীয় যিনি, তিনি ঈশ্বর। বেশ কথা।

৪। এজগতে নাচি, কুঁদি, লাফাই, ছুটি যাহাই করি না কেন, ধানুকীর বাণ যেমন মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া ছুটিতে পারে না, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল নিয়মকে অতিক্রম করিবার সাধ্যও আমাদের নাই। আমরা অবিশ্বাসী তাই এই শুভ সংকল্পের উপর নির্ভর করিতে পারি না।

ব্রাহ্ম সমাজ।

শ্রাদ্ধ—গভীর দুঃখের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে নিম্নলিখিত দুইটী শিশুর পরলোক গমন সংবাদ দিতেছি—

১। আমাদের বগুড়া প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি এখন উৎকট পীড়া নিবন্ধন বহরমপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ৪র্থ পুত্র সুহৃদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিগত ১৭ই ফাল্গুন পরলোকগমন হইয়াছে। বালকটীর সবে ৮।৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং সে পিতার অতি আদরের পাত্র ছিল। এ সময় তাহার বিচ্ছেদে শ্রীমন্ত বাবুর বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই পুত্র-শোকাতুর পিতার প্রাণে সান্ত্বনা আনয়ন করুন। কয়েক দিবস হইল এখানে সুহৃদের ভাই ভগিনী প্রভৃতিতে মিলিয়া তাহার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার এই শিশুসন্তানের আত্মার কল্যাণ করুন এই প্রার্থনা।

২। বিগত ১২ই ফাল্গুন আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ১০ মাস বয়সে হামজ্বরে পরলোকগত হইয়াছে। দেবী বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী—তাঁহাদের এই কন্যাকে অসময়ে হারাইয়া বিশেষ শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত মাঘ মাসে এই বালিকার নামকরণ উপলক্ষে দেবী বাবু অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দের সহিত বালিকাটীর নাম "অপরাজিতা" রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহার নামকরণ সংবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিতে হইল। গত ১২ই চৈত্র অপরাজিতার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। দেবী বাবু এই কন্যার স্মরণার্থ কয়েকটী সাধু কার্য্যের সংকল্প করিয়াছেন। প্রথম ইহার জন্মদিনে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট কোন সৎকার্য্যে ৫৲ টাকা দান করিবেন। ২য় প্রতি বৎসর ফরিদপুর সুহৃদসভার পরীক্ষোত্তীর্ণাছাত্রীগণের মধ্যে একজনকে ৫৲ টাকার একটী পুরস্কার প্রদান করিবেন। ৩য়। তাঁহার বাটীতে ২টী নিরাশ্রয়া বিধবার ভরণ পোষণ করিবেন। ৪র্থ। ২টী বালক ও ২টী বালিকার স্কুলে পড়িবার বেতন প্রদান করিবেন। ৫ম। প্রতিদিন তাঁহার ভবনে মুষ্টি ভিক্ষা প্রদান করিবেন এবং প্রত্যেক মাসের শেষে একখানা বস্ত্র বা তাহার মূল্য দান করিবেন। ৬ষ্ঠ তাঁহার প্রণীত "অপরাজিতা" নামক পুস্তক বিধবা এবং দরিদ্র পুস্তকালয়ের আবেদনানুসারে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন। করুণাময় পরমেশ্বর এই বালিকার শোকাকুল পিতা মাতার প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং তাহাকে কুশলের সহিত রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা।

বিবাহ—বিগত ২৮এ ফাল্গুন কলিকাতা নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের অফিসে কার্য্য করেন। বয়স ২৭ বৎসর। কন্যা পরলোকগত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমমালা বসু বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। এই বিবাহে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ৮ই চৈত্র ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস মহাশয়ের দৌহিত্রী—শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের ১মা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। "বালিকার নাম মনোলতা ও মলিনা" রাখা হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা দাতব্য বিভাগে ১০৲ দশ টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

(আবেদন পত্র।)

মহাশয়,

আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায় উপাচার্য্য মহাশয় প্রচার ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে কোন ধনাঢ্য পরিবারের প্রজা স্বরূপে যে বাটীতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল বাস করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে সেই বাটীর সত্বাধিকারী বাবু দিগের আদেশ মতে তাঁহাকে অচিরে ঐ বাটী ত্যাগ করিতে হইতেছে। সম্মুখে বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে এবং ঝটীকাদির সম্ভাবনা। এমত সময়ে তাঁহাকে সপরিবারে নিরাশ্রয় হইতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহার বাসজন্য সামান্য কুটীরাবাস নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইতেছে, কিন্তু এই কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে দয়ার্দ্রচিত্ত দানশীল মহোদয়গণের দয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এমত অবস্থায় তাঁহার প্রতি আমাদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য বোধে সহৃদয় দানশীল ভদ্রমণ্ডলী সমীপে এই বিষয়টী নিবেদন করিলাম। এতচ্ছ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যদি কেহ যৎকিঞ্চিৎ ও দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা বিশেষ ধন্যবাদ প্রদানান্তর তাহা তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মস্তকোপরি গ্রহণ করিব।

অমরাগড়ী ব্রাহ্ম মিশন অফিষ
ঝিংরা পোষ্ট আঃ (হাওড়া)
সন ১২৯৬।১০ই চৈত্র।

অনুগ্রহপ্রার্থী
রায়
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬এ চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।